



প্রতীক

অজন্মের প্রথম গৃহের চিত্র ইহা

ইহা, বর্ণিত কর্তৃক এক।

কাল্পনিক প্রতীক

ভারতী

৩৪শ বর্ষ]

কার্তিক, ১৩১৭

[৭ম সংখ্যা

ভারত ও বিলাত ।

(বিলাত-প্রবাসীর পত্র ।)

১৩। ব্যক্তিত্ব ও জাতিত্ব ।

এ জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি একএকটা নিজস্ব আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এ আদর্শ তার ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে; বাহির হইতে কোনো জাতিই আপনার এই নিজস্ব আদর্শটিকে ধার করিয়া লইতে পারে না। এই যে আদর্শের বিশেষত্ব, ইহাকেই জাতীয়তা বা জাতিত্ব বলা যায়। ব্যক্তির পক্ষে যেমন ব্যক্তিত্ব বলিয়া একটা জিনিষ আছে, জাতির পক্ষেও ঠিক সেইরূপ জাতিত্ব বলিয়া একটা বস্তু আছে। এই ব্যক্তিত্ব কাকে বলি? আমার ভিতরে, আমার দেহগঠনে, আমার চালচলনে, আমার ভাব ও চিন্তাতে, এমন কিছু আছে, যাহাতে ছনিয়ার অপর সকল লোক হইতে আমাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। আমিও তাদেরই মত মানুষ, তাদেরই মত আমার হাত পা, আমার নাক মুখ চোখ। আমার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলই অপর মানুষের মতন। কিন্তু এগুলির ব্যবহারে আমার এমন একটা বিশেষত্ব ফুটিয়া বাহির হয়, যাহা অপরের হয় না। আমার কণ্ঠনালীতে আর অপরের

কণ্ঠনালীতে কোনো পার্থক্য নাই, যদি কিছু থাকে, তাহাও সহজে ধরা যায় না। অথচ কণ্ঠনালীর গঠন আমাদের একরূপ হইলেও, আমার স্বরে ও অপরের স্বরে বিস্তর প্রভেদ লক্ষিত হয়। গঠন মোটামুটি এক, কিন্তু উচ্চারণ! বিভিন্ন। এটি আমার ব্যক্তিত্ব বা বিশেষত্বের একটা বহিঃপ্রকাশ। সেইরূপ আমার পায়ে যে ক'খানা হাড় ও পেশী, অপর মানুষেরো তাই আছে; কিন্তু আমার পায়ের শব্দ ও তাদের পায়ের শব্দ এক নয়। আমাকে যারা ভাল করিয়া চিনেন, আমার পায়ের শব্দে তাঁরা আমার পরিচয় পাইয়া থাকেন। শরীরের ও শারীর ক্রিয়ার ভিতরেও আমার নিজস্বটুকু এমনভাবে আপনাকে প্রতিনিয়তই ব্যক্ত করিয়া থাকে। আর যাহাতে আমার এই নিজস্বটুকুকে,— বিশাল বিশ্বে আমার এই বিশেষত্বটুকুকে ব্যক্ত করে, তাহাই আমার ব্যক্তিত্ব।

শরীর সম্বন্ধে যেমন আমার একটা বিশেষত্ব বা নিজস্ব আছে, শরীর-সম্বন্ধে যেমন আমি ছনিয়ার সকল মানুষের সমান হইয়াও সমান নই, সাধারণ শারীর ধর্ম আমার যেমন অপরেরো সেইরূপ, ইহা সত্য হইলেও,

এই সত্যে ইহারই ভিতর আমার যে একটা বিশেষত্ব আছে, এই সাম্যের ভিতরই যে একটা চিরস্থান বৈষম্য ফুটিয়া উঠিতেছে, ইহাকে নষ্ট করে না। সেইরূপ আমার মনের গঠনে এবং চিন্তার প্রণালীতেও এমন কিছু আছে, যাঁতে আমার চিন্তাকে, আমার বিচারকে, জীবনের জটিল সমস্যা আমি যেভাবে ভেদ করিতে যাই, তাহাকে, অপর লোকের চিন্তা, অপর লোকের বিচার, অপর লোকের বিশ্ব সমস্যার মীমাংসা হইতে পৃথক করিয়া রাখে। আমাদের চিন্তা যখন এক হয়, তখনো সে চিন্তার অভিব্যক্তি স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন হইয়া থাকে। একই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া, আমরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আমাদের নিজেদের মত করিয়া সে সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করি ও অপরের নিকট প্রয়োজন মত তাহাকে প্রতিষ্ঠিত কবিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। আমাদের কণ্ঠে যেমন একটা সুর আছে, এ সুর যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র; একই কথা বলিতেছি, একই বর্ণ উচ্চারণ করিতেছি, উচ্চারণও সমভাবে সাধু হইতেছে, অথচ আমার সুর আমার, তোমার সুর তোমার, ইহা যেমন সত্য; সেইরূপ আমাদের মনেরো একটা সুর আছে। আমাদের অভিজ্ঞতা এক, আমাদের মত এক, আমাদের বিশ্বাস এক, আমাদের সিদ্ধান্ত এক,—এ সকলই হয়ত এক; কিন্তু তথাপি এই একই অভিজ্ঞতা, একই মত, একই বিশ্বাস একই সিদ্ধান্ত যখন আমি প্রতিষ্ঠিত করিতে যাই, তখন তার ভিতরে আমার মনের যে নিজস্ব সুরটুকু আছে, তাহাই বাজিয়া উঠে, আর তোমার মনের যে নিজস্ব

সুরটুকু আছে, তোমার চিন্তাতে, তোমার বিচারে, তোমার অভিব্যক্তিতে তাহাই বাজিয়া উঠে। এই মনের সুরটার নামই ভাষা। আমাদের ভাষাতে, যেভাবে আমরা শব্দ-যোজনা করি, যেভাবে আমরা কথাবার্তা কহি, যে প্রণালীতে আমরা বিবিধ বিষয়ের বিচার-আলোচনা করি, এককথায় আমাদের লেখার ধরণে, রচনার প্রণালীতে, সর্বদাই আমাদের মনের এই সুরটি ফুটিয়া বাহির হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির রচনার গাঁথুণীর দ্বারা তাঁর মনেরো গাঁথুণীর পরিচয় পাওয়া যায়। যার চিন্তা লঘু, তাঁর ভাষাও লঘু হয়। যার চিন্তা সতেজ, শক্ত, যুক্তি পরম্পরার উপরে সর্বদা আপনার সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, যার ভিতরকার মনের স্বভাব একরূপ, তাঁর ভাষাতেও ইহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর এই ভাষাটুকু আমাদের প্রত্যেকেরই আলাহিদা। রচনার কোনো বিশেষত্ব নাই, এমন লোকও আছেন। তাঁরা যখন যে বই পড়েন, তখন সেই লেখকের ভাষাই লেখেন ও বলেন। একরূপ তুলারশি লোকের মনের বিশেষত্ব ফুটে নাই, ভাষারো বিশেষত্ব ফুটে নাই। তাঁদের মনেরো একটা বিশেষত্ব আছে, সত্য। কালক্রমে উপযুক্ত অনুশীলনে সে বিশেষত্বটুকু ফুটিয়া উঠিবে। আর তখন তাঁদের ভাষাও তাঁদের নিজস্ব বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। যাদের ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁদের লেখাতে সর্বদাই তাঁদের নিজস্ব বা ব্যক্তিত্বটুকু ফুটিয়া বাহির হয়। অনেক লোকের ছবির মাঝখানে পরিচিত বন্ধুর ছবি যেমন সহজেই চেনা যায়, অনেক লেখকের রচনার ভিতরেও সেইরূপ

পরিচিত লেখকের লেখাটা সহজেই চিনতে পারা যায়। যারা বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের লেখা ভাল করিয়া পড়িয়াছেন, বিপুল সাহিত্য সংগ্রহের ভিতর হইতেও তাঁদের পক্ষে এই ছই সাহিত্যরথীর রচনা পৃথক্ করা একটুও কঠিন কাজ নহে। আর ইহাও কি সত্য নহে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা যখন পড়ি, তখন তার বর্ণে বর্ণে, পংক্তিতে পংক্তিতে, বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-রূপ আমাদের মানসক্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়? রবীন্দ্রনাথের লেখা যখন পড়ি, তখন কেবল তাঁর লেখা নয়, উপরন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আমাদের মনের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হন? প্রত্যেক ব্যক্তির কণ্ঠে যেমন এক একটা বিশেষ সুর আছে, আর এই সুর যেমন তাঁর নিজস্ব বস্তু, ইহাতে তাঁর বিশেষত্ব বা ব্যক্তিত্বটুকুকে প্রকাশ করে; সেইরূপ প্রত্যেকের ভাষাতেও একটা বিশেষ সুর আছে, এ সুর কণ্ঠের নহে, মনের; আর তাঁদের মনের, চিন্তার যে বিশেষত্ব বা ব্যক্তিত্বটুকু আছে, তাহাই এই মনের সুরের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর এই যে ভাষার সুর, ইহার ভিতর কোন্ দিক্ দিয়া এই বিশাল বিশ্ব-সমস্তার মীমাংসা করিতেছেন, কে কোন্ ভাবে এই জগৎটাকে দেখিতেছেন, এটিও স্বল্পবিস্তর বুঝিতে পারা যায়। কারণ এই বিশ্ব-সমস্তাই আমাদের চিন্তার মূল বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। এই ইদং ও এই অহং— এই ছই বিরাটতত্ত্ব লইয়াই মন দিবানিশি ব্যস্ত রহিয়াছে। এই অহং ও ইদংএর জটিল সম্বন্ধের অর্থ কি, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা হইতেই মানুষের সর্বপ্রকার শাস্ত্র-

সাহিত্য, ও শিল্পবিজ্ঞানাদির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমাদের লঘুগুরু, ক্ষুদ্রবৃহৎ, সকল আলোচনা ও সকল সমস্তার পশ্চাতেই এই বিশাল বিশ্বসমস্তা সতত দাঁড়াইয়া আছে। আমরা তাহাকে জানে সকল সময় ধরিতে পারি না, সত্য; কিন্তু ধরি আর না ধরি, তাহাকে অতিক্রম করিয়া, ক্ষুদ্রবৃহৎ, বিশেষ-নির্বিশেষে, কোনো সিদ্ধান্তেরই প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। কোনো জ্ঞানই, ফলতঃ সম্ভব হইতে পারে না।

আমাদের শারীর ধর্ম্মে ও মানস ধর্ম্মে এই যে এক একটা বিশেষত্ব বা নিজস্ব আছে, যে বিশেষত্ব বা নিজস্বটুকুতে তোমাকে আমি হইতে, আমাকে তোমা হইতে পৃথক্ করিয়াছে, ও আমাদের উভয়কে, ও জগতের প্রত্যেক মানুষকে, অপর সকল হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে, ইহাই আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব। এইটুকুই আমাদের মৌলিকত্ব। ইহাই আমাদের নিজস্ব বস্তু। আর ব্যষ্টিভাবে, তোমার আমার এই যে ব্যক্তিত্ব, সমষ্টিভাবে, তাহাই প্রত্যেক জাতির জাতিত্ব। আমাদের প্রত্যেকের চেহারা যেমন স্বতন্ত্র, আমাদের সুর যেমন আলাহিদা, আমাদের চিন্তার ধরণ যেমন পৃথক্ পৃথক্, সেইরূপ সমষ্টিভাবে জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতিরো চেহারা স্বতন্ত্র, সুর স্বতন্ত্র, সমাজগঠন ও চিন্তার ধরণ, এ সকলই স্বল্পবিস্তর স্বতন্ত্র ও পরস্পর হইতে বিভিন্ন। এই যে স্বাতন্ত্র্য, এই যে বিভিন্নতা, এই যে বিশেষত্ব ইহারই নাম জাতিত্ব। আর এই যে জাতিত্ব, ইহা প্রত্যেক জাতির শারীর ধর্ম্মে ও মানস ধর্ম্মে, উভয়ক্ষেত্রেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। এক ব্যক্তির চেহারা যেমন আর এক ব্যক্তির চেহারা হইতে ভিন্ন, সেইরূপ

জগতের ভিন্ন জাতি সমূহেরো পরস্পরের চেহারা বিভিন্ন। শরীরের বর্ণে ও গঠনে, এক জাতি অপর জাতি হইতে পৃথক হইয়া রহিয়াছে। জাপানের লোকের চেহারার সঙ্গে ভারতবর্ষের লোকের চেহারার মিল নাই। হিন্দুর চেহারার সঙ্গে কাফির চেহারার মিল নাই। অতিশয় কালো হিন্দুকেও কৃষ্ণকায় কাফির বলিয়া কেহ কখনো ভুল করিতে পারে না। আমেরিকাতে এমন প্রায়ই দেখা যায় যে রং দেখিয়া হঠাৎ কোনো হিন্দুকে লোকে কাফির ভাবিয়াছে, কিন্তু মুখের দিকে চাহিয়াই, অপরাধীর মত, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে। শরীর-গঠনে যেমন, মনের গঠনেও সেইরূপ প্রত্যেক জাতির এক একটা বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্ব তাহাদের ভাষার গঠনে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কতকগুলি ভাষাতে অহং প্রত্যয়ের জ্ঞান প্রবল, কতকগুলিতে ইদং প্রত্যয়ের উপরেই ঝোক বেশী। সংস্কৃত ও সংস্কৃতের সঙ্গে যাদের মৌলিক সম্বন্ধ আছে, লাতিন, গ্রীক প্রভৃতি আর্যভাষাতে, অহং আমি, আমি আছি, এই পদ সিদ্ধ হয়, অপর জাতির ভাষাতে ইহা সিদ্ধ হয় না। শুদ্ধ অস্তিত্বের জ্ঞান স্মরণাতীত কাল হইতে,—ইতিহাস যে কালের খোঁজ পাইয়াছে,—তার বহু পূর্ব হইতে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে, এই সকল জাতির ভিতর আশ্চর্যরূপে ফুটিয়াছিল, তাই তাদের ভাষায় শুদ্ধ অস্তিত্ব-জ্ঞাপক, অহং অগ্নি ইত্যাকার পদ নিষ্পন্ন হইতে পারে। এমন ভাষাও আছে, যাহা এই অস্তিত্বকে ব্যক্ত করিতে যাইয়া সর্বদাই কোনো ক্রিয়ার সঙ্গে তাহাকে যুক্ত করিয়া

দেয়। আমরা যেখানে বলি, 'রাম আছে, সেখানে তারা বলে রাম বসিয়া আছে, বা দাঁড়াইয়া আছে, ইত্যাদি। এই যে বিভিন্ন জাতির আপন আপন ভাষার গঠনে এক একটা মৌলিক বিশেষত্ব আছে, ইহাতে এদের নিজস্ব চিন্তার ধরণটা প্রকাশিত হইতেছে। যে যে ভাবে চিন্তা করে, তার ভাষা সেইরূপই হয়। ইহা ব্যক্তির সম্বন্ধে যেমন সত্য, জাতিসমূহের সম্বন্ধেও সেইরূপ সত্য।

১৪। চিন্তা ও ভাষা।

ভাষার মুখ্য অঙ্গ তিনটি; কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া। এ তিনের মধ্যে যে ভাষায় যেকোনো সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করে, তাহারই দ্বারা সেই ভাষা যাহারা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের চিন্তার ধরণা জানিতে পারা যায়। কোনো জাতির ভাষায় কর্তার উপরেই ঝোক বেশী, যাবার কোনো ভাষায় কর্মের প্রতিই দৃষ্টি বেশী। এমন ভাষাও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে কর্তার উপরেও নয়, কর্মের উপরেও নয়, কিন্তু শুদ্ধ ক্রিয়ার উপরেই চিন্তার সকল জোরটা যেন আসিয়া পড়িয়াছে। রাম আঘাত করিয়াছে, সকল আর্য ভাষাতেই এরূপ পদ নিষ্পন্ন হয়। এখানে রাম কর্তা, রামই এখানে মুখ্য শব্দ। কাকে আঘাত করিয়াছে, কিরূপে আঘাত করিয়াছে, এ সকল বিষয় সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া সর্বদৌ কে আঘাত করিয়াছে, মন এখানে তারই সন্ধান লইয়াছে। যে জাতির ভাষায় এই পদ নিষ্পন্ন হয়, সে জাতির চিন্তাতে কর্তা বা অহংএর জ্ঞানই সর্বাপেক্ষা প্রবল। আবার এমন ভাষাও আছে, যাহাতে এই

একই অভিজ্ঞতা অন্তর্ভাবে ব্যক্ত হয়। যদি কোনো ভাষায়, “রাম যত্নকে আঘাত করিয়াছে, এরূপ পদ নিষ্পন্ন না হইয়া কেবল এই হয় যে, “যত্ন আহত হইয়াছে,” তবে সেই ভাষা যারা ব্যবহার করেন, তাঁহাদের চিন্তায় ও জানে কর্তা অপেক্ষা কর্মের জ্ঞানই যে আদিকাল হইতে অধিকতর প্রবল ছিল, এ সিদ্ধান্ত সহজেই উপলব্ধি হয়। আবার এমন ভাষাও আছে, যাতে কর্তা ও কর্ম উভয়েরই জ্ঞান অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ, কেবল ক্রিয়ার জ্ঞানটাই নিরতিশয় প্রবল। এরূপ ভাষা আদিম কাল হইতে যে জাতি ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের চিন্তার ধরণ যে অপরের চিন্তার ধরণ হইতে স্বতন্ত্র হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি ?

১৫। বিশ্বসমস্যা।

এই বিশ্বের মুখ্য তত্ত্ব দুটি—অহং ও ইদং। অহং কর্তা, ইদং কর্ম। অহং বিষয়ী, ইদং বিষয়। এই অহংএর সহিত এই ইদং এর সম্বন্ধ কি ? ইহাই বিশ্বের বিশাল ও সনাতন সমস্যা। এদের সম্বন্ধ-নির্ণয় করিতে যাইয়াই মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান, শাস্ত্র সাহিত্য, ধর্ম কর্ম, সকলই ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে জাতি আদিকাল হইতে যে ভাবে এই বিশ্বসমস্যা কে দেখিয়াছে, ধরিয়াছে, তার যেরূপ মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছে, সে ভাবেই সেই জাতির ধর্ম ও দর্শন, শিল্প ও সাহিত্য, এক কথায় তার সাধনা ও সত্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। আর প্রত্যেক জাতির ভাষার মৌলিক গঠনের মধ্যে, সে জাতি এই বিশাল বিশ্বসমস্যাকে কিরূপে দেখিয়াছে ও ধরিয়াছে,

তার মূল সূত্রটি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কোথাও বা মানুষ অহংকে সকল অবস্থাতেই ইদং এর উপরে প্রভুত্ব করিতে দেখিয়াছে, সেখানে তার সাধনা ও সত্যতা অহংমুখীন বা অন্তর্মুখীন হইয়াছে। সেখানে সে সর্বদাই বিষয়ের মধ্যে বিষয়ীকে খুঁজিয়াছে, বিষয়-জাল ছেদন করিয়া, বিষয়ীকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তার ধর্ম আধ্যাত্মিক, তার দর্শন অদ্বৈত, তার শিল্প অন্তর্মুখীন, তার সকলই একটা বিষয়াতীত, অতীন্দ্রিয় প্রভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়াছে। আবার কোথাও বা মানুষ বিষয়ের মধ্যে বিষয়ীকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। বিষয়ের প্রভাবে তার জ্ঞান এমনই অভিভূত হইয়াছে যে সে কিছুতেই বিষয়ীকে বিষয়ের উপরে একান্তভাবে স্থাপন করিতে পারে নাই। যে জাতি এইরূপে বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হইয়া যায়, তার ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য সকলই অতি-মাত্রায় বহিমুখীন ও বিষয়াধীন হইয়া পড়ে। মানুষ আদিকাল হইতেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই বিশ্বসমস্যাকে দেখিয়াছে। বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনে এই সমস্যার মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাইয়াছে। এই জন্ত তাদের সত্যতাও পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। এই চেষ্টা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে।

১৬। জাতিত্ব ও মনুষ্যত্ব।

কিন্তু জগতের বিভিন্ন মানুষের একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব এবং বিভিন্ন জাতির একটা বিশেষ জাতিত্ব বা জাতীয়তা আছে বলিয়া যে তারা পরস্পরে সমান নহে, এমনো বলা

যায় না। জগতের সর্বত্রই বৈষম্যের মধ্যে সাম্য ও সাম্যের মধ্যেই বৈষম্য রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির যেমন এক একটা বিশেষ জাতিত্ব আছে, তেমনি অপর সকলেরই মধ্যে একটা সাধারণ ও সার্বজনীন মনুষ্যত্ব রহিয়াছে। সকলেই মানুষ। মানুষে মানুষে আকারে বিভিন্নতা, গঠনে বিভিন্নতা, চাল-চলনে বিভিন্নতা, ভাবে ও চিন্তাতে বিভিন্নতা, একের আকার অপর হইতে পৃথক্, একের মনের গতি অপরের মনের গতি হইতে পৃথক্, একের প্রকৃতি অপরের প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র; কেহ বা তামসিক, কেহ বা রাজসিক, কেহ বা সাত্বিক, কিন্তু এ সকল বৈষম্য সত্ত্বেও সকলেই মানুষ। স্বরূপতঃ সকলেই এক। সকলেরই মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে। আর এই মনুষ্যত্ব বস্তু পূর্ণ বস্তু, অখণ্ড বস্তু; তার ভাগ বাটোয়ারা হয় না। কারো মধ্যে এই সাধারণ মনুষ্যত্ব বেশী ফুটিয়াছে, কারো মধ্যে এখনো পরিমাণে ততটা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। এইরূপে প্রকাশের অভিব্যক্তির ইতর-বিশেষ ভেদ আছে; কিন্তু মূল বস্তুর ভারতম্য নাই। স্বরূপতঃ সকলে পরিপূর্ণ বস্তু। আর তাই বলিয়াই স্বরূপতঃ সকলে এক। আর স্বরূপতঃ সকলে এক বলিয়াই তারা পরস্পরকে জানিতে পারিতেছে, বুঝিতে পারিতেছে, পরস্পরের সঙ্গে ঐ এক ও অদ্বৈত স্বরূপের ভিতর দিয়া অশেষ প্রকারের সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে পারিতেছে। এক ব্যক্তির মধ্যে যাহা প্রকট, অপরে তাহা অপ্রকট; এদের ভিতরে ইহাই পার্থক্য। সেইরূপ এক জাতির মধ্যে যাহা ব্যক্ত, অপরে তাহা এখনো অব্যক্ত রহিয়াছে। নতুবা মূলে তারা সকলে

একই ছাঁচে ঢালা, একই পূর্ণতার প্রকাশ, একই অদ্বৈত অখণ্ড বস্তুর অভিব্যক্তি। এই অদ্বৈত, অখণ্ড পরিপূর্ণ অব্যক্ত বস্তু, ভিন্ন ভিন্ন আধারের ভিতরে থাকিয়া, সেই সকল বিভিন্ন আধারের ভিতর দিয়া আপনাকে ব্যক্ত করিতে ছেন। এজন্য এই বিশ্বের বিপুল অভিব্যক্তিতে ঋণের বা দানের প্রয়োজন নাই, স্থাবও নাই, প্রত্যেকেরই একটা নিজত্ব, একটা বিশেষত্ব, একটা ব্যক্তিত্ব আছে বলিয়া, অপরের নিকট হইতে সে কখনো আপনার জীবনের মূল বস্তু-গুলি ধার করিয়া লইতে পারে না। এক রাজ্যে যেমন অপর রাজ্যের টাকাকড়ি চলে না, ভারতের টাকা বা পয়সা যেমন ফরাসী দেশে রূপার বা তামার বাজার দরে বেচিতে হয়, টাকা বা পয়সা বলিয়া সেখানে তার কোনো দাম নাই, সেইরূপ এক ব্যক্তির সত্য ও ধর্ম অপর ব্যক্তির জীবনে ও কর্মে চলে না, সেখানে তার নিজস্ব মূল্যে বিকাইতে পারে না। সেইরূপ এক জাতির সভ্যতা এবং সাধনাও অপর জাতির ভিতরে তার নিজের দরে বিকায় না, বিকাইতে পারে না। সেখানে তাহাকে সাধারণ সার্বজনীন মনুষ্যত্বের ওজনে মাপিতে হয়, ও এই মনুষ্যত্বের দরে তার দাম-দস্তুর হইয়া থাকে। সেখানে তার বিশেষ মূল্যটুকু আর থাকে না। সেই মূল্যটুকু জোর করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে, তাহা ভয়াবহ পরধর্ম হইয়া উঠে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় ধারকর্জ্বও আর চলে না। তাহাতে লোকসান বই লাভ কখনো হইতে পারে না। আর এরূপ ধারকর্জ্বের কোনো প্রয়োজনও নাই। কারণ সকলের ভিতরে যখন একই পূর্ণ, অদ্বৈত,

অথও বস্তু রহিয়াছে, সেই একই পূর্ণ ও অর্ধৈত বস্তু যখন নানাভাবে, নানা আকারে, সকল আধারের ভিতর দিয়াই আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন, তখন এক ব্যক্তি বা এক জাতি তার নিজস্ব ধনের জ্ঞান অপরের দ্বারে কেনই বা প্রার্থী হইতে যাইব? এই জ্ঞানই এ বিশ্ব-বিবর্তনে দানের কণামাত্রও স্থান নাই, অনু-করণ একান্তই নিশ্চয়োজন।

১৭। মনুষ্যত্বের ইতিহাস।

সকল অপূর্ণের ভিতরেই যে পূর্ণ বস্তু রহিয়াছে, সকল দ্বৈতের মূলেই যে অর্ধৈত বস্তু, সকল ভাগবিভাগের ভিতরেই যে এক অখণ্ড ও অবিভাজ্য তত্ত্বপদার্থ নিহিত রহিয়াছে, এবং বিশ্ববিবর্তনে অনন্তভাবে, অনন্ত আধারে, অনন্তরূপে সেই নিত্য স্বরূপ বস্তু আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন, যুরোপ এই সত্যকে এখনো ভাল করিয়া ধরিতে পারে নাই। আর তারই জ্ঞান যুরোপ অনেক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াও এখনো পর্য্যন্ত মানবসমাজের একটা সার্বজনীন ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। যুরোপ প্রাচীন কালের বহু সাধনা ও সভ্যতার আলোচনা করিয়াছে ও করিতেছে। সমাজের অতি প্রাচীন সময়ের অনেক লুপ্ততত্ত্ব উদ্ধার করিয়াছে ও করিতেছে, বর্তমানে ভিন্ন ভিন্ন জাতির শাস্ত্র সাহিত্য, আচার পদ্ধতি, এ সকলের অনেক সংগ্রহ করিয়াছে ও করিতেছে, কিন্তু এমন সুন্দর, এমন মূল্যবান, এরূপ বিরাট আয়োজন ও উপকরণ সবেও, মানব সমাজের একটা সার্বজনীন ইতিহাসের পত্তন পর্য্যন্ত করিতে

পারে নাই। সমগ্র মানবমণ্ডলীকে যুরোপ এপর্য্যন্ত খণ্ড খণ্ড ভাবেই দেখিয়াছে। আর একটা কল্পিত, অলীক সূত্রে এ সকল খণ্ড বস্তুকে গাঁথিয়া তাহাদের মধ্যে একটা কাল্পনিক একত্ব প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা করিয়াছে। মানুষের যেমন পোগণ্ড, বাল্য, যৌবন, জরা প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থা হয়; প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন এই সকল অবস্থার ভিতর দিয়া যাইয়া আপনার পরিণতি ও পরিপকতা লাভ করে, আর এক এক অবস্থা অতিক্রম করিয়া, মানুষ যেমন অপর পূর্ণতর অবস্থা প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ সমগ্র মানবজাতিও ধারাবাহিকরূপে, সমাজ-পরিবর্তনের ভিন্ন ভিন্ন ধাপ বা অবস্থা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। ভারতে ও মিশরে, লুদিয়ায় ও ব্যাবিলনে, এই “বিশ্ব-মানব” পোগণ্ড ও বাল্যদশায় ছিলেন। গ্রীসে ও রোমে যৌবনের প্রথম প্রাপ্ত হন। আধুনিক যুরোপে যৌবনের পূর্ণতা ও জীবনের পরিপকতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং যুরোপের বাহিরে যারা পড়িয়া আছে, আধুনিক যুরোপীয় সাধনা ও সভ্যতার যারা অধিকারী নহে, তারা বালকরূপে স্নেহ, কৃপা, ও অনুকম্পার পাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু সমকক্ষরূপে কখনো সমাদৃত হইতে পারে না। যুরোপীয় পাণ্ডিত্য এইভাবেই মানবসমাজের একটা সার্বজনীন ইতিহাস রচনা করিয়াছে ও করিতেছে।

কিন্তু পোগণ্ড, বাল্য, যৌবন প্রভৃতি একই ব্যক্তির জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। এক জনে পোগণ্ডাবস্থা শেষ হইয়া, আর এক জনে বাল্যের সূচনা, ও তাহার বাল্যাবস্থার অবসানে তৃতীয় ব্যক্তির যৌবনের প্রতিষ্ঠা

কখনো হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের ক্রমটা কখনো ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয় না। যার পোগণ্ড, তারই বাল্য, তারই আবার যৌবন, সেই একই ব্যক্তি আবার যৌবনের পর ক্রমে জরা প্রাপ্ত হয়। এই যে একত্ব, ইহাই এই বিবর্তনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। ভারতের পোগণ্ড, বাল্য, যৌবন, জরা, এ সকল অবস্থার পরিবর্তন বুঝিতে পারি। কারণ এ সকল অবস্থার ভিতর দিয়া, ভারতে একত্ব বল, নিজত্ব বল, জাতিত্ব বল, তাহা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ভারতের সমাজ-জীবনে কোন ভঙ্গ, কোন বিচ্ছেদ ঘটে নাই। সেইরূপ বিলাতেরও পোগণ্ড যৌবনাদি অবস্থাভেদ, ও এই সকলের মধ্য দিয়া তার জীবনের পরিবর্তন ও পরিণতি হইয়াছে, ইহা বুঝি। কিন্তু মিশরে বাল্য ছিল, আর আজ মিশরের পুরাতন পোগণ্ড মার্কিনের যৌবনে পরিণত হইয়াছে, ইহা অতি অদ্ভুত কথা। অথচ যুরোপীয় পণ্ডিতেরা এই অদ্ভুত তত্ত্বের উপরই মানবসমাজের সার্বজনীন ইতিহাস রচনা করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন যে মিশর, ভারত, পারস্য, চীন, আসিরীয়, ব্যাবিলন—এ সকল “বিশ্বমানবের” বিকাশের বিভিন্ন অবস্থার পরিচয় প্রদান করে। বর্তমান যুরোপ সেই বিশ্বমানবের বিবর্তনের সকলের শেষ অবস্থার প্রমাণ দিতেছে। এজন্য যুরোপীয় সাধনা প্রাচীন হিন্দু বা ইহুদীয় সভ্যতা ও সাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যুরোপীয় সাধনার মাপকাটি দিয়া জগতের প্রাচীন সাধনা সকলের ভাল মন্দের বিচার করিতে হইবে।

মিশর, ভারত, পারস্য, ব্যাবিলন প্রভৃতি প্রাচীন জাতি সকলের জীবনের ও ইতিহাসের সঙ্গে আধুনিক যুরোপীয় জাতিসকলের যদি একটা নিরবচ্ছিন্ন যোগ ও সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইত, তবেও বা এই সিদ্ধান্ত কিয়ৎ পরিমাণে দাঁড়াইবার স্থান লাভ করিত। আধুনিক যুরোপের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের একটা সম্বন্ধ আছে। গ্রীসীয় ও রোমক সাধনার সঙ্গে বর্তমান যুরোপীয়সাধনার একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বর্তমান যুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পসাহিত্য সকলই বহুল পরিমাণে, প্রাচীন গ্রীসীয় ও রোমক সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রীস ও রোমের অর্জিত সম্পদেই আধুনিক যুরোপীয় সভ্যতার বিভবগোরব রচিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে কিয়ৎপরিমাণে, গ্রীস ও রোমকে বর্তমান যুরোপীয় সাধনা ও সভ্যতার বাল্য বা প্রথম যৌবনের অবস্থা বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু মিশর বা চীন বা পারস্য বা ভারতের প্রাচীন সাধনার সঙ্গে বর্তমান যুরোপীয় সাধনার সে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। বর্তমান যুরোপ এখনো প্রাচীন ভারত বা চীনের সাধনার উত্তরাধিকারী হয় নাই। সে সাধনাকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া, তাহারই উপর এক নূতন সাধনা গড়িয়া তোলে নাই। এ অবস্থায় ভারত বা চীনকে যুরোপীয় সাধনার পূর্বতন পোগণ্ড বা বাল্য অবস্থা বলা যাইতে পারে না।

• শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল ।

আশা-হত ।

১

বড়দিনের ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছিল ।
তাসের ব্রে খেলা চলিতেছিল । ইস্কাবনের
বিবির ভয়ে সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম ।
এমন সময় প্রভাস আসিয়া উপস্থিত ।

আমি কহিলাম, “কি হে, কি মনে
করে ?”

প্রভাস কহিল, “বিশেষ দরকার আছে ।
একটু নিরিবিলিতে বলব ।”

সে বাজি শেষ হইলে প্রভাসকে
লইয়া পাশের নিভৃত কক্ষে গেলাম । প্রভাস
কহিল, “একখানা নাটক লিখেছি !”

আমি হাসিয়া কহিলাম, “আমাকে বুঝি
সমজদার পেয়েছ, তার ? হায়, হায় !”

প্রভাস একটু অপ্রতিভভাবে কহিল, “তা
নয়, তবে তোমার সঙ্গে না হাঁওয়ান খিয়েটারের
ম্যানেজারের আলাপ আছে, কুঞ্জ বলছিল—
তাই যদি একবার তাদের দেখিয়ে সুবিধা করে
দিতে পার ! তা ছাড়া, তোমাকেও একবার
দেখাতে চাই, তোমার মতটা জানবার জন্ত !
কাউকে পড়িয়ে শোনাই নি’ এখনো !”

আমি গণিতের অধ্যাপক । সাহিত্যরসের
আস্বাদ-বোধ কি আমার সাধ্য ! প্রভাসের
কথায় মনে একটু গর্ষ হইল ! আমি কহিলাম,
“বেশ কথা—আজ রাত্রে পড়া যাবে !
এখানেই খাওয়া-দাওয়া করো—সে সময়টা
বেশ নিরিবিলিও থাকি !”

মলিন শালের মধ্য হইতে একখানি মোটা
বাঁধানো খাতা লইয়া প্রভাস আমার হাতে দিল

—আমি সেটি টেবিলের ড়য়ারে রাখিয়া দিলাম ।
প্রভাস আমার সহপাঠী ! ক্লাশে তাহার সহিত
বরাবর আমার প্রতিদ্বন্দিতা চলিত ! প্রবেশিকা
পরীক্ষায় সে পনেরো টাকা বৃত্তি পাইয়া
আমাকে পরাস্ত করিয়াছিল । সেই আক্রোশে
আমার ছাত্রজীবন এমন কঠোর সাধনার
মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল যে, বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের সরস্বতী তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপহার
গুলি আমার হাতে তুলিয়া দিতে এতটুকু
দ্বিধা বোধ করেন নাই !

বি, এ, পরীক্ষার ব্যুহভেদ করিতে
না পারায় প্রভাসের ছাত্রজীবনের গতি মন্থর
হইয়া পড়িল !

বাঙ্গালা সাহিত্যের নেশা তাহাকে পাইয়া
বসিয়াছিল ! ছেলেবেলা হইতেই কেমন-একটা
স্বপ্নময় অস্পষ্টভাবে তাহাকে ঘেরিয়া থাকিত ।
ক্রমে সেই ভাব তাহার চারিধারে এমন একটি
সুনিবিড় জাল রচনা করিল যে, পাঠ্যপুস্তকের
প্রতি তাহার অনুরাগ শিথিল হইয়া আসিল !
কাব্যের ইন্দ্রজালময় রহস্যলোকে তাহার চিত্ত
কিসের সন্ধানে ফিরিত, সেখানে সে কি সুখের
স্বাদ পাইত, তাহা আমরা ধারণাও করিতে
পারিতাম না ! তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠিন
পাঠ্য-ভবনের দ্বার তাহার বিরুদ্ধে রুদ্ধ হইলেও,
কল্পনার কমলবনে বাণীদেবী তাহার জন্ত মেহ
আসন বিছাইয়া দিতেছিলেন ! সহসা একদিন
দেখা গেল, তাহার বন্ধুবান্ধব যখন ছাত্র-
জীবনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সংসারের
কর্মক্ষেত্রে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন

সে সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার কুহক-রচনার মধ্য দিয়া একটা সুপ্রতিষ্ঠ স্থান সংগ্রহ করিয়া লইলেও কৰ্মক্ষেত্রে এতটুকু অগ্রসর হইতে পারে নাই !

সাহিত্য আর যে আনন্দই দান করুক না কেন,—শূন্য উদর কিম্বা দারিদ্র্যের রাহগ্রাস হইতে পরিত্রাণ-লাভের কোন পন্থাই সে নির্দেশ করিয়া দিতে পারে না। অবশেষে একদিন বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কর্তব্য-পালনের জন্ত বাঙ্গালার উদীয়মান সাহিত্যিক সংবাদ-পত্রের অফিসে কৰ্ম্মের উমেদার হইয়া আনিয়া দাঁড়াইল ! লক্ষ্মীদেবী রূপা করিলেন—সহজেই প্রভাসের চল্লিশ টাকার একটা চাকুরি মিলিল !

কিন্তু এ কি অসহ্য হুঃখ ! তীব্র পরিহাস ! মন যখন কল্পনা-কুঞ্জে পুষ্প-সুরভির জন্ত আকুল হইয়া উঠে, গোপন উর্দ্ধলোকে আদর্শের সন্ধানে ফিরে, কর্তব্য তখন খুন-তদারকের বীভৎস রিপোর্ট লিখিবার জন্ত তাগাদা দেয় ! ইংরাজী সংবাদ-পত্রের সার-সঙ্কলন, গরিলা-বনমানুষের বিচিত্র বার্তা-সংগ্রহ, ও গ্রীণলণ্ডের রাজনীতির চর্চা করিয়া ত এমন একঘেয়ে হীন জীবনও বহন করা যায় না ! কিন্তু উপায় নাই ! লোকে আদর্শ বা কাব্য পড়িতে চাহে না, কারণ, তাহা দুর্কোষ হইয়া পড়ে। কাজকৰ্ম্মের অবসরে এইরূপ দুই-চারিটা উদ্ভট সংবাদ পাইলেই তাহারা কৃতার্থ হইয়া যায় !

রাত্রে প্রভাস কহিল, “খপরের কাগজে ত আর টেঁকা যায় না—জীবনে যেন ক্রমেই কালো কালি মাখছি ! চাকরি রাখা দুষ্কর হয়েছে !”

প্রভাস পরচর্চা বা গ্লানির কথা লিখিতে পারে না, কড়া দুই চারিটা সমালোচনায় সহ-যোগীর প্রতিষ্ঠা সে দূর করিতে পারে না, তোষামোদ করিয়া লেখনীর সাহায্যে ধনীর শিরে সে পুষ্পবৃষ্টিও করিতে পারে না, কাজেই স্বত্বাধিকারী বিরক্ত, পাঠকের দলও আগ্রহশূন্য !

প্রভাস কহিল, “শুনেছি থিয়েটারওলারা পয়সা দিয়ে বই নেয়—মোটো বাঁধা মাহিনাও দেয়—তাই বহু চেষ্টায় এই নাটক লিখেছি !”

আম কহিলাম, “তুমিও যেমন—থিয়েটারে কেবল হীন রুচি, সেখানে নাটক জোগানো কি তোমার মত লোকের কাজ ! কতকগুলো পচা অশ্লীল ইয়ারকি, আর নাটকের মাথায় লাঠি মেরে সেখানে নাটক লিখতে হয় !”

প্রভাস কহিল, “তবু তুমি একবার দেখ না !”

প্রভাস নাটক পড়িতে লাগিল—নাটকের নাম, “রাজকত্তা।” যেখানে যেমন প্রয়োজন, তেমনি ভাবভঙ্গীর সহিত সুর খেলাইয়া সে স্বরাচিত নাটক পড়িতে লাগিল ! রচনায় এমন একটা আশ্চর্য্য আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, আমার নীরস গণিতচর্চারত মাস্তুলও মুগ্ধ হইয়া গেল ! করুণরসের স্নিগ্ধ ধারায় আমার চিত্ত আর্দ্র হইয়া আসিতোছিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইতেছিল, অজানা লোকের হুঃখিনী রাজকত্তার মৰ্ম্মবেদনায় অন্তরটা হা-হা করিয়া উঠিতেছিল ! যখন নাটক পাঠ শেষ হইল, তখন আমার মনে হইল, যেন একটা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম !

সাহিত্যের সহিত আমার কোন সংশ্রব ছিল না, তবু এটুকু বুঝিলাম, যাহা সচরাচর পাঠ

করা যায় “রাজকন্ঠা” তেমন নহে! ইহাতে যাহা আছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে বড়-একটা দেখিতে পাওয়া যায় না! চরিত্রগুলিতে একটা অসাধারণত্ব ছিল!

২

আমার পিতৃব্য ইণ্ডিয়ান থিয়েটারের এটর্নি ছিলেন। সেই সূত্রে ম্যানেজারের সহিত আমার অল্প আলাপ ছিল।

প্রভাসকে লইয়া ম্যানেজার রামকালী বাবু সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সুদক্ষ অভিনেতা ও প্রসিদ্ধ নাট্যকাব রামকালী বাবুর নাম আর কে না শুনিয়াছে? স্মৃতিমত আগ্রহের সহিত রামকালী বাবু প্রভাসের নাটক খানি হাতে লইলেন। বলিলেন, “দশ বাবো দিন পরে সংবাদ দিব।”

আমি তাঁহাকে অন্তরালে লইয়া গিয়া কহিলাম, “বহিখানা সাধারণ নাটকের মত নয়।”

রামকালী বাবু বলিলেন, “সাহিত্যে প্রভাস বাবুর নাম কে না জানে?”

ছই সপ্তাহ পরে রামকালী বাবুর বেহারা আসিয়া আমাকে একখানি পত্র দিল! পত্রের মর্ম,—প্রভাস বাবুর নাটক সাহিত্য-হিসাবে সুন্দর হইলেও অভিনয়ে তেমন জমিবে না—দৃশ্যপটাদি অঙ্কনেও বিস্তর ব্যয় হইবে। নূতন গ্রন্থকারের জন্ত সহসা এত টাকা ব্যয় করিতে তাঁহার সাহসে কুলায় না। ওথেলা হ্যামলেট আজকাল অভিনীত হইলেও দর্শক জুটে না—তেমনি প্রভাস বাবুর নাটক দৃশ্য-কাব্য হইয়াছে বটে, কিন্তু অভিনয়ের উপযোগী নহে। কাজেই তিনি ছুঃখের সহিত নাটক খানি ফেরত পাঠাইয়াছেন।

প্রভাস প্রত্যহই আপনার অদৃষ্ট-ফলের কথা জানিবার জন্ত আমার নিকট আসিত। সেদিনও আসিয়াছিল! রামকালী বাবুর পত্র দেখিয়া সে অবসন্ন হইয়া পড়িল। তার মুখ সাদা হইয়া গেল। কোন কথা না বলিয়াই সে খাতাখানি লইয়া চলিয়া গেল! আমি ডাকিলাম, কিন্তু সে ফিরিয়াও একবার চাহিল না! বেচারার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়া ছিল!

এই সময় চৌবাড়ীর জমিদার ক্ষিতীশ চৌধুরী এক সখের থিয়েটারের দল খুলিল। তাহারা নূতন নাটকের সন্ধান করিতেছিল। আমি প্রভাসের নাটকের কথা বলিতে সে পাঁচ শত টাকা দিয়া নাটকের স্বত্ব ক্রয় করিয়া লইতে উদ্যত হইল! আমি গিয়া প্রভাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা বলিলাম।

প্রভাস কহিল, “সে খাতা পুড়িয়ে ফেলেছি।”

আমি অবাক হইয়া গেলাম। “সে কি? তার নকল নাই?”

“না—তার কোন চিহ্ন রাখিনি! ব্যর্থতার সাক্ষ্য রেখে লাভ কি?”

ক্ষোভে আমার অন্তর ভরিয়া উঠিল!

প্রভাস কহিল, “কাল আমি ইণ্ডিয়ান থিয়েটারে গেছলাম—নাটক দেখতে। যা দেখলাম—কদর্য্য!”

আমি কহিলাম, “রামকালী বাবুর নাটক?”

“না।”

“রামকালী বাবুর নাটক একদিন দেখে এস, কি রকম ধরণটা ওরা চায়!”

“দাসত্ব করতে বল, তুমি?”

“তা নয়, ঠিক! তবে ষ্টেজের জন্তই যদি

লেখ, তা হলে ষ্টেজকে একেবারে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন? এতগুলো দর্শকের রুচি তুমি ত আর একরাতেই হঠিয়ে দিতে পারচ না?”

“তা বলে তাদের কুংসিত রুচির অহুসবণ করতেও পারব না—এতে না খেয়ে সপরিবারে যরি যদি, সে-ও ভালো!”

৩

কিছুদিন পরে প্রভাস আসিয়া আবার সহসা দর্শন দিল। কহিল, “আজ থিয়েটারে যাবে? একখানা নূতন বই আছে।”

থিয়েটার দেখাব প্রতি আমার কোন ঔৎসুক্য ছিল না! রাত্রি জাগরণ সহ হইত না,—তাহাব উপর, হেতুধাব ধারে প্রাতঃস্নানে বাহির হইয়া দেখিতাম, সারারাত্রি বায়ু ও আলোক-হীন, অন্ধকূপের মত, থিয়েটার হইতে দর্শকের দল শীর্ণ মুখে শুষ্ক চোখে গৃহে ফিরিতেছে—এই নিষ্ঠুর আমোদ প্রিয়তা দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিতাম। থিয়েটারের নামে আমার কেমন আতঙ্ক জন্মিয়াছিল।

তাই আমি কহিলাম, “সারারাত্রি গারদঘরে আটক থাকা আমার দ্বারা পোষাবে না!”

প্রভাস কহিল, “সারারাত্রি না-ই বা থাকলাম—একখানা নূতন নাটকের অভিনয় হবে—রামকালীবাবুর লেখা!”

একখানিমাাত্র নাটক! “জেলে খুন”, “কালো ভূত” প্রভৃতি গীতিনাট্য ও গ্রহসনে পাঁচ ফুলের সাজির ব্যবস্থা হয় নাই শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য ও আশ্চস্ত হইলাম।

প্রভাস আরো কহিল, “রামকালীবাবুর লেখার ধরণটা কেমন—দেখব!”

আমি কহিলাম, “কি নাটক?”

প্রভাস একখানা হ্যাণ্ডবিল ফেলিয়া দিল! কেমন করিয়া আশ্চ-প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতে হয়, হ্যাণ্ডবিলখানি তাহাব চূড়ান্ত পরিচয়! এমন নাটক আর কখনো প্রকাশিত হয় নাই—নাটকের রাজ্যে একেবাবে যুগান্তর উপস্থিত কবিয়াছে ইত্যাদি বাগাড়ম্বরের ক্রটি ছিল না এবং খুব মোটা চিত্র-বিচিত্র অম্পষ্ট অঙ্করে নাটকের নাম লেখা—“কমলাবতী”,—নূতন ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। নায়ক বিনায়ক সাজিবেন, নাট্যকাব স্বয়ং,—বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের আর্ভিং, শ্রীযুক্ত রামকালী হালদার।

রাত্রে ইণ্ডিয়ান থিয়েটারে উপস্থিত হইলাম। দুইখানি টিকিট কিনিয়া ভিতরে গেলাম। কি ভিড়! কলিকাতাব যত লোক যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। একই রাত্রে এত লোকের থিয়েটারে দেখিবার সখ জাগিয়া উঠিয়াছে ভাবিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। রামকালীবাবু গর্ব্বফীত বক্ষে টিকিট-ঘরের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন—আমরা সাবধানে তাঁহার দৃষ্টিটুকু এড়াইয়া আসিলাম!

ঐক্যতান-বাদনের পর পটোত্তোলন হইল—প্রথম দৃশ্যে এক সুবিস্তীর্ণা নদী—দুই কূল দেখা যায় না! নদীবক্ষে একখানি সুদৃশ্য তরণী! তরণীর উপর বসিয়া রাজকন্ঠা কমলাবতী বাঁশী বাজাইতেছেন! দৃশ্যপটের আড়ম্বরে ও রাজকন্ঠার সুদক্ষ বাঁশীর সুরে কেমন-একটা বিভ্রম আনিয়া দিল! তাহার পর নানা ঘটনার মধ্য দিয়া নাটকের গতি দ্বরিতভাবে অগ্রসর হইয়া চলিল! দুই-চারিটা দৃশ্যের পর আমি চমকিয়া উঠিলাম,—এ যে প্রভাসের নাটক! কেবল নামগুলো ও দৃশ্য-যোজনায়

একটু পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে! রচনার ভাব, ভঙ্গী, উপাখ্যানের অভিনবত্ব, সমস্তই প্রভাসের! আশ্চর্য্য হইয়া আমি প্রভাসের দিকে চাহিলাম। অভিনয়ের মধ্যে সে একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল! প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হইলে, প্রভাস কহিল, “আমার ‘রাজকণ্ঠার’ মত মনে হচ্ছে, না?”

আমি কহিলাম, “হুবহু তাই বলে ত আমার মনে হয়!”

চোখ দুইটা বিক্ষারিত করিয়া প্রভাস সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল! আমি কহিলাম, “আর একটু দেখা যাক! ভদ্রতায় না হয়, কোট আছে!” প্রভাস কথা কহিল না!

তার পর দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইল! কথাবার্তায়, ভাবে-ভাষায় এতটুকু আর প্রভেদ রহিল না—হুবহু প্রভাসের রচনা! কেবল ঐ নামগুলাই যা বদলাইয়া দিয়াছে!

অভিনয় দেখিতে দেখিতে দর্শকের দল মাতিয়া উঠিল! এমন নাটক বাঙ্গালা থিয়েটারে কখনো অভিনীত হয় নাই! যেমন উচ্চভাব, গানগুলিতেও তেমনি কবিত্ব,—থিয়েটারে সাহিত্যে যে দুটি জিনিষ একান্তই ছুঁত!

পার্শ্বস্থ জনৈক দর্শক কহিল, “রামকালীবাবু কি আশ্চর্য্য নূতন ভাবে লেখার স্রোত ফিরিয়েছেন!”

আর একজন কহিল, “প্রতিভার লক্ষণই ত এই!”

প্রভাস ক্ষেপিয়া উঠিল। সে কহিল, “চুরি! আমার লেখা বেমালুম চুরি করেছে!”

লোক দুইজন অবাক হইয়া গেল! এমন অদ্ভুত কথা তাহারা শুনিবে বলিয়া কখনো আশাও করে নাই!

আমি কহিলাম, “কথাটা সত্য!”

তাহারা কহিল, “হঁঃ! বলেন কি মশায়?”

উৎসাহী দর্শকের সঘন করতালিবর্ষণে প্রভাস অস্থির হইয়া পড়িল!

তখন তৃতীয় অঙ্ক চলিতেছিল। দৃশ্যটি বেশ জামিয়া উঠিয়াছিল! নায়ক বিনায়ক যুদ্ধ জয় করিয়া আসিয়াছে—রাজা হংসবাহন বিপুল ভাবনা ও দায় হইতে মুক্তি পাইয়াছেন—জয়মাল্য লইয়া রাজকণ্ঠা কমলাবতা সম্মুখে উপস্থিত! এমন সময় বড়যন্ত্রকারী কতিপয় রাজ অনুচরেব প্রচুর প্রমাণে বিনায়কের বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল—রাজা শত্রুরা বিশ্বাসঘাতকের দণ্ডবিধান করিলেন! রাজকণ্ঠার কর হইতে পুষ্পমাল্য খসিয়া ভূতলে লুপ্ত হইল। এ অসম্ভব কথায় সভাসদগণ অবাক হইয়া গিয়াছিল। রাজা নিরুপায়, প্রমাণ পাইয়া দোষীর দণ্ডবিধান না করিলে কর্তব্যহীন হইবে! বিনায়ক অবিচলিত হৃদয়ে সমস্ত অপবাদ মাথায় বহিয়া কারাগৃহে যাহবার সময় ধারস্বরে করুণ আক্ষেপবাণীতে দর্শকের হৃদয় আদ্র করিয়া দবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় প্রভাস দাঁড়াইয়া উঠিল!

পিছন হইতে অবার দর্শকের দল একসঙ্গে গাঁজিয়া উঠিল—“আঃ বহুন না, মশায়—আপনি ত transparent নন যে, দেখতে পাব!”

প্রভাস ধীরস্বরে কহিল, “চোর—চোর! আমার বই চুরি করেছে—নিলজ্জ চোর কোথাকার!”

আকস্মিক রসভঙ্গে অভিনেতাও স্থির হইল। চারিদিকে রীতিমত গোল বাধিয়া

গেল ! গ্যালারি হইতে চীৎকার উঠিল—
“দূর করে দাও, মাতালটাকে—দূর
করে দাও !

আমি প্রভাসের হাত ধরিলাম ! প্রভাস
কহিল, “বল, তুমিই বল, চুরি কি না ! আমি
মাতাল নই, অজ্ঞান নই—এ নাটক আমার
লেখা । রামকালী বাবুকে দেখতে দেওয়া হয়ে-
ছিল—তিনি ফেরত দিয়ে বলেন, ভালো হয়নি
—তার পর সেই বই নিজে আগাগোড়া চুরি
করে নিজের নামে চালিয়েছেন—চোর কোথা-
কার ! প্রমাণ অবধি রাখিনি, আমি ! ওঃ ! সে
খাতা পুড়িয়ে ফেলেছি !”

‘দূর করে দাও’, ‘পাগল’, ‘মাতাল’ শব্দে
চারিধারে যেন বজ্রনিলাদ উঠিল ! মধুচক্রে
লোষ্ট্রনিষ্ক্রেপ করিলে যেমন হয়, তেমনি
ভাবখানা !

নায়ক বিনায়ক মঞ্চ হইতে হাঁকিলেন—
“গার্ড !”

ষ্টলের গার্ড আসিয়া প্রভাসের হাত
ধরিল ! প্রভাস কহিল, “ছেড়ে দাও—
অসভ্য, বেয়াদব্ !”

প্রভাসকে শাস্ত কবিবার সকল
চেষ্টাই বার্থ হইল । থিয়েটারের ছুইচারি
জন লোক আসিয়া প্রভাসের গলা ধরিয়া
ধাক্কা দিল । আমি কোনমতে গোল থামাইয়া
প্রভাসকে লইয়া বাহিরে আসিলাম !

রাস্তার ধারে আসিয়া গাড়ীর সন্ধান
করিতেছি, এমন সময় ভিতরে তুফল ববে
করতালির ধ্বনি উঠিল ! প্রভাস তখন
আমার বুকে মাথা রাখিয়া ধীরে ধীরে
মূর্ছাতুর হইয়া পড়িতেছিল !

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ।

তর্কী ।

তর্কী ইংলণ্ডের দক্ষিণে ডিভনসায়ারে
সমুদ্রতীরের উপর অবস্থিত একটি স্বাস্থ্য
নিবাস । ষ্টেশনে গিয়া দেখি, লোকে লোকারণ্য ।
সকলেই প্রায় তর্কীতে ঘাইবার জন্ত ব্যস্ত ।
সকলেরই হাতে এক একটি হ্যাণ্ডব্যাগ—
তাহাতে দুই তিন দিনের মত তাঁহাদের
আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যথা,—শার্ট কলার
রুমাল ইত্যাদি । আহার ও বাসোপযোগী
অগ্ন্যন্ত দ্রব্যাদি সেখানকার হোটেলেই মিলিয়া
থাকে । আমাদের এক দিন বাড়ি হইতে
বাহির হইতে হইলে কত ভাবনা হয়—কি
খাইব, কোথায় থাকিব । কিন্তু এই সব

দেশে সে কথা কিছুই ভাবিতে হয় না বলিয়া
আমোদ বা ব্যবসার জন্ত দেশ-ভ্রমণে
কত সুবিধা ।

যাত্রীর এত ভিড় যে সব গাড়ি গুলিই
ভরিয়া গিয়াছে । ছেলেপিলে লইয়া বাপ মা
আনন্দ করিতে করিতে চলিয়াছেন ।
কেহ বা লাল রঙের ধবজা উড়াইয়া গান
গাহিতে গাহিতে ষ্টেশন ও রেলগাড়ি
প্রতিধ্বনিত করিয়া চলিয়াছে । ছেলে
মেয়েদের প্রায় সকলের বুকেই এক একটি ফুল
গোঁজা ।

এই স্থানে ষ্টেশনে ডাক্তার কার্ণিজী

ব্রাউন সাহেবের সহিত দেখা হইল। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের রোগ নিরাকরণ করিবার জন্ত যে সমিতি আছে, ইনি তারই সেক্রেটারী। সাদরে আলাপ করিয়া—লগুনে ফিরিলে তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিয়া তিনি তাঁহার নামের কার্ড আমাকে দিলেন। ঠিকানা ৩২ নং হারলী ষ্ট্রীট। সেখানে ডাক্তারের আপিস বাটী, কিন্তু তিনি থাকেন হ্যামস্টেড নামক লগুনের এফট নির্জন পর্যায়ে। এই মনোহর স্থানে রাত্রি ঘাপন করিয়া সকালে কর্ম-স্থানে আসেন ও সারা দিন সেখানেই কাজ করিয়া রাত্রে বাটী ফিরিয়া যান। মাঠের নীচে দিয়া যে রেল-লাইন গিয়াছে তাহার সাহায্যে আধ ঘণ্টায় যাতায়াত হয়। সে দেশে আমাদের এদেশের মত এত গাড়ি ঘোড়ার খরচ নাই। সবাই পথে চলে ও সাধারণ লোকের সঙ্গে যাতায়াত করে; তাহাতে অপমান বোধ করে না। অনর্থক খরচ নিবারণ করা সে দেশের বীতি। তাই তাহাদের এত স্বচ্ছল অবস্থা।

সেই গাড়িতে ডিভনসায়ারেরই এক কৃষক ও কৃষকবধুর সহিত আলাপ হইল। তাঁহারাও দুই দিনের অবসরে স্বাস্থ্যকর স্থানে বিশ্রাম ও বায়ু-পবিত্বের জন্ত যাইতেছেন। তাঁহাদের খুব সরল ভাব। রমণীটি ক্ষীণাক্ষী এবং দেখিতেও বেশ সুশ্রী। তাঁহার সহিত কর্মমর্দন করিবার সময় দেখিলাম—তাঁহার হাতগুলি চাষার ঘরের মোটা কাজ করিয়া, শক্ত হইয়া গিয়াছে—মোটাই কোমল নহে। তাঁহারা আমাদের দেশের কথা সাগ্রহে শুনিতে চাহিলেন।

আমি একজন সহযাত্রী ছিলাম তিনি

কারিগর। মঙ্গলুং গোহার তোরঙ্গ তৈয়ার করাই তাঁহার কাজ। কারখানার ভিতরটা বড়ই উত্তপ্ত—তাহারই মধ্যে তিন দিনে প্রায় আট ঘণ্টা কাজ করেন! প্রতি সপ্তাহে দুই দিন ছুটি পান। আর সেই দুই দিন কালীঝুলা মাখা পোষাক ত্যাগ করিয়া আমোদ করিয়া বেড়ান। সপ্তাহে ছয় পাউণ্ড আর। স্ত্রী আছেন, ও একটি দুই বছরের ছেলে আছে। স্ত্রী এখন ছেলেটিকে লইয়া তর্কীতেই রহিয়াছেন। আজ এক মাস পরে দুইজনের দেখা হইবে।

খোলা মাঠ, শস্যক্ষেত্র, ঘরবাড়ি, ও ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া গাড়ি অচিরে সমুদ্রের ধারে পৌঁছিল। তীরে কত ছেলে মেয়ে ও নরনারী শুধু পা করিয়া হাতের কাপড় গুটাইয়া বালি ঘাঁটিয়া কিছুকুড়াইতেছে। কেহ বা ছোট নৌকার করিয়া সমুদ্রে বেড়াইতেছে। সকলেই একটি না একটি খেলায় বাস্ত—কেহই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া অপরের খেলা দেখিতেছে না!

তর্কীতে পৌঁছাইয়া সেখানকার নিকটবর্তী একটি হোটেলে আহার করিলাম। পরে রেলের গুদামঘরে আমার হাতবাগটী জিন্মা রাখিয়া দেশ দেখিতে বাহির হইলাম। সে সব স্থানে ষ্টেশনেই মানুষের মোটবাট জমা রাখিবার ব্যবস্থা আছে। দুই এক পেনি দিলেই তাহারা একদিনের জন্ত জিনিষপত্র জমা রাখে। ইহাতে কত সুবিধা,—মোটবাটপত্র লইয়া বিক্রত হইতে হয় না।

এ ষ্টেশনটিও সমুদ্রের ধারে। সেখান হইতে সুনীল সমুদ্র অনেকদূর অবধি দেখা

যায়। দূরে দুই একটি ছোট ছোট দ্বীপ বুকে লইয়া নীল সমুদ্র নীল আকাশে মিলিয়া আছে। সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট জাহাজগুলি এদিক ওদিক করিয়া যাত্রী পার করিতেছে। নিকটেই ব্রাইটনের ঘাট। সমুদ্রে স্নান করিবার ছোট ছোট ঢাকা গাড়ির সাবি। তাহার মধ্যে কাপড় ছাড়িয়া কোপান পরিয়া জলে নামিতে হয়। অনেক স্থলে Mixed bathing বা স্ত্রী পুরুষে একত্রে স্নানের আড্ডা আছে। সেগুলিতেই বেশি ভিড়। সাঁতার শিখার উপলক্ষ করিয়া যত অযথা ঘটনা হয় তার সব ছবি-ছাপা কাগজ বাজারে বিক্রয় হয়। এখন এ প্রথা বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছে।

সমুদ্রের ধারে-ধাবে পাথর-বাধান রাস্তা। তার তলায় কত সুন্দর জলজ উদ্ভিদ ভাসিয়া আছে। চলিতে চলিতেই সে সব দেখা যায়। কত জেলা মাছ দেখিলাম। ধীরেদের নৌকাগুলিতে বলিষ্ঠকায় ছেলেরা ঝাঁপাঝাঁপি করিতেছে। আর সমুদ্রের ধারে ধারে অত্যাচ্চ পাহাড়ের উপর বড় বড় বাড়ী। সেখান হইতে অসীম সমুদ্রের দৃশ্য কি সুন্দর! পাহাড়ের ধারে ধারে অসংখ্য ফুল গাছ। এ সব স্থান আমাদের ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানেরই মত প্রায় গরম। এমন কি—তাল গাছ অবধি দেখা যায়। রোদ্দ্রে বাহির হইলে মাথা ঢাকা দিতে হয়, তাই শীতকালেই এই স্থানে যাত্রীর এত জনতা। এই স্থানে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার জন্য অনেকগুলি চিকিৎসালয় আছে। সেখানকার চিকিৎসার ব্যবস্থা ঔষধ খাওয়ানো নহে। নির্মল বায়ু সেবন, নিয়মিত ব্যায়াম, ও সূর্যালোকে সারা

দিন থাকাই নিয়ম। নিয়মিত সময়ে আহার ও নিদ্রা চাই। এইরূপ ব্যবস্থায় যক্ষ্মা কাশের রোগীরা যত শীঘ্র ও যত বেশি আরাম পায়, অথ কোন প্রকারে তাহা পায় না। তাই এখন সকল সভ্য দেশে এইরূপ চিকিৎসারই বেশি চলন হইতেছে। আমাদের দেশে রোগী কেবল ঔষধ খাইয়াই ডাঙ্গা মারা যায়।

স্থানটি ছোট ও সেখানে দেখিবার জিনিস অল্পই আছে। এবং দৈনিক খরচ প্রায় পনেরো শিলিং—এই কারণে সেই দিনই সেখান হইতে ফিরিবার মনস্থ করিলাম। কখন ট্রেন পাওয়া যায়, জানা ছিল না;—ষ্টেশনে আহ্বারের ঘরের তত্ত্বাবধান মেয়েরাই করেন, তাঁহারা বই দেখিয়া সমস্ত খবর আমাকে বলিয়া দিলেন। বিলাতে ও অগ্রাণ্ড সভ্য ও উন্নতিশীল স্থানে মেয়েদের উপযোগী সকল কাজে কেবল মেয়েদিগকেই নিযুক্ত করা হয়, যথা পোস্ট আপিস, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন সংক্রান্ত কার্য, আহ্বারের তত্ত্বাবধান, কেরানীগিরি ইত্যাদি। এ সব না করিয়া রমণীরা পরমুখাপেক্ষী হইলে কেমন করিয়া তাঁহাদের স্বাধীনতা থাকিবে! এই সব কাজ রমণীগণ দিব্য সূচারূপে ও এমন সুব্যবস্থার সহিত সম্পন্ন করিতে পারেন দেখিয়া তাঁহাদিগকে অল্প কাজ দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। নিদ্দিষ্ট সময়ে কাজ করিয়া তাঁহারা নিদ্দিষ্ট সময়ে ছুটি পান। তখন সুন্দরভাবে সাজ সজ্জা করিয়া তাঁহারা আমোদ-প্রমোদ করিতে বাহির হন। সেই সুন্দর পোষাকগুলি সবই প্রায় অবসর সময়ে তাঁহাদের নিজের হাতের তৈরী। সুতরাং সজ্জাতে তত অর্থ

ব্যয় করিতে হয় না—ঠাহারা নিজেরা শিক্ষিত
ও নিপুণ বলিয়া ঠাহাদের কত দৈনিক খরচ
বাঁচিয়া যায়।

সেইদিনই বৈকালে ট্রেনে চড়িয়া রাত্রি
নয়টার সময় আমি লগুনে পৌঁছিলাম।

শ্রীহনুমাধব মল্লিক।

পোষ্যপুত্র

৩৩

সাঝারাত্রি জাগিয়া ভোরের সময় ঘুমাই-
বার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অকৃতকার্য হইয়া
বিরক্তচিত্তে নীরদকুমার বিছানা ছাড়িয়া
জানালায় নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন
সময় বাহিরে দরজায় ঘা পড়িল। কোন
ছাত্র হয়ত কোন প্রয়োজনে তাহাকে
ডাকিতে আসিয়াছে এই কথাই তাহার
মনে হইয়াছিল, কিন্তু প্রবেশ করিল
যোগেশ্বর। যোগেশ্বর এখন আর একটু
মোটা হইয়া গিয়াছে, মাথার চুলও দুইচারি
গাছা সাদা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, বেশ
ভুষার পারিপাট্যও তখনকার মত কিছু নাই,
তবু তাহার মুখে সেই সরল প্রাণখোলা
হাসিটুকুর অভাব ছিল না। ঘরে ঢুকিয়া
একবার মাত্র বন্ধুর মুখের দিকে চাহিতেই
যোগেশ্বরের মুখে হাসির পরিবর্তে ঘোর
বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। সে আর অগ্রসর
না হইয়া সেইখানেই ধমকিয়া দাঁড়াইয়া
পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল “একি! তোমার
কি হয়েছে?”

নীরদ তাহার বিস্ময়ের কারণ কতকটা
বুঝিয়াই তাড়াতাড়ি মুখের ভাব বদলাইবার
চেষ্টা করিয়া হাসিয়া বলিল, “কি? ভূত
দেখলে নাকি?” “ভূত আমি দেখি
কি, কাল রাত্রে তুমি ঐ জানলার দাঁড়িয়ে

দেখেছিলে তাত ঠিক বুঝতে পারচিনে!
যাহোক তোমার কি কোন বেশি রকম
অসুখ করেছে?” সত্যই খুব বড় একটা
কঠিন পীড়া মানুষকে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই
যেন কত বৎসরের পরিবর্তনে পরিবর্তিত
করিয়া দিয়া যায়, নীরদের মুখে সেই রকম
একটা হৃদয়বিহীন ব্যাধির আক্রমণ শতচিহ্নে
সুপরিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। যোগেশ্বর তাহার
মুখের দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া একটু
বিচলিতভাবে সে সরিয়া আসিল। আবার
হাসিবার চেষ্টা করিয়া মৃদুস্বরে উত্তর করিল,
“হাঁ, মাথাটা ভারী ধরেচে।” “সেইজন্ম
বুঝি কাল খেলে না? ঠাকুর বলে তুমি
সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে আছ,—আর
ওদিকে বড়—বুঝেছ তো! আমিতো
জানিনা তোমার অসুখ করেছে—একি!
একবারও বিছানায় শোওনি নাকি?
ঐ জন্মেই তো বলিরে দাদা, সাধু সন্ন্যাসীতে
কি আর তোমার আমার ধাত বোঝে?
সারা দিনরাত্রি ধরে যোগ-যোগ হচ্ছিল বুঝি?”

যোগেশ্বরের আক্ষেপোক্তি শুনিয়া নীরদ
একটু হাসিল, বলিল, “পাগল নাকি! কে যোগ
শিখচে? রজ্জুতে সর্পভ্রম করে যখন তখন
খুব শিউরে উঠতে পারো, যাহোক!”

যোগেশ্বর যেন গভীর হইয়া কহিল “বাঁচালে,

সর্পেতে রজ্জুভ্রম করিনে ত, সেইটেই সাংঘাতিক" নীরদ হাসিয়া ফেলিল "ও একই কথা মোদা ভ্রমতো বটেই" ।

"আচ্ছা না হয় আমারি ভ্রম, কিন্তু সেই যে মহুরার অমন হাসিখুসি, আমোদ অহ্লাদ, খাসা বাড়ি, তোফা ব্যবস্থা, চা-কফি, পাঁঠা পাখী, কোথাও কোন ফাঁকটি ছিল না;—দেশের কাজ, নিজের সুখ একসঙ্গে সবি ছিল,—হুড়হুড় করে টাকা আসছিল,—আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মত হঠাৎ কোথা থেকে এক দৈত্য এসে তোমাব ঘাড়ে চাপলো বল দেখি? রাতারাতি একভাবে সন্ন্যাসী!"

যোগেন্দ্র আসন গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল ।

নীরদ পরিহাস করিয়া বলিল "সে কষ্ট যে আর ভুলতে পারচো না? শুনেছিলুম সময়ে সকলি সহিয়া যায়। তোমার দেখচি ঠিক বিপরীত" ।

"ভুলতে দিলে কৈ বলে, সেওতো ঐ তোমারি কৌর্ভি! মাছ—এমন তোফা টাটকা মাছ চোখের ওপোর দিয়ে জেলে ব্যাটারা ধরে নিয়ে যাবে বোজ ছবেলা—তাই ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখচি। উপায় নেই! জ্বিভে যত চোখে তত জল ঝরতে থাকে। কাছে কেউ থাকলে বলি চোখে কি একটা পোকা না কি পড়ল। নিজেতো আলো চাল ধরেছ, যেন মা কি বাপ—"

নীরদ সকৌতুক হাস্তে যোগেন্দ্রের দুঃখ-কাহিনী শুনিতেছিল; শেষের দিকটায় অকস্মাৎ চমকিয়া সে বাধা দিল; "যোগেন য়া খুসী তাই বলে বসোনা ওসব কি কথা—"

যোগেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিছুক্ষণ বন্ধুর উত্তেজিত মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া অপেক্ষাকৃত অপ্রতিভভাবে একটু হাসিয়া সে বলিল "এ কি তুমি যে একেবারে আমার অবাক করে দিলে? তামাসা করে কি নাকি একটা কথা বলেছি, তাতে চটবাব এতো কি পেলো? এতেই বলে—উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট, উচিত বলে মানুষ রুষ্ট—। সত্যিই তো আর তোমার স্বর্গগত বাপ দ্বিতীয়বার তোমাকে কাছা পরাবার জন্তে স্থানচ্যুত হয়ে আসচেন না! ভক্তি কত? বৎসবাস্তে এক গণ্ডুষ জলও তো দিতে দেখিনে।—"

নীরদকুমার যোগেন্দ্রের পিঠেব উপর একটা অধীর চপেটাঘাত করিয়া তাহাকে একটুখানি ঠেলিয়া দিয়া অসহিষ্ণু ভাবে বলিয়া উঠিল, "ও সব কথা ছেড়ে দাও যোগেন, তুমি যদি সত্যসত্য এখানে ক্লান্ত হয়ে থাক তা হলে সে কথা স্পষ্ট করে বলেই কেন অবসর নাওনা, জোর তো কিছু নেই! আব জোর করলেই বা মানবে কেন? আব পাব যদি", নীরদ একটু হাসিল, "এই হতভাগা স্কুগটাকে সিডিসনের আড্ডা বলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে একটা রিপোর্ট করে দিও, খুব উন্নতি হয়ে যাবে এখন।"

যোগেন্দ্র এই বিদ্রূপে শিহরিয়া উঠিল, "বলে নাও; ভগবান মুখ দিয়েছেন যত পার বলো। জানো কিনা হতভাগাটাকে বঁড়শিতে বিঁধে রেখেছ, ওর আর কোথাও এক পা নড়ার জো নেই—তাই মাঝে মাঝে খেলিয়ে দেখে নেওয়া বইত না! তাই যদি পারবো নীর, তাহলে আর মহুরার তেমন চাকরীটে খুইয়ে তোমার সঙ্গে এসে

বনবাসী হই? স্ত্রীপুত্র সব ছাড়িয়েছ, আরও তুমি বলা তোমায় ছেড়ে যেতে চাই?”

নীরদ মনে মনে অনেকখানি লজ্জা বোধ করিল, যোগেন্দ্র যাহা বলিতেছে সে কথা সম্পূর্ণ সত্য। যোগেন্দ্রের স্বার্থত্যাগ ও বন্ধুপ্রেম যথার্থই অমুকরণীয়। নীরদ জানিত যে কয়জন যুবক তাহার এই নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের কার্যভার গ্রহণ করিয়া নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়াছেন, যোগেন্দ্র-নাথ তাহাদেরই মধ্যে একজন নহে। অতীত সকলে দেশক ভালবাসিয়া কর্তব্যকে ভালবাসিয়া যশ ও ভবিষ্যতের আশা লইয়া তাহার সহিত যোগদান করিয়াছেন কিন্তু যোগেন্দ্র স্বৈচ্ছায় এ কার্য গ্রহণ করিয়াছে, সুধু তাহাকে ভালবাসিয়া! ইহার জ্ঞাত সে বেচারী ঘরে অনেকখানি নির্যাতন সহ্য করিয়া থাকে। পাছে নীরদ মণিমালাব চরিত্রের এই দুর্বলতা ও সঙ্কীর্ণতা জানিতে পারে সেই ভয়েই যে সে এই কয়মাস তাহাকে এখানে আনিতে পর্যাস্ত সাহসী হয় নাই, একথাও নীরদ যে একটু একটু না বুঝিয়াছিল, এমন নয়। দু'একবার সে একটু আভাষ দিয়াও সাবধান করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল। “গিন্নির কাছে অভিপ্ৰস্ত করো না! ভাই, দেখো।”

নীরদ চুপ করিয়া রহিল। যোগেন্দ্র আরও একটু আশ্চর্য হইয়া গেল! অবশেষে হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, আজ নীরদ অসুস্থ, এবং তাহার আহার হয় নাই। এক মুহূর্তের জ্ঞাতও যে সে বিরুদ্ধ ভাব হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল ইহা ভাবিয়া অমুতাপের ধিকারে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল, ব্যগ্র হইয়া

তাড়াতাড়ি সে বলিয়া ফেলিল, “ডাক্তারকে একবার ডাকতে পাঠাই তা হলে?” নীরদ মাথা নাড়িয়া বলিল, “না না ডাক্তার কি হবে? তেমন কিছুতো হয়নি”। “সে কি! মুখের চেহারা দেখলে যে ভয় করে! তবে না হয় থার্মোমিটারটা আনি। নিশ্চয়ই তোমার শরীর বেশি খারাপ আছে।” যোগেন্দ্র উঠিল,—নীরদ ডাকিল, “না, না ও সব কিছু করতে হবে না,—যোগেন, শোন শোন—এসোনা একটু গল্প করা যাক। একটা কথা আছে—” যোগেন্দ্র ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল, “অসুখটা বাড়িয়ে কি হবে?”

“বেশতো তোমরা না হয় একটু সেবা যত্ন করবে! পারবে?” “রা আব আছি কই?” নীরদকুমার হাসিয়া বলিলেন “হওনা কেন তোমরা,—আমি কি বারণ করেছি? বিরহের পালা-অন্তে মিলনের নাট্য রচনা করো, আমি দেখে যাই।”

“কি বল্লে, দেখে যাই? অশ্রুার্থ?”

“ঐ যে আগে বল্লেম একটা কথা আছে, এটা তারি সূচনা।”

“সূচনা শুনেইতো হৃৎকম্প উপস্থিত! আরম্ভ করো তবে—দেখা যাক কোথায় গিয়ে শেষ—!”

সেইদিন প্রাতঃকালে নীরদকুমারের গুরু বিদায় লইয়া গিয়াছেন। বৈকালে পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া একটুখানি অশ্রুমনস্ক হইবার আশায় নীরদকুমার ঘরটার চারিদিকে একবার প্রত্যাশিতনেত্রে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। ঘরের দুই কোণে দুইটা আলমারিতে

পুস্তক ভরা আছে, বাংলা সংস্কৃত ইংরাজি সকল ভাষার কিছু না-কিছু ভাল বই তাহার সংগ্রহে ছিল। ম্যাক্সমুলারের “অমিতাভ বুদ্ধ” একবার হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া যখন সে ঈষৎ ক্লান্তভাবে উপরের তাকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তখন একখানি ক্ষুদ্রাকৃতি পুস্তিকা নিজের পূর্কস্মৃতির সবটুকু মধুরতা ঢালিয়া দিয়া উজ্জ্বল সুবর্ণাঙ্করে হাসিয়া তাহাকে আহ্বান করিল। যন্ত্রচালিতের মত বইখানা তুলিয়া লইয়া নীরদ আলমারি বন্ধ করিয়া ঘরের মাঝখানে টেবিলের কাছে ফিরিয়া আসিল। টেবিলের উপর সাদা কাপড়ের আস্তরণ বিছানো ও তাহার উপর কাশীর পিতলের সুন্দর কারুকার্য খচিত ফুলদানিতে এক গুচ্ছ হাসনাহানা ফুল তাহার শুষ্ক হৃদয়টির ভিতর হইতে ঘরখানিকে ক্ষীণ শেষ সুরভি দান করিয়া যেন সফলতার গৌরবে চাহিয়া দেখিতেছিল। আসন্ন মরণের পানে চাহিয়া সে যেন হাসিয়া বলিতেছে, “দেখ সবটুকু দিয়া দিয়াছি,—অনুতাপ করিবার কিছু নাই।” বাতাস তাহারি সুরভি স্মৃতিতে পূর্ণ হইয়া প্রাণপণে তাহাকে তাজা রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। সে-ও শুধু লইয়া সন্তুষ্ট নয়, কিছু দিতে চাহে। বইখানা খুলিতে প্রথমেই নীরদের চোখে পড়িল,

All look for thee Love, Light and Song,
Light in the sky deep red above
Song in the Lark of pinions strong
And in my heart true Love.
Apart we miss our nature's goal
Why strive to cheat our destinies?
Was not my love for thy Soul?
Thy beauty for mine eyes!

No longer sleep oh listen now!
I wait and weep, But where art thou?”

অত্যন্ত ভাল লাগিল। And in my heart, true Love. সে দুইবার উচ্চারণ করিল, True Love? “হাঁ সত্যই তাই! ইহাকেই True Love বলে! স্বার্থসিদ্ধি, রূপের মোহ, মিষ্টতার স্বাভাবিক আকর্ষণ, সে সব কি প্রেম? ভুল, ভুল, সে সব ভুল! সত্য বলিয়া পূর্ণ মিথ্যাকে আশ্রয় করিতে সবেগে দুই হাত সে উল্টে তুলিয়াছিল, তাই সত্যের অধীশ্বর তাহার সে বাতুলতা সহ্য করিতে পারেন নাই! তাহার অমোঘ বজ্রনিক্ষেপে তাহার গতি প্রতিহত করিয়া দিয়া সত্যের গোবব রক্ষা ও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাকেও রক্ষা করিয়াছেন। অস্তরের মধ্যে একটা স্থানে যেন নীরদ একটু হালকা বোধ করিল। যাহা বজ্রাহত বলিয়া ভয় ছিল, ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিল তাহা উপরের সামান্য আঁচড়মাত্র,—ভয়স্ফটিক নয়।

পিছন হইতে যোগেন্দ্র হঠাৎ বলিয়া উঠিল, “হরি তুমি সত্য! দেখো এতদিন তুমি আছ কি না আছ এ বিষয়ে বিষম সন্দেহ পোষণ করে এসেছিলাম; আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে তুমি আছ, আছ, আছ, এই পৃথিবীতেই আছ”। নীরদ হাসিয়া মুখ ফিরাইল, “হঠাৎ বেল্লিকের মুখে হরিধ্বনি শুনলে যে আতঙ্ক উপস্থিত হয়! লক্ষণ তো বড় শুভ মনে হচ্ছে না, যোগেন”! যোগেন্দ্র নীরদের পিঠে একটা চপেটাঘাত করিয়া সোৎসাহে বলিল, “শুভ লক্ষণ বলে তোমার মনে হচ্ছে না?”

আমার কিন্তু এখনকার লক্ষণটা বড়ই সু বলে মনে হচ্ছে! কি বলব দাদা যদি তোমার মত ছিপছিপে শরীরখানি আজকের জন্য পেতাম তাহলে একবার আহ্লাদটা প্রকাশ করে দেখাতাম। আমার ইচ্ছে করচে আনন্দে হয় নেচে, নয় গলা ছেড়ে একবার কেঁদে উঠি।”

“কেন হঠাৎ তোমার হলো কি, বলো দেখি? শ্রীমতী মণিমালা তবে আজই আসছেন, কেমন?”

“তিনি আসছেন, কাল। কিন্তু তা নয় নীরদ, তোমার এই রুচি পরিবর্তন দেখে আমার আজ যে আনন্দটা হচ্ছে ভাই তা আর কি বলব!” যোগেন্দ্র খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া আবার বন্ধুব পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল, “বেঁচে থাক, ভাই, আমার বড় ভাবনাই হয়েছিল, এখন আবার আশা হচ্ছে—।”

নীরদ দেহ সঙ্কুচিত করিয়া লইয়া সরিয়া গেল। ঈষৎ কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল “বেওয়ারিস্ মাল পেয়েছ, যোগেন! পিঠখানা ভেঙ্গে দেওয়ায় বিশেষ কোন লাভ তোমার নেই! হঠাৎ অতটা উচ্ছ্বাস ভাল নয়, একটু রেখে খরচ কর—।”

যোগেন্দ্র নীরদের পাশে আসন গ্রহণ করিয়া উচ্ছ্বাসিত হইয়া কহিল, “যাই বল, ভাই আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম,— গস্তীর মুখ আর ভাষ্য ভঙ্গ আমার প্রাণটাকে একেবারে চেপে মেরে ফেলবার যোগাড় করেছিল! নীর তোমার মুখে শেলি, বার্ণস্, রবীন্দ্রনাথের কবিতা কত মিষ্ট শোনায়! ও গলা কি মোহ যুদ্ধের আবৃত্তি করবার জন্ত, ভাই! তুমি যে খোদার উপরেও খোদাগরি করেছিলে!—আমি

বেশ বুঝতে পারছিলুম অতটা বিদ্রোহ তোমার বরদাস্ত হবে না। এখন, কি কথাটা বলবে বলেছিলে—শুনি?”

নীরদ এতক্ষণ যোগেন্দ্রের কথায় বেশ একটু কোতুক অনুভব করিতেছিল। শেষ প্রশ্নে সহসা সে স্তম্ভ হইয়া উঠিল। “বলবো 'খন”।

“কখন বলবে, পঁজিপুঁথি আনতে হবে নাকি? তারপর দুখানা নৈবেদ্য একটা শাঁক ফুল ও চন্দন?”—নীরদ হাসিয়া ফেলিল, “জ্বালিও না, থামো, কি বলবো?”

“যা বলবে বলেছিলে!” নীরদ অত্যন্ত সহসা বলিয়া উঠিল, “কি বলি উচিত, বুঝতে পারচি না”—তাহার মুখ চোখ গরম এবং লাল হইয়া উঠিল; মাথা ও মুখের ভিতর উত্তপ্ত রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। যোগেন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় দুইটা স্কুলের ছেলে ঘরে আসিয়া নত-মস্তকে দাঁড়াইল। নীরদ দরজার দিকে ফিরিয়া বসিয়াছিল, তাহাদের দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, “কি বলচো সুধীর, বিনয়?” সুধীর সোজা নীরদের মুখের দিকে চাহিয়া অকুণ্ঠিতভাবে কহিল, “আপনি আজও কি বাগানে যাবেন না? রোজ রোজ আপনি না থাকলে কেমন করে চলবে?” বালকের এই কথা কয়টা আচমকা নীরদকে যেন আঘাত করিল। ছি, ছি, সে স্বার্থপর নিতান্ত কাপুরুষের মত নিজের অন্তর্দাহ লইয়া এ কোণে ও কোণে লুকাইয়া বেড়াইতেছে! নীরদের উত্তর দিবার পূর্বেই যোগেন্দ্র একটু ব্যস্তভাবে বলিল, “আজ নীরদের শরীর ভাল নেই সুধী, বিনয়, তোমরা খেলতে যাও।

কাল থেকে তোমাদের খেলার সময় আমরা ঠিক উপস্থিত থাকব দেখো”। বালক দুইটি একসঙ্গে নীরদের স্তম্ভিত মুখেব দিকে চাহিয়া দেখিল। বিনয় ধীরে ধীরে ব্যথিত নেত্র নামাইয়া বলিল,—“তবে থাক—এসো সুধীর!”

তাহারা ফিরিল, কিন্তু তাহাদের মৌন অভিমানের প্রচ্ছন্ন ব্যথা নীরদের অপরাধী চিত্তকে তাহাদের মত সহজে ক্ষমা করিতে চাহিল না। সে অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, “না না চলো আমি যাচ্ছি। আজ তোমাদের মাচ আছে, না?” বিনয় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে উত্তর করিল, “সেতো কাল হয়ে গেছে।” সুধীরের মুখ হইতে তখনও অভিমানের ছল-ছল ভাব চলিয়া যায় নাই। সে মুখ না ফিরাইয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, “আপনার শরীর ভাল নেই। আজ থাক’ “তা হোক আমার কিছু কষ্ট হবে না এসো।” এই বলিয়া নীরদ দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িল; যোগেন্দ্র একটু অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল—তারপর কার্য্যাহরে উঠিয়া গেল! খেয়ালী-লোকদের চরিত্র বোঝা তাহার মাথোর অতীত, সে কথা সে পুনঃপুনঃই স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। আজ আর নূতন কি বলিবে?

ছেলেরা ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছিল; যাহারা খেলা না করিতেছিল, তাহারা আপনা-আপনি দাঁড়াইয়া হাসি গল্প করিতেছিল। ছোট ছোট গাছগুলি বিকাল বেলার বাতাসে তাজা হইয়া ধীরে ধীরে মাথা কাঁপাইতেছিল, অদূরে নদীর পারে অস্তোন্মুখ সূর্যের রাঙা

কিরণটুকু যেন ঋষিপত্নীর ক্ষৌম বসনের রাঙা পাড়টির মত আসন্ন সন্ধ্যার তলে ফুটিয়া রহিয়াছে। নীরদ সুধীরের হাত দৃঢ় ভাবে চাপিয়া ধরিয়া মৃদুস্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আমি না দেখলে তোমাদের খেলতে ভাল লাগে না?” সুধীর এখন অভিমান ভুলিয়া গিয়াছিল; সে সেই হাতখানার উপর অল্প একটু ঝুঁকিয়া পড়িবার প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, “একটুও না”।

এই পৃথিবী এমন সুন্দর! এই মিশ্র বায়ু, প্রসন্ন সূর্য্যকিরণ, ঐ আকাশের গায় মিশিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে যে ছোট ছোট পাখীগুলি, নদীতীর হইতে ভাসিয়া আসা, সহজ হান্ত মিশ্র কলরব, এখানকার কিছুই তো নিরাশার অন্ধকার গায় মাখে না! উদ্ভাপে তাহারা স্নান হয়, আবার বাতাসে হাসিয়া উঠে। অন্ধকারে ঘুমাইয়া থাকে, আলো আসিলেই জাগিয়া উঠে। তবে এই সজীব শান্ত আলোকিত জগতের মাঝখানে ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া সে কেন এক হইয়া যাইতে পারে না! আরো, তাহার উপর অশ্রু সকলের এই যে নিঃস্বার্থ ভালবাসাটুকু, এই যে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি, ইহাই কি তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। সে তো অনেক পাইয়াছে। তাহার জীবন ব্যর্থ নহে, সে ধন্য!

৩৫

সেদিন ও তার পরদিনটা পর্য্যন্ত নীরদ যোগেন্দ্রের হাত এড়াইয়া কোন রকমে আত্ম-রক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আবশ্যক তাহার নিজের,—কথাটা প্রথম সেইই তুলিয়াছে,—বলিবার প্রয়োজন এখনও বিদ্যমান, অথচ যোগেন্দ্রকে দেখিলেই বুক যেন কাঁপিয়া

উঠে। হাত পায়ের তলাগুলো অসাড় হিম হইয়া আসিতে থাকে।

মণিমালা তাহার দুইটি পুত্র কণ্ঠা সঙ্গে লইয়া আসিয়া পৌঁছিলে যোগেশ্বরের হাত হইতে আপাতত রক্ষা পাইল মনে করিয়া নীরদ কতকটা আরাম বোধ করিতে লাগিল। সন্ধ্যাবেলা ছেলেদের লইয়া গল্প করিয়া রাত্রে যখন সে শয়ন করিতে গেল,—কলাগময়ী জননীর মত সর্বসম্ভাপহরা নিদ্রাদেবী তাহার শ্রান্ত ললাটের উপর কোমল হাতখানি বুলাইয়া দিলেন।

প্রভাত আবার যুদ্ধের সাজে সাজিয়া আসিল। আবার সেই জীবন-সংগ্রামে হৃদয়ের সহিত ধস্তাধস্তি! বিদ্রোহী চিত্তকে সহজ প্রলোভনে ভুলাইয়া বশীভূত করিবার জ্ঞান প্রাণপণ চেষ্টা!

তখনও ঠিক প্রভাত হয় নাই। দূরে পূর্বা-কাশের একটি প্রান্ত সবেমাত্র লাল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। পাখীরা স্তম্ভ জাগ্রত হইয়া আপনাদিগের শিশু শাবকগণের সহিত আলাপ শেষ করিয়া দিবসের মত বিদায় লইতেছিল। দুইটা পক্ষী-দম্পতী একটি গাছের ডালের কাছাকাছি বসিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতেছে। মন্দের প্রাঙ্গণ হইতে বালকদের সমবেত কর্তোচ্চারিত সংস্কৃত স্তব আবৃত্তির গাভীর্যময় ঝঙ্কার স্তব প্রভাতের বাতাসে-আকাশে কম্পিত হইতে লাগিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত নীরদ এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে কোন এক সময়ে আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিল।

সেই দিন আসন্ন সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন কানন-পথে ফিরিতে ফিরিতে গ্রামের বৈরাগী যখন

খঞ্জনী বাজাইয়া আপন মনে গাহিয়া চলিয়াছিল, “সামাল মাঝি এই পারাবারে বান ডেকেছে সাগরে। এবার তোমার দফা, হল রফা, পড়ে গেলে ফাঁপরে”—তখন পাশে বেড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া নীরদ আপনার মনের সহিত শত-শত প্রশ্নোত্তর করিতেছিল। যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিয়াছে। কল্যা প্রভাতেই জীবন-ব্যাপী মহাসমরের সমাপ্তি—তার পর? তারপর কি অপূর্ণ শান্তি, অটুট সুখ! লুক্ক বালকের মত আপনাকে আপনি সে ভুলাইতেছিল। গান একটা সামান্য ভিক্ষাজীবী গ্রাম্য বৈরাগীর অশিক্ষিত কণ্ঠের স্বাভাবিক স্বরমাত্র, সারা-দিনের ধূলি-রৌদ্রমাখা ক্লাস্তচিত্তের একটুখানি আত্মতৃপ্তি, কিন্তু নীরদের কানে ইহা আজ সংসারের মধ্যে সব চেয়ে মিষ্ট ও মধুর ঠেকিল। বৈরাগী যেন তাহার সঙ্কট বুঝিয়া ছরস্তু পারাবারে ভাসমান নৌকাখানিকে প্রাণপণে সামলাইতে বলিতেছে! বান ডাকিয়াছে, যদি সে সাবধান না হয়, তাহার ক্ষুদ্রতরী রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিবে।

কয়দিন সমস্ত মানসিক শক্তি ধরচ করিয়া করিয়া আর সব মীমাংসা একরকম সে করিয়া আনিয়াছে; কিন্তু একটা অদম্য লজ্জা সে কিছুতে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছিল না। লক্ষ্মীপুরে সে কাহার প্রতি-দ্বন্দ্বা হইয়া দাঁড়াইবে? সে যে শাস্তির স্বামীকে তাহার স্বর্কস্ব দান করিয়া দিয়াছে। আবার কি সে দান ফিরাইয়া লইবে? নীরদের আরম্ভ মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহার চঞ্চল হৃৎপিণ্ড পুনঃপুনঃ নিশ্চল হইয়া পড়িতে লাগিল। ঘড়িতে যেন দম আর একটুও নাই। সামলান বুঝি দায় হয়, যাত্রী

এবার ফাঁপরেই পড়িল! সত্ত্ব ফোটা ফুলের মত আকাশভরা নক্ষত্রগুলি সকৌতুকে তাহার লজ্জাক্রিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া রহিল; শীতের কনকনে বাতাস গায় তীরের মত বিধিয়া ফিরিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিল, অনেক দূর হইতে ক্ষীণ সঙ্গীতের ধ্বনি তখনও শুনা যাইতেছিল কিন্তু বুঝিতে পারা যাইতেছিল না। অনেকক্ষণ পরে অদূরস্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন কলাবাড়ের পানে চাহিয়া চাহিয়া সুদীঘ নিখাসে স্নগভীর লজ্জাকে যেন জোর করিয়া সে পরিত্যাগ করিতে চাহিল “আমার যেতে হবে, আমি যাবো,—তার সম্মুখে দাঁড়িয়েই আমার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে,—তাই করব,—আমার যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই।”

নীরদ যখন ঘরে ফিরিয়া আসিল তখনও অপর দিকের ঘরগুলি হইতে ছেলেদের পাঠের সাড়া আসিতেছিল। তাহার ঘরে টুলের উপর একটি তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছিল ও যোগেন্দ্র আলোর কাছে একখানা চৌকিতে বসিয়া ঋপরের কাগজ হইতে পুনঃপুনঃ চোখ তুলিয়া দরজার দিকে চাহিতেছিল। নীরদ ঘরে ঢুকিতেই কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া সে বলিয়া উঠিল “হ্যালো মান! তোমার যে পাত্তাই পাওয়া যায় না—হলো কি? কেবলি ঠাণ্ডা বাতাস, আর দীর্ঘশ্বাস!—না, আর কিছু?” নীরদ যোগেন্দ্রের চৌকি ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল, “না আর কিছু না।”

“I wait and weep but where art thou? শুধু তাই?”

“তাই, কিন্তু যোগেন, তামাসা যাক, কাজের কথা বলো, আমার কথার

উত্তর কই? আমি চলে গেলে আমার কাজের ভার তুমি নেবেত?”

“আমার প্রশ্নটারি উত্তর কেন প্রথমে হোক না! তোমার মতলব কি?”

“কার মনে কখন কি মতলব ওঠে, তা কি সব সময় খুলে বলা যায়? তবে এই পর্য্যন্ত বলচি, মন্দ কিছু নয়, গুরুদেবের আদেশে আমি যাচ্ছি।”

“ঐ তো ওখানেই যে গলদ! তাঁর যে একটি তল্লি বয়বার চেলায় দরকার হয়নি, তা ভরসা করব কি কবে?”

মাথা নীচু করিয়া নীরদ কহিল, “তা হলে ত আমার সৌভাগ্য!”

বন্ধুর অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস যোগেন্দ্র গুনিতে পাইল না। সে মাথা নাড়িয়া অতি কক্ষণ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, “ওটাও যে একটা দুর্লক্ষণ! এ বোঝনা—মহা মহা পাপীরাই তো শেষ কালটার বড় বড় সাধু হয়। জগাই মাধাই পাপী ছিল, হরিনামের গুণে তরে গেল। আর জানো তো মহামুনি বাল্মীকির পূর্ব ইতিহাসটা? যত দেখবে মস্ত জটা, ততই তাঁর পূর্বলীলার সন্ধান নিতে থাক, দেখবে যে কেউ আর বাদ পড়েন না—”

আর একটু গাঙ্গীর্যের চেষ্টা করিয়া সে বলিল, “আচ্ছা, তাহলে এখন ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করা যাক—ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তুমি আপাততঃ কোন অজ্ঞাত মতলবে কিছু দিনের জন্ত নিরুদ্দেশ হচ্ছে—না হয় পর্য্যটনেই বেরুচ্ছে! এখন তোমার অশুপস্থিতিতে আমরা এখানকার সব দায়ভার নিজেদের স্কন্ধে বহন করি, তোমার অশুর্রোধ—এই, না? আমার এখন জিজ্ঞাস্য, এই ভারবাহী গর্দভের গলায় কত দিন আর এরকম শিকল বাঁধা থাকবে?”

নীরদ একটু ভাবিয়া বলিল “তাতে জানি না। হয় তো খুব শীঘ্রও চতে পারে আর নয় তো অনেক দেরিও হয়ে যেতে পারে। কি জানি যোগেন কি হবে!” নীরদের স্বর কম্পিত হইতেছিল! যোগেন্দ্র জানিত ভাবুক লোকের কথা বার্তা চাল চলন সাধারণ লোকের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। সে কহিল “তোমার আদেশ কবে অগ্রাহ্য করেছি। কিন্তু একটা কথা—এই বৎসবৃন্দ নিয়ে দিন রাত গোষ্ঠলীলা করতে করতে যে সময় প্রাণটা পরিত্রাহি ডাক ছাড়বে সেই সময়টিতেই যে ঠিক মানভঞ্নের পালা গাইতে খুব ভাল লাগবে এমন তো ভরসা করা যায় না। তাই ভাবচি ওপরের ঘরগুলো গুঁদের খাসমহল করে দিয়ে তোমার এই নারীবর্জিত গৃহে আস্তানা গেড়ে একবার জিরিয়ে নেওয়া যাবে, নৈলে ত আর পারা যায় না।”

নীরদ তীক্ষ্ণ শ্লেষের সহিত বাঙ্গ করিল, “যো খায়া উওভি পস্তায়া!—আর যো নেহি খায়া—উওভি পস্তায়া! তা ত দেখতে পাচ্চি মশায়! এখন বল দেখি কোথায় যাচ্চ, কোন দেশে?”

নীরদ হঠাৎ ঘামিয়া উঠিল, তাহার বৃকের মধ্যে এত জোরে জোরে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল যে তাহার নিশ্বাস আটকাইয়া পড়িবার মত হইয়া আসিল। মাটির দিকে চাহিয়া রুদ্ধশ্বাসে মৃদু স্বরে সে উত্তর করিল, “মাপ করো ভাই, আজ আমার কিছু জিজ্ঞাসা করো না।”

যোগেন্দ্র মনে মনে বিস্মিত হইল কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ না করিয়া কহিল “এত

লুকোচুরি কিসের বলো তো শুনি? তা যাও যাও যদি সঙ্গিনী-সংগ্রহের ইচ্ছা হয়ে থাকে তো বলে যাও আমি মণিকে দিয়ে বরণডালা সাজিয়ে রাখি। ও কি চমকালে যে? ঠিক ধরেছি নাকি? দেখ আজ তোমার বলি—শান্তিকে ভালবেসেও তুমি যখন তাকে পাবার চেষ্টা করলে না তখন আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল যে তোমার আঙুলীলার কোথাও কোন গলদ আছে। কে সে ভাগ্যবতী শুনি এতদিন পরে যার কপাল ফিরলো? নিশ্চয়ই কোন ব্রাহ্ম মেয়ে হবে নৈলে কে আর এখনও আইবুড় বসে আছে। নীরদ নীরদ! ও কি? রাগ কল্লে?” যোগেন্দ্রনাথ সহসা লজ্জাতাড়িত আবেগে এই কথা বলিয়া তাহার হাত ধরিবার জন্ত নীরদের দিকে দুই হাত বাড়াইয়া দিল। কিন্তু বন্ধু তাহার প্রতি কোন লক্ষ্য না করিয়া বেত্রাহতের মত চমকিয়া দ্রুত পদে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। সেথায় স্তব্ধভাবে জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বাহিরের অন্ধকার দৃশ্যের দিকে সে চাহিয়া রহিল।

যদি তাহার বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ তখন হতবুদ্ধি না হইয়া গিয়া উঠিয়া আসিয়া একটা আলো হাতে করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইত, তাহা হইলে তাহার বিশ্বয়সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিত কাবণ সে মুখে লজ্জার যে নিবিড় ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহাতে অমার্জনীয় অপরাধেরই চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছিল। যোগেন্দ্র তাহার বন্ধুকে ঠিক দেবতার মত পবিত্র বলিয়া জানে সে যখন জানিবে যে বাস্তবিক সে তাহা নয়!

ক্রমে অন্ধকার কাটিয়া গিয়া কুয়াশা-

ছন্ন ক্ষীণ জ্যোৎস্না ছড়াইয়া আকাশে
চাঁদ উঠিল, জানালার নীচে টবেব মধ্য হইতে
চন্দ্রমল্লিকার গন্ধ আসিতে লাগিল, শাখা
বিরল সজিনা গাছের উপর হইতে একটা
নিশাচর পক্ষী কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করিতে
করিতে বাতাসে ডানা মেলিয়া জানালার
নিকট দিয়া উড়িয়া গেল।

ধীরে ধীরে নীরদ পূর্বকক্ষে ফিরিয়া
আসিল। সে ঘরে যেখানে সে তাহাকে ছাড়িয়া
গিয়াছিল—ঠিক সেইখানটিতে সেই অবস্থায়
যোগেন্দ্র তখনও স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল।
অনুতাপের গ্লানিতে তাহার মুখ পরিপূর্ণ।
নীরদ ধীরে ধীরে তাহার পাশে আসিয়া
দাঁড়াইল, বলিল “যোগেন্ তাই বলো,
বরণডালা সাজাতেই বলো, আমি আমার
স্ত্রীকে জানতে যাচ্ছি।” তাহার জিহ্বায় তখন

আর একটুও জড়তা ছিল না। যোগেন্দ্রের
কণ্ঠ মধ্য হইতে অক্ষুট চীৎকারের মত বাহির
হইয়া পড়িল “তোমার স্ত্রী!”

নীরদ উত্তর করিল, “হাঁ আমার পরিত্যক্তা
অত্যাচারিতা, স্ত্রী শিবানী।” সন্মুখে কোন
অশরীরি মূর্তির ছায়া দেখিলে লোকে যেমন
চমকিয়া পলাইতে যায় তেমনি ভাবে
পিছাইয়া গিয়া অক্ষুট কণ্ঠে যোগেন্দ্র কহিয়া
উঠিল, “তবে তুমি, তবে তুমি শাস্ত্র—”
পরিত্যক্ত চৌকিখানা সরাইয়া বসিয়া নীরদ
স্থির কণ্ঠে উত্তর করিল “হাঁ। কিন্তু যোগেন
ওসব কথা নিয়ে আলোচনা এখন থাক।
প্রতিজ্ঞা কর, আমি ফিরে না আসা
পর্যন্ত তুমি কারু কাছে এ কথা বলবে না?”

প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিতে করিতে
যোগেন্দ্র কহিল “আচ্ছা।”

একই

একই সুরে সবাই বাঁধা

জান বা আর না জান।

একই তারে সবাই গাঁথা

মান বা আর না মান।

একই মরণ, সবাই মবে

মরতে চাও আর নাই বা চাও।

একই জনম সবাই ধবে

ধরতে চাও আর নাই বা চাও।

একই কথা সবাই বলে

ভাষা যতই হোক না কো।

এক রাগিণীই সবাই ভাঁজে

সুরের তফাৎ থাক না কো।

এক জোড়নে সবাই জোড়া

বাঁধা সবাই এক তাঁতে।

দশাব ফেরে যতই ফিরুক

আগ্-পিছুতে এক সাপে।

এক নিয়মে গড়ছে সবাই

যতই কর কোণাহল।

ভাস্কতে তারে পারবে না কেউ

কারিকরের এম্নি কল।

একই ধরম একই করম

একেরই সব কারখানা।

এক ছাড়া হুই নাই রে ও ভাই

যতই কর কল্পনা।

দো-সতীনা।

হুগলী জেলার অন্তর্গত 'দে পাড়া' একটি ক্ষুদ্রায়তন পল্লীগ্রাম। তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে কয়েকঘর কৰ্মকার, কুস্তকার ও ক্ষৌরকার মাত্র হিন্দু; অবশিষ্ট সকলে মুসলমান। গ্রামের পূর্বদিকে বিস্তৃত ধাতুক্ষেত্র এবং তার পরেই দুইটি সুপ্রশস্ত পুষ্করিণী পথিকের মনে সুদূর অতীতের কোনো প্রাচীন স্মৃতি স্বতঃই জাগাইয়া তোলে। এই সুবহুৎ প্রসিদ্ধ সরোবর দুইটিই "দো-সতীনা" নামে জনসাধারণের নিকট পরিচিত। এই পুরাতন বিখ্যাত সরোবর দুইটির সম্বন্ধে যে প্রবাদ-কথা প্রচলিত আছে তাহা ঐতিহাসিক মূল্যরঞ্জিত না হইলেও কৌতূহলোদ্দীপক, ভাবিয়া নিম্নে তাহা প্রকাশিত কবিলাম।

প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে এই স্থানের নাম ছিল, 'দেবপল্লী', এবং এখানে দেবপাল নামক একজন ভূপতি বাস করিতেন। তাঁহার মাতাপিতার পরিচয় পাওয়া যায় না— তিনি যে কত বৎসর যাবৎ এখানে বাস করিয়াছিলেন তাহাও নির্ণয় করিবার উপায় নাই। রাজা দেবপাল প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার বিবাহ করিতে অভিলাষী হইলেন। তাঁহার বিস্তৃত সম্পত্তি, তরুণ বয়স ও অসাধারণ রূপলাবণ্য দৃষ্টে লক্ষ্মীকান্ত নামে জনৈক রাজা আপন কন্যা ইলাকে দেবপালের হস্তে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। দেবপালও ইলার অপরূপ রূপ-মাধুরী দর্শনে একান্ত মুগ্ধ হইলেন। যথাসময়ে বিবাহের দিনও স্থির হইল। নির্দিষ্ট দিনে দেবপাল বরবেশে সুসজ্জিত হইয়া আশ্বীয় বহুবাহুবগণসহ

রাজা লক্ষ্মীকান্তের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বরযাত্রী এবং কন্যাযাত্রীর দলে পরস্পরে আলাপ-পরিচয় হইতে লাগিল, উভয় পক্ষের অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যগণের মধ্যে বিবিধ শাস্ত্রের বিচার ও তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইল। বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইলে, বর সম্প্রদান স্থানে আনীত হইলেন। পুরমহিলারা শঙ্খ-ধ্বনি করিতে লাগিলেন,—বাহিরে শানাইএর সহিত নহবৎ বাজিতে লাগিল; বহুমূলা বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা পীঠোপরি উপবিষ্টা পাত্রীকে নির্দিষ্ট স্থানে আনা হইল। পুরোহিত ঠাকুর মস্ত্রোচ্চারণপূর্বক সম্প্রদানকার্য্য আরম্ভ করিলেন। এমন সময় সহস্রা রণভেরীর ভীষণ নিনাদ শ্রবণ করিয়া সকলেই সেইদিকে উৎকর্ণ হইলেন। দেখিতে দেখিতে বহু অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যপাদভরে সম্প্রদান-ভূমি কাঁপিয়া উঠিল। অগণ্য সেনা ভীমবে সকলেব প্রাণে দারুণ ভীতির সঞ্চার করিয়া তোরণ-দ্বার হইতে বিবাহ স্থান অবধি দুই সারিতে বিভক্ত হইয়া দাঁড়াইল। বিবাহ আর হইতে পারিল না। সৈন্যগণ ইলাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

সভাস্থ সকলে চিত্তার্পিত পুত্তলিকাবৎ নিশ্চল ও নিষ্পন্দ হইয়া রহিল। কাহারো মুখে একটি কথা নাই। ক্ষণকাল পরে বাড়ির ভিতর হইতে ক্রন্দনের ধ্বনি উঠিল, কয়েকজন দম্ভাদলের অল্পসঙ্কানে ছুটিল। ক্রমে রাত্রি অবসান হইয়া আসিলে, দেবপাল উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা 'মাগতী' ও 'মাধবী' নামী ইলার দুই সখীকে লইয়া

গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং যথারীতি তাহাদের দুজনকেই বিবাহ করিলেন। কিন্তু ঐ দুজনের মধ্যে একজনও ব্রাহ্মণকন্যা নহে ; একটি কৰ্ম্মকার ও অপরটি কুম্ভকারের কন্যা। এই কথা প্রচার হইবামাত্র গ্রামস্থ সকলেই দেবপালের উপর অসন্তুষ্ট হইল। অনন্তর রাজা দেবপাল স্বীয় প্রাসাদের পূর্ব-প্রান্তে দুইটি স্তূপস্থ পুষ্করিণী খনন করাইলেন এবং উহার মধ্যস্থলে এক-একটি বাড়ি প্রস্তুত করাইয়া দুই স্ত্রীকে তথায় রাখিলেন। তদবধি ঐ দুই দীঘির নাম “দো-সতীনা” বলিয়া চতুর্দিকে ঘোষিত হইল। অতঃপর কেহই আর দেবপালকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মান্য করিত না এবং তাঁহার সংশ্রবে থাকিলে জাতি ও ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, এই আশঙ্কায় সেই

গ্রামবাসী ব্রাহ্মণগণ সকলেই স্ব স্ব পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

সেই অবধি ঐ গ্রাম ব্রাহ্মণশূণ্য হইয়াছে। রাজা দেবপাল দীর্ঘকাল বাঁচিয়া ছিলেন কিন্তু তাঁহার কোনো পুত্রকন্যা জন্মে নাই। কালক্রমে ঐ দেবপল্লীর নাম ‘দে-পাড়া’ হইয়াছে। উক্ত গ্রামবাসীদের নিকট রাজা দে পালের নাম ও অনেক বিচিত্র কাহিনী শুনা যায়। তাহাদের কথিত দে পালই যে সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দেবপাল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ এই “দো-সতীনা” দীর্ঘিকা আজ অবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

শারদ-লক্ষ্মী ।

পুলক-ঢালা আকাশ-নীলে ছায় কি তব স্পর্শ ?
উড়িয়ে-চলি মেঘের কোলে বেড়ায় ছুটে হর্ষ ?
ছড়িয়ে-পড়া সোনার গোদে ভাসে মুখের দীপ্তি ?
আকাশ বন সমীর চুমি ভায় কি তব তৃপ্তি ?
সবুজ ধানে ঢুটু তুলিয়ে বহ কি তুমি বহ গো ?
কুমাণ-বধু পরাণ মধু চুমিয়া তুমি রহ গো ?
মদিরঘন শেফালিবাসে বিকাশে হৃদি-বদন। ?

কল-আরাবে কৃহরে কি গো মুখর শত কামনা ?
পরাণ আজি করুণ বাজি খুঁজিয়া ফিরে তোমারে,
নয়ন-মনে পরশমুখে চাই যে তব দেখা রে ?
কপোতগলে বরণ-মালে চকিতে যাও মিলায়ে,
কাশের ফুলে ধরিতে গেলে যাও যে মেঘে পলায়ে !
ফাটিয়ে-টুটা চকিতে-ছুটা তোমার পাব দেখা কি ?
বাঁধন-হারা বগাগুলির কোথাও আছে মেলা কি ?

শ্রীসুধরঞ্জন রায় ।

প্রেম ও মিলন ।

প্রেম চায় মিলনের নিবিড় সংযোগ,
অনিবৃত্ত আকাঙ্ক্ষার অবিচ্ছেদ ভোগ ;

মিলন কাঁদিয়া ফিরে সরমের মাঝে,—
প্রেম-কণ্ঠে নিরাশার ভগ্নবীণা বাজে !

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত ।

সন্ন্যাসী।

১

ঘাটের ধারে বৃদ্ধ বটগাছের ছায়ায় যে জীর্ণপ্রায় পরিত্যক্ত কুটির বহুদিন শূণ্য পড়িয়াছিল, হঠাৎ একদিন প্রাতে গ্রামবাসীগণ বিস্মিত হইয়া দেখিল, সেখানে এক সন্ন্যাসী!

রং গোরবর্ণ, মাথায় দীর্ঘ জটা, পরণে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড; এই সন্ন্যাসী একদিনের মধ্যেই সমগ্র গ্রামবাসীর কোতূহল আকর্ষণ করিল।

সন্ন্যাসী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড জালাইয়া সমস্তদিন ধরিয়া হোম করে, মাথার উপর রৌদ্র যখন খর হয় তখনও তাহার বিরতি নাই, এবং সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ভোজনের জন্ত তাহার কোন প্রয়োজন বা চেষ্টার লক্ষণ দেখা যায় না।

এত বড় একটা অদ্ভুত প্রাণী সচরাচর মেলে না—বিশেষ এই ললিতগাঁয়ে।

গ্রামবাসীরা সমস্ত দিন তাহার দুয়ারে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, অবশেষে বেলা-অবসানেও যখন তাহারা কিছুতে সন্ন্যাসীর লক্ষ্য আকর্ষণ করিতে পারিল না, তখন ফিরিয়া গেল।

২

পরদিন এক বৃদ্ধা আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ডাকিল, “ঠাকুর”—

সন্ন্যাসী কহিল, “কি?”

“আপনি কে আমাদের দয়া করে এখানে এসেছেন?” সন্ন্যাসী একটু হাসিল, “আপনারাই মত মানুষ—বোধ হয় তাও নয়—”

বৃদ্ধা জিভ কাটিল, “অমন কথা বলবেন না—আপনি দেবতা—”

হোমেব আগুণ লক্ লক্ করিয়া উঠিল, সন্ন্যাসী কহিল, “মা, যাকে তাকে দেবতা বলে পাপের ভাগী করবেন না—দেবতা কি সহজে হয়?”

বৃদ্ধা আর একবার গড় করিল, “একটা কথা বলব?”

সন্ন্যাসী কহিল, “বলুন”—

“আপনার সেবার জন্তে কিছু এনেছি, যদি দয়া কবে গ্রহণ করেন”—বলিয়া একখাল অন্ন এবং অত্যাণ্ড ভোজ্য সন্ন্যাসীর সম্মুখে রাখিল।

সন্ন্যাসীর মুখে আবার হাসি দেখা দিল, “গ্রহণ করব বৈ কি মা! পরের দেওয়া অন্নে আট বৎসর উদর পূর্তি কচ্ছি, আজ আর তা নইলে আমার চলে না।”

সেইদিন হঠতে প্রতাহ গ্রামবাসীগণ সন্ন্যাসীর জন্ত অন্ন দিয়া যাইত।

৩

সন্ন্যাসীর কুটির হইতে খানিকটা দূরে জমিদার বিপিনবাবুর বাটি।

নবীন যৌবনে বিপিনবাবুর উদ্যম চরিত্রের কথা দেশবিদেশে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর সহসা একদিন কোথা হইতে তিনি কাহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়া কলিকাতাবাসী হইলেন। চার-পাঁচ বৎসর কলিকাতায় থাকার পর যখন তিনি দেশে ফিরিতেন,—তখন তাঁহার সঙ্গে আসিল তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার ছোট ফুটফুটে মেয়ে মন্দা।

এই বিবাহ সম্বন্ধে কি একটা গোলযোগ

উঠিয়াছিল, কিন্তু সে অত্যন্ত অশুট, কারণ বিপিনবাবু জমিদার !

কলিকাতায় যখন বিপিনবাবু ছিলেন তখন দেশের লোকে বাচিয়াছিল—তিনি যখন ফিরিলেন, তখন তাহারা প্রমাদ গণিল।

৪

কিছুদিনের মধ্যেই সন্ন্যাসীর কতকগুলি ভক্ত এবং বন্ধু জুটিয়া গেল। জমিদারকত্তা মন্দা দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত।

ছপুরবেলা একটা ছিন্ন বই হাতে লইয়া মন্দা আসিয়া উপস্থিত, “সন্ন্যাসী ঠাকুর—”

সন্ন্যাসী ধ্যান-মগ্ন ছিল, চোখ খুলিয়া বলিল “মা এসেছ?—এই ছপুর রৌদ্রে ঘুমোলেনা কেন?”

মন্দা প্রবলভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল “নাঃ,—কত পড়েছি আপনাকে তাই দেখাতে এলাম,—আর একটা জিনিষ এনেছি সন্ন্যাসী ঠাকুর—”

ধ্যান অগত্যা বন্ধ রাখিতে হইল। সন্ন্যাসী কহিল, “কি, দেখি?”

কাপড়ের ভিতর হইতে একটা পুতুল বাহির করিয়া মন্দা কহিল, “এ হচ্ছে বড় বৌ। আরো মেজ বৌ, সেজ বৌ, ন বৌ, ছোট বৌ, ঘরে আছে, নিয়ে আসব?”

সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিল, “না থাক, আজ আর আনতে হবে না, কাল এ না।”

তখন বড় বৌকে কোলে রাখিয়া মন্দা তার ঘরকন্নার কথা পাড়িল। ‘ওদের বাড়ীর কুন্দর ছেলের সহিত বড় বৌএর মেয়ের এই সে দিন বিবাহ হইয়া গেছে—তাতে কত ঘটা কত আমোদ!’ ছোট ছইখানি হাত ঘুরাইয়া মন্দা তাহারই কথা বলিতে লাগিল।

সন্ন্যাসীর কঠিন হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিতে-ছিল, চোখে জল আসিয়াছিল। এই একটা অবোধ ছোট মেয়ে,—কি জানি কেন এর এত মোহ! সে তার ছোট ছইখানি হাতে এমন সুদৃঢ় বন্ধন রচনা করিয়াছে যে, এই দীর্ঘ আট বৎসরের কঠিন সংযমেব পরও সন্ন্যাসী সে বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। ওই তার সুন্দর মুখখানি—সে কাহার কথা মনে করাইয়া দেয়! কিসের একটা আভাষ—কিসের একটা স্মৃতি! নদীর জল ছলছল করিতে থাকে, গাছের পাতায় হাওয়া সিবু সিবু করিয়া উঠে, চোখের জল কোন রকম করিয়া ঢাকিয়া সন্ন্যাসী মন্দাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলে, “ঘাও মা, বাড়ী ঘাও, বেলা পড়ে আসছে।”

অনর্গল কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ মন্দা থামিয়া যায়—“সন্ন্যাসী ঠাকুর, আপনার চোখে জল কেন?”

সন্ন্যাসী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলে “আমার কি চোখে জল আসে মা? ঐ হোমের আঙুনে সব শুকিয়ে গেছে—”

মন্দা গলা জড়াইয়া ধরে “কিন্তু ঐ ত’ রয়েছে—!” তখন অশ্রুজল উচ্ছৃঙ্খিত হইয়া উঠে। মন্দার মুখচুষন করিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দেয়।

৫

বাড়ীতে ইহার জন্ত মন্দাকে অল্প লাঞ্ছনা সহ করিতে হইত না। তাহার ঠাকুরমা দেখিবা-মাত্র তাহাকে শাসন করিতেন, কহিতেন,

“কোথা গিয়েছিল-রে?”

মন্দা একটা ঢোক গিলিয়া বলিত, “ঘাটের ধারে।”

“সন্ন্যাসীর কাছে বৃষ্টি ?”

মন্দা চুপ করিয়া থাকিত।

তখন ঠাকুমা গর্জন করিয়া উঠিতেন “এমন মেয়েও ত দেখিনি! সন্ন্যাসীর কাছে দিবারাত্র পড়ে থাকা এমন ত শুনিনি! হতভাগা মেয়ে,—তারা কত কি জানে, তাদের কাছে কি থাকতে আছে,—তারা নজর দিলে অনাছিষ্টি হয়—অশুখ বিষুখ করে দিয়ে মেরে ফেলে,—কতবার বলি—রাক্ষসী মেয়ে তবু শোনে না!”

মন্দা কহিত “না ঠাকুমা, সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে কত ভালবাসেন, কত গল্প বলেন, — কত আদর করেন—”

ঠাকুমা সভয়ে বলিতেন, “ঐ রে, মেয়েটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিপাকে ফেলবে দেখছি—”

সন্ন্যাসীরও বিপদেব অস্ত ছিল না। মন্দার মত দু'একটি বন্ধু ছাড়া তাহার অসংখ্য ভক্তও জুটিয়াছিল। সময়ে সময়ে তাহাদের ভক্তশ্রোত যখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত তখন সন্ন্যাসী প্রমাদ গণিত।

কিন্তু প্রকৃত বিপদ ছিল এই যে, ভক্তের প্রার্থনা প্রায় ঔষধ-ষাঙ্কাক্রমেই প্রকাশ পাইত। “সন্ন্যাসী ঠাকুর, আমার মেজবোমার হজম হয় না।” “আমার ছেলেটার পিলে হয়েছে”, “নাতিটা জ্বর-বিকারে মর মর”, “মেয়েটা কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছে” ইত্যাকার রোগের বিবরণ ও তাহার পর ঔষধ প্রার্থনা, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত—ইহার বিরাম থাকিত না।

সন্ন্যাসী বিস্মিত হইয়া ভাবিত, চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাহার এ অধিকার কবে হইতে!

এতগুলো লোকের বিশ্বাস সে কেমন করিয়া বিনা প্রমাণে জন্মাইয়া দিয়াছে! এবং এ বিশ্বাসের মূলই বা কি?

সে কিছুতেই ঔষধ দিতে সন্মত হইত না, কিন্তু ভক্তেরা নাছোড়বন্দ। অগত্যা প্রত্যেক প্রার্থীকেই একটু করিয়া হোমের ভস্ম দিয়া তুষ্ট করিতে হইত।

তাহার ফল এই হইত, যাহারা বাঁচিবার তাহারা বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু ইহাতেই সন্ন্যাসীর খ্যাতি বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল, এবং ঔষধ-প্রার্থীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া চলিল।

কিন্তু সব চেয়ে বড় বিপদ হইয়াছিল, মন্দাকে লইয়া। সে এমন করিয়া হৃদয়কে অভিভূত করিয়া দেয় কেন,—সন্ন্যাসীর কঠিন প্রাণকে এমন করিয়া স্নেহ-কোমল প্রেম-আর্দ্র করিয়া দেয়, কিসের মোহে! ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে চোখের সন্মুখে ভাসিয়া উঠে মন্দার মুখ; মন সমস্ত দিন উন্মুখ হইয়া থাকে, মন্দার লঘু-পদ-শব্দের প্রতীক্ষায়! সংসারের মায়া কাটাইয়া এ কি মায়াবিনীর মোহ-পাশে আজ নূতন করিয়া বন্ধন!

দুই হাত জোড় করিয়া সে কহে “দেবতা আমার! যেমন করিয়া আমাকে সেবার সংসার হ’তে মুক্তি দিয়েছিলে, তেমনি করে এ নতুন বন্ধন কেটে দিয়ে আমাকে তোমার পায়ের তলায় নিয়ে চলো!”

সন্ন্যাসীর চারিপার্শ্বে দেশের লোক যে বিরক্তি এবং মন্দা যে আকর্ষণ গড়িয়া তুলিয়াছিল, সন্ন্যাসী একদিন স্থির করিল তাহা হইতে আপনাকে সেই রাত্রে সে মুক্তি দিবে।

কিন্তু মন্দা ! হু'দিন মন্দা আসে নাই,
তাই তাহার জন্ত প্রাণ ছটফট করিয়াছে !
কেন ? আজ রাত্রে সে মুক্ত হইবে, বন্ধনহীন
হইবে—তবে আর কাহার জন্ত চিন্তা ।
সে আজ চিত্ত দৃঢ় করিয়াছে !

কিন্তু হায়, তবু মন বণে, মন্দা !

৬

সন্ধ্যার সময় বন্দনা শেষ করিয়া সন্ন্যাসী
বসিয়াছে । আজ গভীর রাত্রে সে ললিতর্গা
ত্যাগ করিবে ।

এমন সময় মন্দার ঠাকুমা আসিয়া প্রণাম
করিল, “ঠাকুর, মন্দার বড় অসুখ করেছে,
একবার তাকে দেখবেন চলুন ।”

সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিল, “মন্দার অসুখ—
কি অসুখ ?”

“বসন্ত হয়েছে ।”

সন্ন্যাসী কাঠের মত বসিয়া রহিল । এ কি
পরীক্ষা ! আজ সে যখন সমস্ত বন্ধন ছিন্ন
করিতেছিল, তখন সব চেয়ে কঠিন বন্ধনের
কি এ নিদারুণ আকর্ষণ ! মন্দা তাহার
কেহ নয়, বিশেষ সে চিকিৎসক নহে, কি হবে
মন্দাকে দেখিয়া ? আর নহে, আবার নুতন
করিয়া সে ধরা দিতে রাজী নহে ।

“আমি গৃহীর বাড়ীতে যাই না ত
আপনাকে আমি এই ছাই দিচ্ছি, এতেই
ভাল হবে ।”

বৃদ্ধা অনেক অনুনয় করিল, কহিল,
“ঠাকুর তোমারই কাছে সে আস্ত, এখানেই
কি অপরাধ করে সে রোগগ্রস্ত হয়েছে,—
তুমি দয়া করলেই সে মেরে উঠবে—
একটিবার চলো ।”

সন্ন্যাসী কহিল, “না”—

৭

হোমের আগুণ নিভিয়া গিয়াছে—এইবার
গ্রাম ত্যাগ করিবার সময় আসিয়াছে ।
অদূরে মন্দাদের বাড়ী, একটা ঘর হইতে
আলো আসিতেছিল—বোধ হয়, ঐ ঘরে
মন্দা আছে ।

সেই দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসীর চোখে
জল আসিল,—কিন্তু না !

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে উঠিল, এইবার সে
ললিতর্গা ও তাহার স্মৃতির সহিত সমস্ত সম্বন্ধ
শেষ করিবে ।

এমন সময় কুটিরের দ্বারে একজন
স্ত্রীলোক আসিয়া দাঁড়াইল,—বস্ত্রে সমস্ত
দেহ সংবৃত, মুখ খোলা ।

বিস্মিত সন্ন্যাসী কহিল, “কে ?”

সন্ন্যাসীর পায়ে মাথা রাখিয়া সে কহিল,
“কমলা—”

মুহূর্ত্তে সন্ন্যাসী দশ হাত সরিয়া গেল,—
ক্ষীণ আলোকে একবার মুখখানা দেখিয়া
লইল—“কমলা ?”

বোধ হয় দাঁড়াইবার ক্ষমতা লোপ পাইয়া-
ছিল—সন্ন্যাসী বসিয়া পড়িল । “এ কি ?”

তুই পা বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া কমলা
কাঁদিতে লাগিল “এক মুহূর্ত্তের দুর্বলতা
আমাকে কি পাপের মাঝখানে এনে ফেলেছে
—তা তোমাকে কি বলব ? তোমার সমস্ত
হোমাগ্নির দাহর চেয়ে তীব্র জ্বালা আমাকে
দিনরাত্রি পুড়িয়ে মারচে—উপায় নেই,—
উপায় নেই—”

সন্ন্যাসী পা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল
—“আমাকে স্পর্শ করোনা—”

কমলা ফুঁ গাইয়া কাঁদিতে লাগিল ।

“তোমাকে ছেড়ে এসে অবধি কি চিত্তার আশ্রমে আমি পুড়ি তা বলতে পারবো না। সারাজীবন তেমনি পুড়তে হবে; তোমার পায়ের তলায় আজ এক মুহূর্তের জন্য তার বিরাম হয়েছে,—দয়া করো, এই এক মুহূর্তের জন্যে আমাকে বঞ্চিত করোনা,—তুমি দেবতা, তোমার স্পর্শ আমাকে ভিক্ষা দাও!”

সন্ন্যাসী কহিল, “আমি এখন এ গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাব—”

কমলা কহিল “তবে বিলম্ব কবোনা— আমার ক্ষমা নেই, আমার অনন্ত নরক, অনন্ত দাহ, জানি, কিন্তু তোমার ঐ ছোট মেয়ে মন্দা, সেই তোমার একমাত্র স্মৃতি, যাকে বুক করে তোমাব কথা মনে করে, প্রাণ জুড়োই,— তাকে তুমি বাঁচাও, তুমি মনে করলে, তুমি দয়া করলে সে নিশ্চয় বাঁচবে। একমাসের মেয়ে,—তাকে কোলে করে আমি বেরিয়ে ছিলাম—”

সন্ন্যাসী ব্যগ্রভাবে কহিল, “চুপ কর, চুপ কর, সে কাহিনী শুনে, বাতাস নিশ্চল হবে, গাছপালা শিউরে উঠবে!”

সন্ন্যাসীর পায়ে মাথা রাখিয়া কমলা কহিল, “তবে থাক। কিন্তু তুমি চলো—তাকে বাঁচাও, দয়া করো, দয়া করো।”

যন্ত্রচালিতের মত সন্ন্যাসী কহিল, “চল”।

৮

মন্দার মাথার শিয়রে আসিয়া যখন সন্ন্যাসী বসিল, তখন মন্দার ঠাকুমা কহিলেন, “ঠাকুর, আমার প্রার্থনা শুনে অবশেষে যে তুমি মন্দাকে দেখতে এসেছ, এতেই আমার মনে হচ্ছে, মন্দা নিশ্চয় বাঁচবে।”

সন্ন্যাসী কহিল, “বাঁচবে বৈ কি—বাঁচবে।

ভেবেছিলাম আস্বনা—কিন্তু মন্দাকে না দেখে থাকতে পারলাম না—”

ঠাকুমা কহিলেন, “তার ওপর এই দয়া চিরকাল রেখো, ঠাকুর।”

সে কি অক্লান্ত সেবা! দিন এবং রাত্রির মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়া গেল—বিনিদ্র, নিরলস ভাবে সন্ন্যাসী সাতদিন মন্দার মাথার শিয়রে কাটাইয়া দিল। যে রাত্রে মন্দাকে সে দেখিতে আসে,—সে রাত্রের কথা একটা স্বপ্ন-কাহিনীর মত, ঐ ছোট মেয়ে মন্দা, যে আজ ব্যাধির প্রকোপে সংজ্ঞাহীন, সে তারই, সে সেই ছোট একমাসের মেয়ে, যে তার ক্রোড়-চ্যুত হয়েছিল! তার ব্রণাক্ত অধরে সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে চুশ্বন দান করে,—সেবার মধ্যে দিনরাত্রি প্রার্থনা কবে, “হে ঠাকুর মন্দাকে বাঁচাও, পতিতার, আশ্রয়হীনা কলঙ্কিনীর সেই একটি মাত্র শীতল সান্ত্বনা, একটিমাত্র স্মৃতি! তাকে ফিরিয়ে দাও!”

সাতদিনের পর যখন মন্দা রোগমুক্ত হইল, তখন সন্ন্যাসী বলিল, “এখন তবে যাই!”

ঠাকুমা কহিলেন, “ঠাকুর আপনাকে কি বলব, কি দেবো, জানিনে! আপনি দেবতা।”

সন্ন্যাসী কহিল, “আমাকে আর কিছু দিতে হবে না, শুধু মুক্তি দিন, আর আবার যদি কখনও ফিরি, মন্দাকে দেখতে দেবেন।”

ঠাকুমা কহিলেন, “মন্দা ত ঠাকুর, আপনাই! আপনি তার প্রাণ দিয়েছেন, সে আর আমাদের নয়। তাকে দেখতে ইচ্ছে কলেই দেখতে পাবেন—এ ত ছোট কথা!”

বিদায়ের সময় মন্দাকে বৃকের মধ্যে লইয়া সন্ন্যাসী বার-বার আদর করিতে লাগিল—

ছাড়িতে ইচ্ছা করে না,—তার পর অশ্রুজল
রোধ করিয়া সহসা অস্তিত্ব হইল !

১০

৯

ললিতগাঁ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী বাহির
হইল,—সমস্ত অঙ্গে নিদারুণ বেদনা ! সাত দিন
ও রাত্রির পরিশ্রমের জন্ত শরীরটা বড়ই অসুস্থ
বোধ হইতেছিল—তবু আর একদণ্ড থাকিবে
না । স্মৃতি আবার তাহার ভাগ্যে সত্যরূপ
ফিরিয়া আসিয়াছে এবং বন্ধন আরও দৃঢ় হই-
য়াছে—স্মৃতির আর না !

ললিতগাঁ হইতে সে বেশী দূর হইবে না,
এক ক্রোশের মধ্যেই,—ততদূর গিয়া আর
চলিতে পাবিল না, একটা গাছের তলায়
সন্ন্যাসী বসিয়া পড়িল ।

কেন, এমন হইল ? আপনাব দেহের দিকে
চাহিয়া সন্ন্যাসী দেখিল, বসন্ত-গুটিকায় সমস্ত
দেহ ভরিয়া গিয়াছে !

চোখ বুজিয়া সন্ন্যাসী ভাবিল, “আঃ—এই
ত ভাল ! আমার মত অভাগাব মৃত্যু লোকা-
লয়ে শোভা পেত না, তাই ভগবান মনুষ্যের
সম্পর্ক থেকে দূরে এইখানে আমাকে এনে
ফেলেছেন ! এখানকার মুক্ত বাতাস, গভীর
স্তব্ধতা, এই ত সন্ন্যাসীর মৃত্যুর উপযোগী !”

গাছের একটা শিকড়ে মাথা রাখিয়া
সন্ন্যাসী শয়ন করিল ।

নিদ্রার মধ্যে, চেতনা-হীনতার মধ্যে একটি
মাত্র মুখ ভাসিয়া উঠে, সে মন্দার ! সেই
একমাসের ছোট মেয়ে মন্দার, তাহার স্নেহ-
ময়ী জননীর ক্রোড়-শায়িতা মন্দার, আটবৎসর
পূর্বেকার লতাপাতাঘেরা আনন্দ ও
প্রেমোজ্জ্বল গৃহের মন্দার !

কতদিন এমন ভাবে কাটিয়াছিল স্থির
নাই । যে দিন সন্ন্যাসী চোখ খুলিল, সেদিন
তাহার মুখে মৃত্যুর ছায়া স্ননিবিড় হইয়া
আসিয়াছিল ।

একটা গরুর গাড়ী যাইতেছিল, গাড়োয়ান
সন্ন্যাসীকে দেখিয়া নামিয়া আসিল । ভাল
করিয়া দেখিয়া চিনিল, ললিতগাঁর সেই
সন্ন্যাসী যে তাহার প্লাহা আরাম করিয়াছিল ।

হাতজোড় করিয়া সে কহিল, “ঠাকুর
আপনার এ দশা কেন ? আপনার জন্তে
আমি কি করতে পারি ?”

সন্ন্যাসী কহিল, “দয়া করে যদি একটি
কাজ কবো । তোমাব ঐ গাড়ীতে আমাকে
একটু জায়গা দিয়ে ললিতগাঁর বিপিনবাবুর
বাড়ীতে পৌঁছে দাও—একবার মন্দাকে
দেখতে ইচ্ছে হয়েছে ।”

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে গাড়ী আসিয়া দাঁড়া-
ইল । অতি ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে নামিয়া
সন্ন্যাসী বোয়াকে উপবেশন করিল ।

ভাল আওয়াজ বাহিব হয় না,—কম্পিত-
কণ্ঠে সন্ন্যাসী ডাকিল, “মন্দা--ও মন্দা—”

শুনিয়া মন্দার ঠাকুমা মুখ বাড়াইলেন,
“ওমা সন্ন্যাসী ঠাকুর যে ! বসন্ত হয়েছে
দেখছি—এমন অবস্থায় এখানে এলেন কেন,
—ছেলেপুলের বাড়ী—”

সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে কহিল, “একবার মন্দাকে
দেখতে এসেছি—”

ঠাকুমা স্বর উচ্চ করিয়া বলিলেন, “না,
না, সে কাহিল, এখন সে উঠতে পারবেনা,—
তাকে এখন দেখা হতে পারে না—”

গোলমাল শুনিয়া বিপিনবাবু বাহিরে আসিলেন, “কি হয়েছে?”

তাহার মাতা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “একবার মন্দাকে ত ঐ অস্থানে ফেলেছিলেন, আবার এই অবস্থায় তাকে দেখতে চান,— কেন, বাপু, তার ওপর এত নজর—”

বিপিন বাবুর দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী কহিল, “মরবার আগে একটবার শুধু চোখের দেখা দেখব—দয়া করুন—”

ধীরে ধীরে সন্ন্যাসী রোয়াকে শুইয়া পড়িতেছিল।

বিপিনবাবু ক্রোধের ভরে বলিলেন, “না— না, তা হবে না। মন্দা, মন্দা, সমস্ত দিন শুধু মন্দা, মন্দার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ—?”

সন্ন্যাসী উল্লে চাহিল, “তিনি জানেন!”

আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বিপিনবাবু কহিলেন, “যাও, যাও, ও সব হবে না বলছি, আমার বাড়ী থেকে বেরোও—”

চোখের জল বাধা মানিল না। “এক-বার, একটবার, শুধু—তারপর চলে যাবো—”

ক্রোধের তখন পরিসীমা ছিল না, বিপিন-বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “তবু যাবে না—

দারোয়ান, এই পাগলটাকে ‘গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দে!’”

শুনিয়া সন্ন্যাসী দুই হাতের উপর ভর করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল,—অবলম্বনহীন মস্তক দুই হাতের মাঝখানে ঝুলিয়া পড়িল,— তবু সে চেষ্টা করিতে লাগিল,—এবং অদূরে দরোয়ান আসিয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় মন্দার হাত ধরিয়া মন্দার মা সেই কোলাহলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসীর শির আপনার কোলের উপর রক্ষা করিয়া তাহাকে শয়ন করাইল, তাহার মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া নিশ্বাস-সৌরভে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া লইল, এবং তাহার ব্রণাক্ত কপোলে বারবার চুম্বন দান করিয়া কহিল, “ঐ এসেছে, তোমার মন্দা এসেছে,— আমি তাকে এনেছি—”

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে চোখ খুলিয়া কমলার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর মন্দার হাত আপনার বুকের মধ্যে টানিয়া আবার চোখ বুজিল।

বিস্মিত দর্শকের দল নিম্পন্দ নির্ঝাঁকভাবে চাহিয়া রহিল।

শ্রীগিরীজনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

জাপানের সহর।

যখন আমরা জাপান যাই তখন মনে করিয়াছিলাম যে তথায় কলিকাতার চেয়েও কত বড় বড় হর্ষ্যামালাশোভিত নগর দেখিতে পাইব। হয়ত কত গগনভেদী অক্টারলোনী মনুমেন্ট জাপানের নব উচ্চতালাভের পরিচয় প্রদান করিতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; হয়ত

লাটভবন, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ প্রভৃতির ঞায় কত বড় বড় মনোহর প্রাসাদশ্রেণী দর্শকের দৃষ্টি স্তম্ভিত করিয়া দিতেছে! যে জাপান বাস্তবিকই কৃষিয়ার ঞায় একটি ইউরোপের অতি প্রধান শক্তিকে জলে স্থলে পরাভূত করিল, অট্টালিকাগোরবে ইয়োরোপের কোন

সহরের অসমতুল্য হইবে না ইহাই আমরা কল্পনা করিয়াছিলাম। যখন আমাদের জাহাজ ইয়োকোহামা বন্দরে পৌঁছিল এবং সিঙাপুর ছাড়িয়া আমরা ঠিক দুই সপ্তাহ পরে লোকালয়ের দর্শন লাভ করিলাম তখনও জাপানের সহর সম্বন্ধে একেবারে নৈরাশ্রো নিমজ্জিত হই নাই। প্রকাণ্ড ইয়োকোহামা সহর দেখিয়া মনে করিলাম রাজধানী তোকিও সহর নিশ্চয়ই ইহার চেয়ে অধিক জঁকাল এবং জাতীয় ঐশ্বর্য্য-জ্ঞাপক! কিন্তু যখন তোকিও সহরে গিয়া পৌঁছিলাম, তখন পূর্বকল্পনা লোপ পাইতে লাগিল। কয়েকদিন সহরের আত্মস্থ খুঁজিয়াও চোরঙ্গী, গড়ের মাঠ, ডালহৌসী-স্কোয়ার প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাইলাম না, আর সে মাড়োয়ারীদের অত্যাচ আকাশস্পর্শী হর্ম্য্যরাজিও দেখিতে পাইলাম না। পক্ষান্তরে দেখিতে পাইলাম বাড়ী ঘর ছোট হইলেও বেশ পরিষ্কার ঝকঝকে, রাস্তা ঘাট তুলিতে অঙ্কিত চিত্রপটের স্থায়। দিনান্তে সন্ধ্যাবেলায় পালিয়ার্মেন্টের মেম্বর, লর্ড, রাজমন্ত্রী, ক্রোরপতি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত দীন-দরিদ্র মুটে মজুরও সমভাবে ইডেন গার্ডেনে আনন্দ উপভোগ করিতেছে। সেখানে ইডেন-গার্ডেন নামে কোন গার্ডেন না থাকিলেও সেইরূপ গার্ডেন এবং পার্ক অনেক আছে। সকলেই এক আসনে উপবেশন করিয়া আলাপ করিতেছে; এবং একই মঞ্চে দাঁড়াইয়া দেশের কথা, দেশের কথা এবং প্রকৃতির কথা আলোচনা করিতেছে। আর এক বৈশিষ্ট্য, সহরের ভিতর ছোট বড় অধিকাংশ বাড়ীতে এবং দোকানে ছোটখাট খরগের কোন জিনিষ প্রস্তুতের কারখানা; আর

দেখিলাম সহরতলীর চারিদিকেই সারি সারি বড় বড় ফ্যাক্টরীর অসংখ্য চিম্নির ধূম মেঘের স্থায় সূর্য্যরশ্মি-বিকাশ প্রতিবন্ধক জন্মাই-তেছে। রাস্তাঘাটে লোকজন কলের মত দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিয়া কাজ করিতেছে। নিভৃত পল্লীগ্রামের লোক কলিকাতায় গিয়া রাস্তায় লোকজনের ক্রততা দেখিয়া যেমন অবাক হয় তেমনি কলিকাতার লোক জাপানের এই অতিস্ফূর্তিময় ভাব দেখিয়া অবাক না হইয়া থাকিতে পারে না।

কলিকাতার রাস্তায় দলে দলে লোক ছোট্টে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোকের বদনমণ্ডলে যেন বিধাদের ছায়া প্রকটিত। যাহারা ভদ্রসন্তান এবং যাহাদের উদরানের কথঞ্চিৎ সংস্থান আছে তাঁহারাও উপর-ওয়ালার তাড়না ও গজনার ভয়ে বিষন্ন স্ফূর্তি-হীন মনে আফিসপানে ছুটিতেছে। স্কুল কলেজের ছেলেরাও যেন গারদে বা মসানে যাইবার পথে থরথর করিয়া চলিতেছে। এই স্থলে কবিবর নবীনচন্দ্রের একটি কথা মনে পড়িল। তিনি এক জায়গায় লিখিয়াছেন “আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় করালবদনী নৃমুণ্ড-মালিনী কালিকাদেবীর স্থায় পরীক্ষারূপ তরবারি দ্বারা সহস্র সহস্র সবলপ্রকৃতি তরুণ যুবকদের মস্তক ছেদন করিতেছে।” তারপর অপর সাধারণ উদরান্দিষ্টাভারগ্রস্ত হইয়া যেন চক্ষে সন্নিধাকুল নিরীক্ষণ করিতে করিতে চলিয়াছে। ভাবনার সকলেরই স্বাস্থ্য বসিয়া গিয়াছে, হৃদয় দমিয়া পড়িয়াছে। আর জাপানের রাস্তায় সকলকেই যেন রাম-মূর্তিবৎ দেখিতে পাইলাম। যেমন হৃষ্টপুষ্ঠ শরীর, তেমনি বদনমণ্ডলে স্ফূর্তি সংজ্ঞাপক

ভাব। অল্প চিন্তা কাহার নাই? কিন্তু তাহাই তাহাদের প্রধান চিন্তা নহে, জীবনের কর্তব্য সাধনে সকলেই ব্যস্ত। পশুর তায় শুধু উদরার সঙ্স্থানে মনুষ্য সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, অত্যাণ্ড জন্তুর চেয়ে তাহাদের জীবনের অপর কর্তব্য আছে। তাই তাহারা স্ত্রী পুরুষ সকলেই রাস্তায় ঘাটে কলের তায় দ্রুতভাবে কর্তব্য সাধনে ব্যস্ত।

জাপানী সহরের ঘরদরজার দিকে তাকাইয়া দেখিলাম উহা কত সামান্য ধরণের। কাষ্ঠ নির্মিত একতলা কি দোতলা—বড় জোর কচিং দুই একটা তিনতলা দালান দেখিলাম। ইয়োকোহামা এবং কোবে সহর দুটা সমুদ্র-তীরস্থ বড় বন্দর। এই দুই সহবেই বৈদেশিক বণিকদের অত্যন্ত বড় বড় আমদানী রপ্তানীর কারবার রহিয়াছে। তাই এ সহর দুটা অনেকটা ইউরোপীয় সহর অর্থাৎ কতকটা কলিকাতার ধরণের। তোকিও সম্পূর্ণ জাপানী সহর। ইয়োকোহামা এবং কোবে বাদে অত্যাণ্ড সকল সহরই জাপানী সহর। জাপানী সহরে নীরস কৃত্রিম সৌন্দর্যের পরিবর্তে মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরই প্রাবল্য অধিক। সহরের ভিতর কত পার্ক, গাছপালা এবং বাগান। অনেক সহরের ভিতর ছোট ছোট পাহাড় এবং হ্রদ ও সরিৎ অনির্কর্ষচনীয় সৌন্দর্যে ভরিয়া রহিয়াছে। আবার জাপানের অধিকাংশ প্রধান প্রধান সহরের পাদদেশই প্রশান্ত মহাসাগরে বিধৌত হইতেছে, বাস্তবিক জাপান যেন প্রকৃতি দেবীকে আয়ত্তাধীন রাখিবার জন্ত নানা প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; প্রকৃতি দেবীও প্রিয় সন্তানগণের মনস্তপ্তির জন্ত প্রতিনিয়ত তাহা-

দের সম্মুখে নানারূপ বেশভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া বিরাজিত। জাপানীরা গাছপালা, লতাপাতা, ফুল প্রভৃতির যেরূপ সমাদর করিয়া থাকে পৃথিবীর অন্য কোন জাতি তেমন করে কিনা জানি না। তাহারা সহরের নীরস ক্ষেত্রকেও কুঞ্জবনে পরিণত করিয়া তাহাতে বাস করে, প্রায় সকলের বাড়ীর সম্মুখেই অস্ততঃ ছোট একটা বাগান আছে। তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে বাগানের স্থান নাই তাহারা কতকগুলি টবের সাহায্যে বারেন্দায় অতি ক্ষুদ্র একটা বাগান রচনা করিয়া রাখে।

জাপানে যে সহরের লোক-সংখ্যা বিশ হাজারের উপর তাহাকে সি অর্থাৎ নগর এবং তন্নিম্নে মাচি অর্থাৎ সহর বলা হয়। ক্ষুদ্র দেশের তুলনায় জাপানে নগরের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। উত্তর দক্ষিণে প্রায় বারশত মাইলের মধ্যে অধিকাংশ প্রধান সহরই আমি দেখিয়াছি। তন্মধ্যে তোকিও, ওমাকা, কিওতো, কোবে, নাগোইয়া, ইয়োকোহামা, ছেনদাই, মোরি-ওকা, আওমোরি হাকোদাতে, ওতারু, ছাপ্পোরো, ইয়োকোমুকা এবং মোজি বিখ্যাত। নাগামাকি, হিরোমিমা এবং ওকাইয়ামা সহরত্রয়ও বেশ কারবারী। স্থূল কথা একটা সহর দেখিলেই সকল জাপানী সহরেরই ধারণা করা যায়। জাপানে ৪৬টা জেলা সহর, উহার প্রত্যেকটির লোক সংখ্যাই প্রায় পঞ্চাশ হাজারের উপর। সংক্ষেপে রাজধানী তোকিও সহরের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রশান্ত মহাসাগরস্থ তোকিও উপসাগরের উপর সহরটি অবস্থিত। আয়তনে ৬৪ বর্গ মাইল। জাপান টাইম্‌স্‌ রিপোর্টে দেখিয়াছি আয়তনে তোকিও সহর পৃথিবীর মধ্যে সর্বো-

পেঙ্গা বড়; আর তোকিও সহরে দৈনিক তাড়িতের খরচ লগুন অপেক্ষাও অধিক। যুরিয়া ফিরিয়া সহরের কুলকিনারা ঠিক পাওয়াও মুশ্বিল। কাঠনির্মিত একতালা বাড়ীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; সহরের ভিতর কয়েকটি বড় বড় পার্ক আছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি পাহাড় আছে। এই সকল কারণে সহরটি অনেক জায়গা জুড়িয়া আছে। সহরের ভিতর দিয়া হুগলী নদীর চেয়ে কিঞ্চিৎ অল্প পরিসর বিশিষ্ট ছুমিদানদী প্রবাহিত। নদীর দুই তীরেই সহর। চারিটি সেতুর উপর দিয় লোকজন গাড়ী ঘোড়া এবং ট্রাম নদীর অপর তীরে যাতায়াত করিতেছে। ছুমিদানদীর ছোট ছোট শাখা সহরের ভিতরে চলিয়া যাওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। একখানি গ্রন্থে দেখিয়াছি এই সকল খালের উপর দিয়া চলাচলের সুবিধার জন্য তোকিও সহরে ছোট বড় অন্যান্য তিন সহস্র সেতু (bridges and culverts) রহিয়াছে। প্রতিদিনই সহরের চতুর্পার্শ্বের আয়তন বৃদ্ধি পাইতেছে। গত আদম সুমারীর পর লোকসংখ্যা বিস্তর বাড়িয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন এখন লোকসংখ্যা একুশ লক্ষের উপর, আমার মনে হয় বিশ লক্ষের কম নহে।

হিরিয়া, শিবা, উয়েনো, আছাকুছা এবং কুদান এই পাঁচটি পার্ক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্রাটের বাড়ী এবং হিরিয়া পার্কের মধ্যে কেবল পরিখা মাত্র ব্যবধান। এই পার্ক সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার পাশেই মিকাদোর বাড়ী, পার্লামেন্ট মহাসভার হাউস অব লর্ডস্ এবং হাউস অব কমন্স্,

এবং তোকিও সহরের গবর্নরের অফিস। নিকটেই সমরবিভাগের অফিস, চেম্বার অব কমন্স্, শিক্ষাবিভাগের অফিস, বড় বড় সংবাদপত্র অফিস, পিয়র্স ক্লাব; ইম্পিরিয়াল হোটেল, নিষ্টল ইউমেন কাইমা অপিস, সেন্ট্রাল ও শিম্বামৌ রেলওয়ে স্টেশন এবং বিখ্যাত গিজা স্ট্রীট। পার্কের ভিতরে স্থানে স্থানে বিশ্রামাগার এবং ভোজনালয় রহিয়াছে। রাস্তাগুলি ধবধবে; কোন যায়গায় ফুলের বাগান আবার কোথাও বা সুন্দর সুন্দর বৃক্ষশ্রেণী ও কুঞ্জবন। কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে নানা রঙের মৎস্য ক্রোড়া করিতেছে। ফোয়ারায় জল উঠিতেছে, কোথাও তালালে তালে ব্যাঙ বাজিতেছে। স্থানে স্থানে যুবকের দল জিমখানাতে ব্যায়াম করিতেছে। কোথাও ব্যাটবল খেলিতেছে। ব্যাটবল জাপানের প্রধান খেলা। ইহার আমেরিকা হইতে এই খেলার প্রবর্তন করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহা প্রধান খেলা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। আবার স্থানে স্থানে ছোট কৃত্রিম পাহাড়ের উপর বসিবার আসন রহিয়াছে, রাত্রিবেলায় তাড়িতালোকে উদ্ভাসিত পার্কটী নন্দনকানন বলিয়া মনে হয়। পরিষ্কার দিনে সন্ধ্যাবেলায় বিশেষতঃ বসন্তের সন্ধ্যায় বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। রুষ জাপান যুদ্ধের সময় যখন প্রায় প্রতিদিনই নূতন নূতন জয়ের সংবাদ আসিতেছিল, পার্কে দিন রাত সমভাবে আনন্দের ছড়াছড়ি চলিত। আমরাও কোন কোন দিন সে আনন্দে যোগ দিতাম। পার্কের চারিদিকেই প্রাতে ৫টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত ট্রাম চলিয়া থাকে।

হিরিয়ামা পার্ক হইতে অর্ধমাইল দূরে শিবা পার্ক, দুই মাইল দূরে উয়েনো পার্ক। শিবা পার্কে কতকগুলি অত্যাচ্চ প্রাচীন বৃক্ষ আছে। ক্ষুদ্র পাহাড়ের একটি স্থান বেশ উঁচু। তাহার উপর একটি ধ্যানস্থ দেবমূর্তি রাখিয়াছে। ঐ উচ্চ স্থানে উঠিলে অদূরে সমুদ্রের দৃশ্য এবং চতুর্দিকস্থ সহরের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। শিবাপার্কের দেব মন্দির

এবং নিকটবর্তী স্থায়ী প্রদর্শনী (কাঙ্কোবা) বিশেষ বিখ্যাত। শিবির দেব মন্দিরেই সব চেয়ে মূল্যবান প্রস্তর এবং ধাতব পদার্থ রহিয়াছে। সময় সময় সম্রাট এবং সম্রাট পরিবারের অন্ত্যন্ত ব্যক্তি তথায় গিয়া থাকেন।

উয়েনো পার্ক একটি দেধিবার জিনিস। উয়েনোপার্কের পাদদেশে হ্রদ। হ্রদ মধ্যস্থ দ্বীপের উপর বিখ্যাত বেস্টেন দেবী মন্দির,



উয়েনো পার্কের নিকটবর্তী হ্রদ।

বিশ্রামাগার, এবং দ্বীপে যাইবার রাস্তা। পার্কটি অত্যাচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। উহার একধারে একটি হ্রদ এবং দুই ধারে রেলের রাস্তা আর অপর পার্শ্বে পল্লী। হ্রদের চতুর্দিকে বেড়াইবার প্রশস্ত রাস্তা আছে। জুন মাসে হ্রদের ভিতর পদ্মফুল

ফুটিলে সৌন্দর্যের তুলনা থাকে না। প্রাতে ও সন্ধ্যায় লোকের ভিড় হইয়া থাকে। এই হ্রদের তীরে জয়মাল্যে ভূষিত প্রত্যাগত মার্শ্যাল ওইয়ামাকে অভ্যর্থনা করা হয়। সে দিন অবিরল বৃষ্টিপাতেও যেকোন লোক সমাগম দেখিয়াছি জীবনে কোন সমারোহ-ব্যাপারে

তেমনটি দ্বিতীয়বার দেখিব বলিয়া কল্পনাও করিতে পারি না। এই হ্রদের তীরেই যুদ্ধের পর জাপানের বিখ্যাত প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। যুদ্ধের পর ঐ রাস্তা হ্রদের অপর তীর পর্য্যন্ত প্রস্তব সেতুর সাহায্যে যোগ করা হইয়াছে। উয়েনো পার্কের গাছপালাগুলি বেশ বড় বড়, এখানে সাকুরা বা চেরি পুষ্পের সময় বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। চেরি পুষ্প সম্বন্ধে অল্প কোনো সময় লিখিবার আশা রহিল। পার্কের ভিতরে যাদুঘর; চিড়িয়াখানা, ২৫ ফিট উচ্চ

বুদ্ধদেবের মূর্তি, অনেকগুলি ধর্ম মন্দির, মৃত ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষার আঙ্গিনা, আর্টস্কুল এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী রহিয়াছে। প্যানোরামা মন্দির সর্বসমক্ষে রুঘ জাপান যুদ্ধের জীবন্ত দৃশ্য ধরিয়া আছে। পার্কের নীচেই প্রসিদ্ধ উয়েনো রেল স্টেশন। নিকটেই উয়েনো কাকোবা বা স্থায়ী প্রদর্শনী।

আছাকুছা পার্ক আমোদ-প্রমোদের প্রধান স্থল। তথায় পদস্থ ব্যক্তির ততদূর সমাগম দেখা যায় না। দিন রাত থিয়েটার সার্কাস, বায়োস্কোপ, পুতুল নাচ, পাখীর



ASAKUSA PARK TOKYO

水噴公園公草淺所若

আছাকুছা পার্ক।

গান, কুস্তি, জীবন্ত চিত্র টেলো, গেইসা নাচ, নানারূপ জুয়াখেলা, প্যানোরামা দৃশ্য প্রভৃতি দেখিবার জন্ম সকালে বিকালে কোন সময়েই জনস্রোতের বিরাম নাই। পরদিনে লোকে লোকারণ্য হইয়া

যায়। কারণ, ঐ দিন কল কারখানা অফিস প্রভৃতি বন্ধ থাকায় সকলেরই ছুটি। একটি পুকুরের চতুর্পার্শ্বে ঐ সকল আমোদ উৎসব হইয়া থাকে। ফোয়ারার পিছনে ক্ষুদ্র মন্দির, অদূরে প্রকাণ্ড এবং বুদ্ধদেবের

এক বিখ্যাত মন্দির। অনেক সময় স্ত্রীলোকে পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধার সংখ্যাই অধিক। সকলেই ভক্তিগদগদ চিত্তে হাত জোড় করিয়া নিবিষ্ট মনে পুরোহিত মহাশয়ের উচ্চারিত মন্ত্র শ্রবণ করিতেছেন। বলা বাহুল্য ঐ মন্ত্র স্ত্রীলোকদের কেন আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষেও বুঝিয়া উঠা মুষ্কিন; যেহেতু উহা পালি এবং হর্কোধ্য প্রাচীন জাপানী, কোরিয়ান এবং চীনা ভাষার সংমিশ্রণ। অনেক দিন কলেজের জাপানী বন্ধুদের সহিত আমি মন্দিরে গিয়া দেখিয়াছি ইঁহারাও সে মন্ত্র বোঝেন না। বৃদ্ধারা বুদ্ধদেবের সম্মুখস্থ অগ্নিপাত্রে ধূপ ধূনা নিক্ষেপ করিতেছেন, কেহ বা মোমের বাতি জ্বালাইতেছেন। কেহ কেহ পাইন-বৃক্ষের পল্লব, পুষ্প বিশেষতঃ পদ্মকুল ফলমূল, এবং নানারূপ মিষ্ট দ্রব্য অর্ঘ্য প্রদান করিতেছেন। এবং মাঝে মাঝে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া অস্পষ্টস্বরে কি বলিতেছেন। অনেকেই জানেন যে জাপানীদের নাক চেপটা। ধর্মমন্দিরের স্থানে স্থানে বুদ্ধদেবের যে মূর্তি প্রতিষ্ঠিত অনেককে তাহার নাকের সহিত নিজ নিজ নাক স্পর্শ করাইতে দেখিয়াছি। তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করার বৃদ্ধাদের নিকট শুনিয়াছি সমুদ্রত নাকের প্রত্যাশায় প্রাচীন কাল হইতেই জাপানীরা এইরূপ করিয়া আসিতেছে। ফলতঃ এই দাঁড়াইয়াছে যে ঘষিতে ঘষিতে বুদ্ধদেবের নাক একেবারে লোপ পাইয়াছে। এই মন্দিরের অনতিদূরেই জুনিকাই অর্থাৎ বারতালা উচ্চ স্তম্ভের গায় সঙ্কীর্ণ দালান বিশেষ! উহার উপর উঠিলে দূরবীক্ষণের সাহায্যে

তোকিও সহরের দৃশ্য অতি বিশাল দেখায়।

হিরিয়া পার্কের বিপরীত দিকে সম্রাটের বাড়ীর অপর পার্শ্বে কুদান পার্ক অবস্থিত। কুদান পার্কের ভিতর একটা মিউজিয়ম আছে। এখানে গত রুশ জাপান এবং চীন জাপান-যুদ্ধে লক্ক বন্দুক, কামান, তরবারি এমন কি সেনাপতির খাট ও বিছানাপত্র সর্বসাধারণকে দেখাইবার জন্ত সুন্দরভাবে সাজ্জত রহিয়াছে। পার্কের ভিতর প্রসিদ্ধ শিস্তো মন্দির। প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসে এই মন্দিরে মৃত সৈনিক পুরুষদের বার্ষিক শ্রাদ্ধ-উৎসব হইয়া থাকে। স্বয়ং সম্রাট সেনাপতিগণ সহ উপস্থিত থাকিয়া প্রথম দিন ক্রিয়া আরম্ভ করেন। তিন দিনে এই ব্যাপার শেষ হয়। দিবসত্রয় প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত সেই লোক-সমুদ্রে একবার শরীর ঢালিয়া দিলে যেন পদ-সঞ্চালনের দরকার হয় না; অনায়াসে পার্কের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে চলিয়া যাওয়া যায়। সে তিন দিন তথায় সার্কাস, থিয়েটার প্রভৃতির অবধি নাই। রাত্রে আতস বাজীর মহা ধুম। শোকে অভিভূত হওয়া জাপানে কাপুরুষতার লক্ষণ। মৃতব্যক্তির সদগতির জন্ত শ্রাদ্ধ দিনে বিশেষতঃ সৈনিকের শ্রাদ্ধে তাহার আমোদ উৎসব করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে অত্র কোন সময়ে বিস্তারিত লিখবার ইচ্ছা রহিল। শিস্তো মন্দিরের পশ্চাৎভাগে অত্রান্ত পার্কের গায় এ পার্কেও পুকুর ফোয়ারা, কুঞ্জবন প্রভৃতি যথেষ্টই আছে।

এই করেকটা উল্লেখযোগ্য পার্ক ছাড়া আরও ছোট ছোট পার্ক যথেষ্ট আছে।

অনেক ভক্তলোকের বাগানগুলিও কতকটা পার্কের অনুরূপে রচিত। তোকিও সহরের উশিগোম অঞ্চলে বোটানিকাল গার্ডেন আছে। জাপানের সহর গ্রাম সকলই গাছ-পালায় সজ্জিত বলিয়া সর্বত্রই যেন বোটানিকাল গার্ডেন। উশিগোমেব বোটানিকাল গার্ডেন, আমাদের শিবপুরের বোটানিকাল গার্ডেনের চেয়ে অনেক ছোট। আশ্চর্যের বিষয় জাপানের ছাত্রগণ এমন কি মেয়েরা এবং সাধারণ লোক পর্যন্ত অনেকে সাধারণ গাছ পালার বোটানিকাল শ্রেণী বিভাগ বেশ বুঝিতে পারে।

উয়েনো পার্কের ভিতর যে যাহুঘবের কথা উল্লেখ করিয়াছি উহাই জাপানের সর্বশ্রেষ্ঠ যাহুঘর। উহা আমাদের কলিকাতার যাহুঘর অপেক্ষা অনেক ছোট। কলিকাতার যাহুঘর পৃথিবীর মধ্যে একটা উল্লেখ যোগ্য যাহুঘর। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ব্রায়ান সাহেব উহাকে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান প্রদান করিয়াছেন। জাপানের প্রত্যেক জেলা সহরেই একটা করিয়া যাহুঘর আছে। এক তোকিও সহরেই বলিতে গেলে অনেকগুলি যাহুঘর। উয়েনোর ইম্পিরিয়াল মিউজিয়াম ছাড়া গবর্ন-মেন্টের কৃষি এবং বাণিজ্য বিষয়ক একটা মিউজিয়াম (নোশোমুখো) রহিয়াছে। তা ছাড়া সুন্দর সুন্দর প্রকাণ্ড বাড়ীতে সহরের স্থানে স্থানে কাকোবা নামক প্রদর্শনীর গ্রাম স্থায়ী বাজার প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত অসংখ্য দর্শক এবং ক্রেতাদের চিত্তাকর্ষণ করিতেছে।

প্রাচীনকাল হইতেই জাপানীরা সামরিক জাতি। আর পূর্বপুরুষদের প্রতি উহাদের অসাধারণ উচ্চবিশ্বাস এবং অচলা ভক্তি।

তাই যাহুঘরের দুই তিনটা ঘর কেবল প্রাচীন তরবারিতেই পূর্ণ। প্রাচীন ধনুর্বাণ প্রাচীন পোষাক, প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তি প্রভৃতিতে যাহুঘর সজ্জিত। আধুনিক কলা ও শিল্পবিদ্যা সম্ভূত জিনিসপত্র তথায় অতি অল্প। সে সমস্ত রাস্তাঘাটে ও হাটে-বাজারে সর্বত্রই দৃষ্টব্য। একস্থলে দুই ব্যক্তির জীর্ণ বস্ত্র এবং টুপি আর তাঁহাদের তৈল চিত্র অতি সমৃদ্ধ রক্ষিত হইয়াছে। উহারা উভয়ে ইউরোপে গিয়া সর্ব প্রথম খনিজবিদ্যায় ব্যাপ্তি লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাভর্তন করেন এবং খনিতে কাষ করিতে করিতে পাথরের চাপে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাই জাতীয় সম্মান প্রদর্শনের জন্ত উহাদের স্মৃতি সাধারণের সমক্ষে সমৃদ্ধ রক্ষিত হইয়াছে।

আমাদের কোন ভারতীর বন্ধু বলিয়াছেন, ভারতের তুলনায় জাপান অতি ক্ষুদ্র দেশ অথচ পৃথিবীতে এমন কিছু নাই যাহা জাপানে নাই! তাই সমগ্র জাপান দেশকে একটা বড় আকারের যাহুঘর মনে করিলেও চলে। সহব কিম্বা গ্রামে পুকুরের সংখ্যা অতি অল্প; নাই বলিলেও চলে। কোন কোন বন্ধু বলেন একে ক্ষুদ্র দেশের ৮৪ ভাগ পাহাড়ে আবৃত তাহার উপর যদি পুকুর খনন করা যায় তবে কৃষি করিবে কোথায়!

মিউজিয়ামের অনতিদূরে পার্কের ভিতরই চিড়িয়াখানা। চিড়িয়াখানায় জীবজন্তু অধিকাংশই বিদেশ হইতে আনীত—যেহেতু জাপানে জীবজন্তুর বৈচিত্র্য এবং সংখ্যা অতি অল্প। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, বানর, ভল্লুক প্রভৃতি গ্রীষ্ম প্রধান দেশ হইতেই আমদানী করা হয়। শকট পরিচালন এবং কৃষি-

কার্যের জ্ঞান গরু এবং ঘোড়া ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে আনীত হইয়া থাকে। সমগ্র জাপানে তিনটা বই হাতী নাই। আমাদের আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখিলে আর জাপানের চিড়িয়াখানায় দেখিবার উপযোগী কিছুই থাকে না। সময় সময় দুই একটা বিশেষ শ্রেণীর জাপানী মোরগ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের পুচ্ছ ১২।১৪ হাত লম্বা। ঐরূপ এক একটা মোরগের দাম নাকি চারি পাঁচ শত টাকা।

তোকিও সহরে বৌদ্ধ ও শিন্তো মন্দিরের সংখ্যা নির্ণয় করা হুকুহ। সাধারণ পার্কে,

রাস্তার ধারে নদীর ঘাটে, পাহাড়ের উপর কত যে মন্দির তাহার ইয়ত্তা নাই। রাজপুতানায় বিকানীর রাজ্যে যেখানে সেখানে মন্দির; কিন্তু জাপানে মন্দিরের সংখ্যা তার চেয়েও ঢের বেশী। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বাড়ীতে অনেকের ঘরের মধ্যেও অতি ক্ষুদ্র আয়তনের একটা করিয়া মন্দির আছে। উহা কাঠে নির্মিত, অনেকটা আমাদের পাথুর খাঁচা বা পিঁজরার মত। প্রতিদিন তথায় ভাতের ভোগ দেওয়া হয় এবং সন্ধ্যায় মোমের বাতি জ্বালান হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীযত্ননাথ সরকার।

চয়ন । যবদ্বীপে ।

বুধবার—১২ ডিসেম্বর

আজ প্রাতে, ছয় ঘটকার সময়, হোটেলের সম্মুখস্থ উদ্যান হইতে একটি চমৎকার দৃশ্য আমার দৃষ্টিগোচর হইল; সম্মুখের সমভূমি হইতে কতকগুলি ক্ষুদ্র স্ফীতোদর পাহাড় উঠিয়াছে, উহাব উপর তেঙ্গেরেসের কতকগুলি গ্রাম; তাহার পশ্চাতে জলপ্লাবিত ধানের ক্ষেত বিকৃমিক করিতেছে; দক্ষিণে নীল সমুদ্র—পাতলা কুয়াসায় আচ্ছন্ন; বামে, ঈষৎ-ধূসরবর্ণের কুজ্জাটিকা-জাল প্রসারিত; তাহার পশ্চাতে, বিরাট-দর্শন কৃষ্ণবর্ণ কতকগুলি আগ্নেয়গিরি। বর্ষাকালে, প্রভাতেই কচিং-কখন এইরূপ প্রসারিত ভূখণ্ডের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

হোটেলের ঘোড়াগুলো সবই ভাড়া হইয়া গিয়াছে; তাই আজ ব্রোমায় যাওয়া হইল

না; কাল যাইব। আজিকার একটা দিন হাতে পাইয়াছি। এই অবসরে তোসারীর আশপাশগুলা পদব্রজে ভ্রমণ করিব। Ngadivono নামক একটি গ্রাম দেখিবার জ্ঞান একজন পাণ্ডা সঙ্গে লইলাম; কিন্তু এই পাণ্ডার পথ দেখাইবার ধরণটা অতি অদ্ভুত; রাস্তাব প্রত্যেক চৌমাথায় থামিয়া আমাকে একটা পথ নির্বাচন করিতে বলে এবং মালাই ভাষায় একটা লম্বা বক্তৃতা ঝাড়ে...হোটলে ফিরিয়া গিয়া, তাহাকে সেইখানে ছাড়িয়া দিলাম; আমি একলাই হাঁটিয়া চলিলাম।

পর্বতের সুঁড়ি পথগুলি ধরিয়া, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে বড়ই ভাল লাগে। এই সকল গ্রাম ছোট ছোট পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। তাহার

চারিদিকে বেড়ার ঘের; কোন কোন গৃহে
যে রূপ এক একটা তোরণ আছে, এই ঘেরের
মধ্যেও সেইরূপ একটা তোরণ আছে; এই
তোরণদ্বার আড়াআড়ি বাঁশ দিয়া নির্মিত।
এখানকার লোকেরা সমভূমির লোক হইতে
খুবই তফাৎ; ইহারা রুঢ় প্রকৃতি বলিষ্ঠ
পর্কতবাসী; উহাদের চালচলনে বেশ একটা
তেজ ও বীর্যের ভাব লক্ষিত হয়। ইহারা এই
গ্রামের চত্বরে গ্রীড়ামোদ করে। আমি
একজন অপূর্ব-ধরণের যুরোপীয়, পাণ্ডা না
লইয়া যেখানে-সেখানে ইচ্ছামত বেড়াইতেছি
—আমাকে দেখিয়া উহারা কিছুমাত্র ভয়
করিতেছে না। পাহাড়ের ধার দিয়া ছোট
ছোট রাস্তা গিয়াছে—সেই সব রাস্তা ধরিয়া
আমি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিতেছে।
ক্ষেতে যুরোপ-সুলভ শাকসজ্জি জন্মিয়াছে;
তাহার পর, কতকগুলি ভেরাণ্ডা, কতকগুলি
পর্নতুরু, কতকগুলি কলা-গাছ। আমাকে
দেখিয়া ভয়ে গণ্ডা-পাঁচ কেনারী-পাখী
তাহাদের ক্ষুদ্র পীত পক্ষ বিস্তার করিয়া

ঝাঁ করিয়া উড়িয়া গেল। একটা স্তূড়ি
পথের বাঁকে আসিয়া, একটা স্রোতোস্বিনী
পাইলাম। একটা দেশীয় তরুণী তাহার
জলে স্নান করিতেছে; আমাকে দেখিয়া
একটা চীৎকার শব্দ করিয়া, তাড়াতাড়ি
কাপড় পরিয়া, ছুটিয়া পলাইল; আর তাহাকে
দেখিতে পাইলাম না।

আমি তোসারীতে ফিরিয়া আসিলাম।
শাকসব্জি বহন করিয়া দুইজন কৃষক-রমণীও
সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। একটা
প্রকাণ্ড কালো প্রজাপতি উড়িতেছিল,—
উহারা আমাকে দেখাইল এবং মালাই ভাষায়
কি বলিতে লাগিল—আমি ফরাসী ভাষায়
বলিলাম এইরূপ পরস্পরের সহিত দুই চারিটা
কথার বিনিময় হইল, কিন্তু আমরা কেহই
কাহার কথা বুঝিলাম না। পরে, হঠাৎ এই
হাস্তজনক অবস্থাটা আমাদের হৃদয়ঙ্গম
হওয়ায় আমাদের ভারী মজা লাগিল,—
আমরা সকলেই এক সঙ্গে হাসিতে লাগিলাম।
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বন্দী।

২৪

বেলা দশটা বাজিয়াছে!

আমার মেরির কথা মনে পড়িতেছিল!
হা হতভাগিনী কণ্ঠা আমার, আর
ছয় ঘণ্টা পরে কোথায় এ পৃথিবী, কোথায়
আমি! হাঁসপাতালের টেবিলে একটা
কদর্য মাংসপিণ্ডের মত আমি পড়িয়া রহিব।
দেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া তবে তাহারা

আমাকে মুক্তি দিবে! তারপর সেই টুকরা-
টুকরা মাংস ও অস্থিগুলা ধরণীর কোলে
বিছাইয়া দিবে—তবে আমার ছুটি মিলিবে!
হায় মেরি, তোমার পিতার জীবনের
এ কি পরিণাম!

অথচ এখানে কেহ আমাকে ঘণার
চক্ষে দেখে না! করুণায় সকলের প্রাণ
ভরিয়া গিয়াছে! যত্ন বা সেবার এতটুকু

ক্রটি নাই! তবু আমাকে বাঁচিতে দিবে না!
করণা—কিন্তু এ কি নিশ্চয় তার বিধি!
আমাকে হত্যা করিবে—কিছুতে ছাড়িবে না!

বেচারী মেরি আমার। পিতার সে কি
ভালবাসা তোমাকে ঘেরিয়া রাখিয়াছিল,
তার সে কি মধুর চুম্বনে তুমি তৃপ্তি
পাইতে, তোমার ঐ কুঞ্চিত কেশের গুচ্ছে
মুহূ দোল দিয়া পিতা সে কি আদর করিত—
ফুলের মত তোমার কচি নরম মুখখানি হাসিতে
নিত্য ভরিয়া রহিত—স্নানন্দেব কলহাস্তে সারা
গৃহে সে কি বিচিত্র সঙ্গীতের স্বাক্ষর উঠিত,
তার পর নিদ্রার পূর্বে ছোট হাতছটিতে মুষ্টি
ভরিয়া পিতার সহিত বিধাতার বন্দনা-গীতে
যোগ দিয়া দিনেব সকল শ্রান্তি, সকল তাপ
ঘুটাইয়া দিতে—কি সে আবেগপূর্ণ আন্তরিক
আরাধনা! এমন সুখের স্বাদ আর কে
পাইয়াছে—কিন্তু হায়, আজ সে সব যেন স্বপ্ন!
হায় বালিকা, তেমন করিয়া তোমাকে বুকে
তুলিয়া কে আর অজস্র চুমায় তোমাব ছোট
মুখখানি ভরাইয়া দিবে—তেমন ভাল আর
কে বাঁসবে! সবার গৃহে ছোট ছেলে-মেয়ে
গুলি যখন সুখে-দুঃখে উৎসবে-আনন্দে
পিতার আদরে নাচিয়া মাতিয়া উঠিবে, তখন
তোমরা আঁখির কোণ শুধু জলে ভরিয়া
উঠিবে—গভীর বেদনার তাপে তোমার
ঢগঢগ মুখখানি শুখাইয়া যাইবে স্নান নেত্রে
সবার পানে চাহিয়াই তোমার দিন কাটিবে!
বৎসরের প্রথম দিনে না আছে কোন উপহার,
না আছে পিতার আদর! নাই, কিছু নাই,
হা রে অভাগিনী, স্নেহকান্দালিনী, তোমার
হৃদয় স্নেহের তৃষায় আকুল তৃষিত হইয়া
উঠিবে—কিন্তু তার পরিতৃপ্তির কোন

আশা থাকিবে না! পিতৃহারা অনাথিনী
মেরি!

জুরির দল একবার যদি আমার মেরিকে
দেখিত, তাহা হইলে এ মৃত্যুদণ্ড দিবার পূর্বে
আমার কথাটা একটুও বুঝি তারা বিবেচনা
করিত! তিন বৎসরের অবোধ সে বালিকা!
তবু তার সাক্ষ নেত্র দেখিয়া তাদের কঠোর
চিত্ত নিশ্চয় চঞ্চল হইত! সন্দেহ নাই, কোন
সন্দেহ নাই! আমার মেরি,—তার দুঃখ
দেখিলে কার না প্রাণ কাটিয়া যায়!

মেরি! যখন তার বয়স বাড়িবে, জ্ঞান
হইবে, সকল কথা বুঝিবার তার শক্তি হইবে,
তখন কোথায় আমি! সারা প্যারির একটা
কলঙ্কিত স্মৃতি মাত্র! আমার নামে তার
প্রাণ কি শিহরিয়া উঠিবে না! আমার
নামে জীবনের যত দুর্দৈব, যত লজ্জা,
নিমেষে তার অন্তরে কি জাগিয়া উঠিবে না!
লোকের ঘৃণায় তার সমস্ত জীবন কি এক
অসহ্য জ্বালায় ভরিয়া যাইবে! মেরি, আদারিণী
মেরি আমার—পিতার নামে একবিন্দু অশ্রুর
পরিবর্তে কি তোমার চক্ষু বীভৎস ঘৃণার
দাহ বর্ষণ করিবে! না, মেরি, না, একবিন্দু
অশ্রু দিও! শুধু একবিন্দু মাত্র! হা
ভগবান, আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি,
পাপ করিয়াছি যে, সমাজ আজ এমন একটা
শুক্লতর অপরাধ ও পাপে তার প্রায়শ্চিত্ত
করিতে বসিয়াছে!

আজিকার সূর্য্য যখন অস্ত যাইবে—
তখন কোথায় আমি! এ পৃথিবীতে সকল
অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছি! আজ আমার
জীবনের শেষ দিন! ইহা কি সত্য?
স্বপ্ন নয়?

বাহিরে অস্পষ্ট একটা কি কোলাহল! আমাদের মৃত্যু দেখিবার জন্ত সকলে বুঝি ছুটিয়া চলিয়াছে! কোতূহলী দর্শক, স্পর্ধিত প্রহরী, সজ্জিত আচার্য্য—আমাকে দেখিবার জন্তই সকলের এত আগ্রহ! মৃত্যু তবে সত্যই আজ আমাকে গ্রহণ করিবে! আমাকে—? যে আমি বসিয়া রহিয়াছি, নিশ্বাস ফেলিতেছি, দেখিতেছি, শুনিতেছি, বায়ু-স্পর্শ অনুভব করিতেছি—সেই আমি এখনই মরিব!

২৫

এ ব্যাপারখানা আমারো কিছু জানা আছে! প্লে দি গ্রীভের পাশ দিয়া যাইতে-ছিলাম—সে আজ বহুদিনের কথা! বেলা তখন এগারোটা বাজিয়াছিল! সহসা আমার গাড়ী থামিয়া পড়িল।

পথে বিস্তর লোক জমিয়াছিল। গাড়ীর মধ্য হইতে আমি মাথা বাহির করিয়া দেখি, আবালবৃদ্ধবনিতায় সারা পথ ভরিয়া গিয়াছে! নরশিরের সংখ্যা ছিল না! গৃহের প্রাচীর, বৃক্ষচূড়া কোন স্থান বাদ যায় নাই! এবং অদূরে উর্দ্ধে স্থাপিত—ফাঁসকাঠও দেখা যাইতেছিল! ফাঁসির সকল সরঞ্জামই প্রস্তুত ছিল!

আজও সেইদিন! কিন্তু আজ আমি দর্শক নই, আজ আমাকে দেখিবার জন্তই সেখানে তেমন লোক জমিয়াছে!

একটী রজ্জুকে অবলম্বন করিব—নিমেষে অমনি কি বিরাট অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে নামিয়া পড়িব! জমাট অন্ধকার! তারপর—

আঃ, একখণ্ড প্রস্তুত যদি কুড়াইয়া পাই,

ত তারি আঘাতে এখনি মস্তকটা চূর্ণ করিয়া ফেলি!

২৬

মার্জনা! ওগো, মার্জনা! আমায় মার্জনা কর! হয়ত আমি মুক্তি পাইব! রাজার প্রাণ করুণায় গলিবে—মার্জনার আজ্ঞা বহিয়া এখনি দূত ছুটিয়া আসিবে! শীঘ্র—শীঘ্র এসো! তখন এই সমস্ত অন্ধকার চকিতে মুছিয়া যাইবে—এবং কি সে তীব্র দীপ্ত মুক্ত আলোর রাজ্যে প্রবেশ করিব! জয়ের সে কি বিকট উল্লাসে সারা চিত্ত ভরিয়া উঠিবে!

আমায় প্রাণ ভিক্ষা দাও! ওগো, স্নেহমায়াতরা এমন সুন্দর পৃথিবী,—প্রাণ যে ছাড়িতে চাহে না! আমায় রক্ষা কর! ওগো, তপ্ত লৌহশলাকায় সর্বদেহ আমার বিধিয়া দাও—লোকালয়ে প্রবেশ করিতে দিও না—বিশ-বৎসর, পঁচিশ বৎসর জেলে রাখিয়া দাও, শুধু এই সূর্য্যের আলো আকাশ বাতাস হইতে বঞ্চিত করিও না—বন্দী যে, সে-ও চলে, দেখে, ভাবে, কথা কয়, সে-ও সুখী! শুধু এই প্রাণটা ভিক্ষা দাও,—আর আমার কোন প্রার্থনা নাই!

২৭

আচার্য্য ফিরিয়া আসিল। তাঁর পণিত কেশ, শাস্ত্র কথাবার্তা, নম্র প্রকৃতি। শ্রদ্ধার যোগ্য পাত্র বটে।

আজই সকালে আপনার সমস্ত জ্ঞান বন্দীর দলে তাঁহাকে বিতরণ করিতে দেখিয়াছি! কিন্তু আমার তাহাতে কি লাভ! তাঁর কথার দিকে আমার মনই ছিল না! বৃষ্টির জল মাশির গায় লাগিয়া যেমন ঝরিয়া পিছলাইয়া

যায়, আমার মনে লাগিয়া তাঁহার অমূল্য-
বাণীও তেমন পিছলাইয়া যাইতেছিল।

তবু তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণটা যেন জুড়া-
ইল! চারিধারে এই পুরুষ রুম্মতার মধ্যে
তিনি যেন কি এক আনন্দশ্রী বিকশিত
করিয়া দিলেন।

আমরা 'বসিলাম—তিনি চেয়ারে এবং
আমি আমার সেই জীর্ণ শয্যার উপর।

“ভাই!” তিনি কহিলেন—কথাটা আমার
হৃদয়ে বিধিল! তিনি কহিলেন, “ঈশ্বরে
তোমার বিশ্বাস আছে কি?”

আমি কহিলাম, “আছে।”

“এই যে উদার ক্যাথলিক ধর্ম—ইহাব
প্রতি তোমার ভক্তি আছে?”

আমি কহিলাম, “নিশ্চয় আছে।”

“তবে শোন।” আচার্য্য বলিতে লাগি-
লেন! কি বলিতেছিলেন তাহা আমার
মনে নাই, কতক্ষণ বলিতেছিলেন তাহাও
জানি না! আমি অন্তরিক্কে চাহিয়াছিলাম—
সহসা তিনি কহিলেন, “কি?” আমার চমক
ভাঙ্গিল। আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম। কহি-
লাম, “হুগ্ৰহ করে আমাকে একলা
থাকতে দিন। আমার কিছু ভাল লাগছেনা।”

“কখন আসব আমি, বল।”

“থবর দেব'খন।”

তিনি উঠিলেন, মৃদুকণ্ঠে কহিলেন,
“নাস্তিক।”

নাস্তিক! না—যতই কেন হীন হই না
আমি, তবু নাস্তিক নই! ভগবান জানেন
তাঁর প্রতি কি গভীর আমার বিশ্বাস! কিন্তু
এ আচার্য্য আর নূতন এমন কি কথা বলিবে!
আমার সংস্কৃত আত্মা যাহ! পাইয়া পূর্ণ তৃপ্তি

পাইবে, তাহা দিতে ইহার সামর্থ্যই বা
কোথা? কতকগুলি বাঁধা গৎ বকিয়া শুধু
অস্থির করিবে মাত্র!

খুনী ও ডাকাতির সম্মুখে মুখস্থ বিদ্যা জাহির
করা যাহার পেশা, ফুরুর আত্মাকে শাস্তি
দিবার চেষ্টা করা, তার পক্ষে ধৃষ্টতা! ভগ-
বানের নাম লইয়া কি এ শ্ব-বৃত্তি? বিধাতার
নামে এমন পরিহাস! অখণ্ড ইহাই রাজধর্মের
অনুমোদিত হইয়া কতকাল ধরিয়া চলিয়া
আসিতেছে! আশ্চর্য্য!

কিন্তু এই বৃদ্ধ আচার্য্য! ইহারই বা
দোষ কি? কি তার শিক্ষা, কি তার জ্ঞান?
তুচ্ছ কয়টা মুদ্রার জগু সে এই কাজ
করিতেছে! ইহাই তার জীবিকার অবলম্বন,—
নহিলে উদরপূর্তি হয় না যে! এমন অশ্রদ্ধা
দেখানোটা আমার পক্ষে উচিত হয় নাই!
কিন্তু উপায় নাই! আমার নিখাস-বায়ুস্পর্শে
চারিধার জ্বলিয়া যাইতেছে, মুখের কথায়
বিষ বাহির হইতেছে, আমি ত উপলক্ষ্যমাত্র,
ভবিতবা কঠিন!

প্রহরী আমার জগু নানাবিধ আহার
লইয়া আসিয়াছে! ইহজীবনের মত একবার
বাসনা মিটাইয়া খাইয়া লইতে হইবে। যথেষ্ট
হইয়াছে! এমন কদর্য্য ঘৃণা, এমন হীনতা
আর গলাধঃকরণ করা যায় না!

একটা লোক,—মাথার টুপি—হঠাৎ
আসিয়া উপস্থিত! ব্যস্ত ভাব, কোনদিকে তার
লক্ষ্য নাই! হাতে গজের ফিতা ও কাগজ-
পত্রের বাণ্ডুল! আসিয়াই সে দেয়াল মাপিতে
লাগিল! ‘আচ্ছা’—‘পাঁচফুট’—এখানটা বদলানো

দরকার' প্রভৃতি নানা কথা আপনার মনেই
সে বকিয়া যাইতে লাগিল।

প্রহরীর মুখে শুনিলাম, সে একজন
কণ্ট্রাক্টর! কারাগৃহের সংস্কার হইবে, তাই
সে মাপ করিতে আসিয়াছে।

কাজ শেষ হইলে সে আমাকে কহিল,
“আপনার বুঝি আজ ফাঁসি হবে—আহা!”

আমি উত্তর দিলাম না। সে আমার
দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

সে কহিল, “ছ’মাস পরে এ জেল আর
চেনা যাবে না, এর আগাগোড়া বদল হয়ে
যাবে, আর কি জমকালো রকমই না সে
দেখতে হবে।”

অর্থাৎ তাব কথার মর্ম,—আমি নিতান্তই
বেচারা, এমন কাণ্ড দেখা আমার অদৃষ্টে
ঘটিবে না—।

তার মুখে কাষ্ঠ হাসি দেখা দিল।
প্রহরী তাহাকে কহিল, “এখানে দাঁড়াবার
হুকুম নাই! আপনার কাজ হয়ে থাকে
যদি ত, বাহিরে গেলে ভালো হয়।”

সে চলিয়া গেল। আর আমি—যে পাষণ-
দেয়াল সে ফিতা লইয়া মাপিতেছিল—সেই
পাষণ দেয়ালেরই মত নিশ্চল মুক হইয়া
বসিয়া রহিলাম।

২৯

এমন সময় এক মজার কাণ্ড ঘটিল।
প্রহরী বদল হইল। নূতন প্রহরীর অসভ্য-
ভাব-ভঙ্গী, বিক্রী চেহারা, কর্কশ স্বর! যেন
যমদূত!

প্রহরী কহিল, “ওহে, তোমার মনে দয়া-
মায়া কিছু আছে কি, ভাই?” আমি
কহিলাম, “না!”

আমার স্বরে একটা তীক্ষ্ণতা ছিল—কিন্তু
সে হঠিবার পাত্র নহে। সে কহিল, “বলি,
একটা কথা, শোনই না!”

আমি কহিলাম, “অত রসিকতা আমার
সহ্য হবে না।”

সে কহিল, “আমি বড় দুঃখী, ভাই, নেহাৎ
হতভাগা। তুমি একটু দয়া করলে যদি ভালো
হয় ত, কর না! চিরদিন আমি কৃতজ্ঞ থাকব!”

চিরদিন! আমার সে ‘চির’ ত সূর্যাস্তের
পূর্বেই ফুরাইয়া যাইবে! আমি কহিলাম,
“তুমি কি পাগল? তোমার সুখদুঃখের খোঁজ
নিয়ে আমি মিছে মাথা ঘামাই কেন?”

তবু সে ছাড়িবে না—কহিল, “বলি
শোনইনা কথাটা!” তার পর চারিধারে
চাহিয়া নিম্নকণ্ঠে সে কহিতে লাগিল, “দেখ
দাদা, আমার যা কিছু সুখ, যা কিছু ভালো, তা
তোমারি হাতে নির্ভর কচ্ছে! নেহাৎ গবীব
আমি—এ কাজে কি পরিশ্রম, আর মাহিনাটা
কি কম! এর উপর আবার নিজের খরচে
একটা ঘোড়া রাখতে হয়! চাকরির সুখ
কত! তাই বুঝেই, ভাই, লটারির টিকিটটা
আসটা মাঝে-মাঝে আমি কিনি! জীবনে
একটা কিছু করা চাই ত! কিন্তু এই যে আজ
সাত-আট বৎসর লটারিতে এত টাকা দিচ্ছি,
তা এ ত লটারিতে নয়, সব জলে দিচ্ছি।
আমার নম্বর যদি হয়, ৭৬, ত ঠিক ৭৭ নম্বরের
টিকিট টাকা পেয়ে বসে আছে। আবার যদি
দেখে-শুনে ৭৭ নম্বরের টিকিট কিনি ত, হয়
৭৬ নম্বর, নয় ৭৮ নম্বর টাকা পায়! বরাত
দেখ না! তাই মনে করেছি কি জানো?”
কথাটা বলিয়া সে আমার দিকে চাহিল।
আমি কহিলাম, “কি মনে কবেছ?”

সে কহিল,—“তাই মনে করছি একটা সুবিধা হতে পারে তোমা হতে।”

আমি আশ্চর্য্য হইলাম, কহিলাম, “আমা হতে সুবিধা?”

সে কহিল, “হাঁ, দাদা সে তোমারি হাত। দেখ, মানুষ মবে গেলে ভূতভবিষ্যত সব দেখতে পায়, তা তুমি ত এই ক’ঘণ্টা পরেই মরচ, তাই বলছি কি, জানো, আমাকে যদি ঐ ঠিক নম্বরটি বলে দাও ত আমি সেই নম্বরের টিকিট-খানি কিনি! বেশ ছ পয়সা তা হলে হাতেও আসে! রাতারাতি বড়মানুষ হয়ে পড়ি, আর এই লক্ষ্মীছাড়া চাকরি ছেড়ে বাঁচি—ভূতকে আমি ভয় করি না, বুঝলে কি না—কোন বাধা নাই! আমার নাম কাসেঁ পাপিকুর! বি নম্বর ঘর, ২৬ নম্বর বিছানা—মনে থাকবে ত? আজই সন্ধ্যার পব তা হলে বলে দিও, দাদা। দোহাই তোমার।”

এ কথার আমি উত্তর দিতাম না—প্রবৃত্তি ছিল না—কিন্তু একটা উন্মদ আশা আমার মনে জাগিয়া উঠিল—একবার শেষ চেষ্টা! আমি কহিলাম, “দেখ, তুমি টাকা চাও?”

“হাঁ, দাদা! আর পয়সার দুঃখ ভোগ করতে পারিনে!”

আমি কহিলাম, “বেশ—আমি তোমাকে রাজার ঐশ্বর্য্য দেব, অগাধ টাকা যদি এক কাজ করতে পার!”

তার চোখ যেন জলিয়া উঠিল। সে কহিল, “বল, আমি এখনি করব—যত বড় শক্ত সে কাজ হোক, তবু পেছুবো না।”

আমি কহিলাম, “শুধু আমাদের পোষাক বদল করতে হবে, বাস—আর কিছু নয়!”

“এই কাজ! ওঃ, এখনি রাজী আছি।” বলিয়াই সে জামার বোতাম খুলিতে লাগিল। ক্ষিপ্র গতিতে আমি উঠিলাম। বুকটা ধক করিয়া উঠিল। আর একমুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়—এখনি সব পণ্ড হইবে! আঃ, ভগবান, ধন্য তুমি! নিমেষে আমি দেখিলাম, আমার সম্মুখে আগাগোড়া সমস্ত দ্বার মুক্ত—কোথাও বাধা নাই, বন্ধ নাই—মুক্ত আকাশতলে আবার আমি দাঁড়াইয়াছি—মাথার উপর পাখীর দল উড়িয়া চলিয়াছে, স্নিগ্ধ শীতল বায়ুর স্পর্শ অবধি যেন আমি স্পষ্ট অনুভব করিলাম,—সে এক সম্পূর্ণ নূতন জীবন!

সহসা প্রহরীটা থমকিয়া গেল—কহিল, “ওহো! বুঝেছি তোমার মতলবখানা—তুমি পালিয়ে যেতে চাও?”

একটা ঢোক গিলিয়া আমি কহিলাম, “তাইত চাই, নইলে তোমাকে টাকা দেব কি করে?”

প্রহরী জামার বোতাম আঁটিতে লাগিল। আমার অন্তরের মধ্য দিয়া একটা তীব্র বিহ্বল শিখা বহিয়া গেল—মাথায় রক্ত চন্ চন্ করিয়া উঠিল।

সে কহিল, “না—তা কি হয়? ও সব হাঙ্গামায় আমি নাই—মরে তুমি টাকার কিনারা করো ভাই, যেমন বললুম—এ রকম পালিয়ে—আরে না—না।”

আমি বাসিয়া পড়িলাম—আমার পা টলিতেছিল! আশা নাই—কোন আশা নাই! নিরাশার সুগভীর বেদনায় আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

দ্বিতীয় ভাগ।

ভারতবর্ষের অনেকগুলি নাম আছে। পূর্বে ইহাকে সিটু নামে অভিহিত করা হইত। কেহ কেহ ইহাকে হিয়েনটোও বলিত। কিন্তু ইহার প্রকৃত নাম হইতেছে ইটু। নিজ নিজ জিলা অনুযায়ী ইটু দেশীয় লোকেরা ইহার নামকরণ করিয়া থাকে। প্রত্যেক প্রদেশের আচার ব্যবহার বিভিন্ন প্রকারের। চীন ভাষায় ইটু অর্থে চন্দ্র।

ভারতবর্ষের ব্যক্তিগণ বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের কৌলীন্ত ও চরিত্রের অশ্রু প্রসিদ্ধ। জনশ্রুতি ব্রাহ্মণদের কাহিনী পবিত্রতাপূর্ণ করিয়াছে। জনসাধারণে ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মণদের দেশ এইকপ বলিয়া থাকে।

পরিমাণ, জলবায়ু প্রভৃতি।

ভারতবর্ষ নামক পরিচিত দেশগুলি পঞ্চসিন্ধু নামে কথিত হইয়া থাকে। এই দেশের পরিধি ৯০,০০০ লি; ইহার তিন দিকেই সুবিশাল সাগর এবং ইহার উত্তরে তুষার পর্বত। ইহার উত্তরাংশ প্রশস্ত; দক্ষিণাংশ সঙ্কীর্ণ। দেখিতে অর্ধ চন্দ্রাকৃতি। সমগ্র দেশটি ৭০ কি ততোধিক প্রদেশ বিভক্ত। ঋতুগুলি অত্যন্ত উষ্ণ; ভারতভূমি সুন্দর এবং আর্দ্র। উত্তরাংশ উপত্যকাপূর্ণ ও সমতল। এই সকল উপত্যকা ও সমতল ক্ষেত্রগুলি সুন্দর ও কর্ষিত বলিয়া উর্বর ও ফলোৎপাদক। দক্ষিণাংশ বনরাজি ও শাক পরিপূর্ণ। পশ্চিমাংশ কঙ্করময় এবং অসুর্বর।

ভারতবর্ষের পরিমাপ লইতে হইলে প্রথমে যোজন গণনা করা হইয়া থাকে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই সৈন্যদের একদিনের কুচকে যোজন বলে। পুরাতন পুস্তকাদিতে ৪০ লিতে এক যোজন এইরূপ দেখা যায়। সাধারণতঃ ৩০ লিতে এক যোজন পরিগণিত করা হয়—কিন্তু ধর্ম পুস্তকে দেখা যায় যে ১৬ লিতে এক যোজন হয়। আট ক্রোশে এক যোজন। গরুর ডাক যতদূর হইতে কর্ণে প্রবেশ করিতে পারে সেই দূরত্বকে ক্রোশ বলে। এক ক্রোশে ৫০০ শত

ধনু। চার হাতে এক ধনু এবং ২৪ অঙ্গুলিতে এক হস্ত হয়। ৭ যবে এক অঙ্গুলি এবং এই প্রকারে আরও নানাপ্রকার পরিমাপের প্রণালী আছে। ইহার পরে আবার অণু ও পরমাণু আছে।

জ্যোতিষ, পঞ্জিকা ইত্যাদি।

সর্বাংশে ক্ষুদ্র সময়কে ক্ষণ বলে। একশত বিশ ক্ষণে তক্ষণ; ৬০ তক্ষণে এক পল, ৩০ পলে এক মুহূর্ত এবং ৫ মুহূর্তে কাল এবং ৬ কালে এক অহোরাত্র হয়। সাধারণতঃ দিবারাত্রি আট-কালে বিভক্ত করা হয়। প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত শুরুপক্ষ, পূর্ণিমা হইতে অমাবস্যাতে কৃষ্ণপক্ষ বলা হয়। চৌদ্দ কি পনের দিনে কৃষ্ণপক্ষ হয়—কেননা মাস কখন দীর্ঘ কখন ছোট হইয়া থাকে। কৃষ্ণপক্ষ ও তৎপরবর্তী শুরুপক্ষ লইয়া একমাস। ছয় মাসে দুই অয়ন। সূর্য্য যখন বিষবরেখার মধ্যবর্তী থাকে তখন ইহাকে উত্তরায়ন ও বহির্ভাগে থাকিলে দক্ষিণায়ন বলে এই দুই অয়ন লইয়া এক বৎসর পরিগণিত হয়।

বৎসর ছয় ঋতুতে বিভক্ত। প্রথম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে তৃতীয় মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল; তৃতীয় মাসের ষোড়শ দিবস হইতে পঞ্চম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্যন্ত পূর্ণ গ্রীষ্মকাল; পঞ্চম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্যন্ত বর্ষাকাল। সপ্তম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে নবম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্যন্ত শস্তবৃদ্ধিকাল। নবম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে একাদশ মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্যন্ত শীত ঋতুর প্রারম্ভকাল ও একাদশ মাসের ষোড়শ দিন হইতে প্রথম মাসের পঞ্চদশ দিবস পূর্ণ শীতকাল।

তথাগতের শাস্ত্রানুযায়ী বৎসরে মাত্র ৩টি ঋতু। প্রথমমাসের ষোড়শ দিবস হইতে পঞ্চম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্যন্ত গ্রীষ্মঋতু। পঞ্চম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে নবম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্যন্ত বর্ষাক্রতু ও নবম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে প্রথম মাসের পঞ্চদশ

দিবস পর্য্যন্ত শীত ঋতু। আবার চারিঋতুও কথিত হইয়া থাকে—বসন্ত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত ও শীত। বসন্তের মাস হইতেছে চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। প্রথম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে চতুর্থ মাসের পঞ্চদশ দিবসের সহিত এই মাসত্রয়ের ঐক্য দেখা যায়। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্রপদ মাস জইয়া গ্রীষ্মকাল। চতুর্থ মাসের ষোড়শ দিবস হইতে সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত এই গ্রীষ্মকালের ঐক্য দেখা যায়। আশ্বিন কার্তিক, মার্গশীর্ষ এই তিনমাস লইয়া হেমন্ত। সপ্তম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে দশম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত সময়ের ঐক্য আছে। পৌষ, মাঘ, এবং ফাল্গুন—এই কয়মাস শীতকাল। দশম মাসের ষোড়শ দিন হইতে প্রথম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত এই কাল। পুরাকালে পুরোহিতগণ বুদ্ধদেবের নিধনাবলী অবলম্বন করিয়া বর্ষাকালে দুইবার বিশ্রাম করিতেন *—প্রথম তিনমাস অথবা শেষ তিন মাস। সূত্র ও বিনয় অনুবাদকারীগণ—এই বিষয় গুরুরূপে অনুধাবন করিতে পারিতেন না, তাহার কারণ এই যে সীমান্ত প্রদেশের অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ মধ্যপ্রদেশের ভাষা বোধগম্য করিতে পারিত না। এবং এই কারণেই তথাগতের জন্ম, গৃহত্যাগ, নিক্রাণ প্রভৃতির সঠিক সময় নির্দ্ধারিত হইয়া উঠে নাই।

নগর ইত্যাদি।

নগর ও গ্রামের মধ্যে দরজা আছে। প্রাচীর উচ্চ ও প্রশস্ত। পথ ও উপপথ সকল পাকানো এবং রাজপথগুলি ঘোরানো। পথগুলি অপরিষ্কার এবং ইহাদের পার্শ্বে সুসজ্জিত বিপণিগুলি বখাযোগ্য চিহ্নে শোভিত। কদাচিৎ, মৎস্যজীবী, নর্তক নর্তকী, জল্লাদ ও সম্মার্জক প্রভৃতির বাস নগরের বহির্ভাগে। ইহাদিগকে রাজপথের বামপার্শ্বে দিয়া গমনাগমন করিতে হয়। ইহাদের গৃহাদি অল্প প্রাচীর বেষ্টিত এবং উপনগর বলিয়া খ্যাত। মৃত্তিকা নরম ও কন্দময় বলিয়া নগরের প্রাচীরগুলি ইষ্টক বা টালি দ্বারা প্রস্তুত। প্রাচীরের উপরিস্থ প্রাসাদগুলি কাঠ বা বংশনির্মিত

গৃহাদিতে বারান্দা ও আমোদগৃহ আছে। এইগুলি কাষ্ঠনির্মিত। তবে ইহাদের বহির্দেশে চূণ বা সুরকোর আস্তরণ থাকে এবং ছাদ ইষ্টকের। চাঁনের গায় তুণ, শুষ্ক শাখা, টালি বা কাষ্ঠ ছাদের জন্ত ব্যবহৃত হয়। দেওয়ালগুলি চূণ ও কন্দমলিগু এবং পবিত্রতার জন্ত গেময়ও মিশ্রিত হইয়া থাকে।

সজ্জারামগুলির নির্মাণ কৌশল অত্যন্ত অসাধারণ। চতুষ্কোণের চতুর্দিকেই এক একটা ত্রিতল মন্দির নির্মিত হইয়া থাকে। কড়িকাঠ ও কাণিস নানা-প্রকারে খোদিত হইয়া থাকে। দরজা জানালা এবং অনূচ্চ প্রাচীরগুলি মুক্তহস্তে চিত্রিত। সন্ন্যাসীগণের কক্ষের অভ্যন্তর কারুকাৰ্য্যখচিত কিন্তু বহির্দেশ অনলঙ্কৃত। মধ্যস্থলে উচ্চ ও বিস্তৃত ঘর। দরজাগুলি পূর্বমুখ; রাজসিংহাসনও পূর্বমুখে স্থাপিত।

আসন, বসন ইত্যাদি।

ভারতবাসীরা উপবেশন বা বিশ্রামের কালে মাদুর ব্যবহার করে। রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণ এবং সম্ভ্রান্তব্যক্তি ও সহকারী কর্মচারীগণ কারুকাৰ্য্য শোভিত মাদুর ব্যবহার করে কিন্তু আকারে সকল মাদুরই এক প্রকার। রাজার সিংহাসন বৃহৎ উচ্চ এবং মূল্যবান মণিমুক্তাসজ্জিত; ইহাকে সিংহাসন বলে। সিংহাসন অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র দ্বারা মণ্ডিত; পাদদানটী পর্য্যন্ত মণিমুক্তাখচিত। সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণ নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী সূচিত্রিত ও মূল্যবান আসন ব্যবহার করেন।

পোষাক পরিচ্ছদের কোন রূপ “ছাট কাট” নাই। শুভ্র পোষাকই তাহারা পছন্দ করে; বহুবর্ণ বা সুশোভিত পরিচ্ছদ তাহাদের মনঃপুত হয় না। পুরুষেরা মধ্যদেশে তাহাদের পরিচ্ছদ জড়াইয়া, কৃষ্ণতলে গুস্ত করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে দিয়া বুলাইয়া দেয়। স্ত্রীলোকের পোষাক মৃত্তিকা স্পর্শ করে এবং সম্পূর্ণরূপে তাহাদের স্কন্ধ আবৃত করে। তাহারা মস্তকোপরি কেশের কিয়দংশ দ্বারা কবচী বন্ধন করে

* এই সকল আচার ব্যবহারগুলি ইংসিংও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

এবং অল্প চুলগুলি খালগা করিয়া রাখে। কেহ কেহ গৌফ ছেদন করে*। মস্তকোপরি তাহার মুকুট ও মণিময় মালা ব্যবহার করে। তাহাদের পরিচ্ছদ কোষের* ও কার্পাস নির্মিত। ক্ষৌম বস্ত্রের পরিচ্ছদও দেখা যায়। উৎকৃষ্ট ছাগলোম দ্বারা কঞ্চল প্রস্তুত হয়। করাল (বস্ত্র পশুর হৃদিকণ-লোম) দ্বারা বস্ত্র বয়ন করা হয়। ইহা বয়ন করা সহজসাধ্য নয় এবং সেই জন্য ইহার পরিচ্ছদ মূল্যবান এবং ইহা উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদরূপে গণিত হয়।

উত্তর ভারতে বায়ু শীতল এবং সেই জন্য তথায় তাহার ছোট এবং আঁটা পোষাক ব্যবহার করে। অবিখ্যাসীদিগের পরিচ্ছদ ও গহনা বহুবিধ ও মিশ্রিত। কেহ ময়ূরপুচ্ছ, কেহ নরকঙ্কাল ব্যবহার করে। কেহ বা উলঙ্গ থাকে, আবার কেহ পত্র বা বকুল পরিধান করে। কেহ কেশ কর্তন করে, কেহ বা গৌফ মুণ্ডন করে। পক্ষান্তরে দীর্ঘ গৌফ এবং মাথার উপর চুলের কবরী ও দেখা যায়। ইহাদের পরিচ্ছদ একরূপ নহে এবং এক এক সময় এক এক প্রকার রংয়ের পোষাক ব্যবহার করে।

শ্রমগণের তিন প্রকার পরিচ্ছদ*। এই তিন প্রকার পরিচ্ছদের “ছাঁট” এক প্রকার নহে— ইহা সম্প্রদায় বিশেষের উপর নির্ভর করে। কাহারও কাহারও ক্ষুদ্রপাড় কাহার আবার চওড়া। কোন কোন পোষাক আবার কমবেশী ঝুলিয়া পড়ে। এক প্রকার পোষাক কেবল বাম স্বক্স ও উভয় কুক্ষিতল আবৃত রাখে। ইহা বামদিকে অনাবৃত রাখিয়া দক্ষিণদিক আবৃত করিয়া রাখে। কোমরের নীচে ইহা ঝুলিয়া পড়ে। অল্প প্রকার পোষাকের কটিবন্ধ বা খোবা নাই। পরিধানকালীন ইহার নিম্নাংশ ভাঁজ করিয়া পরিতে হয় ও কটিদেশে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিতে হয়। সম্প্রদায় সকলের পরিচ্ছদের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু—পীত ও লোহিত উভয়ই ব্যবহৃত হয়।

* এই সকল আচার ব্যবহারগুলি ইংসিংও উল্লেখ করিয়া গিয়াছে।

+ দস্তকাষ্ঠের ব্যবহার ইংসিংয়ের গ্রন্থে এবং আরও অনেক প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। “বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে ভারতের কথা” প্রবন্ধে (ভারতী ১৩১৬ শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা) দৃষ্টব্য।

ক্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি ব্যবহার করেন এবং সাদাসিধা ভাবে ও মিতব্যয়িতার সহিত জীবন ধারণ করেন। রাজা এবং মন্ত্রীগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার ব্যবহার করেন। রত্নখচিত উষ্ণ এবং পুষ্প কেশে ব্যবহার করেন। তাহার বলয় ও মালা দ্বারা নিজেদের ভূষিত করেন।

অনেক ধনবান বণিক স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবসায় নিযুক্ত থাকেন। ইহার লগ্নপদে যাতায়াত করেন— কদাচিত্ কেহ উপানৎ ব্যবহার করে। ইহার দস্ত লোহিত কিম্বা কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত এবং কর্ণ বিদ্ধ করে। ইহাদের নাসিকা চিত্রিত এবং চক্ষুগুলি আয়ত।

পরিচ্ছন্নতা ।

ইহার শারীরিক পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী এবং এই বিষয়ে কোনরূপেই শৈথিল্য প্রকাশ করে না। আহারের পূর্বে সকলেই স্নান করিয়া থাকে; কখনও উচ্ছষ্ট ভোজন করে না এবং একের ভোজনপাত্র অপরে ব্যবহার করে না। কাষ্ঠ বা প্রস্তর পাত্র ব্যবহৃত হইলেই নষ্ট করিয়া ফেলে। সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা লৌহ পাত্র প্রত্যেকবার ব্যবহারের পর ধোত ও মার্জিত করে। আহারাদির পরে তাহার দস্তকাষ্ঠ + ব্যবহার করে এবং মুখ ও হস্ত প্রক্ষালন করে*। স্নানের পূর্বে কেহ কাহাকেও স্পর্শ করে না।। শৌচান্তে প্রত্যেকবার তাহার গাত্র ধোত করে এবং চন্দন ও হরিদ্রার সুগন্ধি ব্যবহার করে। রাজার স্নানকালে ঢঙ্কা নাদ হয় ও বাদ্যযন্ত্র যোগে সঙ্গীত হয়। পূজা বা প্রার্থনার পূর্বে ইহার অবগাহন করে।

লিখন, বর্ণমালা, ভাষা পুস্তক প্রভৃতি ।

ভারতবর্ষীয়দের বর্ণমালা ব্রহ্মদেব কর্তৃক রচিত হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে। সংখ্যায় ইহার ৪৭ এবং দেশ কালপাত্র অনুযায়ী

শব্দ রচনার উপযোগী ভাবে সংযুক্ত। এই বর্ণমালা নানা দেশের নানা ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে এবং সেই জন্তই দেশভেদে উচ্চারণে ব্যতিক্রম দেখা যায় কিন্তু সাধারণতঃ বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই। মধ্য ভারতে ইহা আদিকাল হইতে এক ভাবেই আছে। এই স্থানের উচ্চারণ শুনিতে মধুর এবং দেবতাদিগের ভাষার ন্যায়। সীমান্ত প্রদেশবাসীদের উচ্চারণে ভ্রম দেখা যায় কেন না চরিত্রগত দোষের জন্ত তাহাদের ভাষাও দূষিত হইয়া পড়ে।

প্রত্যেক প্রদেশে সাময়িক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার জন্ত রাজকর্মচারী নিযুক্ত আছেন। এই সকল বিবরণকে নীলপিত বলে। শুভাশুভ সর্ববিধ ঘটনাই ইহাতে লিপিবদ্ধ হয়।

বালকদিগের শিক্ষা ও উৎসাহের জন্ত তাহাদিগকে প্রথমতঃ দ্বাদশ অধ্যায় বিশিষ্ট সিদ্ধবস্ত্র নামক পুস্তক অধ্যয়ন করান হয়। সপ্তম বয়ে উপনীত হইলে তাহারা পঞ্চবিদ্যা নামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। প্রথমেই তাহারা শব্দবিদ্যা অধ্যয়ন করে। এই পুস্তক শব্দের অর্থ এবং পদের ব্যুৎপত্তি বিষয়ক তত্ত্ব শিক্ষা দেয়। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা শিল্পস্থান বিদ্যা অর্থাৎ শিল্পশক্তি নির্ণয়কবিদ্যা এবং জ্যোতিষ অধ্যয়ন করে। পরে চিকিৎসাবিদ্যা অর্থাৎ যাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা ও গুপ্তমন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেয় তাহাই অধ্যয়ন করে। পরে হেতুবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। শেষোক্ত-টিতে পঞ্চ বৌদ্ধ শাস্ত্রের * সকল তত্ত্ব নিদ্বারিত আছে।

ব্রাহ্মণে চতুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। প্রথম বেনকে আয়ুর্বেদ বলে কেন না ইহা জীবনরক্ষণ বিষয়ে পর্যালোচনা করে। দ্বিতীয় যজুর্বেদ, তৃতীয় সামবেদ ও চতুর্থ অথর্কবেদ।

এই সকল বেদে যে সকল গূঢ় ও গুপ্ততত্ত্ব সন্নিবিষ্ট আছে তাহা এতদ্দেশীয় শিক্ষকগণ যে উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন তাবিশেষে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহারা প্রথমতঃ তাহাদের ভাবার্থ ব্যাখ্যা করিয়া পরে ছাত্রদিগকে ছরুহ শব্দ সমূহের

অর্থ বোধগম্য করাইয়া দেন। তাহারা শিষ্যদিগকে উৎসাহিত করেন এবং স্কুলশেলে তাহাদের পরিচালিত করেন। যদি তাহারা দেখেন যে তাহাদের শিষ্যগণ অধিক বিদ্যায় সম্বলিত হইয়া সাংসারিক কার্যে লিপ্ত হইতে ইচ্ছুক তাহা হইলে তাহারা উৎসাহের স্বকীয় বশে রাখেন। তাহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে এবং ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে তাহাদের চারত্র গঠিত এবং জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যখন তাহারা কোন কাৰ্যে নিযুক্ত হয় তখন প্রথমে তাহারা গুরুদেবের যত্নের জন্ত তাহাকে ধন্যবাদ দেয়। পুরাতত্ত্বে অভিজ্ঞ অনেকে বিদ্যা-চর্চাতেই জীবনানতিপাত করেন এবং এবং সংসার হইতে দূরে বাস করিয়া নিজেদের স্বভাব অক্ষুণ্ণ রাখেন। পার্থিব বিষয়ের ইহারা কিছুই ধার ধারেন না; নিন্দা বা প্রশংসা ইহাদের, কিছুই যায় আসে না। তাহাদের সূচন দিগদিগন্তে বিস্তৃত হওয়ায়, রাজশ্রবণ তাহাদের যথেষ্ট সম্মান করেন কিন্তু তাহারা কদাপিও রাজসভায় উপস্থিত হন না। গুণের জন্ত নরপতি তাহাদের সম্মান করেন এবং প্রজাবৃন্দ তাহাদের যশোরাশির প্রশংসা করে এবং সর্ব-সাধারণে তাহাদের ভক্তি করে। এই কারণেই তাহারা দৃঢ়তা ও উৎসাহ সহকারে অক্লান্ত ভাবে বিদ্যাচর্চায় সমন্বিতপাত করিতে পারেন। তাহারা আত্মবলে নির্ভর করিয়া জ্ঞানান্বেষণ করেন। যদিও তাহারা বিপুল ধনের অধিকারী তথাপি তাহারা সামান্য জীবিকার জন্ত নানাস্থান ভ্রমণ করেন। পক্ষান্তরে, একপ লোকও দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াও নিলজ্জভাবে কর্তব্য পালনে বিমুখ হইয়া কেবল মাত্র শ্বখলালসায় অর্থরাশির অপচয় করে। ইহারা বহুমূল্য আহারাদি ও বস্ত্র নিজ সম্পত্তি বিনষ্ট করে। নিজেদের নৈতিক বল এবং অধ্যয়নস্পৃহা না থাকিতে ইহারা অপমানিত হয় এবং ইহাদের দুর্নাম চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

নিজ নিজ শ্রেণী অনুযায়ী, সকলেই তথাগতের

* পঞ্জয়ান—(১) বুদ্ধ (২) বোধিসত্ত্ব (৩) প্রত্যেক বুদ্ধ (৪) যতি (৫) অন্যান্য শিষ্য।

ধর্মমত জ্ঞাত আছে। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবের পরে বহুকাল গত হওয়াতে, তাঁহার মতের রূপান্তর হইয়াছে এবং কেবলমাত্র তত্ত্বাভিগণের অনুসন্ধানের উপরই এইক্ষণ এই জ্ঞান নির্ভর করে।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়, পুস্তক, বিচার, বিনয় প্রভৃতি।

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মতের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায় এবং সমুদ্রের তরঙ্গমালার স্তায় তাঁহাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক উখিত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য আছেন এবং যদিও তাঁহাদের মতামত বিভিন্নমুখী, তথাপি তাঁহাদের লক্ষ্য এক।

অষ্টাদশটি সম্প্রদায় আছে এবং প্রত্যেকই অপরের উপর প্রাধান্য প্রকাশ করিতে অভিলাষী। মহাযান এবং হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ পৃথক পৃথক বাস করিতেই ইচ্ছুক। অনেকে নীরব ধ্যানেরই আসক্ত এবং ভ্রমণে, উপবেশনে, দণ্ডায়মান থাকিয়া সকল সময়েই জ্ঞানার্জন ও সূক্ষ্ম দর্শনের জন্ত নিমগ্ন থাকেন। কেহ কেহ স্ব স্ব মতের পোষার্থ চৌক্য করিয়া তর্ক বিতর্ক করেন। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিয়ম অনুসারে বৌদ্ধগণ চালিত হন।

বিনয়, বিচার, এবং সূত্রপিটক—সকলই বৌদ্ধ-পুস্তক। যিনি এই সকল গ্রন্থের এক শ্রেণীর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তাঁহাকে কর্মদানের শাসন হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। যদি তিনি দুই শ্রেণীর ব্যাখ্যা করিতে পারেন তবে তাঁহাকে দ্বিতীয় তলে বাসের জন্য আসবাব দেওয়া হয়। যিনি তিন অংশ ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তাঁহাকে পরিচর্যা করিবার জন্য কয়েকটি ভৃত্য দেওয়া হয়। যিনি চারি অংশের ব্যাখ্যা করিতে পারেন তাঁহাকে উপাসক নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। যিনি পঞ্চাংশ ব্যাখ্যা করিতে পারেন তাঁহাকে হস্তিধান দেওয়া হয়। যিনি ছয় অংশেরই ব্যাখ্যা করিতে পারেন তাঁহাকে শরীররক্ষা প্রদত্ত হয়। যখন কাহারও সুখশ উচ্চ

সীমায় উপনীত হয়, তখন যিচারের জন্য তিনি সজ্ঞ অস্থান করেন। যাহারা সভায় উপস্থিত হন, তিনি তাঁহাদের গুণের বিচার করেন; তিনি বুদ্ধিমানদিগকে প্রশংসা করেন এবং ভ্রান্ত ব্যক্তিকে তিরস্কার করেন। সভায় যদি কেহ মার্জিত ভাষা, সূক্ষ্ম অনুসন্ধান, ভীক্ৰবুদ্ধির পরিচয় দেন তাহা হইলে তাঁহাকে সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া এবং বহুসংখ্যক সহচর সঙ্গে দিয়া মঠের দ্বারদেশ পর্যন্ত আনয়ন করা হয়। পক্ষান্তরে, যদি কেহ বিচারকালীন অসাধু ভাষা প্রয়োগ করেন, অথবা কুতর্ক অবলম্বন করেন, তাহা হইলে সকলে তাহার মুখ লাল ও সাদা রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া দেয়, তাহার সন্মুখভাগে ধূল ও কর্দম মাখাইয়া দেয় এবং পরে কোম নির্জন স্থানে বা পয়ঃপ্রণালীতে রাখিয়া আইসে। এই প্রকারে তাহার গুণী ব্যক্তিকে সম্মান এবং গুণহীনকে অপদস্থ করে।

ভোগবিলাস সাংসারিক জীবনেই শোভা পায় এবং জ্ঞানার্জনই ধর্মজীবনের লক্ষণ। শেষোক্ত জীবন পরিভ্রমণ করিয়া সাংসারিক ভোগবিলাসে লিপ্ত হওয়া অভ্যস্ত গাইত। যদি কেহ বিনয়ের নিয়ম ভঙ্গ করে তবে তাহাকে প্রকাশ্যে তিরস্কার করা হয়। সামান্য দোষে, তিরস্কার বা কয়েকদিবসের জন্য নির্বাসন দেওয়া হয়। অপরাধ গুরুতর হইলে চিরদিনের জন্য মঠ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। যাহারা এইরূপে বহিষ্কৃত হয় তাহারা অন্যত্র আবাস অব্যেষণ করে এবং যদি তাহাতে অসমর্থ হয় তবে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখনও কখনও তাহারা পুনরায় গার্হস্থ্যপ্রবেশ করে।

বর্ণবিভাগ ও বিবাহ।

ইহারা চারি বর্ণে বিভক্ত। প্রথম ব্রাহ্মণ—ইহারা সবাচারী। ইহারা ধর্মপরায়ণ এবং নিয়মান্বলী পালনে বিশেষ তৎপর। দ্বিতীয় শ্রেণীকে ক্ষত্রিয় বলে, ইহারা রাজজাতীয়। বহু দন হইতে ইহারা দেশ শাসন করিতেছেন। ইহারাও ধার্মিক ও দয়ালু। তৃতীয় বৈশ্য—ইহারা বাণিজ্য ব্যবসায়ী।

ইহারা ব্যবসায় লিপ্ত থাকে ও দেশ বিদেশে ধনার্জন করে। চতুর্থ শ্রেণীকে শূদ্র বলে—ইহারা কৃষিজীবী। ইহারা হলচালন ও কর্ষণ করে। এই চতুর্বিধে জাতীয় বিপুলতা বা অবিপুলতা অনুসারেই পদ-মর্যাদা নির্ধারিত হয়! যখন ইহারা বিবাহ করে, তখন নূতন কুটুম্বিতা অনুসারে ইহাদের পদমর্যাদার

হ্রাসবৃদ্ধি হয়। আত্মীয় স্বজনের সহিত বিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই। একবার স্ত্রীলোকের বিবাহ হইলে আর বিবাহ হয় না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু জাতি আছে যাহারা নিজ নিজ ব্যবসায়কারী বিবাহ করে।

ক্রমশঃ

ছবি।

(ইংরাজী হইতে)

শরতের স্নিগ্ধ অপরাহ্নে প্রসিদ্ধ চিত্রকর সেমুর সঙ্গীক নদীতীরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। অস্তগামী সূর্য্যকিবণে তখন নদীর জল লাল হইয়া গিয়াছিল।

অদূরে শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া এক বালক কাষ্ঠখণ্ড লইয়া ছুরিকার সাহায্যে ছোট নোকা তৈয়ার করিতেছিল। বালকের বেশ ছিন্ন ও মলিন। আপনার কাষে সে এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে, পথের দিকে তার কোন লক্ষ্যই ছিল না।

সেমুব ভাবিল, বাঃ—চিত্রের যোগ্য বটে! স্ত্রী কিতিকে কহিল, “আঁকবার মত নয় কি?”

কিটি কহিল, “নিশ্চয়, সুন্দর হবে।”

অগ্রসর হইয়া বালকটির কাঁধে হাত দিয়া সেমুর কহিল, “তোমার নাম কি?”

বালক চমকাইয়া সেমুরের মুখের দিকে চাহিল, কহিল, “আমি জিম”। বলিয়া সে আবার আপনার কাষে মন দিল।

কিটির নিকট আসিয়া সেমুর কহিল, “আমি এখনি সব জিনিষপত্র আন্ছি—

তুমি একে কিছুতে উঠতে দিও না, কোন রকমে ভুলিয়ে রেখো।”

সেমুব যখন ফিরিয়া আসিল, বালকটি তখনো তেমনিভাবে নোকা তৈয়ার করিতেছিল। সেমুর পট লইয়া বসিয়া গেল।

তখন চারিধারে আঁধার নামিতেছিল! জিম একবার আকাশের দিকে চাহিয়া ছোট নোকাটা বুকে লইয়া উঠিয়া পড়িল।

সেমুর কহিল, “আর একটু,—জিম, আর একটু বস।” পবে পকেট হইতে একটা রৌপ্যমুদ্রা বাহির করিয়া কহিল, “আর একটু বসলে দেব?”

জিম অবাক হইয়া গেল। কহিল, “আমাকে দেবেন?”

“হাঁ, তুমি আর একটু ঐখানে বস, তা হলে দেব। কিন্তু কাল আবার আসা চাই, আবার দেব। কেমন আসবে ত, জিম?”

জিম ষাড় নাড়িয়া সস্তমিত জ'নাইল।

সে রাত্রে সেমুব বাড়ীওয়ালীকে জিমের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, “ওঃ, নিশ্চয় তবে সে জিম মেরিডিথ। আহা

বেচারি জিম্! তাদের দুঃখের কথা আর বলব কি, সে আজ প্রায় দু বৎসরের কথা। হাঁ, ঠিক দু বৎসর। জিমের বাপ ওয়েনের সঙ্গে তার বন্ধু বিজের কি বচসা হয়, ওয়েন রিজকে একটা ধাক্কা দেয়। ওয়েনের ধাক্কায় রিজ কেমন বে-কায়দায় পড়ে অজ্ঞান হয়। রিজ বুঝি মারা গেল ভেবে ভয়ে দুঃখে ওয়েনও কোথা চলে গেল। তার পব, তার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।”

কিটি কহিল, “রিজ কি সত্যি মাঝে গেছে?”

“নাঃ, মরবে কেন? জোয়ান মানুষ, একটা ধাক্কায় কি মরে কখনো? প্রায় হপ্তা দুই পরে সে বেশ সেবে উঠল! ওয়েনের জন্তু কতদিন সে কেঁদেছে, তার কত খোঁজও করেছে—আহা, বড় ভাব ছিল দুজনে, তার উপর রিজেরই নাকি দোষ ছিল—তা কোথায় ওয়েন—তার কোন সন্ধানই নেই!” কথাটা বলিয়া বাড়াওয়ালী ছোটখাট একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

২

পরদিন সেমুর নদীতীরে আসিয়া দেখে জিম্ তাহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। কিন্তু আজ আর সে জিম নয়—আজিকার জিম দিব্য পরিচ্ছন্ন! বেশ ধোপদস্ত পোষাক পরিয়া সে আসিয়াছে। মুখের কালি সাবানে ধুইয়া ফেলিয়াছে, উষ্ণ-খুষ্ণ চুলগুলো তৈল-চিক্ণ, ব্রসের সাহায্যে তার পারিপাটাই বা কি!

সেমুর কহিল, “এ কি করেছ জিম্—

তুমি আর সে জিম নও যে—এঃ, এমন সেজে আসতে কে বলেছিল?”

বালকের মুখ শুখাইয়া গেল। সে বলিল, “মা সাজিয়ে দিয়েছে, ছবি তোমার কথা বলতে, মা—”

“না, না শীঘ্র যাও, কাল যেমন ছিল, তেমনটাই হয়ে এস—কিছু মনে করোনা জিম্, এই দেখ তোমার চুলে এমন তেল মেখেছ—এ সব ঠিক করে এস, যাও, না হলে ছবি ভাল হবে না ত। ঠিক কালকের মত পোষাকে এস।”

এমন ভদ্রোচিত বেশ সেমুরের কেন যে মনঃপূত হইল না,—জিম তাহাব মর্মুই মোটে গ্রহণ করিতে পারিল না।

* * * *

ছবিখানি সম্পূর্ণ হইল। সেমুরের নিপুণ তুলিকাপাতে সুন্দর ফুটিল! চিত্রশিল্পে তার দক্ষতাও ছিল অসামান্য!

কিটি ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইল। সোৎসাহে স্বামীকে কহিল, “বাঃ, চমৎকার হয়েছে।”

“তোমার ভাল লেগেছে ত কিটি, তাহলেই আমি সুখী। জিম তুমিও একবার এসে তোমার ছবি দেখ।”

জিম গৃহমধ্যে যাইয়া অনেকক্ষণ একদৃষ্টে ছবির পানে চাহিয়া রহিল! এই কি সে! দেখিল, একেবারে ঠিক—ক্রমে আপনার বেশের প্রতি তার নজর পড়িল—লজ্জায় সে আপন বেশের ছিন্ন স্থান গুলা হাত দিয়া ঢাকিতেছিল। তার কেমন একটা সঙ্কোচ হইতেছিল—‘তাইত ছবিতে এগুলোও আঁকা হইয়া গিয়াছে!’

জিমের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সেমুর হাসিয়া

কহিল, “জিম্ ঐ গুলার জগুই ত ছবি খানির দাম ! বুঝলে ?”

পরে কহিল, “আর পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই আমরা চলে যাচ্ছি !”

বালক কাতব দৃষ্টিতে সেমুকের প্রতি চাহিল, কহিল, “চলে যাবেন ? কোথায় ?”

“লগুনে যাব, বুঝলে, জিম্, তুমি যাবে ?” বালক বলিয়া উঠিল, “মা বলছিল সেখানে আমার বাবা আছেন”, পরে সে আঁব কহিল, “সেখানে আপনারা আমার বাবাকে নিশ্চয় দেখবেন, দেখা হলে আমার আর মার কথা যদি বলেন—” বলিতে বলিতে বালকের চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল।

সেমুর ও কিটির অন্তর হঃখে ভরিয়া গেল ! জিমকে বুকে টানিয়া কিটি কহিল, “কেঁদোনা জিম। চুপ কর।” সেমুর কহিল, “জিম তোমার বাবাকে নিশ্চয় আমি এখানে পাঠিয়ে দেব, তোমার মাকে বলো।”

* * * *

৩

সুত্র রাত্রি। লগুনেব এক গৃহমধ্যে নিম্নকণ্ঠে কে কহিল “হা ভগবান !” লোকটির মুখ শুষ্ক বিবর্ণ ! সে চোর, চুরি করিতে আসিয়াছিল।

রাত্রি তখন প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। গৃহের মেঝেতে চোবের পরিশ্রমলব্ধ জিনিষপত্র সংগৃহীত—সকলগুলিই রৌপ্য-নির্মিত—ঝক্ ঝক্ করিতেছে ! নিকটে একটা থলিও পড়িয়াছিল।

চোর সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কাহারো কোনো সাড়াশব্দ নাই—চারিধার নিস্তব্ধ !

বাহিরে কেবল খড়খড়ির গায় বৃষ্টির ফোঁটার পট-পট শব্দ আর রাস্তায় কচিং গৃহমুখী গাড়ীর ঘর্ঘব শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনা যায় না। চাৰিধারে বিরাট নিস্তব্ধতা ! চোবের মুখ পাংশুবর্ণ, তাব সর্কশরীবে বোমাঝ।

সম্মুখে গৃহকোণে একটা চিত্রের প্রতি মন্ত্রমুগ্ধেব মত সে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। তার পর ধীবে ধীরে দেয়াল হইতে ছবিখানি সে নামাইয়া লইল।

দ্বার খোলার শব্দ হইল—সে শুনিতে পাইল না, তন্ময় হইয়া ছবি দেখিতেছিল।

একখানি চেয়াবে সে ধীরে ধীবে বসিয়া পড়িল। পশ্চাতে তখনো প্রবেশদ্বার অন্ধমুক্ত রহিয়া গেল। হাঁটুর উপব ছবিখানি রাখিয়া একমনে সে তাহাই দেখিতেছিল।

নদীতীরে শিলাখণ্ডের উপর উপবিষ্ট এক বালকের প্রতিমূর্তি—বালকের বেশ ছিন্ন মলিন ! মুখে কেমন করুণ ভাব ! সুন্দর !

দেখিতে দেখিতে একটা অব্যক্ত বেদনাঃ তার খাস রুদ্ধ হইয়া আসিল—অলক্ষিতে তার চক্ষু হইতে বড় একফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া চিত্রের উপব পড়িল। ক্রমে দুইটা—তিনটা। আপনাকে সে আঁব কোনমতে সঞ্চরণ করিতে পারিল না।

এমন ভাবেই খানিকটা সময় কাটিয়া গেল। তখনও সে ছবি দেখিতেছিল। চোখের জলে ছবি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল ! এতক্ষণ কখন সে চলিয়া যাইত, কিন্তু আজ তার একি মোহ !

তখন উষার প্রথম আলোকচ্ছটা ধরণীতে ব্যাপ্ত হইতেছিল। তাহারই একটা অস্পষ্ট

কণা খড়খড়ির ফাঁকের মধ্য দিয়া ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে কক্ষমধ্যে বাতির আলোও ম্লান হইয়া আসিল।

রাস্তায় ময়লা গাড়ীর ঘর্ষর শব্দে সে চমকিয়া উঠিল। সম্মুখে থলি ও মেঝেতে স্তূপীকৃত দ্রব্যাদির প্রতি চাহিতেই সব কথা তার মনে পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পরে ছবিখানি দেয়ালে টাঙ্গাইয়া সে ভাবিল, “হা, ভগবান! ধন্য তুমি,—আজ রাত্রে এ কি নূতন পথ দেখালে! আজ হতে আমি নূতন মানুষ! আর আমার কোন লোভ নাই—অভাব নাই, আজ হতে আমি চুরি ছাড়লাম।” ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে সে অগ্রসর হইল। কে যেন তার বুক চাপিয়া ধরিয়াছিল! দ্বারের নিকট আসিয়া সে দেখে, বাহির হইতে তাহা রুদ্ধ। আর সম্মুখে রিভলভার হস্তে দাঁড়াইয়া স্বয়ং গৃহস্বামী তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে।

গৃহস্বামী কহিল, “দাঁড়াও!” তার স্বর বজ্রগম্ভীর!

চোর থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। চোরের দিকে রিভলভার তুলিয়া গৃহস্বামী হাঁকিল, “চুরি—চুরি করতে এসেছে, যাও যেমন বসেছিলে তেমন ভাবে বস, নইলে এখনি মাথা উড়িয়ে দেব!”

চোর ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল, কহিল, “বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন, আমি সত্য কথা বলব—ঐ ছবি! এখানা চোখে না পড়লে কোন্ মুহূর্তে আমি এ সব জিনিষ নিয়ে সরে পড়তাম! শুধু ঐ ছবি। ঐ ছবি

খানিই আজ চোরের হাত হতে আপনার জিনিষপত্র রক্ষা করেছে!”

চোরের কথা শুনিয়া গৃহস্বামী রিভলভার নামাইয়া একপদ অগ্রসর হইল, বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল “ছবি,—কোন্ ছবি?”

চোর কহিল, “ঐ যে একটি ছেলে নদীর ধারে পাথরের উপর বসে, উক্ক-খুক্ক চুল—ছেঁড়া পোষাক—”

গৃহস্বামী কহিল, “ওগো! বুঝেছি সেই ছবি—ভালো, তোমার নাম? তুমি—” “ওয়েন মেরিডিথ—ঐ ছেলেটির মত আমরা একটি ছেলে—”

গৃহস্বামী অধীরভাবে কহিল, “তার নাম?”

চোর কহিল, “জিম্।”

গৃহস্বামী স্তম্ভিত হইলেন। চোরের স্বক্বে হাত রাখিয়া কহিলেন, “ওয়েন মেরিডিথ তোমাকে এমন চোরের বেশে দেখব, তা স্বপ্নেও ভাবিনি!”

শিশুর গায় ওয়েন কাঁদিয়া উঠিল। পবে রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি আমার জিমের ছবি কেমন করে পেলেন?”

সুগভীর বেদনায় গৃহস্বামীর অন্তর আকুল হইয়া উঠিল। সে বলিল, “সে আজ চাব বৎসর, ঠিক চার বৎসরের কথা—যখন আমি ঐ ছবি আঁকি। ঐ ছবিই আমার উন্নতির প্রথম সোপান—সে এক শুভ মুহূর্তের কি উজ্জ্বল স্মৃতি! আমার জীবিত কিটি ও আমি বেড়াতে গেছলাম—হুজনে জিমকে দেখি,—আমি এই ছবি আঁকি—তাবপব আমার জীবনের উপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে গেল—আজ কোথায় কিটি—এ ছবি আমাদের সেই মহা সুখের স্মৃতি—তাই

আবার আমি কিনে রেখেছি, ওয়েন আজ তোমাকে পেয়ে আমার বড় আনন্দ হচ্ছে! তোমার জন্ম বাড়ীতে তোমার স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু সকলে অধীর, তোমারই সন্ধান করছে। তোমার বন্ধু—”

ওয়েনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কহিল—“জানেন ত—খুনের দায়ে আমি,—”

“ওহো, সে তোমার ভুল, ওয়েন, রিজ মরেনি—বেঁচে আছে! তোমার দুঃখিনী স্ত্রী,

আদরের জিম্, প্রাণের বন্ধু রিজ সকলে তোমারই জন্ম আজ অধীর।”

ওয়েনের চোখ জলিয়া উঠিল, এ কি স্বপ্ন! উন্মাদের মত সে জড়িতস্বরে কহিল “রিজ, —রিজ বেঁচে আছে!—কি আশ্চর্য্য, আর আমি—”

সেমুর কহিল “তুমি চারটি খেয়ে নিয়ে আজই বাড়ী যাও—আমি টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি।”

শ্রীনরেন্দ্রমোহন চৌধুরী।

বিজ্ঞানের নূতন বাণী।

এতদিন পর্য্যন্ত লোকে কবি ও বৈজ্ঞানিকের মধ্যে এই পার্থক্যটাই লক্ষ্য করিয়াছে যে বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির দুয়ার পর্য্যন্ত মাত্র অগ্রসর হইয়াই ক্ষান্ত হন, কিন্তু কবি সে গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে ধরা দেন না; তিনি প্রকৃতির গৃহাভ্যন্তরে গমন করিয়া প্রকৃতি অহরহ যে পাদপদ্মের দিকে তাহার অঘ্যাঞ্জলি প্রেরণ করিতেছেন তাহারই সন্ধান গ্রহণ করেন। বৈজ্ঞানিক নাকি কবির এই কাজটিকে হাসিয়া উড়াইয়া দেন—অন্ততঃ অনেকেই তাহা মনে করে। এই জন্মই কবির সহিত বৈজ্ঞানিকের বিরোধ অনেকটা প্রবাদের দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

কিন্তু সেদিন আর থাকিবার নহে। যাহারা বিজ্ঞানের কেবল কাঠামোটুকু লইয়া আলোচনা করেন তাঁহারা সেই পুরাতনটা লইয়াই আছেন। বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা এই দলের। কিন্তু আজকাল

যাহারা বিজ্ঞানের অন্তরদেশে প্রবেশ করিয়া তাহাকে তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা বিজ্ঞানের ভিতর হইতেই একটা বড় কথা সন্ধান পাইয়াছেন। তাহাতে কবির সহিত বৈজ্ঞানিকের সমস্ত বিরোধ দূর হইয়াছে, এবং দুইদিক হইতে দুইজনের লক্ষ্য যে একই দিকে ফিরিয়া আছে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা গিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে দেখিবার সাধক। তিনি নানা প্রাকৃতিক ঘটনা লইয়া আলোচনা করিয়া তাহাদের সকলগুলির ভিতরে সাধারণ চক্ষুর অন্তরালে যে সত্যটি কাজ করিতেছে তাহাই আবিষ্কার করিয়া থাকেন। এই গুলিই তাঁহার বিজ্ঞান-সৌধ নিৰ্ম্মাণের ইষ্টক। বৈচিত্র্য তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। গরমিল দেখিয়া তিনি নিরাশ হন না, বরঞ্চ সেই গরমিলের মধ্যে মিল খুঁজিবার জন্ম তাঁহার উৎসাহ ও উত্তম জাগ্রত হইয়া উঠে। লোকে

যেখানে কোনো মিল দেখে না। বৈজ্ঞানিককে সেই স্থানেই মিল আবিষ্কার করিতে হয়।

বৈজ্ঞানিক যে নিয়মের সূত্রে নানা প্রাকৃতিক ঘটনাকে একত্র বাঁধেন সেগুলি এই ঐক্যের অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ। এই নিয়মগুলিই একটা ঘটনার সহিত আর একটা ঘটনাকে এবং অতীতের সহিত বর্তমান ও বর্তমানের সহিত ভবিষ্যৎকে বন্ধন করিয়া ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে একসূত্রে বাঁধে। যে কারণে একবার যাহা ঘটিয়াছে, এখনো সে কারণে তাহাই ঘটে, ভবিষ্যতেও ঘটিবে। দশটি ঘটনা যে সুদৃঢ় নিয়মের বশবর্তী হইয়া ঘটে সেই নিয়মগুলিই বিজ্ঞানের প্রাণ।

এক সময় ছিল যখন লোকে বৃক্ষ হইতে ফলের পতনের কারণ এবং সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর গতি অব্যাহত থাকার কারণ যে একই তাহা কল্পনাই করিতে পারিত না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক এই দুই ঘটনার মধ্যেও ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাই প্রচারিত হইয়া গিয়াছে যে সৌর জগতের সমস্ত গ্রহ উপগ্রহের গতি যে ক্ষতিরহিত হইয়া অপরিবর্তিত রহিয়াছে মহাকর্ষণই তাহার কারণ। সমগ্র সৌর জগৎটি যে সূত্রে গ্রথিত হইয়া একটি হইয়া আছে তাহা মহাকর্ষণ। পৃথিবীর অতি প্রচণ্ড বেগ সত্ত্বেও যে কারণে ভূপৃষ্ঠস্থ কোনো পদার্থই পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে না তাহাও মহাকর্ষণ। যে শক্তিতে পরমাণুর সম্পাতে অণু এবং অণুর সম্পাতে পদার্থ গঠিত হইয়া রহিয়াছে তাহাও আকর্ষণ। অত্যাতি সূক্ষ্ম হইতে অত্যাতি বৃহৎ ক্ষেত্রেও সেই এক মহাকর্ষণ শক্তি যে কাজ করিতেছে তাহাই

আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান কি কম ঐক্যের সাধনার পরিচয় দিয়াছে?

জ্যোতিষীরা বলেন, আমরা আকাশে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই তাহাদের প্রত্যেকটিই এক একটি সূর্য। তাহাদের এক একটির চারিদিকে তাহাদের আপন আপন গ্রহগুলি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এ কথাও অসম্ভব নহে। এমন কথাও বলা হয় যে গ্রহ উপগ্রহ সহ আমাদের এই সৌর জগৎটি এমনিতির আরো কত কত জগতের সহিত কোনো এক অজ্ঞাত বৃহত্তর সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। নক্ষত্রগুলি আমাদের নিকট হইতে এত দূরে যে সে গুলির কোনো-টিরই সহিত সৌর জগতের কোনো সম্পর্ক আজো স্থাপিত হইতে পারে নাই। এইটা হইলে বিশ্বাকাশকে একই সূত্রে গ্রথিত দেখিতে গাইতাম। একদিন ছিল যখন কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে একটি মাত্র কারণে সৌর জগৎ এক হইয়া আছে এবং তাহার প্রতি অংশেরই গতি একরূপ নিয়মবদ্ধ; কিন্তু আজ সেটাও যে সত্য তাহাতে আমাদের কোনো সন্দেহ উপস্থিত হইবার আর অবকাশ মাত্র নাই। একদিন হয়তো জানা যাইবে যে মহাকর্ষণই একমাত্র শক্তি যাহাতে কেবল সৌর জগৎ নহে, সমগ্র বিশ্বযন্ত্র সূনিয়মে চলিতেছে। তখন সৌরজগৎকে বিশ্বের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যাইবে। তখন দশ বিশটা পদার্থের মধ্যে যে ঐক্য দেখিয়া আমরা এত আনন্দ লাভ করিতেছি তাহাই আরো প্রসারিতা লাভ করিয়া একটা মহা ঐক্যরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হইবে।

জীব জগতেও এমনিতর একটা সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু এখনো কোনো কথা জোরের সহিত বলিবার সামর্থ্য জন্মে নাই। দারউইন্ বানরত্বকে মানুষের পূর্বা-বস্থারূপে নির্দেশ করিয়া এই দুইটি জীবের মধ্যে একটি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

দারউইনের পথে আজো কোনো মহা-ঐক্যে উপস্থিত হইতে পারা যায় নাই সত্য এবং মহাকর্ষণের ভিতর দিয়াও আমরা কোনো পরম ঐক্যকে দেখি নাই সত্য কিন্তু আর এক স্থানে বৈজ্ঞানিক ঐক্যের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সমগ্র জগৎকে তিনি এক করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন।

এতদিন এইটুকু মাত্র জানিতাম যে পব-মাণুব সম্পাতে অণু এবং অণুর সম্পাতে পদার্থ গঠিত হইয়াছে। এক সময় ছিল যখন অণুতেই আমাদের গতিবিধি শেষ হইত, আরো সূক্ষ্মতায় যাওয়া কাহারো সাধ্য ছিল না। এ গণ্ডী এখন উত্তীর্ণ হওয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান এই এক সত্য প্রচার করিয়াছে যে, ভৌতিক পদার্থের অণুগুলি অভৌতিক পদার্থের সম্পাতে গঠিত। সাধারণত যে যে গুণ থাকিলে আমরা কোনো কিছুকে পদার্থ বলি

এই অভৌতিক পদার্থ গুলিতে সেগুলির কোনোটিই নাই। এ গুলি শক্তিকণা। সকল বস্তুই অণু এই শক্তিকণার সম্পাতে গঠিত। এই সম্পাতের বিশেষত্ব অনুসারে পদার্থের মধ্যে বিশেষত্ব জন্মে। স্বর্ণ যাহা, রৌপ্যও তাহাই, আবার সামান্য অঙ্গার খণ্ডেব উপাদান ও সেই একই শক্তি। একই এই জগতেব উপাদান। ভূলোক, ভুবলোক এবং অন্তর্বীক্ষ একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ।

বিজ্ঞান এই এক শক্তিকে জগতেব উপাদানরূপে নির্দেশ করিতে পারিয়া ঐক্যের সাধনায় সিদ্ধিব সংবাদ দিয়াছে। বিপুলভাবে এককে উপলব্ধি করিয়া বৈজ্ঞানিক কবির সহিত তাহার দ্বন্দ্ব মিটাইয়া ফেলিয়াছে এবং উভয়েই বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বের মূল এক।

বর্তমান যুগ আমাদেরকে একটি একটি করিয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তর উপলব্ধির মধ্যে লইয়া যাইতেছে। যে বিজ্ঞানকে এতদিন আধ্যাত্মিকতার শত্রু বলিয়া লোকে মনে করিত সেই আজ এমন এক নূতন বাণী প্রচারিত করিয়াছে যে তাহাতে ভগবন্তের ঈশ্বরোপলব্ধি স্বতই সাধন পাইতেছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সীতারাম।

সীতারামের ক্রীড়াক্ষেত্র, প্রতাপাদিত্যের লীলাস্থল, সেই সোণার যশোহর আজ আর নাই। যে যশোহর একদিন সহস্র সহস্র যোদ্ধার হুঙ্কারে নিত্য মুখরিত হইত, অসি যষ্টি ও বন্দুক ক্রীড়ায়, মগ, ফিরিঙ্গি, পাঠান

ও মোগলের ভীতি সঞ্চারিত করিত, সুপ্রসিদ্ধ গোড় নগরীর যশহর—করিয়াছিল বলিয়া যাহা যশোহর নামে প্রখ্যাত হইয়াছিল, যথাকার প্রতি পল্লী—প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম নির্মিত, গোবিন্দদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ ও

কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীর উচ্চ শীর্ষ মন্দিরাবলীতে সুশোভিত ছিল, যেখানকার পল্লী, ছত্র, দেবমন্দির সমূহ একদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রী ও অতিথিকে চর্কচোষা লেছপের আহালাদি দ্বারা পরিচুষ্ট করিত, প্রতাপ এবং সীতারামের সুবিখ্যাত সেই রাজধানী আজ আর নাই। এখন তাহার কতক অংশ সমুদ্র গর্ভে নিহিত, কতক অংশ বা গভীর অরণ্যে পরিণত; অবশিষ্ট যেটুকু আছে, তাহা ম্যালেরিয়া-প্রসিদ্ধিত জীর্ণ শীর্ণ সামান্ত পল্লীগাম মাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আজ সে রামও নাই—সে অযোধ্যাও নাই—আছে কেবল তাহার ক্ষীণ স্মৃতিটুকু।—সেই স্মৃতিটুকু লইয়াই আমরা ধন্য। ইতিহাসের উজ্জ্বল অক্ষরে সেই ক্ষীণ আলোকটুকুও যদি স্থায়ী করিতে পারি তবেই আমাদের প্রশাস সার্থক হইবে।

দুঃখের বিষয় অতীত ইতিহাস এ সব কথা বড় বলে না। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এ সকল বীরের কথা ফুৎকারে নির্কাণের চেষ্টা করিয়াছেন। তাই সীতারামের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ আমরা যশোহরবাসী জানি না। কেহ কেহ বলেন যে ১৭১২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তাঁহার মৃত্যু হয়। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার “যশোহরের বিবরণী”তে তাহাই লিখিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলিতে চান যে সীতারাম ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও জীবিত ছিলেন। শেষোক্ত পক্ষীয় ব্যক্তিগণ Long's Selections from the records of Government নিম্নোক্ত কয়েকখানি পত্রের উপর নির্ভর করিয়াই ঐ কথা বলেন।

“যে পত্রে আপনি রোজ সাহেব নামক ইংরাজ সওদাগরের নৌকা লুট ও তাঁহার মৃত্যুর কথা লিখিয়াছেন সে পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। বাথরগঞ্জের নিকট যে তাঁহাকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে এবং ডাকাইতগণ যে সীতারামের জমিদারীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহাও আপনার পত্রে অবগত হইয়াছি। আপনার অনুরোধানুযায়ী যাহাতে উক্ত জমিদার ঐ লুণ্ঠিত সম্পত্তি ফেরত দেন ও ঐ অঞ্চলে যাহাতে আর দস্যুভয় না থাকে তজ্জন্ত বন্দোবস্ত করিতে সৈয়দ রেজা খাঁকে অণু পত্র দিয়াছি।” (কলিকাতার শাসনকর্ত্তার নামে নবাবের পত্র) [প্রথম খণ্ড ৩৬১ পৃষ্ঠা]। ঐ খণ্ডের ৩৮৭, ৩৮৮ এবং ৩৮৯ পৃষ্ঠায় পুনরায় এই ঘটনার উল্লেখ আছে। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ১৪ই নবেম্বর তারিখে গবর্নর মহাশয় নবাবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহারও মর্ম্ম এইরূপ—“পূর্বেই আপনাকে রোজ সাহেবের নৌকা-লুট ও তাঁহার মৃত্যুর কথা এবং দস্যুগণ যে সীতারামের জমিদারীতে আশ্রয় লইয়াছে তাহাও বলিয়াছি। আমি একজন ইংরাজকে এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে সীতারামের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম কিন্তু উক্ত জমিদার এই দূতকে গ্রাহ্যই করেন নাই!” এইত গেল এক কথা।

দ্বিতীয়তঃ, কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় একটা প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সীতারামকে ধৃত করিবার জন্ত যে সৈন্তবাহিনী প্রেরিত হয় তাহার সহিত দয়ারাম প্রেরিত হইয়াছিলেন। এবং সীতারামের পরাজয়ের পর দয়ারাম নবাব কর্ত্তক পুরস্কৃত হইয়া-

ছিলেন। (কলিকাতা রিভিউ ১৭৮৩ সনের জানুয়ারী)। লং সাহেবের পুস্তকে উপরোক্ত রোজ সাহেবের মৃত্যু-ঘটনা বিবৃত হওয়ার অব্যবহিত পরেই দয়ারাম সংক্রান্ত একটা ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তারিখে গবর্ণর কর্তৃক লিখিত পত্রে জানা যায় যে কাশীমবাজার কুঠীৰ অধ্যক্ষ উইলিয়ামসন্ গবর্ণরকে অবগত করিয়া-ছিলেন যে, রামপুৰ বোয়ালিয়া হইতে নৌকা-যোগে কোম্পানির ১০০ শত মণ রেশম আসিতেছিল কিন্তু দয়ারাম ঐ রেশম আটক করেন। এই সকল ঘটনা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে সীতারাম এই সময় পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। অর্থাৎ, উপর্যুক্ত সীতারাম যদি আমাদেরই সীতারাম হন, তবে বলিতে হইবে যে কোম্পানির দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্তির ২১ বৎসর পূর্বেও তিনি জীবিত ছিলেন। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে তাহা সম্ভবপর নহে।

প্রথমতঃ সীতারাম মুর্শীদকুলীখাঁর আমলেই সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুর্শীদকুলীখাঁ ১৭০৪ হইতে ১৭২৫ পর্য্যন্ত বাংলার গদী উপভোগ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, সীতারাম তাঁহার দেওয়ান যহু মজুমদারকে যে সনন্দ প্রদান করেন তাহাতে ১১১৪ সনের ২৫ বৈশাখ তারিখ আছে। এই বাংলা তারিখ ইংরাজী ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ।

তৃতীয়তঃ, সীতারাম-প্রতিষ্ঠিত দশভূজা মন্দিরে নিম্নলিখিত কবিতা লিখিত ছিল—

“মহীভূজরসক্ষৌণীশকে দশভূজালয়ং
অকারি শ্রীমতাসীতারামরায়ণ মন্দিরং।”

অর্থঃ—মহী এই স্থলে ‘১’র পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। মহী বা পৃথিবী মাত্র একটা—সেইজন্ত মহী=১

ভূজ—এই স্থলে ‘২’র পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভূজ বলিতে দুই বা দুই বুঝায় সেইজন্ত ভূজ=২

রস—এই স্থলে ‘৬’র পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। রস ছয়টা। সেইজন্ত রস=৬

ক্ষৌণী—এই স্থলে (১)র পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্ষৌণী বা পৃথিবী মাত্র একটা—সেইজন্ত ক্ষৌণী=১।

ইহা হইতে আমরা ১,২,৬,১, এই অঙ্ক চারিটা সজ্জিত করিয়া ১২৬১ শকে যে এই মন্দিরটা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি। ১২৬১ শক ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আরম্ভ হইয়াছিল।

লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে নিম্নলিখিত শিলালিপি ছিল।

“লক্ষ্মীনারায়ণস্থিতৈ তর্কাক্ষিরসভূমিতে

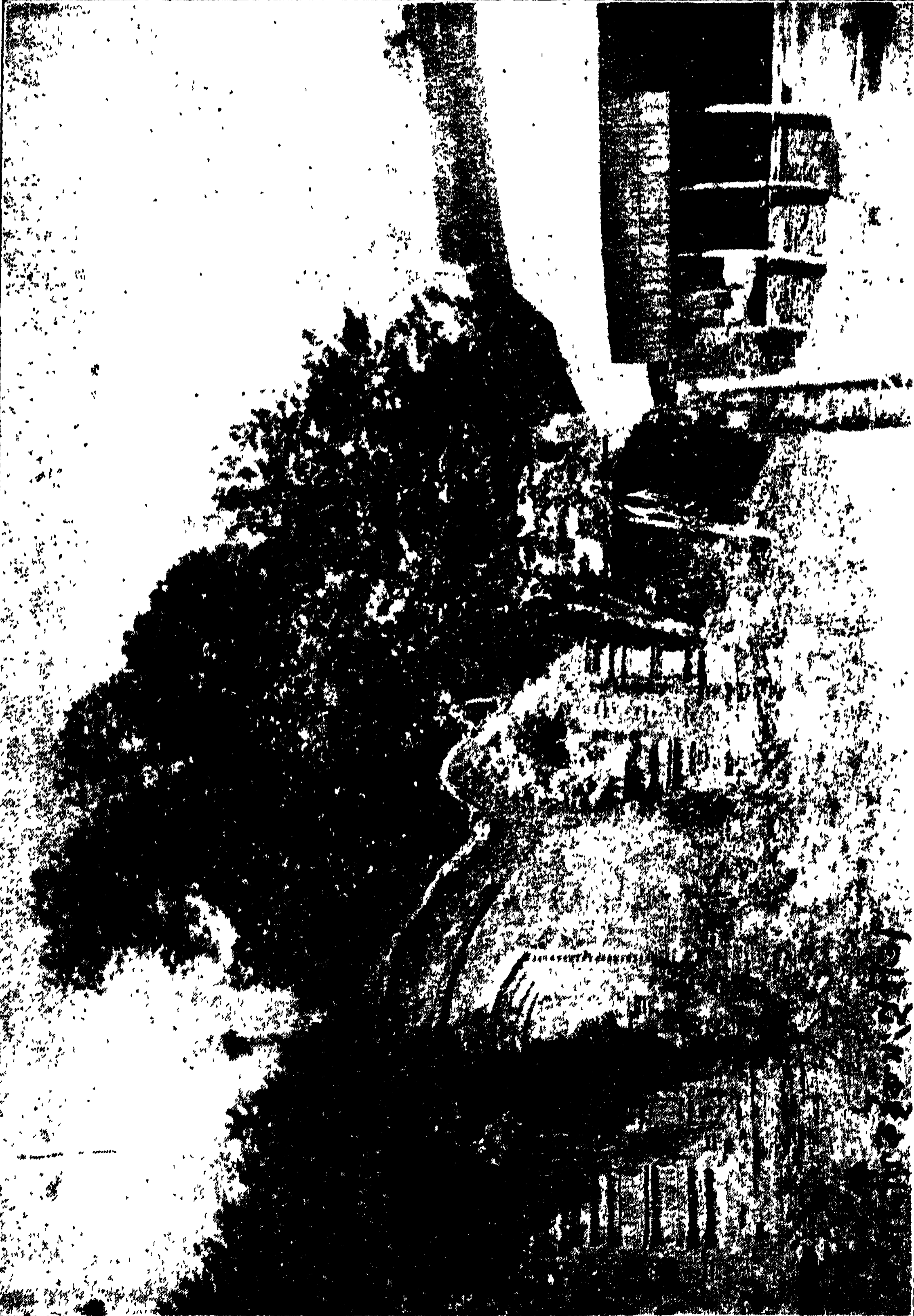
নির্ম্মিতং পিতৃপুণ্যার্থে সীতারামেণ মন্দিরং।”

অর্থাৎ তর্ক (ত্রায় (৬)), অক্ষি (২), রস (৬), ভূমি (১) হইতে আমরা ১৬২৬ শকের নিদর্শন পাই। এই শক ১৭০৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আরম্ভ হইয়াছিল। তাহা হইলেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যাহা ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সীতারামকে টানাটানি করিতে চান, তাঁহাদের যুক্তি ভ্রমসঙ্কুল।

ঐতিহাসিক ষ্টয়ার্ট সাহেব তাঁহার “বাংলার ইতিহাসে” সীতারামের নিম্নলিখিত কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। আমবা ষ্টয়ার্টের বর্ণিত কাহিনীর স্থূলবৃত্তান্ত পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিলাম।

“আবু তোরাব নামক একজন সঙ্কশজাত
ওমরাহ বঙ্গদেশের অন্তর্গত ভূষণার ফৌজদার
নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময়, ভূষণার নিকট
সীতারাম নামক একজন অবাধ্য জমিদারের

অধীনে অনেকগুলি দস্যু থাকিত। সীতারাম
ইচ্ছানুযায়ী নিজ লোকজন সহায়তার ডাকাতী
করিতেন। আবুতোরাব এই দুর্দান্ত দস্যু
দমন মানসে নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করা



দশভূজা মন্দির ।

সত্ত্বেও নবাব তাঁহাকে কোন সাহায্য প্রদান করেন নাই। অবশেষে, এই দস্যুকে ধৃত করিবার জন্ত ফৌজদার পিরখাঁ নামক সীতারাম এই সংবাদ পাইয়া নিজ আড্ডা পরিত্যাগ করিয়া অন্ত্র গমন করেন



লক্ষ্মীনারায়ণ

ঘটনাচক্রে ফৌজদার আবু তোরাব এই স্থলেই মৃগয়ার্থ আগমন করিয়াছিলেন এবং সীতারাম পৌছিবার পূর্বেই তাঁহার অধীনস্থ দস্যুগণ আবু তোরাবকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ করে। সীতারাম এই ঘটনায় অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন এবং আবুতোরাবের মৃতদেহ তাঁহার অনুচরগণের নিকট প্রত্যর্পণ করেন। আবুতোরাবের অনুচরগণ মৃতদেহ ভূষণার নিকটেই কবর দেয়।

নবাব, আবুতোরাবের মৃত্যুসংবাদ পাঠিয়া বক্স ইলাহি খাঁ নামক সেনাপতিকে সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং ইলাহি খাঁকে সাহায্য করিবার জন্ত নিকটবর্তী জমিদারদিগকে পরোয়ানা প্রেরণ করেন। সীতারাম সপরিবারে ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হন। সেইস্থানে পৌছিবামাত্র তাঁহার পরিবারবর্গকে বিক্রয় করা এবং সীতাবামেব মৃত্যুদণ্ড হয়।”

ষ্ট্রুয়ার্ট সাহেব যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন তাহা উপন্যাস হইতে পাবে কিন্তু আমবা ইহাকে ইতিহাসে পরিগণিত করিতে পারি না। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব সত্যই লিখিয়াছেন যে “The tanks and temples and ruins at Muhammadpur consist far better with the local legend than with the Muhammadpur account.” অর্থাৎ সীতারামকৃত দীর্ঘিকা, মন্দির এবং মহম্মদপুরের ভগ্নাবশেষ দেখিলে স্পষ্টই

প্রতীয়মান হয় যে সীতারাম সখসীর প্রবাদই সত্য।

ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব * যে বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন আমরা সেই বৃত্তান্তকেই মোটের উপর সত্য বলিয়া গণ্য করি এবং তাহাই আমবা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

বঙ্গদেশে এই সময় দ্বাদশটি ভূঁইয়া ছিলেন। এই ভূঁইয়াগণ এক প্রকার স্বাধীন ছিলেন বলিলেও অত্যাঙ্কি হয় না এবং বাদসাহ বা তাহার প্রতিনিধি নবাবকে বিশেষ গণ্যমাণ্যও কবিতেন না বা নিরূপিত রূপে রাজস্বও প্রেরণ করিতেন না। সম্ভবতঃ কোন এক ভূঁইয়াকে শাসন করিবার জন্তই হোক বা ফতেয়াবাদ স্থিত কোন পাঠান ওমরাহকে দমন করিবার জন্তই হোক নবাব সায়েস্তাখাঁ কর্তৃক সীতারাম বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়া ছিলেন। তিনি ইহাতে কৃতকার্য হওয়াতেই পুরস্কার স্বরূপ নলদী পরগণা লাভ করেন। এবং সম্রাট আউরঞ্জীব তাঁহাকে সনন্দ প্রদান করিয়া রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। সম্রাট প্রদত্ত ফার্মানসহ সীতারাম মুরশীদকুলি খাঁর নিকট পৌছিয়া রৌমত নজর দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলে নবাব তাঁহাকে কয়েক বৎসরের জন্ত ঐ সকল ভূমি নিষ্কর দখল করিতে অনুমতি প্রদান করেন। সীতারাম ফিরিয়া আসিয়া মহম্মদপুর নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন। কি কারণে হিন্দু-কুলতিলক সীতারাম তাঁহার রাজধানী মহম্মদপুর নামে আখ্যাত করেন তাহা সঠিক

* Mr. Blochman supposes him to be one of the descendants of successors of the equally notorious Mokund, who possessed the Sirkar of Fathabad and Pergunna of Bhoosna.—Ibid.



সীতারামের বাসস্থান।

সীতারামের

জানা যায় না। ওয়েষ্টল্যান্ড সাহেবের মতে সীতারাম যেখানে নিজ প্রাসাদ নির্মাণে মনস্থ করেন, সেই স্থানে এক ফকীর বাস করিতেন। সীতারাম ফকীরকে ঐ স্থান পরিত্যাগে অনুরোধ করিলে ফকীর অস্বীকার করেন। পবে, অনেক অনুরোধ উপরোধে স্থান পরিত্যাগে স্বীকৃত হন কিন্তু সীতারাম ফকীরের নামানুযায়ী ঐ স্থান মহম্মদপুর নামে আখ্যাত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। জনশ্রুতি এইরূপও শোনা যায় যে, মহম্মদ আলি নামক এক ফকীর সীতারামকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন ও আবশ্যিক মত উপদেশাদি প্রদান করিতেন। নব-রাজ্য সংস্থাপনোত্তর সীতারামকে তিনি উপদেশ দিলেন যে সীতারাম হিন্দু হইয়া যদি মুসলমান-পয়গম্বরের নামে নগর প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলে মুসলমান প্রজাও সন্তুষ্ট হইবে। এই নূতন রাজা যে হিন্দু মুসলমান উভয়কেই অপত্যনির্কীর্ণশেষে ও নিরপেক্ষভাবে দেখিবেন, ইহা তাহার বুদ্ধিবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাস সীতারামে এই মতই অবলম্বন করিয়াছেন।*

প্রচলিত জনশ্রুতি এই যে, সীতারামের পিতা উদয়নায়ায়ণ একদিন অশ্বারোহণে এই স্থান দিয়া ষাইবার সময় তাঁহার অশ্বক্ষুব

কর্দমে প্রোথিত হইয়া যায়। বহুকষ্টে অশ্বপদ কর্দম হইতে উঠান হইলে দেখা গেল যে অশ্বক্ষুর ত্রিশূলে বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এবং অনুসন্ধানে লক্ষ্মীনারায়ণ শিলাও এইস্থানে পাওয়া গেল। অতঃপর একটা প্রবাদ এইরূপ যে সীতারামের অশ্বই এই ত্রিশূলে আবদ্ধ হইয়া যায় এবং সেইজন্য সীতারাম এই স্থলেই রাজধানী ও দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ করেন।

সীতারাম রাজা হইয়া অতঃপর ভূঁইয়াদের নিকট হইতে রাজকর আদায় করিতে আরম্ভ করেন। মেনাহাতী, বক্তার, ফকীর মাছকাটা, কপটাদ ঢালি প্রভৃতি সৈনিকদিগেব তহানধানে তাঁহার বহু সৈন্যদল মুশিক্ষিত হইয়া উঠিল। সাধারণতঃ নিকটবর্তী জনপদ সমূহ হইতেই এই সৈন্যদল গঠিত হইয়াছিল। সীতারামের সৈন্যদলমধ্যে ক্ষত্রিয়েরও অভাব ছিল না। মহম্মদপুরের নিকটবর্তী ২১টা স্থলে এখনও ক্ষত্রিয়-বাস আছে।

এই অঞ্চলে তখন আবুতোরাব নামক এক ব্যক্তি নবাবের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি সীতারাম রায়েব উন্নতি সহ্য করিতে পারিলেন না। গৃহশত্রু সীতারামের উকীলও গোপনে আবুতোরাবকে সকল অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দিতে লাগিলেন। ফলে,

* "The ruins at Mohamadpur called after Mahmud Shah, the twelfth king of Bengal wrongly designated by Mr. Westland Muhammadpur. They all belong to the period of Sitaram Rai, the notorious Zeminder of Bhoosnah, styled by the writer of the Report Raja"...Calcutta Review CXXV. রেণী সাহেবের এ ব্যক্তোক্তি ঐতিহাসিক। সত্য পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম উপন্যাসে যে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিয়াছেন ইহা সকলেই অবগত আছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বায় চৌধুরী মহাশয় সীতারাম নামে এক নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে "সন্তোষ রঙ্গমঞ্চে" ইহার অভিনয়ও দেখিয়াছি। নাটকখানি প্রকাশিত হইলে সীতারাম সম্বন্ধে আমরা আরও কিছু নূতন নূতন বিষয় জানিতে পারিব।

আবুতোরাব দলবলসহ সীতারামকে আক্রমণ মেনাহাতী তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া
 করিলেন। সীতারাম প্রস্তুত ছিলেন। সীতারামকে উপহাব প্রদান করিলেন।
 এ যুদ্ধে বাঙ্গালীর নিকট আবুতোরাব পরাস্ত বক্স ইলাহিখাঁব অধীনে আবার সৈন্য প্রেরিত
 হইলেন। তাঁহার অবিস্মৃকারিতার ফলস্বরূপ হইল। সীতারাম এই যুদ্ধে তাঁহার স্মপ্রসিদ্ধ



সীতারামের হুর্গাবশেষ।

কালার্থা ও কুমকুমার্থা নামক ২টা কামান দ্বারা মুসলমানবাহিনী বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। জয়শ্রী সীতারামকে জয়মালা দিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিলেন না।

এই দুই যুদ্ধের ফলে সীতারাম বিদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তাঁহার “মস্তকের জন্ত” পুরস্কার ঘোষিত হইল এবং সীতারামকে সমূলে দলন করিবার জন্ত সিংহরাম নামক এক প্রথিতনামা সেনানী প্রেরিত হইলেন। গুপ্তচরে সিংহরামকে সংবাদ দিল যে মেনাহাতী যতদিন জীবিত আছেন ততদিন সীতারাম অপরাজেয়। তাই মেনাহাতী একদিন যখন দোলমঞ্চ সমীপে সন্ধ্যা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে সিংহরাম সমীপে আনয়ন করা হইল। নিরস্ত্র বীর আত্মরক্ষায় সক্ষম হইলেন না। প্রবাদ এই, মেনাহাতী নিজ শরীরে গুপ্তভাবে একপ্রকার ঔষধ ধারণ করিতেন। সেই ঔষধপ্রভাবে কোনপ্রকার অস্ত্রই তাঁহার শরীরে ক্ষত করিতে পারিত না। কিন্তু বেদনা নিবারণের কোন উপায় তিনি জানিতেন না। তাই যখন শত্রুপক্ষীয় সৈনিকগণ তাঁহাকে অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল, তখন যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তিনি ঔষধের কথা ব্যক্ত করিয়া দিলেন। ইহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার ছিন্নশির নবাব সমীপে প্রেরিত হইলে নবাব এরূপ বীরের এই শোচনীয় মৃত্যুতে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে ইহাকে জীবন্ত ধৃত করিয়া আনাই সমীচীন ছিল।

মেনাহাতীর এই আকস্মিক মৃত্যুতে সীতারাম মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তত্রাপি তিনি সিংহরামকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি সিংহরামকে পরাস্ত করিলেও তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিলেন না। সিংহরাম তাঁহাৰ দুর্গাধিকার কবিলেন।

সীতারামের মৃত্যু কাহিনীঃ সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন যে দুর্গ আক্রমণ কালে সীতারাম বীরেব ত্রায় মুসলমান বাহিনীৰ গতিরোধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। অন্য প্রবাদ,— ফকীর মহম্মদ আলি তাঁহার এক শিষ্যকে সীতারামের রাজপোষাকে সজ্জিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শিষ্য মৃত্যুমুখে পাত্ত হইলে মুসলমানসৈন্যগণ সীতারাম হত হইয়াছেন ইহা মনে করিয়া আফ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া পড়িলে ফকীর সীতারামকে যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে স্থানান্তরে লইয়া গুপ্তাধিকার করিয়া তাঁহাকে জীবন দান করেন।

আমরা সংক্ষেপে সীতারাম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু মহাপুরুষের কাহিনী সামান্য কয়েক পৃষ্ঠায় বিবৃত করা সম্ভবপর নহে। বারান্তরে এই বীরের কাহিনী আরও পর্যালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। অন্য কেহ সীতারাম ও যশোহরের লুপ্ত কাহিনী উদ্ধারে আমাদের সাহায্য করিলে আমরা কৃতার্থ বিবেচনা করিব।*

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

* বহু দিন পূর্বে যশোহরের ইতিহাসের জন্ত উপকরণ সংগ্রহে ব্যাপৃত ছলাম। গৃহদাহে সবই ভস্মীভূত হইয়াছে। আবার এই দুর্কহ বাপারে হস্তক্ষেপ করিবার বাসনা আগিয়াছে। কিন্তু সমগ্র যশোহরবাসীর অন্তরিক ইচ্ছা ও অনুরোধ ব্যতীত এ কার্য অসম্ভব—তাই সকলের নিকট আমরা সাহায্য আর্শনা করিতেছি।

তরু দত্ত।

“Full many a flower is born to
blush unseen,
And waste its sweetness on the
desert air.” Gray.

কবি তরু দত্তের নাম অনেকেই শুনিয়া
থাকিবেন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলা
এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তাঁহার কবিতার

সহিত আমরা বঙ্গীয় পাঠকের পরিচয় সাধন
করিব মাত্র।

তরুবালা ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায়
রামবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার
পিতা গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয় শিক্ষিত
এবং সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। অজু,
অরু এবং তরু তিন ভগ্নী, তন্মধ্যে তরু সর্ব-



কনিষ্ঠা। তের বৎসর বয়সে তরু পিতার সহিত যুরোপ ভ্রমণে গমন করেন এবং ফ্রান্স ও কেম্ব্রিজ্জে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। তিনি পাঁচ বৎসর যুরোপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বিদেশ ভ্রমণের একরূপ সুযোগ কুমারী তরুর স্থায় অপর কোন ভাবত রমণীর ভাগ্যে সচরাচর ঘটে না। যুরোপে অবস্থানকালে তিনি তাঁহার ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ দৈনিক লিপিতে লিপিবদ্ধ রাখিতেন। অত অল্প বয়স হইতেই তিনি সুন্দর পিয়ানো বাজাইতে ও গান করিতে পারিতেন; এবং তাঁহার অসাধারণ স্মরণ শক্তি ছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি বিভিন্ন ভাষায় লিপিত নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি সেক্সপিয়র, মিল্টন, গেটে, ভিক্টর হিউগো, ব্রাউনিং প্রভৃতির কাব্য পাঠ করিতেন। সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষায় লিপিত বহু কবিতা ও গল্প তিনি ইংরাজী ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন। বিদেশীয় ভাষা সুন্দররূপে আয়ত্ত্ব কবা ও সেই ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করা অত্যন্ত কঠিন কার্য। মিল্টন ইতালীয় ভাষায় গ্রন্থ সুইন-বর্ন ফরাসী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। পরদেশীয় ভাষায় উচ্চশ্রেণীর কবিতা রচনা করার দৃষ্টান্ত সাহিত্য জগতে অপর এই দুইটি ভিন্ন আর বড়-একটা দেখা যায় না। তরুমালা ইংরাজী ভাষায় বহু কবিতা লিখিয়া আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে অধিকদিন এ সংসারে রাখিলেন না। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে, ২১ বৎসর মাত্র বয়সে, তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে অমর কবি Keats

এর কথা মনে পড়ে। তরুর নিজের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

“A creature of the starry skies,
Too lovely for the earth to keep.”

তরুদত্তের বাল্যরচিত কবিতার কতকগুলি উল্লেখ-যোগ্যও নহে। কতকগুলি নিতান্ত অপরিস্রব, গাম্ভীর্য-বিহীন, এবং দোষ বহুল। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাবের বিরূপ বিকাশ হয় তাঁহার কবিতা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনের শেষ-ভাগে লিখিত কবিতাবলী হইতে যথার্থ কবিত্ব-বসেব আশ্বাদ যথেষ্ট পরিমাণেই পাওয়া যায়। ইংরাজী সাহিত্যের পাঠকেরাও জানেন সেক্সপিয়রের ‘Midsummer Night’s Dream’ এবং ‘Hamlet’এ রচনার বিরূপ প্রভেদ। সকল কবিই সম্বন্ধে এই একই কথা খাটে।

তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে বাল্যাবস্থা হইতেই তাঁহার রচনার কবিত্বের একটা লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। তাঁহার রচনা স্বভাৱেই সরল, অনাড়ম্বর এবং কবিতার চন্দ্রমধুর ও সাবলীল।

‘Ancient Ballads and Legends of Hindustan’ নামক গ্রন্থটিতে হিন্দুদিগের কতকগুলি পুরাতন গল্প মধুব চন্দ্রে বর্ণিত হইয়াছে। কোন্ হিন্দু রমণী না সাবিত্রীর উপাখ্যান পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হন? তরু দত্ত এইরূপ বহু প্রচলিত ভারতীয় গল্প তাঁহার সুললিত ভাষায় নূতনতর করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

‘Royal Ascetic and the Hind’ কবিতায় নির্জন কাননে বিরূপে একজন বানপ্রস্থাবলম্বী সম্রাটের মন একটা মৃগশাবকের

প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই বর্ণনা করিয়া কবি মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহপ্রবণতাব একটা হৃদয়গ্রাহী চিত্র প্রদান করিয়াছেন। সম্রাটের মৃত্যুকালে গুগশিশুটী সজলনয়নে, পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে মলিনমুখ শিশুরই মায় দাঁড়াইয়া আছে ! কি সুন্দর পাণস্পর্শী বর্ণনা ! কবির প্রতিপাদা, কেবল কঠোর শাবীর নির্ঘাতন দ্বারা দয়াব আধার ঈশ্বরকে পাইবার চেষ্টা করা ভুল। গল্পের এই মর্স্যার্থটুকু শেষে সুন্দর-রূপে কয় ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

“Not in seclusion, not apart from
all,
Not in a place elected for its peace,
But in the heat and bustle of the
world,
‘Mid sorrow, sickness, suffering,
and sin,
Must he still labour with a loving
soul
Who strives to enter through the
narrow gate.”

তাঁহাকে পাইতে হইলে সংসারের দুঃখ, দৈত, বেদনা সমস্তই বরণ করিতে হইবে। তিনিই সমস্ত, কাজেই সমস্তকে স্বীকার না করিলে তাঁহাকে স্বীকার করা হয় না, তাঁহাকে পাওয়াও যায় না।

ধ্রুবোপাখ্যানটী এই মণিকাঞ্চনময় কাব্য-কুমুম মালাব একটা উজ্জল রত্ন। বালক ধ্রুব তাহাব পিতার কোড়ে উঠিবার আশায় পিতাব নিকট গিয়া বাজাব প্রিয়া ভার্য্যা মুখরা সুকচিব তাড়নায় ক্ষুব্ধ হইয়া মাতার নিকট ক্রন্দন করিতেছে। সুনীতি তাহাকে বুঝাইলেন—

“The sins of previous lives must
bear their fruit.”

কিন্তু কস্মফলে মানুষ কষ্ট পায়, ধ্রুবের মন এ কথায় ভুলিল না, তাহার উত্তর কি বীরত্ব-পূর্ণ !

“There is a crown above my father’s
crown,
I shall obtain it, and at any cost
Of toil, or penance, or unccasing
prayer.”

কঠোর অধ্যবসায়, কঠোরতব প্রায়শ্চিত্ত এবং অবিচ্ছিন্ন প্রার্থনা দ্বারা—কিন্মা যেমন করিয়াই হউক সে পিতাব মুকুট লাভ করিবেই।

“Well kept the boy his promise
made that day !
By prayer and penance Dhruba
gained at last
The highest heavens, and there he
shines a star !
Nightly men see him in the fir-
mament,”

ধ্রুব আপনার কথা রাখিয়াছিল। স্বর্গ লোকের শীর্ষদেশে আজো সে অপূর্ব আলোকে উজ্জল হইয়া দেখা দিতেছে।

সিন্ধু, বটু, প্রহ্লাদ, সীতা প্রভৃতি কবিতা-গুলিব ছন্দ যেমন মধুব ভাবও তেমনি সুগম্ভীর ! প্রবন্ধবিস্তারের আশঙ্কায় এগুলি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত কবিবার ইচ্ছা দমন করিতে হইল।

‘Our Casurina Tree’ কবিতাটি অতি সুন্দর ! কবি বলিতেছেন,

“Dear is the Casurina to my soul :
 Beneath it we have played ;
 though year may roll,
 O sweet companions, loved
 with love intense,
 For your sakes shall the tree
 be ever dear !
 Blent with your images,
 it shall arise
 In Memory, till the hot tears
 blind mine eyes !”

কবি অতীত স্মৃতিতে প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠবন্ধনে আবদ্ধ ! গাছটির ছায়ায় কেমন করিয়া একদিন সঙ্গীদের সহিত আনন্দে কাল কাটাইয়াছেন সেই শৈশবেব স্বর্গস্থের দিন স্মরণ হওয়ায় গাছটি কবির নিকট কি এক অভিনবরূপে প্রকাশ পাইয়াছে !

তরু দত্তের প্রকৃতি-বর্ণনা বড়ই সুন্দর । ‘Ancient Ballads’এব কবিতাবলী পারিজাতকুমুমালোর স্থায় সদাই নূতন । যত পাঠ করা যায় প্রতিবাবই নব নব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয় ।

‘A sheaf gleaned in French fields’ নামক গ্রন্থ chateaubriand, Heine, Victor Hugo, Sainte-Beuve, Dupont, Gramont প্রভৃতি নানা বিখ্যাত (অধিকাংশ ফরাসী) কবিব অনুবাদ সমষ্টি । ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই সাহিত্য-জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে । অনুবাদের বিশেষত্ব এই যে মূলের ভাব ও সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র হ্রাস না করিয়া কবি নিজের কবিত্বেরও প্রভূত পরিচয় দিয়াছেন ।

‘The young Captive’ (Andre Chenierএর অনুবাদ) কবিতার নাগিকার চক্ষে মানবজীবনই সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ দান । তাহার উক্তি কি কারুণ্যে পূর্ণ —
 “At the banquet of life
 I have barely sat down,
 My lips have but pressed
 the bright foaming Crown
 Of the wine in my cup
 bubbling high.

* * *

O Death, thou canst wait ;
 leave, leave me to dream ;

* * *

The world has delights,
 the Muses have songs,
 I wish not to perish too soon ”

সে আজো জগৎপিতাব শ্রেষ্ঠ দানটির সদ্যবহার করিয়া উঠিতে পারে নাই, এখনো যে সে ঘাইবাব জন্ম প্রস্তুত হয় নাই ! কবির নিজের জীবনদীপটি এমনি অকালে নিভিয়া গিয়াছিল !

ভিক্টর হিউগোর ‘Universal Republic’ কবিতা বেশ সুচারুরূপে অনূদিত হইয়াছে । ইহাতে টেনিসনের “Parliament of man, the Federation of the world”এর মত মানবের ভবিষ্যৎ ভ্রাতৃত্বাবের কথা সুন্দররূপে বর্ণিত আছে ।

“Rancour and hatred are effaced
 One picture in all hearts is traced,
 One purpose animates all minds ;
 Equality—no king, no chief.”

পাঠ করিলে Shelleyর ছত্রগুলি মনে পড়ে—

“The loathsome mask has fallen,
the man remains—
Sceptreles, free, uncircumscribed,
but man :
Equal, unclassed, tribeless,
and nationless.”

সমস্ত স্বাতন্ত্র্যের ভাব চলিয়া গিয়াছে। কোথাও আর বাধা নাই; শাসকের দণ্ড কোথায় ধসিয়া পড়িয়াছে! বিশ্বে আর শ্রেণী নাই, জাতি নাই—সকলেই সমান!

‘To a bereaved mother’ (Jean Reboul এর অনুবাদ) কবিতায় শোকাকুলা মাতাকে পৃথিবীতে অবিমিশ্র সুখ পাওয়া যায় না—“চক্রবৎ পরিবর্তনশ্চে দুঃখানি চ সুখানি চ” প্রভৃতি কথার দেবদূত শাস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন—

“Here never is an unmixed joy,
Distinct from suffering and from pain,
Nothing, alas, without alloy ;
No smile but has its sigh again.

বাল্যকালাবধি তরুণবালার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তিনি একখানি উপন্যাস রচনা করিবেন এবং চিত্রবিদ্যাকুশলা ভগ্নী অরুণালা তাহার চিত্র অঙ্কন করিবেন। এই উপন্যাসখানি ফরাসীভাষায় এবং দৈনিকলিপির আকারে লিখিত হইয়াছে। ইহা ফরাসীদেশের একটি চিত্র, এবং নায়কনায়িকাগণও সেই দেশীয়। এখানি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

ইংরাজদিগের মধ্যে Elizabeth Barrett Browning প্রভৃতি অনেক মহিলা স্বীয় ভাষায় কাব্য বচনা করিয়া যশোলাভ করিয়াছেন। একজন বঙ্গ-মহিলা যে ইংরাজী ও ফরাসীভাষায় একরূপ কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা ভারতের পক্ষে অল্প গৌরবের কথা নহে। সুবিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক Edmund Gosse তরুণবালার ‘Ancient Ballads’ গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে বিদেশীয় সাহিত্যে তরুণবালার স্থান কত উচ্চে।

শ্রীদেবাংশুনাথ চক্রবর্তী।

বৌদ্ধ ও প্রাচীন মোগল চিত্রশিল্প।

ভারতীয় চিত্রের আদর্শ আমরা পাই, প্রথমত বৌদ্ধ গুহা থেকে, দ্বিতীয়ত—মোগল রাজাদের প্রাসাদ এবং পুস্তকে অঙ্কিত চিত্রাদি থেকে।

আমরা এখন দেখাতে চাই, এই বৌদ্ধ-যুগের আর মুসলমান যুগের ছবির মধ্যে কি কি বিষয়েই বা পার্থক্য এবং কি কি

বিষয়েই বা ঐক্য আছে। মূলে দেখতে গেলে আমরা দেখি, উভয় শিল্প প্রায় একই নিয়মে রচিত। পাশ্চাত্য শিল্পের মত ওগুলি শুধু আলো ও ছায়ার খেলা দেখিয়ে পালাতে চায় না; ওরা ভাব ফুটিয়ে তোলবারই কেবল চেষ্টা করে। যাদের ধারণা, স্বভাবের ছবছ নকল করার নাম,

অথবা কাগজে থিয়েটার দেখানরই নামই চিত্র-শিল্প, তাঁরা যদি অজস্তা গুহায় পদার্পণ করেন তবে নিশ্চয়ই তাঁদের সে ভুল বিশ্বাস দূর হবে! একদিকে তাঁরা সুরহং চিত্র-ভাণ্ডার গুলির অপূর্ণ কার্তিকলাপ দেখে বিস্মিত হয়ে যাবেন, অন্যদিকে - আমাদের দেশে শত-সহস্র বৎসর আগে এইরকম সুন্দর ছবি আঁকা হয়েছিল বলে—আজুগোরবে অভিবূত হয়ে পড়বেন।

অজস্তার শিল্পীরা যে সমস্ত পারকল্পিত চিত্রে গিরি-গুহা পরিশোভিত করে রেখে গেছেন সে সমস্তগুলির শুধু নকল করতে পারাও বিশেষ ক্ষমতার কায। এমন কি আমরা শুনেছি বিলাতের বড় বড় শিল্পীরাও সুন্দররূপে তার দু'একটা ছবিরও সামান্য প্রতিলিপি করে উঠতে পারেননি। বিশেষত ছবির যেখানে প্রাণ, অর্থাৎ ছবির আসল ভাবটা একেবারেই বজায় রাখতে পারেননি। মোগলশিল্প ও ইংরাজ চিত্রকরগণের কাছে এক আশ্চর্য ব্যাপার! একটা নখের মত স্থানের মধ্যে সংখ্যাতীত কারু শিল্প যে কি করে দেখান যায়, তা' তাঁরা বুঝে উঠতে পারেন না। সূক্ষ্ম কারু-শিল্প বিষয়ে মোগল শিল্প শ্রেষ্ঠ; আর বৌদ্ধ শিল্প ভাব পারকল্পনায় সর্বপ্রধান।

আমরা যখন গিরি-গুহায় প্রবেশ ক'রে সর্বপ্রথম সেই অনন্ত অসংখ্য কারু-শিল্প দেখলুম, তখন মনে হয়েছিল, এই সকল কাজ না জানি কত যুগ ধরে কতশত শিল্পী মিলে এঁকেছেন; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা যতই সেগুলি দেখতে লাগলুম ততই আমাদের মনে হ'তে লাগল,

যেন অবলীলাক্রমে নির্বরের মত এই সকল বিচিত্র কারুশিল্পসমূহ শিল্পীগণের অন্তর হতে প্রবাহিত। সেগুলো তখন দেখলে আর মনেই হত না যে, সে সব অনেক মাথা ঘামিয়ে বা বহু পবিশ্রমে আঁকা! যেন আলাদিনের প্রদীপের গল্পের মত সে এক বিচিত্র ব্যাপার! এক একটা নির্দিষ্ট সময়ে যখন সূর্যালোক গুহাগুলো আলোকিত করত; তখন, গুহার দেয়ালের ছবিগুলি আলোতে যেন প্রাণ পেয়ে সজীব হ'য়ে উঠে আমাদের চোখে সে যে কি বিস্ময়স্বরূপ সৌন্দর্যের অবতারণা করতো তা বলা অসম্ভব! সে ব্যাপার যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁ'নই কেবল বুঝতে পারেন। দেয়ালের কোথাও রাজারাণী পারিষদবর্গে বেষ্টিত হ'য়ে সিংহাসনে ব'সে, কোথাও রাজ্যাভিষেক,—বাইরে ভিখারী বিদায় হ'চ্ছে, কোথাও গান-বাজনা,—বেণু-বীণা বাজিয়ে নর্তক-নর্তকীরা আসব জাময়ে তুলেচে; কোথাও বা বাস্তায় বাস্তায় ঢোল মৃদঙ্গ নিয়ে সংকীর্তন বেঁচেয়েছে, এই রকম আরও শত শত চিত্র এক সঙ্গে চোখের উপর ফুটে উঠে আমাদের যেন যেন এক নূতন অনন্ত সৌন্দর্যের রাজ্যের মধ্যে নিয়ে যেত। প্রথম প্রথম আমরা কোনটা ছেড়ে যে কোনটা দেখবো ভেবে ঠিক করতেই পারতুম না! মনে হত যেন কি এক ঐন্দ্রজালক ব্যাপারের মধ্যে পড়ে আয়ত্ৰহা বা হয়ে পড়াচ! মোগল চিত্র দেখে এককম ভাব আমাদের কখনও হয়নি। মোগল চিত্র চোখের সামনে ধরে তাব মধ্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিল্পের বিচার করে তবে সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায়। মোগলচিত্রে আমরা প্রধানত বিলাস ও

ক্রীড়ার ভাবই দেখতে পাই। কিন্তু সমস্ত ছবিতে পর্যাস্ত ধর্মভাব প্রবেশ করেছে। বৌদ্ধ চিত্রই একটা আধ্যাত্মিক আবেশ ও শান্তির ভাবে মণ্ডিত! এমন কি যুদ্ধ বিজ্রোহের তা'হলে বুঝতে হবে মোগলশিল্প বিলাসপ্রধান এবং বৌদ্ধ শিল্প শান্তিময়। মোগলদের



চিত্ররচনা প্রণালী ও বৌদ্ধ শিল্পীদের চিত্র-
রচনা প্রণালীর মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য
আছে। মোগল শিল্পীরা চিত্রের যে ভাব
অতি চেষ্টা ও যত্ন নিয়ে ও সূক্ষ্ম কারুকার্য

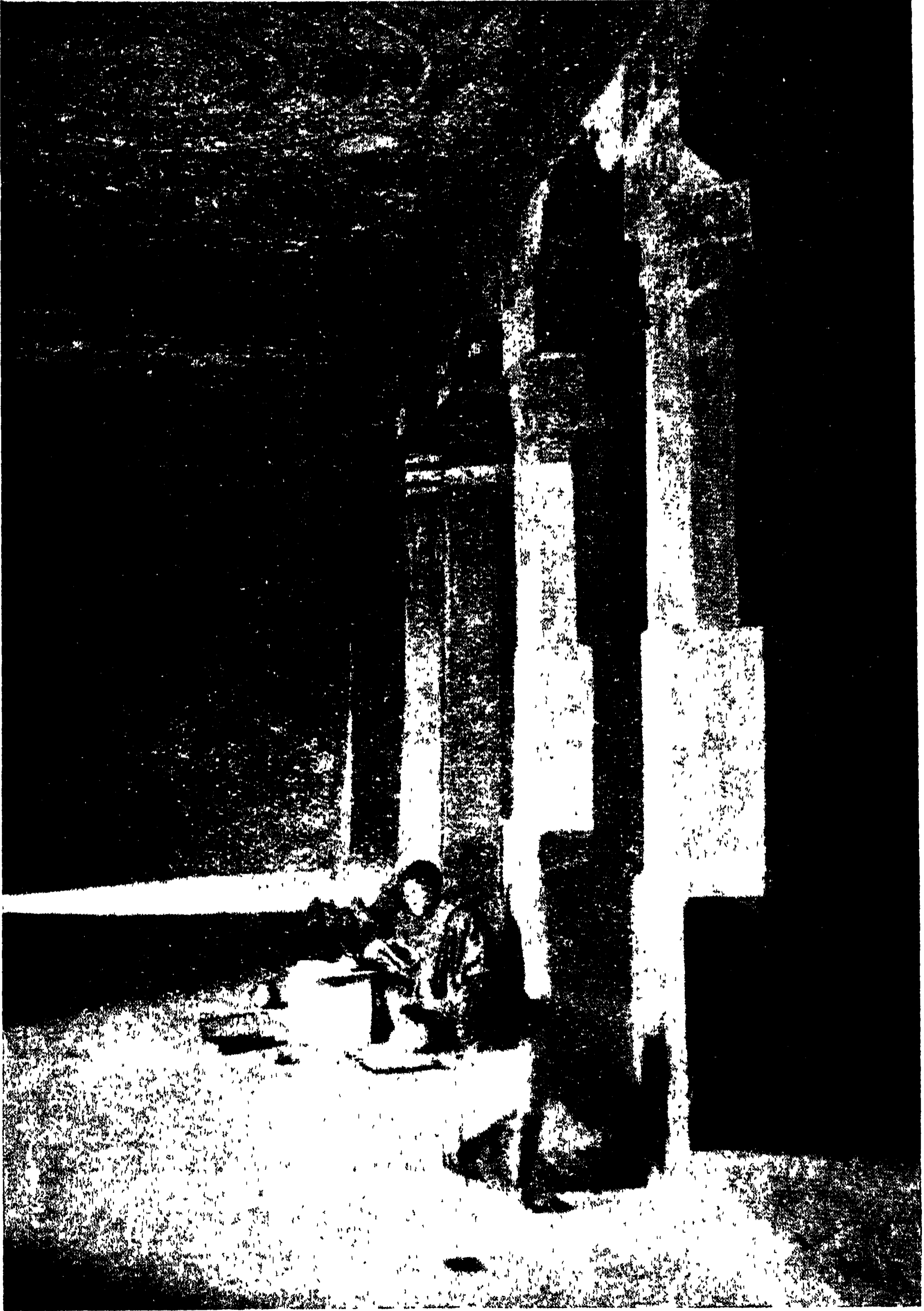
দ্বারা ফুটিয়ে তোলেন বৌদ্ধশিল্পীরা সেটা
ছই চারটা সরু-মোটা রেখার টানে দেখিয়ে
দেন। বৌদ্ধশিল্পী অঙ্কিত উপরের ছবিখানি
দেখলে সেটা বোঝা যাবে। অজস্রাচিত্র

বর্ণসমাবেশেও অতি মনোরম! তার প্রতিবর্ণ যেন চোখে স্নিগ্ধ শীতল ভাব আনে। মোগল কিম্বা অথবা কোন শিল্পে সে রকমটা প্রায় দেখা যায় না! বৌদ্ধ আর মোগলচিত্র উভয়েরই রঙের একটা প্রধান গুণ, শত শত বৎসরের পুরাতন মোগল ছবি এবং সহস্র বৎসরের জীর্ণ বৌদ্ধ ছবিগুলির কোনোটাতেই বর্ণের অথবা কোন রকম পরিবর্তন ঘটেনি। সেগুলি যেন চিরনবীন! দেখলে হঠাৎ মনে হয়, এইমাত্র বুঝি কেউ রং দিয়ে গেল! স্বভাবত পরিবর্তনশীল রঙের মধ্যে সাদা আর নীল রংগুলি অজস্তার ছবিতে এখনও এত পার্শ্বাক্রমে বর্তমান যে, ইংরাজ দর্শকেরা সে যে সহস্র বৎসরের পুরাতন রং, একথা মোটেই স্বীকার করতে চান না! তাঁরা বলেন, পবিত্র চিত্রকরেরা সংস্কারের সময় ওগুলিতে নুতন করে রঙ দিয়েছিলেন। যাই হক, ভারতীয় চিত্রেব রঙ যে ইউরোপীয় তৈলচিত্রের চেয়ে স্থায়িত্বে শ্রেষ্ঠ সে কথা সর্ববাদিসম্মত।

বৌদ্ধ শিল্পীদের অসীম ধৈর্য্য দেখলেও স্তম্ভিত হতে হয়! সেই অবরুদ্ধ অঙ্ককার গুহার ভিতর নানান অসুবিধার মধ্যে বিশেষত ছাদের নীচে (ceiling) যে কি করে ঐ সমস্ত বিষয়কর ও নয়নানন্দ কারুকার্য করে গেছেন, এখন তা বোঝাই অসাধ্য। এ বিষয়ে মোগল চিত্রকর অথবা অথবা কোন দেশের চিত্রকরকেই এতটা কষ্ট স্বীকার করতে দেখা যায় না। আলঙ্কারিকশিল্প (decorative art) সম্বন্ধে বৌদ্ধশিল্পী এবং মোগল শিল্পীগণ

প্রায় সমকক্ষ। অজস্তা গুহার শীর্ষদেশ সজ্জা (ceiling decoration) এক বিচিত্রকাণ্ড! হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন মাথার উপর একখানি বহুমূল্য শালের চাঁদোয়া টাঙান রয়েছে! প্রত্যেক চাঁদোয়ার মধ্যে একটা করে প্রকাণ্ড শ্বেত পদ্ম বিকশিত; আর চারিধারে গোলভাবে সজ্জিত সারি সারি হাঁস, কিম্বা ময়ূব, অথবা মৃগাল দল-মহুঁন-তৎপর হাতীর পাল; এবং চার কোণে নানারকম লতা-পাতার কাজ। সেগুলির মধ্যে যে একটা বিশেষ অর্থ আছে তা দেখলেই বোধ হয়। মোগল decorative চিত্র সূক্ষ্মতা হিসাবে সর্বোৎকৃষ্ট বটে; কিন্তু অজস্তার আলঙ্কারিক চিত্রের মত অর্থ পূর্ণ বলে মনে হয় না। অজস্তাগুহায় গাছ-পালার চিত্রগুলিও প্রায় নিখুঁত। মোগল চিত্রেও বৃক্ষাদির ছবি অতি সুন্দর! পাশ্চাত্য শিল্পীদের মত ওরা শুধু তুলির স্পর্শে একটা গাছের ভাস্ক খাড়া করে দিয়ে নিশ্চিত হন না; তারা যতদূর সম্ভব গাছের পাতাগুলি এমন কি গুঁড়ির আকারের তারতম্য ঠিকভাবে একে গাছের পরিচয় দিয়ে দেন; অথবা ভারতবর্ষীয় চিত্রের গাছপালা দেখলে জিজ্ঞাসা করতে হয় না যে, 'এটা কী গাছ?' Perspective সম্বন্ধে অজস্তার ছবিতে প্রায় কোন ভুল দেখলুম না। মোগল শিল্পীরা বোধ হয় ও বিষয়ে ততটা লক্ষ্য রাখতেন না। আমরা এক নম্বর গুহার দেয়ালের এক জায়গায় একটা ছবির নকল নেবার সময় হঠাৎ পিছন ফিরতেই দেখলুম গুহার চারিদিকের বারান্দা দেওয়া প্রকাণ্ড হল ঘরটা

যেমন, চিত্রকরেরা যেন ঠিক সেইটে ছবি এঁকেছেন। এতে বোধ হয় যে, দেখেই ছবিতে একটা বাবাণ্ডা দেওয়া হলের তখন Perspective বলে একটা কিছু কথা



ছাদের নীচের কারুকার্য
(অজন্তার সপ্তদশ গুহার চিত্র হইতে)

না থাকলেও তাঁরা ও বিষয় নেহাৎ অজ্ঞ ছিলেন না। তবে, তাঁরা পাশ্চাত্য শিল্পীদের মত ওটাকেই ছবির সার বা চূড়ান্ত জিনিস বলে মানতেন না। অজস্র ছবি ছায়া-আলোক সমাবেশেও (shade and light) নয়ন-তৃপ্তিকর! বিলাতী ছবিতে যেমন ছবির একদিকে খুব আলো আর অপর দিকে আঁধার ঘনিয়ে দিয়ে ছবিব কোমলত্ব ঘুচিয়ে দেয়, এ তা নয়। অজস্র ছবিতে গঠন দেখাবার জন্তে কোন কোন জায়গায় সামান্য, কোন কোন জায়গায় প্রচুর shade দেওয়া আছে।—তাতে ছবিতে ভারি চমৎকার এক স্নিগ্ধ ও স্বাভাবিক ভাব এনে ফেলেচে! মোগল ছবিতে ক'চিৎ shade দেওয়া দেখতে পাঠি। ইহাব প্রধান কারণ,—তাঁরা সাধারণতঃ ছোট ছোট ছবি আঁকতেন বলে তাঁদের ছবিতে যেটুকু shade দিতেন তা চোখে প্রায় দেখা যায় না।

অজস্র চিত্রে আমরা আনাটমিক ভুল কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। আমাদের সঙ্গে যে একজন ইংরাজ মহিলা শিল্পী (Mrs. Herringham) ছিলেন, তিনি বলতেন, “এত প্রাচীন কালে আঁকা তোমাদের দেশে এরকম নিখুঁত ছবি দেখলে সত্য সত্যই আনন্দ হয়। আমাদের দেশে এরকম ছবি থাকলে আমরা তাদের নিজেদের জীবনের চেয়েও বেশী যত্ন করতুম! বড় দুঃখের বিষয় যে তোমরা এমন অমূল্য বস্তুর আদর জান না।” মোগল চিত্রকরণ স্থানে স্থানে anatomy এবং proportion সম্বন্ধে বিশেষ অগ্ৰথা করেচেন বটে, কিন্তু তাতে যে তাঁদের ছবির ছাব্ব লোপ পেয়েছে তা

নয়, বরং সেই জন্তেই তাঁদের অনেক ছবিতে স্তর শাস্ত্র ভাব এসেছে।

অজস্র ছবিতে আমরা যে সমস্ত নানারকমের নিখুঁত ভাবে আঁকা জীবজন্তু, পশু, পক্ষী, গাছ-পালা, প্রাসাদ, দোকান, প্রাচীর, কুটার প্রভৃতির চিত্র দেখতে পাঠি, সে সমস্ত কোনো আদর্শের অনুকরণ না কবে কেবল কল্পনার দ্বারা যে কি রূপে তাঁদের মাথায় এসেছিল তা আমাদের জানা তাত! তাঁরা তাঁদের চিত্রেব হ এক জায়গায় যে সমস্ত সংশোধন ও পরিবর্তন কবেছেন, সে গুলিব স্থানে স্থানে বং উঠে যাওয়ায়, তাহা অল্প অল্প প্রকাশ হইবে পড়েছে। সে গুলি দেখে, বেশ স্পষ্ট বোধ হ'ল যে, তাঁদের যা-কিছু যখন মাথায় আসত, অমনি গোবরমাটি-লেপা দেয়ালে সাদা বড়ের একটা জাম করে এক এক তুলির টানে তা একে যেতেন। তার পরে, তাদের ইচ্ছামত তাব উপর রং দিয়ে ঢেকে সংশোধন কিম্বা পরিবর্তন করতেন। আজকালকার মত পেনসিলের দাগ ব্যবহার বদাবে ঘসে ঘসে ইচ্ছামত বদলা কিম্বা শোধবাতে পারতেন না। এ বিষয়ে তৈল-চিত্রে অনেক সু বদা; কেন না, নরম মাটিতে পুতুল গড়ার মত একটা ছবির উপর অবলীলাক্রমে যেমন ইচ্ছা পরিবর্তন করা চলে। অজস্র শিল্পীরা ছবিতে সংশোধন করা একপ্রকার অসম্ভব জেনে, যে বিষয়টা আঁকতেন যথাসম্ভব তাব রূপ ধ্যান কবতে করতে যখন মানসচক্ষে দেখতেন সাদা দেয়ালেব উপর ছবিটা ফুটে উঠেছে তখন তুলিতে হাত দিতেন! মোগল চিত্রকরণ কিম্বা অগ্ৰ দেশের খুব অল্প শিল্পী

মহাত্মারাই-ওরকম পদ্ধতিতে ছবি আঁকতে জানতেন।

অজস্তা গুহার এক এক দেয়ালে এক এক ধরনের (style) ছবি। তা'তে বেশ বোঝা যায় যে গুহাগুলি একটা বিরাট শিল্প-বিদ্যালয় বা আশ্রম ছিল; এবং গুরু শিষ্যেরা মিলে এক একটা দেয়ালে ছবি আঁকতেন। আমরা অজস্তার দেয়ালে অসম্পূর্ণ ছবিও অনেক দেখেছি; কিন্তু, সে গুলির মধ্যে কতকগুলি অসম্পূর্ণ হ'লেও দেখে মনে হ'ল যেন কোন ওস্তাদেরই হাতের কাজ। হ নম্বর গুহায় এ অসম্পূর্ণ কাজের সংখ্যা অধিক। অল্পবয়স্ক বাগকের হাতের কাজও কোন কোন দেয়ালে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়।

গুহার ক্ষোদিত শিল্পেও চিত্রশিল্পীগণ রং দিতে ছাড়েন নি; ছয়ের নম্বর গুহার বারাণ্ডায় দেখলুম থামের উপর এবং থামের ধারে ধারে সাদা high light দিয়ে থামের গঠন ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই নির্জ্বল ইন্দ্র-পুরী তুল্য গিরিগুহায় নির্ঝরীর পাশে, স্তম্ভ স্তম্ভ ভাবে বিভোর হ'য়ে পুণ্যাত্মা শিল্পিরা বাদর পেঁচা যা কিছু এঁকে গেছেন তারই ভিতর থেকে যেন আমরা এক অমৃতময় শান্তি ও আনন্দের বিকাশ দেখতে পাই! অজস্তার ছবির আর একটি বিশেষ বাহাজুরী এই যে, কোন ছবি কোনটার নকলে আঁকা হয় নি। প্রত্যেকটার ভাব ও ব্যাপার ভিন্ন। কালিদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিরা বর্ণনায় যে যে ভাব ব্যক্ত করে গেছেন, অজস্তার ছবিতে সেই সমস্ত ভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। কালিদাস যেমন বিবাহের বরষাত্রী দেখবার

জন্তে উৎসুক মহিলাদের কাউকে লাজ-বর্ষণ-তংপরা, কাউকে চুল বাঁধতে বাঁধতে,— কাউকে বা আলতা পায়ে দিতে দিতে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে জানালার কাছে উঠে আসতে দেখিয়েছেন;—অজস্তাতেও ঠিক সেই সমস্ত ভাবের ছবি অঙ্কিত আছে। পদ্মবনে হাতী, হংস-মিথুন, চকা-চকি, মৃগ-মৃগী প্রভৃতি পূর্ব কবিদের বর্ণিত বিষয় অজস্তার ছবিতে দেখতে পাই। পূর্ব কবিরা যেমন সুন্দরী ললনার উপমায় কৃশাঙ্গী, পীণপয়োধরা প্রভৃতির দ্বারা আকৃতি-বর্ণনা করতেন, আমরা অজস্তাতে ঠিক সেই বর্ণনার অমুরূপ চিত্র দেখতে পাই। কালিদাসের রঘুবংশে আছে, বন পথ দিয়ে যখন মহারাজ দিলীপ আর রাণী সুদক্ষিণা পুত্রকামনার বিমানে চড়ে বশিষ্ঠঋষির আশ্রমে যাচ্ছেন, তখন তাঁদের রথের শব্দে হরিণ-হরিণীগণ কিছু মাত্রও ভীত ব্রস্ত না হ'য়ে বরং যেন রাজা রাণীকে দেখ'বাব জন্তেই পথ ছেড়ে রথবন্ধের দিকে অনিমেষ নেত্রে চেয়ে আছে। অজস্তা চিত্রের মধ্যেও একটা ঠিক এই ভাবেরই ছবি আছে।

আমরা ছবিতে এমন-সব অনেক জিনিষ আঁকা দেখতে পাই, যে গুলো আমরা আমাদের ভারতের জিনিষ ব'লে মোটেই জানি না।—আমাদের বোধ হয় কারো ধারণাই নেই যে, বগলস'টা আমাদের দেশে অনেকদিন থেকে চলে আস্চে! একটা ঘরে, কলকাতার ঠিক কুক কম্পানির ঘোড়ার আড়গড়ার মত অনেকগুলি ঘোড়া রাখা আর ছকের উপর সাজসরঞ্জাম টাঙান। দেখলে সত্যি সত্যি অবাক হয়ে যেতে হয়!

অজস্তার ছবি দেখলে বেশ বোঝা যায় যে, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার আদব কায়দায় যেমন কোট বা কুর্তা-না পরলে সভ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হওয়া যায় না, এবং অধিক গহনা পরাটা যেমন ভয়ানক বর্জ্যতা, অজস্তার ছবিতে দেখি, ঠিক তার বিপরীত। যত নর্তক-নর্তকী আর সাধারণ লোকদের গায় কোর্তা জাঁটা, গয়না নেই বললেও হয়। আর যত বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত লোকের অঙ্গেই অলঙ্কারের পরিমাণ বেশী। বড় লোকদের গায় কখনও কখনও কোমরে একটা নাম মাত্র সূক্ষ্ম উত্তরীয় ফিতের মত ক'রে বাঁধা। আর ভূত্যগণ তাঁদের পার্শ্বে পান-পাত্র কিম্বা আর কিছু নিয়ে একান্ত অমুগত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। খুব সম্ভব সেই সমস্ত দাসেরা বিদেশীয়। যার যত পদমর্যাদা ও সম্মান

বেশী তাঁর গায়ের গহনার মূল্যও তত অধিক।

অজস্তায় যে কেবল বড় বড় ছবিই আছে তা' নয়। ১৭নং গুহার সামনের বারান্দার এক পাশে দেয়ালে একটা প্রকাণ্ড রথের চাকার ভিতর টুকরো টুকরো ছোট ছোট অনেক ছবি সুন্দর ভাবে আঁকা আছে। অজস্তায় যেমন মানুষের চেয়ে বড় ছবি দেখা যায়, তেমনি চার পাঁচ ইঞ্চি ছবিও বিরল নয়। মোগল ছবি সাধারণত ছোটই বেশী দেখতে পাওয়া যায়; সূক্ষ্মত্ব হিসাবে আজ পর্য্যন্ত কোন দেশের চিত্র ওর কাছে ঘেঁসতে পারেনি, কিন্তু অজস্তার মত প্রশান্ত ভাবপূর্ণ এবং বড় চিত্রও বোধ হয় আর কোথাও নেই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅসিতকুমার হালদার ।

অক্ষমালার উৎপত্তি

পাটীগণিত বাঙলার নিজস্ব বলিলেও চলে; কারণ শুভঙ্কর বাঙালী ছিলেন এবং তাঁহার আর্ঘ্য, দেহের পক্ষে মাতৃহৃৎের ত্রায় প্রত্যেক বঙ্গবাসীর মস্তিষ্কের স্বাভাবিক পরিপোষক! মানসাক্ষ এই পাটীগণিতেরই অঙ্গ মাত্র, এবং বাঙালী যে এককালে বর্তমান মাড়ওয়ারীগণের ত্রায় অতীব চতুর ও কর্মঠ ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহার অদ্ভুত ক্ষিপ্রগণনাকৌশলই তাহার প্রমাণ। বিবিধ প্রকার Table বা Ready Reckoner সাহায্যে, উচ্চ-বেতন-ভোগী বর্তমান হিসাব-

নবীশ যাহা কষিতে গিয়া ডেসিমেলের সাহায্যে (ছুরদৃষ্ট বশতঃ তাহা আবার মধ্যে মধ্যে Recurringএ পরিণত হয়) কোনরূপ একটা মোটামুটী সমাধা বাহির করেন, অনধিক-পঞ্চদশমুদ্রা-বেতন সে কালের পাঠশালে পড়া সরকার বা মুছরী, কড়াক্রান্তি মিলাইয়া তাহার সিকি সময়ে সেই সমাধাটি মুখে মুখে বলিয়া দেন। দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে গিয়া আজি কালিকার শিক্ষাভিমানী কয়জন, দাম ঠিক হইল কিনা বুঝিয়া লইয়া মূল্য দিয়া থাকেন? বিশেষতঃ ইংরাজের দোকানে

হইলে বিনা বাক্যব্যয়ে বিক্রেতানির্ধারিত মূল্য দিয়া আসিয়া, পরে বাটীতে কাগজ কলমের সাহায্যে হিসাব করিয়া দেখিতে হয়।

শুভঙ্করের মানসাক্ষের শিক্ষা থাকিলে আর একরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। বাঙালী যে পাটীগণিত বা তদঙ্গীভূত মানসাক্ষে নির্ধারিত পৃথিবীর অপরজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার কারণ ইহা বলা যাইতে পারে যে বঙ্গদেশ হইতেই অঙ্কমালার (Numerals) সৃষ্টি। যে জাতি যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বর সেই জাতির মধ্যেই তাহার উদ্ভব বা প্রথমাবিকার ঘটাইয়া থাকেন। বিজ্ঞানপটু ইয়োরোপীয় জাতির মধ্যেই বাষ্পীয়যান ও বিদ্যুৎযান প্রভৃতি যন্ত্রের প্রথমাবিকার; অধুনা কৃত্রিম শিল্প-বিদ্যাবলে সস্তার প্রলোভন দেখাইয়া জন্মি, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীগণের মধ্যেও নিজ বাণিজ্য বিস্তারে প্রয়াসী, সেই জন্তু কৃত্রিম প্রণয়ন বিদ্যা এক্ষণে জন্মিগিরই একরূপ একচেটিয়া বলিলেই হয়। বাণিজ্যকুশল বাঙালী, সেই জন্তুই বহুপূর্বে, অঙ্কমালার উদ্ভাবনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

উক্ত কথার সমর্থনোপযোগী প্রমাণ প্রয়োগের পূর্বে এইটুকু বলিয়া রাখি যে ইয়োরোপীয়গণ এক্ষণে স্বীকার করেন যে ভারতেই পাটীগণিতের প্রথম আবির্ভাব। ছোট বড় সকল ঐতিহাসিকই বলেন পাটীগণিত ভারতভূমি হইতে প্রাচীন আরব-গণ কর্তৃক মিশ্রদেশ পথে ইয়োরোপে আনীত হয়—সুতরাং উহার পুনঃ সমর্থন নিশ্চয়োজন। এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই যে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের কোন প্রদেশ বা দেশে ইহার প্রথম উৎপত্তি। আমি নিম্নলিখিত যুক্তি দ্বারা এইটুকু প্রমাণ

করিবার চেষ্টা করিব যে আমাদের ‘মোনার বাঙলা’ই অঙ্কমালার উৎপত্তি স্থান।

প্রমাণ।

১। এক, দুই, তিন, চারি, প্রভৃতি শব্দের মাত্রা বর্জিত প্রথম বা প্রধান অক্ষর ও অঙ্কমালার অঙ্কগুলি পরস্পর পার্শ্বে রাখিয়া উহাদের আকার সাদৃশ্য অবলোকন করুন। যথা :—

| | | |
|----|---|------|
| ১ | এ | এক |
| ২ | দ | দুই |
| ৩ | ত | তিন |
| ৪ | চ | চারি |
| ৫ | প | পাঁচ |
| ৬ | ছ | ছয় |
| ৭ | স | সাত |
| ৮ | ট | আট |
| ৯ | ন | নয় |
| ১০ | শ | দশ |

বলা বাহুল্য, ট-ই আট শব্দের প্রধান অক্ষর ও শ-ই দশ শব্দের প্রধান অক্ষর! প ও ছ অক্ষর দুইটির সামান্য পরিবর্তনেই অর্থাৎ একের দাঁড়ি ও অপরের পুচ্ছ বাদ দিলেই ৫ ও ৬ হয়। “যোড়া পুটুলী শ লেখো!” কে জানিত এই যোড়া পুটুলী শ-ই অঙ্ক মালার ‘জান’ “০” অঙ্কের উদ্ভাবক? শ এর দাঁড়ি বাদ দিলেই ১০ অঙ্কটি পাওয়া যায় এবং শ এর দ্বিতীয় পুটুলীই শূণ্য “০” অঙ্কের মূল।

দৈব সাহায্যই অনেক আবিষ্কারের মূল! মৃত ভেক-দেহের সহসা স্পন্দনই বিদ্যুৎ শক্তির উদ্ভাবক। দ্বিবিধ ধাতু ও তাহাদের সংযোগ সঙ্কেতের নির্দেশক। দশ শব্দের শ অক্ষরটির এই বিচিত্র পুটুলী বহুল আকৃতি না থাকিলে

‘শূন্য’ প্রাণ অক্ষর মালার সৃষ্টি আদৌ হইত কি না, কে বলিতে পারে ?

২। এগারো, বারো, তেরো, প্রভৃতি শব্দের ও তাহার অর্থ ও অক্ষর লিখন প্রণালী পর্যালোচনা করিলেও বুঝা যায় দশ অক্ষর দুই অক্ষর বিশিষ্ট (১ ও ০) হইবার পর, এগারো অর্থাৎ এক আর ও, বারো অর্থাৎ দুই আরও, তেরো অর্থাৎ তিন আরও এই রূপ ভাবে পর পর অক্ষরগুলি এক অক্ষরের

পাশে যোজনা করিয়া অপর অক্ষরগুলি লেখা হয় ।

৩। শ হইতেই যে শূন্য (০) অক্ষরের সৃষ্টি, তাহা বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ প্রভৃতির অক্ষরপাত প্রণালী দ্বারা সমর্থিত হয় ।

৪। শূন্যের এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা উপলব্ধি হইবার পর, অপর শূন্য প্রয়োগে ১০০, ১০০০, প্রভৃতি অক্ষরের সৃষ্টি হইয়া পাটীগণিত সম্পূর্ণ হইয়াছে—বলা বাহুল্য ।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

সমালোচনা ।

ঝুমঝুমি । শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত । ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত । কাস্টিক প্রেসে মুদ্রিত । মূল্য ছয় আনা । এখানি শিশুপাঠ্য গল্পের বহি । গল্পগুলি জাপানীগল্পের ভাব লইয়া রচিত । লিপিচাতুর্য্যে মৌলিক গল্পেরই মত সুন্দর ফুটিয়াছে । গল্পগুলি সহজ সরল ভাষায় উপভোগ্য, কোতুক ও আনন্দ-রসের ধারায় সুস্নিদ্ধ । পাঠ করিলে ছরস্তু শিশুও বশ মানিবে । শিশুসাহিত্য-রচনায় মণিলাল বাবুর দক্ষতা অসাধারণ । “ইন্ডেরের মোকর্দ্দমা” কবিতাটি সুন্দর, বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব ও মনোরম । গ্রন্থে এগার খানি নানাবর্ণে রঞ্জিত চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । মলাটের উপর ফার্সী ছাদে গ্রন্থের নাম ও ঝুমঝুমির চিত্রখানি চমৎকার হইয়াছে । ছাপা কাগজও উৎকৃষ্ট ।

হৃদয় ও মনের ভাষা । শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত । কুস্তলীম প্রেসে মুদ্রিত । মূল্য চারি আনা । এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা স বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি । ‘আগে ভাব খোঁজ, ভাষার অভাব থাকিবে না,’ ‘যে মানুষ ও যে জাতি যেমন, তাহার চিন্তা ও ভাবও তেমন—তাহার ভাষাও তেমন । ইংরাজী ও পার্সী শক্তির ভাষা—বলের ভাষা । সঁস্কৃত ও গ্রীক, সত্য ও সুন্দরের ভাষা । ল্যাটিন

জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাষা । ইটালিয়ান, উর্দু ও বাঙ্গালা স্নেহের কোমলতার ভাষা,’ ‘ভাষার মধ্যে মানবের চিন্তা ভাব ও জীবনের অস্থি, কঙ্কাল সমাধিস্থ’ প্রভৃতি কয়েকটি সুগভীর সত্য লেখকের যুক্তিতর্কে বেশ সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । দুই এক স্থলে লেখকের সহিত আমরা মতের মিল হয় নাই, তথাপি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা লেখকের সুগভীর চিন্তাশীলতা, ও কাব্যরসগ্রাহিতার পরিচয় পাইয়াছি । গ্রন্থখানিতে একটিও বাজে কথা নাই, এইটুকুই ইহার মনোরম বিশেষত্ব ।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব । ারামগতি গ্রায়রত্ন প্রণীত । শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল কর্তৃক সম্পাদিত । তৃতীয় সংস্করণ, ১৩১৭ । বাণী প্রেসে মুদ্রিত । মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র । বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে এইখানিই প্রথম গ্রন্থ । ভূমিকা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অনুলাচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন, “বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে এরূপ ভাবের আলোচনা গ্রায়রত্ন মহাশয়ের পূর্বে কেহই করেন নাই । সাহিত্য পথের পরবর্তী পথিকেরা * কেহই নূতন মার্গে বিচরণ করিতে পারেন নাই । * * গ্রায়রত্ন মহাশয় যে অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন,

পরবর্তী পুস্তিকা সেই অটালিকার চুণ-বালি ধরাইয়া রঙ ফলাইয়া শিল্পীর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন মাত্র, নক্সা বদলাইতে পারেন নাই।” গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষার পরিবর্তনের কালকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন আঢ়, মধ্য ও ইদানীন্তন অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার বাল্য যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা। অনির্দিষ্ট কাল হইতে চৈতন্যদেবের প্রাচুর্য্যকাল অবধি বাল্য, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও কৃষ্ণিবাস এই কালের লেখক। পরে ভারতচন্দ্রের সময় অবধি যৌবন, মুকুন্দরাম, ক্ষেমানন্দ, কাশীরাম, রামপ্রসাদ প্রভৃতি এই কালের লেখক এবং তাহার পর ইদানীন্তন অথবা বাঙ্গালা ভাষার প্রৌঢ়কাল। গ্রন্থখানির উপাদেয়তা সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও ইহা বেশ সহজভাবে আগাগোড়া পাঠ করিতে পারিবেন। গবেষণার অত্যধিক ভারে বস্তব্য কোথাও চাপা পড়ে নাই—গ্রন্থের ধারাবাহিকতাটুকু গ্রন্থকারের লিপিকুশলতায় কোনখানে প্রচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট হয় নাই। প্রাচীন সাহিত্যের কাল-নিরূপণাদি সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্য অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে, সম্পাদক মহাশয় ফুটনোটে সে সমস্তই পরিবিষ্ট করিয়াছেন। পুরাতন মতও বাদ দেওয়া হয় নাই! গ্রন্থকার সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও কবিবর মাইকেল সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত অনেকেরই সহানুভূতি হইবে না। গ্রন্থের পরিশিষ্টে বাঙ্গালার সমগ্র সাময়িক পত্রাদির সতারিখ এবং কতিপয় নবীন গ্রন্থকারের বর্ণনাত্মক তালিকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকারদিগের নামের তালিকায় সম্পাদক মহাশয় ‘বাহুল্যভয়ে’ বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারেন নাই; উক্ত তালিকায় অপ্রথিত বা অজাত নামা প্রায় সাত আট জন লেখকের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, অথচ সুকবি ৮২জনীকান্ত সেন, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, ও নবীন আরো দুই চারি জন প্রতিভাশালী লেখক এবং কবি প্রিয়ম্বদা দেবী, শরৎকুমারী চৌধুরাণী প্রভৃতির নামোল্লেখ দেখিলাম না। সম্পাদক মহাশয়ের এ কর্তব্য-শৈথিল্য উপেক্ষণীয় নহে। আশা করি ভবিষ্যতে এ ত্রুটি স্থালিত হইবে।

কবীর। প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত ক্ষিত্তিমোহন সেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রম। বোলপুর। মূল্য ছয় আনা। সাধু কবীর রচিত প্রায় শতাধিক দৌহাবলী অনুবাদসহ সংগৃহীত হইয়াছে। কবীরের দৌহার নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। ক্ষিত্তিবাবু বিস্তর পরিশ্রম করিয়া বহু নূতন দৌহ সংগ্রহ করিয়াছেন,— অনুবাদগুলির ভাষা বেশ সরল ও প্রাঞ্জল—মূলের ভাব কোথাও নষ্ট হয় নাই। এই গ্রন্থখানি বঙ্গভাষার সম্পদ যে সমধিক বর্দ্ধিত করিয়াছে সে কথা বহু বাহুল্যমাত্র। গ্রন্থের ভূমিকায় কবীরের সংক্ষিপ্ত জীবনী-পরিচয়ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লেখকের উচ্চম জয়যুক্ত হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সাবিত্রী। শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রণীত। মূল্য ছয় আনা। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণে আমরা বই খানির যে প্রশংসা করিয়াছিলাম তাহার অতিরিক্ত বলিবার কিছু নাই।

রেখা। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রণীত। মূল্য বারো আনা। এখানি কবিতার বই। যতীন্দ্রবাবু কবিতা লিখিয়া বশস্বী হইয়াছেন। তাহার রচনায় কবিত্ব আছে, ভাবে মৌলিকতা, ভাষায় সরলতা, শব্দচিত্রে নিপুণতা ও ছন্দে একটা সীলা আছে। তাহার বর্ণনাগুলি ছবির মত ফুটিয়া উঠে। তাহার কোনে' কোনো কবিতা রবিবাবুর ভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও সেগুলি উপভোগ্য। *

টুনটুনির বই। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত। কাল্পনিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি শিশুপাঠ্য গল্পের বই। ‘টুনটুনি পাখী,’ ‘দুষ্ট বিড়াল,’ ‘নরহরি দাস,’ ‘বুদ্ধুর বাপ,’ ‘পান্তবুড়া’ প্রভৃতি চিরপরিচিত গল্পগুলি গ্রন্থকারের সহজ সরল রূপকথার ভাষায় চমৎকার ফুটিয়াছে। বইখানির জন্ম শিশুরাজ্যে স্নেহমত কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে। গল্পগুলি আগাগোড়া হৃদয়-গ্রাহী এবং সেগুলির মধ্যে বেশ একটি মনোরম বৈচিত্র্য আছে। বইখানির পাতায় পাতায় ছবি— আকারে ছোট হইলেও সংখ্যায় অনেক। কভার

কাগজ পরিপাটি, এবং ছাপা, কার্তিক মাসের স্বাভাবিক মুদ্রণ-নৈপুণ্যেরই প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

আর্য্য-বিধবা । শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত কর্তৃক বিরচিত ও বগুড়া হইতে প্রকাশিত। রায়প্রেসে মুদ্রিত। ১২৯৯ সাল। মূল্য তিন আনা। ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে বিধবার কর্তব্যাদি সম্বন্ধে লেখক সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। সুখপ্রিয়া নিরাশ্রয়া বা সংযম-অক্ষমা নারীর পক্ষে বিবাহ দোষের নহে, কর্তব্য; তবে ব্রহ্মচর্যের আদর্শ-গৌরব চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ইহাই এ ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানির প্রতিপাদ্য। লেখকের যুক্তিগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত; গ্রন্থে কোথাও গোঁড়ামি নাই—সকলদিকই লেখক সহৃদয়তার সহিত আলোচনা করিয়াছেন।

গার্গী । শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত এল, এম, এস প্রণীত। নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য তিন আনা। গ্রন্থকার ক্ষমা করিবেন—তাঁহার বিরাট ভাষা-গহন ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া আমাদের সাধ্যাত্ত নহে। রচনা যেমন নীরস, তেমনই দুর্কোথা জটিল, গ্রন্থে ভাষার দোষ ও দৈগ্ণের দৃষ্টান্তও প্রচুর।

বঙ্গের রত্নমালা । বা বঙ্গীয় সমাজের কতিপয় নীতিগর্ভ ঘটনা ও চরিত্র। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। নববিভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত। বাঁধাই মূল্য দশ আনা। বালকবালিকাগণের নীতিশিক্ষা প্রদানোদ্দেশ্যে সাধারণ ও অসাধারণ বাঙ্গালী-জীবনের ছোট বড় ঘটনা হইতে সৌভ্রাত, পরদুঃখানুভব, আহায়ে সংযম, চরিত্রে বল, কর্তব্য-পালন, প্রভুপরাযণতা প্রভৃতি শিক্ষণীয় গুণাবলীর দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার একটা উপভোগের দিক আছে। দেবচরিত্র বা বিদেশীয় মহৎচরিত্র অনেকস্থলে হৃদয়ে ঠিক ততখানি দাগ টানিতে পারে না, যতখানি আমাদেরই মত 'সাদাসিধা' বাঙ্গালী চরিত্রের দ্বারা সম্ভব হয়! গ্রন্থকার কলেজের অধ্যাপক হইলেও তাঁহার ভাষা বঙ্গ-নির্ঘোষের মত কর্ণপটের পীড়াদায়িকা নহে, তাহা বেশ সরল ও সতেজ! সহৃদয়তার গুণে গল্পগুলি বেশ ফুটিয়াছে। তবে মাঝে মাঝে ভাবভঙ্গির অভিব্যক্তিতে অযথা বাড়াবাড়ি আছে। যথা, "জননী এক অপূর্ব

মূর্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি-ক্ষুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল।" 'চক্ষু দিয়া অগ্নিক্ষুলিঙ্গ বাহির' প্রভৃতি রচনারীতি নিতান্তই অসহ্য ঠেকে! বালক বালিকাগণের নীতিশিক্ষার উপযোগী ত গ্রন্থখানি বটেই, উপরন্তু অভিভাবকগণও ইহা পাঠে পরিতৃপ্ত হইবেন। গ্রন্থের ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর হইয়াছে।

খোকার বই । দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বসু প্রণীত। বারদী ঢাকা হইতে প্রকাশিত। মূল্য তিন আনা মাত্র। এখানি শিশু-পাঠ্য গ্রন্থ। গ্রন্থের ভাষা কটমট, নীরস এবং দুর্বল। "হরিভক্ত প্রহ্লাদ", "ভারতবর্ষ" প্রভৃতির ভাষা নিতান্তই অসহ্য। কবিতাগুলিতে না আছে ভাব বা ভাষা, না আছে কোমল লালিত্য। কোন আখ্যানই ভালো করিয়া ফুটে নাই! শিশুদিগের পক্ষে গ্রন্থখানির উপযোগিতা বিষয়ে আমাদের যোরতর সন্দেহ আছে! পাঠে অনুরাগের পরিবর্তে শিশুহৃদয়ে বিভীষিকার সঞ্চার হইবে।

মেহেরনেগার-কাব্য । শ্রীযুক্ত আব্বাছ-আলী : প্রণীত। মৈমনসিং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। গ্রন্থখানি কাব্য কি হেঁয়ালি ঠিক বঝিতে পারা গেল না। কবিত্বেরও একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইল। নমুনা স্বরূপ দুই ছত্র উদ্ধৃত হইল।

"* * বলি, এক কোটা বিষপূর্ণ,
সকরে গলায় ঢালি পড়িলা ভূতলে।"

উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক । প্রকৃত ঘটনামূলক উপন্যাস। প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত। সাধনপুর "শরৎ পুস্তকালয়" হইতে প্রকাশিত। চট্টগ্রাম সনাতন যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। এমন বীভৎস ও সৃষ্টিছাড়া কল্পনা কচিৎ দেখা যায়। পনের বৎসরের বালক ও বারো বৎসরের বালিকা সকলেই গ্রামের পাঠশালায় একসঙ্গে পাঠাভ্যাস করেন এবং প্রেমে পড়েন। গ্রন্থের নায়ক স্কুল পরিদর্শনে গিয়া একটা বার বৎসরের বালিকার হাত ধরিয়া 'বেগী বড় দুঃস্থ বালক' পড়াইতেছিলেন, সহসা তাঁহার "শরীর শিহরিয়া উঠিল। হৃদয়ে তাড়িৎ-

বৎ কি প্রবেশ করিল। চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে পাইলেন; পুনঃ পুনঃ বালিকার মুখ দেখিবার ইচ্ছা জন্মিল।' আবার টিপ্তনী আছে,—“ঈশ্বরের সব ইচ্ছা” আমরা বলি, প্রভু উপাশাসিক, আপনারই সব ইচ্ছা! এমন হীন প্রকৃতির যুবককে বালিকাবিদ্যালয়ের সীমানায় প্রবেশ করিতে দিতে নাই,—প্রেমে পড়িবার জন্ত ইহারা যেন সর্লদা উদ্গীৰ হইয়া রহিয়াছে। এমন কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত লেখককেও উপাশাস লিখিতে হইবে। হায় বঙ্গসাহিত্য!

কায়স্থ দর্পণ। প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত। সাধনপুর কায়স্থ সভা হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা বিশ্বকোষ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, তাঁহাদের উপনয়ন সংস্কার বিধেয় এবং উপনয়নের প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখক বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। কায়স্থগণের আচার ব্যবহার ও প্রধান প্রধান বংশের পরিচয়ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থখানি নানা তথ্যে পূর্ণ, কৌতূহলোদ্দীপক। কায়স্থগণের নিকট সমাদর লাভের যোগ্য।

শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা। শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য লিখিত নাই। গ্রন্থকার সুপণ্ডিত। “তিনি শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে এক বিপুল গ্রন্থের আয়োজন করিয়াছেন, এই পুস্তিকা তাহার ভূমিকা।” প্রথম ভাগে “শিক্ষাতত্ত্ব” ও দ্বিতীয় ভাগে “শিক্ষার প্রণালী” সবিস্তারে আলোচিত হইবে। ভূমিকায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় “গ্রন্থকারের যোগ্যতা অধাবসায় ও ঐকান্তিকতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া” এ মহৎ অনুষ্ঠানের সফলতা সম্বন্ধে সর্বশেষ আশাবিত্ত। আমরাও তক্রপ আশাবিত্ত। গ্রন্থকার শিক্ষাব্রতে আপনার সকল চিন্তা সফল চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন। শিক্ষাদান কার্যে তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী—সমগ্র ভারতবাসীর শ্রদ্ধাভাজন। ‘শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা’ পাঠে গ্রন্থকারের শক্তি সম্বন্ধে কাহারো সংশয় থাকিতে পারে না। এমন পাণ্ডিত্য ও তাহার সদ্যবহার আজিকালিকার এ স্বার্থের যুগে দুর্লভ,

প্রাচীন ভারতের কথা মনে পড়ে। বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে এই গ্রন্থ বিরাজ করুক। শিক্ষার প্রকৃষ্টতর আদর্শ বাঙ্গালী উন্নতির পথে উঠিবে সে বিষয়ে সন্দেহ-মাত্র নাই। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

প্রব। শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত প্রণীত। নবভারত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। লেখক আধুনিক নভেলের ছাঁচে ক্রবোপাখ্যান লিখিয়াছেন। রচনাটি ব্যর্থ হইয়াছে। যাত্রার ধরণের উচ্ছ্বাস ও হীন নাটকের রুচিব পরিচয়ই সর্বত্র প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ স্কচি-চরিত্রে রুচির মর্ধ্যাদায় লণ্ডাঘাত করা হইয়াছে।

সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ও মহাভারত।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক সংকলিত। সরকার এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত। লোকনাথ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারতের সংক্ষেপ-সঙ্কলনে সঙ্কলয়িতা বেশ কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। প্রয়োজনীয় অংশগুলি কোথাও বাদ পড়ে নাই। ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। তবে ফুটনোটের টীকাগুলি সর্বত্র সহজ হয় নাই। ‘স্বয়ম্বর’র ব্যাখ্যা ‘নিজেই স্বামী বাছিয়া নিতে ইচ্ছিতা’ তেনন সহজ বলিয়া মনে হইল না। গ্রন্থে দুইখানি হাফটোন চিত্র আছে—ছাপা ভাল, তবে পরিকল্পনা সুখ্যাতির যোগ্য নহে। গ্রন্থের মূল্য সুলভ।

অভিনয়-প্রণালী ও অথার। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী দত্ত প্রণীত। শ্রীঅমূল্যচরণ নাগচৌধুরী (নাট্যভূষণ) কর্তৃক প্রকাশিত। গ্রেট ইডিন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনামাত্র। ‘অভিনয় সম্বন্ধীয় পুস্তকের অভাব হেতু এবং অধুনা অভিনয়ের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া’ গ্রন্থকার লেখনী ধরিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাহার প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। গ্রন্থকার ‘অভিনয় প্রথারূপ পথের আবর্জনা’ দূর করিতে গিয়া বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে আবর্জনা নিক্ষেপ করিয়াছেন। পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া প্রহসনকারের গীতের ছত্র মনে পড়ে, ‘আপনি অন্ধ দৃষ্টি বন্ধ, পরকে দেখায় পথ।’ ‘অথার’ ক্ষুদ্র রঙ্গপ্রহসন। ‘অথার’ নামধারী অক্ষম লেখককে বাঙ্গ করাই ‘অথারের’

উদ্দেশ্য । পাঠ করিয়া 'ছু'চ' ও 'চালুনীর' প্রচলিত প্রাচীন প্রবাদ-কথা, মনে পড়ে ।

সংসারী । (হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা পুস্তক) ডাক্তার এন. সি. ব্যানার্জী প্রণীত । দ্বিতীয় সংস্করণ । সংশোধিত ও পরিবর্ধিত । শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । পশুপতি প্রেসে মুদ্রিত । মূল্য বার আনা । গ্রন্থখানিতে হোমিওপ্যাথি মতে রোগ নির্দেশ ও ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা বেশ সহজ ভাষায় সরলভাবে বর্ণিত হইয়াছে । জ্বর, ওলাউঠা, ও জটিল স্ত্রী-ব্যাধি হইতে ক্রিমি, চুলকণা অবধি রোগের ঔষধ নির্দেশে গ্রন্থখানি সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে বিশেষ উপ-যোগী হইয়াছে । অথচ গ্রন্থের কলেবর হিসাবে মূল্যও সুলভ । ডাক্তার মহাশয়ের ইংরাজী ধরণে নামকরণের সহিত আমাদের কোন সহানুভূতি নাই । এ ব্যাধি তাঁহাকে সহসা আক্রমণ করিল কেন, ইহার প্রতিকার সাধনে ডাক্তার মহাশয়ের মনোযোগ আমরা সবিনয়ে আকর্ষণ করিতেছি । এ নাম-বিভ্রাট আর কেন ?

শ্রীসত্যব্রত শর্মা ।

খাণ্ড । শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু প্রণীত । মূল্য এক টাকা । আমরা চুনীলাল বাবুর খাদ্য সম্বন্ধে পুস্তকখানি অতি যত্নের সহিত পড়িয়াছি । পুস্তকখানি প্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠায় পূর্ণ ও নানা বিষয়ের অল্পনীলনে বড়ই শিক্ষাপ্রদ ও সুখপাঠ্য হইয়াছে ।

সাধারণ পাঠকের বুদ্ধিবাহার সুবিধার জন্য শারীর বিজ্ঞানের পরিপাক প্রণালীর ও ছবির সহিত সরল বিবৃতি আছে । তা ছাড়া আরও অনেক অত্যাশ্চর্যকীয় বিষয় সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । যথা

স্বাস্থ্যের সহিত খাদ্যের সম্বন্ধ ।

খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান ও তাহাদের গুণ ।

খাদ্যের পরিমাণ নিরূপণ । নিত্য ব্যবহার্য খাদ্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা ।

রন্ধন । আমিষ ও নিরামিষ ভোজন । খাদ্যে ভেজাল ও ভিন্নরূপের উপায় । ইত্যাদি ।

আমাদের দেশের খাদ্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে ; কিন্তু খাদ্য সম্বন্ধে পুস্তক বঙ্গভাষায়

অতি বিরল । ডাক্তারবাবুর এই ছোট পুস্তকখানিতে আমাদের আয়ুর্বেদীয় ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথা বিবৃত আছে । তাহাতে পুস্তকখানি দেশের লোকের খাদ্য সম্বন্ধে পড়িবার ও শিখিবার বড়ই উপযোগী হইয়াছে । পুস্তকখানির ভাষা অতি সরল ও বলিবার প্রথা অতি প্রাঞ্জল হওয়াতে সকলেরই সহজে বোধগম্য হয় ।

আমাদের দেশে বিশেষ কলিকাতায় প্রায় সকল খাদ্যদ্রব্যই অল্প বিস্তর ভেজাল দেওয়া । আইন করিবার সময় এমন একটু শিথিলতা ছিল যে লোকে ভেজাল জিনিস বেচিলেও যদি

“ভেজাল দেওয়া” “মিশ্র দুধ” “মিশ্র ঘী”

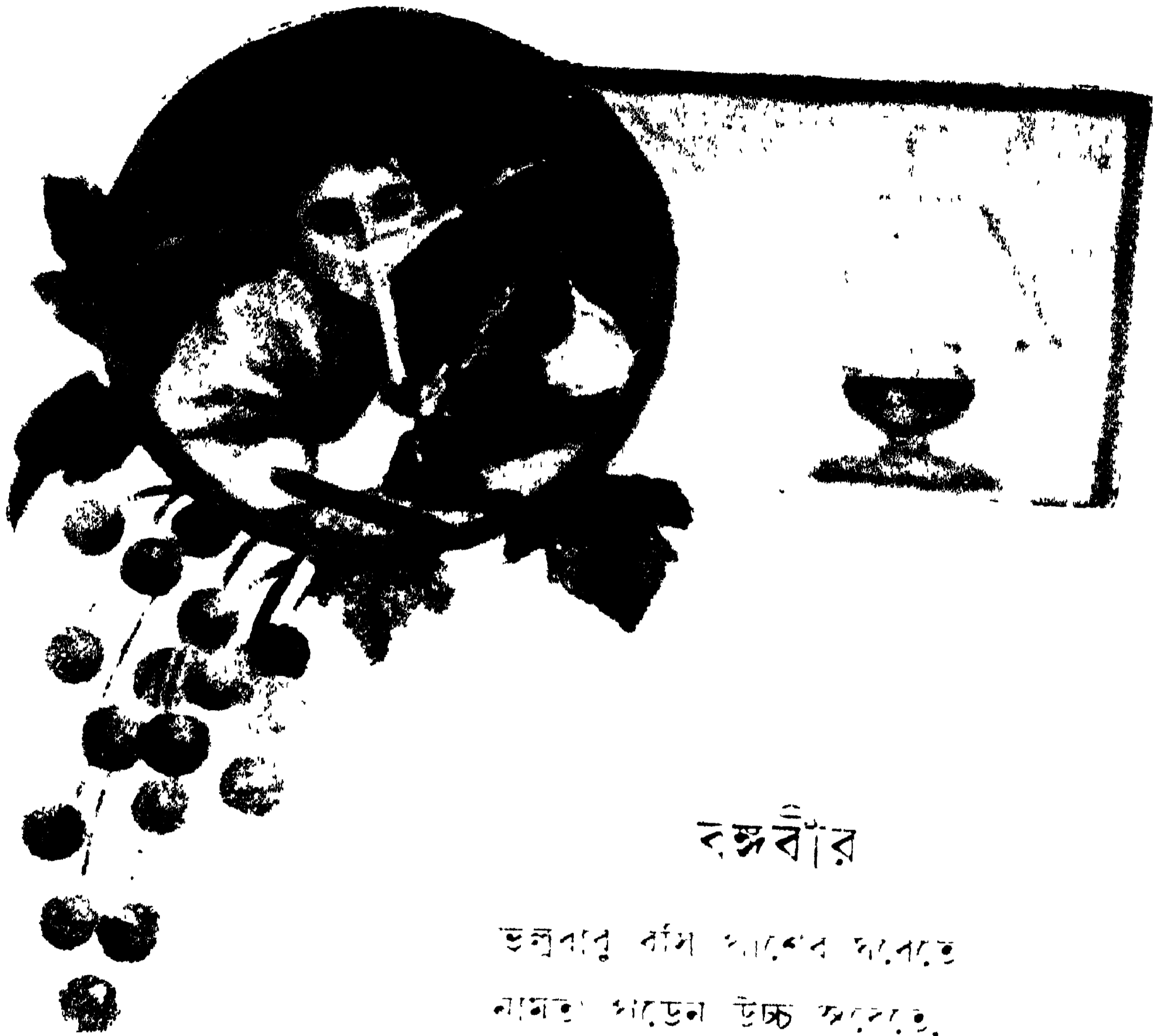
বলিয়া বেচে, তবু তার আইনমত দোষ হয় না । চুনীলাল এসকল নিবারণ করিবার অনেকগুলি উপায় দেখাইয়াছেন । তিনি সাধারণ লোকদেরও সাবধান হইতে বলেন ও কোম্পানী বাহাদুরকে আইন সংস্কার করিতে বলেন ।

চুনীলাল এই মত অনুসরণ করিয়া যদি ভেজাল দেওয়া খাওয়ার প্রচলন বন্ধ হয় ত দেশের কত উপকার হইবে । কলিকাতায় খাওয়ার দোষে কত লোক মন্দাগ্নি অল্প প্রভৃতি রোগে কষ্ট পাইতেছে । ও কলেরা টাইফইড বম্বাকাশ ইত্যাদি রোগও দুই খাদ্য হইতে উৎপন্ন । দুধ ঘী প্রভৃতি নিত্য ব্যবহারের অনেক জিনিসই ভেজাল দেওয়া । দেশের লোকের স্বাস্থ্যের পক্ষে তাহা কত হানিকর । দুধের অভাবে ও দুধের দোষে আমাদের দেশে হাজার করা তিন শত ত্রিশটি শিশু মারা যায় । এ সকলের প্রতিকার স্বরূপ তিনি যে করটি উপায় করিতে বলিয়াছেন তা মোটামুটি এই

১ লোক শিক্ষা । ২ আইন সংস্কার । ৩ আব-শ্যকীয় ব্যবসায় ঘোষণা কারবার রূপে আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের—মনোযোগ ও চেষ্টা ।

এই সহপদেশপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত পুস্তকখানি আমাদের দেশের গৃহলক্ষীদের হাতে পড়িয়া নিশ্চয় অশেষ সুফল দিবে । এ পুস্তকখানি যেরে ঘরে রাখা উচিত ।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক ।



বঙ্গবীর

ভুলবাবু বাসি পাশের দাবতে
নামতা' পাড়েন উচ্চ স্নেহে,
ত্রিধে কেতাব লইয়া কবেতে

কেদারা তেলান দিয়ে ।

দই ভাঙি মোদা' স্তখে সমাসান,
মোড়ের উপরে ছলে কেবোসিন,
পাড়িয়া ফেলিছি চাপটার তিন,

দাদা এম এ, আমি বি এ ।

বনৌন্দনাথ ।

শ্রীমন্ত বসু প্রকাশক প্রজাপাধ্যায়ের পাবলিশিং হাউসে ।

ভারতী

৩৪শ বর্ষ]

অগ্রহায়ণ, ১৩১৭

[৮ম সংখ্যা

ভাবসাধন ।

চিরকাল যাহার সঙ্গে আড়ি করিয়া বসিয়া আছি, আজ হঠাৎ 'এস' বলিয়া তাহার দিকে কর প্রসারণ করিলেই যে সে আমাদের হইয়া যাইবে এমন কথা কে বলিল ? ঘরের শিল্প, তাহার সঙ্গে ভাব রাখিবার কোন পন্থা, কোন ইচ্ছা আমরা এতকাল রাখি নাই, আমাদের শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই নিজস্ব শিল্পেব সঙ্গে ভাবের অভাব ঘটাইবার জন্তই এতদিন প্রয়োগ করিয়া আসিতেছিলাম, আজ মথ হইয়াছে ভাব করিব কিন্তু তাহা হয় কই ? এখন সাধিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া ভাব করা ছাড়া তো উপায় নাই ।

শিল্প তো সখের খেলনা নহে, সাধনার বস্তু । রত্নহার নির্জীব পদার্থ, তাহাকে যখন ইচ্ছা টানিয়া ফেল, যখন ইচ্ছা কঠে ধর । কিন্তু বন্ধুব বাহুপাশের মত পূর্বপুরুষগণের ভাব সঞ্জীবিত যে শিল্প তাহাকে আজ টানিয়া ফেলিলে কাল চাহিবামাত্র ফিরিয়া পাওয়া হুক্ষর ।

ভা ও ব সহজ দুইটা অক্ষর যে টান্কে বুঝায় মনে সেটার অভাব থাকিতে প্রাচীন ভারতশিল্পটা যে আমাদের যত্নের আদরের ও গৌরবের সামগ্রী এটা আমরা কিছুতেই বোধ করিতে পারিব না, সুতরাং এ অবস্থায়

তাহাকে বুঝিতে অথবা বুঝাইতে যাওয়াই বিড়ম্বনা । ঠিক কোন্ ভাবে ভারতশিল্পটা গ্রহণ করিব তাহা বোঝা আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে । আমরা দেখিতেছি যে পাশ্চাত্য শিল্পটা যেমন অবাধে আমাদের কাছে ধরা দিতেছে মনে হইতেছে, ভারতশিল্পটা সেরূপ করিতেছে না । শিল্পেব যে একটা গুণ সহজে সাধারণের বোধগম্য ও মনোরঞ্জক হওয়া যেন সেই গুণের অভাব ভারতশিল্পে লক্ষ্য করিয়া আমরা ভারতশিল্পকে নানা দোষদৃষ্টে অপরিণত এবং অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ করিয়া থাকি ; কিন্তু আমাদের নিকট কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই যে সকল সময়ে ভারতশিল্পটারই দোষ একথা বলিতে পারি না, এ বিষয়ে আমাদের নিজের দিকেও যে ভারতশিল্পকে বুঝিবার একটা প্রকাণ্ড অক্ষমতা জন্মিয়াছে সেটা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে ।

অল্পকালই হইল আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে পড়িয়াছি এবং এই অল্প কালের মধ্যেই প্রাচীন ভারতবাসীর ভাব গতিকের সহিত আমাদের ভাবগতিকের একটা প্রচণ্ড বৈপরীত্য সংঘটিত হইয়াছে । আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেমন করিয়া যে কাজটি করিতেন, যে সকল বিষয় লইয়া

যে ভাবে চিন্তা করিতেন, আমরা আজকাল ঠিক সেরূপটা করিনা। উন্নতির পথেই বল বা অবনতির দিকেই বল অগ্রসর হইতে হইতে আমরা প্রাচীন আৰ্য্যসভ্যতার সহিত যোগাযোগের পথ প্রায় রুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছি। সুতরাং এ অবস্থায় ভাবতশিল্পেব নিগূঢ় সৌন্দর্য্য বুদ্ধিবাহার অবসর আমাদের কোথায়? অন্তর্বে বাহিরে ধর্ম্মে কর্ম্মে প্রাচীন ভাব-নদীর সহিত বিচ্ছিন্ন রহিয়া পিণাসা তো আমাদের কোন দিন মিটিবে না উপরন্তু নদীর নাম ধরিয়া চিৎকাব করিলে স্বরভঙ্গ হইয়া মরিবারই সম্ভাবনা। এ অবস্থায় তপস্যা করিয়া নদীর স্রোত নিজের দিকে আনা, নিজেকে প্রাণপণে নদীর দিকেই অগ্রসর করা অথবা ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিয়া স্থির থাকা ছাড়া উপায় কি! নীরস আধুনিক ও বিজ্ঞান যুগের মরু প্রান্তবে আমরা প্রাণ হারাইতে বসিয়াছি, জীবনে ভাবের প্রভাব সৌন্দর্য্যের স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়া কোন নরকের দিকে যে আমরা অগ্রসর হইতেছি তাহা বুদ্ধিবাহার ক্ষমতা পর্য্যন্ত আমাদের লোপ হইয়াছে।

বিজ্ঞানের চোখে শিল্পটাকে দেখা চলেনা, ভাবের চক্ষে ধরা যায়। বিজ্ঞানের চক্ষে শিল্পে এটার অভাব ওটার অভাব, আর ভাবের চক্ষে সকল অভাব পূর্ণ হইয়া শিল্পের স্বরূপ আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। কি ভারত কি ইউরোপীয় সকল শিল্পকেই বুদ্ধিবাহার এই একমাত্র অমোঘ উপায়।

প্রাচীন ভারতশিল্প যেটা প্রাচীন ভারত-বাসীর ভাবের বিকাশ সৈন্যকে হৃদয়ঙ্গম করিতে চাহি কিন্তু হৃদয়টাকে বিপরীত ভাবের

বর্ষাচ্ছাদনে ঢাকিয়া রাখিয়া। এ অবস্থায় ভারতশিল্প যে কোনদিন আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে এ আশা হ্রবাশা।

এই নবযুগের স্মৃতিষ্ক জ্ঞানের অণুবীক্ষণ সাহায্যে লুপ্ত অক্ষর উদ্ধার করিয়া প্রহৃত্ত্ব প্রকাশ করা চলে কিন্তু তাহাতে পুরাতন পুঁথির ভাব ও রস গ্রহণে কোন সহায়তা কবে না। শিল্পেও তেমনি ভাবের চশমা না লাগাইলে আমাদের কোন লাভেরই আশা নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রাচীন সভ্যতার ও ভাবের সহিত যদি আধুনিক আমরা বিচ্ছিন্ন হইলাম তবে প্রাচীন শিল্পটাকেই বা ধরিয়া থাকিব কেন? আমরা একটা নূতন অবস্থার উপযোগী নব শিল্পের অবতারণা কেন না করি? অবশ্য এ কথা গ্রাহ হইবে সেইদিন যেদিন আমরা নবভাবে এমনই অনুপ্রাণিত হইব যে ভারতবাসী বলিয়া আমরা নিজেকে স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারিব না, যে দিন আমাদের কাব্য সঙ্গীত আচার ব্যবহার ধর্ম্ম কর্ম্ম আমাদের নিকটে অসভ্যেব খেয়াল কৌতুকের সামগ্রী মাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

নব নব জ্ঞানের রেলগাড়িতে চলিয়া যে দ্রুত গতিতে আমরা অগ্রসর হইতেছি— তাহাতে সেদিনের আর বড় বিলম্ব নাই, কিন্তু আশার বিষয় এই যে ভারতের কোটা কোটা নরনারীর মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক জীবই এই মহাযাত্রায় টিকিট কিমিয়াছি।

দেশের কুলকামিনীগণের হস্ত হইতে সেই সত্যযুগের শব্দ আভরণ এখনও স্থলিত হয় নাই। বেদ ধ্বনিতে ব্রাহ্মণেরা এখনও আকাশ

ধনিত করিয়া থাকেন, দেশের সাড়ে পনরো আনা শিল্পির নির্ভর এখনও সেই প্রাচীন শিল্পেরই উপর, দীন দরিদ্র ধনী গৃহস্থ যতি সন্ন্যাসী এখনও অন্তরে অন্তরে সেই আৰ্য্য সভ্যতার অগ্নান তিলকাক বহন করিতেছে, আর ভগবান এই ভারতের ষড়ঋতুর সৌন্দর্য্যবিকাশে চিরন্তন প্রথার কোন ব্যতিক্রম ঘটতে দিতেছেন না। কালিদাস যে বর্ষার গান শরতের শোভা বসন্তের মাধুরী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন সেই গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতুগণ ঠিক তেমনি ভাবেই আমাদের চোখের সম্মুখ দিয়া আজও আসিতেছে যাইতেছে তবে কেমন করিয়া বলি নূতন শিল্প আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে!

এই কলিকাতা সহরে এখনও এমন লোকও আমি দেখিয়াছি যিনি ক্রোরপতি হইয়াও নিজের Portrait অঙ্কিত করাইবার সময় নিজেকে মহামূল্য সিংহাসনে না বসাইয়া গুরুদেবের ছত্রধারিরূপে অঙ্কিত করাইয়াছেন। আৰ্য্য সভ্যতা যখন এখনও ওতঃপ্রোতভাবে আমাদের জীবনের সঙ্গে বিজড়িত রহিয়াছে তখন অতি শিক্ষিত আমাদের মত দুই দশজন বাঙালীর কথায় আৰ্য্যশিল্পকে দেশ হইতে নির্বাসন দিতে যাওয়া মুর্থতাব কার্য্য।

যতদিন না এই ভারতখণ্ড তাহার তেত্রিশকোটি নরনারী তাহার এই শস্ত্রশ্রামলা মূর্ত্তি লইয়া সমুদ্রের অতল গর্ভে প্রবেশ করে ততদিন জগতের লোক আমাদের প্রাচ্যজাতি বলিয়াই জানিবে এবং আমাদের নিকট হইতে প্রাচ্য শিল্পই প্রত্যাশা করিবে, ইতালীয় শিল্পও নয় ফ্রেঞ্চ শিল্পও নয় অথবা

প্রাচ্য ইতালীয় এবং ফ্রেঞ্চ শিল্পের খিচুড়িও নয়। এ অবস্থায় ইউরোপের সহিত Loan খুলিবার যে বিশেষ আবশ্যক আছে এমন বোধ করি না।

আমরা নিজের ভাণ্ডার হইতে সল্প হইলেও যেটুকু দান করিব জগৎবাসীর নিকটে তাহারই মূল্য আছে, আর ধার করিয়া যেটা বিতরণ করিয়া যাইব তাহা চিবদিন চোরাই মালেব সামিল হইয়া থাকিবে।

সমস্ত মানবজাতির মধ্যেই ভাবের আদানপ্রদান যখন চলিতেছে তখন শিল্পেও আদানপ্রদান চলিতে থাকিবে, সেটাকে ঠেকাইবার সাধ্য কাহারও নাই এবং সেরূপ আদানপ্রদানে দোষও দেখি না; কিন্তু দানই গ্রহণ করিতেছি দান করিতে অপারক একপটা হইলে আজ না হউক দশদিন পরেও অর্দ্ধচন্দ্রে আমাদের ভাগ্যে সুনিশ্চিত।

Science of Perspective ইত্যাদি তুচ্ছ সামগ্রীর লোভে পুরুষ-পরম্পরালঙ্ক যে আশ্চর্য্য শিল্প কৌশলটা হারাইতে বসিয়াছি সেটা জগতের আর কোন শিল্পই আমাদের দিতে পারিবে না। এই পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া perspective, anatomy আরও কত কি আমরা দখল করিয়াছি কিন্তু প্রাচীন ভারতের একটা মন্দির চূড়া অথবা একটি চিত্রের এক রেখা এক বর্ণও পুনঃসংস্কার করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছি বলিয়া তো বোধ হয় না! তবে বৃথা পরিশ্রমে কোন্ লাভ? নূতন artএর সৃষ্টি করিতেছি এমন অহঙ্কারও আমরা রাখিতে পারি না, কেননা এই পঞ্চাশ বৎসরে ইউরোপীয়

একেবারে নিঃসংশয় হইতে হইবে, তর্ক ও আলোচনা কোন দিন আমাদের নিঃসংশয় করিয়া দিতে পারিবে না।

হৃদয় রতন যাচিয়া মেলে, অযাচিত ও পাওয়া যায় কিন্তু যে যাচাইয়া গ্রহণ করিতে চাহে তাহাকে ঠেকিতে হয়।

আমাদের প্রাচীন শিল্পটাকে আমরা তামাকু ধরাইবার টিকাটার মত যৎসামান্য করিয়া দেখি স্মৃতরাং তাহার যেখানে সেখানে আগুন ধরাইয়া সেটাকে ছাই ভস্ম করিয়া দিতে আমাদের কোন ভাবনা উপস্থিত হয় না। আমরা কথায় কথায় বলিয়া ফেলি, ভারত শিল্পের আকৃতি প্রকৃতিটা ইউরোপীয় দস্তুর দিয়া একটু আধটু সোজা করিয়া দিলে ক্ষতিটা কি? এস তাহার বেমানান হাত পায়ের স্থানে গ্রীকমূর্তির হাত পা কাটিয়া বসাইয়া দেওয়া যাউক, তাহার চম্পক অঙ্গুলির পরিমাণ উখা ঘসিয়া খাটো করিয়া ফেলি; তাহার গালের একদিক সাদা একদিক কালো করিয়া তাহার স্মৃচেহারাটা ফুটাইয়া তুলি, তাহার তপশ্চায় শীর্ণ দেহটাকে গোস্তু খাওয়াইয়া তাজা করিয়া তোলা যাক—ঠিক গ্রীসিয় কুস্তিগিরের মত!

শিল্প যে ছেলাখেলা নয় আমাদের জীবনের উপরে তাহার একটা প্রভাব আছে এটা যদি আমাদের জ্ঞান থাকিত তবে এত সহজে আমরা ভারত শিল্পের উপরে ছুরি চালানো ব্যাপারে উৎসাহের সহিত যোগ দিতে পারিতাম না!

যাহারা হাতে কলমে শিল্প চর্চা করিয়া থাকেন তাঁহারা জানেন যে কোন চিত্রের বা কোন মূর্তির রেখাপাত বা বর্ণ সন্নিবেশ

প্রথায় সামান্য মাত্র ব্যতিক্রম ঘটাইলে চিত্রটার বা মূর্তিটার ভাবে ও অর্থের কতই না বদল হইয়া পড়ে। চিত্রণের মুখে গঠনের বেলায় যেটা বাহির হয় তাহার উপরে হাত চালাইতে যিনি শিল্পি তিনিই সাহস করেন না আর আমরা অতি সহজে বলিয়া ফেলি কেন এরূপ পরিবর্তনে দোষ কি? দোষ যে কি তাহা প্রস্তাবকারীর চোখে না পড়িতে পারে কিন্তু যাহাদের প্রাণ আছে প্রাণ থাকিতে তাহারা আনাড়ির হাতে ভারত শিল্পের চিকিৎসার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে কই!

যুগযুগান্তর ধরিয়া ভারত শিল্পের ভিত্তিতলে কত না শিল্পের কত তরঙ্গ আসিয়া বারম্বার আঘাত করিয়াছে কিন্তু কোন দিন তাহাকে স্বস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই কিন্তু এই যে তাহার আশ্রয়-ভূমি আমাদের মন তাহার ভিতর হইতে যে একটা জিঘাংসা প্রবল ভূমিকম্পের মত সজ্জারে তাহাকে নাড়া দিতেছে তাহাতে ভারত শিল্পের পতন অবশ্যস্তাবী। ভারত শিল্পের মন্দির চূড়া পাকা মসলায় গাথা দুই চারিটা ভূমিকম্প সে সহিবে কিন্তু তাহার অধিক নয়। সেই প্রলয়ের দিনে যে ভূমি তাহাকে নাড়া দিতেছে সেই ভূখণ্ডের সহিত কোন অতলে সে প্রবেশ করিবে তাহাই ভাবিয়া দেখ।

চ বর্গের উদ্ভবক এর মত ভারত শিল্পটা যদি বা আমাদের চক্ষে বিসদৃশ ঠেকে তথাপি একে N করিয়া যেমন আমাদের কোন লাভ নাই তেমনি ভারত শিল্পকে পাশ্চাত্য শিল্পের ভারবাহী গর্দভ করিয়াও আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে না।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাপানের সহর।

(২)

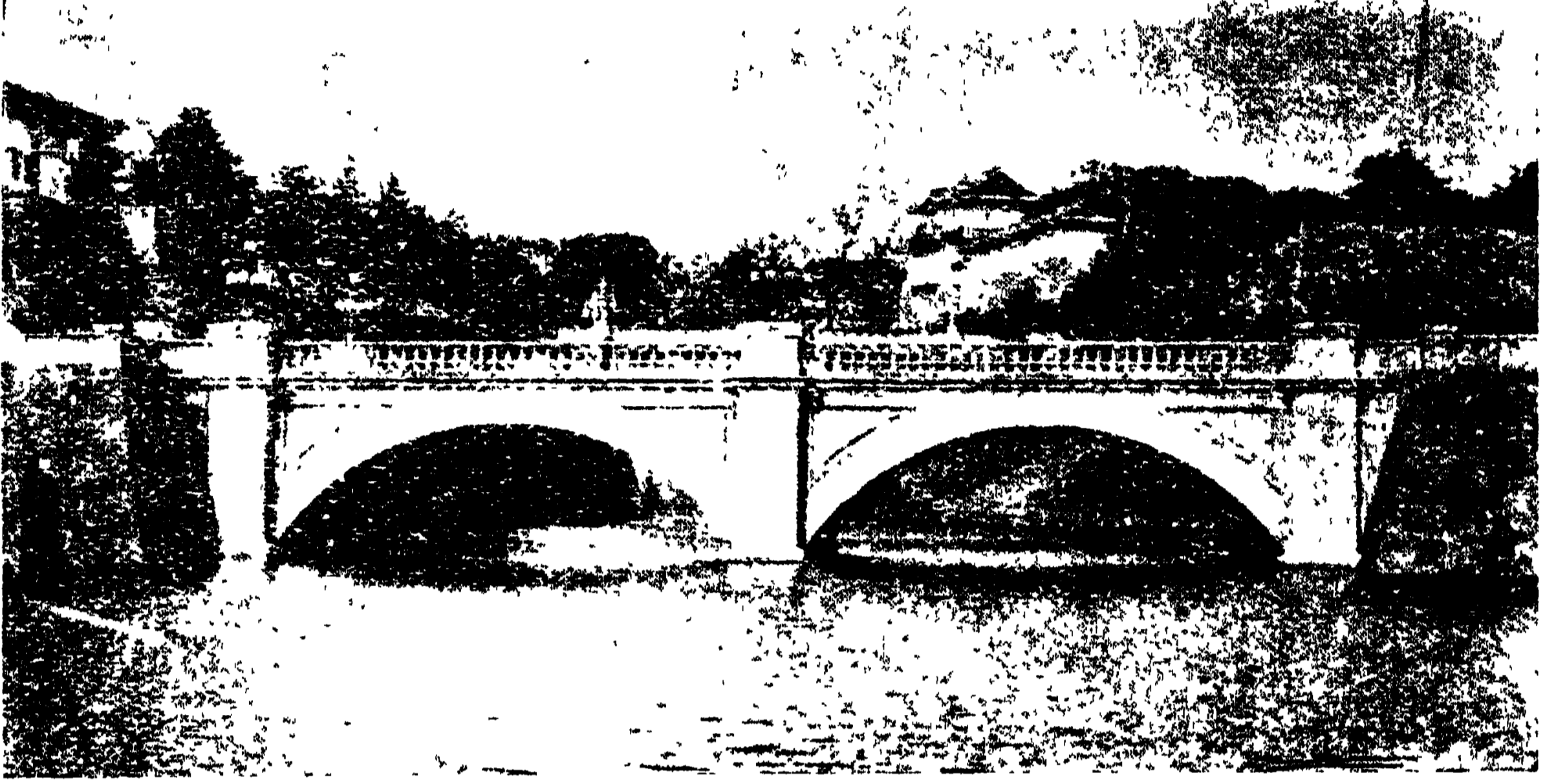
জাপানের দৃশ্য অতি মনোরম। সমগ্র জাপানই যেন শিলং, দার্জিলিং, শিমলা, মুম্বরী, নাইনিতাল প্রভৃতি স্থানে পূর্ণ। জাপানের শতকরা ৮৪.৩ ভাগ পাহাড়ে আবৃত। শত শত ঝরণা, প্রশ্রবণ প্রভৃতির ঝরঝর শব্দ বড়ই আনন্দদায়ক। আবার কোন কোন জায়গার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড waterfallগুলি ভীতিসঞ্চার করিয়া থাকে। আর সে শীতপ্রধান দেশে বরফের কোন নূতনত্ব নাই। পার্শ্বতঃ জাপান ছোট বড় ৬০০ দ্বীপ সমষ্টি। ছোট ছোট নদীর সংখ্যা অল্প নয়। পর্বতের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। সমুদ্রের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ দেশের নানাস্থানের অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া এক অনির্কচনীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সমুদ্র এবং পর্বতের সন্মিলনেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের চূড়ান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

গতমাসে তোকিও সহরের ভিন্ন ভিন্ন পার্কের বিবরণ ভারতীয় পাঠকবর্গের নিকট বিবৃত করিয়াছি। অল্প সহরের অন্তর্গত বিষয় উল্লেখ করিবার পূর্বে জাপান সম্রাট মিকাদোর প্রাসাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব। ১৮৬৭ খৃঃ পর্য্যন্ত সোশুগ উপাধিধারী সম্রাটের প্রধান সেনাপতি তোকিও সহরে বাস করিতেন। সে সময়ে তোকিও ইয়েদো নামে অভিহিত হইত। নামে সেনাপতি হইলেও সোশুগের প্রতিপত্তি এত বেশী ছিল যে কার্যতঃ তিনিই সর্বেসর্ব্বা

ছিলেন; সম্রাট মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের আয় সহর হইতেই তিন শতাধিক মাইল দূরবর্তী কিওতো রাজধানীতে অবস্থান করিতেছিলেন। যে রাষ্ট্রবিপ্লবেব সঙ্গে সঙ্গে জাপানের মধ্যযুগের অবসান হইয়া বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তন হয় সেই রাষ্ট্রবিপ্লবই প্রকৃত প্রস্তাবে তোকিও সহরকে রাজধানী পদে উন্নত করে। তোকিও তখন অতি ক্ষুদ্র সহর ছিল। সেনাপতি স্বৈচ্ছায় এবং সানন্দে আপন বাসভবন সম্রাটকে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ মনে করেন। সে আজ প্রায় ৩৩ বৎসরের কথা। তদবধি তোকিও জাপানের রাজধানী। তখন জাপানে রেল ছিল না। সম্রাট শিবিকারোহণে দূরবর্তী কিওতো হইতে নূতন রাজধানী তোকিও সহরে আগমন করেন। পাঠক মনে করিবেন না যে সেনাপতির বাড়ী বলিয়া সম্রাটের বর্ত্তমান প্রাসাদ ছোট বা সামান্ত ধরণের। উহা বিশাল এবং বিস্তৃত। আমার যে সকল বন্ধু ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশ এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্য দেখিয়া জাপানে আসিয়াছেন সকলেই মিকাদোর বাড়ীকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করেন। কোন কোন সম্রাট কিম্বা প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ অপেক্ষাকৃত বড় হইলেও মোটের উপর জাপান রাজভবন অনেক বিষয়ে অধিকতর সুন্দর। বাড়ী খানা একটা ছুর্গের মত; তোকিও সহরের মধ্যস্থলে দীর্ঘে প্রস্থে আনুমানিক এক মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত

এবং পবিখায় বেষ্টিত। পরিখাগর্ভ হইতে উখিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হার্কিউলিয়ান পাথরে প্রথিত অভ্রাচ্ছ দিব্য দেওয়ালের উপর সবুজ

ছর্কীচ্ছদিত বেষ্টন এবং তাহার উপর সারি সারি কামান। পরিখার উপরিস্থিত ভিন্ন ভিন্ন দ্বারদেশের প্রশস্ত প্রস্তর সেতু সহরের



সম্রাটের বাড়ীর চতুষ্পার্শ্ব পরিখা, তদুপরিস্থ সেতু, হার্কিউলিয়ান পাথরের দেয়াল এবং প্রহরীদের বিশ্রামাগার।

বিস্তৃত রাস্তার সহিত সংযোজিত রহিয়াছে। বহির্দেশের ভূগাবৃত বিস্তৃত আঙ্গিণাগুলি এতই পবিষ্কার যে বহুমূল্য মকমল এবং কার্পেটারিত প্রাঙ্গণও তাহার নিকট লজ্জা পায়। সাধারণ লোক বহির্দেশের কয়েকটা প্রাঙ্গণ পর্য্যন্তই অগ্রসর হইতে পারে। রাজভবনের দুই ধারে দুইটা পাবলিক পার্ক। রাজবাড়ীর চারি ধারেই বৈদ্যাতিক ট্রামের রাস্তা।

রাজবাড়ীর প্রায় অর্ধমাইল দূরে এক বিস্তৃত জায়গায় রাজপুত্রের (ক্রাউন প্রিন্সের) বাড়ী। এ বাড়ীর আয়তনও স্বয়ং সম্রাটের বাড়ীর অপেক্ষা নিতান্ত কম নহে, ইহারও কয়েক ধারে বিস্তৃত রাস্তা। তিন ধার দিয়া বৈদ্যাতিক ট্রাম এবং অপর ধাবের তলদেশ দিয়া সুড়ঙ্গ পথে রেলগাড়ী ও

বৈদ্যাতিক ট্রাম উভয়ই চলিতেছে। সম্প্রতি শ্বেত প্রাসাদ নামে নামক রাজপুত্রের জন্ম যে প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছে তাহা দেখিবার জিনিস। রাজপুত্র তাঁহাব স্ত্রীপুত্রাদিসহ এই বাড়ীতে অবস্থান কবেন। এই বাড়ীর এক পার্শ্বে সৈন্যদের কাওয়ার্ড খেলিবার বিস্তৃত মাঠ; ব্যাবাক, এবং মিলিটারী কলেজ। রাজপুত্রের প্রাসাদ আওইয়ামা প্যালাস্ নামে পরিচিত। সহরের ঐ অঞ্চলের নাম আওই-য়ামা। আমাদের ভাবতীয় ছাত্রদের তোকিওস্থ ইণ্ডিয়ান হাউস রাজপুত্রের বাড়ীর এক পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল। রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী প্রদেশেই বৈদেশিক নৃপতি মণ্ডলীর প্রতিনিধি বর্গের আবাসস্থল। রাজবাড়ীর নিকটেই শাসন, শিক্ষা, যুদ্ধ, এবং অন্যান্য বিভাগীয় বড় বড় আফিস এবং পার্লামেন্ট হাউসরয়,

পার্লিয়ার্গেণ্ট এবং বড় বড় আফিসের অধিকাংশ বাড়ীই কাষ্ঠ নির্মিত। জাপানীরা বাহ্যিক আড়ম্বরের বশবর্তী হইয়া কোন বিষয়ে প্রচুর অর্থ আটক রাখিতে এবং তন্নিবন্ধন দেশের

কারবারের প্রতিবন্ধক জন্মাইতে প্রস্তুত নহে। খর্বাকৃতি, ক্ষুদ্রদহধারী জাপানী সাধারণ ভাবে থাকিয়া বড় বড় কায করিতেই অভ্যস্ত।



প্রাচীন প্রাসাদ

প্রাচীন রাজধানী কিওতোর প্রাসাদ আজও পর্য্যন্ত অতি সমৃদ্ধে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ইংরাজ রাজপ্রতিনিধির পরিচয় পত্র লইয়া উক্ত প্রাসাদ দেখিয়া আসিয়াছি। অন্দর এবং বাহির্বাটী সমস্তই প্রাচীন ধরণের, অনেকটা হিন্দুস্থানী ধরণের। টেবিল চেয়ারের পরিবর্তে সর্বত্রই তাতামি অর্থাৎ সুন্দর সুন্দর মাছুরে আচ্ছাদিত মেজে বা ভূমিতল। নানারূপ চিত্রিত পটে দেওয়াল সুসজ্জিত। প্রাচীনকালের চিত্রিত পট বলিতেই বুঝিতে হইবে যে সামুরাই জাতির যুদ্ধবিগ্রহের চিত্র। যুদ্ধবিগ্রহের চিত্র ছাড়া কোন কোন স্থানে জীবজন্তুর এবং গাছপাণ্ডার চিত্রও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন রাজপ্রাসাদ দেখিলে বেশ প্রতীতি জন্মে যে প্রাচ্যের সভ্যতা জাপানে অনেক দিন পূর্বে হইতেই বিস্তারিত হইয়াছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ছুমিদা নদীর দুই ধারে তোকিও সহর অবস্থিত। ইতিপূর্বে যতকিছু উল্লেখ করিয়াছি সমস্তই ছুমিদা নদীর পশ্চিম তীরে। অপর তীরে রাশি রাশি কল কারখানা ব্যতীত উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নাই। মারিন স্কুল, কিশারি স্কুল প্রভৃতি কয়েকটা নূতন ধরণের ইন্সটিটিউশন সহরের এই অঞ্চলেই। এ অঞ্চলে প্রত্যেক বাড়ীতেই ছোট খাট কোন না কোন কারখানা আছেই। আমাদের ভারতীয় ছাত্রদের

যাহারা কারখানার কাজ শিখিতে যায় তাহাদের অধিকাংশকেই ছুমিদা নদীর এই পারে কাষ শিখিতে আসিতে হয়।

ছুমিদা নদী ক্ষুদ্র হইলেও বাণিজ্য-বহুল; ছোট ছোট ষ্টীমার এবং নৌকার পূর্ণ; প্রতি পাঁচ মিনিট পর পর ছোট ছোট ফেরি ষ্টীমার সহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আরোহী বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। অর্ধ কিম্বা এক মাইল অন্তর অন্তবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টেশন। এই নদী উপর রিওগোকু জাপানের সর্বশ্রেষ্ঠ সেতু। ইহার উপর বৎসরে জুলাই মাসে একদিন “হানাবি” অর্থাৎ আতসবাজির মহাসমারোহ হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকসমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী ষ্ট্রিকালে তাড়িতালোক এবং আতসবাজির সাহায্যে স্ব স্ব ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া থাকে। সহস্র সহস্র নৌকা সমাগমে সেদিন জলে ও স্থলে যেন কোন ভেদ থাকে না।

নদীর ধাৰে বসন্তকালে মুকোজিমা নামক স্থানের চেরি প্রস্ফুটিত হইবাব সময় প্রায় একমাস কাল সংসার-চিন্তা ভুলিয়া সহস্র সহস্র লোক অপার আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠে। তখন তথায় রোজই যেন চুড়ামণি যোগ লাগিয়া আছে বলিয়া মনে হয়।

জাপানের বড় সহরের সহিত ছোট সহরের পার্থক্য কেবল আয়তনে এবং লোকসংখ্যায়। চাল চলন সর্বত্রই এক। রাস্তা ঘাট, ঘর, ড়য়ার অধিকাংশ সহরেই এক রকম। উত্তর অঞ্চল অর্থাৎ শীতপ্রধান প্রদেশস্থ সহরগুলির এবং তোকিও, ওসাকা,

কোবে এবং ইয়োকোহামা প্রভৃতি কারবারী সহরের লোকগুলি স্ফুটুর এবং কণ্ঠ।

মার্কিন জাতির ঞ্য় জাপানীরা আজকাল সহর প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে; দেশের গণ্য মাণ্ড এবং নব্য ভদ্রলোকগণ রাজধানী অথবা অন্য কোন বড় সহবে বাড়ী করিয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। অবস্থাপন্ন ব্যক্তির সমুদ্রতীবে, হ্রদ অথবা বিখ্যাত জলপ্রপাতের নিকটবর্তী স্থানে গ্রীষ্মাবাস দেখিতে পাওয়া যায়।

জাপানের মিউনিসিপালিটি আমাদের মিউনিসিপালিটির ন্যায় নহে। সহরের রাস্তা ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেও নর্দমাগুলি খোলা; ঢাকা সহরের নর্দমার মত। নূতন রাস্তা ঘাট প্রস্তুত কিম্বা পুরাতনের নেরামত ভার মিউনিসিপালিটির হস্তে। মিউনিসিপালিটির পার্ক প্রভৃতিতে মিউনিসিপালিটি হইতেই আলো দেওয়া হয়। তাছাড়া দোকানদারগণ এবং সহরের অধিবাসিগণ নিজ নিজ ব্যয়ে স্ব স্ব বাড়ীর সম্মুখে আলো দিয়া থাকে। অবস্থানুযায়ী কেহ তাড়িতালোক, কেহ বা গ্যাসের, আবার কেহ বা কেরোশিনের আলো বাড়ীর সম্মুখদেশে ব্যবহার করিয়া থাকে। আর বাড়ীর সম্মুখবর্তী রাস্তাতেও গৃহস্বামীই পরিষ্কার রাখিয়া জল সিঞ্চন করিয়া থাকে। প্রত্যেক বাড়ীর আবর্জনা নিষ্ক্ষেপ করিবার জন্ত বাড়ীর এক পাশে একটি কাঠের বাস রাখিয়া দেওয়া হয়। দুই একদিন পর পর উহা পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। পরিষ্কার করিবার জন্ত কতকগুলি লোক নিয়োজিত আছে সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে পারিশ্রমিক স্বরূপ অতি সামান্যই দিতে হয়; যেহেতু আবর্জনা জমির পক্ষে মূল্যবান। উহার

উহা মফস্বলে বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট উপার্জন করিয়া থাকে। সহরে আলো দেওয়ার জন্ত অনেক প্রাইভেট কোম্পানী রহিয়াছে, মাসের শেষে বিল করিয়া আলোর খবচ লইয়া থাকে। বড় বড় সহরে জলের কল আছে। সহরতলি এবং ক্ষুদ্র সহরে কূপের জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জাপানীরা অদ্ভুত জীব। হোকাইদো দ্বীপে একটি ক্ষুদ্র সহরের লোক সংখ্যা বিশ হাজার। লৌহ এবং কয়লার আকর থাকায় ইহা একটি বাণিজ্যস্থান। কিন্তু এখানে জলের বড়ই অভাব। ত্রিশ মাইল দূরবর্তী ছাপ্পোবের সহর হইতে রোঙ্ক রেলের তথায় জল নীত হইতেছে।

তোকিওর গ্রাম বড় সহরের রাস্তাতেও জল সিঞ্চনের বেশ বন্দোবস্ত নাই। পূর্বেই বলিয়াছি দোকানদার এবং সাধারণ বাসিন্দাগণ নিজেদের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা সিক্ত করিয়া থাকে। উহারা খোলা নর্দামার কিম্বা নিকটবর্তী খালের জল অথবা নিজ বাড়ীর কূপ অথবা কলের জলই রাস্তায় ছিটায়। আর পাবলিক রাস্তা এবং পার্ক প্রভৃতির জন্ত স্থানে স্থানে রাস্তার ধারে কূপ আছে। ভিস্তি একরূপ কাঠের গাড়ীতে জল লইয়া রাস্তায় দেয়।

পায়খানার বিবরণ ভারতবাসীর নিকট একটু অভিনব। সহরে এবং গ্রামে সর্বত্রই পায়খানার প্রচলন, মিউনিসিপালিটীর সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই; উহা গৃহস্বামীরই তত্ত্বিরাধীন। সহরে কতকগুলি কোম্পানী আছে, ময়লা সংগ্রহ করাই তাহাদের ব্যবসা। কোম্পানীনিয়োজিত লোক কাঠনির্মিত পাত্রে ময়লা সংগ্রহ করিয়া থাকে। এক একজন

ঐরূপ ৮১০টি পাত্র একখানা গাড়ীর উপর সাজাইয়া মফস্বলে টানিয়া লইয়া যায়। যে সময়েই তোকিওর পথে বাহির হও না কেন দেখিবে সারি সারি ময়লা গাড়ীর যেন শেষ নাই। জাপানীরা উহার গন্ধে অভ্যস্ত; আমরা কিন্তু নাকে ক্রমাল না দিয়া চলিতে পারিতাম না। জাপানীদের উহাতে একটু ঘৃণার ভাবও পরিলক্ষিত হয় না। এমন কি সহরের অনেক কেন্দ্রস্থলে ঐ সকল গাড়ীর আড্ডা দেখিতে পাওয়া যায়। জলপথেও বহু দূরবর্তী গ্রামে ঐ সকল গাড়ী লইয়া যাওয়া হয়। তোকিও সহরে জলপথে নৌকাযোগে উহা রপ্তানী হইবার উল্লেখযোগ্য প্রধান ষ্টেশন আছাকুশার বিখ্যাত হায়াব পলিটেকনিক ইন্সটিটিউশানের দ্বারদেশের সম্মুখভাগ। আমাদের দেশে—সাধারণ ভদ্রলোকের বাড়ীর সম্মুখেও এরূপ ষ্টেশন থাকিতে পারে না। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি সে বিষয়ে আদৌ আকৃষ্ট হয় না; যেহেতু উহা অনেকটা ধানের বস্তা, তুলার বস্তা, পাটের বস্তা প্রভৃতির গ্রাম বিবেচিত হইয়া থাকে।

শীত প্রধান দেশ বলিয়াই ইহা দ্বারা সহজে ব্যারামের বীজ ছড়াইয়া পড়ে না। কোম্পানীর লোকগণ মফস্বলের কৃষকদের নিকট উহা বিক্রয় করিয়া থাকে। গৃহস্বামীকে ময়লা পরিষ্কার করার জন্ত মেথরকে কিছুই দিতে হয় না এবং ইচ্ছা করিলে গৃহস্বামী মেথরের নিকট হইতে ময়লার মূল্যস্বরূপ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিতে পারে। সাধারণতঃ অনেকেই নগদ মূল্য গ্রহণ করে না। ময়লার পরিবর্তে মাঝে মাঝে শাক শজীর ভেট লইয়া থাকে। জাপানে মেথরশ্রেণী বলিয়া কোন নির্দিষ্ট

শ্রেণী নাই। যে কেহ পাশখানা পরিষ্কার করিতে পারে, তাহাতে জাতিভ্রষ্ট কিম্বা সমাজচ্যুত হইবার কোনরূপ আশঙ্কা নাই।

অনেকেই জানেন যে গরুর বিষ্ঠা জমির পক্ষে মূল্যবান সার। মনুষ্যের বিষ্ঠা উহা অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান, যেহেতু মনুষ্য গরুর চেয়ে পুষ্টিকর এবং মূল্যবান পদার্থ আহাৰ্য্যরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। আমাদের ভুক্ত পদার্থের কিয়দংশ অস্থি, মাংস ও রক্তে পরিণত হইয়া দেহ পুষ্টি করে এবং বাকী অধিকাংশই রূপান্তরিত হইয়া বিষ্ঠারূপে বহির্গত হয়। উহা উদ্ভিজ্জের পরিপোষণে বিস্তর সহায়তা করে। মনুষ্য খাওয়ার সহিত উহা পুনরায় গ্রহণ করিয়া থাকে। অতি অল্প খরচে এই মূল্যবান সার সকলেই লইতে পারে। জাপানে ছোট বড় ধনী দরিদ্র কেহই এ সার জমিতে প্রয়োগ করিতে ঘৃণা বোধ করে না।

মিউনিসিপালিটীর ট্যাক্সের দায়ে গরীব সহরবাসীকে ঝালাপালা হইতে হয় না। যে যেরূপ চালচলনে চলিতে চায় তেমনি পারে। গরীব ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে বাড়ীর সম্মুখে আলো নাও জ্বালাইতে পারে। আর পাড়াপ্রতিবেশীর কলের জলেই তাহার সমস্ত কার্য্য নিৰ্কাহিত হইয়া থাকে।

সহরে এবং বড় বড় গ্রামে গতায়াতের সুবিধার জন্ত ট্রাম এবং রিকশার বন্দোবস্ত আছে। তোকিও সহর কলিকাতার চেয়ে অনেক বড় হইলেও সেখানে গাড়ী ঘোড়া এবং মোটরকারের ধুম কলিকাতা হইতে অনেক কম। তোকিও সহর বৈদ্যুতিক ট্রামে ছাইয়া ফেলিয়াছে। তথায় চারি বৎসর

অবস্থান কালে সংবাদপত্র স্তম্ভে একদিনের জন্তেও মোটর গাড়ী কিম্বা বৈদ্যুতিক ট্রামের চাপায় একটী ব্যক্তিরও অপমৃত্যুর সংবাদ অবগত হই নাই। তোকিওর গ্রাম ভারী সহরে ১৫১২০ খানার বেশী মোটর গাড়ীও নাই। ঘোড়ার গাড়ীর সংখ্যাও প্রায় তদ্রূপই। বাইসিকেল আজকাল ভদ্রলোকে কমই ব্যবহার করিয়া থাকে। ফেরিওয়ালা এবং সংবাদবাহকগণের ভিতরই উহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। স্কুল কলেজের ছেলেরাও ব্যবহার করিয়া থাকে।

গাড়ী ঘোড়ার আড়ম্বর নাই বলিয়াই যে জাপানীরা আমাদের চেয়ে গরীব তাহা নহে। পূর্বেই বলিয়াছি যে উহারা এরূপ ব্যয়কে অপব্যয় বলিয়া মনে করে। একবার হায়দরাবাদের নিজামের ভাগিনেয় এক নবাব তোকিও সহরে গিয়াছিলেন। তাঁহার সেক্রেটারী এবং সৈন্যবভাগীয় কাপ্তেনের সহিত তাহাদের আগমনের দ্বিতীয় দিবস সহর ভ্রমণে বাহির হই। তাঁহারা কয়েক মিনিটের অভিজ্ঞতাতেই গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতির আড়ম্বর না দেখিয়া মস্তব্য প্রকাশ করিলেন “আরে ভিকারী সত্রাট রে! আরে ভিকারী মিউনিসিপালিটি রে। আরে ভিকারী জাপান রে।” বলাবাহুল্য মাসাধিক কাল অবস্থানের পর তাঁহাদের মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছিল। তাঁহারা তখন দরিদ্র জাপানীদের ভিতরও ঐশ্বর্য্য পরিজ্ঞাপক কিছু না কিছু দেখিতে পাইতেন। বাস্তবিক দরিদ্র চাকরানীগুলি রাশি রাশি যেরূপ মূল্যবান রেশমী বস্ত্র দেখিতাম আমাদের দেশের বিশিষ্ট অবস্থাপন্ন ভদ্র

মহিলারও তেমন আছে কিনা বলিতে পারি না। জাপানের দরিদ্র কৃষকও তিন বার পরিতোষ সহকারে উদর পূর্তি আর রেশমী

বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। তেমন স্বচ্ছল অবস্থা আমরা কি কখন হিন্দুস্থানে আশা করিতে পারি।

শ্রীযত্ননাথ সরকার।

বহুস্মারস্ত।

(১)

নীহারিকা একদিন তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা, আমি যদি এখন মরি, তুমি কি কর?”

সুকুমার গভীর ব্যথার ব্যঙ্গভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, “ওঃ! তা হলে?—একটা মস্ত কবিতা লিখে ফেলি!”

নীহারিকা কহিল, “না—ঠাট্টা নয়! সত্যি বল—তুমি ফের বে কর?”

“তুমি আমায় এত অধম ভাব?”

নীহারিকা হাসিয়া বলিল, “দেখা যাবে!”

“কি দেখবে?”

“এই, ফের বে কর কিনা।”

সুকুমার একটু বিবস্ত্র ব্যথিত হইয়া বলিল—“যদি বে-ই করি তুমি আর দেখবে কোথেকে?”

নীহারিকা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—“সে তখন বুঝবে!”

ইহার কিছু দিন পরে নীহারিকা তার পিতার কর্মস্থল—হাজারিবাগে গেল। তার বড় বোন প্রভাতকুমারীও স্বামীসহ সহিত তখন পিত্রালয়ে আসিয়াছিল। অরুণ বাবুর শরীর খারাপ। ছুটি লইয়াছেন—এখন হাজারিবাগেই থাকিবেন। লোকনাথ বাবু,

জামাতাকে পৃথক বাটী ভাড়া করিতে দেন নাই।

(২)

এপ্রিল মাসেব আর বেশী দেবী নাই। প্রভাত বলিল, “নীহার, আয় সুকুমার বাবুকে ‘এপ্রিল ফুল’ করি।”

নীহারিকা সাহ্লাদে বলিয়া উঠিল—“বেশ! আমার একটা প্ল্যানও তৈরি আছে।”

“সত্যি নাকি? কি, বল দেখি! যাতে ঠকে, এমন করতে হবে!”

“নিশ্চয়ই ঠকবেন, তা ছাড়া সেই সঙ্গে বেশ একটা রীতিমত একজামিনও করা হবে!”

“তা হলেত খুব মজা!—কি প্ল্যান করেচিস?”

নীহারিকা বলিতে লাগিল, “একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস্ কল্পম—‘আমি যদি মরে যাই তুমি কি কর’—?”

প্রভাত খুব হাসিয়া উঠিয়া বলিল, “ও হরি! সকলেরি দেখিচি এক রোগ!”

নীহারিকা বলিল, “ওমা! তুমিও বুঝি ঐ কথা জিজ্ঞেস্ করো?—তা, কি উত্তর পাও?”

তিনি অম্নি চোখদুটো কপালে তুলে

বলেন, “তা হলে ঘন ঘন মুছা যাবো আর কবিতা লিখিব!”

নৌহারিকা গালে হাত দিয়া বলিল—
“সকলেরি দেখ্‌চি এক প্রেক্ষপশান!”

“তা যাক এখন তোর প্ল্যানটা কি শুনি।”

“অরুণ বাবুকে দিয়ে একখানা চিঠি তাঁকে লেখান যাক যে, হঠাৎ হার্টফেল হয়ে আমি মারা গেছি! দেখি কি করেন।”

প্রভাতের মনে প্ল্যানটা তত সুবিধার বলিয়া মনে হইল না; নৌহারিকার দিকে চাহিয়া সে বলিল, “দুব! সেকি ভাল?—”

নৌহার বলিল, “তোমার ভয় নেই দিদি, আমি মরবো না!”

“দূর, তা কেন?”

“তবে কি?”

“যদি আবার বে করে বসে!”

নৌহারিকার মুখ একটু লাল হইয়া উঠিল—সে বলিল, “না, সেটুকু বিশ্বাস আছে।”

প্রভাত কহিল—“তবে আবার একজামিন কেন?”

“ভাল ছাত্রকেও তো একজামিন দিতে হয়!”

প্রভাত কৃত্রিম হুঃখে বলিল—“আহা, বেচারী সেই বেলা থেকে একজামিন দিতে দিতে জ্বালাতন হয়ে গেছে—আবার তোর কাছে একজামিন!”

নৌহারিকা হাসিয়া বলিল—“পুরুষের মারাজীবনই ত একজামিন।”

এমন সময়ে অরুণচন্দ্র সেখানে আসিয়া বলিলেন—“আর মশায়রা বুঝি বসে বসে প্রাইজ দিবেন!” অরুণবাবুর দিকে না

চাহিয়াই নৌহার হাসিয়া বলিল—“সেই রকম ত মনে হয়!”

(৩)

‘এপ্রিল ফুলের’ প্ল্যান শুনিয়া অরুণচন্দ্র প্রথমটা রাজি হইলেন না কিন্তু হঠাৎ আর একটা মতলব তাঁর মাথায় আসিল—তিনি বলিলেন, “বেশ, আমিও রাজী!”

নৌহারিকা ও প্রভাত সকৌতুক ব্যগ্রতার সহিত সুকুমারের পত্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পাঁচ দিনের দিন সুকুমারের নিকট হইতে পত্র আসিল। অরুণ বলিলেন, “নৌহার, দেখো, সুকুমার ‘মাই ডিয়ার অরুণবাবু’— লিখেই তোমার শোকে চোখের জলে ভেসে গেছে—এই দেখো কাগজ চুপসে গেছে!”

স্বামীর সুগভীর স্নেহ স্বরণ করিয়া নৌহারিকার ডাগর চক্ষু দুটা অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

কিছু দিন পরে প্রভাতের নিকট সুকুমারের সম্পাদিত ‘মলয়া’র চৈত্র সংখ্যা আসিল। নৌহারিকা দেখিল, কাগজের প্রথমেই আর একখানি ‘উদ্ভাস্ত প্রেমের’ সৃষ্টি হইয়াছে! প্রবন্ধের নীচে লেখা—“অভাগা।”

দুই ভগিনীতে খুব খানিকটা হাসিলেও প্রিয়জনকে কৌতুকের খাতিরে বেদনা দেওয়ায় নৌহারিকা অন্তরে অন্তরে ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল। নৌহারিকা বলিল, “না ভাই! আর বেচারাকে কষ্ট দিয়ে কাজ নেই, এবার বহরমপুর যাওয়া যাক!”

প্রভাত রাজী হইল না—বলিল, “আচ্ছা, আর একটু দেরী করনা, বেদনা ও বিরহ আর একটু পেকে আসুক।”

বৈশাখের “মলয়ায়” নৌহারিকা দেখিল—

তার ছবি বাহির হইয়াছে—চারি ধারে মোটা কালো 'বর্ডার' মধ্যে একটী করুণ মর্মস্পর্শী সনেট! নীহারের ব্যথিত প্রাণ বহরমপুর যাইবার জন্ত আবার আঁহর হইয়া উঠিল! প্রভাত বাধা দিল। আরো চারি মাস কাটিয়া গেল—ইহার মধ্যে "মলয়াতে" নীহারিকার শোকে অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে! সেই সঙ্গে সম্পাদকের বাঙ্গরসাম্বন্ধ কয়েকটী ক্ষুদ্র গল্পও আছে।

নীহার একটু আশ্চর্য হইয়া প্রভাতকে একদিন বলিল—“আচ্ছা! তাঁর যদি মন খারাপ তা হলে এমন হাসির লেখা বেরুচ্ছে কেমন কবে?”

প্রভাত হাসিয়া বলিল—“ঐটি পুরুষদের বিশেষ তো লেখক জ্ঞাতের বাহাদুরী!—আরো এরকম কাণ্ড আমি দেখেছি!”

নীহারিকা বলিল, “তবে কি পুরুষের হাসিও মিছে কাঁদাও মিছে?—”

“ভাদ্রের রোদবিষ্টি কি মিছে?”

“মিছে নয় বটে কিন্তু কোন কাজেরও নয়—সে জলে মাটিও তেমন ভেজনা, সে রোদে কাপড়ও শুখায় না।

(৪)

আখিন মাস। ছুটির আগেই 'মলয়া' বাহির হইবার কথা। নীহারিকা ভাবিতেছিল, এবার পূজার সংখ্যার ছদ্মাবরণে প্রিয়তমের ব্যথিত প্রাণের আর একটু ভাবতরঙ্গ পাইব—না জানি পূজার 'মলয়া'র ছত্রে ছত্রে বর্ণে বর্ণে তাঁর কত ব্যথা কত মর্মস্পর্শী কত অশ্রুসিক্ত ভাগনামা নিহিত আছে!—সত্যই আমি নিষ্ঠুর!—বড় নিষ্ঠুর—একজনের প্রাণের ব্যথা নিয়ে আমোদ কোতুক!

এমন সময় প্রভাত পিছন হইতে বলিল—“নীহার! নাঃ! সুকুমারটা শেষে ফেল্-ই হ'ল।” কথাটা বলিয়া আখিনের 'মলয়া'খানা তার সম্মুখে ফেলিয়া সে চলিয়া গেল।

“সুকুমার ফেল্!”—নীহারিকার মুখের রংটা পাঁশের মত হইয়া গেল। সে কম্পিত হৃদয়ে, 'মলয়ার' পাতা খুলিয়া দেখিল সুকুমারের নব-পরিণীতা স্ত্রীর ছবি—এমন সুন্দর অথচ এমন কুৎসিত বৃদ্ধি নীহারিকা জীবনে কিছু দেখে নাই! আবার ছবির তলে চারি লাইন কবিতা—

“কনা কর তুমি দেবী!—অতীত প্রতিমা!
তুমিই এসেছ ফিরে নব প্রতিমায়
ধুইয়া স্বর্গদানীরে মৃত্যুর কালিমা,
এহ জ্ঞানে স্থাপিয়াছি এ চাকুবালায়!”

নীহারিকার চক্ষু ফাটিয়া যেন আগুনের হুকা বাহির হইতে লাগিল! নীহারিকার মৃত্যুসংবাদ তার স্বামাকে ব্যথা দেয় নাই—কবিতার উপাদান যোগাইয়াছে মাত্র!—যে নারী স্বামীর স্মৃতি হৃদয়ে আমরণ জাগাইয়া রাখে, সেই স্বামা স্ত্রীর চিতার আগুণ না জুড়াইতেই আবার ঘটকের দ্বারস্থ হয়!—নীহারিকা যতই ভাবিতে লাগিল, ততই যেন তার বুকটা ফাটিয়া যাইবার উপক্রম করিল!

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে পরিচিত কণ্ঠে কে বলিল—“এ কি! নীহার তুমি বেঁচে!”

নীহার চম্কাইয়া উঠিল—দেখিল,—তার স্বামী!

সুকুমার হাসিয়া বলিল “সতীনের হাতে স্বামীটিকে দিয়ে বৃদ্ধি স্বর্গে মন্টিকুল না? এখন সতীনটিকে আদর করে ডেকে আনো! গাড়ীতে বসে আছে।”

নীহার গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল—“বেশত! চল না!”

সুকুমার বলিল—“ইস্—থাক্ না!—এখনি আবার স্মেলিং সন্টের দরকার হবে!”

নীহারিকা বলিল—“তুমি ত আচ্ছা লোক! কাগজে ছাপালে কেমন করে?”

এমন সময় প্রভাত ও অরুণচন্দ্র সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীহার তাঁর দিকে ফিরিয়া বলিল—“অরুণবাবু, শেষ আপনার এই বিশ্বাসঘাতকতা!”

অরুণবাবু সহাস্ত্রে বলিলেন “কি করি বল! পাখোয়াজের দিকেই যা দিতে হয়,

নহিলে যে বেস্তুরো বাজবে! তোমরা দুই বোনে এককাটা হয়ে বেচারাকে জন্ম করতে গিছলে, আমি একটু তাঁর পক্ষ নিয়েছিলুম—আবার কোন্ দিন আমায়ও তো অমনি করতে পারো! তখন কে সহায় হবে, বল!”

নীহারিকা বলিল—“নাঃ, আপনার জন্তই আমাদের এই হারটা হল!”

প্রভাত বলিল—“আচ্ছা, সে যেন হোল—কিন্তু সেই সঙ্গে ‘মলয়া’র এতগুলি নিরীহ পাঠক কি অপবাধ করেছিল যে তারাও ঠকল!”

সুকুমার হাসিয়া বলিল—“ওহো ও কথানা আপনাদের জন্ত স্পেঞ্জাল্ কাপ!”

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ ।

বৌদ্ধ ও প্রাচীন মোগল চিত্রশিল্প ।

আশ্চর্যের বিষয় অজস্তার ছবির মধ্যে আমরা বাঙ্গলাদেশের দৃশ্যের আভাষ পাই। প্রথমত আমরা গুহার নিকটবর্তী ও দূর্বর্তী গ্রামে বেড়াতে গিয়ে যত কুটীর দেখেছি, সবগুলিরই মটীর ছাদ; কিন্তু, অজস্তার ছবিতে অবিকল বাঙ্গলার মত আটচালা! ও দেশের লোক নারকল গাছ চোখে দেখেনি; কিন্তু ছবিতে নারকল গাছ যথেষ্ট! বঙ্গদেশে যেমন উঁচু বৃষক দেখা যায়, অত্র কোন দেশের ষাঁড়ের বোধ হয় তত উঁচু কাঁধ নয়; অজস্তার ১ নং গুহার ষাঁড়ের লড়াইয়েব ছবিতে ঠিক আমাদের দেশের ষাঁড়ই অঙ্কিত। এই সমস্ত দেখে অনেকে বলেন যে, বাঙ্গলা দেশ থেকে কোন ছাত্র অজস্তার শিল্পাশ্রমে চিত্রবিদ্যা শিখতে গিয়ে

ছিলেন। কিছুই বিচিত্র নয়! আবার নয় নয়র গুহার থামের গায়ে আঁকা যে কয়েকটি বুদ্ধদেবের ছবি আছে—সেগুলি অবিকল চীন ছবির অনুরূপ! তা দেখে অনেকে অনুমান করেন যে, চীন কাবিকর এদেশে এসে আমাদের চিত্রশিল্প শিখে গিয়েছিলেন। আমি এখানে অনেক জায়গায় রোমশিল্পের আভাষও দেখেছি। গ্রীক প্রভৃতি বিদেশীয়গণও যে এ দেশে শিল্পশিল্পার অভিপ্রায়ে এসেছিলেন—এ থেকে এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নয়। ষাঁড়াই এসেছেন তাঁরাই এখানে নিজের দেশের শিল্পের কিছু কিছু রেখে গেছেন। চীন ও জাপান-বাসীরা ত স্বীকারই করেন যে, বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের

দেশের শিল্প-বিদ্যাও তাঁদের দেশে এবং অন্যান্য সকল দেশে গেছে।

অনেকে মনে করেন পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রের আদর্শ জাপান চিত্র হইতে গৃহীত—অজস্তার ছবি দেখলে কিন্তু এ ভ্রম একেবারেই দূর হয়ে যায়। তাঁর চিত্র—এমন কি সেই চিত্রের প্রাণ পর্য্যন্ত যে ভারতবর্ষীয় তাহা অজস্তার চিত্র দেখলে আর সন্দেহ থাকে না।

ইংরাজেরা নয় নম্বর গুহাকেই অন্যান্য সকল গুহার চেয়ে বেশী প্রাচীন বলেন,—কেন জানি না। তাঁরা বোধ হয়, গুহার অনেকগুলি ছবিতে অপকৃষ্ট অসভ্যতার আকৃতি দেখতে পান বলে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন! কিন্তু, সেই গুহাটাতাই আবার আমরা ‘বুদ্ধদেবের প্রচার’ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ছবিও দেখেছি। তবে, থামের গায়ে খোদা যে একটা লেখা আছে সেইটে ধরে’ যদি—তাঁরা কিছু আবিষ্কার করে থাকেন ত’ সে কথা স্বতন্ত্র!

আমরা অজস্তার ছবিগুলিতে মাত্র দু-এক যায়গায় পালি অক্ষরের মত লেখা দেখেছিলুম। আর পাথরের দেওয়ালের উপর খোদা লেখাও দু-একটা গুহাতে পেয়েছি। সেগুলিতে ঐতিহাসিকদের জানবার বিষয় অনেক থাকতে পারে। আমরা এক, নম্বর, দুই, নয়, দশ, ষোল, সতের, উনিশ প্রভৃতি নম্বরের কতকগুলি গুহা ভিন্ন, আটশতা গুহার মধ্যে অন্য কোনটাতে বড় একটা ছবি দেখতে পাইনি। পথ না থাকায় একটা গুহাতে তো একেবারে যাওয়াই গেল না। অল্পসংখ্যক

কতকগুলি গুহা অসম্পূর্ণ ভাবে পড়ে আছে। কোনটার কেবল বারান্দাটুকু খোদা মাত্র হয়েছে, কোনটা কেবলমাত্র খুদতে আরম্ভ করেছিল; পাহাড়ের গায়ে বাটালীর দাগ এখনও বেশ পরিষ্কার ফুটে আছে! দেখলে মনে হয় যেন এইমাত্র শিল্পীরা বসে বসে কাটছিল, পরিশ্রান্ত হয়ে যে যার বাড়ী গেছে। কতকগুলিতে পূর্বে ছবি ছিল,—কিষা আঁকা হচ্ছিল—কালে মাটি চাপা পড়ে সেগুলি একেবারে অদৃশ্য হয়েছে! অজস্তার বেশীর ভাগ ছবি একেবারে লুপ্ত ও নষ্ট হয়ে গেলেও এখনও তাকে অক্ষয় ভাণ্ডার বলা চলে। যে সব ছবি এখনও বর্তমান আছে সে গুলির আমরা কেউ যদি আজীবন ধবে প্রতিলিপি (copy) করি, তবে, এ জীবনে সেগুলি শেষ করে উঠতে পারি কিনা সন্দেহ!

আমি এইবার অজস্তার বিশেষ বিশেষ কয়েকটা ছবির বিষয় কিছু বো’লে আমার প্রবন্ধ শেষ করুব। প্রথম নম্বর গুহার আমরা একটা বিশাল, সৌম্য, ও সুন্দর কাস্তি বিশিষ্ট বুদ্ধদেবের ছবি গুহাটিকে উজ্জ্বল করে রেখেছে দেখতে পাই। সেখানি বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগের চিত্র ব’লে মনে হয়। সেই ছবি খানিতে চিত্র-শিল্পীরা বাস্তবিকই তাঁদের মহৎ ও উদার অন্তঃ-করণের পরিচয় দিয়ে গেছেন; কেন না, তাঁদের মন সেরূপ উচ্চ না হ’লে ছবিতে তেমন বিশ্বপ্রেমে বিশ্বাস ও আত্মহারা ভাব কখনই দেখাতে পারতেন না। সাধারণতঃ কবিদের লেখায়, আর চিত্রকরের চিত্রে তাঁদের চিন্তের ভাব প্রতিকলিত হ’তে দেখা



বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ।
 (অজম্ভার প্রথম গুহার চিত্র হইতে)

যায়। এক নম্বর গুহাব মধ্যে “বুদ্ধদেবেব প্রলোভন” ছবি খানিও সুন্দর ভাব-বাজ্ঞ চিত্র। সে ছবি খানিতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য প্রভৃতি রিপুগণ কর্তৃক আক্রান্ত ও পবিবেষ্টিত হ’য়ে ভগবান বুদ্ধদেব অটল-গম্ভীর ভাবে ধ্যানে নিমগ্ন! তিনি শত-সহস্র প্রলোভনের মধ্যে থেকেও মনে মনে তাদের চেয়ে চেব তফাতে যেন কোন শাস্ত্রিব আলোকময় বাজ্যে ভাসছেন! আর তাঁর জড়-তন্ত্র খানি সেখানে প্রাণশূণ্য হ’য়ে পুতুলের মত বসে আছে। এদিকে আশে-পাশে চারিদিকে দুর্গম শক্রবা তাঁকে প্রলোভিত করার জন্য মদ-মহদ্ব সাপা চেপে কব্ধে। কাম সুন্দরা স্ত্রী মূর্তি ধবে, লোভ চাকবেশে, মোহ দানব সেজে, মদ-মাৎসর্য প্রভৃতি আঁক বকম বকম মূর্তি ধবে তাঁকে প্রলোভিত করার নানা বকম কৌশল করচে। রাজসভায় দুজন পণ্ডিতের তর্ক বিতর্কের ছবিখানি অত্যন্ত কৌতুকজনক! এক নম্বর গুহায় যে একটা প্রকাণ্ড ভীষণ দর্শন সাপের ছবি আছে, সেটা এত স্বাভাবিক যে, চর্চাং দেখলে আতঙ্কে শিউবে উঠতে হয়!

সতের নম্বর গুহায় উৎকৃষ্ট ছবির সংখ্যা কিছু বেশী। অত্যন্ত ভাল ভাল ছবির মধ্যে ভিখারী বেশী বুদ্ধদেবেব সামনে মাতৃমূর্তির ছবি খানিতেই গিরিগুহাটী অলঙ্কৃত কবে তুলেছে। মা ছেলেব হাত ধবে তাকে দিয়ে বুদ্ধদেবকে ভিক্ষা দিতে গেছেন, অবশেষে মহাত্মা বুদ্ধদেবেব সৌম্যোজ্জ্বল কাস্তি দেখে, ভক্তি-প্রেম-বিহ্বল হ’য়ে তাঁর চরণ-প্রান্তে পুত্র সমেত নিজেকে নিবেদন করতে যাচ্ছেন!

অন্তর্যামী বুদ্ধদেবও যেন তার মনোগত ভাব বৃদ্ধিতে পেরে নত হয়ে তাদের দেওয়া ভিক্ষা সাধরে গ্রহণ করছেন! ভিক্ষাপাত্রধারী বালকটির মুখে সবল-নির্ভীক-হৃদয়ের মাতৃ-ভক্তি ও আনুগত্যের ভাব সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে! বুদ্ধদেবকে দেখলে মনে হয়, যেন তাঁর অন্তর-নিভূতে কি এক কোমল করুণ সুর বাজচে, যেন তাই তিনি অপরের বেদনায় বাগিত, দুঃখে দুঃখিত, এবং ভগবৎ প্রেমে বিহ্বল!—এক কথায়—ছবি খানিতে জননীব মেহ, ভক্তেব প্রেম, বুদ্ধদেবেব করুণা এবং পুত্রের আনুগত্যের ভাব সুন্দর কুটেছে! বুদ্ধেব ছবি খানি মাতৃমূর্তির দ্বিগুণ বা ততোধিক বড়। তাতে বোধ হয় যে, মাতৃমূর্তির হৃদয় পটে মহাতাপস বুদ্ধদেবেব যে বিশাল ও উদ’ব ছবি খানি প্রতিফলিত হইছিল, সেই ভাবটা দেখাবার জন্তেই শিল্পী বুদ্ধ মূর্তীগকে ও বকম অস্বাভাবিক বড় করে আঁকেছিলেন। বুদ্ধদেবেব ছবির এখন শুধু বকটুকুই বর্তমান! কিন্তু তাতেও তাব সৌন্দর্য্য লোপ পায়নি।

সতের নম্বর গুহায় সিংহল বিজয়ের চিত্র-গুণিতে আমবা ধর্ম্ম বুদ্ধেব আদর্শ দেখতে পাই। যাঁরা কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি পুরাকালের যুদ্ধ-প্রাণী আর নাচি, বজ্র, শেল, শূল আদি নানারকম অস্ত্র ও অস্ত্রেব চালনা কীরূপ ছিল জানতে চান, তাঁরা সিংহল বিজয়ের ছবি গুণিতে তা’ দেখতে পাবেন। কোন কোন যারগায় (সম্ভবতঃ সিংহলের) দুর্গবारे বিপক্ষের অশ্বাবোহী আর পদাতিক যোদ্ধার দল বীর-দর্পে ও মহোল্লাসে যেন মেদিনী কাঁপিয়ে প্রবেশ করছে।

পরাজিতেরা এখনও সম্মুখ সমরে তৎপর। এই যুদ্ধ ব্যাপারের ছবিগুলি দেখলে মনে বাস্তবিক আলো আধারের মত আনন্দ ও আতঙ্কের উদ্ভেক হয়! সিংহল বিজয়ের ছবিগুলিতে আমরা প্রাচীন অর্ণবপোতের ছবি দেখতে পাই। এক যায়গায় একটা মিছিলের চিত্রে কতকগুলি লোক আনন্দে চীৎকার করচে, কতকগুলি লোক হাতীর পিঠ থেকে ভেঁপু বাজাচ্ছে। তাদের ভাব-ভঙ্গি একমনে কিছুক্ষণ দেখলে ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিলের কিম্বা কলকাতার বড়লোকের বিবাহের সমারোহের বাহুকোলাহলময় শব্দ, কানে যেন খুব স্পষ্ট ভাবে এসে লাগে। ছবিতে এরকম ভাব দেখান কম ক্ষমতার কাজ নয়। যুগয়ার ছবিগুলিও বেশ চিত্তরঞ্জক! সেগুলি আজ কালকার মত 'ফাঁসকল' পেতে শীকার করার ছবি নয়। তাতে অনেক বিষয় বোঝবার ও দেখবার আছে। হরিণদের স্বাভাবিক ভয়বিহ্বল চপলভাব আর শিকারীদের যুগয়াকৌশল তাতে সুস্পষ্ট। নর-নারীর বিলাসচিত্র ও দাম্পত্য প্রেমের ছবিও যথেষ্ট পাওয়া যায়। তার মধ্যে ১৭ নং গুহার, প্রবেশ ঘরের উপর কতকগুলি দম্পতির ছবি উল্লেখযোগ্য। আর এক জায়গায় কোন কামিনী বসন্ত আগমনে হৃষ্টচিত্তে বাসন্তি রঙের কাপড় প'রে দোলনায় হুলছে; তার আননে ও গঠনে যৌবনের ধীর ও প্রফুল্ল ভাব সুন্দর ফুটেছে! ২ নম্বর গুহার একস্থানে দুয়ারের দুধারে দুটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড একতলার সমান বড় বুদ্ধমূর্তি আছে; সে দুটির মধ্যে একটি এখন অস্পষ্ট ছায়াকার হয়ে পড়েছে আর একটার

কেবল খেত শতদলের উপর চরণ কমল দুটি অবশিষ্ট! চরণ দুটি এত সুন্দর ও ভাবপূর্ণ যে, তার তলায় পড়ে থাকতে ইচ্ছে হয়! আবার ঐ গুহাতেই গগনচারিণী দেবকন্ডাদের কতকগুলি পা দেখেছি অতি আশ্চর্য্য ভাবে আঁকা! সেগুলো দেখলেই তারা যে শূণ্ডে মেঘের কোলে ভাসচে সে বিষয় কোন সন্দেহই থাকে না! ১৯ নম্বর গুহার এক জায়গায় একটা পুষ্পিত পলাশ গাছের গুঁড়ির উপর সারবন্দী পিপড়ের দল উঠছে। শিল্পীরা একটা সামান্য পিপড়ে থেকে হাতী ঘোড়া লোক লঙ্কর প্রাসাদ প্রাচীর—দুনিয়ার কিছুই যেন বাদ দেন নি।

খানিকক্ষণ ধরে ছবি দেখতে দেখতে আমরা এমন তন্ময় হয়ে পড়তুম যে বাইরের সমস্ত বিষয়, এমন কি নিজের বিষয়ও যেন ভুলে যেতুম! আমাদের মনে কেবল সেই তিন সহস্র বৎসর পূর্বের কাল জেগে উঠত। আমরা যখন যে ছবিটার কাছে দাঁড়াইতুম, তখন, একগতের সমস্ত বিষয় ভুলে গিয়ে তাতেই ডুবে যেতুম! হয়ত, আমি কোন একটা মিছিলের ছবি দেখছি, দেখতে দেখতে মনে হ'ত আমিও বুঝি সেই মিছিলের মধ্যের একটা লোক! কোলাহল দেখতে দেখতে কোলাহলে যোগ দিতে ইচ্ছা হ'ত। কখন হয় ত, কোন পারিষদ্বর্গ বেষ্টিত সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট রাজার দরবারের ছবি দেখে মনে হত, যেন, ত্রেতা-যুগে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে কোন বিষয়ের প্রার্থী হয়ে এসেছি। কোথাও যদি গান বাজনা হচে এরকম ছবি দেখতুম, তো

সেখানে শ্রোতা হয়ে যেতুম ! চির-মৌন ছবি-
তেও যেন রাগ-রাগিণী বেজে উঠতো ! চিত্রে
এরকম আশ্চর্য্য ভাব খুব কমই দেখা যায়।
ছবিগুলি দেখে ঠিক যে ভাব মনে উদয় হতো
তা' ভাষার জানান আমার পক্ষে একপ্রকার
অসম্ভব ! আমি এ জীবনে সেই সব ভাব
কখনও ভুলতে পারব না। অজন্তার প্রথম
নম্বর গুহা থেকে বুদ্ধদেবের জীবনের বাল্যের
ঘটনা আরম্ভ করে, ২৬নং গুহায় তাঁর
চির নিরীকার চিত্র দেওয়া আছে। এবং
প্রসঙ্গ ক্রমে অনেক স্থানে তখনকার প্রচলিত
উপকথা ও জাতকাদি গল্পের ছবি আছে।

অনেকে অজন্তার ছবিকে নগ্ন বলে উপ-
হাস করে থাকেন ; কিন্তু, এর নগ্নভাব আর

বিলাতি নগ্নভাবের মধ্যে অনেক প্রভেদ !
ইউরোপীয় ছবিতে নগ্নতা বিশেষ করে নগ্নতার
ভাবই মনে করিয়ে দেয়, আর অজন্তার ছবিতে
নগ্নতা কেবলমাত্র গঠনের সৌন্দর্য্য দেখায় !
এ সম্বন্ধে মোগল ছবি অজন্তাচিত্রেরই
অনুরূপ।

হেমেন্দ্র রায় মহাশয় ইতিপূর্বে ভারতীতে
অজন্তা গুহাগুলির অবস্থা ও বিবরণ সুন্দর
ভাবে লিখেছেন। তাই বাহুল্যভয়ে আর
সে সব কথা এ প্রবন্ধে লিখতে চাইনা। মোট
কথা,—সূক্ষ্ম কারুকায্য হিসাবে মোগল চিত্র
শ্রেষ্ঠ হলেও চিত্র হিসাবে অজন্তার ছবি টের
মূল্যবান।

শ্রীঅসিতকুনার হালদার।

নর্তকী।

কুশলিবু

বীরসিংহ...রাজ-সেনাপতি।

রাধাবাই...নর্তকী।

হেমরাজ...অজ্ঞাতপরিচয় যুবক।

তরুণসিংহ...বীরসিংহের সহকারী।

দৃশ্য—সজ্জিত প্রমোদ-কক্ষ। মুক্ত
বাতায়ন-পথে অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারের মধ্য
দিয়া অদূরস্থ নদী দেখা যাইতেছিল। কাল,
জ্যেষ্ঠা-রাত্রি।

রাধা বাতায়ন পার্শ্বে মধমল-আস্তীর্ণ
উচ্চাসনে বসিয়া মৃদুকণ্ঠে গান গাহিতেছিল।

রাধা—(গীত)

ক্যায়সে যুসে রহেনা যায় সামেলিয়াসে

প্রীতিকর পাছে তানি,

ক্যায়সে করু ক্যায়সে করু মেরি সজনি—

পিয়ারে সুরত সামেলিয়া—

বীরসিংহ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

বীরসিংহ—চারিধার নিস্তব্ধ হয়েছে,
রাধা !

রাধা—এখনো তার দেখা নেই।

বীরসিংহ—বেচারা জানেনা সে কি ফাঁদে
পা দিয়েছে—আজ সে বন্দী হবে ! আমি
আড়ালে সরে যাই ! কিন্তু এখনো সে দেরী
করছে কেন ? সে কি কোন সন্দেহ
করেছে ?

রাধা—আসবে কি না, তাই বা কে
জানে ?

বীরসিংহ—তাহলে তোমায় ধিক ! এমন

রূপের আঙুন জেলে রেখেছে—তুচ্ছ এ পতঙ্গটা কি ঝাঁপ দেবে ন' ? রাধা—

রাধা—চূপ ! কি সুন্দর রাত্রি ! চাঁদের আলোয় চারিধার ছেয়ে গেছে—যেন আঁগা-গোড়া স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে !

বীরসিংহ—থাক—আমি তা দেখতে চাইনে ! এমন চাঁদেব আলো, এমন তুমি, তা হলে সব কাজ মাটি হয়ে যাবে ! কি সুন্দর তোমাকে আজ দেখাচ্ছে, রাধা !

রাধা—একটা কঠোর দস্যুর প্রাণ টলাবার জন্ত এত আয়োজন—

বীরসিংহ—সব কি পণ্ড হবে ?

রাধা—না—কুহকিনীর কুহকের শক্তি অসাধারণ—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, সেনাপতি, যদি সে আসে ত আজ রাত্রে বন্দী করে তাকে তোমার হাতে দেব, নিশ্চয়—

বীরসিংহ—আঃ কি সে দম্ভান, কি সে গৌরব, তার পর, রাধা, তুচ্ছ সংসার, তুচ্ছ কর্তব্য সব থেকে অবসর নিয়ে তোমারি প্রেমে ডুবে থাকব ! সে কি সুখ, কি আরাম—

রাধা—সে কথার সময় আছে, সেনাপতি ! এখন মোহেব ফাঁদে ধরা পড়ো না—

বীরসিংহ—রাধা—রাধা—তুমি আনায় কি করেছ—জানোনা তুমি !—নাবীকে কখনো আমি জানবার অবসর পাইনি ! মাহুঘ মারার নানা কোশলের মধ্যেই এতদিন মগ্ন ছিলাম । তার পর এই ছবৃত্ত দস্যু চাঁদরায়কে ধরবার নানা চেষ্টা বিফল হল, শেষে তাকে ধরবার জন্ত তোমার সাহায্য গ্রহণ করলাম—তুমি যখন একটা বসে নিজের মনে গান

গাও, আমার প্রাণের মধ্যে কি যেন একটা অভাব হাহাকার করে ওঠে ! তোমার পাশে বসে তোমার মুখের পানে চেয়ে থাকতে শুধু সাধ যায় ! আমাকে কি এক নেশায় তুমি মাতিয়ে তুলেছ—এমন বেণী ছলিয়ে রঙ্গীন কাপড় পরে গোলাপী ওড়না উড়িয়ে যখন তুমি বসে থাকো, তখন আমার কি সাধ যায়—জানো—

রাধা—চাঁদরায় জানলার ধারে আমাকে প্রথম দেখে—চোবের মত সে এসেছিল ! আমার অতুল ঐশ্বর্য আছে ভেবে সে তা লুণ্ঠন করতে এসেছিল—জানেনা যে আমি ব্যাধের মত বসে আছি ! আমি তখন গান গাচ্ছিলাম—তন্ময় হয়ে সে আমার পাশে এসে দাঁড়াল—তার পর পাগলের মত এসে কি সব বললে—আমার মনে যে কি আহ্লাদ হল—পাখী ধরবার জন্ত ফাঁদ পাতা হয়েছিল—পাখী এসে আপনা-হতে সে ফাঁদে পা দিয়েছে—উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার আর কোন আশঙ্কা রইল না—যে কাজের জন্ত সেনাপতির নিমক খেয়েছি—সে নিমকের মর্যাদা থাকবে—

বীরসিংহ—আর সেই সঙ্গে সেনাপতিকে এমন ভাবে জয় করে বসেছ যে সে চিরজন্ম তোমার কাছে বন্দী থাকবে ! এমন পরাজয় হয়েছে আজ তার !

রাধা—প্রেমের কথা তুলো না—সেনাপতি ! আমি হাঁন নভুকী—রাণী ব্যবসায়িনী আমি, আর তুমি সম্রাট রাজপুত সেনাপতি—এ সাম্রাজ্যের ভিত্তি তুমি !

বীরসিংহ—যাক সে ভিত্তি রসাতলে !

রাধা—চাঁদরায়ই যে হেমরাজ কেমন

করে জানলে, তুমি? সে জানে, আমি কোন সর্কার-কত্তা! আমার প্রেমে বিভোব হবে পড়েছে সে।

বীরসিংহ—এটা তার স্মৃতিবই পবিচয়!

রাধা—সে জানেনা, সন্দেহ কবাবো সে কোন অবকাশ পায় নি যে, আমি একজন সামান্য নর্তকী মাত্র—তাকে ধববাব জন্ত বিবাত আয়োজন করে বসে আছি! সে এমন বশ মেনেছে যে আমার কথায় স্বচ্ছন্দে সহরে যেতে এখন সে এতটুকু সংক চ বা দ্বিধা করবে না!

বীরসিংহ—রাধা, আমাকে ত আশ্বাসেব কথা কিছু বললে না, তুমি!

রাধা—সে কথার এখনো ত সময় যায়নি, সেনাপতি!

বীরসিংহ—এমন সুন্দর তুমি, হায় নারী, আমার এমন নিশ্চয়! পাষণেব প্রতিমা।

রাধা—সেনাপতি বীরসিংহ, প্রেমোচ্ছ্বাসের সময় এ নয়!

বীরসিংহ—সময় নয়, কি বল, রাধা? এমন জ্যোৎস্না রাত্র, এমন নিশ্চল দিক, এমন শান্ত সুন্দর তুমি, এমন নির্জন—

রাধা—চুপ! দূরে ঐ ঘোড়ার ফুরেব শব্দ! তুমি আড়ালে যাও -

বীরসিংহ—রাধা, ধিক এ বর্তব্যো!

প্রস্থান।

রাধা—(আপনার মনে গান ধরিল।)

দেখে বনু কল নাহি পরত চায়ন মোহে
ছিপি রহে বনোয়ারী মৌর সজনি,

কোই দেউনা বাতা ওয়ে—

হেমরাজের প্রবেশ।

হেমরাজ—রাধা!

রাধা—হেম!

হেমরাজ—এত রাতে এখনো তুমি একলাটি বসে আছ!

রাধা—(হেমরাজেব মুখের পানে চাহিয়া রহিল।)

হেমরাজ—এখনো তুমি জেগে আছ, বাধা?

রাধা—হঁ! কিন্তু তোমার এত দেবী চল কেন, হেম! এত রাতে কি এমন তোমার কাজ ছিল!

হেমরাজ—সে কথা জিজ্ঞাসা কবোনা, আমাকে! (রাধার হাত আপনার হাতে তুলিয়া লইল) আমারি জন্ত তুমি বসে আছ, রাধা?

রাধা—(হেমরাজেব মুখের পানেই সে চাহিয়া রহিল—কোন উত্তর দিল না।)

হেমরাজ—(বাধার হাত ছাড়িয়া) তুমি জানোনা—আজ সারাক্ষণ কি যন্ত্রণা আমি ভোগ করছি!

রাধা—বল, আমাকে! (হেমরাজেব হাত ধরিল) বলবে না?

হেমরাজ—আমাকে স্পর্শ করোনা, তুমি! তোমার পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতাও আমার নেই! আমি আজ বিদায় নিতে এসেছি।

রাধা—বিদায়? কোথা যাবে, তুমি?

হেমরাজ—জানি না। তবে তোমার সামনে আর আসবো না, কখনো!

রাধা—আমাকে তুমি গ্রহণ করবে, বলেছ ত!

হেমরাজ—তা হয় না, রাধা!

রাধা—কেন? কি দোষ করেছি আমি?

হেমরাজ—দোষ তোমার নয়, রাধা, দোষ আমার !

রাধা—তোমার ? কি, সে ? এত ভালবাসা—

হেমরাজ—সেই ভালবাসার জন্ত আমি দূরে যেতে চাই ! রাধা, সূর্য্য তুমি, আমি পথের মলিন ধূলিমাত্র ! তোমার দীপ্ত আলোর সামনে আমার মলিনতা আরো ব্যক্ত হয়ে ওঠে । তুমি আলো, আমি অন্ধকার !

রাধা—এ তুমি কি বলছো, আজ ?

হেমরাজ—বুঝতে পারছ না ? তবে শোন বলি—

রাধা—(বসিল) বল !

হেমরাজ—(চকিতভাবে) ও কিসের শব্দ ?

রাধা—কিছু না !

হেমরাজ—আমার মনের তা হলে ! রাধা যা বলব তা শুনে এখন সমস্ত আলো নিভে যাবে—বাতাস স্তব্ধ হয়ে যাবে, আকাশ কেঁপে উঠবে, তুমিও স্তম্ভিত হবে—তবু শোন...রাধা আমাকে চেননা তুমি, আমি সর্দার নই, ওমরাহ নই, আমি ঘৃণিত দস্যু ! রাজদণ্ডে দণ্ডিত !

রাধা হেম—

হেমরাজ—আমি সেই দুর্দাস্ত দস্যু চাঁদ রায়—তোমাকে যা বলেছি, মিথ্যা ! সব মিথ্যা ! তাই আজ তোমার পথ থেকে সরে যেতে চাই ! এ মণি রাজার মুকুট-শোভার জন্ত, হীন দস্যুর বৃকের জন্ত নয়, রাধা !

রাধা—আমি তোমার ভালবাসি, হেম !

হেমরাজ—ভুলে যাও, রাধা, হৃৎস্বপ্নের মত আমার কথা ভুলে যাও, তুমি ! আমিও

তোমাকে ভালবেসেছিলাম—অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল ! কিন্তু তোমার নিশ্চল প্রেমের যোগ্য নই, আমি !

রাধা—তবু আমি ভালবাসি, হেম ! তুমি দস্যু হও, যে হও, তবু তুমি আমার সর্ব্বস্ব !

হেমরাজ - না ! তুমি ভালবাস সর্দার হেমরাজকে, দস্যু চাঁদরায় তোমার ভালবাসার যোগ্য পাত্র নয়, রাধা !

রাধা—হেম !

হেমরাজ—কি ?

রাধা—তবে আমারো কিছু বলবার আছে । শোন—আমিও মিথ্যা বলেছি—আমি সর্দারকত্তা নই, হীন নর্তকী, আমার নাম লছমি ! তোমাকে ধরবার জন্ত শুধু ফাঁদ পেতেছিলাম রাজার আদেশে,—কিন্তু কি ফাঁদে ধরা পড়েছি, তা তুমিই জানো !

হেমরাজ—নর্তকী লছমী ! রূপব্যবসায়িনী লছমী—

রাধা হাঁ, হীন, অতি হীন নর্তকীর প্রাণ তোমারই প্রেমের সে আজ নূতন রূপে ভরে উঠেছে ! জীবনে এই প্রথম সে ভালবাসার স্বাদ পেয়েছে ! তা থেকে বঞ্চিত করোনা তাকে !

হেমরাজ—লছমী—

রাধা—না, লছমী নয়, লছমী মরেছে, আমি রাধা !

হেমরাজ—রাধা, এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বল, তুমি ?

রাধা—কি কথা ?

হেমরাজ—যে আমাকে তুমি ভালবাস, যে আমি তোমার সর্ব্বস্ব !

রাধা—বিশ্বাস কর, হেম, সত্য বলছি, এ

কথা বিশ্বাস কর, পৃথিবীতে এমন সত্য আর কিছু নেই !

হেমরাজ—আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্তু ফাঁদ পেতেছিলে তুমি, অথচ...

রাধা—অথচ নিজেই আমি কি এক নূতন ফাঁদে ধরা পড়েছি !

হেমরাজ—এ কথা সত্য ?

রাধা—সত্য, তোমার পদ স্পর্শ করে বলছি, এ কথা সত্য ! আজ যখন তোমারি প্রতীক্ষায় এখানে এসে বসলাম তখন চারিধার জ্যোৎস্নায় ভবে গেছে—কি সে সৌন্দর্য্য, কি সে শোভা—মনে তৃপ্তি ছিল না। তোমার জন্তু প্রাণ অস্থির হয়ে উঠছিল—কি অধীর তীব্র সে ব্যাকুলতা ! সেই সময় প্রথম জানলাম এ খেলা নয়, প্রেমেরি জটিল বন্ধন ! সে বন্ধন ছেদন করবার শক্তি আমার নেই ! সে এমনি দৃঢ় !

হেমরাজ—রাধা, তুমি জানানো, কাল যদি ঘুণাকরে এ কথা সন্দেহও করতাম আমি, তাহলে তোমার ঐ কোমল বুক ছুরি বসাতেও দ্বিধা করতাম না ! (বক্ষ হইতে ছুরি বাহির করিল) এই দেখো !

রাধা—তাই করো—তোমার উপেক্ষার চেয়ে শাণিত ছুরিই আমার আদরের, গৌরবের, লাভের !

হেমরাজ—না—দূর হোক, এ ছুরি—(ছুরিকা বাহিরে ফেলিয়া দিল)—রাধা—

রাধা—কি ?

হেমরাজ—জীবনে আমার আর কোন স্পৃহা নেই ! সেনাপতিকে ডাক—প্রহরীদের ডাক—আমার তারা বন্ধন করুক !

রাধা—না !

হেমরাজ—তবে আমি আত্মসমর্পণ করিগে, চাঁদরায়ের অস্তিত্ব এ পৃথিবী থেকে মুছে যাক !

রাধা—না, না !

হেমরাজ—তবে কি চাও, তুমি ?

রাধা—চল হেম, লোকালয় ছেড়ে বনে যাই ! দুজনে থাকব... দুজনে শুধু—তুমি প্রভু, আমি দাসী ! বনের মাঝে হিংসা নেই, বন্দ নেই, কোন কোলাহল নেই !

হেমরাজ—লছমী—

রাধা—না, রাধা আমি ! আমার সমস্ত অতীত কলঙ্ক মুছে পায়ে যদি না স্থান দাও আমাকে, তবে হত্যা কর, এখনি হত্যা কর (হেমরাজের পদতলে লুপ্তিতা হইল ।)

হেমরাজ—(নির্ঝাঁকভাবে চাহিয়া) রাধা, ওঠ—(রাধা দাঁড়াইল ।) এ প্রেম কতদিনের জন্তু ! এমন মিথ্যা হতে সন্দেহ হতে, প্রবঞ্চনা হতে যে প্রেমের সৃষ্টি. ব প্রেম সত্যের উপর, মর্যাদার উপর, ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সে প্রেম কত দিন !

রাধা—তবু সে প্রেম !

হেমরাজ—কে জানে এ-ও ক্ষণিকের খেলা নয় ? খেলায় আমার সাধ নেই ! রুচিও নেই !

রাধা—উপরে ঐ অনন্ত আকাশ তার শপথ, এ প্রেম চিরদিনের—মেঘশূন্য ঐ আকাশেরই মত সুন্দর, উদার, নির্ম্মল এ প্রেম ! বীরসিংহ আসিয়া অন্তরালে দাঁড়াইল ।

হেমরাজ—এ প্রেমে কোন পাপের স্পর্শ নেই ?

রাধা—অনুতাপের অশ্রুতেও কি তা মুছে যাবে না ?

হেমরাজ—কিন্তু স্মৃতি ! সে যে বৃশ্চিকের মত মাঝে মাঝে দংশন করে উঠবে—তখন ? না রাধা, আমি ধরা দিই—সকল খেলার অন্ত হোক !

রাধা—না, চলো হেম, এই রাত্রেই নীরবতার মধ্য দিয়ে আমরা চলে যাই ! সমস্ত অতীত, সমস্ত পাপ, রাত্রির মত পোহাবে—তারপর দিনের আলোয় নূতন প্রেমোজ্জ্বল জীবনে নবজাগরণ ! আনন্দ ও পুণ্যের সে মিল্ক জ্যোতি !

হেমরাজ—কিন্তু লছমী—

রাধা—বুঝেছি, কোথায় তোমার বাধছে,—বেশ, নর্তকী বলে ভুলতে না পাবো যদি ত, দাসী বলে—

হেমরাজ—(সহসা রাধাকে বক্ষে ধরিল।)

রাধা—

রাধা—হেম !

হেমরাজ—তাই হবে, সমস্ত অতীত ভুলবো—আমি চাঁদরায় নই, হেমরাজ ! আর তুমি রাধা, আমার স্ত্রী ! (চুম্বন করিল।)

রাধা—আঃ, কি সুখ !

হেমরাজ—যাক্, সমস্ত অতীত মুছে যাক্। আজ আমাদের পুনর্জন্ম ! প্রেমের মোহন স্পর্শে সমস্ত মলিনতা ঘুচে যাক—

নূতন আলো, নূতন পৃথিবী, নূতন জীবন !

রাধা—প্রভু, স্বামী—

হেমরাজ—এসো, রাধা,—

উভয়ে বাতায়ন-পথ দিয়া নিজ্জাক্ত হইল !

বীরসিংহ আসিয়া নির্ঝাঁকভাবে বাতায়নের ধারে দাঁড়াইল।

বীরসিংহ—দুর্ভাগা বীরসিংহ ! যাও, প্রেমের বশ্যে আচ্ছাদিত হয়ে হুজনে চলে যাও ! তোমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করবারও কারো সাধ্য হবে না !

তরুণের প্রবেশ।

তরুণ—কৈ, কোথা সে দস্যু, চাঁদরায় ? সেনাপতি—

বীরসিংহ—(ফিরিয়া) তরুণ—

তরুণ—কি, পালিয়েছে ? (শশব্যস্তে বাতায়নের ধারে আসিল।)

বীরসিংহ—না—আমারি ভুল হয়েছিল !

তরুণ—ভুল ?

বীরসিংহ—হাঁ ! দস্যু চাঁদরায় ও স্বাধীন সর্দার হেমরাজ, হুজনে এক লোক নয় !

তরুণ সিংহ স্তম্ভিতভাবে বাতায়নের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

যবনিকা।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতে বিবাহ-পদ্ধতি ।

আজকাল ভারতের নরনারী আধুনিক বিবাহ-রীতিতে সম্বষ্ট নহেন। পুরাকালে যে সকল রীতি আমাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহা বহুকাল হইল অপ্রচলিত হইয়া

পড়িয়াছে। আজকালকার রীতিগুলি সেই সকল প্রাচীন রীতির অপভ্রংশ মাত্র। সুতরাং আজকাল ব্যক্তিগত ও মতগত স্বাধীনতা লাভ করিয়া অনেকে সমাজকেও

মধ্যযুগের অগ্রায় ও অধৌক্তিক বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জ্ঞান উৎসুক হইয়াছেন।

অনেকে মনে করেন যে আমাদের দেশেও বিবাহের পূর্বে কোন একটা নির্দিষ্ট আকারে ভাবী পতিপত্নীর আলাপ ও পরিচয়ের অবসর থাকা আবশ্যিক। তাঁহাদের মতে যে যাকে বিবাহ করিবে তাহাকে তাহার আপনি ভাল করিয়া দেখিয়া ও বুঝিয়া লওয়া নিতান্ত আবশ্যিক। একরূপ করিতে হইলে বর্তমান বিবাহপদ্ধতির সমূল উচ্ছেদ করিয়া বালকবালিকার স্থলে যুবকযুবতীর পরিণয়রীতি প্রচলিত করাই আবশ্যিক হইয়া পড়ে। প্রাচীন ভারতে যে একরূপ যুবকযুবতীর স্বয়ম্বর-প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তাহার ফলে যে সমাজের মঙ্গলই হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রামায়ণ ও মহাভারতে একরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্তেব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং হিন্দু মাত্রেই এই সকল কাহিনী শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পবিত্র জ্ঞানে পাঠ করিয়া থাকেন। প্রাচীন-কালে এই ভারতবর্ষেই যদি যুবকযুবতীর স্বয়ম্বরে ও বিবাহপূর্বে আলাপ-পরিচয়ে কোন ক্ষতি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে তাহার সমস্ত না হইলেও কতকাংশ বর্তমান সমাজ মধ্যে প্রচলিত করিলে আমাদেরও বিশেষ ক্ষতি না হইয়া বরং অনেক ইষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। ভারতের পুরাতন বিবাহপদ্ধতিতে আমরা পাশ্চাত্যজগতের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিকাশই দেখিতে পাই,—কেবল ইহার মধ্যে পাশ্চাত্য সমাজের যথেষ্ট ব্যবহার ও শৈথিল্যটুকু নাই। তাহার কারণ ভারতের প্রাচীন সভ্যতার মর্মটুকু প্রতীচ্য সভ্যতার অগ্র জড়বাদিত্বের পক্ষে

পূর্ণ ছিল না। ভারতের সনাতন ধর্ম বা চরিত্রনীতি আপামর সকলকেই একরূপ শিক্ষা দান করিয়াছিল, যদ্বারা তাহারা কেহই পার্থিব বস্তুকেই জীবনের চরম লক্ষ্য করিতে শিখে নাই, সকলেই জগদাতীত এক ব্রহ্মতর ও উচ্চতর লক্ষ্যের অমুসন্ধানে ছুটিত। ভারতবাসী পৃথিবীকে কর্মভূমির চক্ষেই দেখিত—ইহাকেই সে কোনদিন চরম লক্ষ্য-ভূমি বলিয়া জ্ঞান করে নাই। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু, আনন্দ, সুখ বা সম্ভোগ্য বস্তু, সে সকলকেই পরম লক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান না করিয়া, এ সকলকে সে কেবল শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য লাভের উপায়স্বরূপ বলিয়া মর্ম্মমধ্যে বিশ্বাস করিত। এই বিশ্বনীতিটুকু উচ্চ নীচ সকলেই আপন আপন জীবনে সফল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিত। যে মহাপাপী ও অত্যাচারী সেও আপনাকে মানব চরিত্রের এই নীতিটুকুর অধীন বলিয়া জানিত। লঙ্কেশ্বর রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিল সত্য, সীতার শুভাশুভ তাহার নিমেষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছিল সত্য, কিন্তু তথাপি রাক্ষসরাজ এই দীর্ঘকালের মধ্যেও সীতার অনিচ্ছায় তাঁহাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে সাহস করে নাই। সেকালের নীতিই ছিল যে তাহার ইচ্ছা ব্যতীত কোনও রমণীকে কেহ স্পর্শ করিবে না। সেকালের আপামর সকলেই কিরূপ ধর্ম্মানুরক্ত ছিল তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে অমর অক্ষরে চিত্রিত রহিয়াছে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ যখন একরূপ ছিলেন, তখন আমরা যে এক্ষণে কতকাংশেও তাঁহাদিগের অগ্র হইতে পারি না, ইহার কারণ কি ?

পণ্ডিতগণ তাঁহাদের চিরপ্রচলিত সংস্কার অনুসারে বলিয়া থাকেন যে আধুনিক হিন্দু জীবনের বাহ্যিক অবস্থাগুলি প্রাচীন সনাতন ধর্ম অনুষ্ঠানের পক্ষে অনুপযুক্ত এবং এই সকল বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হইলে আমাদের পুনরায় ভারতের প্রাচীন আদর্শ অনুসারে জীবনগঠন করা সম্ভব। কিন্তু এ স্থলে বিবেচ্য এই যে সেই সকল বাহ্যিক অবস্থাকে পরিবর্তিত করায় আমাদের যথার্থ বাধা কোথায়! আমরাদিগের আপন অজ্ঞতা বা দুর্বলতা ভিন্ন অপর কোন শক্তিই আমাদের বিদেশী আদর্শের অর্থাৎ তাহার বিকৃত অনুকৃতির আদর করিতে, অথবা আপনার শ্রেষ্ঠ ধনকে উপেক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে সেকালে নারী ও পুরুষের মধ্যে চরম স্বাধীনতা ছিল এবং পুরুষের সাহায্য ব্যতিরেকে ভারতরমণীর আত্মরক্ষা করিবার পক্ষেও যথেষ্ট বল ও শক্তি ছিল। আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে সেকালে ভারতের নরনারীর মধ্যে পাশ্চাত্য জগতের স্থায় স্বাধীনতার অপব্যবহার প্রচলিত ছিল না, অন্ততঃ সেরূপ প্রবল ও সাধারণ ভাবে নহে সেটা নিশ্চয়। সেকালে পতিপত্নী যথেষ্টাচারকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে শ্রেষ্ঠ সম্বানোৎপাদনের জন্তই চেষ্টা করিতেন। বিবাহ ব্যাপারটা কেবল একটা লৌকিক অনুষ্ঠান মাত্র ছিল। যুবক যুবতী প্রথমে বিবেচনা করিয়া দেখিত যে তাহাদের উভয়ের মিলন তাহাদের নিজেদের বা সম্বানের পক্ষে আবশ্যিক কি না। তাহারা এরূপ আবশ্যিকতা

বোধ করিলে তবে সমাজ ও ধর্ম তাহাদিগের মিলনকে স্বীকার করিত। আজকাল এ নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সমাজের মতে বিবাহ কস্মটা প্রথম হয়, তাহার পর উভয়ের মিলন-ইচ্ছা জাগ্রত হইতে থাকে। সে কালের কাহিনী হইতে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে তখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরকে ত্যাগ করিয়া যাওয়ার রীতিটা অল্লাধিক প্রচলিত ছিল। অনেক ঋষি লোক-সমাজ ত্যাগ করিয়া বনে বা পবিত্র নদীতীরে বাস করিয়াও সময়ে সময়ে আপনার বাসনা পরিতৃপ্তির জন্ত কোনও নারীর সহিত মিলিত হইতে কুণ্ঠিত হইতেন না, এবং উভয়ে বিচ্ছিন্ন হইবাব পর আর কেহ কাহারও বিষয় চিন্তাই করিতেন না। স্বার্থ বা অপবিত্র মোহই অধিকাংশ সময়ে তাঁহাদের এ অস্থায়ী মিলনের যথার্থ কারণ। অনেক সময়ে শ্রেষ্ঠ সম্বান উৎপাদনের জন্তও নরনারী এরূপ ভাবে মিলিত হইতেন।

বিশ্ববসু ও মেনকার মিলনে একটি কন্যার জন্ম হয়। তাহারা উভয়েই গন্ধর্ষ। বিবাহ-সূত্রে বন্ধ নহে বলিয়া তাহারা তাহাদের শিশু কন্যাটিকে সুলকেশী নামে এক ঋষির আশ্রমে ফেলিয়া যায়। শিশুর রূপে মুগ্ধ হইয়া যুনিবর তাহাকে ভূমি হইতে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাইলেন ও তাহাকে আপন পোষ্য-কন্যারূপে গ্রহণ করিলেন। দিনে দিনে শিশুটির বয়সের সহিত রূপগুণ প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল এবং সকলেই তাহাকে ঋষিকন্যা বলিয়াই জানিল।

এদিকে প্রসিদ্ধ ভৃগুমুনির পুত্র রুরু সুলকেশীর আশ্রমে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন

এবং সেই অসামান্য সুন্দরী ঋষিকন্যাকে দর্শন করিতেন। রুচু সেই সুন্দরীর রূপে এতই মুগ্ধ হইলেন যে তাহাকে না পাইয়া জীবন-ধারণ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। অবশেষে তিনি তাহার নিকট আপনার অন্তরের গুপ্তপ্রেম প্রকাশ করিয়া জানিলেন যে কিশোরীও তাঁহার প্রেমে আত্মহারা। তখন তিনি তাহার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিবার জন্ত আপন পিতা ভৃগুকে সূলকেশী মুণির নিকটে প্রেরণ করিলেন। সূলকেশী যুবক-যুবতীর মনোভাব পূর্ব হইতেই জানিতেন, এক্ষণে ভৃগুমুণির মুখে এই প্রস্তাব শুনিবা মাত্র সানন্দচিত্তে সম্মতি দান করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহাদের বিবাহ স্থির হইবার পরেই একদিন সেই ঋষিকন্যা অশ্রু-আশ্রম-বালাদিগের সহিত উদ্যানে ক্রীড়া করিতে ছিলেন, এমন সময়ে সহসা অজ্ঞাতে এক সর্পকে পদাঘাত করেন। সর্পটি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দংশন করিল এবং অনতিবিলম্বেই ঋষিকন্যার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

এই শোকসংবাদ অল্পকাল মধ্যেই তাহাব আত্মীয়বর্গের নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহারা সকলে তাহার সেই অচেতন দেহের পার্শ্বে আসিয়া দেখিলেন সে মূর্তিতে মৃত্যু-কালিমা কিছুই নাই,—নিজাগতা স্বর্ণ-তাব ত্রায় ভূতলে পড়িয়া আছে! চতুর্দিকের যত মুনিঋষি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ত্রিলোকখ্যাত ভরদ্বাজ ও গৌতম মুনিও তথায় উপস্থিত হইলেন। শোকবিহ্বল রুচুও তথায় গিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু ভূতলে তাঁহার প্রাণপ্রিয়্যার মৃত দেহ দেখিয়া তাঁহার চিত্ত এতই কাতর হইল যে তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া এক

নির্জন বৃক্ষতলে যাইয়া অবিপ্রাম অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাতরহৃদয়ে দেবতার নিকট তাহার প্রাণভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন, কারণ তাহাকে হারাইয়া তাঁহার প্রাণধারণ করা অসম্ভব! তিনি নিজে একজন দেবতা-বিদিত তপস্বী, সুতরাং ইন্দ্রদেব তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া শোকাক্ত রুচুর নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন।

দেবদূত আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল “ঋষিপুত্র, তোমার এ শোকের কারণ কি? ইন্দ্রদেব তোমাকে সাহায্য দিবার জন্ত আমার পাঠাইয়াছেন। মানুষ একবার মরিলে কি আবার বাঁচে? তোমার এ শোক নিতান্তই বৃথা!”

ঋষিপুত্র বলিলেন—“কিন্তু আমি এমন কোন কুকর্ম্মই করি নাই, যাহার জন্ত আমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর শাস্তি-বিধান হইতে পারে। শৈশব হইতে আজ পর্য্যন্ত আমি কোন অশ্রম কর্ম্মই করি নাই এবং কোন দিন মনুষ্য বা দেবতার প্রতি কর্তব্যোপ পরায়ুখ হই নাই। ইন্দ্রদেব ইচ্ছা করিলে কি আমার প্রাণপ্রিয়্যাকে ফিরাইয়া দিতে পারেন না?”

দেবদূত—“তোমার প্রাণপ্রিয়্য একজন সামান্য মানবী ছিল না; গন্ধর্বি ও অশুরার ঔরসে তাহার জন্ম। এরূপ জীবের পৃথিবীতে কতকাল থাকা সম্ভব? সেই জন্ত দেখ, তাহার এই অকালমৃত্যু হইয়াছে,—এ মৃত্যু বিধাতার বিধান অনুসারেই হইয়াছে।”

রুচু—“কিন্তু আমি তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়া পাইতে চাই, তাহার কি কোন উপায়ই নাই?”

দেব—“হাঁ আছে। ইন্দ্রদেব আমাকে

বলিয়াছেন যে যদি তুমি তোমার অর্দ্ধেক পরমায়ু ত্যাগ করিতে সম্মত থাক, তাহা হইলে সেই কাল পর্য্যন্ত এই রমণীকে জীবিত রাখা যাইতে পারে।”

রুদ্র—“আমি আমার নিজের অর্দ্ধেক জীবন ত্যাগ করিতে সম্মত হইলাম।”

এই কথা শুনিবামাত্র দেবদূত যমরাজের নিকট যাইয়া ঋষি-কন্যাকে পুনর্জীবিত করিবার আদেশ লইয়া আসিলেন। দেবদূত ফিরিবামাত্র ঋষিকন্যা নিদ্রোখিতার ঞ্চায় ভূমি হইতে উখিতা হইলেন,—সকলে বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া উঠিল।

পরে উভয়ে বিবাহিত হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এই আখ্যানের মধ্যে আমরা বিবাহের পূর্বে যুবক যুবতীর প্রেমের প্রাচীন আদর্শটিকে পরিস্ফুট দেখিতে পাই, এবং অসাধারণ অবস্থার মধ্যে ব্রাহ্মণযুবার আন্তরিক প্রেমের কঠোর পরীক্ষা দেখিতে পাই।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে মনুষ্য-প্রকৃতির বিশেষত্বগুলি একরূপভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে তাহার মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ ব্যতিরেকেও বিবাহ ব্যাপারের অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। এখনকার ঞ্চয় মহাভারতের কালেও সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে বংশরক্ষার জন্ত পূর্বপুরুষগণের যন্ত্রণার সীমা থাকে না। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া আমরা অগ্নিতেজা তপস্বী জরৎকারকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইতে দেখিতে পাই।

জরৎকার কঠোর ব্রহ্মচর্য ও তপস্চার দ্বারা দেবপিতা ব্রহ্মাকে পর্য্যন্ত তুষ্ট করিয়াছিলেন। আমরা কুমার থাকিবেন বলিয়াই

তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল। কিন্তু তাঁহার আর ছয়টি ভ্রাতাও কুমার অবস্থায় প্রাণত্যাগ করাতে পিতৃদেবগণ বংশলোপ হইবার ভয়ে দারুণ বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

জরৎ এক অতল কূপের মধ্য হইতে তাঁহাদের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়া তাঁহাদের শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

পিতৃদেবগণ তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া উত্তর করিলেন “হে অপরিচিত, আমাদের ইচ্ছা তুমি জরৎকার নামক চিরকুমার-ব্রতী অভাগাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বল যে আমাদের উদ্ধারের জন্ত তাহার বিবাহ করিয়া বংশরক্ষা করা আবশ্যিক।”

জরৎ বলিলেন—“আমিই সেই অভাগা। আপনাদের যাহা কিছু বক্তব্য, আমাকে বলিতে পারেন।”

“আমরা জানি যে তুমি কঠোর তপস্চার দ্বারা সাধনমার্গে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছ, কিন্তু তুমি অপুত্রক বলিয়া আমাদের উদ্ধারের আর আশা নাই। সুতরাং তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে।”

“আমি আজ পর্য্যন্ত বিবাহে মনোযোগী হই নাই। কিন্তু যখন আপনারা ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন তখন আমি বিবাহ করিতে সম্মত আছি, কিন্তু একটা সর্ত্ত আছে!”

“কি সর্ত্ত?”

“আমি সাধারণভাবে বিবাহ করিতে পারিব না ইহা স্থির, সে আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি যাহাকে লেশমাত্রও ভালবাসি না, তাহার সহিত প্রেমের ছলনা করিতে পারিব না। তবে ভিক্ষা করিতে

করিতে আমি একটি পত্নী ভিক্ষা চাহিব। যদি কেহ আমারই স্তায় নামবিশিষ্টা কোন কন্যাকে ভিক্ষাদান করে, তাহা হইলে আমার একটি সন্তান হওয়া পর্য্যন্ত সে আমার পত্নী থাকিবে।”

এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে এই ব্রহ্মচারী পত্নী অন্বেষণে বাহির হইলেন। কিন্তু তিনি দরিদ্র বলিয়া এবং অনভিক্ষার সহিত পত্নীভিক্ষা করিতেছেন দেখিয়া কেহই তাঁহাকে কন্যাদান করিতে অগ্রসর হইল না। তিনি পত্নীগাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বিরত হইবার বাসনা করিতেছিলেন একরূপ সময়ে নাগরাজ বাসুকী তাঁহার ভগ্নীর জন্ত এইরূপ একটি পাত্রের অন্বেষণ করিতেছিলেন। এই অসাধারণ ঘটনাটী দেবগণের ব্যবস্থানুসারে হইয়াছিল বলিয়া মহাভারতে লিখিত আছে। রাজা পরীক্ষিতের পুত্র সর্পযজ্ঞ করিতেছেন দেখিয়া নাগগণ সবংশে ধ্বংশ হইবার ভয়ে ভীত হইয়া দেবতাগণের নিকটে যাইয়া প্রার্থনা করিল যে তাহাদের কতকগুলিকে ধ্বংশ করিয়া অবশিষ্টকে রক্ষা করা হউক। তাহাদিগের প্রার্থনা পূরণের জন্ত দেবগণ বলিলেন যে যদি তাহারা তাহাদের একটি কন্যাকে কোন পত্নীভিক্ষুকে ভিক্ষাস্বরূপ দান করে তাহা হইলে সেই কন্যার গর্ভজাত সন্তান তাহাদিগকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবে।

সেইজন্ত রাজা বাসুকী পুরবাসীদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রাসাদে কোন পত্নীভিক্ষু উপস্থিত হইলে তাঁহাকে যেন অবিলম্বে সংবাদ দেওয়া হয়। তিনি তাঁহার ভগ্নীকে ইতিপূর্বেই জিজ্ঞাসা করিয়া-

ছিলেন যে তিনি ভিক্ষুকের পত্নী হইয়া তাঁহার স্বজাতিকে উদ্ধার করিতে সম্মত কি না, তাহাতে তিনি আপন আত্মোৎসর্গের অভিলাষ জানাইয়া বলিয়াছিলেন—“রমণী বিবাহ করে, হয় প্রেমের জন্ত না হয় কর্তব্যের জন্ত। প্রেমের জন্ত বিবাহ করা যদি আমার পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহা হইলে আমি কর্তব্যের জন্ত বিবাহ করিয়া স্বজাতিকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি।”

সুতরাং জরৎকার যখন নাগরাজ্যে অন্ন ভিক্ষা করিতে যাইয়া প্রতি দ্বারে তিনবার করিয়া পত্নী ভিক্ষা করিয়া ফিরিতে লাগিলেন, তখন এ সংবাদ অবিলম্বে যাইয়া রাজা বাসুকির নিকট উপস্থিত হইল; এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভগ্নী বহুমূল্য বস্ত্রশোভিতা হইয়া সলজ্জ পাদক্ষেপে সেই ভিক্ষুকের নিকট উপস্থিত হইয়া সানন্দ চিত্তে আপনাকে ভিক্ষা স্বরূপ দান করিলেন।

নাগকন্যার ঈদৃশ আচরণ দেখিয়া জরৎকার বিস্মিত হইলেন। রমণীব নাম তাঁহার অধুরূপ কিনা এই সন্দেহে তিনি সেই মনমোহিনী সুন্দরীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমার নাম কি, সুন্দরী?”

নাগকন্যা ভাবী পতির এই প্রথম সাদর সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন—“আমার নাম জরৎকার, আমি রাজা বাসুকীর ভগ্নী।”

এমন সময়ে স্বয়ং রাজা বাসুকী তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—“মুনিবর, এই কুমারী আমার সহোদরা। সে আপনারই জন্ত এতদিন অপেক্ষা করিয়াছিল, এক্ষণে আপনি তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন ইহাই প্রার্থনা।”

ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন—“তুমি রাজগৃহে

জন্মগ্রহণ করিয়াছ আর আমি কঠোর তপস্বী । তোমাকে যে আমি ভরণপোষণ করিতে পারিব না তাহা জানিয়াও তুমি আমার পত্নী হইতে চাহিতেছ ?”

বাসুকি উত্তর করিলেন—“আমি তাহা বেশ জানি । আপনার যতদিন ইচ্ছা আমি আপনাকে ও আমার ভগ্নীকে রক্ষা করিব । আপনার ঞ্জ মহাপুরুষের জন্মই আমি এত দিন আমার সহোদরাকে কুমারী রাখিয়া-ছিলাম ।”

এই কথা শুনিয়া জরৎকারু কঠোর স্বরে বলিলেন—“তবে বাসুকীরাজ শ্রবণ করুন ।

আমি রাজকুমারীকে পত্নীস্বরূপ রাখিবার জন্ম আমার দারিদ্র্য বা অবস্থা পরিবর্তিত করিতে চাহি না । অধিকন্তু আপনার সহোদরা লেশমাত্র অবাধ্য হইলে আমি তাহা সহ্য করিব না । যে মুহূর্ত্তে সে আমার অমনোমত কোন কথা বলিবে বা কৰ্ম্ম করিবে সেই মুহূর্ত্তেই আমি তাহাকে ত্যাগ করিব ।”

বাসুকি লেশমাত্রও চিন্তা না করিয়া কহিলেন—“তথাস্তু ।”

এইরূপ অভূতপূৰ্ব্ব ভাবে নাগ-রাজ্যে সুন্দরী রাজকুমারীর সহিত এক কুৎসিৎ ব্রাহ্মণ কুমারের বিবাহ হইয়া গেল । বিবাহ দিবসে রাজপ্রাসাদের আনন্দ—কোলাহলের মধ্যে রাজকুমারী বেশ প্রকুল ও সুখী । ব্রাহ্মণকুমার কিন্তু তাপসোচিতভাবে রাজ-প্রাসাদ-সংলগ্ন উত্তানে বাস করিতে লাগিলেন । বিবাহ সময়ে অভদ্র ব্রাহ্মণ যথাসম্ভব মধুরভাষী হইবার চেষ্টা করিয়া পত্নীকে চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন—“ভদ্রে, তুমি কদাচ আমার বিরক্তিকর কোন কৰ্ম্ম করিও না বা অপ্রীতি-

কর কোন কথা উচ্চারণ করিও না । যে দিন এইরূপ করিবে সেই দিনই আমি তোমাকে ত্যাগ করিব, তুমি আর আমার পত্নী থাকিবে না ।”

মনুষ্য প্রকৃতি তখনও আমাদের মতই ছিল । বিবাহের দিনে স্বামীর নিকট একরূপ স্মৃতিষ্ট কথা শুনিবার জন্ম কেহই প্রস্তুত থাকে না । সুতরাং মূনিবরের বাক্য শ্রবণমাত্র রাজকুমারী কম্পিত কলেবরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাশ্রনয়নে স্বামীকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন—“ঋষিবর, আমি জীবনে একদিনের জন্মও আপনার অবাধ্য বা অপ্রীতিকর হইব না প্রতিজ্ঞা করিতেছি ।”

বিবাহের পর ঋষিপত্নী প্রাণপণে স্বামী-সেবা ও তাঁহার সন্তোষ বিধানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সৰ্ব্বদাই ভয় পাছে তাঁহার কোন অজ্ঞাত ক্রটির জন্ম চিরপরিত্যক্ত হইয়া জীবনপাত করিতে হয় ।

কিন্তু সে দুর্ঘটনা ঘটতে অধিক বিলম্ব হইন না । তিন চারিমাস পরেই একদিন এক অভাবনীয় ব্যাপারে উভয়ের চিরবিচ্ছেদ ঘটিল ।

একদিন বৈকালে এই কঠোর ব্রাহ্মণ পত্নীর অঙ্কোপরে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতে-ছিলেন । সূর্য্য অস্ত গেল তথাপি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না । কর্তব্যপরায়ণা পত্নী মহা সমস্তায় পড়িলেন । সাক্ষ্য আঙ্কিকের সময় উপস্থিত, এ সময়ে স্বামীকে নিদ্রোখিত না করিলে তিনি কুপিত হইবেন, আবার তাঁহার অনিচ্ছায় নিদ্রাভঙ্গ করিলেও তিনি অনস্ত হইবেন । এই উভয়সঙ্কটে পড়িয়া স্বামীগতপ্রাণা ঋষিকণ্ঠার মুখমণ্ডল শ্বেদসিক্ত

হইয়া উঠিল, বাগ্যান্দোলিত বল্লবীবৎ সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। অবশেষে মনে হইল যে সাক্ষ্য-আহ্নিক না করিলে তাঁহার প্রাণেশ্বরের অমঙ্গল হইবে। আর তাঁহাব বিধা রহিল না। স্বামীর অমঙ্গলেব অপেক্ষা আপনার অমঙ্গলকেই শ্রেয় মনে করিয়া তিনি পতির নিদ্রাভঙ্গের জন্ত বলিলেন—“হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ, জাগ্রত হও। সন্ধ্যা আগতপ্রায়, সূর্য্য অস্তাচলগামী হইয়াছে। তোমার সূর্য্যোপাসনার সময় হয় নাট কি? দেবপূজার সময় উপস্থিত, স্মৃতবাৎ অধানাব অপরাধ ক্ষমা করিও।”

জরৎকারু ধীরে পত্নীর অঙ্ক ত্যাগ করিয়া উঠিয়া নয়ন মুছিয়া দেখিলেন তাঁহার নিকটে কে উপস্থিত রহিয়াছে। পার্শ্বে তদন্তচিত্তা পত্নীকে দেখিয়া বুঝিলেন তিনিই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছেন। ক্রোধে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। বিচ্ছেদভয়বিধুবা পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“নাগরাজ ছুহিতা, তুমি কোন্ সাহসে আমার নিদ্রাভঙ্গ করিতে এবং আমি আমার আপন ধর্ম্মসাধনে অমনোযোগী বলিয়া আমাকে এইরূপে অপমানিত কবিতে সাহসী হইলে? তুমি আমাদের উভয়ের সর্ভভঙ্গ করিলে বলিয়া আমি হুঃখিত, কিন্তু এক্ষণে তোমাকে এই মুহূর্ত্তেই ত্যাগ করিতে আমি বাধ্য।”

ভীতিবিহ্বলা রাজকুমারী কাতরে বলিয়া উঠিলেন—“হায় তাপসবর, আমি তোমাকে অপমানিত কবিবার জন্ত নিদ্রাভঙ্গ কবি নাট, তোমার অমঙ্গলের আশঙ্কাতেই করিয়া-ছিলাম।”

পাষণ্ডদয় ঋষি উত্তর করিলেন—“আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা ভঙ্গ হইতে পারে না। এতদিন তোমাদের নিকটে বিবাহিত জীবনের সুখসন্তোগ করিতেছিলাম। আজ বিদায়! তোমার ভ্রাতা বাসুকিরাজকে সংবাদ দিও! আমি তোমাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম বলিয়া আক্ষেপ করিও না।”

ঋষিকণ্ঠার সকল আশা দূর হইল। বেদনায় তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, সর্ষদেহ কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার সেই প্রেমপূর্ণ নয়ন দুইটি অশ্রুভারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল এবং লজ্জাবতী লতার গায় এই নিষ্ঠুর আঘাতে একেবারে মর্ষ্মমধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। পরে চিরবিদায়ের পূর্বে নৈরাশুর সাহসে ভর করিয়া কাতরে করযোড়ে কহিলেন—“স্বামী, প্রভু, আমি অনুক্ষণ তোমার সেবা ও পূজা করিয়াছি, এক মুহূর্ত্তের জন্তও কোন অশ্রয় কর্ম্ম করি নাই, তবে বিনা অপরাধে আজ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে কেন প্রভু? বাজা বাসুকি তোমার ঔবসে সন্তান জন্মিয়া নাগজাতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবে বলিয়া তোমার সহিত আমার বিবাহ দিয়া-ছিলেন। এক্ষণে তুমি আমাকে এ ভাবে ত্যাগ করিয়া যাইলে তিনিও যৎপরোনাস্তি হুঃখিত হইবেন।”

জরৎকারু বলিলেন—“ভদ্রে, তুমি যাহা বলিতেছ সত্য, কিন্তু তুমি ভুল বুঝিতেছ। আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেছি বলিয়া তোমাদেব কোন অনিষ্ট করিবার বাসনা আমার নাই। দেবতার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আর কয়েকমাস পরে তোমার যে পুত্র হইবে

তাহার দ্বারা আমার পিতৃপুত্রগণ এবং
নাগজাতি উদ্ধার পাইবে। এক্ষণে বোধ হয়
বুঝিতেছ তোমার শোকের কোন কারণ
নাই?”

এইভাবে ব্রহ্মচারীর অনিচ্ছাকৃত বিবাহেব

উপসংহাব হটল। পতি পত্নীর মধ্যে ব্যবহার-
বিধি সাময়িক বিবিধ গ্রাম কঠোর ও
প্রাণশীল! আজকালের গুরুজন-আদিষ্ট
বিবাহের মধ্যে এইরূপ দাম্পত্য-সুখশীল
সম্বন্ধ কত সুলভ তাহা পাঠক স্থির করিবেন।

শ্রীসুবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

মেয়ে-যজ্ঞ।

(১৩১৬ বর্ষের প্রাক্বেব সমুদ্রযজ্ঞ)

পূর্বেই বাল্যমার্গে প্রবন্ধ লেখা বড় দাখ।
যাহা ভাবনাছিলম তাহাই ঘটনাছে
আমরা শক্র বহু গায়েরি কুটুম্ব সকলের নাম
দিক হতে মনো প্রকাশ আমাকে আক্রমণ
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আমি যে সকল পত্র পাঠিয়াছি তাহাব
মধ্যে ২৪ খানি ভাবতার পাঠকপাঠিকার
গোচবার্থ প্রকাশ করিতেছি।

পত্র নং ১

ভাই দাদ—

আমরা গরীব বনে যে আমাদের বুদ্ধ
শক্তি নাই তা মনে কোব না। হুঁ ম সিন্ধু
“সুশিক্ষিতা-মাতা-যজ্ঞে বিদ্যুজাল, তা না
কিন্তু ভাই বিবেচনা কবে দেখ, তাঁর
সুশিক্ষিতা বলেই বিদ্যুজাল ঘটে না অথবা
ধনী বলে ঘটে না। তাঁদের প্রচুর দানদান
আছে, আয়া আছে গবর্ণেন্ আছে,—মাষ্টার
পণ্ডিত আছে। তাঁরা মধ্যাক্ ভোজনের
পূর্বে কি পরে বিকেলেব আহারাদির ছকুম
দিলেন না ভাঁড়ার দিলেন। একটু
বিশ্রামের পর ইচ্ছামত নিজের গাড়ীতে

নিমন্ত্রণ স্থানে গিয়ে মিলিত হগেন। তার
পর আশাব,—তা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। মনে
কর মনোবল তাই হলেই যে কাট অসুস্থ—
কেন্দ্রে অতি ক্রমে সবাই ছ—তা মিথ্যা
যে কে ন প্রসাব এতটা গুচা করে তাঁর চলে
গেলেন। অতঃপর যবে ভাই ওবকম
সুন্দর হবো অথব এবেতেই পাব না।

জাত গামের গুণ্ডা ঠাকরুণ বুড়া
মানুষ—সংসারের মনোব কিহুব মধ্যে
থাকবে না। আমাব ভট্টা মস্তান—বড়টী
এই দেশ বংবংবের; একটু নাহি বা মননম্বন
কবে যবকরান মকল কয় লোকের মনস্ত্রণ
যাবনা মন মন ওয়েবকো মতে যবে যবে
যেতেও পাবে—বন্ধু পরিণত কে বাব পাবে?
বিলাপের পরে যেও বিলাপত থে ক কোমতে
ছুটী নিয়ে তবে ত বাড়ার বাহির হতে
পারবো। তাদের জন্তু বেধে বেড়ে বেখে
যেতে হলে আর বাওয়া হয় না। তা ভাই
লোকলোকতা ত রক্ষা করতে হবে!
ছেলেদের কষ্ট হবে বলে কি আঁয়কুটুম্ব সব
ত্যাগ করবো? আজ তবে গা।

তোমাব ছোট বোন।

পত্র নং ২

শ্রীচরণেষু

দিদিমা, তুমি যে দেখাচ্ছ "সমাজ-সংস্কারক" হয়ে উঠলে। আর যা কর না কর মেয়ে-যজ্ঞের সময়টা নির্দিষ্ট করে দিয়ে না। ভেবে দেখ তোমার এ সেবক যে কাজকর্ম উপলক্ষে তোমাদের শ্রীচরণ দর্শন পায় তার কত না অস্তুরায় ঘটবে। আমার ও এই কুড়ে ধব— দিদিমার দল কি পরিমাণ জানইত। মনে পড়ে কি ঠাকুর মা বলে ছিলেন "বাপবে যদি কে চেয়ে দোখ, দোখ বড় গোঁএব বাপের বাড়ী ব কুটুম!" তা তোমাদের তো কোন কায কর্মে বাদ দিতে পারি না না ডাকলেও তো তোমরা ছাড় না। তার পর এ দাসের বিবাহ দিয়াছ; তা গৃহিণীর পিত্রালয়টা কিছু বাদ দেওয়া চলে না। বাকী রইলেন খুড়া জ্যেঠাই মাসী পিসি ভাগনী পাড়া প্রাতবাসী প্রভৃতি। এঁদেরও অনেককে না ডাকলে হয় না। এঁরা না হলে কাজ কর্ম করেই কি? তা আমার নিবেদনটা এঁই যে নির্দিষ্ট সময়েরও একটা সুবিধে আছে। কতক আসছেন, খাওয়া দাওয়া সেরে যাচ্ছেন— আবার কতক আসছেন,—এমনি কবে সমাজ ভোজন থেকে আবস্ত করে গান্ধী ভোজন পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া লগতে থাকে। তাই বলাই আর যা কর সময়টা নির্দিষ্ট কবে কাজ নেই। আমার মত কুড়ে ঘরে অনেকেরই বাদ। শুধু একেণা কি আমি?

হাতি সেবক রাজু।

পত্র নং ৩

শ্রীচরণ কমলেষু,

মাসিমা আমার প্রণাম জানিবেন।

ভারতীতে আপনার যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা আমরা পড়িয়াছি।

এ কি মাসিমা আমাদের উপর আবার আক্রমণ কেন? আপনার মা, মাসিমারা আমাদের যেমন শিখাইয়াছেন তেমনি শিখিয়াছি।

আপনাদের এমনি শিক্ষা দেবার ঝাঁক, যে কবে যে আমাদের অক্ষর পরিচয় হয়েছিল তা ত মনেই পড়ে না। পাঁচ বছর বয়সে যখন আমরা ইংরাজি স্কুলে ভর্তি হলাম তখন বাড়িতে মাষ্টার মশায় রাজর্ষি আর সেকেণ্ড বুক পড়াতেন। এত গল্প কথা নয় মাসিমা এ সত্যিকার ঘরের কথা। ভোরে সেই বিছানা থেকে উঠে স্কুলে যাবার জন্ত প্রস্তুত হতে হত। ঘড়ির কাঁটার চাংটা বাজলে আমরা গাড়ীতে উঠে স্কুল চলে যেতুম—আর সেই সন্ধ্যা ৫।৫।০ টায় বাড়ীতে ফিরে আসতুম। রান্না বাস্না ঘরের কায শেখবার জায়গার পাওয়া দূরে থাকে মোটা করতে অবসর পেতাম না। আবার সন্ধ্যাজাগার সঙ্গে সঙ্গেই মাষ্টার মশায় এসে হাজীর হতেন। এমনি করে খেলার সুখের মুহূর্ত টুকুও আমরা ভোগ করতে পাই নাই বলে হয়।

যাচোক তার পর বিবাহ। বিবাহের পর পরের ঘবে পরের হাতে পড়োই। তাঁরা যেমন তেমন হতে হয়েছে। রান্না বাস্নার কায ঘাড়ে পড়ে নাই—কাষেই তেমন পটু নাই যে তা স্বীকার করিতেছি।

আগুনতাতে গেলেই মাথা ধরে তাত সত্য। রান্নার কায তেমন অনাধাসে করতে পারি না বটে কিন্তু তা ছাড়া যে সব কায আমাদের

করতে হয় তার পক্ষে কি রায়ার কাষ করাটা এমনই শক্ত ? অনভ্যাস বশতঃ শারীরিক ক্লেশ হয় কিন্তু কাষটা কঠিন নয়। তার চেয়ে সংসারের সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্ত প্রতি খুটিনাটির দিকে দৃষ্টি রাখা সুকঠিন নয় কি ? সস্তানদের দেখা শোনা, দাস দাসীদের পরিচালনা করা, ঘর দ্বার পরিষ্কার রাখা, আর বাহার হাতে আমাকে সমর্পণ করেছেন তাঁর সর্ব কার্যে সহায়তা করা ও তাঁর সুখস্বচ্ছন্দের দিকে সর্বপ্রকারে দৃষ্টি রাখতে আমাদের যত হয় এমনটি পল্লী মহিলাদের কিন্তু হয় না। আমি অনেক পল্লীগ্রামে গিয়েছি তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি তাঁতে এইটুকু বুঝেছি যে আমাদের ঘরকন্নার দায়িত্ব তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে পড়েছে। আজ তবে আসি।

আপনার স্নেহের রেণু

পত্র নং ৪

ভাই ঠাকুরঝি —

আর বোল' না জলে মলুম। পুরুষদেয় চক্ষু যে ভগবান কেন দিয়েছেন বলতে পারি না। একটু কি পসন্দ নেই। মেজবোঁমাকে চড়কের তত্ত্ব কোরবো বলে দুটো জ্যাকেট কিনে আনতে বলেছিলুম বোলবো কি ভাই তোমার দাদা 'মোটা মোটা দুটো সাটিনের জামা এনে হাজির। তাতে বিশ্বের জরী ফিতে লেস দেওয়া আছে। সে দুটো জ্যাকেট কি বালিসের খোল তার ঠিক নেই! দেখে ত

অবাক। তোমাদের শিল্পবিদ্যালয় কেমন চলছে ? রথের তত্ত্ব জন্ত কয়েকটা জ্যাকেট আমাকে তৈরি করাইয়া দিতে পারকি ? দেখে যেন ভাল রকম হয়। ছিঃ ছিঃ পুরুষ মানুষের কি কিছু পসন্দ নাই। এদিকে ত ভাল কাপড়খানি পরলে হাঁ করে চেয়ে থাকেন।

তোমাব বৌদিদি

পত্র নং ৫

প্রিয় ভগিনি—

ভারততে আপনার মেয়ে যজ্ঞবিশ্বজ্বলা পাঠ করিয়া সম্বৃষ্ট হইলাম। মহিলাবর্গের দোষগুণ, অভাব, অভিযোগ মহিলাদেরই করা উচিত। আপনি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া ভাল করিয়াছেন। এক্ষণে মহিলাগণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন প্রত্যেকে গৃহস্থালী বিদ্যাশিক্ষা শিশু পালন প্রভৃতির উন্নতি ও সুশৃঙ্খলা সম্বন্ধে চিন্তা করেন এবং এই সকল বিষয়ে নিজেদের মধ্যে পত্রিকা প্রভৃতিতে আন্দোলন করেন। কেহ কোন বিষয়ের ত্রুটি দেখাইলে ক্ষুণ্ণ না হইয়া যেন ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করেন। নমস্কার।

আপনার শ্রীমতী দয়াবতী দেবী

এক্ষণে ভারতীর পাঠিকাবর্গের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, মেয়েযজ্ঞবিশ্বজ্বলা নিবারণের উপায় বাহার যাচা মনে হয় যেন ভারতীতে প্রকাশ করিয়া আমাকে রক্ষা করেন

শ্রীশবৎকুমারী চৌধুরাণী ।

পোষ্যপুত্র।

গড়ের মাঠের নির্জন রাস্তা ছাড়াইয়া একথানা গাড়ি আফিস কোয়ার্টারের জনহীন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়িগুলোকে অতিক্রম করিয়া অল্পক্ষণেব মধ্যেই লোক চলাচল পূর্ণ আলোকিত হাওড়ার পুলের নিকট আসিয়া পড়িল, হঠাৎ সেই সময়ে স্তব্ধ শান্তি বিস্মিতনেত্রে বাহিরের পানে চাহিয়া দেখিল। সমস্ত পথটা দুজনেই নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, কেহ কাহারও সহিত একটি কথা পর্য্যন্ত কহে নাই, আসিবার সময়েও এই প্রকারে আসিয়াছে কিন্তু সেবারে শান্তি সমস্ত পথটাই কাঁদিয়াছিল, এবারে সে কাঁদিতে পারে নাই।

হেমেন্দ্রও একবার চাহিয়া দেখিল, রাস্তার ধারে আলোকাধার হইতে অতুজ্জ্বল, তীব্র একটা আলোকের চ্ছটা গাড়ির ভিতবকার অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহাদের মুখে পড়িল; হেমেন্দ্র ক্ষিপ্রহস্তে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। শান্তি সন্দিগ্ধনেত্রে সেই অন্ধকারের মধ্যে স্বামীর মুখের ভাব দেখিতে চেষ্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল; “হাবড়া ট্রেনে নিয়ে এলো যে?”

হেমেন্দ্র উত্তর দিল না, যেন গুণিতেই পায় নাই এমনি করিয়া বসিয়া রহিল। শান্তির বুকটা এবার একটা কি যেন নূতন আশঙ্কার আভাষে হঠাৎ ধড়াসু করিয়া উঠিল, চঞ্চল ভাবে সে পিছনদিকের একটা খড়খড়ি টানিয়া আবার উৎকণ্ঠিতনেত্রে বাহিরের দিকে চাহিল। গঙ্গার জলে সহস্র বিদ্যুতালোক জ্বলিতেছে, অগণ্য নক্ষত্র এখানে প্রভাহীন, সাদা ও লাল ফুলে গাঁথা

মালার মতন পশ্চাতে আলোকের শ্রেণী পড়িয়া রহিয়াছে। শান্তি ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল “গাড়োয়ানটা ভুল করেছে, আমাদের সেয়ালদায় না নিয়ে গিয়ে হাবড়ায় নিয়ে এলো”—হেমেন্দ্র এবারেও কোন উত্তর করিল না।

গাড়ি আসিয়া যথাস্থানে থামিলে দরজা খুলিয়া হেমেন্দ্র গাড়ি হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। শান্তিকে নামিবার চেষ্টা বিরহিত দেখিয়া বলিল “নেবে এসো একথানা গাড়ি বোধ হচ্ছে দাঁড়িয়ে রয়েছে।”

শান্তি নামিল না বরং গদির উপর একটু শক্ত হইয়া বসিল। হেমেন্দ্রের ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়াই ছিল, শান্তির অবাধ্যতায় গভীর বিরক্তিতে তাহা আরো কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; তথাপি সংযতভাবে শান্তির অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ডাকিল “শান্তি তুন্টো নেবে এসো”। শান্তি এবার দ্রুতকণ্ঠে বলিল “কোথায় আমায় নিয়ে যাচ্ছ তা না বললে আমি নাববো না।”

শান্তির স্বরের দৃঢ়তায় ও কথার ধরণে হেমেন্দ্র প্রথমটা একটু থতমত খাইয়া গেল। তাহার মুখের উপরে এমন জোরের সহিত প্রাতিবাদ করা যে কাহারও পক্ষে সম্ভব হইতে পাবে নাই, বিশেষতঃ শান্তির মুখে এমন উদ্ধত স্বর সে একদিনমাত্র শুনিয়াছিল বটে কিন্তু সেদিনকার সে ভৎসনা নারী হৃদয়ের উত্তম অভিমানাশ্রুশির মতনই প্রেমপূর্ণ, কিন্তু আজ তাহার মধ্যে একি কঠোরতা একি বিচারকের অলজ্জ্য আদেশের কঠিন

স্বর! হেমেন্দ্র খোর বিরক্তিতে আরক্ত হইয়া উঠিল। তাহকে সামান্য কীটপতঙ্গগুণাও এখন হইতে অপমান করিতে পারিলে ছাড়িবে না বোধ হয়! অদৃবে গাড়ি ছাড়িবার বাশি বাজিয়া উঠিল। স্বল্পসংখ্যক লোক কেহ মাথায় মোট কেহ ব্যাগ হাতে ছাতা বগলে প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। হেমেন্দ্র উত্তত বোধগ্ন হৃদয়ে চাপিয়া ফেলিয়া বাস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল; “শিগ্গুর এসো এখনও যদি গাড়িটা না পাই তা হলে হয়ত সকাল অবধি দসে থাকতে হবে।”

শান্তি নামিয়া আসিল, কিন্তু সে হেমেন্দ্রের অনুসরণ করিল না; প্রাচীরের গায় পাত রাখিয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। গাড়িভাড়া চুকাইয়া দিয়া হেমেন্দ্র দ্রুতপদে স্টেশনের ভিতর চলিয়া গিয়াছিল; মনে করিয়াছিল শান্তিও তাহার পশ্চাতে আসিতেছে, কিন্তু টিকিট কিনিতে গিয়া একটু ভাবিবার জন্ত দাঁড়াইল, তারপর হঠাৎ পিছনে চাহিয়া দেখিল শান্তি তাহাব সঙ্গে আসে নাই, দারুণ বিরক্ত ও অপমানে ক্রুদ্ধিত কারিয়া টিকিট না কিনিয়াই ফিরিয়া আসিল। ট্রেন ছাড়িয়া দিয়াছিল।

ভোর হইয়া আসিতেছিল, দূরে আলোকের নানা স্রবৎ হানপ্রভ হইয়া আসিয়াছে। লোকজনও খুব বেশ চলিতেছে না। স্টেশনের প্রবেশ পথের সম্মুখে কতকগুলি খার্ড ক্লাশের খাটী গাড়ির আগমন প্রতীক্ষা করিয়া ছোট বড় বোচকা পাশে রাখিয়া যুমে ঢুলিতেছে। ক্রুদ্ধকণ্ঠে হেমেন্দ্র বলিল “এ কি রকম ব্যবহার তোমার শান্তি! অধুস্বধু ট্রেনটা ফেল করালে!”

শান্তি ক্ষিপ্ৰকণ্ঠে অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল “বলেছতো আমার কোথায় নিয়ে যাচ্চো না বললে আমি যাবো না, কোথা যাচ্চো?”

হেমেন্দ্র এবাবও নিস্ময় বোধ করিল, কিন্তু নিজেকে পুনঃ পুনঃ অপমানিত করিতে দিতে আর সে সাহস কাবল না। দিনের আলোয় কোন পবিচিত বন্ধুবান্ধবের চোখে এই অবস্থায় যদি পড়িয়া যায় তাহাব চেয়ে অপমানের বিষয় তাহাব পক্ষে আব কিছুই নাই স্বরট একটু কোমল করিয়া বলিল “কোথা যাচ্চি তা কেমন করে বলবো বলো, আমাদের স্থান কোথা? যেখানে হয় কোথাও চলে যাই এসো।” শান্তি ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—

“না আমরা লক্ষ্মীপুরেই যাবো, কেন তুমি এখানে নিয়ে এলে? চলো ফিরে যাই। সেখানে না গিয়ে কোথায় যেতে চাইছো?”

এবার আবার শান্তির চোখে জল ভরিয়া আসিয়া পতনোত্ত হইয়া। তাহার স্বর কাপিতেছিল। হেমেন্দ্র পরুষ শ্লেষের সহিত সক্রোধকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—

“এ জন্মে আর নয়, জাহান্নমে বাব সেও ভাল তবু সেখানে নয়, তোমার খুসি হয় তুমি যাও।”—চারিদিকেই অনেক নানা নিক্রাপিত হইয়া গিয়া উষার অল্পে অল্পে মুক্তি প্রকাশ পাইল। আকাশে মেঘ ছিল না কিন্তু গত দিবসের দৃষ্টিভঙ্গি রাজপথকে পিচ্ছিল করিয়া রাখিয়াছিল, লোকের ভিড় ও গাড়ীর শব্দ স্টেশন ভরিয়া উঠিল। শান্তির চোট কাপিতেছিল প্রথমটা সে কথা কহিতেই পারিল না। কিন্তু পর মুহূর্তেই আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল, স্থির

স্বরে কহিল, বেশ তাই তবে হোক, “আমি জ্যেষ্ঠামণ্ডলের কাছেই যাবো।” বোম্বে ফোনে গুমরিয়া হেমেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। এ সংসারে তাহার কোন দাবী নাই! যে জ্ঞা ভিন্ন তাহার ষণার্থ আপনার বলিতে গেলে কেহই বিচ্যুত নাই সেও তাহাকে পবিত্যাগ করিয়া যাইতে চায়। সে কি এমন অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল! কিন্তু না হেমেন্দ্র তাহাকে কিছুতেই এখন হাতছাড়া করিতে পারে না। সেই এখন তাহার অভিলেখিত সিদ্ধি একমাত্র অঙ্গ।

হেমেন্দ্র বড় বিপদেই পড়িল, শাস্তি ক্রমেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে! এখন তাহাকে বুঝাইয়া ভুলাইয়া নিজেব মতে লইয়া আসা সম্ভবই নয়। এদিকে আর কতক্ষণই বা এমন করিয়া সাধারণের কৌতুহল দৃষ্টিব দৃষ্টরূপে পথেব দাবে দাঁড়াইয়া থাকা যায়! কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে একটু বেড়াইয়া আসিয়া আবার একটু কোমল ভাবে কহিল—“দিন-কতোটা পশ্চিমে বেড়িয়ে আসি চলো।” কথাটা অসঙ্গত হইয়া যেন সকলেরে জড়াইয়া আসিল। শাস্তির মুখেও এনটা অবস্থাসেব বিস্ময় হামব ছাড়া অন্য সমস্তেরে দুটরা উঠা-ছিল,— সেটুকু হেমেন্দ্রের দৃষ্টি এড়াই নাই, অপ্রতিভ হইয়া সে গা ময় গোলা। তাব পর আবার বার “যাব না?”

শাস্তি কথা কহিল না—সুধু তাহার দিকে চাহিয়া মাথার মাথা নাড়িল ‘না’।

ক্রোধে অপমানে হেমেন্দ্রের আপাদমস্তক কাঁপিতে ছ। কিন্তু সে কেমন কাঁপিয় এই শাস্তি পশু লজ্জানত্র শাস্তিকে যে তাহার একটা মিষ্ট কথার জন্ত লালসিত, তাহার

কৃপাদৃষ্টির উপর মাত্র যাহার সমস্ত জীবনের সুখশান্তি নির্ভর—কেমন করিয়া তাহাকে আজ নিজের মতে লইয়া আসে ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। এত লোকের মাঝখানে তো আর তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া বাহতে পারে না।

চাবিদিকের লোক হাঁ করিয়া তাহার-দিকেই চাহিয়া আছে, হেমেন্দ্র অস্থির হইয়া পড়িল। এই সময় একখানা মেল আসিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ কাঁবল; কোলাহলে ষ্টেশন মুখারত কারয়া আবোহাবা ক্রমে বাহির হইয়া যাইতে ছল;—হঠাৎ তাহার মন্য হইতে যোগেশ আসিয়া হেনেব হাত ধরিল “আরে ছোট বাবু যে, কোথায়?” বলিতে বলিতে হেমেন্দ্রের দৃষ্টি অনুসরণ কারয়া শাস্তির পানে চাহিল “বো দাদ ও সঙ্গে যে! ব্যাপারখানা কি বলো তো? যাওয়া হচ্ছে কোথায়?”

শাস্তি যোগেশকে দোঁপিয়াই মুখে ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। হেমেন্দ্র যেন সেদিকের ভাবনা হইতে মুক্ত হইয়া হাঁক ফেলিয়া বাঁচিল! যোগেশকে গাইয়া সে এই দিকের মধ্যে যেন একটা কুন পাঠিল। কিন্তু নিজেব স্বভাবাসক্ত অস্বাভাবিক ত্যাগ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব, —ঈবং গাঙ্গীষের সাহিত উত্তর কারল “পাশ্চম” “পাশ্চন!” বলিয়া যোগেশ একবার চান্দিকে চাহিয়া লোক জন বা লগেজ পত্রের অনুসন্ধান কারয়া বথ হইল।

কহ কাউকে তো দেখাচনা? আর এমন সময় পাশ্চমের গাড়ি কোথা? যোগেশ কৌতুহলে হেমেন্দ্রের পানে চাহিল। হেমেন্দ্র বিপন্ন হইয়া পাড়িয়া ছল। একটু খানি মাথা চুলকাইয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া কহিল,

তা বটে এখনতো কোন ট্রেন নেই ; তাহলে যোগেশ কি করা যায় বলো দেখি ?”

যোগেশ অনুমানে ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিল, চট করিয়া তাহার মাথায় বুদ্ধি খেলিয়া গেল, হেমেন্দ্রকে একটু আড়ালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল “ব্যাপারটা কি বলো দেখি ? শ্বশুরবাড়ি গেলেনা কেন ?”

হেমেন্দ্রের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল কিন্তু সব কথা খুলিয়া না বলিয়া কেবল মাত্র উত্তর করিল “না।” “বাড়িতে আর বনবেনা তা আমি আগেই জানতুম। তা কোন জায়গাটায় যাওয়া ঠিক হয়েছে ?” হেমেন্দ্র মুখ নীচু করিয়া আস্তে আস্তে উত্তর করিল “এখনও কিছুই ঠিক করিনি।” “ঠিক না করেই টিকিট কিনবে নাকি ? সঙ্গে কে আছে ? জিনিষ পত্র কই ?”

একি পরিহাস ! হেমেন্দ্রের লোকজন জিনিষ পত্র ! তার কি আছে ? কে আছে ? মৃহুহাসিয়া বলিল “সঙ্গে কে থাকবে ? যোগেশ যখন বাড়ি থেকে এসেছিলুম সঙ্গে কে এসেছিল ? আর কিছুই তো আনিনি, যেমন এসেছিলুম তেমনিই যাব। শুধু যে বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন সেইটেই বহিতে হবে।”

“এর নাম পশ্চিম যাওয়া ! পশ্চিমে গিয়ে কি করবে ? চলেবে কেমন করে ?”

হেমেন্দ্রের আরক্তমুখ বিবর্ণ হইয়া আসিল, সম্মুখে দিগন্তপ্রসারী সংসার সমুদ্র, সে গলায় কলসী বাঁধিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে আসিয়াছে, সাঁতারও জানেনা, তথাপি গর্কের সহিত কহিল “কোথাও একটা চাকরী বাকরী চেষ্টা করব, ভিক্ষের ভাত আর খাবো না। যোগেশ আমার বখেষ্ঠ শিক্ষা হয়েছে।”—

যোগেশ মৃহু মৃহু হাসিতেছিল ! বলিল “ভিক্ষে, সবিতো তোমার। খুড়র ভীমরথি হয়েছে। বলে দেশের আইন আদালত স্কন্ধ কি উঠে গেল ? মাগী আদালতে প্রমাণ করুকনা কেমন সে বিনোদের স্ত্রী।”

হেমেন্দ্রের চোখের সম্মুখ হইতে যেন এক-খানা কাল পর্দা কে সরাইয়া দিল। সত্যিতো মূর্খ বিনোদ কুমাবের মতন সেও অভিমানে দেশ ছাড়া হইবে নাকি ? তাহাতে ক্ষতিই বা কাহার ? সাগ্রহে বলিয়া উঠিল “কিন্তু শ্বশুর তো আমাদের কিছুমাত্র সাহায্য কর্কেনা আমার তো কিছুই নেই—”

যোগেশ বন্ধুর পিট চাপড়াইয়া তাহাকে তাহাকে উৎসাহিত করিয়া কহিল “কিছু ভেবনা সব আমি ঠিক করে ফেলব। এখন তবে কোথায় থাকবে ! ফরেন্স ডাঙ্গায় আমার এক শালীর বাড়ি আছে চলো বলত তোমাদের বরঞ্চ সেইখানেই নিয়ে যাই। তারা গেছে কাশীবাস করতে,—বাড়িখানা ভাড়াও হয়নি খালি পড়ে রয়েছে।”

একটু পরেই একখানা প্যাসেঞ্জার গাড়ি ছাড়িবে—যোগেশ গিয়া শান্তিকে বলিল, “বৌদি এখানে দাঁড়িয়ে কেন গাড়িতে এসে বসুন, চারিদিকে ভদ্র লোকের ভিড়।—” শান্তি দ্বিক্রান্তি মাত্র না করিয়া যোগেশের সহিত আসিল ! হেমেন্দ্র দেখিয়া বিশ্বয়ের সহিত ভাবিল যোগেশ নাজানি কিউপায়েই তাহার মন ফিরাইয়াছে !

ট্রেন ছাড়িয়া দিলে একে একে জনকোলা-হলময়ী নগরীর দৃশ্য চক্ষের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলে পব শান্তি যখন মুখ ফিরাইল, হেমেন্দ্র দেখিল একরাত্রির ভিতরে

তাহার যেরকম পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে সেরূপ অনেক বৎসরেও হয় না। সে ভিতরে ভিতরে একটু শিহরিয়া উঠিল। একবার মনে করিল, কাজ নাই শান্তিকে লক্ষ্মীপুরে ফিরাইয়া লইয়া যাই—” কিন্তু দারুণ আত্মাভিমান পরমুহূর্তেই তিরস্কার করিয়া উঠিল,—ভীক! জীর জন্তে নিজেকে লোকের কাছে নীচু করবে! হেমেস্র জোর করিয়া মনের কোমলতাটুকুকে পদদলিত কীটের মত দূরে নিক্ষেপ করিয়া যোগেশের কাছে সরিয়া বসিল।

যোগেশ বন্ধুকে মৃদুস্বরে অনেক রকম পরামর্শ দিতে দিতে মধ্যে মধ্যে শান্তির ভাব

লক্ষ্য করিতেছিল। হেমেস্র না বুঝিলেও সে বুঝিয়াছিল শান্তি বাহিরের লোকের সম্মুখে আত্মমর্যাদা রক্ষা করিবার জন্তই শুধু স্বামীর সঙ্গে আসিল। *

তাহার মুখের আশাহীন বেদনার নিদারুণ আঘাতচিহ্ন কথামত চিহ্নের মতনই সুস্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সকরুণ-নেত্রে যোগেশ তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া মনে মনে বলিল “তোমার ভাগ্যে অনেক দুঃখ আছে; তুমি যার হাতে পড়েছ সে তোমায় চিনবে না সে তোমার আদর বুঝবে না। তবে আমি যেটুকু পারি তোমার মঙ্গল চেষ্টা করবো।”

শ্রীঅম্বরূপা দেবী

ব্রিটিশ মেডিক্যাল কনফারেন্স।

সমস্ত ইউরোপে এই ব্যবস্থা যে শীতকালে তাহার বাড়াইতে বা দেশে থাকিয়া কাজ করেন, আর গ্রীষ্মকাল পড়িলেই স্বাস্থ্যলাভ-উদ্দেশ্যে আনন্দে নানা দেশ বিদেশে বেড়াইয়া—সঙ্গে সঙ্গে নূতন জ্ঞান অর্জনও করেন। Winter session বা শীতকালের কাজ তাহাদের দেশে ছয় মাস চলে, কিন্তু summer session গ্রীষ্মকালের কাজ তিনমাস মাত্র চলে। বাকী তিনমাস ছুটি ও বেড়াইবার বা বিশ্রাম করিবার সময়। তাই এই অবসর সময়েই যত সভা, সমিতি, ও সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া থাকে।

বিলাতে সব ডাক্তারদের একত্রে মিলিবার একটি সমিতি আছে তাকেই British Medical Association “চিকিৎসকসভা”

বলে। পৃথিবী জুড়িয়া সকল পাস করা ডাক্তারই তাহার সভ্য হইতে পারেন। বৎসরে তজ্জন্ত প্রায় বিশ টাকা দিতে হয়। বিভিন্ন দেশ হইতেও সেই বিলাতি সভার সভ্য হওয়া চলে। দূরে থাকিয়া কাগজ-পত্র পাঠাইয়া ও জ্ঞানের আদানপ্রদান করিয়া নিকটে থাকার মতই একত্রে কার্য করা যায়। আসল সভাটি বিলাতে বটে, কিন্তু প্রত্যেক স্থানে শাখা সমিতি আছে। আমাদের ভারতেও তার একটি খণ্ড সমিতি আছে। এইরূপে বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন রোগ পরীক্ষা ও রোগ চর্চার ফল পরে একত্র হইয়া সেই পীঠস্থান বিলাতের প্রধান সমিতিতে যাইয়া মিলে। জ্ঞানোপার্জনের সে দেশে এমনই পৃথিবী জুড়িয়া সুব্যবস্থা।

আমি যে সময়ে বিলাতে ছিলাম, সেই সময়েও গ্রীষ্মকালে সেই মহাসভায় পৃথিবীর সকল সভ্যকে নিমন্ত্রণ করা হয়। প্রতিবৎসর এক স্থানে ইহার অধিবেশন হয় না। কখনও বা বর্মিংহামে, কখনও বা লণ্ডনে, কখনও বা এডিনবরায় এই মহাসভা আহূত হইয়া থাকে। সে বৎসর ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে ডিভনসায়ারের “একসেটর” নামক একটি পুরাতন স্থানে এই অধিবেশন হইয়াছিল।

আমি এত নিকটে থাকিয়াও এই বাৎসরিক অধিবেশনের কথা কিছুই জানিতাম না। অধিবেশনের সবেমাত্র দুই দিন পূর্বে আমার এক পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু একজন পার্শী ভদ্রলোক আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়া এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। তাঁহার আর একজন বন্ধু সেই সভার সভ্য হইয়া যাইতেছিলেন। শুনিবামাত্র আমি তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলাম। সে সব দেশে যাত্রার উদ্যোগ করিতে বেশী সময় লাগে না। মংলবেরও সহজে ঠিক হয়, তাহা কার্যে পরিণত করাও সহজ সাধ্য এবং যাতায়াতেরও অশেষ সুবিধা। সুতরাং একঘণ্টার মধ্যেই একটি হাতব্যাগ, ওভারকোট ও দুইটি সার্ট ও চারখানি রুমাল লইয়া গাড়ি ধরিতে চলিলাম। ১৭ শিলিং মাত্র দিয়া টিকিট ক্রয় করিয়া গাড়িতে উঠিলাম। গাড়িগুলি যদিও খুব দ্রুত চলে—তবুও লণ্ডন হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার সময় সে স্থানে পৌঁছিলাম। যাইবার পথে কতই নূতন দৃশ্য দেখিলাম। সে অঞ্চলগুলি সবই পাড়ারগানের মত।

শস্ত্রক্ষেত্র, গোচারণ মাঠ, বাগান ও দরিদ্র-লোকের ছোট ছোট বসত বাড়ী। চারিদিকে গরু, বাছুর, ভেড়া, ঘোড়া চরিতেছে। সুস্থশরীর ও কর্ম্মপটু কৃষকেরা ও কৃষকবধূরা শস্ত্রক্ষেত্রে হাতের আস্ত্রের গুটাইয়া পাশাপাশি নিজের হাতে কাজ করিতেছে।

আমাদের দেশে যেমন রেল দিয়া যাইতে যাইতে ক্রমে কত পরিত্যক্ত ঘর বাড়ী ও গ্রাম দেখা যায়, ও দেশে সেরূপ মোটেই দেখিলাম না। অভাব, অযত্ন হুঃসময়, বা মৃত্যুর চিহ্ন যেন কোথাও নাই। চারিদিকেই সমৃদ্ধির লক্ষণ; পুরাতনের উপরও পরিপূর্ণ নূতন সংস্কার। যাইবার পথে “বাথ” প্রভৃতি কতগুলি নূতন সহরও দেখা যায়; সেগুলি সব লণ্ডনের ভাব ও নূতন সমৃদ্ধি লইয়া গঠিত। যাইবার কালে পথে কতগুলি সমুদ্রধারের স্বাস্থ্যনিবাসও দেখা গেল। সে গুলির বর্ণনা ব্রাইটন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে পূর্বেই করিয়াছি। আনন্দমাখা মুখ ও হাবভাব লইয়া সব ছেলে মেয়েগুলি খালি পা করিয়া হাঁটু জলে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছে ও ছিপ ও কুড়াজাল করিয়া মাছ ধরিতেছে। অনেক স্থলে অবগাহন স্নান করিবার জন্য ছোট ছোট ঢাকা গাড়ি। কোথাও বা প্রণয়ীদেব নির্জন গাছের তলায় গুপ্ত সন্মিলন স্থান। সেস্থানে অনেকে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিত্য সময় কাটান।

সন্ধ্যা ছয়টায় গাড়িখানি একসেটরের ষ্টেশনে পৌঁছিল। সেটি একটি পুরাতন সহর। ষ্টেশনটিও তত বড় নয়। একাই সাহস করিয়া গিয়াছি কিন্তু নাবিরা যে কোথায় যাইতে হইবে ও কোথায় থাকিব,

তার কিছুই জানি না। কিন্তু ষ্টেশনে নাবিয়াই দেখিলাম সভ্যদের জন্তু আহ্বান-সমিতির লোক সেইখানেই উপস্থিত আছেন।

এত দেশ বিদেশের লোক সেখানে তখন সমাবেশ হইয়াছিল যে আশ্রয় স্থান খুঁজিয়া পাওয়াই দুর্লভ। সবাই আগে হইতে চিঠি লিখিয়া আপনার আপনার স্থান ঠিক রাখিয়াছে। আমার জন্তু কোনই ভাল স্থান নাই। আহ্বান-সমিতির লোকেরা নিকটস্থ একটি বড় হোটেলে লইয়া গিয়া আমাকে আশ্রয় দিলেন। সেখানে একদিন মাত্র মাথা গুঁজিয়া ছিলাম তাহাতেই অনেক শিক্ষা হইয়াছে। যত বড় লোকের সেই হোটেলে আড্ডা। সুধু আহার করিবার জন্তু ১২ শিলিং লাগে—সমবেত সভ্যেরা আহারের সময় যে সকল মস্ত পান করিলেন,—তার রং যেমন সুন্দর গন্ধ তেমনি মধুর। ফেণাগুলি দানা দানা হইয়া গেলাসের ধারে বৈদ্যাতিক আলোকে মুক্তার শোভায় শোভা পাইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল আজ ইহারা যেরূপ দামী মদ পান করিতেছেন অল্প দিন এমন করেন না।

দুইটি যুবতী রমণী হোটেল তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা সকলকেই এমনি মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করিতেছিলেন যে লোভ হইতে লাগিল, বেশী পয়সা খরচ হইলেও সেখানে কিছু দিন থাকি।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি যাহার স্থান দখল করিয়াছিলাম, পরদিন তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন! সুতরাং আমাকে সে স্থান ত্যাগ করিতে হইল। তাঁহারাই আমার জন্তু জন্তু স্থান ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু সে স্থানটি বড়ই অপছন্দসই। কি

করি বাধ্য হইয়া থাকিতে হইল। হোটেলটির নামও বড় ভাল নয়—“প্যাক্ হস হোটেল।” সেখানেও দৈনিক এক পাউণ্ড খরচ করিয়া থাকিতে হইল।

শীতের দেশে বড় একটা ক্লান্তি আসে না। অতিরিক্ত পরিশ্রমের পরও খানিক ক্ষণ মাত্র বিশ্রাম করিলেই শ্রান্তি দূর হয়। গাড়ি হইতে নামিয়া প্রথমেই এসোসিয়েসনের আপিশে যাই। সেখানে সব সই করিয়া তবে ব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়। একাধিক সনাক্ত করিবার দুইজন লোক চাই। আমাকে জানে না বলিয়া প্রথমে কেহই সনাক্ত করিতে চায় না। পরে একজন অবসর প্রাপ্ত I. M. S. কর্মচারী আমাকে নিজে না জানিয়াও সই করিলেন, ও অল্প একজনকেও সই করিতে অস্বীকার করিলেন! এই সদাশয় পুরুষের নাম ডাক্তার “জইলাস্”। ইনি এখন কার্য হইতে অবসর লইয়া “প্লাইমাউথে” ডাক্তারী করেন। ইনি Tropical Journal-এর একজন সম্পাদক ও ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের উপর ইহার বড়ই দয়া। আমাকে দেখিবামাত্রই জানাশুনা না থাকিলেও ইনি নিজে আমার স্বাক্ষর নিয়ে সই করিলেন ও অপর একজন ডাক্তারকে দিয়াও সই করাইয়া দিলেন। ইনিই (St. Mary) “সেন্টমেরী” হাঁসপাতালে ডাক্তার রাইটের (Sir Amruth Wright) কাছে আমাকে পরিচয় করাইয়া দিয়া চিঠি দেন। সেই চিঠি লইয়াই আমি সে হাঁসপাতালে ভর্তি হই। সে চিঠির একস্থানে এই কথা লিখিত ছিল Dr. Mallick hails from India—and is our fellow-subject. He like all Indian, is very

shy, and hence the necessity of this introduction. অর্থাৎ—“আমরাও যেমন ব্রীটিশ প্রজা ডাক্তার মল্লিকও সেইরূপ। আর সকল ভারতবাসীই যেমন সকল বিষয়ে লাজুক ইনিও সেই প্রকৃতির। তাই ইঁহার হাতে আমি এই চিঠিখানি দিলাম।”

এই কথা কয়টিব ভিতর কেমন একটু আন্তরিক ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা মাথান আছে। ভারতবর্ষে উপস্থিতিকালে তিনি কত তন্ন তন্ন করিয়া ভারতবাসীর চরিত্র পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন তাহা এই চিঠিখানি হইতে বুঝা গেল।

অত বড় একটি বৃহৎ সমিতির স্থান হইবার মত একটি বড় বাড়ী সহজে পাওয়া যায় না। তাই সমিতির বিভিন্নশাখার অধিবেশন বিভিন্ন স্থানে হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এলবার্ট হল নামক বাটীতে গ্রীষ্মদেশের রোগ-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। Albert Hallটা অতি সুন্দর স্থান। সেইটিই স্টেশনের নিকট ও সহরেরও প্রায় মধ্যস্থলে। সকল দিক হইতে যাতায়াতের সুবিধা আছে। বাড়ীটিও বেশ বড়, সেখানে অনেক বিষয়ের মিউজিয়ম আছে। সবগুলিই অতি সুনিয়মে সাজান। একটি ঘরে চাববাসের যত কল কারখানা সব একত্র পাশাপাশি সাজান ও তাহার কলকৌশলও বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আছে। একটিতে খনিজ পদার্থের প্রদর্শনী। আর একটিতে জীবজন্তু ও মনুষ্য কঙ্কাল সাজান। সকলগুলিই শিক্ষার উপযোগী। এই স্থানেই Polytechnic নামক শিক্ষা স্থান। এইখানে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্ত প্রতি সন্ধ্যায়

বক্তৃতা হয়। লোকেরা দিবসের কাজকর্ম শেষে অবসর সময়ে এখানে আসিয়া তাহা শুনে। একটি স্থানে কতকগুলি সুন্দর ছবি ছিল। তার এক শ্রেণীর ছবিগুলি সবই দরিদ্র ঘরের ঘটনার চিত্র। সে চিত্রকর দরিদ্র লোকের বিভিন্ন অবস্থারই চিত্র লিখিয়া গিয়াছেন। একখানিতে একটি ছোট কুঁড়ে ঘরের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সামান্য সমিতি। ঘরে ছেলেরা সব আঙুন পোহাইবার জন্ত আঙুনের ধারে ধারে বসিয়া আছে। একটি অনাথ বালকও আসিয়া তাদের দ্বারে আশ্রয় পাইয়াছে। দরিদ্রই, দারিদ্র্যের ব্যথা জানে। একান্ত সহানুভূতির ভাব সে চিত্রে সুন্দর চিত্রিত।

সেখানে নানা রকমের বিভিন্ন সমিতি থাকিলেও আমি দুটি সমিতিতে মাত্র মিশিয়া ছিলাম। “গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগের সমিতি” ও “জীবাণু বিচার সমিতি”। সে সকল স্থানে বক্তৃতার প্রথা এই যে, একজন কেহ একটি বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া সেই সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য বলেন, তারই উপর তর্কবিতর্ক চলিতে থাকে। তাতে বিভিন্ন লোকের মুখ হইতে অল্পসময়ে কত কথাই শেখা যায়। প্রথমেই গ্রীষ্মপ্রধান-দেশের মেলেরিয়া প্রভৃতি জরের প্রাদুর্ভাবের কথা উঠিল। এ দেশে যত লোক মরে তার অর্ধেক সংখ্যা জরের তালিকাভুক্ত। এমন কি যাহারা মরে না তারাও জরে ভুগিয়া দুর্বল হইয়া পড়ে। তাই এত জাতীয় দুর্বলতা আসিয়াছে। মেলেরিয়া বিষ মশক দংশনে ঘটে। তাই মশা মারিয়া অনেক দেশে ফল পাওয়া গিয়াছে। মেলেরিয়া প্রকোপেই গ্রীষ্মের পতন হয়। ইহাতেই দেশ

জুড়িয়া জাতীয় দুর্বলতা আসে ও সঙ্গে সঙ্গে পতনও ঘটে। গ্রীসে ম্যালেরিয়া আসিবাব প্রথম কারণ মেলেরিয়ার দেশ হইতে তথায় কৃতদাস ধরিয়া আনা হয়। আমি নিজে বহুমূত্র রোগের বিষয় কিছু বলিলাম। এই সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে ভারতবর্ষেই কেন এ রোগ এত অধিক হয়। তার উত্তর অনেক আছে—যথা আমাদের অসার আচার, বালাবিবাহ, ও মস্তিষ্কের বেশী চালনা। সমিতিতে সকলেরই বলিবার সময় নির্দিষ্ট আছে, কেহই তার বেশী সময় লইতে পারেন না। সবই অতি সুব্যবস্থায় চলিত—কোনও গোলমাল নাই। আমাদের এদেশের সমিতিতে কত অব্যবস্থা ও গোলমাল উঠে। এইরূপ,—অস্ত্রচিকিৎসা, চক্ষুর চিকিৎসা, ধাত্রী-বিজ্ঞা প্রভৃতি নানা বিষয়ের শাখা ছিল। অগ্ৰাণ স্থানে নানা বিষয়ের জিনিষপত্র দেখাইবার নানারূপ প্রদর্শনীও চলিতেছিল। তার মধ্যে একটি কেবলই অমুবীক্ষণের ব্যাপার। রোগ নিরূপণে ও রোগ চিকিৎসায় সে যন্ত্রের আজকাল বড়ই আদর। সেখানে সকল রকম ডাক্তারী নূতন ঔষধ ও নূতন যন্ত্র ইত্যাদিরও প্রদর্শনী আছে। অনেক প্রকার (X ray) যন্ত্র দেখিলাম। যন্ত্র-ব্যবসাদারেরা নানা দেশ হইতে আপনাদের জিনিষ দেখাইতে ও বেচিতে লইয়া আসিয়াছে। সকল জিনিষেরই গায়ে দাম লেখা। বড় একটা দরদস্তুর করিতে হয় না। তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার যন্ত্রই সর্বাপেক্ষা অধিক স্থান লইয়াছে। Cancer বা কর্কট রোগের চিকিৎসার জন্ত কতনা বৈজ্ঞানিক ও রেডিয়ম যন্ত্র দেখিলাম। তা ছাড়া নানারূপ

নূতন ঔষধ ও খাদ্যসামগ্রীও ছিল। সবগুলিই লোক চক্ষু আকর্ষণ করিবার জন্ত বিপুল আড়ম্বরে সজ্জিত। সকল গুলিই বুঝাইয়া দিবার জন্ত ছাপা কাগজ আছে, ও দেখাইয়া বুঝাইয়া দিবারও লোক আছে। তুমি কেনো বা নাই কেনো তাতে ক্ষতি নাই, আপাততঃ যন্ত্রগুলিতে তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলেই হইল। আর তখনই তোমার নাম ধাম খাতায় টোকা হইয়া গেল। পরে তার সফল ফলিবে—এই আশায় চিরদিন তোমাকে তাদের জিনিষের বিজ্ঞাপন ছাপা কাগজ পাঠাইবে। আমি এখনও এখানে ওরূপ কাগজ কত পাই। বিলাতী ব্যবসায়ের এই দস্তুর।

অধিবেশন শেষ হইলেই কত স্থান দেখিবার ও নিমন্ত্রণ খাইবার আহ্বান আসিল। সে দেশের মিউনিসিপালিটি ও নিকটবর্তী স্থানের বড় লোকেরাই অতিথিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিভিন্ন স্থান দেখাইতেন ও নানারূপে আপ্যায়িত করিতেন। ধরচ তাঁদেরই সব; তবে কে যাইবে কে না যাইবে তাহা আগে হইতে ঠিক করিয়া বলা চাই। ওরূপ নিয়মবদ্ধ ঠিকঠাকের দেশে একবার যাইব বলিয়া শেষে 'না' বলা চলে না।

পূর্বেই বলিয়াছি ডেভনসায়ারে এমন বেশী কিছু দেখিবার নাই। বিখ্যাত রাসায়নিক “ডেভী”র এইস্থানে জন্ম হইয়াছিল। তাছাড়া একটি বহু পুরাতন ও বড় গির্জা আছে।

স্থানটি আয়তনে খুবই ছোট—তবুও রাস্তার রাস্তার বৈজ্ঞানিক ট্রাম্‌গাড়ি চলে। আর পূর্বে মালপত্র যাতায়াতের সুবিধার জন্ত কতকগুলি খাল কাটা হইয়া-

ছিল,—এখন তাহার তত দরকার না থাকিলেও সেগুলি যত্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। আমাদের দেশে বত খাল এখন অস্বল্পে নষ্ট হইয়া গেছে। আর একটি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিলাম—যুবতী বালিকাদের সুবেশ পরিয়া হাবভাব দেখাইয়া পথে বেড়ান। যেখানে জনতা হয় সেই স্থানেই তাঁহাদের গতি।

অতিথি বলিয়া সমিতির অভিভাবকগণ আমাদের কত কি দ্রব্য স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ উপহার দিলেন। তাঁর ভিতর একখানি সাদা কাফ্-লেদারে বাঁধান সুন্দর সোনার জল দিয়ে লেখা, বহু ছবিবিশিষ্ট

“Exeter” নামক সেই স্থানটিরই ইতিহাস। সে বইখানি আমার কাছে এখনও আছে। দেখিলেই সেই দিনের কথা মনে হয়।

সমিতি শেষ হইবার পরদিনই প্রাতে এই সব কাগজ ও খাতাপত্র সম্বন্ধে খলির মধ্যে পুরিয়া ও হাতব্যাগ হাতে লইয়া সমুদ্র ধারের স্বাস্থ্যনিবাস “তর্কী” নামক স্থানে যাইবার জন্ত গাড়ি ধরিতে ছুটিলাম। তাহাতে কোন ক্লাস্তিই বোধ করি নাই। ঠাণ্ডা দেশে ও উষ্ণমণ্ডল বীরজাতির সংসর্গে মনে তখন কত উৎসাহ দেহে তখন কত বল! আজ এদেশে ফিরিয়া আসিয়া তাহার কিছুই নাই! সকলই আবহাওয়ার গুণ!

শ্রীহিন্দুমাধব মল্লিক।

রসেটা প্রস্তর।

হামিস্ ত্রিস্ মেজিষ্টাস্ নামক মিশরীয় দার্শনিক স্বদেশকে সঙ্ঘোধন করিয়া বলিয়া ছিলেন, “হা মিশর, তোমার ধর্মের অনিশ্চিত কিংবদন্তী মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। ভবিষ্যৎ-ঈশ্বরগণ তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। প্রস্তরোৎকীর্ণ শব্দাবলী মাত্র তোমার ধর্ম-জীবনের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। সিথীয় অথবা ভারতীয়গণ, অথবা অন্ততর বর্ষের প্রতিবেশী আসিয়া মিশরে বাস করিবে। দেবতাগণ স্বর্গে প্রতিগমন করিবেন। মানব ও দেবতা-বর্জিত মিশর মরুভূমিতে পরিণত হইবে।”

স্বদেশপ্রেমিক দার্শনিকের সেই বক্রণ ভবিষ্যৎবাণী সত্যে পরিণত হইয়াছে। পারসীক গ্রীক ও রোমকগণ একে একে মিশর জয়

করিয়া তথায় স্ব স্ব বিজয় পতাকা উড়াইয়াছে। অবশেষে মুসলমানগণ প্রাচীন সভ্যতার শেষ চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। প্রাচীন মিশরীয় সাম্রাজ্য শুধু কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। মিশরীয় সভ্যতা ও ধর্মের কাহিনী বহুদিন যাবৎ শুধু কিংবদন্তীতেই নিবদ্ধ ছিল। সে কিংবদন্তীও মিশর ত্যাগ করিয়া গ্রীক ও রোমক সাহিত্যে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। মিশরে ছিল শুধু প্রস্তরোৎকীর্ণ শব্দাবলী। দুই সহস্র বৎসর যাবৎ তাহাদের মধ্যে মিশরীয় রহস্য লুক্কায়িত ছিল। দুই সহস্র বৎসর যাবৎ তাহারা মানবের অসু-সন্ধিৎসা ব্যর্থ করিয়াছিল। অবশেষে উর্নবংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অতর্কিতভাবে সেই রহস্য

কুহেলিকা পরিষ্কৃত হইয়া পড়ে এবং মিশরীয় সাহিত্য সুধীগণের কৌতূহল তৃপ্তি করিতে সক্ষম হয়।

গ্রীকগণ যখন মিশর জয় করিয়াছিল তখনও প্রাচীন ভাষাভিজ্ঞ লোকের সম্পূর্ণ অভাব ঘটে নাই। কিন্তু এই ভাষা শিক্ষা করিতে গ্রীকগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। দুই একজন চেষ্টা করিয়া থাকিলেও তাহার শিক্ষা বিবরণ পাওয়া যায় নাই। অস্তুতঃ কোন গ্রীক পণ্ডিতই মিশরীয় ভাষা শিক্ষা ও পড়িবার উপায় সম্বন্ধে কিছুই লিখিয়া যান নাই। মিশরীয় লিপিকে গ্রীকগণ যে নামে অভিহিত করিত—তাহা হইতে বোধ হয় গ্রীকগণ উক্ত লিপিকে ধর্মের গুহ্যত্ব প্রকাশক সাক্ষাতিক চিহ্ন বলিয়া মনে করিত। (Hieroglyphics—hieros sacred, glyphein—to carve) কিন্তু মিশরীয়গণের দৈনিক ব্যাপারেও যে ঐ একই লিপি ব্যবহৃত হইত তাহা পরে জানা গিয়াছে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মিশর রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহাব বহু পূর্বে হইতেই প্রাচীন মিশরীয় ভাষা বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। মিশরের পূর্ণ অভ্যুদয়ের সময়ও কতিপয় সুধীগণ ভিন্ন ভিন্ন কৌতূহল প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় কথা বলিতে বা লিখিতে পারিত না। প্রাচীন ভাষা ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া এক স্বতন্ত্রভাষায় পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। মিশর রোমীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার পরে প্রাচীন ভাষা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন প্রাচীন ভাষা লিখিতে ও পড়িতে পারে এমন লোকের সম্পূর্ণ অভাব হইয়া পড়ে।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টির মিশরাভিযানের সহিত কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মিশরে গিয়াছিলেন। মিশরে উপনীত হইয়াই তাঁহারা মিশরীয় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হন, এবং মিশরের পুরাবস্তু সমূহ ফ্রান্সে অন্তর্ভুক্ত করিতে প্রয়াসী হন। ইংরেজের প্রতিবন্ধকতায় ইহাতে তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ইংরেজগণ অনেক পুরাবস্তু স্বদেশে লইয়া যান। রসেটা প্রস্তর তাহাদিগের অন্যতম। ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে নীলনদের মোহানায় রসেটা নগরের সান্নিধ্যে সেন্ট জুলিয়ান দুর্গের ভগ্নাবশেষের মধ্যে ফরাসীগণ রসেটা প্রস্তরখানা প্রাপ্ত হন। আলেকজান্দ্রিয়ায় সন্ধির পরে প্রস্তরখানি ইংরেজদিগকে অর্পিত হয়। ইংরেজগণ বৃটিশ মিউজিয়মে ইহাকে রক্ষা করেন।

রসেটা প্রস্তরের উপর ত্রিবিধ লিপি খোদিত আছে। প্রথমে মিশরীয় চিত্র লিপি, তৎপরে রেখা, কোণ ও চিত্রাঙ্কসম্বলিত এক প্রকার লিপি। ইহা দেখিয়া একরূপ সংক্ষিপ্ত লিপি বলিয়াই ধারণা হয়! ইহাকে প্রাকৃত লিপি (Enchorial or demolic) বলে। সর্ব নিম্নে গ্রীক লিপি। একত্র সমাবেশিত ত্রিবিধ লিপি দেখিয়া প্রথমেই মনে হয় একই কথা ভিন্ন ভিন্ন লিপিতে লিখিত হইয়াছে। বাস্তবিকও পণ্ডিতগণ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, একই কথা তিন লিপিতে খোদিত আছে! ১৯৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মেম্ফিস নগরের যাজকগণ মিশরের গ্রীক রাজা পঞ্চম টলেমি, এপিফেনসকে দেব-সম্মান প্রদান করেন,— প্রস্তর লিপি তাহারই নিদর্শন।

বৃটিশ মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষগণ রসেটা

প্রস্তর দেখিয়াই তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, এবং সমগ্র প্রস্তরীয় লিখো-গ্রাফ চিত্র প্রকাশিত করেন। ইউরোপের যাবতীয় দেশের পণ্ডিতগণ দ্বাদশ বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিয়াও প্রস্তর খোদিত মিশরীয় লিপিব্ধন পড়িতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে ইংরেজ টমাস্ ইয়ং ও ফরাসী চ্যাম্পোলিন কর্তৃক এই সমস্যার সমাধান হয়।

রসেটা প্রস্তরের পাঠোদ্ধারে কৃতসংকল্প হইয়া ইয়ং বর্তমান মিশরীয় ভাষা কপ্ত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। প্রচুর অধ্যবসায় সহকারে এক বৎসরের মধ্যে তিনি কপ্ত ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলেন, এবং তাঁহার দৃঢ় ধারণা হয়—প্রাচীন মিশরীয় ভাষার সহিত কপ্ত ভাষার সাদৃশ্য আছে। প্রস্তরে খোদিত লিপি বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া সর্বনিম্নস্থ গ্রীক ভাষায় খোদিত বাক্যাবলীর অর্থ তিনি উপরিস্থ লিপিব্ধন হইতে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করেন এবং অবশেষে নিম্নলিখিত বিষয় আবিষ্কার করেন।

(১) চিত্রলিপির অনেক চিত্রদ্বারা চিত্র-সূচিত পদার্থ সূচিত হইয়াছে। মানুষের চিত্রদ্বারা মানুষ, সিংহের চিত্রদ্বারা সিংহ (‘শব্দ’ নহে শব্দসূচিত পদার্থ) সূচিত হইয়াছে।

(২) অনেক চিত্রদ্বারা তৎসূচিত পদার্থ সূচিত না হইয়া পদার্থান্তর সূচিত হইয়াছে। শব্দসূচিত পদার্থের সহিত পদার্থান্তরের সম্বন্ধই এই ব্যাখ্যার কারণ।

(৩) পুনরুক্তিদ্বারা বহুবচন সূচিত হইয়াছে।

(৪) রেখাদ্বারা সংখ্যা সূচিত হইয়াছে।

(৫) দক্ষিণ অথবা বাম উভয় দিক হইতেই চিত্রলিপি পড়া যায়। কিন্তু যোদিকে জঙ্ঘুলির মুখ থাকে—সেই দিক হইতে পড়িতে হয়।

(৬) লোক অথবা পদার্থটি (proper nouns) শেষের নামসূচক চিত্রগুলি এক-প্রকার ডিম্বাকার রেখাধারা বেষ্টিত থাকে। ইয়ং এই ডিম্বাকার রেখাকে কার্তুসু (cartouche) আখ্যা দিয়াছেন।

(৭) রসেটা প্রস্তরস্থ কার্তুসুগুলির মধ্যে “টলেমির” নাম লিখিত আছে।

(৮) কার্তুসুের পরে কোনও স্ত্রীলোকের চিত্র থাকিলে তদ্বারা কার্তুসুমধ্যস্থ নামের স্ত্রী সূচিত হয়।

(৯) কার্তুসুমধ্যস্থ চিত্রগুলি শাব্দিক চিহ্নরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে (phonetic symbol)। কোথাও তাহারা মৌলিক ধ্বনির চিহ্নরূপ (alphabetical), কোথাও কতিপয় সমবায়ে গঠিত শব্দাংশের চিহ্নরূপে syllabic রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(১০) একাধিক চিত্রদ্বারা একই ধ্বনি সূচিত হইতে পারে।

চতুর্দশটি ধ্বনিসূচক চিত্রের নির্দেশ ইয়ং করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ছয়টি মাত্র পরবর্তী পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন। ইয়ং শুধু কার্তুসুের মধ্যেই বর্ণমালার ব্যবহার স্বীকার করিয়াছিলেন। বস্তু অথবা ব্যক্তি বিশেষের নাম ভিন্ন অগ্রত্রেণ যে মিশরীয় ভাষায় বর্ণমালার ব্যবহার হইত—ইয়ং তাহা বুঝিতে পারেন নাই। ফরাসী চ্যাম্পোলিন এই তথ্য অবাধে স্বীকার করেন।

রসেটা প্রস্তর ও অগ্রত্রেণ অনেক মিশরীয়

লিখন পর্যবেক্ষণ করিয়া চ্যাম্পোলিন বুদ্ধিতে পারেন মিশরীয়গণ একপ্রকার বর্ণমালা ব্যবহার করিত। তিনি মিশরীয় ভাষায় সম্পূর্ণ বর্ণমালার আবিষ্কার করেন। তন্মধ্যে স্বরবর্ণের সংখ্যা অতি কম।

কিন্তু চ্যাম্পোলিনের মতও সুধীগণ কর্তৃক পরিবর্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে। মিশরীয় ভাষায় চিত্র দ্বারা শুধু বর্ণই যে সূচিত হইত তাহা নহে। অনেক চিত্র দ্বারা পূর্ণ শব্দ ও অনেকগুলি দ্বারা শব্দাংশও সূচিত হইত। আবার অনেক চিত্র দ্বারা শব্দ সূচিত না হইয়া শব্দ নির্দিষ্ট পদার্থই সূচিত হইত।

চ্যাম্পোলিনের পরে তৎশিষ্য রসেলিনি ও অন্যান্য অনেক পণ্ডিত তৎপ্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া বিস্তর মিশরীয় পুঁজিবস্তু আবিষ্কার করতঃ মিশরের ইতিহাস গঠন করিয়াছেন। এই সমস্ত পণ্ডিতের গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে—মিশরীয়গণের মধ্যে প্রথমে চিত্রলিপিই প্রচলিত ছিল বর্ণমালার ব্যবহার প্রথমে হয় নাই। এবং বর্ণমালাব ব্যবহার প্রচলিত হইবার পরেও চিত্রগুলি পরিত্যক্ত হয় নাই। বর্ণমালার অলঙ্কারের পূর্বে প্রথমে চিত্র দ্বারা পদার্থ সূচিত হইত। প্রতি পদার্থ বুঝাইতে এক একটি চিত্র ব্যবহৃত হইত। তৎপরে চিত্র দ্বারা পদার্থ সূচিত না

হইয়া তৎকালে শব্দ সূচিত হইত। একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হইলেও একই চিত্র দ্বারা শব্দ বিশেষ সূচিত হইত। একাধিক শব্দাংশের (Syllable) সমবায়ে শব্দ ও একাধিক মৌলিক ধ্বনির সমবায়ে শব্দাংশ গঠিত। প্রথমতঃ শব্দাংশের জন্ত চিত্র ব্যবহার করিয়া অবশেষে মৌলিক ধ্বনির জন্ত স্বতন্ত্র চিত্রের ব্যবহার পর্যাস্ত মিশরীয়গণ শিখিয়াছিল। প্রতি মৌলিক ধ্বনির জন্ত স্বতন্ত্র চিত্র ব্যবহার করা ও বর্ণমালার ব্যবহার একই কথা। প্রথমে যে চিত্রগুলি মৌলিক ধ্বনি প্রকাশ করিতে ব্যবহৃত হইত—কালে সরলীকৃত হইয়া তাহারাই অক্ষরে পরিণত হইয়াছে। এই অক্ষরমালার ব্যবহার শিখিয়াও মিশরীয়গণ চিত্র ব্যবহার ত্যাগ করে নাই। কোনও শব্দ বর্ণ সাহায্যে বানান করিয়া তৎপরে তৎসূচক চিত্রও তাহার ব্যবহার করিত। ফিনিসীয়গণ মিশরীয়গণের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের অবলম্বিত লিপিপ্রণালী অবলম্বন করে। কিন্তু তাহার মিশরীয় লিপির অনাবশ্যক চিত্রগুলি ত্যাগ করিয়া শুধু অক্ষরগুলি গ্রহণ করতঃ লিপিবিদ্যাকে অনেক সরল করিয়া দেয়। ফিনিসীয়গণের নিকট হইতেই যাবতীয় ইয়োৰোপীয়গণ আপনাদের অক্ষরমালা প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

জোনাকি ও আঁধার।

জোনাকি কহিল হাসি—শোন গো আঁধার,
আমার প্রকাশে বাড়ে সৌন্দর্য্য তোমার !
আঁধার কহিল—নাহি কর অহঙ্কার,
তোমার প্রকাশ হয় উদয়ে আমার !

দীপ ও রজনী।

দীপ কহে—হে রজনী আলোকে আমার,
ধরা মাঝে হয় সদা প্রকাশ তোমার !
রজনী কহিল হাসি—মোর অবসানে,
হে দীপ, তোমার কথা কেহ নাহি জানে !

শ্রী প্রফুল্লশঙ্কর গুহ।

চয়ন।

হি উয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

রাজ-পরিবার, সৈন্যাদি ও অস্ত্রশস্ত্র।

রীতিনীতি, বিচার, পরীক্ষা প্রভৃতি।

কৃত্রিয়গণই রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইহারা সময় সময় বলপ্রয়োগে ও রক্তপাতে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। ইহাদিগকেও বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখা হয়।

জনমণ্ডলীর মধ্যে যাহারা সর্বাধিক সাহসী তাহাদিগকেই বিশিষ্ট সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়। যেহেতু পুত্র পিতার ব্যবসায় অবলম্বন করে, সেই জন্ত ইহারা শীঘ্রই যুদ্ধবিদ্যার পারদর্শী হয়। শান্তির সময় ইহারা রাজ-প্রাসাদের চতুর্দিকস্থ শিবিরে বাস করে কিন্তু যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয় তখন ইহারা সকলের অগ্রবর্তী হয়। সৈন্যগণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম, পদাতিক, দ্বিতীয় অখারোহী, তৃতীয়, রথী এবং চতুর্থ গজারোহী। হস্তীগণকে সুদৃঢ় বর্ম্মে আবৃত করা হয় এবং তাহাদের দস্তেও তীক্ষ্ণ কটক থাকে। সেনাপতি রথে উপবিষ্ট থাকিয়া আদেশ প্রদান করেন এবং তাঁহার দক্ষিণে ও বামে দুই জন করিয়া চালক রথ চালনা করে। এই সকল রথ চতুরথযোজিত। সৈন্যাদ্যক রথেই থাকেন; এবং চতুর্দিকে সৈন্যগণ তাঁহার রথচক্রের নিকটে থাকে।

অখারোহী সৈন্য আক্রমণ প্রতিরোধ জন্ত সর্বাগ্রে থাকে এবং পরাজয় হইলে সংবাদ বহনের জন্ত ইতস্ততঃ গমন করে। পদাতিকগণ ক্ষিপ্ৰকারিতার জন্ত প্রতিরোধে নিযুক্ত থাকে। সাহস ও শারীরিক বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহাদের নির্বাচন হয়। ইহারা দীর্ঘ বর্ষা ও প্রশস্ত ঢাল বহন করে। কখন কখন ইহারা তরবারীও ব্যবহার করে এবং প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হয়। ইহাদের যুদ্ধোপযোগী সকল অস্ত্রই তীক্ষ্ণধার ও সুস্পাগ্র। বর্ষা, ঢাল, তীর, ধনুক, তরবারী, কুঠার, টাঙ্গী, এবং নানা প্রকার ফিঙ্গা যন্ত্র ইহারা ব্যবহার করে। এই সকল অস্ত্রাদি ইহারা বহুকাল হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।

সাধারণ ভারতবাসীগণ যদিও লঘুচিত্ত, তথাপি তাহারা সৎ ও অপকার্যবিমুখ। অর্থাৎ বিষয়ে তৎপরতা জানেনা এবং বিচার কার্যে ইহারা সতর্ক। পরকালের শাস্তির জন্ত ইহারা বিশেষ ভীত কিন্তু বর্তমানের বিষয় ইহারা বিশেষ চিন্তা করে না। ব্যবহারে ইহারা প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় লয় না এবং প্রতিজ্ঞাপালনে বিশেষ তৎপর। রাজ্য-শাসন সংক্রান্ত নিয়মাবলী সাধুতাপরিপূর্ণ এবং ইহাদের ব্যবহার অত্যন্ত সরল ও মধুর। দেশে অপরাধীর সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং অতি অল্প সময়ই ইহারা উপদ্রব করে। যখন কেহ আইন-বিরুদ্ধ আচরণ করে, তখন সেই বিষয় সুস্পষ্টরূপে অনুসন্ধান করা হয়। শারীরিক কোন প্রকার শাস্তি প্রয়োগ করা হয় না। শীলতা অথবা স্ত্রীর বিধিলঙ্ঘন, দাম্পত্য-সম্বন্ধ ভঙ্গ, বা পিতৃমাতৃভক্তিতে উদাসীন্ধ্য দেখিলে সেই ব্যক্তির নাসাকর্ণ ছেদন অথবা হস্তপদাদি কর্ষণ করিয়া অথবা দেশ হইতে বিতাড়িত বা মরুভূমিতে তাড়িত করিয়া শাস্তি দেওয়া হয়। অস্ত্রান্ত দোষে, সামান্ত অর্ধদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অপরাধী ব্যক্তির দোষানুসন্ধানের জন্ত কোনরূপ বেত্র বা দণ্ড ব্যবহৃত হয় না। অপরাধীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে যদি নিজ দোষ স্বীকার করে তবে তাহাকে লঘুশাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু যদি অপরাধী নিজ দোষ স্বীকার না করে অথবা অপরাধ করিয়া থাকিলেও দোষকালনের চেষ্টা করে, তাহা হইলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া নিম্ন লিখিত কোন প্রকারে শাস্তি প্রয়োগ করা—যথা (১) জল, (২) অগ্নি (৩) পরিমাণ প্রয়োগ অথবা (৪) বিষ।

প্রথমোক্ত বিধিতে অপরাধীকে খলিয়ান করিয়া প্রস্তর পাত্রসহ গভীর জলে নিক্ষেপ করা হয়। যদি ঐ ব্যক্তি জলমগ্ন হয় ও প্রস্তর পাত্র

ভাসিয়া ওঠে তাহা হইলে সে অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু যদি প্রস্তুত জলমগ্ন হয় ও ঐ ব্যক্তি ভাসিয়া ওঠে তাহা হইলে সে নির্দোষ বলিয়া গণ্য হয়।

দ্বিতীয়ত :—ভারতবাসীরা লৌহপাত্র উত্তপ্ত করিয়া অপরাধীকে তাহার উপর উপবেশন করায়। এবং ঐ উষ্ণ লৌহপাত্র অপরাধীকে ক্রমান্বয়ে হস্ত, পদ ও শিহ্ন'দ্বারা স্পর্শ করিতে হয়। যদি ইহাতে কোন ক্ষত না হয় তবে সে নির্দোষ এবং ক্ষত হইলে দোষী বলিয়া গণ্য হয়। কোন দুর্বল ভীকু ব্যক্তি এইরূপ পরীক্ষায় অসম্মত হইলে, তাহাকে একটি ফুলের কলিকা অগ্নির দিকে নিক্ষেপ করিতে হয়। যদি কলিকাটি প্রফুটিত হয় তবে সে ব্যক্তি নির্দোষ এবং পুষ্পটি দগ্ধ হইলে অপরাধী বলিয়া গণ্য হয়।

তৃতীয় দণ্ডের নিয়ম, অপরাধীর সমপরিমাণ প্রস্তুত একত্র তোল করা হয়। যদি তোলকালীন অপরাধীর ওজন প্রস্তরাপেক্ষা কম হয় তবে তাহাকে নির্দোষ বলা হয়। আর যদি সে প্রকৃত অপরাধী হয় তবে, প্রস্তরের ভারই বেশী হয়।

চতুর্থ দণ্ডের নিয়ম ; একটা মেঘের দক্ষিণ উরুতে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে সকল প্রকার বিষ ও অপরাধীর আহাৰ্য্যের কিয়দংশ দেওয়া হয়। যদি ঐ ব্যক্তি প্রকৃত অপরাধী হয় তবে মেঘটি মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং নিরপরাধ হইলে বিষে কোন ক্ষতি করিতে পারে না।

উপরোক্ত চারিটা উপায়েই দুষ্কার্য্যের পথ রোধ করা হইয়া থাকে।

সম্মান প্রদর্শনের নিয়ম।

নিম্ন লিখিত নয় প্রকারে সম্মান প্রদর্শন করা হইয়া থাকে।—(১) অমুরোধ কালীন মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া (২) সম্মান প্রদর্শনের জন্য মস্তক অবনত করিয়া (৩) হস্তোত্তোলন করিয়া এবং নম্র হইয়া (৪) হাত জোড় করিয়া এবং নত হইয়া (৫) জামু নীচু করিয়া (৬) সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া—(৭) জামু ও হস্তের উপর ভর দিয়া (৮) পঞ্চচক্রে

মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া এবং (৯) পঞ্চাঙ্গে প্রণত হইয়া এবং মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া।

এই নয় প্রকারের মধ্যে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত এবং পরে জামু পাতিয়া সম্বোধিত ব্যক্তির গুণকীর্তনই হইতেছে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মাননীয় ব্যক্তি দূরে থাকিলে অবনত হইয়া প্রণাম করাই বিধেয়। নিকটে থাকিলে পদ চুম্বন এবং সম্বোধিত ব্যক্তির গুল্ফ স্পর্শ করাই উচিত।

উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির আদেশ গ্রহণের সময়, পরিধেয় প্রাস্ত ভাগ উত্তোলন করিয়া ভূমিতে প্রণত হইতে হয়। উচ্চ পদস্থ বা সম্মানীয় ব্যক্তি—যাঁহাকে উপরোক্ত রূপে সম্মান প্রদর্শন করা হয়—তিনি মস্তক স্পর্শন বা পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া মিষ্ট বাক্যে উপদেশ দান অথবা স্নেহ প্রদর্শন করেন।

যখন কোন শ্রমণকে—যিনি ধর্ম চর্চায় নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—এইরূপ অভিবাদন করা হয়, তখন তিনি প্রত্যুত্তরে শুভ কামনা করেন।

ভারতবর্ষে প্রণামই একমাত্র সম্মান উপায় নহে। তাহারা নানা প্রকারে প্রদক্ষিণ করিয়াও সম্মান প্রদর্শন করে।

ঔষধ, সংকার প্রভৃতি।

কাহারও কোন রূপ ব্যাধি হইলে তিনি সাত্ত দিবস উপবাসী থাকেন। অনেকে এই উপবাসকালীনই আরোগ্য লাভ করেন কিন্তু ইহাতে আরোগ্যলাভ না করিলে তখন ঔষধ সেবন করেন। এই সকল ঔষধের ফল ও নাম বিভিন্ন। চিকিৎসকগণ রোগ পরীক্ষা এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী।

যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, যাহারা সংকার করে, তাহারা বিশেষরূপে শোক প্রকাশ করে এবং সকলে একত্র হইয়া ক্রন্দন করে। তাহারা তাহাদের বস্ত্রাদি ছিন্ন ভিন্ন, এবং কেশবন্ধন উন্মুক্ত করিয়া মস্তকে ও বক্ষে আঘাত করিতে থাকে। অশৌচকালীন কিরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হইবে এবং কতদিন অশৌচ পালন করিতে হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

মৃতদেহ সংকার করিবার তিনটি প্রণালী আছে । প্রথম দাহ, চিতা সজ্জিত করিয়া কাঠ দ্বারা দাহ করা হয় । দ্বিতীয়, গভীর জলে মৃতদেহ নিক্ষেপ ; এবং তৃতীয় পশুপক্ষীর আহ্বারের অন্ত মৃতদেহ নির্জ্বল হানে বিসর্জন ।

রাজার মৃত্যু হইলে, প্রথমতঃ তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্ধারিত হয় । কেননা উত্তরাধিকারীকেই রাজার সংকার কার্য সম্পাদন করিতে হয় এবং প্রজাগণকে তাঁহার প্রাধান্ত স্বীকার করিতে হয় । রাজার গুণানুসারে তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহাকে উপাধি ভূষিত করা হয় । মৃত্যুর পরে আর কোন প্রকার উপাধি দেওয়ার রীতি নাই ।

যে বাড়ীতে মৃত্যু হয়, তথায় যতক্ষণ মৃতের সংকার না হয় ততক্ষণ আহাঙ্গাদি সৃগিত থাকে । সংকারের পর পূর্ববৎ আহাঙ্গাদি ও ক্রিয়া কলাপ হয় । মৃতের জন্ত কোন প্রকার বাৎসরিক অনুষ্ঠানের রীতি নাই । যাহারা সংকারে ব্যাপ্ত থাকে তাহারা নিজেদের অপবিত্র বিবেচনা করে । তাহারা নগরের বহির্ভাগে স্নান করিয়া পরে গৃহ প্রবেশ করে ।

বৃদ্ধ ও হুবির অথবা যাহারা গুরুতর ব্যাধি গ্রস্ত তাহারা যদি মৃত্যুমুখে পতিত হইতে বাসনা করে, অথবা যদি কেহ সংসারের ভোগাদি হইতে মুক্তির বাসনা করে, তবে তাহাদের আত্মীয় ও বন্ধুগণ তাহাদিগকে নিমন্ত্রণাদি করিয়া বাদ্যসহকারে নৌকায় উঠাইয়া দিয়া নৌকা গঙ্গার মধ্যস্থলে আনয়ন করিলে, এই সকল ব্যক্তি গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হয় । এই ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলে উহারা দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিবে—এইরূপ ইহাদের বিশ্বাস ।

পুরোহিতগণ মৃত ব্যক্তির জন্ত শোক প্রকাশ বা ক্রন্দন করিতে পারে না । যখন কোন পুরোহিতের মাতার বা পিতার মৃত্যু হয়, তখন তাহারা মন্ত্র পাঠ করে এবং অতীতের বিষয় স্মরণ করিয়া সংকারে প্রবৃত্ত হয় । ইহাদের বিশ্বাস যে এইরূপ করিলে ইহাদের ধর্মভাব বৃদ্ধি পায় ।

রাজনীতি, রাজকর প্রভৃতি ।

ভারতবর্ষের রাজনীতি মঙ্গলজনক বিধির সঞ্চিত

জড়িত বলিয়া, শাসনকাব্য অত্যন্ত সহজ । অধিবাসীদিগের নামধাম লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রথা নাই এবং তাহাদিগকে বলপূর্বক সৈন্ত শ্রেণীভুক্ত করিবারও নিয়ম নাই । রাজাদিগের নিজ ভূমাধিকার আয় প্রধানত চারি অংশে বিভক্ত । প্রথম অংশ রাজকীয় কার্য এবং পূজা হোমাদিতে,— দ্বিতীয়াংশ মন্ত্রী ও রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্মচারীবর্গের বেতনাদিতে,—তৃতীয়াংশ রাজ্যের লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের পুরস্কারার্থে, এবং চতুর্থাংশ ধর্মমভা প্রভৃতিতে ব্যয় হইয়া সর্বস্তি সকলের অনুশীলনে উৎসাহ প্রদান করা হইয়া থাকে । এই প্রকারে প্রজার রাজকরের পরিমাণ অল্প এবং তাহাদের ব্যক্তিগত যে পরিশ্রম করিতে হয় তাহাও পরিমিত । প্রত্যেকেই নিজ নিজ দ্রব্যাদি শাস্তিতে রক্ষা করিতে পারে এবং জীবিকার জন্ত স্ব স্ব ভূমি কর্ষণ করে । যাহারা রাজকীয় ভূমি কর্ষণ করে, তাহাদিগকে উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ রাজকর রূপে দিতে হয় । বণিকগণ ইচ্ছামত যাতায়াত করিতে পারেন । সামান্য কর প্রদত্ত হইলেই জলপথ ও স্থলপথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় । পূর্তকার্যের জন্ত আবশ্যিক হইলে প্রজাদের কাজ করিতে হয় বটে কিন্তু তজ্জন্ত তাহারা বেতন পায় । কার্যের অনুপাতানুযায়ী বেতন দেওয়া হয় ।

সৈনিকগণ সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করে অথবা অবাধাদিগকে শাস্তি দিতে বহির্গত হয় । সৈন্তগণ, শাসনকর্তাগণ, মন্ত্রীগণ, নগরপাল এবং কর্মচারীগণ নিজ নিজ ভরণপোষণের অর্থ নির্ধারিত ভূমি লাভ করেন ।

তকলতা, কৃষি, আহার্য, পানীয়

এবং পাক ক্রিয়া ।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জলবায়ু বলিয়া, ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের । পুষ্প, লতা, ফল, বৃক্ষ নানা প্রকারের এবং তাহাদের নামও বিভিন্ন । আমলা, সাধুক, শাজ, কপিথ, তিম্বুক, মোচা, নারিকেল, এবং পানস ফল প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায় । এদেশের সকল প্রকার ফলের নামকরণ

অসম্ভব। খর্জুর, বাদাম, এদেশে পাওয়া যায় না। আঙ্গুর, পীচ প্রভৃতি ফল কাশ্মীর হইতে আনীত। দাড়িম্ব ও মিষ্ট কমলা সর্বত্রই পাওয়া যায়।

উপযুক্ত সময়ে কর্ণ, বপন, কর্তন হয়। কার্য শেষে কৃষকেরা কিছুকাল বিশ্রাম করে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চাউলই প্রধান। আদা, শরিশা, তরমুজ, লাউ, কদু, যথেষ্ট পাওয়া যায়। পেঁয়াজ ও রসুন বেশী পাওয়া যায় না। যদি কেহ পেঁয়াজ বা রসুন ব্যবহার করে তাহা হইলে তাহাকে নগরের বহির্ভাগে নির্বাসন করা হয়। ছক্ক, মাখন, সর, চিনি, গুড়, শর্ষপতৈল, এবং পিষ্টকই সর্বজন খাদ্য। মৎস্য ও মেঘ মাংসও সচরাচরই লোকে খায়। বখন কখন নোনা মৎস্যমাংসও ব্যবহৃত হয়। গো, গর্দভ, হস্তী, অশ্ব, শূকর, কুকুর, শূগাল, নেকড়ে সিংহ, বানর এবং লোমশ পশুর মাংস নিষিদ্ধ। যাহারা এই সকল পশুমাংস ভক্ষণ করে, তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখা হয় এবং সকলেই তাহাদের নিন্দা করে। ইহারা নগরের বহির্ভাগে বাস করে এবং কদাচিৎ ভদ্র মনুষ্যের সহিত মিলিত হয়।

নানা প্রকার মদ্য আছে। ক্ষত্রিয়গণ আঙ্গুর ও ইক্ষু নির্মিত সুরা পান করে। বৈশ্যগণ তেজস্কর মদ্য পান করে। শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ আঙ্গুর অথবা ইক্ষু সরবৎ পান করে। এই সরবৎ তীক্ষ্ণতেজ নহে।

বর্ণসঙ্কর ও নীচ জাতিগণ অশ্রান্ত জাতি অপেক্ষা আচার ব্যবহারে বিভিন্ন নহে। কেবলমাত্র ইহারা যে পাত্র ব্যবহার করে তাহা অশ্রুপ। ইহাদের গৃহকার্যোপযোগী দ্রব্যাদির অভাব নাই। যদিও ইহাদের কড়াই ও হাঁড়ী আছে কিন্তু তত্রাপি ইহারা অন্নপাকের জন্য ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার জানে না। নানা প্রকার মূল্যবান পাত্রাদি ইহারা ব্যবহার করে। সকল প্রকার দ্রব্য একটা পাত্রে একত্র করিয়া অঙ্গুলি সংযোগে মাখিয়া আহার করে। ইহারা চামচ বা পেয়ালী ব্যবহার করে না। পীড়িত হইলে ইহারা তাম্রপাত্র ব্যবহার করে।

বাণিজ্যাদি—

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, খেত অশ্ব এবং মুক্তাই এই দেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এতদ্ব্যতীত নানারূপ মূল্যবান রত্ন এবং নানা প্রকার প্রস্তরাদি এদেশে পাওয়া যায়। ইহারা অশ্রুপ দ্রব্যের সহিত এই গুলি বিনিময় করে। ইহাদের স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা নাই।

ভারতবর্ষ এবং নিকটবর্তী প্রদেশ সমূহের সীমা উপরে বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করা হইল। জলবায়ু ও ভূমির বিষয়ও বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিবরণ প্রদত্ত হইবে। (ক্রমশঃ)

তৈমুর লঙ্গ।

প্রথম সত্রটি। (মামুশি হইতে)

যে বীরপুরুষ তাতার দেশের এক সামান্য গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ শক্তি ও প্রতিভার বলে ভারত হইতে পশ্চিমে স্যাসিডোনিয়া পর্যন্ত আপন সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস বর্ণনা করিতে হইলে এক বৃহৎ পুস্তক রচনা করা আবশ্যিক হইয়া পড়ে। তৈমুর লেন বা তৈমুর লঙ্গ দুইটি তাতার কথার সংযোগে রচিত হইয়াছে। তৈমুর অর্থে লোহ। চিরদিন লোহ অস্ত্রে পরিবেষ্টিত

ও কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতেন বলিয়া তাঁহাকে তৈমুর বলা হইত। লঙ্গ অর্থে ধঞ্জ। তৈমুরের জন্মাবধি একটি পা খোঁড়া ছিল। তাতার দেশের কাশ নগরে ইহার জন্ম হয়। মুসলমানদিগের ইতিহাসে এই সত্রটির জন্ম সম্বন্ধে একটি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অসাধারণ প্রতিভাশালীর জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ কোন গল্প রচনা করা প্রাচ্যজাতির অভ্যাস।

শুনা যায় তৈমুরের মাতার নাকি বিবাহের পূর্বেই সহস্রা পুত্রবতীর লক্ষণ প্রকাশ পায়। কুমারীর পিতা নিতান্তই ভীত হইয়া পড়িলেন; কন্যাকে নানাপ্রকার ভিন্নস্বাকর করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ছুটী কন্যাকে বিখণ্ডিত করিয়া স্বীয় অপমানের প্রতিশোধ লইতে উদ্ভূত হইলেন। এরূপ সময়ে সুবতী পিতার পদতলে পড়িয়া তাহার অবস্থার আশ্চর্য কাহিনী প্রকাশ করিল। সে বলিল “তাহার গৃহের জানালায় একটি সামান্য ছিদ্র ছিল। সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়া একটি ক্ষীণ সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিয়া তাহাকে এরূপ ভাবে বেষ্টিত করিয়া ধরিল, যে মনে হইল যেম সে উজ্জ্বল আলোক-পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়াছে। পরে সেই রশ্মি তাহাকে আদর করিতে লাগিল। পরে কুমারী কাতরে কহিল, পিতা, আপনার আমার প্রতি ক্রোধ সঙ্গত সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার এ অবস্থার কারণ ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে।” পিতা সন্ধান লইয়া জানিলেন কন্যার কথাই সত্য। অবশেষে তাহার মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, সকল তেজের আকর সূর্য্যের অনুগ্রহে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার গৌরব-কীর্তিতে তাহার বংশের নাম অমর হইবে।

এই গল্পটি নিতান্ত গল্প হইলেও তৈমুরের পিতার নাম হইতেই এই গল্পের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তাহার নাম ছিল টার্গে অর্থাৎ “আলোকের উৎপত্তি-স্থল।” ছসেন নামে এক নৃপতি সে সময়ে তুর্কিস্থান ও তাতারের একছত্র অধিপতি ছিলেন। এই ছসেনের রাজসভার মধ্যে টার্গে একজন অতি বিখ্যাত সম্রাট সভাসদ ছিলেন। “মোগল” এই কথাটার আদি অর্থে কোম দেশবিশেষকে বা সাম্রাজ্য বিশেষকে বুঝায় না। “মোগল” একটা পরিবার বিশেষের নাম মাত্র। এই পরিবার বহুদিন হইতে তাতার প্রদেশের দক্ষিণভাগে রাজত্ব করিত। এই পরিবার হইতেই তৈমুরের উৎপত্তি। ইহারই পূর্ব-পুরুষ চেঙ্গিস খাঁ আসিয়ার প্রধানতম দণবীর বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ মোগল বর্তমান উভয় তাতার প্রদেশকেই

শাসন করিতেন। নিজ ভূজবলে তিনি চীনদেশ পর্যন্ত পদানত করিয়াছিলেন। তাহারই বংশধরগণ চীনে সম্রাটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হিজরা ৭৩৬ অব্দে অর্থাৎ ১৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুরের জন্ম হয়। এই সময়ে ছসেন নামে চেঙ্গিসের এক বংশধর দক্ষিণ তাতারে রাজত্ব করিতেন। মোগলদিগের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও, তৈমুর রাজসভা ও রাজধানী হইতে দূরেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে তিনি বাল্যকালে তাহার পিতার মেঘ পালন করিয়া বেড়াইতেন। সেই সময় হইতেই তাহার বাক্যে ব্যবহারে একটা অনন্য তেজের ভাব প্রকাশ পাইত। তাহা ছাড়া সেই অল্প বয়সেই তিনি চতুর্দিকস্থ মেঘপালক বালকগণের উপর বেরূপ প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে তিনি যে প্রভুত্ব করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বেশ বুঝা যাইত। পল্লীর বালকগণ সকলেই তাহাকে দলপতির আয় সম্মান করিত এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ হইলে তাহাকেই বিচারক বলিয়া মনোনীত করিত। মেঘ চারণের স্থান লইয়া যখন বিবাদ ও ঘন্ড উপস্থিত হইত, তাহারা বালক তৈমুরের নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিত এবং তিনি যাহা বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করিতেন তাহার বিরুদ্ধে আর কোন আপিল করা তাহারা আবশ্যিক মনে করিত না। একবার এক উষ্ট্র দলভ্রষ্ট হইয়া বালকদের মেঘ-চারণের স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। বালকেরা তাহাকে ধরিয়া রাখিবে কি ছাড়িয়া দিবে স্থির করিতে না পারিয়া, তাহাদের অভ্রান্ত বিচারক তৈমুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তৈমুর বিচার করিয়া বলিলেন—“এই উষ্ট্র যদি নিয়ন্তুমি হইতে তোমাদের নিকটে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া স্বদলে যুক্ত হইতে দেওয়াই কর্তব্য, আর যদি সে পার্কৃত্য ভূমি হইতে নামিয়া আসিয়া থাকে তাহা হইলে পুনরায় স্বদলে মিলিত হওয়া সম্ভব নয় বরং বগ্নজন্তুর দ্বারা হত হওয়াই সম্ভব, সুতরাং সেরূপ স্থলে উহাকে রাখিয়া দেওয়াই তোমাদের কর্তব্য।” বালকগণ তাহাই

করিল, উষ্ট্রটিকে নিজেদের নিকটেই রাখিয়া দিল। এইরূপে বালকদের ক্রীড়ার মধ্যেই পৃথিবীর অভূত-পূর্ব বিরাট সাম্রাজ্যের প্রথম ভিত্তি গঠিত হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে সেই মেঘপালক বালকগণ বড় হইয়া উঠিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে তৈমুরেরও তাহাদের উপর প্রভুত্ব ও প্রভাব বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এই প্রভুত্বের অধিকার-বলে তিনি অনুচরদিগকে যেকণ কঠোরভাবে শাসিত করিতেন, তাহাতে ক্রমে তাহার। তাঁহাকে অত্যন্ত ভীতির চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিল, তাঁহার প্রতিবাহ করিতে আর কেহই সাহসী হইত না। একদিন তৈমুর শুনিলেন এক নেকড়ে বাঘ একটি মেঘকে লইয়া গিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ মেঘপালককে তাহার অসাবধানতার জন্য সমুচিত দণ্ড দানের ব্যবস্থা করিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার এক প্রজা একটি গরু চুরি করিতে যাইয়া ধরা পড়ে। নবীন নৃপতি তৎক্ষণাৎ তাহাকে শূলদণ্ডে বধ করিবার আজ্ঞা দিলেন। এই বিচারের ফলে মেঘপালকের অধিনায়ক তাঁহার শক্তির বল বুঝিলেন এবং সাম্রাজ্য বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইলেন। মৃত ব্যক্তির পিতা মাতা মনে করিলেন মেঘপালকগণ বালক তৈমুরের হস্তে যে ক্ষমতা দান করিয়াছে তৈমুর এক্ষেত্রে তাহার অপব্যবহার করিয়াছে। এই বিশ্বাসে তাহার। বিচারক ও তাঁহার নৃপংস শাসনের পরামর্শনাতাগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল। শাস্তিটা যে অসঙ্গত হইয়াছিল তাহা তাহার। মনে করে নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি শাস্তি দান করিয়াছিল তাহাকে শাসনকর্তারূপে স্বীকার করিতে তাহার। প্রস্তুত নহে। সেই জন্য এই অস্ত্রায় মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য দুই গ্রামের অধিবাসীরা অর্থাৎ দুই পরিবারের পরিজনবর্গ নিকটবর্তী মেঘচারণ-ক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। তৈমুর তাঁহার অল্প বয়স্ক বীরগণকে লইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং এই দুই পরিবারকে পরাজিত করিয়া তাঁহার অনুচর-বর্গ প্রথম জয়গৌরব লাভ করিল। তৈমুরের

সাহস ও দক্ষতার বিবরণ শুনিয়া দেশের শ্রেষ্ঠ সাহসী যুবকগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিল। ইহারা সকলেই তাঁহার প্রজা হইবার জন্য উৎসুক, এবং যথার্থ রাজার স্তায় তৈমুরের আজ্ঞাপালন করিয়া ইহারা এক প্রকার গর্ল ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

তৈমুরের যে সকল মেঘপাল ছিল তাহাদের চারণোপযোগী যথেষ্ট ভূমি লাভ করিবার জন্য এবং এতগুলি অনুচর মেঘপালকের অধিকার বৃদ্ধির জন্য, তাঁহার নূতন ভূমি জয় করা আবশ্যিক হইয়া পড়িল। সুলতান্ মামুন্ই তাঁহাদের নিকটতম প্রতিবেশী ছিলেন। তাহার। তাঁহাকেই সর্বপ্রথম আক্রমণ করা সম্ভব বলিয়া স্থির করিল, এবং তাঁহার রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া একেবারে রাজধানী অধিকার করিবার পরামর্শ করিল। এই রাজধানীতে সেই প্রদেশের যত অল্পবয়স্ক মেঘপালকগণ যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত।

যুদ্ধ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ এই অল্পবয়স্ক মেঘ-পালক-গণ তাহাদেরই স্তায় অল্পবুদ্ধি ও অল্পবয়স্ক এক নাযকের নেতৃত্বে চালিত হইয়া রাজধানীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। তৈমুরের নৈষ্ফরণ যে কোথায় ছিল ভিন্ন হইয়া পড়িল তাহার ঠিক নাই। অবশেষে তৈমুর অনুচর-বিহীন ভাবে একাকী পদব্রজে ভিক্ষা করিতে করিতে প্রত্যাভূত হইতে বাধ্য হইলেন। একদিন এক গ্রামের মধ্য দিয়া যাইবার সময়ে তিনি খাদ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিলেন। এক বৃদ্ধা তাঁহাকে চিনিত। সে তাঁহাকে তাহার আপন কুটীরে লইয়া গেল এবং রাখালরাজকে এক সঙ্কীর্ণ রেকাবে করিয়া দুটি গরম ভাত দিল। ক্ষুধায় কাতর হইয়া তৈমুর রেকাবের মধ্যস্থল হইতে ভাত লইয়া তাড়াভাড়ি যেমন খাইতে গেলেন, অমনি তাঁহার মুখ পুড়িয়া গেল। বৃদ্ধা হাসিয়া বলিল, “প্রভু, এই ঘটনা হইতে শিক্ষা করুন যে ভবিষ্যতে আর কখনও মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ করিবেন না, প্রান্তভাগ হইতে আরম্ভ করিবেন। প্রথমে সীমান্ত দেশ জয় না করিয়া ব্যস্ততা সহকারে দেশের মধ্যস্থলে

যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলে বিপদ ও ব্যর্থতা অনিবার্য।”

এই উপদেশ তৈমুর কখনও বিশ্বাস হন নাই। ভবিষ্যতে যাবতীর যুদ্ধে তিনি সর্বদাই এই নীতির অনুসরণ করিতেন। তাঁহার যাত্রার ব্যাঘাত করিতে পারে বা পলায়নে বাধা প্রদান করিতে বা জয়লাভকে ব্যর্থ করিতে পারে, এরূপ কারণ তিনি সেই অবধি কখনও পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিতেন না। যাহা হউক তাঁহার জীবনের এই প্রথম বাধায় তিনি ভগ্নোদ্যম হন নাই। তাঁহার বিচ্ছিন্ন অনুচরবর্গ বিভিন্ন পথ দিয়া পলায়ন করিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট যাইয়া সমবেত হইল। তাহার পূর্বের স্তায়ই তাঁহার অনুগত রহিল। কিন্তু এই দুর্ঘটনার পর হইতেই তৈমুর যেন কিছু অত্যধিক উদ্ধত ও কঠোর হইয়া পড়িলেন। ক্রমে তিনি নিকটবর্তী ভূমিসমূহ অধিকার করিতে লাগিলেন। প্রতি স্থলেই জয় লাভ করিয়া রাখালরাজ তাঁহার পূর্ব পরাজয়ের স্থানটির এত নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন যে তিনি সেই নগরটিকে পুনরায় অধিকার করিতে চেষ্টা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। নগর অধিকৃত হইল এবং এই সংবাদে বহুদূর পর্য্যন্ত সকলে ভীত হইয়া পড়িল।

এই সকল রাখাল ও তাহাদের অধিনায়কের অসমসাহস দেখিয়া হুসেন ও তাঁহার সভাসদবর্গ ভীত হইয়া উঠিলেন। তাতার প্রদেশে তাঁহার রাজ্যমধ্যে তৈমুর একপ্রকার রাজশক্তি অধিকার করিয়া বসিয়া ছিলেন। হুসেন এই নবীন বিজ্ঞতার অগ্রসরের পথ

বলপূর্বক রোধ করা আবশ্যক স্থির করিলেন। মামুদের পরাজয়ে তৈমুরের শক্তি দেখিয়া বস্তুতঃ অনেকেই ঈর্ষা বোধ করিত। অমাত্যবর্গ হুসেনকে পরামর্শ দিল যে এরূপ যুদ্ধকর্মে অনভিজ্ঞ মুষ্টিমেয় অর্ধাচীন ও অল্পবয়স্ক মেঘ-পালককে পরাজিত করার জন্য অল্পসংখ্যক সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ সৈন্যই যথেষ্ট। অস্ত্রের প্রভেদ হিসাবে এরূপ অসমান যুদ্ধ কখনও হইয়াছে কি না জানি না। রাজনৈনিকেরা উজ্জল লোহবর্ষে আচ্ছাদিত হইয়া ধনুর্কাণ ও তরবারি লইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাতার দেশীয়গণ এ সময়ে বন্দুকের ব্যবহার জানিলেও তাহা যুদ্ধে ব্যবহার করা তখনও প্রচলিত হয় নাই। তৈমুরের লোকেরা কেবল শড়কি ও বর্ষা লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও তৈমুরের লোকেরা সকলেই যৌবনের অদম্য তেজে উদ্দীপ্ত,—তাহাদের দেহ ক্রান্তি জানে না, মন সঙ্কোচ জানে না। তাহা ছাড়া তাহাদের মনোনিীত নায়কের আদর্শে ও জয়োল্লাসে তাহারা সকলেই উৎফুল্ল; যুদ্ধ ব্যাপারে তৈমুরের একপ্রকার ঐশী শক্তি ছিল। অনভিজ্ঞ হইলেও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বলে তিনি সুদক্ষ বীরের স্তায় সৈন্যচালনা করিতেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল; মেঘপালকগণের প্রবল বাহু হুসেন কোনমতেই ভেদ করিতে পারিলেন না। তৈমুর শ্মশ্রুৎ বাহুখে উপস্থিত থাকিয়া অসমসাহসে শত্রুসংহার করিতে লাগিলেন। অবশেষে তৈমুরই জয়ী হইলেন, হুসেন জীবন ও রাজমুকুট দুইই হারাইলেন।

(ক্রমশঃ)

যবদ্বীপে ।

বৃহস্পতিবার ।

একটি উৎকৃষ্ট টাটুঘোড়ার উপর চড়িয়া, প্রাতঃকাল পাঁচটার সময় ব্রমোর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার পথপ্রদর্শক—একটি বাবা-দেশীয় যুবক—মুখে একটি বেশ

মধুর সরল ভাব। গায়ে একটা সাদা ছোটো জামা, এবং আ-জানু-লম্বিত একটা খাটো স্বচ্-কোর্তা। জুজ্বা ও পদদ্বয় নগ্ন।

দুই ঘণ্টা ধরিয়া, শাকুসব্জির ক্ষেতের উপর দিয়া, বনজঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিলাম।

পরে, হঠাৎ একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের চূড়া হইতে, একটা বিরাট দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইল। বালু-সমুদ্র। এই ধূসর বালু-সমুদ্র, একটা বিশাল পরিসর ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তাহার চারিদিকে, আগ্নেয় গিরির প্রাচীর। বোধ হয় ইহা আগ্নেয় গিরির একটা পুরাতন অগ্নি-গহ্বর। এই বিরাট গহ্বর হইতে ষাটো প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড আগ্নেয় গিরি সমুখিত হইয়াছে :—বাটক্,—উদ্ভিজ্জ সমাচ্ছন্ন ; তাহার পশ্চাতে ব্রমো ; আরও দূরে, আর কতকগুলি আগ্নেয় গিরি ; দক্ষিণে, Smeroc গিরি ; তাহা হইতে ধূম নির্গত হইতেছে ; দেখিলে মনে হয় যেন টুপির মাথায় পালোকের থোপনা উঠিয়াছে... এই অনন্ত-সাধারণ বিরাট-গম্ভীর দৃশ্য অনেকক্ষণ দেখিয়াও ক্লান্তি বোধ হয় না। আর-কি নিস্তরঙ্গতা ! বাতাসের শব্দমাত্র নাই—একটি পাখীর ডানার শব্দও নাই : এই বিরাট-গম্ভীর দৃশ্য দেখিয়া মনোমধ্যে যে এক অপূর্ব গাম্ভীর্য-রস অনুভূত হয়, তাহা আর কিছুতেই বিক্ষিপ্ত হইবার নহে।...

পাহাড়ের পাদদেশে নামিয়া বালু-সমুদ্রে পৌছিলাম। নীচে হইতে দৃশ্যটা আর এক হিসাবে আরও জম্‌কালো।—নীচে হইতে আগ্নেয় গিরিগুলার প্রশস্ততা আরও বেশী উপলব্ধি করা যায়। উপর হইতে শুধু কল্পনা করা যায় মাত্র। আবার ঘোড়ায় চড়িয়া, বাটকের মধ্য দিয়া,—বায়ু সমুদ্রের চতুর্দিকে, স্ফীতকায় উদ্ভিজ্জ-শ্রামল যে গিরি-প্রাচীর আছে—তাহাব প্রায় চূড়াদেশে আরোহণ করিলাম। এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে একরূপ উন্মত্ত হইলাম

যে সেই বালু-সমুদ্রের উপর দিয়া আমার টাটুকে খুব ছুটাইয়া ব্রমোর পাদদেশে আসিয়া পৌছিলাম। ব্রমোর পশ্চাতে, আগ্নেয় পদার্থসমূহের সূক্ষ্ম রেণুবাণি জলদ-জালের ন্যায় সমুখিত হইয়াছে। আমার পথপ্রদর্শক এত পিছনে পড়িয়া গিয়াছে যে, সে একটি বিন্দুর ন্যায় অদৃশ্য প্রায়। তাহার এই ক্ষুদ্রতা হইতে, চতুর্দিকস্থ পদার্থসমূহের বিশালতা আরও যেন বেশী উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

আমি ব্রমোর ছরারোহ চালুব উপর পদব্রজে উঠিলাম। একটা বন্ধুর সূঁড়ি-পথ, তার পর একপ্রকারের সোপান ধাপ—এই পথ ও ধাপের উপর দিয়া একেবারে চূড়ায় উঠিলাম।

এই শৈল-প্রাচীরের চূড়া হইতে, পাদদেশের গহ্বর দেখা যায়—এই আগ্নেয় গহ্বরটা অতীব বিশাল। শৈল-গাত্রে দ্রব-ধাতু গড়াইয়া পড়িতেছে ; ফিকা হলুদ কিংবা ঘোর-সবুজ রঙ্গের গন্ধকের বড়-বড় পতর। অসংখ্য রন্ধুপথ দিয়া ধূমের ফোয়ারা নিঃসৃত হইয়া খুঁ উচ্ছে উঠিয়াছে। একেবারে তলদেশে, জল টগুবগু করিয়া ফুটিতেছে ; ঐ ফুটন্ত জল পর্যায়ক্রমে ধূসব, সাদা, কালো, সবুজ—এইরূপ বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিতেছে। একটা বাষ্প উঠিতেছে—এই বাষ্প কখন কুয়াসার মত পাতলা কখন মেঘের মত ঘন... সমুদ্র গর্জনের ন্যায় একটা গভীর শব্দ ক্রমাগত শুনা যাইতেছে—যেন সৈকত বেলার উপর তরঙ্গাবাত হইতেছে। সময়ে-সময়ে এই মূল-ধ্বনির সহিত, সোঁ-সোঁ শব্দ, ঘোর গর্জন, ও ব্রজনিবাদ মিশ্রিত হইতেছে...

এই নৈর্গর্গিক নাট্য, নাট্য-সঙ্গীত, নাট্য-

সজ্জা সমস্তই অতীব অদ্ভুত। আমি ভাবিতে লাগিলাম—আমার অন্তরাগ্না যদি ধর্ম্য প্রবণ ও উপধর্ম্যভীরু হইত এবং মধ্যযুগের যোগীদিগের ন্যায় আমার প্রাণ কল্পনা শক্তি থাকিত, তাহা হইলে এই আগ্নেয়গহ্বর দেখিয়া নিশ্চয়ই আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইত : আমার মনে হইত, আমার পাদদেশে একটা নবকের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে—যে নরকে,—প্রেমময় ঈশ্বরের ইচ্ছায়, অসংখ্য পাপী অনন্তকাল ধরিয়া দগ্ধ হইতেছে !

কিন্তু আমি উনবিংশতি শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আধুনিক বিজ্ঞান, আমার অন্তরে শাস্তিতর ভাবের অঙ্কুর, উচ্চতর চিন্তার অঙ্কুর স্থাপন করিয়াছে। বিজ্ঞান নিরাকুলভাবে এই সকল প্রাকৃতিক ব্যাপারের ন্যাথ্যা করিয়া থাকে ; বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, পৃথিবীর গর্ভকেন্দ্রে একটা বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে।—বিজ্ঞানের এই আভাস ইঙ্গিতে, মানুষের কল্পনা ছুটিয়া চলিয়াছে। না জানি এই পৃথিবীর গর্ভে উত্তাপ কতদূর হইতে আসিয়া, আমার নিকটবর্তী এই জলরাশিকে ফুটাইয়া তুলিতেছে ! কি প্রকাণ্ড আমাদের পৃথিবী ! কি প্রকাণ্ড আমাদের পৌরভগৎ—যাহার নিকট আমাদের এই পৃথিবীও একটি ক্ষুদ্র বিন্দু মাত্র ! আর এই সমস্ত অসংখ্য তারা, এই সমস্ত গ্রহ, এই সমস্ত সূর্য্য লইয়া যে

ব্রহ্মাণ্ড—এই ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড, কি অমেয়, কি অসীম !...এই যবদ্বীপের আগ্নেয়-গিরি আমার মনে অনন্তের ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছে—তারা-সঙ্কুল নির্মেঘ আকাশ দর্শনে ষেক্রপ অনন্তের ভাব উদ্বোধিত হয়, ইহাও কতকটা সেইরূপ।

আমার এইরূপ মনোভাবের হেতু নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতে করিতে, ব্রহ্মের শিখরে উঠিয়া, বিরাট্-রস (sublime) সম্বন্ধে ক্যান্টের (kant) সিদ্ধান্ত আমার মনে পড়িয়া গেল। ক্যান্টের মতে,—মানুষ যখন যুগপৎ আপনাকে ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ক্ষুদ্র জীব ও জ্ঞান-নীতি সম্পন্ন উন্নত জীব বলিয়া মনে করে, তখনই মানুষের মনে বিরাট্-রসের আবির্ভাব হয়। ক্যান্ট যেভাবে বিরাটের অর্থ করেন, সেই অর্থে এই যবদ্বীপের আগ্নেয়-গিরি, বিরাট্ ভাবোদ্দীপক। এই সকল আগ্নেয় গিরি আমাদের মনে অনন্তের ভাব উদ্বোধিত করে ; পক্ষান্তরে ইহাও মনে করাইয়া দেয়, প্রকৃতি যতই বৃহৎ হোক না কেন, মানুষ প্রকৃতি অপেক্ষা বড়, প্রকৃতি অপেক্ষা বুদ্ধিমান, প্রকৃতি অপেক্ষা প্রীতিভাজন। বিজ্ঞানের দ্বারা মানুষ যখন বাস্তবকে বুঝিতে পারে, মানুষ যখন বিশ্ব-বাসী কতকগুলি জীবের হৃৎক হ্রাস ও সূখ বর্দ্ধন করিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করে, তখনই মানুষ আপনার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

বন্দী।

৩০

হুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আমি বসিয়া-
ছিলাম—অতীতের সমস্ত কথা মনে পাড়তে-
ছিল—স্বপ্নের মত বিচিত্রমধুর কৈশোরের
কথাগুলি! হুর্ভাবনা ও হুশ্চিন্তার এই
ভীষণ কণ্টক, সে কথাগুলি তাহারি পার্শ্বে
যেন সুন্দর, শুভ্র কুসুমের রাশি!

প্রফুল্ল মুখ, নিশ্চিন্ত হৃদয়, উল্লসিত প্রাণ—
কি সে মধুর দিন! উগানের মাঝে ছুটাছুটি
খেলা, সঙ্গীদের প্রাণভরা ভালবাসা, সে কি
সুখ! তার পর কৈশোরের স্বপ্নরাজ্যে
নূতন আলোকের উন্মেষ! নিরাল কাননে
পার্শ্বে ছিল তরুণী সঙ্গিনী!

সুদীর্ঘ টানা চক্ষু, কেশের রাশি, গোর
তলু, রক্তাভ অধর—অপূর্বরূপিণী চতুর্দশী
পেপা! বাগানে আমরা একত্রে কত খেলা
করিয়াছি! কত হাসি, কত গল্প!

কলহেরো অস্ত ছিল না! তার প্রকৃতিটি
ছিল শাস্ত্র মধুর! পাখীর বাসা চুরি করিয়া
হৃষ্টমনে ধীরে ধীরে যখন আমি গাছ হইতে
নামিতাম তার স্নান চোখ দেখিয়া আমি
জ্বলিয়া যাইতাম। সে দিন সে মিনতি করিয়া
বলিয়াছিল, “কেন তুমি বাসা চুরি কর—
আহা, ছোট ছানাগুলি—বড় নিষ্ঠুর তুমি!”
এত বড় একটা বীরত্বের কাজ সারিয়া
আসিতেছি কোথায় সে উৎসাহ দিবে, না,
তিরস্কার! পাখীর বাসা ছুড়িয়া তাহাকে
আঘাত করিলাম! গৃহে ফিরিলে যখন তার
মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার এখানে কি

কি হয়েছে রে?” সে অমনি অসঙ্কোচে
বলিয়া উঠিল, “পড়ে গেছলুম, মা!”

তার পর কতদিন আমার স্কন্ধে ভর দিয়া
নদী তীরে সে বেড়াইয়াছে! কখনো ধীর,
কখনো-বা দ্রুত গতি! তীরে দাঁড়াইয়া নদীর
তরঙ্গ দেখিতাম—সন্ধ্যা নামিয়া আসিত—
চারিদিক ধীরে ধীরে আঁধারে অম্পষ্ট হইয়া
উঠিত—মৃদু সঙ্গীতের মত নদীর জল তটের
কূলে আছাড়িয়া পড়িত—আমাদের কণ্ঠস্বরও
মৃদু হইত! কত গল্প করিতাম—কত
রাজকন্য়ার কথা, বার্থ প্রণয়ের কত করণ
কাহিনী! মাঝে মাঝে কেমন সঙ্কোচে-
সরমে সে মুখ নত করিত!

পেপার হাতের ক্রমাল পড়িয়া গেল—
আমি তাড়াতাড়ি সেখানি তুলিয়া তাহার
হাতে দিলাম—স্পর্শে হাত কাঁপিয়া উঠিল!

সে এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যা! বাগানের
কোণে বাদাম গাছের তলার আমরা
বসিয়াছিলাম।

সহসা পেপা কহিল, “এস খানিক ছুটি!”
সূক্ষ্ম তলুটি লইয়া সে ছুটিয়া চলিল—বোলতার
মত লঘু তার সে গতিটুকু! কেশের শুচ্ছ
উড়িয়া পড়িতেছিল—মাঝে মাঝে গলার সুন্দর
রঙ ফুটিয়া উঠিতেছিল—যেন তামাতে মেঘে
বিদ্যৎ খেলিয়া যাইতেছিল!

একটা কূপের পার্শ্বে সে বসিয়া পড়িল—
ললাটে শ্বেদের বিন্দু মুক্তার মত ফুটিয়া উঠিয়া-
ছিল। আমি তাহার পার্শ্বে বসিয়া পাড়লাম
—সে হাঁকাইয়া পড়িয়াছিল—নিখাস রুদ্ধ হইয়া

যাইতেছিল—কৃষ্ণ পঙ্কের তলে চক্ষু দুটি যেন
শ্বেতপদ্মের মত ! আমি তাহার প্রতি
চাহিয়াছিলাম ।

পেপা বলিল, “একটু পড়ি এস ! এখনো
ত আলো রয়েছে ; বই নেই তোমার কাছে ?”

পকেটে একখানি ভ্রমণকাহিনী ছিল
—তাহার পৃষ্ঠা খুলিলাম । আমার স্কন্ধে
মাথা রাখিয়া সে পড়িতে লাগিল—আমার
পূর্বেই তার পাঠ শেষ হইতেছিল—তার
বুদ্ধিও বেশ তীক্ষ্ণ !

পাঠ শেষ করিয়া আমার পানে চাহিয়া
সে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার পড়া হয়েছে ?”
আমি তখন সবেমাত্র পড়া শুরু করিয়াছি !

আমাদের উভয়ের কেশাগ্র পরস্পর
স্পর্শ করিল, তার নিখাস বায়ু আমার গালে
লাগিল, তার পর উভয়ের ওষ্ঠও মিলিল !
আবার যখন বই খুলিলাম, তখন মাথার
উপর এক আকাশ নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে !

গৃহে ফিরিয়া সে ডাকিল, “মা, মা, আজ
আমরা খুব ছুটেছি !” আমার মুখে কথা
বাধিয়া গেল !

তিনি বলিলেন, “তুই যে কিছু বলছিস
না রে ? তোর মুখ যে শুঁথয়ে গেছে—
মনে দুঃখ হয়েছে নাকি কিছু ?”

দুঃখ ! আনন্দে আমার হৃদয়ের দুই কূল
যে ছাপিয়া গিয়াছে ! সেই স্নিগ্ধ সুন্দর সন্ধ্যার
কথা, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত অবধি ভুলিতে
পারিব না যে !

জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত—? হায়, তার আর
বিলম্বই বা কি ?

কয়টা বাজিয়াছে জানি না ! কিসের

একটা মিশ্র শব্দ ভ্রমর-শুঞ্জরের মত কাণে
আসিতেছে ! বুঝি আমারি শেষ চিন্তাগুলি
মাথার মধ্যে এক বিরাট কোলাহল বাধাইয়া
দিয়াছে !

আমার অপরাধের কথা ভাবিতে সর্ব্বাগ
শিহরিয়া উঠিতেছে, কিন্তু এ অনুতাপ আর
কতটুকু সময়ের জন্তই বা !

দণ্ডের পূর্বে অনুতাপের বোঝা যে বৃকে
চাপিয়াছিল, এখন মৃত্যুর কথা ছাড়া আর
কিছুর জন্য ত আমার হৃদয়ে স্থান নাই !
অতীতের কথা ভাবিতে গেলেও—ফাঁসির
রজুর কথাটা যে ভুলিতে পারি না ! মধুর
শৈশব, গৌরবোজ্জ্বল কৈশোর, আজ এমনি
রক্ত মাখিয়া সে অবসিত হইবে ! অতীত
ও বর্তমানের মধ্যে একটা রক্তনদীর ব্যবধান !
যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া আমার এ জীবনের
কাহিনী পাঠ করেন ত ঘৃণায় বিভীষিকায়
কতখানি তিনি শিহরিয়া উঠিবেন ! এ কি
বিশ্বাসের যোগ্য কথা ! কি রক্তপিপাসী আইন !
হা নিষ্ঠুর মানুষ—আমি কি এমনি মন্দ ?
না, কখনো না !

আর কয় ঘণ্টা পরেই সকল চিন্তা সকল
ভাবনার সুগভীর সমাপ্তি ! অথচ সে আজ
কত দিনই বা, যখন শুদ্ধ স্বাধীন দিতে নদীর
তীরে, বৃষ্ণের তলে, পত্র-মর্ষর পথে স্বচ্ছন্দ
গতিতে বেড়াইয়া আমার দিন কাটিত !

আমার এ রক্ত ঘরেরই অনতিদূরে সুখের
গৃহগুলি তরুণতরুণীর সুখগুঞ্জন, ও শিশুর
ন্দলোচ্ছ্বাসের বিহ্বল রাগিনীর উচ্ছ্বাসে
পরিপূর্ণ—আশা-নিরাশার ও সুখ-দুঃখের তার
লইয়া অসংখ্য নরনারী পথে চলিয়াছে !

বালকের দল হাঁকিয়া সংবাদপত্র বিক্রয় করিতেছে! জীবনের কি বিরাট ক্ষুধা চারি দিকে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে, আর আমি?—কিন্তু আর কেন সে চিন্তা!

পুরানো এক দিনের কথা মনে পড়ে। তখন আমি বালকমাত্র! নোতরদমের ঘণ্টা দেখিতে আসিয়াছিলাম। অন্ধকারে আঁকা-বাকা বিস্তর সোপান অতিক্রম করিতে আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল—উপরে উঠিয়া দেখি মাথা পারি সহর যেন আমার চরণতলে বিচিত্র গালিচার মত বিছানো রহিয়াছে!

তারপর ঘণ্টা দেখিলাম! কি সে প্রকাণ্ড ঘণ্টা! কিন্তু আমি পারি সহর দেখিতে-ছিলাম—নোতরদমের গগনস্পর্শী ভবনশির হইতে নিম্নে পথের লোকগুলোকে পিপীলিকার মত ক্ষুদ্র দেখাইতেছিল! এমন সময় সহসা আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া ভীমরোলে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—বজ্রের মত ভীষণ সে নিনাদ! চূড়া কাঁপিয়া উঠিল! আমার পা কাঁপিয়া গেল আমি মেঝের উপর বসিয়া পড়িলাম—স্কন্ধ নিকরক পাষণের মত আমি বসিয়া-ছিলাম! ঘণ্টাধ্বনি খামিয়া গেলেও তার প্রতিধ্বনি অসংখ্য ভ্রমণগুঞ্জের মত কাণে আসিয়া লাগিতেছিল!

আজো আমার তেমনই মনে হইতেছে! ঘণ্টাধ্বনি নাই, তবু যেন চারিধারের কোলাহল একটা অস্পষ্ট শব্দের বজ্রের শ্রুতিটাকে ভরাইয়া তুলিয়াছে—আমার ললাটের শিরগুলাও দপ দপ করিতেছে! ছায়ার মত অস্পষ্ট যেন আমি দেখিতেছি—আমারি চারিদিকে অসংখ্য নরনারী হর্ষকোলাহলে মাতিয়া চলাঘেরা করিতেছে, তাদের উল্লাসের

চীৎকার না ঐ শুনা যায়! আর আমি নিস্পন্দ জড়ের মত বসিয়া রহিয়াছি—কোথায় শান্তি—কোথায় আরাম!

৩৪

ভিলা হোটেলের স্ক্রু চূড়ার গায়ে স্থাপিত বিচিত্র ঘড়িটা যে ঐ দেখা যায়! প্লে দী গ্রীভের পক্ষ কঠিন প্রাচীরের দিকেই ঘড়িটা যেন চাহিয়া রহিয়াছে! কতকালের প্রাচীন জীর্ণ প্রাচীর—রং কালো, এমন কালো যে দীপ্ত সূর্য্য কিরণেও তার সে কৃষ্ণাভা দূর হয় না!

যেদিন কাহারো জীবন ফাঁসির রজ্জু ধরিয়া অজানা লোকের ভীমাক্রমের ঝুলিয়া পড়ে সেদিন প্লে দী গ্রীভের সকল দ্বারগুলার সম্মুখে অসংখ্য প্রহরীর চক্ষু যেন কি এক কোতূহলের দৃষ্টি লইয়া জাগিয়া উঠে; হতভাগ্য মরণপথের যাত্রী সে ব্যগ্র দৃষ্টির একমাত্র লক্ষ্য! লুক্ক দৃষ্টির সম্মুখে সে আপনার জীবনের সকল কাহিনী শেষ করিয়া দেয়, আর সন্ধ্যার স্নানিয়ার মধ্যে দীপ্ত চন্দ্রের মত হোটেলের ঐ জলন্ত ঘড়ি ফুটিয়া উঠে!

৩৫

একটা বাজিয়া পনেরো মিনিট হইয়াছে!

আমার এখন অবস্থাটা! মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা! যেন কে মাথার মধ্যে আগুন জালিয়া দিয়াছে! যখন বসি, কিম্বা উঠিয়া দাঁড়াই, মনে হয় মাথার মধ্যে কিসের একটা রুদ্ধ শ্রোত যেন আমার মাথার খুলি বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া যাইবে।

কেমন একটা আতঙ্কে সারা অঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে। অজুলি হইতে লেংনী খামিয়া

পড়িতেছে—হাতে যেন একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ লাগিয়াছে !

দুই চোখের কোণ জলে ভরিয়া গিয়াছে, যেন আমি ধূমাচ্ছন্ন ঘরের মধ্যে বসিয়া আছি ! বাহুমূলে কি একটা বেদনা ! কিন্তু আর পোনে তিন ঘণ্টা মাত্র ! তাহার পর আমার সকল যন্ত্রণা জুড়াইবে—আঃ, চিরদিনের জন্ত বিরাম লাভ করিব ! সে কি তীব্র অসহ সুখ !

৩৬

কেহ বলেন, যন্ত্রণা—সে-ত কিছুই নহে—বিজ্ঞানের এমনি অপূর্ব কৌশল যে মৃত্যুর পথে যন্ত্রণা আমার মোটেই হইবে না ! যন্ত্রণা কিছু নয় ?

এই ছয় ঘণ্টা ধরিয়া আমি যে বেদনায় সারা হইয়া যাইতেছি—ইহাপেক্ষা মৃত্যুযন্ত্রণা কি এমন ভীষণ ? এই যে প্রতিমূহূর্ত্তি এমন ধীরগতিতে চলিয়াছে—আমার মনে হইতেছে সে কি দ্রুত ! বেদনার অসংখ্য সোপান বহিয়া মৃত্যালোকে চলিয়াছি ! কি অসহ এ যন্ত্রণা !

তবু, ইহা কিছুই নয় ?

প্রতি শিরা হইতে যেন রক্ত বরিয়া

পড়িতেছে ! বুকের উপর কে যেন পাষণ ভার চাপিয়া ধরিয়াছে—খাস রুদ্ধ হইয়া আসে !

কি এ যন্ত্রণা ! বুঝিবে কে, বুঝাইবে বা কে ? ফাঁসির পরমূহূর্ত্তে, দ্বিখণ্ডিত নরশির যদি একবার আসিয়া এ বেদনাটা বুঝাইতে পারিত তবে আর যাই বলুক বিজ্ঞানের কোণলের তারিফ্ সে নিশ্চয়ই দিত না—কখনো না !

চক্ষের পলক পড়িবারো অবকাশ মিলিবে না । এখন সব সমাধা হইবে ! এই যে অসংখ্য কোঁতুহলী দর্শক, এই যে অগণ্য রাজপুরুষের দল,—ইহারা এ যন্ত্রণার মাত্রা কি বুঝিবেন ! ভীষণ রজ্জু এখন একটিনিমেষে কণ্ঠ চাপিয়া ধরিবে—সমস্ত শিরার মুখ সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে দেহের রক্ত স্তম্ভিত হইয়া যাইবে ! সমুদ্রের গতি রুদ্ধ হইলে রোধে সে যেমন ফুলিয়া উঠে,—তেমনি বাধা পাইয়া সমস্ত ভিতরটা ছুটিয়া বাহির হইবার জন্ত যে বিরাট দ্বন্দ্ব বাধাইবে, হা রে হতভাগ্য, তাহারি নিষ্ঠুর ভীষণ চাপে সব শেষ ! ভিতরে বাহিরে প্রবল সংঘর্ষ—সে কি ভয়ঙ্কর !

ক্রমঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ।

সূর্য ও সৌরজগত ।

সূর্যদেবকে আমাদের আয়ত্তাধীন করিতে পারিলে এ পৃথিবীতে কিরূপ অভিনব ঘটনা সম্ভব, এই বিষয় লইয়া বিলাতের টাইমস্ (Times) পত্রিকায় একটি মনোহর প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে । প্রবন্ধকার লিখিতেছেন—

“একবার এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিদকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে তাঁহার মতে গত শতাব্দীর কোন্

আবিষ্কৃত্যটিকে মানব-সমাজের পক্ষে যুগান্তকারী বলিয়া তিনি মনে করেন । তিনি উত্তর করিলেন, “সাধারণ দোকানে যে একপ্রকার খেলনা বিক্রয় হয়, যাহার মধ্যে দুইটি ছোট ছোট চাকা সূর্যরশ্মির প্রভাবে আপনি ঘুরিতে থাকে, সেইটিই তাঁহার মতে অতীত যুগের সর্বপ্রধান আবিষ্কৃত্য ।”

বস্তুতঃ কিছুদিন পূর্বে অধ্যাপক নুফেন্ডে

(Fessenden) বায়ুর বেগ ও সূর্য্যতাপের শক্তিকে মানুষের কাজে লাগাইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে স বিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তৎনস্তেও আজিও যে আমরা ইহাদিগকে লইয়া খেলা করা ভিন্ন অণু কিছু আবশ্যকীয় ব্যবহারে ইহাদিগকে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছি এরূপ কোন প্রমাণ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে সম্ভাবনার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন তাহা যে নিতান্তই কল্পনা মাত্র তাহাও নহে।

যদি কোনদিন আমরা সূর্য্যতাপের শক্তিকে আমাদের নিত্যকর্মে নিযুক্ত করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে আমাদের আর্থিক অবস্থারও যে বিশেষ উন্নতি ঘটিবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। অধ্যাপক ফেসেন্ডেন্ একটু বিদ্রূপের সুরে বলিয়াছিলেন যে সূর্য্যতাপ প্রয়োগ করিবার পক্ষে ইংলণ্ড বেশ উপযুক্ত স্থান নহে। তবে সেই সঙ্গে সাস্থনা স্বরূপ ইহাও বলিয়াছিলেন যে ইংলণ্ডের বায়ুর বেগ সাধারণত বেশ প্রবল। এ বিষয়ে ভূতত্ত্বভাগী মাত্রই সাক্ষ্য দিতে সক্ষম। উত্তরের এই তুষারাক্ষর দেশে সূর্য্যরশ্মি বেরূপ চঞ্চল অস্থায়ী, তাহাতে এদেশে সূর্য্য শক্তির অধিক ব্যবহার সম্ভব নহে সত্য।

এ বিষয়ে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বড়ই সুবিধা। এ সকল দেশে সূর্য্য হইতে উদ্ভূত শক্তিকে সঞ্চিত ও নিযুক্ত করিবার পক্ষে অনেক সুবিধা। প্রথমে হয় ত মনে হইবে এরূপ আবিষ্করণ যদি কোনও দিন সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে পরিণামে সভ্য জগতের সমস্ত প্রাধান্যই নষ্ট হইবে! যে সকল দেশে স্বাভাবিক সম্পদ অধিক, স্বাভাবিক উর্বরতা অসাধারণ, পরিশ্রম করিবার অন্ত অগণ্য লোক অল্পমূল্যে পাওয়া সম্ভব এবং সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা স্থলভে শক্তিলাভ করা যায়, সে সকল দেশের নিঃকট কালে উত্তরের সভ্য জাতিদের পরাজয় অনিবাধ্য। কিন্তু অধ্যাপক ফেসেন্ডেনের স্বপ্ন সত্য হইলেও পৃথিবীর রাজনৈতিক ও আর্থিক কেন্দ্রস্থল কি কোন কালেও উচ্চ কটিমণ্ডলে স্থানান্তরিত হওয়া সম্ভব?

আমাদের ত তাহা মনে হয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন

জাতিদিগের মধ্যে প্রাধান্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা কোনও দিনই নির্দিষ্ট হইবার নহে, মানবসমাজের চরিত্র ও গুণই উচ্চ নীচ স্থান স্থির করিবে। সূর্য্যশক্তি ব্যবহারের অপেক্ষা মানব শক্তি ও উৎসাহের সাধনাই ভবিষ্যতে পার্থিক উন্নতির প্রধান নিয়ন্তা হইবে।

দেশের জলবায়ুই মানবের গতিশক্তির প্রধান নিরূপক। আমরা চিরদিনই দেখিতেছি যে শীতপ্রধান দেশের জলবায়ুর সহিত যাহাদিগকে অবিরাম সংগ্রাম করিতে হয়, তাহারা স্বভাবতঃ এরূপ মল, সতেজ ও কঠিন হয় যে মানবের ইতিহাসে তাহারাই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। বিজ্ঞানের যাদুমন্ত্র জলবায়ুর প্রবলতর ও সজীবতর শক্তিকে পরিবর্তিত করিতে কোনদিনই পারে নাই। হিমপ্রধান দেশের দুর্জয় প্রকৃতির সহিত যাহারা যুগযুগান্তর ধর্ম্মনা যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে, কোন নূতন আবিষ্করণই তাহাদের অন্তর্জাত শক্তিকে নষ্ট করা সম্ভব নহে। কঠোর প্রকৃতির মধ্যে লালিত হইলে যে শ্রেষ্ঠ অন্তর্শক্তি জাগিয়া উঠে, নগরের বিলাসবহুল জীবন তাহা আজিও নষ্ট করিতে পারে নাই এবং আরও দুই চারিশত বৎসরেও যে পারিবে এরূপ মনে হয় না।

অনেকে বলিতে পারেন যে সভ্যতার অভিযুক্তি গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিল। এ কথাটা সম্ভবতঃ সত্য, কিন্তু সভ্যতার আদি জন্মভূমি যে ঠিক কোথায় তাহা আজিও স্থির হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ভূপৃষ্ঠ খনন করিয়া অনেক প্রোথিত নগর আবিষ্কার করিতেছেন সত্য, কিন্তু সভ্যতার প্রথম প্রভাত যে কোন্ দেশবিশেষে হইয়াছিল, আজিও তাঁহারা তাহা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা আমাদের প্রাচীন নানা জাতির কথা বলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা আজও সেই সকল জাতির উৎপত্তির এমন কোনও যুক্তি-সঙ্গত নিষ্পত্তি করিতে পারেন নাই যাহা দ্বারা আমরা তাহাদের পূর্ব্ববর্তী কালের আভাষ পাইতে পারি। যতদূর জানা যায় তাহাতে মনে হয় যে প্রাচীনতম সভ্যজাতিরা পার্শ্ববর্তী বা উত্তর দিকেই অগ্রসব হইয়াছিলেন, দক্ষিণে অগ্রসর হইতে বড় একটা দেখা যায়

না। ভারতবাসীর ঞায় যাহারা দক্ষিণে গমন করিয়া-
ছিলেন, তাহারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জলবায়ুর প্রভাবে
অবিলম্বেই কোমল প্রকৃতি হইয়া পড়িয়াছিলেন।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে সকল শ্রেষ্ঠ সভ্যতার দৃষ্টান্ত
দেখা যায় তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই জন্ম হইতেই
একটা আশু ও অকাল অধঃপতনের বীজ দেখিতে
পাওয়া যায়। রাজপুতেরাই কেবল প্রবল শৌর্য
বীৰ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, কারণ বালুময় মরুর
মধ্যে জীবনধারণ করিতে তাহাদের যে নিত্য সংগ্রামের
আবশ্যক হইত, তাহা অনেকটা উত্তর দেশের কঠোর
অবস্থার অনুরূপ। এই কারণেই আরবগণ প্রবল-
তেজে চতুর্দিক মথিত করিয়া বেড়াইয়াছিল। কিন্তু
তাহারা তাহাদের উত্থানের অব্যবহিত পরেই উত্তর
দেশের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। যে সকল বিজয়ী
জাতির কীর্তিকলাপ পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হইয়া
আছে, তাহাদের অধিকাংশই জনহীন শস্যহীন কঠোর
পার্বত্য ভূমি হইতে উৎপিত, প্রকৃতির ভীষণ লীলার
মধ্যেই তাহাদের চরিত্র গঠিত ও পুষ্ট; যে সকল
অবস্থার মধ্যে মানুষ সর্বাপেক্ষা বলবান, কর্মক্ষম হয়
ও শ্রেষ্ঠত্বলাভ করে, ঠিক সেই সকল অবস্থার মধ্যেই
তাহারা পালিত। আর অন্তহীন সৃষ্টিবিরণ মনুষ্যকে
অধঃপতনের পথেই অগ্রসর করিয়াছে। মানব সমাজ
চিরদিন এই একই নিয়মে চলিবে বলিয়া আমার
বিশ্বাস। সুতরাং অধ্যাপক ফেসেন্ডেনের শৌর
শক্তিভাণ্ডার একটা সম্ভব ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত
হইবেও, ইয়ুরোপবাসীর ভীত হইবার কোনই কারণ
নাই।

এই স্থলে ইহাও বলিয়া রাখা কর্তব্য যে শীত-
প্রধান দেশের জাতিগণ হইতে অসংখ্য ব্যক্তি নূতন
জলবায়ুর দেশে যাইয়া বাস করিতেছে, কিন্তু আজিও
তাহাদের ষথার্থ কোনও অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া বুঝা
যায় না। গত তিন শতাব্দীর মধ্যে ইয়ুরোপ হইতে
লক্ষ লক্ষ লোক নূতন নূতন মহাদেশে যাইয়া বাস
করিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ
আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসী প্রায় সকলেই
প্রাচীন পৃথিবীর উত্তর দেশ সমূহ হইতে আগত।

আমরা এখানে থাকিয়া অনেকেই মনে করি যে যাহারা
সমুদ্রপারে দেশান্তরে গিয়াছে তাহাদের চরিত্রে আর
কোন পরিবর্তন হইবে না। অনেক সময়ে আমাদের
মনে হয় যেন তাহাদের চরিত্রে আমরা নূতন গুণের
পরিচয় পাই, কিন্তু অন্তরে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে
যাহারা দেশান্তরে গিয়াছে, চরিত্রগত তাহারা আমাদের
অনুরূপই আছে। মোটের উপর এ কথা আজিও
সত্য হইতে পারে বটে, কিন্তু চিরদিন এরূপ থাকিবে
না বলিয়াই বোধ হয়। মানবসমাজের অভিব্যক্তির
পক্ষে তিনশত বৎসর এক মুহূর্ত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ
অধিক হইলেও হইতে পারে। আমাদের এ অভি-
বাক্তি যে কত লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসি-
তেছে তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। পৃথিবীর আদি-
কালের মানুষের ভঙ্গুর অস্থি এতদিনে লোপ পাই-
য়াছে সত্য, কিন্তু পর্বত পাষাণে এখনও তাহাদের
অস্তিত্বের ক্ষীণ স্মৃতি জাগিয়া আছে।

যে সকল জাতি আজ নব নব দেশে যাইয়া বাস
করিতেছে, তাহাদের বাহ্যিক জাতিগত গর্ব, স্বদেশ-
প্রেম বা রাজনৈতিক ভাবের অন্তরালে যে ষথার্থ
জাতীয় চরিত্র প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা চিরদিন একই
ভাবে থাকিবে কিনা, তাহা আজ বলিতে যাওয়া
দূরদৃষ্টির প্রতি কিছু অথবা অত্যাচার করা হইয়া
পড়ে। এক থাকিবে বলিয়া ত মনে হয় না। কিন্তু
তাই বলিয়া এখন হইতে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের ভয়
দেখাইলে বিপদের আশঙ্কা যথেষ্টই আছে। এই
যেমন অষ্ট্রেলিয়ায় যাইয়া যে ইংরাজ জাতির চরিত্র
পরিবর্তিত হইতেছে এখন এ কথা বলাটা আমরা
নিতান্ত অন্য় বলিয়াই মনে করি। পাঁচশত বৎসর
পরে অবশ্য সে কথার আলোচনা করা সম্ভব হইবে।
আসল কথা এই যে প্রেম দয়া আশা সাহস ইত্যাদি
আমাদের যে প্রকৃতিগত প্রধান গুণ আছে তাহা কোন
দেশে বা কোন কালেই নষ্ট হইব র নহে।”

অধ্যাপক ফেসেন্ডেনের প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রবন্ধকার
এইরূপ অন্তিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অধ্যা-
পকের প্রস্তাবটা যে কি তাহা এখনও ভাল করিয়া
বলা হয় নাই। বায়ু ও সূর্য হইতে শক্তি গ্রহণ

করিয়া তাহাকে আমাদের কর্ণে নিযুক্ত করাই যে অধ্যাপকের আলোচ্য বিষয় তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। এই সম্বন্ধে তিনি ইংলণ্ডের প্রধান বিজ্ঞান সমিতিতে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা হইতে মনে হয় যে এরূপ শক্তি সংগ্রহ করিয়া আমরা তাহা বাণিজ্যকর্মে নিযুক্ত করিতে পারি। তবে প্রথমেই একটা মহা বাধা এই যে সূর্য্যতাপের পরিমাণ সকল স্থানে সমান নয়। অধ্যাপক ফেসেন্‌ডেন্ বলেন যে ইহা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেক বর্গ ফুটের উপর প্রায় ১৫০ পাউণ্ড ভারের তুল্য, কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহার এ হিসাব বোধহয় আসলের অপেক্ষা কিছু অতিরিক্ত হইবে। অপর কোনও অধ্যাপকের মতে ইহা ৬৩-৪২ পাউণ্ড, আবার অপর একজনের মতে ইহা ৯১-৩৫।

অধ্যাপক ভেরি (Very) যে হিসাব করিয়াছেন তাহা হইতেও আমরা দেখিতে পাই যে সংগ্রহযোগ্য সূর্য্যশক্তি দেশকাল ও অবস্থা ভেদে ভিন্নরূপ হইয়া

থাকে। এরূপ শক্তি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে যে ব্যয় হইবে বলিয়া অধ্যাপক ফেসেন্‌ডেন্ বলিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে এখন কোনও মতামত প্রকাশ করা অসম্ভব, কারণ আবশ্যকীয় যন্ত্রাদির বিষয় তিনি এখনও সাধারণের নিকট কিছুই প্রকাশ করেন নাই।

এই সকল শক্তিভাণ্ডারে সুবিধামত বায়ু চালিত কল থাকিবে, তাহার শক্তিও ইহার সহিত যুক্ত হইবে। অধ্যাপক বলেন, যে সকল স্থানে জলের শক্তি সংগ্রহ করিবার সুবিধা নাই, সেই সকল স্থানে সূর্য্য বা বায়ুর শক্তি অনায়াসেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। দিন দিন খণিক্ত পদার্থের যত অভাব ঘটবে, তাহার পূরণার্থে এইরূপ কোনও একটা উপায় অবলম্বন করা নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই। সূর্য্য ও বায়ু এতদিন আমাদের কাছে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পূর্বে তাহারা রাবণের যেরূপ আক্রমণ করিয়া চলিত একদিন যে আমাদেরও সেইরূপ আক্রমণ হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

বিবিধ ।

পৃথিবীর বয়স ।

বহুকাল হইতেই দুই বৈজ্ঞানিক দলের মধ্যে পৃথিবীর বয়স লইয়া মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিদগণ বলেন পৃথিবীর জন্ম ৩০ কোটি বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানবিদগণের মতে ২ বা ৩ কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর প্রথম জন্ম হয়। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ভূতত্ত্ববিভাগের অধ্যাপক ক্লার্ক ও বেকার সাহেব সম্প্রতি গণনা করিয়া বলিয়াছেন,—বর্ত্তমান পৃথিবীর বয়স ৭ কোটি বৎসরের অধিক নহে এবং ৫ কোটি ৫০ লক্ষ বৎসরের কম নহে। আধুনিক কালের যে সকল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারা সকলেই এক একটা নূতন বয়স স্থির করিয়াছেন; কাহারও

সহিত কাহারও মতের মিল নাই। লর্ড কেলভিন (Lord kelvin) ১৮৬২ সালে গণনা করিয়া বলেন ২ কোটি হইতে ৪০ কোটির মধ্যে, সম্ভবতঃ ৯ কোটি ৮০ লক্ষ বৎসর। ১৮০৩ সালে কিং ও বেরাস (Clarence King and Carl Baras) বলেন ২ কোটি ৪০ লক্ষ বৎসর। ১৪৯৭ সালে পুনরায় গণনা করিয়া লর্ড কেলভিন বলেন ২ কোটি হইতে ৪ কোটির মধ্যে। ১৮৯০ সালে লাপেরাণ্ট (De Lapperant) বলেন ৬ কোটি ৭০ লক্ষ হইতে ৯ কোটির মধ্যে। ১৮৯৩ সালে ওয়ালকট (Charles D. Walcott) বলেন ৭ কোটির অধিক হইবে না। ১৮৯৯ সালে জোলি (J. Joly) বলেন পৃথিবীর

করিয়ছিল ইহারা তাহাদেরই কতকগুলির বংশধর। ইহাদের বাসস্থানের দূরত্ব এবং আচার ব্যবহারের বিশেষত্ব হইতেই তীরযন্ত্রী স্থানের হাটে বাজারে নানারূপ অতি রঞ্জিত কাহিনীর প্রচার হইয়াছে। এ সিদ্ধান্ত ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হয় না।

এখনকার পৃথিবী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বলিতে হইবে। প্যারাগুয়ে হইতে তিব্বত পর্য্যন্ত দেশ আবিষ্কারকের কর্মণ্ড প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। নিষিদ্ধ নগরের মধ্যে কতলোক প্রবেশ করিয়াছে। গুপ্ত নগর এখন কেবল উপন্যাস লেখকের কল্পনা রাজ্যেই অধিষ্ঠান করিতেছে। এ কালে আর প্রচ্ছন্ন শ্বেতকায় জাতির অজ্ঞাতবাসের স্থান নাই।

আফ্রিকার মধ্যস্থল দিয়া এখন রেলের এঞ্জিন ছুটিতেছে। আফ্রিকার মধ্যস্থলে এক অভিনব গৌরজাতি বাস করে বলিলে এখন আর কেহ সহজে বিশ্বাসে করিবে না। হাগার্ড সাহেব তাঁহার উপন্যাসে যে জাতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহারা সম্ভবতঃ বাহিমা জাতি। অনেকে বলেন যে এই জাতি দেখিয়াই আফ্রিকাতে শ্বেতকায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানা প্রকার জনশ্রুতি উঠিয়াছে। তাহাদের বর্ণ বেশ গৌর এবং তাহারা দেশের সাধারণ লোকের সহিত মেশে না। সত্যের সম্মুখে কল্পনা নিতান্তই সংকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

রেডিয়াম রহস্য ।

রেডিয়াম এতদিনে ধাতুর আকারে পরিণত হইল। বর্তমান যুগে যতগুলি অভিনব আবিষ্করণ হইয়াছে ইহা তন্মধ্যে সর্ব প্রধান। ম্যাডাম কুরিই যে সর্ব প্রথমে এই নূতন ধাতু আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন ইহা আরও আনন্দের বিষয়। তিনি ও তাঁহার স্বর্গগত স্বামী উভয়েই এই ধাতুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বহুদিন হইতে অনুমান করিতেছিলেন, এবং এই অজ্ঞাতপূর্ব ধাতু আবিষ্কার করিবার জন্ত নানা প্রকার পরীক্ষা করিতেছিলেন। প্রথমে তাঁহারা উভয়েই পিচব্লেন্ড (Pitchblend) নামে পদার্থের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এই পদার্থ লক্ষ লক্ষ মণ প্রস্তরের মধ্যে বালুকণার স্থায় সামান্য অংশে পাওয়া যায় মাত্র। অসাধারণ অধ্যবসায় ও কৌশলের ফলে ইহারা বহুবৎসরের সাধনার সামগ্র্য সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এতদিনে সেই সাধনার সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হইল। কিন্তু পতিহীনা ম্যাডাম কুরি এখন একাকিনীই উভয়ের চেষ্টার সার্থকতায় আনন্দ সন্তোষ করিতেছেন।

বহুকালের বিপরীত ধারণা সম্বন্ধেও বহুদিন হইতে বৈজ্ঞানিক জগতে এমন সকল সত্য প্রকাশ পাইতে

আরম্ভ হইয়াছিল যে, তাহা দ্বারা অনেকেরই মনে ক্রমে একটা বিশ্বাস জন্মিতেছিল যে, বায়ুর অপেক্ষা লঘু ও জটিল কোন অমিশ্র পদার্থ থাকি সম্ভব এবং হয়ত স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ হইতে বায়ুহিত অল্পজ্ঞান পর্য্যন্ত সেই একই পদার্থ হইতে উৎপন্ন। এক ধাতু হইতে যে অপর এক ধাতু উৎপন্ন করা সম্ভব তাহা রসায়ন নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া এতদিন বিজ্ঞানবিদেরা হাসিয়া উড়াইতেন, কিন্তু এখন আবার তাহা সম্ভব বলিয়া অনেকের মনে বিশ্বাস জন্মিতে আরম্ভ হইল। প্রথমে যখন আবিষ্কৃত হইল যে কয়েকটি ধাতু এমন রশ্মি বিকীর্ণ করে যে তাহারা সাধারণ একটি শুষ্ক কটোথাকের প্লেটে নিজেদের চিহ্ন রাখিয়া দেয়, তখন হইতেই এ বিশ্বাসের উৎপত্তি। যে কেহ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। একখানি শুষ্ক প্লেটের উপর অনেক ভাঁজ কাগজ জড়াইয়া তাহার উপরে একখণ্ড সাধারণ দণ্ডা রাখিয়া দিন। দুই এক মাসের মধ্যেই প্লেটের উপরে সেই দণ্ডা খণ্ডের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া সম্ভব; সকল ক্ষেত্রেই যে দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহা নহে। দণ্ডাটি যদি প্রায় বিশুদ্ধ অবস্থায় হয়, তাহা হইলে প্লেটে

আর কোনও পরিবর্তন হইবে না। ইয়ুরেনিয়াম (uranium) যে গুঁড় প্লেটকে নষ্ট করে এ অপবাদ তাহার বহুকাল হইতেই ছিল। ইয়ুরেনিয়াম সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধাতুগুলির মধ্যে একটি।

ম্যাডাম কুরির এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের পর ইহা বলা সহজ যে সেই গুরুত্বপূর্ণ ধাতু ইয়ুরেনিয়াম নিশ্চয়ই নিজেকে কোন সরলতর পদার্থে চূর্ণ করিয়া, তাহার লঘু অণুগুলিকে চতুর্দিকে ছড়াইয়া ফেলে, এবং এই উপায়ে যাহাতে পেষিত হইয়া ইহা বর্তমান যন্ত্রে পরিণত হইরাছিল, তাহার কতকাংশ পরিত্যাগ করে! কিন্তু রাসায়নিক তুল্য-দণ্ডে যতদূর জানিতে পারা যায় তাহাতে মনে হয় যে এই ভাবে নিজেকে চূর্ণ করিয়া কাগজ ভেদ করিয়া ইয়ুরেনিয়াম যে ফটোগ্রাফের প্লেটকে নষ্ট করে, তাহাতে ইহার ভার বা শক্তি কিছুই কমে না। সুতরাং পনিজ ধাতুর মধ্যে যে এমন কোন বৈজ্ঞানিক অগতির বস্তু বা ধাতু লুকায়িত ছিল যাহা বহুদিনের যত্নশ্রমে আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না ইহাও দেখা গিয়াছিল যে ইয়ুরেনিয়াম মিশ্রিত পদার্থই সকল পদার্থ অপেক্ষা অধিক শক্তি সম্পন্ন। সেই অস্ত্রই যে খনিজ পদার্থ হইতে ইয়ুরেনিয়াম প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্যেই কুরী দম্পতি অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। সেই খনিজ পদার্থ পিচব্লেন্ড।

প্লেটের উপরে কালিমা চিহ্ন পড়া ভিন্ন অল্প কারণেও পিচব্লেন্ডের উপরই ইহাদের প্রথম দৃষ্টি পড়ে। তাড়িৎ পূর্ণ একটি তাড়িৎ পরিচালক দণ্ড এই খনিজ পদার্থের সম্মুখে ধরিলে তাহা একেবারে তাড়িৎ শূন্য হইয়া যায়। ইহার দ্বারা এই প্রমাণ হইতেছে যে এতৎ সংঘর্ষে তাড়িৎ পরিচালক দণ্ডের চতুর্দিকস্থ বায়ু কোন না কোন প্রকারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়া নিজের স্বাভাবিক অপরিচালকত্ব ত্যাগ বলিয়া পরিচালকত্ব লাভ করে। এই দুই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াই কুরি দম্পতি তাঁহাদের কঠোর পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। রেডিয়ামের অন্বেষণ যে সময়ে আরম্ভ হয় ঠিক সেই সময়েই ক্যাথোড (cathode) তাড়িৎরশ্মি, এক্স তাড়িৎরশ্মি (Xrays) এবং অজ্ঞাত বহু প্রকারের অদৃশ অংশ-

বিকিরণ তৎ আবিষ্কৃত হয়। সম্ভবতঃই বিজ্ঞানবিদগণের মনে হইল যে সেই অজ্ঞাত ধাতুর অন্তর্নিহিত পদার্থ হইতেই এক্স তাড়িৎরশ্মি বিকীর্ণ হয়।

কুরি দম্পতি তাঁহাদের পরীক্ষার প্রথমেই দেখিলেন যে কারখানার যে সকল অব্যবহার্য বস্তু ফেলিয়া দেওয়া হয় সেগুলি তাঁহারা যে ইয়ুরেনিয়াম প্রস্তুত করিতে-হিনেন তাহার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও অংশবিকিরণকারী (radio active)। সুতরাং ম্যাডাম কুরি সেই সকল অব্যবহার্য বস্তু লইয়াই তাঁহার পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন।

এহলে একটা কথা বলিবার বিষয়। আজও পর্যন্ত যত রেডিয়াম প্রসবকারী পিচব্লেন্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই অষ্ট্রিয়া দেশে পাওয়া গিয়াছে। ইয়ুরেনিয়ামের চতুর্দিকে যে আবর্জনারূপ পড়িয়া আছে, তাহাই এ পৃথিবীর রেডিয়াম উৎপাদনের প্রধান উপাদান। অষ্ট্রিয়ার গবর্নেন্ট এ সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নহেন। ম্যাডামকুরির রেডিয়াম আবিষ্কারের কথা যেমন প্রচারিত হইল অমনি অষ্ট্রিয়া হইতে পিচব্লেন্ড বা ইয়ুরেনিয়াম কারখানার আবর্জনার রপ্তানি একেবারে বন্ধ হইল। কাজেই রেডিয়ামের উৎপাদন শক্তি অষ্ট্রিয়া একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন বলিলেও হয়। তাহার পরে রেডিয়ামের উপযুক্ত খনিজ পদার্থ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এবং ইংলণ্ডের তিন চারিটি স্থানে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও আজিও অষ্ট্রিয়াই এ বিষয়ে অগ্রগণ্য।

এই রেডিয়ামের অনুসন্ধান করিতে ম্যাডাম কুরির যে বিরূপ একান্ত অধ্যবসায়ের আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা পাঠককে বুঝান অসম্ভব। সহস্র সহস্র মণ প্রস্তরখণ্ড হইতে এক এক চামচ পরিমাণ প্রস্তর লইয়া, ধীরে ধীরে সেগুলিকে তাহাদের অন্তর্নিহিত উপাদানে বিশ্লেষিত করিতে হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে যে গুলির অংশবিকিরণ শক্তি দেখা গিয়াছে সেগুলিকে একত্রিত করিতে হইয়াছে। প্রথমে যখন এই অসামান্য নারী প্রায় দুই শত মণ প্রস্তর হইতে এমন কয়েক বিন্দু নূতন পদার্থ বাহির করেন যাহা অল্পকাল

খন্ডোতের স্মরণ জ্বলিতে লাগিল, তখনই ইহার কঠোর সাধনার প্রথম পুরস্কার লাভ হয়। এই বিদ্বুগুলি অশুদ্ধ রেডিয়াম ব্রোমাইড্। সত্যই যে রেডিয়াম বিদ্বুগুলি জ্বলিতেছিল তাহা নহে, কিন্তু ইহাদের বিকীর্ণ আলোক রশ্মিতে ব্রোরামের (brorium) অংশগুলিকে উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। এই রেডিয়াম ব্রোমাইড অধ্যাপক কুরি লণ্ডন নগরের রয়েল ইনস্টিটিউটে ইংলণ্ডের বিজ্ঞানবিদগণকে দেখাইবার জন্ত আনিয়াছিলেন। এই বহুমূল্য দ্রব্যের মোড়কটি তিনি তাঁহার ওয়েষ্ট কোটের পকেটে করিয়া ইংলণ্ডে আনেন এবং সেই ভাবেই পুনরায় প্যারিস নগরে লইয়া যান। কয়েক দিন পরে তিনি ঠিক সেই পকেটের নীচে গায়ে একটি দাগ দেখিতে পাইলেন। এই দাগটি ক্রমে সাংঘাতিক ষায়ে দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে অশেষ যত্নগা দিতে লাগিল। এই ঘটনা হইতেই পৃথিবী জানিল যে রেডিয়াম অণু পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকিলে এমন তেজ বিকীর্ণ করে যে অসাবধান হইলে তাহা আমাদিগকে নানা প্রকারে কষ্ট দিতে পারে।

এই নূতন সরল পদার্থ রেডিয়ামের ব্যবহারের কথা অনেকে অনেক রকম বলিয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃই তাপ ও আলোক বিকীর্ণ করে। ধীরে ধীরে ইহা যখন অণু কোন পদার্থে পরিবর্তিত হয়, তখন ইহা

প্রভূত পরিমাণে শক্তি ত্যাগ করিতে থাকে। সেই জন্ত অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে ইহা আমাদের এঞ্জিন চালাইবে ও অসংখ্য নানাবিধ আশ্চর্য কার্য করিবে। পরে যখন অধিক পরিমাণে রেডিয়াম প্রস্তুত হইতে লাগিল তখন চিকিৎসকেরা এই পদার্থের সাহায্যে নানা প্রকার ছুরারোগ্য চর্মরোগের চিকিৎসা করিলেন এবং ক্যান্সার রোগীর যত্নগা উপশমের জন্ত ইহা ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু ম্যাডাম কুরি ইহাকে ধাতুতে পরিণত করিয়া রেডিয়াম সম্বন্ধে চরম সফলতা লাভ করিয়াছেন। তাড়িতের সাহায্যে তিনি ব্রোমাইডকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এক প্রকার উজ্জ্বল ধাতু বাহির করিয়াছেন। প্রকৃতির রহস্যময় বিধানে ইহা প্রবল বেগে একত্রিত এবং ক্রমশঃ চূর্ণ হইয়া সরলতর পদার্থে পরিণত হইতোছে এবং বাহিরের বায়ু সংস্পর্শ আনিয়া ধীরে ধীরে অবিরামগতিতে এরূপ উত্তাপ বিকিরণ করিতেছে, যে ইহার সংস্পর্শে এক টুকরা কাগজ আনিলে তাহা তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে

সৃষ্টির কোন আদি অবস্থায় প্রকৃতির প্রবল শক্তির পেষণে এই রেডিয়াম প্রস্তুত হইয়াছিল, আর আজ আমরা এতদিন পরে তাহাকে বিশুদ্ধ অবস্থায় জানিতে পাইলাম। প্রকৃতির রহস্য যেমন নিগূঢ়, মনুষ্য বুদ্ধির চেষ্টাও তেমনি অজেয়।

শ্রীভঃ

পর্তুগালে সাধারণ তন্ত্র।

পর্তুগালের রাজনৈতিক আকাশে অনেকদিন হইতেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। শাসন বিশৃঙ্খলায়, পুরোহিত ও ধনী সম্প্রদায়ের অত্যাচারে পর্তুগালবাসী অনেকদিন হইতেই পীড়িত হইতেছিল। বর্তমান রাজার পিতাকে কয়েকজন উন্নত প্রজাঃপথের মধ্যে যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে বোমা মারিয়া হত্যা করে—তাহা আমরা আজিও

ভুলি নাই। রাজা মালুয়েল যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি প্রজারঞ্জে প্রতীক্ষিত হইয়া অনেককে আশ্বাস দান করেন। কিন্তু শেষে যখন প্রজারা দেখিল দেশের অবস্থা 'যথাপূর্বঃ তথাপরং,' তখন সেনাবিভাগের ও নৌ-বিভাগের কতিপয় অধিনায়ক মিলিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন

এ ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বশবর্তী হইয়া আধুনিক ভাবে প্রতিশোধ বা লাভের চেষ্টা তাহা নহে। স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি করাই



রাজা ম্যানুয়েল ও রাজমাতার ইংলেণ্ডে পলাইয়া আসিবার পরে গৃহীত ফটোগ্রাফ।

বিদ্রোহীদের প্রধান লক্ষ্য। যতদূর জানিতে পারা যায় তাহাতে মনে হয় আডম্বেল রীস (Reis) সাহেবই এই বিদ্রোহের প্রধান সহায় ও অধিনায়ক। পূর্বে হইতেই তিনি রাজপক্ষের সহিত সংগ্রামের সমস্ত হিসাব পূজ্যানুপূজ্যরূপে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনিই বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবেন স্থির ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত আত্মগন্মান বোধের বশবর্তী হইয়া তিনি মধ্যে মধ্যে ভ্রান্ত

অভিमाने এরূপ অসঙ্গত কর্ম করিয়া বসিতেন যে অপরের পক্ষে তাহার তাৎপর্য বুঝিয়া উঠা কঠিন হইয়া দাঁড়াইত। রীস সাহেব স্থির করিয়াছিলেন যে অক্টোবরের প্রথম মঙ্গলবারের রাত্রি ১টার সময়ে বিদ্রোহ আরম্ভ হইবে। স্থির ছিল যে



অ্যাডমিরেল রীস।

তিনি ১টার কিছু পূর্বে এক নৌকা করিয়া কতিপয় সহচর সঙ্গে লইয়া বন্দরের 'সান্ রাকফেল' নামে রণতরির উপর যাইবেন। পরে তথা হইতে এক দল বিদ্রোহী সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া বিদ্রোহ আরম্ভ করিবেন। ইতিমধ্যে গবর্নমেন্ট ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়া পূর্ক হইতেই সাবধান হইতেছিলেন এবং বিদ্রোহীদের ব্যর্থ করিবার নানাবিধ আয়োজন করিতেছিলেন। গবর্নমেন্ট যদি কেবল আশ্রয়কার চেষ্টা না করিয়া অকুরেই ইহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহাদের এত শীঘ্র এরূপ শোচনীয় পরাজয় হইত না। যাহা হউক বিদ্রোহের নির্দ্ধারিত সময়ের

প্রায় এক ঘণ্টা পূর্বে নৌ-সচিব রণতরি-সমূহে টেলিগ্রাফ দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, আবশ্যক হইলে মুহূর্তমধ্যে আক্রমণকারী শত্রুকে পরাজিত করিতে তাঁহারা প্রস্তুত কি না। এই অনুসন্ধান দেখিবামাত্র ষড়যন্ত্রীরা ভীত হইয়া পড়িল। তাহাদের ভয় হইল, বোধ হয় সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের কৌশল ব্যর্থ হইয়াছে এবং বিদ্রোহের সম্ভাবনা একেবারেই নষ্ট হইয়াছে। অ্যাডমিরেল রীস কিন্তু কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। বার বার তিনি তাঁহার সহচরদিগকে নৌকাযোগে রণতরীতে যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মতে গবর্নমেন্ট সাবধান হওয়া সত্ত্বেও বিদ্রোহ ঘোষণা করাই তখন তাঁহাদের একমাত্র কর্তব্য। কিন্তু তাঁহার সহচরেরা দেখিলেন যে এরূপ স্থলে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে কার্যাসিদ্ধি হওয়ার ত সম্ভাবনা নাইই, বিপদের সম্ভাবনা ও আশঙ্কাই প্রবল। এই ভাবিয়া শেষ মুহূর্তে তাঁহারা তাঁহাদের এই কঠোর ব্রতসাধনে পশ্চাৎপদ হইলেন। আর বিলম্ব নাই! নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত! নৌকা অপেক্ষা করিতেছে, রণতরিতে দলবল আত্মদানের জগু উৎসুক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! এমন সময়ে রাজধানী লিসবনের ষড়যন্ত্রীরা তাহাদের অধিনায়ককে উপেক্ষা করিল, ত্যাগ করিল! এই প্রকারে বিদ্রোহের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এ অবস্থায় পরিণামে ব্যর্থতাই অবশ্যস্বাভাবী! অ্যাডমিরেল রীস সমস্ত বিষয়ে স্বয়ং দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি তাঁহার আত্ম-সম্মানবোধ অতি প্রবল ছিল। তাঁহার মনে

ধারণা হটল যে তিনিই তাঁহার স্বদেশকে ও বন্ধুবর্গকে বিপদসাগরে ডুবাইলেন, সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশা সুদূর পরাহত করিলেন। এই সকল অমঙ্গলের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি উন্মাদের ঞায় হইয়া আত্মহত্যা করিলেন। তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। কে যে কি করিবে তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিল না, অনেকের মনে করিল বিদ্রোহেব সকল আশা বার্থ হইল।

কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ এই সময়ে অত্যাচারী অধিনায়ক আসিয়া উপস্থিত হইল। মেকাডো সান্তেস (Machado Santes) নামে এক নৌ-কর্মচারী এই সময়ে অদ্ভুত প্রত্যাৎপন্নমতিত্ব ও নেতৃত্বশক্তির পরিচয় দিলেন। তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় আডমিরেল রোসের অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিদ্রোহের ঞায় ক্ষিপ্রবেগে তিনি সৈনিকগণকে, সাধারণ প্রজা ও ছাত্রবৃন্দকে একত্রিত কাবয়া বিদ্রোহীদের সৈন্যরচনা করিলেন। রাজধানীর পথে পথে আত্মরক্ষার জন্ত প্রাচীর গঠিত করিলেন। এই প্রতিভাবান পুরুষের প্রবল চেষ্টায় রোসের মৃত্যুর প্রায় ৪৫ মিনিট পরে বিদ্রোহের কামান গর্জিয়া উঠিল। সংগ্রামসচিব তখন কোমল শয্যায় নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছেন। প্রধানসচিব তখন নিশ্চেষ্ট হইয়া রাজপ্রাসাদে বসিয়া আছেন। রাজধানীর পথে পথে বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিল। রাজপক্ষীয়েরাও সশস্ত্রে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। বিদ্রোহীদের অসম সাহস ও আত্মোৎসর্গের সম্মুখে তাঁহারা

পদে পদে পরাজিত হইতে লাগিলেন। রাজা মানুয়েল সেই রাত্রেই রাজপরিবার লইয়া রাজধানী ত্যাগ করিয়া জিব্রালটারে পলাইলেন। দুই দিনের মধ্যেই একপ্রকার বিনা রক্তপাতে সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা একটি অভূতপূর্ব ব্যাপার।

যুদ্ধের পবে সাধারণ-তন্ত্রীরা রাজপক্ষীয় সেনাপতি কন্সিরোকে (conciro) ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিলেন রাজা যখন সিংহাসনত্যাগ করিয়াছেন তখন তাঁহার রাজপক্ষ ত্যাগ করাই কর্তব্য। তিনি ঘৃণাভরে তাহাদের সে অনুরোধ উপেক্ষা করিলেন। রাজা যে সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন এ কথা তাঁহার কোনমতেই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি যে বিদ্রোহদমনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন এই কথা স্বয়ং রাজাকে জানাইতে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজপ্রাসাদে গেলেন। কিন্তু রাজা কোথায়! ক্ষোভে অন্ধ হইয়া বিদ্রোহীদের নেতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন— “এখন আমি তোমাদের শাসন স্বীকার করিলাম এবং তোমাদের প্রজা হইতে প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু আমি তোমাদের পক্ষ লইয়া অস্ত্রধারণ করিতে অক্ষম। আমি আমার সেনাপতিত্ব আজ হইতে ত্যাগ করিলাম।” এই সেনাপতির অস্ত্রত্যাগেই বিদ্রোহীদের পরিণামে জয়ী হইল।

পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে অল্পবয়স্ক রাজা মানুয়েল যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে অকস্মাৎ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, আজ তাহা হইতেও অধিক অকস্মাৎভাবে রাজ্যচ্যুত, সিংহাসনচ্যুত হইলেন। কালের খেলা এমনি দুর্লৌধ্য! এক রাত্রির মধ্যে রাজা ভিখারী!

এই প্রসঙ্গে ভারতের সহিত পর্তুগালের সম্বন্ধ বিবরণ কিছু বলিলে বোধ হয় পাঠকের অপ্রীতিকর হইবে না।

আজ পর্তুগাল ইয়ুরোপে এক প্রকার নগণ্য বলিলেও হয়। কিন্তু একদিন এই পর্তুগালই বাণিজ্যব্যাপারে ও সাম্রাজ্য বিস্তারে ইয়ুরোপের অগ্রগণ্য ছিল। পর্তুগাল নাবিকগণ প্রাচ্য জগতের যে কত দেশ ও দ্বীপ আবিষ্কার করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। জলপথ দিয়া ভারতবর্ষে আসবার পথ সর্ব প্রথম পর্তুগালই বাহির করে। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ নাবিক ভাস্কো ডি গামা যেদিন আফ্রিকার গুডহোপ অস্তরৌপ প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া কালিকাটে (calicut) পদার্পণ করেন, সেই দিন হইতেই পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তরের সূচনা হইল। তাহার পূর্বে ভারত ও প্রাচ্য দেশের সহিত সমুদয় বাণিজ্যই আরবদিগের হস্তগত ছিল। এই বহুমূল্য বাণিজ্য হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কৃত হয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও আমেরিকাও সভ্যজগতের সহিত সংযুক্ত হয়। সে সময়ে পর্তুগালের রাজার নাম ছিল এমানুয়েল (Emmanuel)। তাঁহাকে সকলেই সৌভাগ্যবান বলিয়া ডাকিত। কিন্তু তাঁহার প্রজাগণের এই সকল আবিষ্কারের সফলতা যে রাজসাহায্যে বা উৎসাহে সম্পন্ন হইয়াছিল এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের জলপথ আবিষ্কার করিবার পর ভাস্কো ডি গামা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে পুনরায়—ভারতে আগমন করিয়া তিনি মালাবার তীরে একছত্র বাণিজ্যসম্বন্ধ লাভ

করেন। ফ্রান্সিস (Francis at Almeida) ভারতে প্রথম পর্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি। ফ্রান্সিস ভাস্কোর বিজিত রাজ্যে অনেকগুলি কারখানা স্থাপিত করেন এবং সিংহল ও মালডিভ্ দ্বীপপুঞ্জ পর্তুগালের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু ভারতে পর্তুগীজ শাসন কর্তৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠপুরুষ ছিলেন আবুকার্ক (Albuquerque) ১৫১০ খৃষ্টাব্দে গোয়া নগর অধিকারই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁহার এই যুদ্ধজয়ের ফলে পর্তুগালই পারস্য উপকূল হইতে জাপান পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাচ্য জগতের বাণিজ্যের সর্বময় কর্তা রহিল, এবং প্রায় ৬০ বৎসর ধরিয়া পর্তুগালের রাজাই আসিয়ার দক্ষিণ ভাগেব সর্বময় অধীশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। আবুকার্কই সর্বপ্রথম সুরেজ পর্য্যন্ত রণপোত লইয়া অগ্রসর হন। এই বাণিজ্য পথটি তাঁহাদের জাতীয় সম্পত্তি করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সেকালে পারস্য উপসাগরে আর্মাজ নগর এক টি প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। আবু অনেক কষ্টে তাহা অধিকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার খ্যাতি ও শক্তি দেখিয়া রাজদরবারে তাঁহার অনেকগুলি শত্রু জুটিয়াছিল। অরমাজ অধিকার করিয়া ফিরিতেছেন, এরূপ সময়ে গোয়া বন্দরের মুখে একখানি জাহাজ তাঁহাকে তাঁহার কর্মচ্যুতির আদেশপত্র দান করিল। তিনি দেখিলেন তাঁহার একজন চিরশত্রু তাঁহার কর্মে নিযুক্ত হইয়াছে। এ অপমান তাঁহার সহ্য হইল না, তাঁহাকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইল না, পথেই তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার রাজাকে একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহার

শক্রদিগের সন্ধান। যে মিথ্যা তাহা প্রমাণ করিয়া যান এবং তাঁহার গায়তঃ প্রাপ্য পুরস্কারাদি তাঁহার পুত্রকে দিতে অস্বীকার করেন। পত্র পাইয়া রাজার জ্ঞান হইল, কিন্তু তখন আর আবুকে ফিরিয়া পাইবার কোনও উপায় নাই। অগত্যা তাঁহার পুত্রকেই তিনি সম্মান ও সম্পদে ভূষিত করিলেন। আবু প্রকৃতি উদ্ধত ও যথেষ্টাচারী ছিল সত্য, কিন্তু তিনি একপন্থী এবং সুদক্ষ ও গায়পরায়ণ শাসনকর্তা ছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পবে, হিন্দু মুসলমান তাঁহার সমাধি স্তম্ভের নিকটে গিয়া পরবর্তী শাসনকর্তাদিগের অত্যাচার হইতে অব্যাহত লাভের জন্ত তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিত।

যেদিন হইতে পর্তুগাল স্পেন রাজ্যের অধীন হইল এবং স্পেনের সহিত অগ্রাণ্ড ইয়ুরোপীয় গণ যোগদান করিল সেই দিন হইতেই ভারতে

তাহার শক্তির অধঃপতন আরম্ভ হইল। পর্তুগালের শক্তি হ্রাসের আরম্ভেই ডাচেরা প্রাচ্যদেশের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্ত একটি কোম্পানি গঠিত করিল। ১৬০২ হইতে ১৬১০ সালের মধ্যে তাহারা পর্তুগালের প্রাচ্য রাজ্যসমূহ প্রায় সবই অধিকার করিয়া লইল। ভারতে দুই চারটি ক্ষুদ্র স্থান ভিন্ন পর্তুগালের আর কিছুই রহিল না। দক্ষিণ আফ্রিকা, সিংহল ও যবদ্বীপ সমস্তই ডাচেরা অধিকার করিল। পর্তুগাল প্রথমে পথ দেখাইল বটে, কিন্তু পরে ক্রমে ক্রমে অগ্রাণ্ড জাতিবা আসিয়া একে একে ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। ১৬০০ সালে ইংল্যান্ড, ১৬০৪ সালে ফরাসী ও ১৬১২ সালে দীনেমারেরা আসিল। আজিও গোয়া ও যে দু' চারটি ক্ষুদ্র স্থানে পর্তুগাল উপনিবেশ আছে সে সকল স্থানেও সাধারণ তন্ত্রের অধীনে এখন স্বায়ত্ত শাসন স্থাপিত হইতে চলিল।

পৃথিবীর ইতিহাস

বাঙ্গালা সাহিত্যামুরাগী ব্যক্তিমাতেই অবগত আছেন, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় “পৃথিবীর ইতিহাস” সঙ্কলনে উদ্যোগী হইয়াছেন। আমরা এগ্রন্থখানি পাঠ করিবার জন্ত উদ্যোগী হইয়াছিলাম। এক্ষণে “পৃথিবীর ইতিহাস” গ্রন্থের প্রথম খণ্ড-ভারতবর্ষ প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডে প্রাচীন ভারতবর্ষ আখ্যায়, বেদ চতুষ্টয়, ষড়বেদাঙ্গ, ষড়দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র, প্রভৃতি বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা বাধাই কাগজ প্রভৃতি দিব্য পরিপাটি।

গ্রন্থকাব সূচনার বলিয়াছেন, “এই পৃথিবীর ইতিহাস এক বিরাট কল্পনা। অনূন ত্রিংশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। * * * পৃথিবীর সকলদেশের সর্ববিধ জাতব্য তত্ত্ব বাঙ্গালা ভাষায় এই পৃথিবীর ইতিহাসে সন্নিবিষ্ট করিব।” বর্তমান খণ্ড এই সূবিরাট গ্রন্থের ভূমিকা মাত্র।

একের চেষ্টায় এ ব্রত-উদ্যাপন হওয়া দুর্লভ ব্যাপার। বিষয়টি যেমন গুরুতর এবং বিশাল, তাহাতে বিশেষজ্ঞগণের সম্মিলিত চেষ্টা এতৎপ্রতি প্রযুক্ত হইলে সমগ্র বিশ্বের সাহিত্যে

“পৃথিবীর ইতিহাস” এক অভিনব সম্পদ স্বরূপ হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। সম্ভবতঃ, দুর্গাদাস বাবু এরূপ আয়োজনে ক্রটি করেন নাই।

আলোচ্য খণ্ড পাঠ করিয়া আমরা গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসা, পাঠানুবাগ, ও স্মৃগভীষ জ্ঞানের প্রভূত পরিচয় পাইয়াছি। অদ্ভুত

ঠাহার তদ্বসংগ্রহশক্তি, অপূর্ব ঠাহার সরল বিবৃতিভঙ্গী! এক-একটি বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা করিয়া তবে অপর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ এইগ্রন্থ পরবর্তী ঐতিহাসিকগণকে নূতন পথ দেখাইবে, একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। বিষয়েব প্রভূত ও অসীমতার কথা



শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী।

ভাবিয়া দেখিলে, গ্রন্থকারের সহিত স্থানে স্থানে মতভেদ হওয়া বিচিত্র নহে, বরং তাহা একান্ত স্বাভাবিক! তবে গ্রন্থকারের যুক্তি পরম্পরাও নিতান্ত উপেক্ষনীয় নহে! এই টুকুই ইহার বিশেষত্ব! গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া

আরো যুক্তি হইয়াছে আমরা গ্রন্থকারের বিনয় সন্দর্শনে! গ্রন্থকার স্পষ্টই বলিয়াছেন, “আমি যদি কোন নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হই, পাঠকমাত্রকেই যে তাহা মানিয়া লইতে হইবে, সেরূপ স্পর্ধা সেরূপ উদ্দেশ্য আমার

আদৌ নাই।” তিনি শুধু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রচলিত সাধারণ মত পরম্পরার পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন ; অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীগণ কোন্ বিষয় কিভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন তাহারি আভাসমাত্র দিয়াছেন ; প্রাচীন বিষয়ের আলোচনার প্রধানতঃ শাস্ত্র মতেরই তিনি অনুসরণ করিয়াছেন ।

আবো দুই চারি খণ্ড না দেখলে গ্রন্থের প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে আমরা স্পষ্ট কিছু ধারণা করিতে পারিতোঁছি না, তথাপি এইটুকু বালতে পারি “পৃথিবীর ইতিহাস” বাঙ্গালা লাহোরী-টিকে অপূর্ণ শোভায় ভূষিত করবে ! যে বয়সে সকলে বিশ্বাসেব জগৎ লাগায়িত হইলেন, দুর্গাদাস বাবু সেই বয়সে এই মহাব্রত সাধনে উত্তোঙ্গী হইয়াছেন, তাঁহার এ অধাবসায় ও জ্ঞানচর্চা সকলের পক্ষে অনুকরণীয় ! তাঁহার সাধু সঞ্চল সফল হউক, বঙ্গভাষা ধন্য হইবে ! গ্রন্থের দুই একটি ছোটখাট ক্রটি অ’মাদিগের

চোখে পড়িয়াছে তৎপ্রতি গ্রন্থকারের মনো-যোগ আমরা সবিনয়ে আকর্ষণ করিতেছি । মাঝে মাঝে একদেশদর্শিতা এবং ব্যক্তিগত উচ্চাসেব প্রাবল্য ঘটিয়াছে । ঐতি-হাসিককে রীতিমত উদার ও সমদর্শী হইতে হইবে, ব্যক্তি বা জাতিধর্মগত পক্ষপাতিত্বে ইতিহাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় একথা প্রবীণ গ্রন্থকার মহাশয়কে নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না । তবে স্বজাতি বা স্বদেশের গৌরব স্বার্থে ভাবের রশ্মি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া পড়া সম্ভব ও স্বাভাবিক । তাই বিশেষ করিয়াই কথাটির উল্লেখ করলাম । পরিশেষে সাহিত্যানুরাগী, বঙ্গীয় ভূম্যাধিকারীগণের আদর্শস্থানীয় দানশীল, মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় এই খণ্ডের বায়ভার সম্পূর্ণঃ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন । এজগৎ সাধারণের তরফ হইতে তাঁহাকে আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেওঁছি ।

অনারে বল মিষ্টার সায়েদ আলি ইমাম ।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ মহাশয় ভাবতেব ব্যবস্থাসাচকের পদ ত্যাগ করায় লর্ড মিণ্টো ও লর্ড মালি মাননীয় আলি ইমামকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছেন । ইঁহার এই নিয়োগে আমরা আন্তরিক সুখী হইয়াছি । মুসলমান সমাজ ভারতে হিন্দু সমাজের পরেই, সুতরাং এবার মুসলমান সমাজ হইতে এই পদের জগ্ন লোক নির্বাচিত হওয়াতে মুসলমানদের স্বাভাবিক অধিকারকে

স্বীকার করাই হইয়াছে । তা ছাড়া মিষ্টার আলি ইমাম মুসলমান সমাজের মধ্যে একজন শিক্ষিত ও যোগ্য ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । ইঁহার পরিবারের সকলেই বংশানুক্রমে মুসলমান সমাজের মধ্যে শিক্ষা ও পদে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন । ইঁহার ভ্রাতা আমাদের জাতীয় মহাসমিতির একজন প্রধান সভ্য ও সহায় । তাঁহার শিক্ষা ও উদারতার বিষয় আমরা সকলেই

জানি। মিষ্টার আলি ইমামের প্রতিভার তিনি যে এই কঠিন কর্তব্য ভার গ্রহণ
বা শাসন-শক্তির কোন বিশেষ পরিচয় করিয়া সকলের শ্রদ্ধা ও প্রশংসাতে
আমরা এখনও পাই নাই সত্য, কিন্তু সমর্থ হইবেন এরূপ আশা করা বাইতে



অনারেবল মিষ্টার স্যেদ আলি ইমাম।

পারে। ইনি পূর্বে বাঁকিপু্রে ব্যারিষ্টার করিতেন। তখন ইঁহার পরিচয় আমরা বড় একটা জানিতাম না। পরে 'মোসলেম-লিগ' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই আমাদের তাঁহার সাহিত্য প্রথম পরিচয় হয়। এখন তিনি কালকাতা হাইকোর্টে গবর্ণমেন্টের ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল পদে অধিষ্ঠিত।

এরূপ পদ হইতে কাউন্সিলের মেম্বার পদ প্রাপ্ত এদেশে নিতান্ত বিরল। কিন্তু ইহা আমাদের সৌভাগ্যই বলিতে হইবে। কেননা এখানে গুণেরই আদর প্রকাশ পাইতেছে। সর্বক্ষেত্রে সর্বতোভাবে গুণের সমাদরই যথার্থ পক্ষে দেশের পক্ষে প্রল্যাণ প্রদ। এই প্রসঙ্গে একটা কথা কর্তৃপক্ষকে বলা আমরা সঙ্গত বিবেচনা কর। বিলাত হইতে যখন বিলাতী সচিব নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল তখন তাঁহার ব্যারিষ্টার হওয়া

আবশ্যক বলিয়া স্থির হইয়াছিল। ভারত হইতে ভারতবাসী যখন এই কর্মে নিযুক্ত হইবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে তখন—কি ব্যারিষ্টার কি প্লিডার যোগ্যতামুদারে আইন ব্যবসায়ী মাত্রেরই এ পদ লাভে অধিকার থাকা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, মাননীয় শামসুল হুদা ইত্যাদি প্রতিভাবান লোকেবা যে আইন বিষয়ে ব্যারিষ্টার অপেক্ষা অল্প বা ব্যবস্থাসচিবের কর্মের পক্ষে অনুপযুক্ত এ কথা কোন মতেই বলা যাইতে পারে না। গুণের যথার্থ আদর করিতে হইলে কোন গণ্ডী বিশেষের মধ্যে অন্বেষণ করা ঠিক সঙ্গত নহে। আমরা আশা করি গবর্ণমেন্ট যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডার বেড়া যাহাতে শীঘ্র ভাঙিয়া যায় সে বিষয়ে চেষ্টা করিবেন।

কবি রজনীকান্ত সেন।

পাবনা সিম্বলনীর বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

রজনীকান্তের ক্ষুদ্র জীবন কেবলমাত্র ৪৪ বৎসরের সমষ্টিমাত্র। এই অনতিদীর্ঘ জীবনের মধ্যে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সাহিত্য এমন ভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহার বিচ্ছেদ আমাদের সাহিত্যের পক্ষে গুরুতর ক্ষোভের বিষয়।

১২৭২ সালের ১৭ই শ্রাবণ সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে রজনীকান্ত জন্ম গ্রহণ করেন। কর্তব্যপরায়ণ পিতার সম্মেহপালনে তাঁহার কিশোর জীবন

বিকশিত হইয়া উঠে। পুত্রের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির দিকে এই পিতার অনলস সতর্ক দৃষ্টি দেবতার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদে স্তায় কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে। বালক রজনীকান্ত অটুট স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্তি ছিলেন। ব্যায়ামের প্রদর্শনীতে প্রতিবারই তিনি প্রথম অথবা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেন। পুরস্কারও কোনবার ফাঁক যায় নাই। আর তাঁহার মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে বঙ্গীয় পাঠকের নিকট আমাদের বিশেষ করিয়া কিছু বলিতে হইবে

না,—তাঁহার বাণী, কলাগী এবং অগ্ৰাণ্য কবি তাই সে বিষয়েব শ্রেষ্ঠ পরিচয় ।

রজনীকান্তের পিতা গুরুপ্রসাদ দুর্লভ কবিত্ব সম্পদেব অধিকারী ছিলেন । তাঁহার “পদচিত্তা মণিমালা” একখানি সুবৃহৎ কাব্য গ্রন্থ । ভাবে এবং ভাষায়, সরস করিতে এবং ভক্তি-প্রগাঢ়তায় তাহা বৈষ্ণব কবি-দিগের অতুলনীয় গানগুলির মতই কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে । রজনীকান্তের এই অমর কবিত্ব—স্নেহাতুর জনকের সর্ব শ্রেষ্ঠ দান ।

কান্ত কবির বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার কবিতা বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ, ভক্ত এবং রসিক সকলেরই সমান উপভোগ্য—সকলেরই সমান আদরের বস্তু । একদিকে যেমন তাঁহার “তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্রাম ধবণী সরসা” প্রভৃতি গান উচ্চাঙ্গের দার্শনিক তথ্যের অবতারণা করিয়া শিক্ষিত সমাজকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে অত্র দিকে আবার তেমনি “এস এস কাছে, দূরে কি গো সাজে” প্রভৃতি গান সাধারণের ভিতর কোমল স্পর্শে আনন্দের শতদল পদকে বিকশিত করিয়া তোলে । একদিকে যেমন “আমিত তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ” ভক্তের চক্ষু হইতে বিহ্বল আবেশের ধারা-প্রবাহ উৎসারিত করিয়া দেয়, অত্রদিকে আবার তেমনি “যদি কুমড়েরি মত হতো পাণিতোয়া” মূর্তিমান রহস্যের তাস্তরসপ্রিয় শ্রোতার মুখের উপর অট্টহাস্যের তরঙ্গ রেখা পরিস্ফুট করিয়া তোলে । শতদীপপুলকিত প্রাসাদে তাঁহার সঙ্গীতসমূহ যেমন দেয়ালে বাধিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফিরিয়া আসে -

তেমনি আবার রৌদ্র দৃষ্টি প্রাপ্তরে, “পাখী ডাকা, ছায়ায় ঢাকা পল্লীবাটে” তাঁহারই গীতাবলী গগন পবন পূর্ণ করিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ে ।

চরিত্রের দিক দিয়াও তাঁহাকে দেখিতে গেলে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না । ছোট বড়, ধনী দরিদ্র সকলকেই তিনি স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধহাস্যে এবং মধুব বাক্যে পরিতুষ্ট রাখিতেন । তাঁহার গান ব্যক্তি বিশেষের অনুবোধের অপেক্ষা রাখিত না । যে কেহ ধরিলেই কল্লোলময়ী নিকরিনীর মত তাহা নামিয়া আসিত ।— নিদাঘের ধারাপাতের শ্রায় হৃদয়ের সমস্ত গ্লানি ধৌত করিয়া নিম্মল করিয়া দিত । সঙ্গীতে তাহার ক্ষমতাও এমন অদ্ভুত ছিল যে তিন, চারি ঘণ্টা অবিশ্রান্ত কণ্ঠ পরিচালনার পরও কেহ তাঁহাকে ক্লান্তির নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখে নাই । কিন্তু সর্বাপেক্ষা অসাধারণ ছিল তাঁহার বাক্য পটুতা এবং পরিহাস কারবার ক্ষমতা । তাঁহার উপহাসের ভিতরেও এমন একটা ঋজুতা এবং স্বাভাবিক স্নিগ্ধতা ছিল যাহা কোনো মানুষকেই আঘাত করিতে জানিত না— অথচ সরল সুন্দর হাস্যে সকলকেই উৎফুল্ল করিয়া তুলিত ।

হিন্দু বালিলে যাহা বুঝায় রজনীকান্ত তাহাই ছিলেন । তিনি হিন্দু ধর্মকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন কিন্তু গোড়ামিকে কখনো প্রশ্রয় দেন নাই । বরং সমাজকে এজ্ঞা তীব্রকণ্ঠে শাসন করিতে তিনি কোন দিন বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠানুভব করেন নাই । সমাজ সম্বন্ধীয় কবিতাগুলির আলোচনা করিলে—

আমাদের এই অধঃপতিত সমাজের জন্ত তাঁহার চক্ষুতে যে অশ্রুর অভাব ছিল না তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কবিতা হিসাবে সেগুলির স্থান খুব উচ্রে না হইতে পারে—ভাবের নূতনত্বে, চিন্তার বিশালতায় তাহা পরিণত মস্তিষ্কের উপযুক্ত না-ও হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গলার জাতীয় সাহিত্য এগুলিকে কখনও উপেক্ষা করিতে পারিবে না।

নবযুগের পুণ্য মঞ্চে নিজ্জীব বাঙ্গালা যে দিন সজীব ও চঞ্চল হইয়া উঠিল সেদিনও তাহাতে রজনীকান্তের কৃতিত্ব বা প্রভাব কম ছিল না। নিত্য নূতন সঙ্গীতে তিনি মাতৃপূজার অর্ঘ্য রচনা করিয়া দিতেন আর সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহারই কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া সেই তীব্রতাহীন খাঁটি স্বদেশী উপহারে মাতৃচরণ অর্চনা করিত। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও কবি তাঁহার দেশ মাতাকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। একনিষ্ঠ পূজক যেমন মৃত্যু কালে তাহার পাথরের ঠাকুবকে বিশ্বস্ত হস্তে সাঁপয়া যায় রজনীকান্তও তেমনি কারয়া মৃত্যুব পূর্বে মথার্থ—উপযুক্ত সম্মানের হাতে তাঁহার দেশমাতাকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুবিবর্ণ কবির “কুমার, করুণা-নিধে, দেখো র’ল দেশ”—এ প্রার্থনা ভক্তের প্রার্থনা—সাধকের প্রার্থনা—একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

দীর্ঘদিন হইতে কান্ত কবি ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছিলেন। এই রোগই তাঁহাকে আমাদের ভিতর হইতে কাড়িয়া লইয়া তিল তিল করিয়া মৃত্যুর মুখে তুলিয়া

দিয়াছে। প্রায় ছয় মাস পূর্বে তাঁহার নাক দিয়া নিখাস লইবার ক্ষমতা রুদ্ধ হইয়া যায়। গলায় অস্ত্র করিয়া কৃত্রিম উপায়ে তাঁহাকে এতদিন জীবিত রাখা হইয়াছিল। তাঁহার চিরমুখর কণ্ঠ সেই দিন হইতেই চিরনির্ঝাক। আর গত ২৮শে ভাদ্র রাত্রি ৮—৩০ মিনিটের সময় তাঁহার বুকের স্পন্দনও চিরদিনের জন্ত থামিয়া গিয়াছে। অনাহারই কান্ত কবির জীবন নাটকের শেষ অঙ্কের যবনিকা এত সত্তর টানিয়া দিয়াছে।

কবি তাঁহার জীবনের শেষ অঙ্কে, অমৃত আনন্দময়ী, অভয়া এবং বিশ্রাম এই পুষ্প চতুষ্টয়ে তাহার চিরারাধ্যা বীণাপাণির পূজার শেষ অর্ঘ্যরচনা করিয়া গিয়াছেন।—যে মায়ের সাধনায় তাঁহার সমস্ত জীবন ব্যয়িত হইয়াছে সেই মায়ের পূজা করিতে করিতেই তিনি মায়ের কোলে মিশিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালীর গীতি কবিতায় রজনীকান্তের স্থান কোথায় তাহা নির্দেশের সময় এখনও আসে নাই। কবে আদিবে আমরা তাহাও বলিতে পারি না! আমাদের শোকসন্তপ্ত হৃদয় কেবল এই মাত্র বলিতে পারে যে, তিনি আমাদের কবি—সমাজের কবি—বাঙ্গলার কবি ছিলেন—তিনি যেখানেই থাকুন সেখান হইতেই আমাদের ভক্ত প্রীতি ভালবাসাব অর্ঘ্য গ্রহণ করিবেন।

“Thy thoughts, when thou art gone,
Love itself shall slumber on.”

তুমিও যবে মরিবে তবে আমাদের এবুকে
চিরান্তিনব স্মৃতিটি তব ঘুমায়ে রবে স্মৃথে।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

সমালোচনা ।

পারশু উপন্যাস । (গার্হস্থ্য সংস্করণ) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ কর্তৃক সম্পাদিত । এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস ও কলিকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত । মূল্য বারো আনা । বটতলার দুর্দশাপন্ন জঘন্য পারশু উপন্যাস ভক্ত সমাজের অযোগ্য ছিল সে অভাব দূর করিবার জন্য এই নির্দোষ সর্বজনপাঠ্য ও সুমুদ্রিত গার্হস্থ্য সংস্করণের আবির্ভাব । গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলভ করিয়াছি । ইহাতে কনিষ্ঠ রস কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই—সুরুচিও সর্বত্র সুরক্ষিত হইয়াছে । বালকবালিকাগণের হস্তে অসঙ্কোচে উপহার দেওয়া যায় । গ্রন্থখানিকে সর্বতোভাবে রমণীয় করিবার উদ্দেশ্যে ইহাতে আটখানি সুন্দর চিত্র সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে তন্মধ্যে একখানি তিনবর্ণে মুদ্রিত । চিত্রের পরিকল্পনা রমণীয় । গ্রন্থের সুন্দর বাঁধাই, সুন্দর ছাপা, সুন্দর কাগজ । সে হিসাবে মূল্য বেশ সুলভ হইয়াছে ।

রবিন্সন ক্রুশো । শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ কর্তৃক অনুদিত । এলাহাবাদে ইণ্ডিয়ান প্রেস ও কলিকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত । মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র । ডিকো রচিত রবিন্সন ক্রুশো ইংরাজ বালকবালিকার নিকট বিশেষ আদরের সামগ্রী । এমন কোতূহলপূর্ণ শিশুপাঠ্যগ্রন্থ জগতের সাহিত্যে অল্পই আছে । চারুবাবু সেই গ্রন্থের এমন সুন্দর সমগ্র বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ সাবিশেষ বর্দ্ধিত করিয়াছেন । অনুবাদে কোন অংশ বাদ পড়ে নাই । ভাষা দিব্য লঘু ও সরল, কোথাও এতটুকু বাধাবন্ধ নাই । মূলের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়াই আমাদিগের ধারণা । বহির্ধানি আবালবৃদ্ধবনিতার পক্ষে যে উপাদানের হইয়াছে তাহার একটি প্রমাণ, সমালোচ্য গ্রন্থখানি বহুদিন বহুপাঠকপাঠিকার হাতে কিরূপা তবে সমালোচকের হাতে পড়িয়াছে গ্রন্থে অনেক-

শিশুপাঠ্য গ্রন্থ তালিকায় রবিন্সন ক্রুশো উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য ।

জোলেখা । শ্রীআবদুল লতিফ কর্তৃক সংলিভ । হিতবাদী প্রেসে মুদ্রিত । হিতবাদী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত । মূল্য এক টাকা মাত্র । “বাইবেলের পুরাতন নিয়মাবলী” ও কোরণ শরিফের দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত ধর্ম্ম আ ইউসফের জীবন কাহিনী অবলম্বনে কবি জামি কাব্য রচনা করেন—আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহারই বঙ্গানুবাদ । উপাখ্যানে শিক্ষার সহিত রোমান্সের সুন্দর সমন্বয় আছে । তবে অনুবাদকের রচনায় বোমান্সের রসটুকু ভালো ফুটে নাই । অনুবাদের ভাষা প্রঞ্জল কিন্তু উচ্ছ্বাসের ঘটা কিছু অতিরিক্ত, তজ্জন্য স্থানে স্থানে একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে । এ ত্রুটি সত্ত্বেও গ্রন্থখানি বেশ কোতূহলোদ্দীপক । লেখকের উত্তম প্রশংসনীয় ।

শিশির । শ্রীমতী হেমমতীবালা দত্ত প্রণীত । চট্টগ্রাম শ্রীশ্রীগৌরীশঙ্কর লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত । কলিকাতা হিতবাদী প্রেসে মুদ্রিত । মূল্য চারি আনা মাত্র । এখানি ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থ । তেমন বিশেষত্ব কিছুই নাই ।

জাপান । শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত । প্রকাশক চ্যাটার্জি এণ্ড কোং, ২০৩, ৪ কণ-ওয়ারালস স্ট্রিট, কলিকাতা কুন্তলান প্রেসে মুদ্রিত । মূল্য দেড় টাকামাত্র । গ্রন্থকার সার্কি চার্লসবৎসরকাল জাপানে শিক্ষাসৌকর্য্যার্থ বাস করিয়াছিলেন । সেখানে অনেক ভক্ত পরিবারের সহিত মিশিবার পক্ষে তাঁহার সুযোগ ৭টিরাছিল—সেইহেতু তাঁহারের পারিবারিক জীবন ইতিনীতি জাপানী সমাজ প্রভৃতি বীতিমত দেখিবারও অবসর মিলিয়াছিল । গ্রন্থখানিতে জাপানের রাজধানী, সমাজ, শিক্ষা, জাপানী চরিত্রের বিশেষত্ব প্রভৃতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে লেখক বেশ হৃদয় দিয়া আগাগোড়া বর্ণনা করিয়াছেন দেখিবার শক্তিও তাঁহার সাধারণের মত নহে

উপন্যাসের মত গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য। গ্রন্থের ছাপা কাগজ মলাট প্রভৃতি অত্যাৎকৃষ্ট। সর্বদমেত ৪৩ খানি চিত্রে পরিশোভিত। চিত্রগুলিরও বিশেষ মূল্য আছে। কারণ তাহা হইতে লেখকের বক্তব্য প্রফুটতর হইয়াছে। ভাষাটুকু সরল, কিন্তু মাঝে মাঝে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মিশ্রণে সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে।

আদর্শ রমণী। মৌলবী শেখ আবদুল জব্বার প্রণীত। ঢাকা আশুতোষ প্রেসে মুদ্রিত মূল্য চারি আনা মাত্র। সখিনাথাতুন, জোবারদা খাতুন, দেবী রাবিয়া সত্রাফা মমতাজ মহল প্রভৃতি কয়েকটি আদর্শ রমণীর কাহনী লইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচিত। লেখকের ভাষাটুকু সরল ও মিষ্ট; রচনার বেশ একটি আকর্ষণ। শক্তি আছে। মুসলমান লেখকের এমন রচনাকুশলতা আমরা অল্পই দেখিয়াছি। গ্রন্থখানি হিন্দু মুসলমান সকলের নিকটই আদর পাইবার যোগ্য। মুসলমান মহলাগণের ত অবশ্য পাঠ্য।

মদিনা-শরীফের ইতিহাস। মৌলবী শেখ আবদুল জব্বার প্রণীত। মূল্য এক টাকামাত্র। গ্রন্থের ভাষা সরল প্রাঞ্জল। ইসলাম জগতের বহু জাতব্য বিষয়ে পূর্ণ এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থকার মুসলমান ও হিন্দু উভয় সমাজেরই ধর্ম্মবাদ ভাঙ্গন হইয়াছেন।

শুক্লা। শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন রায় বি, এ প্রণীত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। এখানি কাব্যগ্রন্থ। অমিত্রাকর ছন্দে রচিত। উপাখ্যানে কোন বিশেষত্ব নাই। খণ্ডকাব্য রচনার লেখকের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই আমাদের ধারণা। ভাষা ও ছন্দ অত্যন্ত জটিল; ভাবও আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

পুণ্যের জয়। শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি প্রণীত। মূল্য এক টাকা। গ্রন্থখানির প্রশংসা করিতে পরিলাম না।

শ্রীসত্যব্রত শর্মা।

প্রাপ্ত স্বীকার।

আমরা পূজার সময় সহৃদয় পাঠক পাঠিকা-গণের অন্তর্ভুক্তি সাধনার্থে বিধবাশ্রমেব সাহায্য ভিক্ষা প্রার্থনা কার। মহলাগণ অনেকেই যেকপ আর্থিক সহায়তপূর্ণ ভাবে এই আবেদন রক্ষা করিয়াছেন—তাহাতে আমাদের আনন্দের সীমা নাই। প্রকৃত পক্ষে এ কাজ আমাদের দুই একটি মহিলার কাজ নহে, হহা সমগ্র বঙ্গরমণীরই কাজ। তাই এই আহ্বানে, তাঁহাদিগকে, সাড়া দিতে দেখিয়া আমাদের হৃদয় এত আনন্দগর্ভে স্ফীত। আমরা বুঝিতেছি আমাদের ব্রত নিষ্ফল হইবে না,—বঙ্গের অভাগিনী ভাগিনীদিগের হঃখাশ্র মুছাইতে সমগ্র ভাগ্যশীলা রমণী সম্মেহে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইবেন। এ আশা

যে হারাণা নহে তাহা শ্রীমতী জ্ঞানদাবালার নিম্নোক্ত পত্রখানি হইতে সকলে বুঝিবেন।

শ্রীশ্বর্নকুমারী দেবী।

বিহিত প্রণাম পুরঃসর নিবেদন মিদং

আপনি যে মহত্বদেখে আপনার আশ্বিনের ভারতীতে ৮ পূজার ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন কয়েকটি কারণে ঐ সত্বদেখে আমার সংসারমগ্ন চিত্তকে প্রবল-ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। তাই আপনার বৃহৎ ভিক্ষা-বুলির আদর্শে নিজে একটি সামান্য রকম ভিক্ষাবুলি লইয়া যৎকিঞ্চৎ সংগ্রহ করিয়াছি। এই সংগ্রহ কার্যে এখানকার যে কয়েকজন ভদ্রমহিলা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নাম এই সঙ্গে পাঠাইলাম। আনন্দের বিষয় এই যে, হাঁদের সকলেই আপনাদের সমিতির বিষয় শুনিয়া আর্থিক আগ্রহে ও অসঙ্কোচে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বেশ মনে হয়

যে আমার অপেক্ষা বেশী সামর্থ্য, বিদ্যাবত্তা ও অবসর
স্বাহার আছে তিনি এই সংগ্রহ কার্যে নিয়োজিত হইলে
সিমলা পাহাড়ের বাঙ্গালী মহিলাদের নিকট আরও
বেশী টাকা উঠিত। * * *

যে কয়েকটি কারণে আপনার ভিক্ষা প্রার্থনা
আমাকে বিচলিত করিয়াছে তাহার একটি এখানে
ব্যক্ত করা আবশ্যিক মনে করি। হিন্দু বিধবার সাংসা-
রিক দুর্দশা দেখিয়া আজকাল অনেক
সুশিক্ষিত লোক সমাজের উচ্চস্তরে পর্যন্ত বিধবা-
বিবাহ প্রচলিত করিতে উद्यোগী হইয়াছেন; ইহারা
বোধহয় অনুভব করেন নাই অবিকৃতভাবে হিন্দু-
মহিলার নিকট বিধবার ব্রহ্মচর্যরূপ প্রাচীন সুমহান্
আদর্শ কতদূর সম্মান ও আদরের বস্তু। * * এই সঙ্কট
সময়ে আপনার হিন্দু-বিধবাপ্রম বিধবার আর্থিক
অসহায়তা দূর করিবার প্রয়াসী হইয়া সমস্ত
হিন্দুনারী সমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছে। * * *

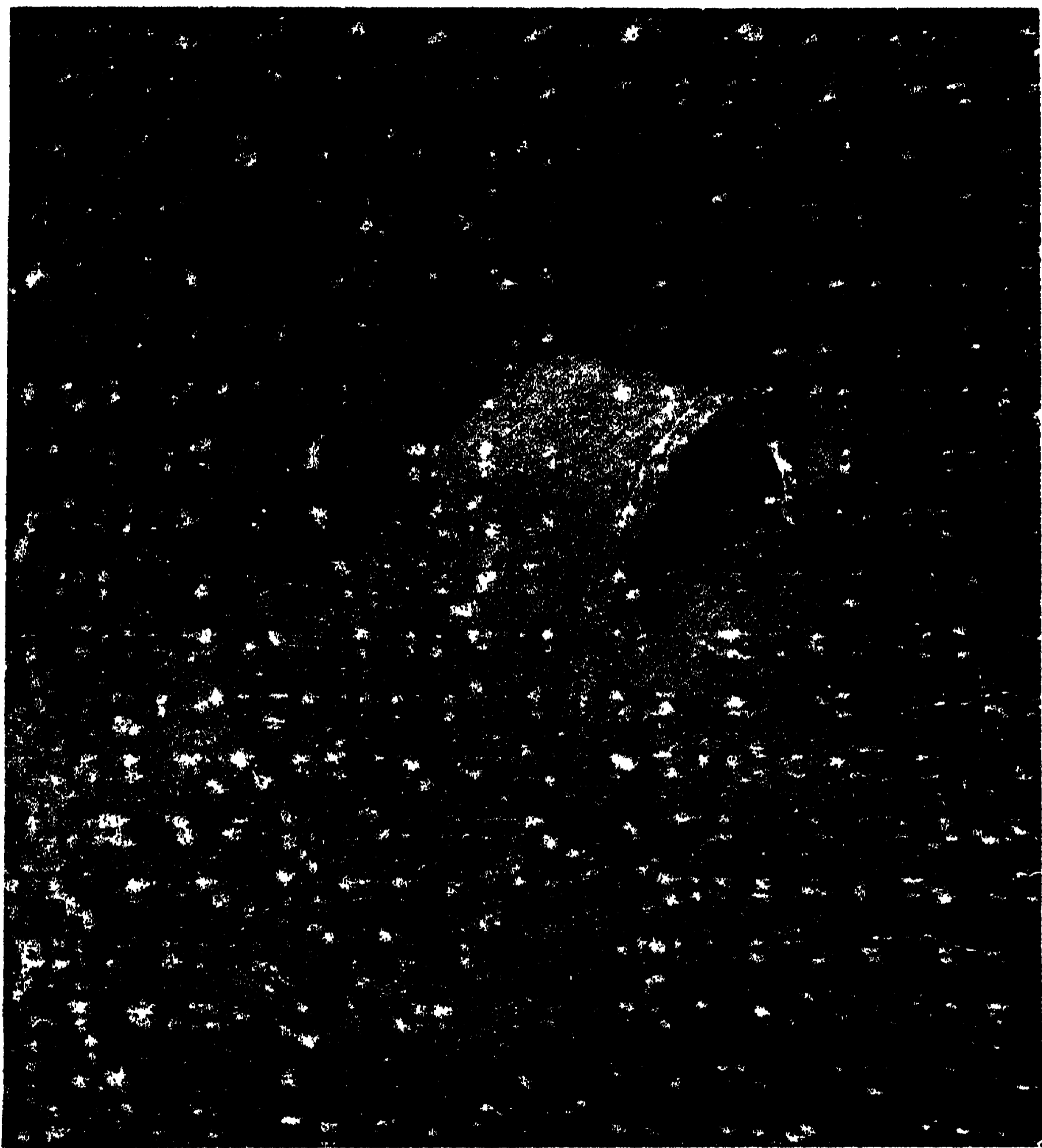
ইতি কার্তিক মন ১৩১৭ সাল।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষিনী—মিত্রজায়া জ্ঞানদাবালা।

| | | |
|-------------------------------|---|----|
| শ্রীমতী উষা দেবী, সিমলাপাহাড় | ঐ | ১০ |
| „ সরলা দেবী বি, এ, | ঐ | ৫ |
| „ শরৎসুন্দরী মিত্র, | ঐ | ৫ |
| „ জ্ঞানদাবালা মিত্র, | ঐ | ৫ |
| „ নীরদবালা দেবী, | ঐ | ৪ |
| „ সরযুবালা দাসী, | ঐ | ৪ |
| „ গোপাঙ্গনা দাসী, | ঐ | ২ |
| „ গোলাপসুন্দরী সিংহ, | ঐ | ২ |
| „ কুমুদিনী দেবী, | ঐ | ২ |
| „ গঙ্গা দেবী, | ঐ | ২ |
| „ প্রেমবালা মজুমদার, | ঐ | ২ |
| „ লতিকা ঘোষ, | ঐ | ২ |
| „ বিষ্ণুপ্রিয়া বসু, | ঐ | ১ |
| „ নগেন্দ্রবালা দেবী, | ঐ | ১ |
| „ প্রকাশনলিনী মিত্র, | ঐ | ১ |
| „ হেমলতা রায়, | ঐ | ১ |
| „ নিত্যকুমারী দেবী, | ঐ | ১ |

| | | |
|--|---|----|
| „ মাধুরীবালা দত্ত, | ঐ | ১ |
| „ হরকুমারী দেবী, | ঐ | ১ |
| „ যুগালিনী ঘোষ, | ঐ | ১ |
| „ ভবানী সুন্দরী দেবী, | ঐ | ১ |
| „ প্রীতিময়ী ঘোষ, | ঐ | ১ |
| „ মণিবালা দে, | ঐ | ১ |
| „ যুগালিনী বসু, | ঐ | ১ |
| „ তুষারবালা সরকার, | ঐ | ১ |
| „ নবনলিনী সরকার, | ঐ | ১ |
| „ নলিনীবালা দেবী, | ঐ | ১ |
| „ নির্মলাবালা দেবী, | ঐ | ১ |
| „ নীহারিকা দেবী, | ঐ | ১ |
| „ চারুবালা ঘোষ, | ঐ | ১ |
| „ অমূল্যসুন্দরী দত্ত, | ঐ | ১ |
| মিসেস্ কে, পি, দে, | ঐ | ১ |
| শ্রীমতী মোহিনী বালা গাঙ্গুলী, | ঐ | ১০ |
| „ নবকুমারী দেবী, | ঐ | ১০ |
| „ সরযুবালা দেবী, | ঐ | ১০ |
| „ সুশীলাবালা ঘোষ, | ঐ | ১০ |
| „ দুর্গা দেবী, | ঐ | ১০ |
| „ নীলনালনী দেবী, | ঐ | ১০ |
| „ গোপেশ্বরী ঘোষ, | ঐ | ১০ |
| মিসেস্ বিনোদদাস, সিলেট | | ১ |
| শ্রীমতী হেমনলিনী সেন, পাটনা | | ১ |
| মিসেস্ গিরীন্দ্রনাথ সেন, কলিকাতা | | ১ |
| মিসেস্ ওদেদার, লক্ষ্মী | | ১০ |
| শ্রীমতী কনকলতা রায়, | ঐ | ৫ |
| „ কমলা গুহ ওদেদার, | ঐ | ৫ |
| কুমারী অমিয়লতা গুহ ওদেদার, | ঐ | ১ |
| শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী, সিলং | | ১ |
| মিসেস্ শরৎচন্দ্র বাগচী, কলিকাতা | | ১ |
| শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, কাশীধাম | | ১ |
| শ্রীশৈলজানাথ চক্রবর্তী আশুগঞ্জ, ত্রিপুরা | | ১ |
| বাবু বতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দেবগ্রাম | | ১ |

১১০



ଅନୁସନ୍ଧାନ

ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟ

ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ

ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ

ভারতী

৩৪শ বর্ষ]

পৌষ, ১৩১৭

[৯ম সংখ্যা

নীলগিরির টোডা জাতি ।

বহুদিন পূর্বে ভারতীতে নীলগিরি সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম ! কিন্তু সে সঙ্গে তখন চিত্র ছিল না । টোডাদিগের ছবি দেখাইবার জগুই প্রধানতঃ পুনরায় সংক্ষিপ্তাকাবে এই প্রবন্ধটি লিখিত হইল । ভা সঃ ।

আমরা যখন উৎকামন্দে ছিলাম তখন বর্ষাকাল । কিন্তু বর্ষাকালে সেখানে সাবা-দিন ধরিয়া টিপটিপ বা ঝুপঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়ে না । যখন বৃষ্টি হয় মুষলধারে খানিক-ক্ষণ বেশ জোরে বৃষ্টি হইয়া যায় ; তাহার পর আবার নিশ্চয় আকাশতলে পরিষ্কার রৌদ্র ফুটিয়া উঠে । দার্জিলিঙ্গে বর্ষার দিনে অনবরত বৃষ্টিবর্ষণনীল মেঘাচ্ছন্ন প্রকৃতিতে একটা বিরক্তিব ভাব আছে, শীতে ক্লাস্তি আছে, সেখানকার রৌদ্রফুট তুষার দৃশ্যও অতি মহান, অতি গম্ভীর, অতি বিস্ময়কর, তাহা কেবল দূব হইতে দর্শনের, স্পর্শনের নহে, তাই তাহার মধ্যে তৃপ্তির পূর্ণ সুখ নাই । নীলগিরির জলবায়ু হইতে দৃশ্য সৌন্দর্য্য সমস্তই নিরতিশয় তৃপ্তিজনক ।

মাদ্রাজ গভর্ণমেন্টের গিরিবিহার এই উৎকামন্দ নীলগিরির সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত । উচ্চতায় ইহা প্রায় ৭০০০ ফুট . দার্জিলিঙ্গেরই প্রায় সমান । কিন্তু ইহার শৈত্য দারজিলিং নৈনিতাল প্রভৃতি গিরি নিবাসের তুলনায় মৃতমন্দ—এবং দৃশ্যও কোমল-মধুর । উৎকামন্দে হিমালয়ের সেই রক্তশুভ্র তুষারসজ্জিত শৈলশৃঙ্গশ্রেণীর

সুমহান সৌন্দর্য্য নাই, দিনে নিশীথে ঝিল্লি ধ্বনি মুখরিত নিবিড় গম্ভীর অরণ্যানীর রুদ্র-শোভা, অথবা পথপার্শ্বে কোথাও বা লতানৈবাল জড়িত মহাবৃক্ষনিবিড়তা, কোথাও বা অতুল্য ময়ূর পর্কিত প্রাচীর, কোথাও বা গভীর খদের ভয়ঙ্কর ভাব নাই । যত্র তত্র বিবিধবর্ণ বন-ফুল ও বিচিত্র লতাগুল্মের বিচিত্র সমাবেশ, নির্ঝর প্রপাতেব ফেণময় উচ্ছসিত কল্লোল এবং মেঘ বোদের মুহুমুহু লীলাখেলাও নাই । পাহাড়গাত্র যে সকল সুন্দর সুদৃশ্য তরুরাজি সমাচ্ছন্ন—তাহাও রুদ্রচাবিরহিত কানন শোভাসঙ্কুল, ভ্রমণেও পার্শ্বতা শ্রমক্লাস্তি নাই—পথ ছরারোহ উচ্চ নীচ নহে, ঘূর্ণমান সমতল চড়াই পথে—নিম্নভূমির মত গাড়ী ঘোড়া চলিতেছে ! সহরের যত উর্কেই উঠিতে চাও ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতে পার—বাতাসও মলয়ানিলের শ্রায় উপভোগ্য ।

ইহার দিগন্তবেষ্টিত মেঘহীন স্বচ্ছশুভ্র আকাশের কোলে স্তরে স্তরে নীলিমায় তরঙ্গায়িত অতি নীল,—নীলাকাশ হইতেও ঘননীল—স্বনামে সার্থক অনতি উচ্চ শৈলাবলী অতি সুদৃশ্য । এত নবঘন নীল মাধুরী অত্র কোন পাহাড়ে দেখা যায় না । ইহার বক্ষস্থিত

সর্পাকৃতি পথ, সুবিশাল হৃদ গুচ্ছ, সুদূর বিস্তৃত শ্রামল ক্ষেত্র, সরল সুদীর্ঘ পত্র মুকুট শোভিত, সুরূপ সুন্দর নীল নির্ঘাস তরুসমাচ্ছন্ন স্তর বিস্তৃত পাহাড়পুঞ্জ, তৎগাত্রস্থিত রক্তবর্ণ খোলার ছাদবিশিষ্ট কুটীরাবলী ও অট্টালিকা-সমূহ সকলই মনোহর। অধিকতর মনোহারী কেননা মেঘহীন শুভ্র সুনির্মল দিন, রৌদ্রদ্রব সুথকর শীত, বসন্তমধুর সুশীতল সমীরণ এবং স্বাস্থ্যপূর্ণ অনায়াস ভ্রমণ এই দৃশ্য সৌন্দর্য্যকে আমাদের প্রকৃত উপভোগের মধ্যে আনিয়া দেয়। হিমালয় দেবালয়, তাহার তুর্ভেগু হৃগম্য গূঢ় গম্ভীর রহস্যপূর্ণ সৌন্দর্য্যকে মানুষ সম্পূর্ণভাবে আপনার করিতে পারে না,—নীলগিরি মর্ত্যে যেন মানব উপভোগ্য নন্দনকানন। অস্তিত দারজিৎ হইতে দূরে—বহুদূরে তাহার সৌন্দর্য্য যখন মানসনেত্রে অদৃশ্য, অপ্রত্যক্ষ, অস্পষ্ট, কাল্পনিক সামগ্রী, তখন নীলগিরির প্রত্যক্ষ, সুদৃশ্য, সুগন্ধ, সুবসন্ত উপভোগ করিতে করিতে আমার এইরূপ মনে হইয়াছিল।

ইংরাজিতে যাহাকে ব্লুগম বলে আমি তাহাকেই নীলনির্ঘাস বলিয়াছি। ইহা ভালগাছের ত্রায় সরল সুদীর্ঘ কিন্তু ইহার গাত্রস্থিত সুদীর্ঘ সরু সরু বিরল শাখায় তেজপত্রের ত্রায় সুদীর্ঘ পত্রাবলী আলম্বিত। শিরোভাগ পত্র ঘন, পত্রগুচ্ছ মুকুটের মত শোভাময়। এই বৃক্ষরাশি শৈশবে ও যৌবনে ভিন্নরূপ। শৈশবাবস্থায় ইহার পাতা লেবু পাতার ত্রায় চ্যাপ্টা এবং আকাশের মত সুনীল আর বড় গাছে ইহা শ্রামকান্তিময়। তরুণ ও বয়স্ক বৃক্ষকে একত্র পাশাপাশি দেখিলে বিশ্বাসই হয় না যে ইহারা

একই জাতি। এই শিশু, কিশোর ও বয়স্ক তরুর সমাবেশে, শ্রাম ও নীলকান্তির অপরূপ সম্মিলনে উৎকামন্দের বনস্থলী একদিকে বিচিত্র শোভাপন্ন অত্মদিকে সুগন্ধে আমোদিত। এই সুগন্ধপত্রবিশিষ্ট নীলনির্ঘাস তরু স্বাস্থ্যকাবিতায় এবং জলশোষণ গুণে নীলগিরির প্রধান ভূষণস্বরূপ। শুনা যায় উৎকামন্দের মাটিতে জলীয়তা পূর্বে এত অধিক মাত্রায় ছিল যে রাস্তার যেখানে সেখানে খুঁড়িলেই চোরানদীর মত জল পাওয়া যাইত। পাহাড়ে যেখানে সেখানে নির্ঝর বহিত। রাস্তাঘাট গাড়ী ঘোড়ার ঘর্ষণ অধিকদিন সহ্য করিতে পারিত না—শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া খারাপ হইয়া যাইত। কিন্তু বহুপরিমাণে নীলনির্ঘাসতরু রোপিত হওয়াও এই পাহাড়ের মাটি এত কঠিন ও নির্জ্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, এখন এখানে একরূপ জলাভাব বলিলেই হয়। মাটি খুঁড়িলে ত আর জল ওঠেই না, সহরের ব্যবহারের জন্য রক্ষিত সরোবর হইতে কলে জল আসে। নীল নির্ঘাস তরু সজিনা গাছের ন্যায় অমর, মুড়াইয়া কাটিয়া ফেল, আবার মূল হইতে শাখা উঠিবে। ইহার শিকড়ে জল শোষণ করে পত্রে তারপিন তেল হয়। এ দেশে লোকেরা সর্দি হইলে ইহার পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে স্নান করে।

সহরের আশে পাশে যে সকল প্রাকৃতিক অরণ্যভূমি রক্ষিত সেখানে নীল নির্ঘাসের গাছ অপেক্ষাকৃত বিরল, অত্যাগ্র নানাজাতীয় বৃক্ষগাছেরই প্রাচুর্য্য অধিক। এই সকল অরণ্যকে এখানে সোলা বলে। সোলায় অনেক পরিমাণে হিমালয়ের প্রকৃতি বিরাজিত।

অরণ্যের মধ্য দিয়া বেশ প্রশান্ত গাড়ীর পথ, পথের স্থানে স্থানে তরুশাখা দুইদিক হইতে খিলানের মত মিলিত হইয়া পথ ছায়াচ্ছন্ন নিকুঞ্জের মত করিয়াছে। স্তব্ধ গম্ভীর অরণ্য লতাজড়িত মহীকূহে, ফলবৃক্ষে, ফার্ণে, বনফুলে ফুলস্ত ফলস্ত শোভা সমাকুল। সহরের ফুলের অভাব এখানে এইরূপেই বিদূরিত হইয়াছে। নইনিতালের গ্রায় বগু সেই উত্তী যুথিতে বনভূমি স্থলে স্থলে আলোকিতা অগ্নাগ্ন বনফুলও নানারূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অর্কড বা শৈবাল লতা নিতান্ত বিরল, ফার্ণও তত প্রচুর বা নানাজাতীয় নহে। এখানকার অমরপুষ্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হরিদ্রা বর্ণের চন্দ্রমল্লিকার গ্রায় দেখিতে এবং চিরসৌন্দর্য্য বতী। শুকাইয়া গেলেও এমন সুন্দর দেখিতে থাকে যে সোলার নির্মিত ফুল বলিয়া ভ্রম হয়। কোন কোন বনে গাছের ফাঁকে ফাঁকে কুইনিনের চাষ দেখিলাম। বগুফলের গাছ সমস্ত সোলাতেই প্রচুর। চেরি নানারকম! ঝুবেরির ক্ষুদ্র লতান ডাঁটার আগায় আমরুল শাকের পাতার মত দু'একটি গোল গোল পাতা আর সমস্ত ডাঁটা ফলে ফলে ভরা। দেখিলে আমাদের দেশের বালিকা মাতাদিগকে মনে পড়ে। আপেল নামপাতি প্রভৃতি নানাবিধ ফলের বাগানও এখানে অনেক।

টিপু সুলতান এখানে আসিয়া যে উচ্চ পাহাড় শিখরে কেলা নির্মাণ করেন তাহার নাম সুলতান শিখর। সেই নাম হইতে আমি এই শিখর সংলগ্ন অরণ্যাবলীর নাম দিয়াছিলাম সুলতান সোলা। কেলা নির্মাণ করিয়া বেশী দিন টিপু এখানে বাস করিতে হয় নাই। শীতকাল হইয়া শীঘ্রই তিনি এ বাস ত্যাগ

করিতে বাধ্য হন। এখনো অরণ্যে পরিণত পাহাড় চূড়ায় গড়ের ভগ্নাবশেষ বর্তমান। একটি ক্ষুদ্র নদী সুলতান সোলার পদপ্রান্তে প্রবাহিত।

আমাদের যে মাদ্রাজি ভূত্যাটি ছিল সে প্রায়ই উৎকামন্দের একটি বিশ্বয়জনক প্রাকৃতিক ঘটনার উল্লেখ করিত। বলিত—

“এখানে গরমের দিনে তুষার পড়ে।”

“সে গরমের সময়টা কখন? কি মাস?”

এ প্রশ্নের উত্তরে সে ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিত—“ডিসেম্বর জানুয়ারি।”

“সে সময়ে গরম?”

“অত্যন্ত। সূর্য্য তখন সমস্তক্ষণ আকাশে থাকে—বৎসরের সমস্ত সময় অপেক্ষা সে সময় প্রচণ্ড রোদ্ৰ—অথচ সন্ধ্যায় বরফ পড়ে, শীত ভীষণ।”

আরও একটি বিষয়ে তাহাকে বিশ্বয় প্রকাশ করিতে দেখিতাম। ইংরাজ যত জংলি গাছ মস্ত লম্বা চওড়া নামে অভিহিত করিয়া বটানিকাল গার্ডেনে লাগায়—আর বেশী বেশী দরে বিক্রয় করে। ইহা তাহার নিতান্তই হীন ছলনা মনে হইত। তাহার ভাষায়—“Madam they bring them all from Jungle and only give a name and sale.”

মাদ্রাজী ভূত্যেরা প্রায় সকলেই ইংরাজি জানে। কিন্তু এ ভাষা ইহাদেরই অদ্ভুত সৃষ্টি। কোন ইংরাজ নিজের ভাষা বলিয়া ইহা গ্রহণ করিবেন না। ইহাদের ইংরাজির একটি বিশেষত্ব—সমস্ত অতীত ক্রিয়ার পূর্বে তাহারা একটা done বসাইয়া দেয় যেমন done eat

খাইয়াছে বা খাইয়াছি Done put রাখিয়াছে রাখিয়াছি, ইত্যাদি।

উৎকামন্দের হৃদ অতি সুন্দর। ইহা সুদীর্ঘ সুবিস্তৃত এবং ইহার জলরাশি স্থানে স্থানে প্রণালীর আকারে সঙ্কীর্ণ হইয়া আবার বিশালতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই জন্ত ইহা গুচ্ছাকার। প্রতি সকালে বিকালে ইংরাজ স্ত্রী পুরুষ হৃদ প্রদক্ষিণ করিয়া বায়ু সেবন করেন। যেমন পদ্মের শোভা জলে জলের শোভা পড়ে;— সেইরূপ গিরি ও ইংরাজ ললনা উভয়ের রূপে উভয়ে শোভা বর্ধন করেন।

উৎকামন্দের চারিদিকেই এইরূপ সোলা অর্থাৎ অরণ্য আছে।—আমরা কেবল ফাৰ্ণহিল ও সুলতান সোলায় গিয়াছিলাম। দুই অরণ্যেই টোডার বাস দেখিলাম। ইহারা নীলগিরির আদিম অসভ্য জাতি।—নিভৃত অরণ্যপ্রান্তের মুক্ত বিজন স্থলে কাছাকাছি তিনচারিখানি কুটীর, ইহাই এক এক অরণ্যের টোডাপাড়া। এমন এক একটি পাড়ায় স্ত্রীপুরুষ ছেলেমেয়ে মিলিয়া ২০।২৫ জন টোডার বাস, আর সেই অতি ক্ষুদ্র তিন চারি খানি কুটীরই সমগ্র ২০।২৫ জনের রাত্রিকালের আশ্রয় স্থল। কুটীরের আকার ধনুকাকৃতি তিনদিক বন্ধ একদিক খোলা, একেবারে গুড়ি গুড়ি না দিয়া সেই অতি নিম্ন দ্বারপথে গৃহপ্রবেশ করা যায় না। দ্বারের কাছে বসিয়াও মাথা নীচু করিয়া উঁকি মারিয়া তবে গৃহমধ্য নজরে পড়ে। কুটীর মধ্যে একদিকে একটু রোয়াক তাহাই শয়ন স্থল, অত্রদিকে উত্তনের কাছে বাসন প্রভৃতি সাজান। তিন চারি

দল বিবাহিত অবিবাহিত স্ত্রীপুরুষ একত্র মিলিয়া এক সঙ্গে সেই রোয়াকে শয়ন করে।

মনুষ্য জাতির আদিম অবস্থায় যখন বস্ত্রবয়ন কৌশল অনাবিক্ত ছিল, যখন কুটীর নিৰ্ম্মাণ সহজ ছিল না তখনকার কালে শীত নিবারণের জন্ত এরূপ একত্র শয়ন আবশ্যিক হইয়া পড়িত সন্দেহ নাই; কিন্তু সভ্যতার সুবিধার এত সংস্পর্শে আসিয়াও তাহারা সেই হীন আদিম প্রথা এখনো রক্ষা করিতেছে দেখিলে অল্পে কেমন কাঁটা দিয়া উঠে। শুনিলাম আগে ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল, সমস্ত ভ্রাতা একজন রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিত। কিন্তু সে নিয়ম এখন আর নাই। এখন প্রত্যেক পুরুষেরই ভিন্ন ভিন্ন পত্নী।—

আদিম অসভ্যজাতি শুনিয়া কেহ যদি মনে করেন ইহারা কাফ্রিজাতির মত ভীষণ মূর্ত্তি বা ভূটিয়াদিগের মত খর্বনাশা ও বিশাল মাংসপেশী তাহা হইলে ভুল করিবেন। ইহাদের চেহারায় অসভ্যত্ব বা অনার্য্যত্ব কিছুই নাই। আৰ্য্যগণ সম্ভ্রষ্ট হইবেন কিনা জানি না—ইহাদের আকৃতি আৰ্য্যদিগের ঞ্চায়ই সুশ্রী সুগঠন। তাহা দেখিয়া ইংরাজ বংশতত্ত্ববিদগণ ইহাদের অনার্য্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাহাদের মধ্যে কেহ বা ইতালীয় হইতে, কেহ বা ইছদিজাতি হইতে, কেহ কেহ বা আরবজাতি হইতে ইহাদের মূল টানিতে চেষ্টা করেন। এক একজন টোডাকে দেখিলাম—একেবারে গ্রীক প্রস্তর ছবির মত সৌম্য সুন্দর। বর্ণ কাহারও কাল নহে—বেশীর ভাগ শ্রাম; কেহ

কেহ সামান্য গোরবর্ণ। ইহাদের স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই ভিতরে ঘাগরার ঞায় কটিবন্ধ বস্ত্র—জড়ান; আর একখানা লম্বাচাদর গলা হইতে পা পর্য্যন্ত ঝোলান। ইহাদের সকলের কেশ প্রায় কুঞ্চিত একং আকৃষ্ট লম্বমান। এইরূপ বেশ বলিয়া যাহারা স্ত্রী দেখিতে তাহাদিগকে যেন ছবির মত দেখায়। ছঃখের বিষয় আমরা যেরূপ স্ত্রী টোটা দেখিয়াছি এস্থলে সেরূপ কোন চিত্র দিতে পারিলাম না।



টোডা খুকী।

আগে নাকি ইহারা একরূপ নগ্ন থাকিত, গভর্নমেন্টের আদেশে কাপড় পরিতে বাধ্য হইয়াছে। যাহারা দূর অরণ্যে থাকে তাহাদেরও শুনিলাম এখন এই রকম বেশ। টোডা যুবতীগণ সাধারণতঃ বেশ

ফিটফাট, সাজসজ্জার দিকে বিশেষ একটু মনোযোগী। সকলেরই সন্মুখের চুল বেশ একটু পরিপাটি করিয়া আঁচড়ান—মুখ মার্জিত পরিষ্কার, কেহ কেহ কেশগুচ্ছ-কুঞ্চিত করিয়া মাথার মধ্যে গুঁজিয়া রাখিয়াছে, উপযুক্ত সময় বুলাইয়া দিবে। কাহারো অলক গুচ্ছ দ্বিধায়ুক্ত-সীমন্তের পার্শ্বে ও পৃষ্ঠদেশে আল-স্থিত, কাহারো গাত্রে অল্পস্বল্প রোপ্যাভরণ, —উল্কাভূষাও ইহাদের দেখিলাম; কিন্তু অধিক নহে। বস্তুতঃ চেহারায় নহে, বাস-স্থলে এবং আচার ব্যবহারেই ইহাদের অনার্যত্ব অসভ্যত্ব প্রত্যক্ষ। তাহা কুটীর চিত্রে পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

প্রত্যেক টোডাপাড়ার বাস কুটীর করখানি হইতে দূরে একখানি করিয়া শূণ্য কুটীর থাকে। ইহা টোডাদিগের দেবস্থান। এখানে কোন প্রকার মূর্তি নাই। ইহারা মহিষ তৃষ্ণ আনিয়া এখানে মাখন ঘূতাদি প্রস্তুত করে। ইহাই টোডাদের পূজা। স্ত্রীলোক এ গৃহে প্রবেশ করে না; দধিমহন পুরুষেরই কার্য। দেবস্থানের অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম—“যেখানে হারিস ডারিস্—অর্থাৎ ঈশ্বর থাকেন”।

জিজ্ঞাসা করিলাম—“ঈশ্বর কে?”

“যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন।”

“তিনি কি ঐ স্থানে থাকেন?”

“আমাদের পূজা লইতে তিনি ঐখানে আসেন। দুধ ঘিতে তিনি সন্তুষ্ট।”

অবশ্য আমাদের ভৃত্য ইন্টারপ্রেটারের কাজ করিয়া আমাদের এইরূপ বুঝাইয়া দিল। টোডাদিগের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, কেহ দরিদ্র নহে। ২৫।৩০।৪০।৫০ করিয়া এক এক

পরিবারের মহিষ আছে। তাহা হইতে ইহারা প্রচুর ঘৃত মাখনাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। যদি কোন টোডার মহিষ মরিয়া যায় তবে অত্র টোডারা নিজেদের মধ্য হইতে দুই একটি দান করিয়া তাহার মহিষ সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দেয়। মহিষ রাখিতেও ইহাদের কোন ঝঁরচ নাই। তাহারা সমস্ত দিন পাহাড়ে চরিয়া খায়, আর বিকালে টোডা রমণীর ডাকে কুটার সন্নিধানে আসিয়া দুগ্ধদোহন করিতে দেয়—তারপর রাত্রে কুটারের কাছাকাছি যেখানে সেখানে শুইয়া থাকে। মহিষগণ ক্ষুদ্র টোডা বালকের হস্তেও পরিচালিত হইয়া থাকে কিন্তু সহরের লোকের পক্ষে ইহারা ভয়ানক। যে পাহাড়ে মহিষ চরে সেখানে কেহ আসিতে পারে না। বিশেষতঃ ইংরাজ ঘোড়সওয়ার দেখিলে ইহারা মহা ক্ষেপিয়া ওঠে।

মহিষ ঘৃত দুগ্ধাদি বা বাসস্থানের জন্ত ইংরাজ গভর্ণমেন্টকে ইহাদের কর দিতে হয় না। ইংরাজ নীলগিরি লইবার আগে যেসকল অরণ্যভূমি টোডাদের ভোগদখলে ছিল গভর্ণমেন্ট সেই সকল স্থান ইহাদিগকে নিষ্কর দান করিয়াছেন; তবে ইহাতে তাহাদের বিক্রয়াদিকার নাই।

টোডাদের অবস্থা এত স্বচ্ছল, গভর্ণমেন্টের ইহাদের প্রতি এত অনুগ্রহ—আবশ্যকের অধিক ইহাদের উপার্জন—তথাপি ইহাদের সস্তানাদি নিতান্ত অল্প। যোগ্যজাতিই যে টেকসই (Survival of the fittest) এখানে তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। প্রতি অরণ্যে ২০১২৫ জনের বেশী টোডা নাই। দূর অরণ্যেও শুনিলাম টোডার সংখ্যা ক্রমশই

কমিয়া আসিতেছে। টোডারা অত্যন্ত অলস। স্ত্রীলোকের গৃহকার্য, এবং পুরুষের ঘৃতাদি প্রস্তুত ও বাজারে ক্রয়বিক্রয় কার্য ছাড়া অত্র কোন কাজ নাই। ইহারা কৃষিকার্য সহজেই করিতে পারে কিন্তু করে না। চাকরী কবা ত নিতান্ত অপমানজনক জ্ঞান করে। আসল কথা ইহাদের অত্র কোন কাজের আবশ্যক নাই। ঘৃত বিক্রয়ে ইহারা যাহা উপার্জন করে তাহাতে বেশ বাবুগিরি করিয়া থাকিতে পারে। চুংখের বিষয়—অর্থের প্রকৃত ব্যবহার ইহাৰা জানে না। অত্র কোন সভ্যতর জাতি ইহাদের মত স্বচ্ছল অবস্থায় যেরূপ আয়েস আরাম সুবিধা কিনিতে পাবিত—ইহারা উপায় সত্ত্বেও তাহা করে না। বত্র ফলমূল, ও দুধই ইহাদের প্রধান আহার। গোধূম চাল ও আলু আজকাল ইহারা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে; মাছ মাংস ইহারা খায় না। অত্রাত্ত তরী তরকারী মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি সহর হইতে যাহা সহজেই পাইতে পাবে তাহাও তাহাৰা দৈবাৎ কেনে। নূতন গ্রহণের মধ্যে তামাক ও নশ্বের আয়েস তাহারা বুঝিয়াছে—আর বুঝিয়াছে ভিক্ষায় আয়েস। দাস্ত্রবৃত্তি তাহারা অপমানজনক জ্ঞান করে কিন্তু ভিক্ষায় অপমান নাই। মেম সাহেবেরা তাহাদের দেখিতে গুলেই তাহারা বক্রিশ্বরূপ কর চাহে,—আমরাও অবশ্য এ দাবী পূরণে বাধ্য হইয়াছিলাম।

টোডার নাচ বড় অদ্ভুত। স্ত্রীলোকে নাচে যোগ দেয় না। ৭১৮ জন পুরুষে মিলিয়া হাত ধরাধরি করিয়া গোল হইয়া দাঁড়ায়,— দাঁড়াইয়া ও হাউ ও হাউ করিয়া চীৎকার করিতে করিতে তালে তালে এক সঙ্গে পা

ফেলিয়া ঘুরিতে থাকে। আসল কথা ইহা উক্তরূপে শব বেঠন করিয়া জঁখর স্তব
 আনন্দ নৃত্য নহে। কেহ মরিলে করে। গ্রাম প্রদক্ষিণ শেষ হইলে তখন
 মৃত ব্যক্তিকে লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে মৃত দেহ পুনরায় স্বগ্রামে নীত হইয়া তাহার
 গমন কালে, প্রতি গ্রামে সকলে মিলিয়া স্বকুটীরে সমস্ত তৈজস অলঙ্কার দ্রব্যাদির



সহিত দক্ষীকৃত হয়। অধুনা এ প্রথার পরি-
বর্তন ঘটয়াছে। কেহ মরিলে তাহার কুটীর
ও দ্রব্যাদি তাহার সহিত ভস্মীভূত না
করিয়া একখানি স্বতন্ত্র কুটীর মধ্যে শবদাহ
করা হয় এবং টোডাগণ সকলে মিলিয়া
দুই একখানি করিয়া তৈজস পত্রাদি যাহা দান
করে তাহাই মৃতব্যক্তির সহিত পোড়ান হয়।
শবদাহ হইয়া গেলে পুরুষেরা শড়কি দিয়া
৮১০ টা মহিষ নিহত করে এবং টোডা
নারীগণ সুর করিয়া কাঁদিতে থাকে। ইহারা
মাছ মাংস খায় না সুতরাং মহিষ বধ মৃত্যু
ভোজের জন্ত নহে। মৃত ব্যক্তি লোকান্তরে
তাহার সম্পত্তি ভোগ করিবে ইহাই তৈজসাদি
দাহন এবং মহিষ বধের অভিপ্রায়। সুখের
বিষয় এইখানেই তাহাদের ইতি পড়িয়াছে ;
সঙ্গে সঙ্গে পত্নীদাহের প্রথা নাই। আমাদের
সুসভা ভারতবর্ষ এলোভ সম্বরণ করিতে
পারেন নাই বলিয়াই বোধ হয়, আধ্যাত্মিক
ভাবের দোহাই দিয়া সতীদাহেরও প্রবর্তনা
করিয়া গিয়াছিলেন !

আমরা তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলাম—
“মরিলে কি হয় ?”

“ওফনার—অর্থাৎ মহালে কে যায় ?”

“ভূতে বিশ্বাস কর ?”

“না আমরা জঙ্গলে থাকি—কখনো ভূত
দেখি নাই—ভূত বিশ্বাস করি না।”

“মৃত আত্মাকে পূজা কর ?”

“না একবার মরিয়া গেলে তাহার কথা
আর আমরা ভাবি না।”

এই মৃত্যুৎসব ছাড়া ইহাদের অত্র কোন-
রূপ উৎসব নাই। এমন কি বিবাহও ইহাদের
পর্কদিন নহে। বিবাহে কোন আমোদ

প্রমোদ হয় না। বাপ মায়ের কথায়
বিবাহ ঠিক হইয়া যায়। এই সম্বন্ধকেই
তাহারা বিবাহ বলে। তাহার পর কোন
সময় কত্থা স্বামীর গৃহে গিয়া বাস করে।

নীলগিরিতে কোটা, কুড়ুয়া, ইরুলা
প্রভৃতি নামে আরো কয়েক জাতি পাহাড়ি
আছে। ইহাদের মধ্যে কুড়ুয়া যাহুর বলিয়া
খ্যাত। ইহারা আবো সুদূব অরণ্যে
বাস করে। এদেশেই অশিক্ষিত লোকমাত্রেই
প্রায় কুড়ুয়াকে ভয় কবে—কেবল টোডারা ভয়
করে না। আমাদের ভৃত্য কহিল—“কুড়ুয়া
জাতির পশু বানাইবার ক্ষমতা আছে—ভিক্ষা
চাহিলে কেহ যদি না ভিক্ষা দেয় ত তৎক্ষণাৎ
তাহাকে পশু বানাইয়া ফেলে। নিজেরাও
বাঘ প্রভৃতির বেশ ধরিয়া লোককে ভয়
দেখায়। এইরূপ মানুষ পশুর কেবল লেজ
থাকে না, ইহাতেই বুঝা যায় যে সে
যাহুপ্রাপ্ত।” নীলগিরির অনেকস্থলে
পুরাতন সমাধি দেখা যায়। পুৱাতত্ত্ববিদগণ
ইহার কোনটাই প্রায় খুঁড়িতে বাকী
রাখেন নাই। খুঁড়িয়া ইহাব মধ্যে যে
সকল দগ্ধ পিত্তল পাত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও মনুষ্যের
মৃন্ময়মূর্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে—সকলই
তাহারা লুট করিয়াছেন। এমন কি অস্ত্রার
পর্যন্ত বাকী রাখেন নাই। সমাধিউদ্ধৃত
অনেক মৃন্মূর্তি তাতার উষ্ণীষধারী। কোন
কোন মতে এই সকল সমাধি টোডাদিগের
সাইথীয় পূর্বপুরুষদিগের। কিন্তু অবোধ
টোডাগণ আপনাদিগের এই উৎপত্তি সম্বন্ধ
স্বীকারে অনিচ্ছুক। তাহারা এই সমাধি তাহা-
দিগের পূর্বপুরুষদিগের বলিয়া জানেও না,
মানেও না।—তাই অবাধে ইহা খনন ও

লুণ্ঠন করিতে দেয়। টোডাদিগের এবং অনেক স্থানীয় লোকের মতে পাণ্ডিয়া বংশ বহুপূর্বে নীলগিরিতে রাজ্য করিতেন—এ সকল সমাধি তাঁহাদিগেরই। নীলগিরির পুরাতন গভীর জঙ্গলে স্থানে স্থানে যেরূপ ভগ্নাবশেষ দুর্গ চিহ্ন এবং দেবমূর্তি পাওয়া যায়, এবং তৎসংলগ্ন দেব ঋষি ও রাক্ষসের গল্প শুনা যায় তাহাতে ইহা যে বহু পূর্বে আৰ্য্য নিবাস ছিল তাহাতে সন্দেহ থাকে না। সম্ভবতঃ পাণ্ডু

বংশীয়রাই এখনি রাজত্ব করিয়াছিলেন— তাঁহারা পাণ্ডিয়া নামে খ্যাত। কিন্তু টোডাগণ যদি সেই পাণ্ডিয়াগণেরই বংশধর হন তবে, ইহাদিগের কি দারুণ পতন? তাহা হইলে উন্নতিও যে কতদূর অবনতিতে পৌঁছিতে পারে ইহাই তাহার জলন্ত প্রমাণ! কে জানে আমাদেরও একদিন এইরূপ অবস্থা হইবে কি না!

খুনে।

সহরের বাহিরে জেলখানার হাতায় জেল-দারোগার বাসার খিড়কির বাগানে একলাটি খেলা কবিতৈছিল জেল-দারোগার সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে মিনু। একটা গোল পাথর পায়ে ঠেলায় ফুটবলের মতন বাগানময় গড়াইয়া লইয়া বেড়ানোই তার খেলা।

জেলখানার মতো খিড়কির বাগানও উঁচু দেয়ালে ঘেবা। কিন্তু এক দেয়ালে আটক আছে কত লোকের স্বাধীনতা, কত লোকের নিরানন্দ পাপের বোঝা; আর এ দেয়ালের অন্তরালে আছে শুধু ফুলের হাসি, সবুজ রঙের চোখজুড়ানো বাহার, প্রজাপতির স্বাধীন নাচ, আর মিনুর সরল পবিত্র আনন্দ।

মিনু খেলা করিতে করিতে শুনিল হঠাৎ কিসের শব্দ। চাহিয়া দেখিল একটা লোক খাটো জাঙিয়া, ঢিলা কুর্তি পরা, গলায় পদক আঁটা, শিকারী বেরালের মতো কুঁজো হইয়া বাগানের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিতেছে।

সে লোকটা এদিক ওদিক চাহিয়া

যখন দেখিল সেখানে একটি ছোট্ট মেয়ে ছাড়া আব কেহ নাই, তখন সে ফস্ করিয়া বাগানে ঢুকিয়া পড়িল, আর ঢুকিয়াই তাড়াতাড়ি দবজা বন্ধ করিয়া ভিতরদিকের খিল লাগাইয়া দিল।

তখন সে সোজা সটান হইয়া দাঁড়াইয়া হাঁপ ছাড়িল—সে নিশ্বাস আরামের, সে নিশ্বাস মুক্তির।

মিনু আজন্ম কয়েদির সঙ্গে পরিচিত, তার একটুও ভয় হইল না। অনেকের সঙ্গে তো তার খুব ভাব ভালোবাসা। এ লোকটাকে সে কিন্তু কখনো দেখে নাই, কাজেই এর সঙ্গে আলাপও ছিল না। সে লোকটার দিকে চাহিয়া দেখিল—লোকটা বেয়াড়া লম্বা চোড়া প্রকাণ্ড। হাতের খাবা-গুলো গুলতোলা লোহার হাতলের মতো, মুখখানা চৌকো কঠিন অস্থিময়, চোখ দুটো ছোট ছোট, বেরালের মতো ভীষণ আর ধূর্ত। তাহাকে দেখিয়া মিনুর তত ভালো লাগিল না।

লোকটা পিঁজরাভাঙা হিংস্র পশুর মতো

একবার খুব আড়ামোড়া ভাঙিল; একবার মুক্তির সম্ভাবনার দাঁত বাহির করিয়া হাসিল, তারপর মিনুর দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

মিনুর আর তাহার দিকে নজর ছিল না। সে একবার তাহাকে দেখিয়া লইয়া! আপনার খেলা শুরু করিয়াছিল। সে পাথর ঠেলিতে ঠেলিতে, টলমল করিয়া হেলিতে ছলিতে আসিতেছিল—সে দেখে নাট যে লোকটা তাহার কাছে আসিয়াছে। সে পাথরে ধাক্কা দিতে গিয়া টলিয়া পড়িতেছিল—কিছু ধ'রবার জন্য হাত বাড়াইয়া দেখিল সেই লোকটা দাঁড়াইয়া আছে, সে তখন অসঙ্কোচে তাহার কুর্ভা ধরিয়া পতন সামলাইয়া লইল।

লোকটা অমনি প্রকাণ্ড জাঁতিকলের মতন হাত দুখানা মিনুর গলার দিকে বাড়াইয়া দিল। মিনু তার সরল চোখদুটি তাহার মুখের দিকে তুলিয়া আদরের স্বরে বলিল—তুমি সরে যাও! আমার পাথর ছিটকে যদি তোমায় লাগে!

সরল বালিকার সোহাগবাণী তাহাকে যেন বাধা দিল। লোকটা হাত গুটাইয়া মিনুর নিকট হইতে সরিয়া গেল।

মিনু লোকটার দিকে ফিরিয়া বলিল—ওগো এস না, আমরা দুজনে খেলি। তুমি হও ভাই মালি, আমি বাবু।

এই বলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া একখান কোদাল আনিয়া লোকটার কাছে বাড়াইয়া ধরিল। লোকটা কোদাল লইতে ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া মিনু বলিল—নেও, তুমি কোদাল নেও—এস আমরা খেলি।

কোদালের চকচকে ধার দেখিয়া

লোকটার গোল চোখ দুটো জলিয়া উঠিল, চোখের পাতা মিটমিট করিল। সে আবার তখনি কেমন সজ্জুচিত হইয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিল—না না, আমার ও চাইনে! আমার ও দিসনে!

মিনু কোদাল ফেলিয়া ঠোট ফুলাইয়া বলিল—না, তুমি বড় ছটু! ঘিটু, নানকুরা ওরা বেশ! আমার সঙ্গে খেলা করে, বাবার কাজ করে। তুমিও এস, খেলবে এস। তুমি মাটি খুঁড়বে না? তবে জল তোল, ডোলের জল নালায় ঢেলে দেও, আমি তাতে নৌকো ভাসাব। এস——।

মিনু তাহার কুর্ভা ধরিয়া টানিতে টানিতে কুপের ধারে লইয়া গেল। সেও যেন কোন প্রবল টানে অসহায়ের মতো একটি বালিকার আকর্ষণ মানিয়া চলিল।

মিনু কুপের পাড়ে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—দেখ দেখ, জলে আমার ছায়া পড়েছে। আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি, তুমি পাচ্ছ? ও! তোমার চোখ দুটো অমন কটমটে কেন? না, তুমি অমন করে চেয়ো না, আমার ভয় করে।

এই কাতর কথাগুলি লোকটার কঠিন হৃদয়ে যেন ঘা দিল। সে প্রসারিত হাত দুখানা বুকের উপর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া প্রাণপণ বলে চোখ বুজিয়া অতি মিনতির স্বরে বলিল—ওরে অবোধ, তুই ঝুঁকিসনে, কুয়োঁর কাছে আমার ডাকিসনে। ওসব দেখলে আমার গায়ে মরণের জ্বর আসে।

মিনু সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া অতবড় লোকটার ভয়কাতর ভাবভঙ্গি দেখিয়া

খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল—দূর বোকা, তোমার ভয় কি, তুমি থাকতে আমি পড়ব কেন ?

সে লোকটা যেই দেখিল মিনু সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অমনি তাহাকে এক ধাক্কা কুপের ধার হইতে সে সরাইয়া দিল। তাহার রূঢ় ধাক্কা মিনুর ভৎসনাতরা দৃষ্টি অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। মিনু ক্রন্দনকম্পিত কণ্ঠে বলিল—যাও, তুমি ভারি ছষ্টু! তুমি আমার মারলে ?

লোকটা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার অভিমানের কান্না দেখিল। তাহার সকল কঠোরতা যেন গলিয়া গলিয়া বালিকার অশ্রুরূপে তাহার প্রাণকে ধৌত নিশ্চল করিয়া দিতেছে। তাহার কণ্ঠ এবার কোমল হইয়া পড়িল, সে বলিল—নে নে, আর কাঁদিসনে! তুই আমার অমন করে কোদাল দেখিয়ে, কুপ দেখিয়ে ক্ষেপাসনে, আমি কিছু বলব না। চুপ কর, চুপ কর!

এই সাস্বনার প্রীত হইয়া মিনু অশ্রুজলের ভিতর দিয়াই হাসিয়া উঠিল। বলিল—তবে আমার একটা গোলাপ তুলে দেও।

ছোট ছোট ঝোপ গাছে টকটকে লাল গোলাপ ফুল গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়াছিল। লোকটি বাধ্য শিশুর মতো এক ধোলো কুঁড়ি ও ফুটন্ত গোলাপ তুলিয়া মিনুর হাতে দিল। মিনু সেই ফুলের তোড়াটি বুকের উপর জামার গায়ে গুঁজিয়া দিল। মিনু হাসিয়া হাততালি দিয়া বলিল—দেখ দেখ কেমন সুন্দর!

লোকটির মুখ পাণ্ডাশ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ডোঙার মতো বড় ছুখানা হাতে তার

প্রকাণ্ড মুখ ঢাকিয়া আহত পশুর মতো কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়া উঠিল—ওরে ওরে তোমার বুকের ওপর ওয়ে রক্তের মতো লাল—ফ্যাল, ফ্যাল, টেনে ফ্যাল, আমার আর লোভ দেখিয়ে ক্ষেপাসনে।

মিনু ভয় পাইয়া ফুলগুলি খুলিয়া ফেলিল। আবার তাহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

লোকটি চোখ খুলিয়া বলিল—ছি! তুই আবার কাঁদচিস। চুপ কর চুপ কর। আমার তুই ক্ষেপাসনে, আমিও তোকে কাঁদাব না।

সে তার হাতুড়ির মতন হাতখানা দিয়া মিনুর অশ্রু মুছাইয়া তাহার গালে আদর করিল। সে নত হইয়া মিনুকে চুমু খাইতে যাইতেছিল, এমন সময় বাহিরে অনেক লোকের ব্যস্ত কোলাহল, দৌড়াদৌড়ি শুনা গেল।

ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতন লোকটা তড়াক করিয়া সোজা হইয়া উঠিল। তারপর একলাফে বাগানের এক কোণে গিয়া লুকায়িত হইল।

বাহির হইতে কে কপাটে ধা দিয়া ব্যগ্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—মিনু, তুই কোথায় ?

“বাবা, আমি এখানে।”

“খোল্ খোল্, দরজা খোল।”

“দরজায় যে খিল দেওয়া।”

“আরে খিলই খোল না।”

“খিল যে উঁচুতে, আমি নাগাল পাই না।”

“তবে দিলি কেমন করে ?”

“আমি দিয়েছি বুদ্ধি—খিল তো ও দিলে।”

বাহির হইতে ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন হইল—ও কে রে ?

মিহু বলিল—ও একজন কয়েদি, আমি ওর নাম জানিনে ।

বাগানের কোণ হইতে একটা দুঃখ-বিরক্তি-মিশ্রিত হতাশার শব্দ মিহুর কানে গেল । ফিরিয়া দেখিল কয়েদি সামনের দিকে হেলিয়া গুঁতাইতে উদ্ভত গোরুর ভঙ্গিতে কোদাল উটাইয়া দাঁড়াইয়া আছে । মিহু তাহার সেই ভাব দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—না না, তুমি অমন করে থেকে না—ওগো তুমি আবার ক্ষেপে উঠলে কেন ?

এতক্ষণে বাহির হইতে দরজা ভাঙিবার জন্ত খুব চেষ্টা হইতেছিল । মিহু ছুটিয়া কয়েদির কাছে গিয়া তাহার কোর্তা ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—এস লক্ষ্মীটি, দরজা খুলে দেও - ওরা যে দরজা ভেঙে ফেললে ! তুমি কোদাল ফেলে দেও, নইলে আমি আবার কাঁদব !

কয়েদি মিহুর মিনতিভরা চোকের দিকে চাহিয়া দেখিল—দুটি বিন্দু অশ্রু তরল মুক্তার মতন টলটল করিতেছে । কয়েদি সটান হইয়া দাঁড়াইয়া মৃত্যুনিশ্চিত পশুর মতো কাতর শব্দে নিশ্বাস ফেলিয়া কোদাল ফেলিয়া দিল । তাহার সেই চৌড়া বুকখানার মধ্যে যে বিষম তোলপাড় হইতেছিল তাহাতে যেন তাহার বুকখানা এখনি ফাটিয়া যাইবে । মিহু কিন্তু

তাহাকে মস্তমুগ্ধের মতো টানিয়া দরজার কাছে আনিয়া বলিল—দরজাটা খুলে দাও ।

কয়েদি একবার খিলের দিকে চাহিল, একবার মিহুব মিনতিভরা চোখের দিকে চাহিল, একমুহূর্ত মাত্র ইতস্তত করিল, তারপর সে দরজার খিল খসাইয়া দিয়া স্বক্ৰ-ভাবে মিহুর মুখেব দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ।

দরজা খোলা পাইয়া তিনজন পাহারাওলা বাঁধভাঙা জলের মতো ছুটিয়া বাগানে ঢুকিয়া কয়েদিকে ধরিল । সে বন্দী বাঘের মতো আপনার বলের গর্বে দৃপ্তভাবে শুধু দাঁড়াইয়া রহিল, কোনো বাধাই দিল না ।

জেল-দারোগা তাড়াতাড়ি আসিয়া কথাকে বুকে তুলিয়া চাপিয়া ধরিল, যেন সে হারানো রত্ন ফিরিয়া পাইল ।

পাহারাওলারা কয়েদিকে লাথি কিল চড় ধাক্কা গুঁতো মারিতে মারিতে জেলখানায় লইয়া যাইতেছে দেখিয়া মিহুর কোমল প্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠিল, সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—বাবা, ওকে মারতে বারণ কর ।

জেল-দারোগা কথাকে বুকে চাপিয়া বলিল—ওর জন্তে কাঁদিসনে, ও খুনে ডাকাত !

এ কথাতে মিহু কিন্তু কোনো মাস্তানা খুঁজিয়া পাইল না ।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

কার্যকরী শিক্ষা।

জীবনের কর্তব্যকে নিত্যপ্রয়োজনীয় কর্মের উপযোগী করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে, শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষা তাহা হইতে স্বতন্ত্র। স্কুল শিক্ষা ও জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় কর্মোপযোগী শিক্ষার মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ থাকা কর্তব্য ইহা বহু-দিবস হইতে ইয়োরপের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রের আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন মানসিক বৃত্তিনিচয়ের সম্যক পরিষ্করণ, পর্য্যবেক্ষণ শক্তির উৎকর্ষসাধন, স্মৃতিবৃদ্ধি এবং যুক্তি শক্তির উন্নতি বিধানই শিক্ষাব একমাত্র উদ্দেশ্য। জীবনের বাস্তব কার্যের সহিত স্কুল শিক্ষার কোনরূপ সম্বন্ধস্থাপন তাঁহারা আদৌ আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না।

কিন্তু এই দ্বিবিধ শিক্ষার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন আধুনিক পণ্ডিত সাধারণেব অভিমত। সেই নিমিত্ত ইদানীং পাশ্চাত্য জগতের প্রায় সকল বিদ্যালয়েই মনোবৃত্তি প্রস্ফুটনকারী শিক্ষার সহিত কার্যকরী শিক্ষা প্রদানেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে অর্পিত সময়ের কিয়দংশ লাভব করিয়া তাহা আধুনিক সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়াছে; জ্যামিতি অধ্যয়নের সঙ্গে জ্যামিতি বিষয়ক অঙ্কন এবং ত্রায় ও অলঙ্কার শাস্ত্রের শিক্ষার সহিত ধনবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এইরূপ পরিবর্তন অবশ্যই প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির ঋক্ষসাধন না করিয়া হয় নাই। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের চিন্তা রাশির সমন্বয় করিয়াই আজকালিকার

বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছে। পূর্বকালেও ইয়োরপে প্রাচীন সাহিত্য কেবলমাত্র মানসিক উন্নতিব জন্তই শিক্ষা দেওয়া হইত না; যাহারা গির্জায় প্রবেশ করিতেন, এবং যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি পৃথিবীর সকল স্থানে পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বাক্যের আদান প্রদান করিতেন, কার্যোপযোগী বলিয়াই তাঁহারা প্রধানতঃ গ্রীস ও রোমেব প্রাচীন সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেন—মনোবৃত্তির উৎকর্ষসাধন তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না।

প্রাচীনকালে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিবিধান জাতীয় গৌরব বলিয়া বিবেচিত হইত না। যিহুদীদিগের মধ্যে ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান কার্য জাতীয় কর্তব্য কর্মের প্রধান অঙ্গ ছিল। গ্রীক ও রোমানগণ দক্ষনাগরিক ও রাজনৈতিক সৃষ্টি করাই গৌরবকর বিবেচনা করিতেন। মধ্যযুগে শিক্ষিত সম্প্রদায় গির্জা ও দৈহিক সামর্থ্যের প্রতি সমাধিক গুরুত্ব অর্পণ করিতেন। কাজেই পুরাকালে প্রধানতঃ নীতিশিক্ষা ধর্ম্মশিক্ষা ও ব্যায়ামশিক্ষা প্রচলিত ছিল। অশিক্ষিত ও নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেই তখন শিল্পচর্চা আবদ্ধ ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য চলত তখন দ্রব্য বিনিময়ে। শিক্ষিত ব্যক্তি ঐ সকল কার্য হেয়জ্ঞান করিতেন। গ্রীস এবং রোমে কার্যকরী ব্যবসা আদৌ আদৃত হইত না, সূতরাং সাধারণ শিক্ষার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। তথাপি পেন (Mr. Payne) বলিয়াছেন যে, মনুষ্যকে শিল্প ও ব্যবসায় বিষয়ক কার্যের উপযোগী করাই সমুদায়

ঐতিহাসিক যুগের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল। প্রকৃতই শিক্ষা-ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে শিক্ষা এবং মানজীবনের কর্তব্য কর্ম সমূহের মধ্যে বরাবরই সম্বন্ধ স্থাপিত; দেশকাল ভেদে শিক্ষা স্বতন্ত্র হইলেও ইহা সর্বত্র সর্বকালে সমাজের উপযোগী ছিল।

প্লেটো তাঁহার “রিপাব্লিক গ্রন্থে” অতীব অবাস্তব শিক্ষার অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে জ্ঞানলাভ বিষয় কর্মে সহায়তা প্রদান জ্ঞান নহে। গণিত ও জ্যামিতি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মনোবৃত্তির উৎকর্ষ বিধান। অথচ সেই “রিপাব্লিক” গ্রন্থেরই প্রধান উদ্দেশ্য নাপরিকগণকে রাজ্যের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে উপযুক্ত সামর্থ্য প্রদান করা। এই অর্থে প্লেটোর শিক্ষা ব্যবসায়মূলক এবং জীবনের দৈনন্দিক কর্ম পরম্পরার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত। অতএব দেখা যাইতেছে যে প্লেটোর শিক্ষারও মূল উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মনোবৃত্তি নিচয়ের উৎকর্ষ বিধান নহে; পরন্তু মনুষ্যকে রাজ্যের উচ্চকার্য সমূহ সম্পাদন করিবার উপযুক্ত সামর্থ্য প্রদান করা।

প্রাচীন রোমে শিক্ষার উদ্দেশ্য প্লেটোর “রিপাব্লিকে” সূচিত শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতে অনেক স্বতন্ত্র। বাগ্মিতা অভ্যাস করিবার জ্ঞান যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন রোমে সাধারণতঃ তদনুযায়ী শিক্ষাই প্রদত্ত হইত! খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রোমে কিরূপ শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাহা আমরা কুইন্টিলিয়ানের (Quintilian A. D. 35-95) প্রসিদ্ধ শিক্ষা বিজ্ঞান হইতে জানিতে পাই।

সুবক্তা হইবার জ্ঞান যে শিক্ষার প্রয়োজন তিনি তাঁহার পুস্তকে কেবল তাহারই আলোচনা করিয়াছেন।

মধ্যযুগে সমুদয় শিক্ষিত সম্প্রদায় ‘চার্চের’ সভ্য ছিলেন এবং যাহারা ‘ষ্টেটের’ কর্ম পছন্দ করিতেন তাঁহাদিগকেও চার্চের সভ্য-মণ্ডলীর ন্যায় শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইত। সে কালে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন শিক্ষাপদ্ধতির ভিত্তিস্বরূপ ছিল—সমুদয় শিক্ষারই বাইবেলের সহিত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। শিক্ষণীয় বিষয় সমূহের মধ্যে যথেষ্ট লাতিন এবং সামান্য গ্রীক প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। আস্-চামের (Ascham) সুপরিচিত গ্রন্থে মধ্য-যুগের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রণালী বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। অস্কার ব্রাউনিং (Mr Oscar Browning) বলেন যে, প্রাচীন সাহিত্য তখন বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জনের জ্ঞান পাঠ্য ছিল না,—সৌখিন কলাবিজ্ঞান হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হইত।

পূর্বকালে শিক্ষা ও বাস্তব কর্মের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ তাহার দ্বিতীয় নিদর্শন। আইন, ঔষধ, এবং ঈশ্বরতত্ত্ব তৎকালিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। প্রফেসার লরি (Lauric) তাঁহার “বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন ও উৎপত্তি” নামক গ্রন্থে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে সেলার্নো (Salerno) বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমতঃ ঔষধ শিক্ষাগার এবং বলোগনা (Bologna) বিশ্ব-বিদ্যালয় আইন শিক্ষাগার ছিল। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, শিশু বিদ্যালয় সমূহ যে কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রালোচনার

আলয় ছিল তাহা নহে ; অধিকন্তু ব্যবসায় ও সমাজের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় কর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

পূর্বে দেখান গিয়াছে যে লাতিন ভাষা প্রাচীনকালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাস্তব কর্মের উপযোগী ছিল এবং তজ্জন্মই শিক্ষা-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন মনোবিগণ লাতিন শিক্ষার এতাদৃশ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর জনৈক লেখক বলিয়াছেন “আমরা লাতিনের দাস। বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করিবার জন্ত যৌবনকাল অতিবাহিত করিতে হইলে গ্রীক ও মুসলমানগণ তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশাবলির জন্ত—কখন ঐদৃশ সম্পদ রাখিয়া যাইতে পারিতেন না”। লক সাহেব (Locke) বলেন যে সম্ভানকে ব্যবসায়ের উপযোগী করিতে হইলে তাহাকে লাতিন শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া বৃথা অর্থব্যয় অপেক্ষা অধিকতর হানুজনক বিষয় কিছুই হইতে পারে না ; কারণ ব্যবসায়ের জন্ত লাতিন শিক্ষার আদৌ প্রয়োজন নাই।

সেকালে ধর্মশাস্ত্রালোচনা ও আইন অধ্যয়ন আদরগীম ছিল, এবং শিক্ষাবিভাগের উপর ধর্ম সম্প্রদায়ের অধিক আধিপত্য ছিল বলিয়া স্কুলে প্রাচীন সাহিত্য শিক্ষা প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই শিক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধে ছ’চার জন সংস্কারকের চেষ্টা কিছুই করিতে পারে নাই। শব্দশিক্ষা অপেক্ষা বস্তু শিক্ষার উপকারিতা বহুপূর্বে উপলব্ধি করিলেও সে সময়ে সেরূপ শিক্ষার উপযোগী কোন নূতন উপকরণ আবিষ্কৃত হয় নাই। পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের সেই

শৈশবাবস্থায়—ইহা বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের শিক্ষোপযোগী হইবে—এ আশা কেহই করিতে পারেন নাই।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে লক বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির কার্য একরূপ সূক্ষ্ম ও বোধ শক্তির অগম্য যে ইহাকে কখনও সর্বোৎসুক বিজ্ঞানে পরিণত করা যাইবে না। এমন কি রুসো—যিনি তাঁহার এমিলেতে (Emile) শিল্পশিক্ষাকে প্রধান স্থান দিয়াছেন এবং মৌলিক পর্য্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার সহিত তুলনায় পুঁথিগত বিচার অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন—তিনিও প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির তখন কোন পরিবর্তন সংঘটন করিতে পারেন নাই। রুসো যে শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন তাহা সে সময়ের উপযোগী ছিলনা। কারণ সেকালে কার্যোপযোগী শিক্ষালাভ করিয়া কার্যক্ষেত্রে তাহা খাটাইবার উপায় ছিল না ; অধিকন্তু পুঁথিগত বিদ্যাই মান সম্ভ্রম প্রদান করিত। কাজেই বস্তুগত শিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ সাধারণের নিকট আদরগীম হয় নাই। কিন্তু রুসো ঠিকই বুঝিয়াছিলেন ; এক্ষণে সকলে তাঁহার বাক্যের সাধারণ্য অনুভব করিতেছেন এবং বলিতেছেন, যে, বাহ্য জগতের সহিত মনোবৃত্তিনিচয়ের সুস্পষ্ট সম্বন্ধ স্থাপনেই বৃত্তিসমূহের প্রকৃত উন্নতি। হারবার্ট স্পেন্সারও বলিয়াছেন যে মানুষকে সর্বতোভাবে জীবন যাপন করিতে সক্ষম করা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ; —এবং ইহা করিতে হইলে জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় কর্মের সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ থাকা একান্ত আবশ্যিক।

শিক্ষা-ইতিহাস, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের

প্রাথমিক শিক্ষা প্রণালী ও তাহার উদ্দেশ্য, এবং শিক্ষা বিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন মনীষিগণের অভিমত পর্যালোচনা করিয়া দেখা গেল যে, আবহমানকাল হইতে বাস্তব কর্মের সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে এবং এই সম্বন্ধ স্থাপনের জন্ত বহুবিধ চেষ্টাও হইয়াছে। শিক্ষা দেশ কাল ভেদে বরাবরই সমাজের উপযোগী ছিল। কালক্রমে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন নিবন্ধন শিক্ষা প্রণালীরও পরিবর্তন আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিগতাকৌ পূর্বের সমাজ ও আধুনিক সমাজ এক নহে, ইহাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য জন্মিয়াছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও বহু পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। এখন আর দ্রব্য বিনিময়ে ক্রয় বিক্রয় চলে না; শিল্প ও বাণিজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং বহুবিধ শিল্পব্যবসায়েরও সৃষ্টি হইয়াছে। নানারূপ কলকারখানার সৃষ্টি হওয়ায় আজকাল অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বহুবিধ দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে এবং পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাতায়াতেরও বিশেষ সুবিধা হইয়াছে—এক্ষণে এক মাসের পথ এক দিবসেই যাওয়া যায়, স্থানের দূরত্ব আর পূর্বের ত্রায় সময়াপহারক নহে। বিজ্ঞান আধুনিক সমাজে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছে; আজকাল একস্থানে বসিয়া নিমেষমধ্যে সমস্ত পৃথিবীর খবর পাওয়া যায়। রেলগাড়ী, ষ্টীমার ও টেলিগ্রাফ স্থান ও সময়ের সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে একসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে। এই সকল পরিবর্তননিবন্ধন এক্ষণে শিল্প ও বাণিজ্য স্বাভাবিক বুদ্ধির দ্বারা চালিত না হইয়া

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চালিত হইতেছে। ইদানীং এমন অনেক নূতন নূতন শিল্প ও ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে যাহা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যতিরেকে পরিচালিত করা একেবারে অসম্ভব। সুতরাং ব্যবসাবাণিজ্য করিতে হইলে আজকাল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন।

অতএব আমাদের দেশেও শিক্ষাকে কার্যের উপযোগী করিতে হইলে এখন আর অতীতকালের শিক্ষা প্রণালী বজায় রাখিলে চলিবে না; সমাজের নূতন নূতন আবশ্যকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তদুপযোগী শিক্ষা-প্রণালীরও প্রবর্তন করিতে হইবে। সুখের বিষয় দেশের লোকে অল্পবিস্তর পরিমাণে ইহা বুঝিয়াছেন। শিল্পশিক্ষা ব্যতিরেকে এক্ষণে আর ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি সাধন সম্ভবপর নহে, ইহা দেখিয়া অনেকেই শিল্পশিক্ষার জন্ত উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন। সংসারে প্রবেশ করিয়া বাণক বালিকাদিগকে যে কর্মে নিযুক্ত হইতে হইবে তাহাদিগকে তদুপযোগী শিক্ষা প্রদান করিবার জন্ত সাধারণের দিন দিন অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে; ব্যবসায় বাণিজ্যের উদ্যোগ এবং শিল্পবিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠার দিকেও লক্ষ্য পড়িয়াছে। তথাপি এখনও আমাদের অভাব বিস্তর। কর্মক্ষেত্রের সকলরূপ বিভাগে প্রবেশ পথ যতদিন না উন্মুক্ত হয় ততদিন এই আগ্রহের অনুরূপ ফললাভে আমরা বঞ্চিত। এপক্ষে আর একটি প্রধান অন্তরায় শিক্ষকের অভাব। জ্ঞান প্রচারের দিকে আমাদের যেমন লক্ষ্য পড়িয়াছে সেই সঙ্গে কার্যকরী শিক্ষার সকল বিভাগেই শিক্ষক প্রস্তুতের চেষ্টারও আবশ্যক।

যোগেন্দ্রবাবুর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সমিতি হইতে এতদ্দেশে ইয়োরোপ জাপানে মধ্যে মধ্যে ছাত্র প্রেরিত হইয়া থাকে, সম্প্রতি বেঙ্গল শিল্পবিদ্যালয় হইতেও সাতজন যুবক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষা পাইবার জন্ত আমেরিকায় গিয়াছেন; ইহা অতিশয় সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি আমাদের অভাবের পক্ষে এই আয়োজন একদিকে সামান্য—অন্যদিকে আবার যাহা বিদেশ হইতে

শিখিয়া দেশে ফিরিতেছেন তাঁহারাও সকলে দেশসেবাই ব্রতরূপে গ্রহণ করিতেছেন না! বস্তুতঃ যেদিন আমরা দেখিব বিশ্বের ফাণ্ডমেন্টাল কলেজের ব্রতধারী শিক্ষকগণের জায় বঙ্গদেশেও বিলাত প্রত্যাগত শিক্ষকগণ অন্তর্নিহিত চিন্তাহীনভাবে শিক্ষাদানে নিযুক্ত সেইদিন বুঝিব আমাদের গ্রাসানেল কলেজ বা শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সার্থক।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

ইংরাজের স্বদেশ-প্রেম।

মোগল পাতসাহদিগের রাজত্বের অবসান-কালে ভারতের চতুর্দিকে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। দিল্লির সম্রাট তখন নামে সম্রাট বলিয়া পরিচিত হইতেন। তাঁহার হস্ত হইতে শাসন-বল্লা বিচ্যুত হইয়াছিল। গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে অথবা কার্যকুশলতার অভাবে গৃহের সর্বত্রই যেরূপ বিশৃঙ্খলা পরিদৃষ্ট হয়, মোগল পাতসাহদিগের অকর্মণ্যতায়, দৌর্ভাগ্যে ভারতবর্ষের রাজ্যনিচয়ের তদ্রূপ অবস্থা হইয়াছিল। তখন সকলেই স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কাজেই গৃহ-বিবাদাগ্নি ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল।

এই সময়ে বঙ্গদেশ ইংরাজবণিকদের ক্রমেই করতলগত হইতেছিল। তথায় ইংরাজের প্রভুত্ব লইয়া বিবাদ করিবার আর কেহই ছিল না। উত্তর-পশ্চিমের অবস্থাও প্রায় তথৈবচ হইয়াছিল। দিল্লির সম্রাট কখন মুসলমান রাজদ্রোহী, কখন মহারাষ্ট্রীয়

নরপতির হস্তে ক্রৌড়গকম্বরূপ বিরাজ করিতেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার মানসে কেবল যে ইংরাজ ও ফরাসী রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা নহে; দেশীয় রাজগুণবর্গও স্বাধীনভাবে দাক্ষিণাত্যে গ্রাসের চেষ্টা করিতে বিরত হন নাই। পক্ষাবে শিখের বল প্রবল থাকিলেও অরাজকতার অভাব ছিল না।

ভারতবর্ষের এংবিধ অবস্থায় যুরোপ হইতে দলে দলে খেতাজ আগমন করিতেন। ভারত রত্ন প্রসূ বলিয়া চিরকাল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এই সময়ে ভারতবর্ষ হইতে রত্নাহরণ করা সুবিধাজনক, ইহা অনেকেই অনুমান করিয়া—স্বদেশে উপেক্ষিত অবস্থায়, দৈন্যদশায়, অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া অপেক্ষা ভারতবর্ষে ভাগ্য পরীক্ষার্থ আগমন করা শতগুণে শ্রেয়ঃ ভাবিয়া—কোনরূপে ভারতে পদার্পণ করিতে প্রয়াসী হইতেন। বলা বাহুল্য, ইহাদিগের অধিকাংশেরই আশা পূর্ণ হইত।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমরা যে সময়ের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছি, ভারতবর্ষে তদ্রূপ দুঃসময় পূর্বে কখন উপস্থিত হয় নাই। স্বল্পবুদ্ধি নৃপতিরা সে সময়ে ইংরাজ ও ফরাসীর বল অনুভব করিতে পারিয়াও, আগন্তুক “ভবঘুরে” খেতাবদিগের কলকৌশলে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাদিগেব দ্বারা সৈনিক-বিভাগ অলঙ্কৃত করিতে বিরত হন নাই। তাঁহারা এই শ্রেণীর খেতচর্মীর সাহায্যে পরস্পরে বিবাদ বিসংবাদে মত্ত হইতেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাট, এই অন্তর্ভেদে তাঁহাদিগের রাজ্যাভ্যাকাঙ্ক্ষা কখনই ফলবতী হইবে না। ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাধান্য, বলদৃশুতা তখন কাহারও অগোচর ছিল না। সেই সর্বগ্রাসিনী ক্ষমতা প্রতিহত করণ মানসে দেশীয় রাজত্ববৃন্দ সমবেত না হইয়া আত্মকলহে মত্ত হইলেন, পরস্পরের কণ্ঠচ্ছেদে হস্ত প্রসারণ করিতে লাগিলেন।

দেশীয় নরপতিদিগের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় ভূপতি সিন্ধিয়া সর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। হোলকার প্রবল প্রতিপক্ষ সিন্ধিয়াকে দমন করিবার জন্ত সতত সচেষ্ট থাকিতেন। সিন্ধিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রধান কারণ, তাঁহাদের অধীনে যেরূপ খেতাব সেনাপতি পরিচালিত সুশিক্ষিত সৈন্যদল ছিল, হোলকারের তাহা ছিল না। তখন পূর্বোক্ত “ভবঘুরে” খেতাবগণ ভারতবর্ষে আসিয়াই দেশীয় নৃপতিদিগের অধীনে সৈন্যবিভাগে কর্ম গ্রহণ করিতেন। দেশীয় রাজাদিগেরও বিশ্বাস ছিল, সেনাদলের সুশিক্ষায়, শৃঙ্খলা স্থাপনে খেতাবদিগের ত্রায় দেশীয় সেনানায়কেরা নিপুণ নহেন। এরূপ ধারণা যে

ভিত্তিহীন ছিল, তাহা নহে। বস্তুতঃ সে সময়ে যে রাজার অধীনে যত খেতচর্মী সেনানায়ক থাকিতেন, এবং তাঁহাদিগের পরিচালিত সৈন্যবল যত অধিক থাকিত, সেই রাজারই বল সেই পরিমাণে অধিক হইত। হোলকারের উপর সিন্ধিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব এই নিমিত্তই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই ত গেল আভিজাত্যবর্গের কথা। তাহার পর ভারতবাসী যোদ্ধৃগণের কথা। ইহাদিগের স্বদেশপ্রেম বা স্বজাতিপ্রীতি আদৌ ছিল না। যেখানে অর্থাগমের অধিকতর সুবিধা হইত, সেইখানেই ইহারা গমন করিয়া সৈন্যদল পুষ্টি করিত। ভারতবাসী কৃতঘ্ন নহে বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, এই সময়ে তাহার বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। “নিমকহারামী” তখন দোষের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইত না। ইহারা আজ যাহার “নিমক” খাইত, কল্যাণ আবার তাঁহারই বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইত না। সে সময়ে পিতা পুত্রে, সহোদরে সহোদরে, জাতি কুটুম্বে ভিন্ন ভিন্ন দলের পক্ষভুক্ত হইয়া রণাঙ্গনে পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনার ক্ষান্ত হইত না। এতদপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে ?

যশবন্ত রাও সে সময়ে হোলকারের রাজ্য-সিংহাসনের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিলেন। তাঁহার অগ্রতম সেনানায়ক মেজর আর এল এমব্রোস বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টরদিগের চেয়ারম্যানকে এই সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থার সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, পাঠকের অবগতির নিমিত্ত আমরা তাহার অংশবিশেষের অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ইংরাজি পত্রের মর্ম্মানুবাদ।*

যখনই সিভ্যালিয়ার ডুডারনেগ এবং মর্সিয়ো প্লুমের কথা হোলকারের মনোমধ্যে উদ্ভিত হইত, তখনই তিনি ফরাসীদের নামে ঘৃণা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। ইহার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিতে পারা যায় না। কারণ উক্ত সৈনিকপুরুষদ্বয়কে তিনি সেনানায়কের পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, অথচ উহারা সিক্কিয়া-সেনার আগমনের পূর্বেই, উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী এবং পদাতিক সেনাসহ, রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতেই সিক্কিয়ার নিকট হোলকারকে পবাত্তব স্বীকার করিতে হয়।

হোলকার উক্ত ফরাসীঘরের ব্যবহারে এরূপ বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, ফরাসী দেশেরও নামোচ্চারণকালে তিনি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। তদনন্তর তাঁহার অধীনে যে সকল (Brigades) গঠিত হইয়াছিল, সেই সকল সেনাদলের সেনাপতিগণকে তিনি বিশেষভাবে বলিয়া দিয়াছিলেন, যেন উক্ত “দাগাবাজ” (বিশ্বাসঘাতক) জাতির কোন লোককে আর সৈন্তপদে বরণ করা না হয়।

“যাহারা প্রাচ্য দেশের (ভারতের) অবস্থা পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা বিশেষরূপে জানেন যে, সে দেশে যুদ্ধ-ব্যবসায়ী লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি, সুবিধা পাইলেই, এক রাজার অধীনে

“Holkar detested—justly detested—the name of a Frenchman, when he reflected that by the Chevalier Duderne and Morsieur Plumet, to whom in the first instance he was deserted on the near approach of Scindia’s army and left with his infantry, deprived of officers, to the defeat which he experienced at Indore. So highly irritated was he, that he never mentioned the country without signs of abhorrence, and it was his express order to the commanders of brigades subsequently appointed, that on no account whatever should they afford employment to individuals of a nation by him entitled the *Duggerbas*, or Faithless.

It is well known, to those conversant with the affairs of the East, that there are in that country many hundreds of thousands, soldiers by profession, who wander continually from service to service, from prince to prince, as the pressure of the moment requires their assistance and promises them employment. Gain is their God, and it is perfectly immaterial to them to whom they serve, while they are paid, and the *minutiae* of their caste attended to. That an ulter stranger, with efficient funds, might at any times raise an army in Hindustan, who would follow him and fight his battles as long as his resources were sufficient for the current expenses of the day.

Born soldiers, without any other profession than that of arms, these men eagerly flock to the standard of any adventurer, however desperate his prospects, if he only possesses then *summum bonum* of their happiness. In the minds of these people no such sentiment as *amor patriae* is to be founded, above affection for a few clods of earth or stumps of trees, merely from their having been imprinted on their recollection from the sportive period of infancy. The Indian is, in this point, a citizen of the world. It not unfrequently happens that fathers, sons, and brothers embrace different service, and meet in battle array on the ensanguined plain against each other, perhaps unwitting by to fall by each other hands”.

চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া, অল্প রাজার অধীনে চাকুরী পাইবার জন্ত, নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। অর্থই তাহাদিগের উপাস্ত দেবতা। তাহার কাহার অধীনে কি কার্য্য করিতেছে, তাহা আদৌ ভাবে না, জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়া অর্থলাভ করিতে পারিলেই তাহার কৃতার্থ হইত। এমন কি, যদি কোন ভিন্নদেশীয় লোকও (অর্থাৎ ভারতবাসী নহেন) সৈন্তদিগের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহকরণোপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষেও সৈন্তদল গঠন কোনরূপে ছুষ্কর কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয় না। এই সকল সৈন্ত তাঁহার পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক সমরাজ্ঞে অবতীর্ণ হইতে কুঠাবোধ করে না। ইহারা জন্মাবধিই যোদ্ধৃপুরুষ, অস্ত্রচালনা ব্যতীত অল্প ব্যবসায় জানে না। অসাধ্য সাধনার্থও যদি কেহ ইহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ করান, অর্থ পাইলে, ইহারা তাহাতেও পশ্চাৎপদ নহে। ইহাদিগের “স্বদেশ প্রেম” বলিয়া কোন বৃত্তি নাই, কেবল বাল্যের ক্রীড়াভূমি পাদপশ্বেণী-পরিশোভিত কয়েকটা মৃত্তিকাখণ্ড ইহাদিগের হৃদয়ে সময়ে সময়ে প্রীতিপূর্ণ স্মৃতিকে জাগাইয়া তোলে। এই বিষয়ে ভারতবাসীকে জগদ্বাসী বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। পিতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রমুখ স্বজননিচয় ভিন্ন ভিন্ন লোকের অধীনে পদগ্রহণ করিয়া যুদ্ধস্থলে পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পরাঙ্গুথ হয় না; এমন কি, একের হস্তে অস্ত্রের নিধনপ্রাপ্তিও যে বিরল ঘটনা এমনও নহে।”

ভারতের এবংবিধ অবস্থার সময়, আর্ম্‌ষ্ট্রং

নামক জনৈক ইংরাজ সৈনিকপুরুষ হোলকারের সেনাবিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। আর্ম্‌ষ্ট্রং মেজরের পদে উন্নীত হন। ডুডারনেগ এবং প্লুমে নামক হোলকারের ফরাসীসেনাপতিদ্বয় যখন সিন্ধিয়ার সেনাগমন দেখিয়া ভয়ে কাপুরুষের ন্যায় স্বদলে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল—অন্নদাতা প্রভু হোলকারের সর্ব্বনাশ সাধনে ইতস্ততঃ করিল না—তখন হোলকার গত্যস্তর না দেখিয়া আর্ম্‌ষ্ট্রংকে মেজর প্লুমের পদে নিযুক্ত করেন। পাঠক! উপরি-উদ্ধৃত পত্রের অনুবাদ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, ডুডারনেগ ও প্লুমের বিশ্বাসঘাতকতায় হোলকার সমগ্র ফরাসী-জাতির উপর কিরূপ বিরক্ত হইয়াছিলেন; এমন কি; ইহাদিগকে “দাগাবাজ” বলিয়া অভিহিত করিতেও বিরত হন নাই।

যাহা হউক, ১৮০২ খৃষ্টাব্দে হোলকারের অনুকম্পায় তদীয় দ্বিতীয় সৈন্তদলের অধিনায়কের পদে মেজর আর্ম্‌ষ্ট্রং বরিত হইয়া সেই বৎসরেই পুণার যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মেজর আর্ম্‌ষ্ট্রংএর কার্য্যকাল দীর্ঘ হয় নাই। কারণ পর বৎসরে অর্থাৎ ১৮০৩ সালে ইংরাজ-কোম্পানীর সহিত হোলকারের যুদ্ধ বাধে। হোলকারের বিশ্বাস ছিল, তাঁহার অর্থে পুষ্ট ইংরাজ সেনানীবৃন্দ তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে, “নিমকহারামী” করিবে না। কিন্তু তাঁহাব এই সিদ্ধান্ত যে ভ্রমপূর্ণ, কার্য্যকালে তিনি তাহার প্রমাণ পাইলেন। হোলকার স্বয়ং ভারতবাসী। স্মরণ্য তদানীন্তনকালের ভারতবাসীর ন্যায় তাঁহারও স্বজাতিপ্রীতি, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতির মর্ম্মাবগত

হইবার শক্তি ছিল না। যাহার বলে ইংরাজ জাতি আজি সমাগরা ধরিত্রীর অধিপতি বলিলেও অতুক্তি হয় না, সেই স্বজাতিপ্ৰীতি, স্বদেশপ্রেমিকতা আবহমান-কাল ইংরাজের অস্থিমজ্জায় সংবদ্ধ হইয়া আছে। কাজেই ইংরাজ কোম্পানীর সহিত যখনই হোলকারের বিবাদ বাধিল, তখনই হোলকারের ইংরাজ সৈনিক কর্মচারীরা পদ ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। ইংরাজ চরিত্রের এই মহত্ব হোলকার বুঝিতে পারিলেন না, তিনি ক্রোধাক্ত হইয়া ভাইকার্স, ডড এবং রায়েল নামক ইংরাজসৈনিক কর্মচারীদিগের প্রাণসংহারে আদেশ দিলেন। মেজর আর্মস্ট্রং ইহাতেও বিচলিত হইলেন না। তিনি স্বদেশের পতাকার বিরুদ্ধে কখনই অস্ত্রধারণ করিবেন না স্থির করিলেন। বহুকষ্টে নানা প্রকার বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি হোলকার রাজ্য হইতে অবশেষে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই মহত্বে ইংরাজ গবর্নমেন্ট মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে জীবনের অবশিষ্টকাল পর্য্যন্ত মাসিক বারশত টাকা

পেন্সন ভোগ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

এই ঘটনায় ইংরাজ ও ভারতবাসীর চরিত্রের পার্থক্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মেজর আর্মস্ট্রং প্রভৃতির স্থায় ভবনুরে ইংরাজ স্বদেশে উদরান্নের সংস্থান করিতে না পারিয়া, উদরপূর্তির দায়ে আত্মীয় কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহাদিগের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হয়। অথচ তাঁহারা স্বপ্নেও স্বদেশদ্রোহিতা করিবার কল্পনা করিতে পারেন নাই, প্রাণপাত করিয়া স্বদেশের সেবা করিয়াছিলেন। আর ভারতবাসী—স্বদেশে থাকিয়া, স্বজাতির অগ্নে পুষ্ট হইয়া, স্বদেশদ্রোহী হইয়া, আত্মীয়স্বজন, জাতিকুটুম্ব প্রভৃতির কণ্ঠচ্ছেদে পশ্চাৎপদ হয় নাই। তুলনায় আলোচনা করিলে বলিতে হয়, একটি স্বর্গের দৃশ্য, অপরটি রোরবের জঘন্য নিকৃষ্ট চিত্র। যাহার চক্ষু আছে, যাহার হৃদয় আছে, তিনিই ইংরাজের এই গুণ দেখিতে পান, ইংরাজের এই চরিত্রমাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সুশ্রুত।

কি ঐহিক বিষয়, কি আধ্যাত্মিক বিষয়, কি বিজ্ঞান, কি জ্যোতিষ, যদিকে দৃষ্টিপাত করি হিন্দুজাতির অপার ভূয়োদর্শন ও গভীর পাণ্ডিত্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হই; অপিচ আমিও যে এই জাতি সমুদ্রের একটা কণামাত্র ইহা মনে করিয়া গৌরবান্বিত বোধ করি। সুশ্রুত

কাশিরাজ দিবোদাস ধর্ম্মস্তুরির জনৈক শিষ্য। গুরুপ্রোক্ত শল্যতন্ত্র বা ক্ষারদাহন ও অস্ত্রনিষ্পন্ন চিকিৎসাশাস্ত্র ইনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; তাহাই কালক্রমে সুশ্রুত নাম ধারণ করিয়াছে। গ্রহকর্তার নাম হইতে গ্রহের নামকরণ হইয়াছে। আয়ুর্বেদ অথর্ব-

বেদের উপাঙ্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । এই আয়ুর্বেদ স্বয়ম্ভু এক লক্ষ শ্লোকে ও সহস্র অধ্যায়ে প্রণয়ন করেন । ইহাতে অষ্ট বিষয়ের উল্লেখ আছে ; ইহাই চিকিৎসা শাস্ত্রের অষ্টাঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে — যথা শল্য, শাল্যাক, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভূত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ও বাজিকরণতন্ত্র ।

যে সূত্রত সংহিতা আমরা দেখিতে পাই ইহা ভগবান সূত্রতের রচিত নহে । ইহা নাগার্জুন নামক জনৈক নৃপতি দ্বারা প্রতি-সংস্কৃত সূত্রবাং সূত্রতের ছায়ামাত্র । সূত্রত সংহিতার টীকাকার ডব্বন ইহা লিখিয়াছেন । প্রতिसংস্কর্তা নাগার্জুন এবং বাগ্ভটও আভাষে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন যথা :—
ঋষিপ্রণীতে ভক্তিশ্চেনুক্তা চরক সূত্রতো ।
ভেলাত্বাকিংন পঠ্যন্তে তস্মাদ্গ্ৰাহং সূত্রাষিতং ।
(অষ্টাঙ্গ হৃদয়)

অর্থাৎ যদি ঋষি প্রণীত গ্রন্থে ভক্তি থাকে তাহা হইলে চরক সূত্রত পরিত্যাগ করিয়া ভেল লিখিত চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত সূত্রবাং যাহা সূত্রাষিত তাহাই সুধি-গণের গ্রহণীয় হইয়া থাকে ।

অপিচ চরক সূত্রতের টীকায় টীকাকারগণ বৃদ্ধসূত্রত হইতে প্রমাণস্বরূপ বচন উদ্ধার করায় বুঝা যাইতেছে সূত্রত ঋষির গ্রন্থ তাঁহাদের সময়ে সংসারে বিরাজিত ছিল—তখনও তাহার লোপাপত্তি ঘটে নাই ।

বিজয় রক্ষিত মাধবনিদানের জর-টীকায় লিখিয়াছেন—“পুষ্পেভ্যোগন্ধরজসৌ,—
জস্যেভ্যো যথানিলঃ ইত্যাদিনা বৃদ্ধসূত্রতেন
পঠিতং—তৃণপুষ্পাখ্যং জর মত্রেবাস্তর্ভাবয়তি ।”

অর্থাৎ পুষ্প হইতে গন্ধ ও পরাগ এবং অগ্নি হইতে যেমন বায়ু বৃদ্ধ সূত্রতের এই বচন দ্বারা সেইরূপ তৃণপুষ্পাখ্য জরের বিষয় প্রকাশ পাইতেছে ।

সূত্রত যে hay ও malaria fever জানিতেন ইহাই তাহার প্রমাণ । কিন্তু ইহা সূত্রত সংহিতাতে নাই ।

চক্রবর্ত্তের বাতব্যাদিপ্রাপ্ত শাল্লন শ্বেদের টীকায় শিবদাস লিখিয়াছেন—

বৃদ্ধ সূত্রতে তু কাকোল্যাদি যথা—
কাকোল্যো মধুকামোদে জব কর্ষভকৌ সহে ।
ঋকিবৃদ্ধিস্তু শাক্ষীরী পুণ্ডরীকাং সপদ্মকং ।
জীবন্তী সামৃতাশ্শ্বী মৃধীকাচেতি কুত্র'চৎ ।
কাকোল্যাতিরয়ং পিত্তশোণিতানিলনাশনঃ ॥

সূত্রতসংহিতা সূত্রস্থান ৩৯ অধ্যায়ে ইহা গণ্ডে আছে ।

বৃদ্ধের সিদ্ধযোগ অর্শাধিকারে পিপ্পল্যাদি তৈল টীকায় শ্রীকণ্ঠ বলেন—“বৃদ্ধ সূত্রতে তু তৈলেহস্মিংশ্চতুগুণং তোয়ং দর্শিতং” ।

অতএব দেখা যাইতেছে নাগার্জুন প্রতি সংস্কার করিতে গিয়া বৃদ্ধ সূত্রতকে নূতন করিয়া গড়িয়া ফেলিয়াছেন । তাঁহার মনোহর পদ্যগুলি ভাঙ্গিয়া গণ্ডাকার প্রদান করিয়াছেন । হিন্দুর দৃষ্টিতে ইহা ভাল হয় নাই ।

বর্ত্তমান সূত্রতসংহিতা ছয় ভাগে বিভক্ত যথা—সূত্রস্থান, শারীরস্থান, নিদান-স্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান, ও উত্তরতন্ত্র । সূত্র ও শারীর স্থানের অধিকাংশ গণ্ডে লিখিত মধ্যে মধ্যে ‘ভবতি ভবতঃ ভবন্তি চাত্ৰ’ বলিয়া এক দুই বা অধিক ছত্র পণ্ডের উদ্ধার আছে । বোধ করি ইহাই বৃদ্ধ সূত্রতের প্রতি সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ । নিদান ও চিকিৎসা স্থানের

অধিকাংশ পণ্ড, অল্প গণ্ড। আমার মতে এই পণ্ডের অল্প বিস্তার বৃদ্ধ সুশ্রুতের বচন হইতে পারে। কল্প ও উত্তর তন্ত্র সম্পূর্ণ পদ্যে রচিত। ইহা নাগার্জুন কর্তৃক রচিত। ভাষা মার্জিত প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট, বিষয় মনোহারী;—পাঠে পুরাকালের অনেকানেক তন্ত্রের অবগতি হয়। যাঁহারা ইহা একবার পড়িয়াছেন তাঁহারা ভগবান ধনন্তরির অসীম জ্ঞানরাশির পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। আর যে ধৃষ্টবুদ্ধিগণ আধুনিক ইউরোপায় চিকিৎসার বহুমান করিয়া নিজের বস্তুকে অকিঞ্চিৎকর মনে করেন তাঁহারা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া পাঠ করিলে নিজের দুর্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিয়া লজ্জিত হইবেন।

আত্রেয় শিষ্য অগ্নিবেশ স্বীয় নামে যে তন্ত্র প্রণয়ন করেন তাহা পরবর্তী কালে চরক ঋষি কর্তৃক প্রতিসংস্কৃত হইয়া চরক নাম ধারণ করিয়াছে। এই চরকে যে অভাব ছিল তাহা পঞ্চনদবাসী বিদ্বান দৃঢ়বল পূরণ করেন এবং কল্প ও সিদ্ধিস্থান গুলিও সংযোজিত করিয়া দেন—যথা

অস্বিন্ সপ্তদশাধ্যায়াঃ কল্প সিদ্ধয়ঃ এব চ।
নাশ্চাত্তস্তেহগ্নিবেশস্ত তন্ত্রে চরক সংস্কৃতে ॥
অথ গুর্থাঃ দৃঢ়বলোজাতঃ পঞ্চনদেপুরে।
কৃৎন্য বহুভ্যস্তন্ত্রেভ্যো বিশেষাচ্চবলোচ্চয়ং।
সপ্তদশোষধাধ্যায়ান্ সিদ্ধিকল্পৈরপূরয়ৎ।

চরক চিকিৎসাস্থান ৩০ অধ্যায়।

অর্থাৎ—চরক সংস্কৃত অগ্নিবেশতন্ত্রে ১৭ অধ্যায়ে পূর্বকল্প ও সিদ্ধি সন্নিবিষ্ট ছিল না তাহা পঞ্চনদবাসী দৃঢ়বল চরক সম্পূর্ণ করিবার জন্ত যোজনা করিয়াছেন।

ইনি নিজের নাম প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন,

নাগার্জুন তাহা করেন নাই; কেন ইহা জিজ্ঞাসিত হইতে পারে?

নাগার্জুন জনৈক বৌদ্ধনৃপতি ছিলেন। রাজতরঙ্গিনীমতে ইনি কাশ্মীররাজ অভিমুখার রাজ্যকালে প্রাদুর্ভূত হন এবং সেই সময় বৌদ্ধগণ প্রবল হওয়ায় কাশ্মীরও শাসন করিয়াছিলেন যথা,—

আবিভুবাভিমম্ব্যঃ শতমম্ব্যরিবাপরঃ।

তস্মিন্নবসরে বৌদ্ধাঃ দেশে প্রবলতাংযযুঃ।

নাগার্জুনেন সুধিয়া বোধিসত্ত্বেন পালিতা।

এই বিদ্বান নাগার্জুন মহাঘান নামক বৌদ্ধধর্ম পদ্ধতি নিয়ামকগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সুতরাং ইঁহার প্রতিসংস্কারের অধীনে পড়িয়া বৃদ্ধ সুশ্রুত মাংসবর্জিত কঙ্কালে পরিণত হইয়াছেন। পরবর্তী কালে হিন্দুর নিকট বৌদ্ধগ্রন্থের যে বিষম পরিণামের বিষয় শ্রুত হওয়া যায়, বৌদ্ধপ্রভাবকালে হিন্দুগ্রন্থের প্রতি সেপ্রকার কিছু হইয়াছিল কিনা তাহা শ্রুত হওয়া যায় না। তবে চিকিৎসাশাস্ত্র মানব ও জীবজন্তুর প্রতি হিতকরী বলিয়া এই শাস্ত্রে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। অন্য সাধারণ ঋষিপ্রণীত গ্রন্থে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হয় নাই বলিয়া স্বয়ং বিক্রমশালী রাজা তাহার সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রতি সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়া ঋষির পণ্ডগ্রন্থিত অংশের বিলোপ সাধন করিয়া তাহার ভাবার্থমাত্র গণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। টীকাকারগণের উদ্ধারদ্বারা বোধ হয় ইনি বৃদ্ধসুশ্রুতের অনেক অংশ বাহুল্য বোধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাতে ত্রিকালজ্ঞ ঋষির রচনার অভাব স্বভাবতঃ আমাদের মনকে বিকল করিতেছে।

নাগার্জুন কতকগুলি বিসদৃশ কথাও লিখিয়াছেন। সকলেই জানেন বেদের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দুগণ,—শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শাস্ত্র সম্মত এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে ছয় ঋতুকে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু স্মৃশ্রুতসংহিতায় প্রচলিত পর্য্যায় পার্শ্বে বর্ষা শরৎ হেমন্ত বসন্ত গ্রীষ্ম প্রাবৃট এইরূপ ক্রম-উল্লেখ করা হইয়াছে। উত্তরতন্ত্রের উপসংহারেও এই শেবোক্ত ঋতুপর্য্যায়ই দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা দুইটি বিষয় অবগত হওয়া যায়— ১ম—স্মৃশ্রুতের বহুকাল পরে প্রতिसংস্কারক প্রাহুভূত হন। ২য়—তিনি কোন বর্ষা বহুল দেশের অধিবাসী ছিলেন। হৃক্ষজুক্ষর্কনিক্স আদি তুরক্ষবংশীয় বৌদ্ধ নৃপতিগণের মথুরার নিকটবর্তী উৎকীর্ণ শিলালিপিদ্বারা জানা যায় যে তাঁহারাও ঋতুপর্য্যয়ে প্রাবৃট-কালেরই প্রথম উল্লেখ করিয়াছেন। স্মুতরাং আশ্চর্য্য নাই যে ঋতুর এই শেবোক্ত ক্রমই বৌদ্ধগণেরই অনুমোদিত হইবে। শুনিলাম পারসীকগণও বর্ষাকে আদি স্বীকার করিয়া ঋতু গণনা করেন। হিন্দুগণ প্রাবৃটকে বর্ষা পর্য্যয়েই ধরিয়ান—যথা শরৎকালং প্রতীক্ষস্ব প্রাবৃট-কালোহয়মাগতঃ। রামায়ণ কিঙ্কি ২৭অ ৩৯। আবার ২৬ সর্গে বর্ষার ও শরতের চারি মাসকে বার্ষিক সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে যথা— পূর্কোহয়ংবার্ষিকোমাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ। প্রবৃতাঃ সৌম্য চত্বারঃমাসাবার্ষিকসংজ্ঞিতাঃ ॥১৪ কার্ত্তিকে সমনুপ্রাপ্তে স্বং রাবণ বধে যতঃ। ১৭ রামায়ণের এই লেখাদ্বারা বেশ বোধ হইতেছে প্রাবৃট বর্ষা হইতে ভিন্ন ঋতু নহে। আমার

বোধ হয় এই বার্ষিক সংজ্ঞাই পরবর্তীকালে বর্ষা প্রাবৃটের বিভিন্ন ঋতুকল্পনার মূল।

সংস্কর্তা চরকের ত্রায় স্মৃশ্রুতের স্থলে নাগার্জুন যদি স্বীয় নাম দিতেন তাহা হইলে তাহা জনসমাজে গৃহীত হইত কি না সন্দেহ। প্রথমতঃ তিনি ঋষি ছিলেন না স্মুতরাং তাঁহার রচনাও প্রমাদহীন হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। এই নিমিত্তই নাগার্জুন স্মৃশ্রুত নামের লোপসাধন যুক্তিসিদ্ধ মনে করেন নাই। প্রত্যুত স্থানে স্থানে ঋষিগণের প্রতি সম্মানের সহিত উল্লেখ আছে, এবং কোনস্থলেই গ্রন্থ বা শাস্ত্রের নিন্দাবাদ নাই।

একগণে স্মৃশ্রুতসংহিতা হইতে কতকগুলি বিষয় উদ্ধার করিয়া ঋষির পাণ্ডিত্য ও প্রমাদ বিহীনতা প্রদর্শন করিয়া সময় নির্ধারণ করিতে অগ্রসর হইব। ইউরোপীয়গণ এত বিজ্ঞান চর্চা করিয়াও অত্যাধি স্থির নিশ্চয় করিতে পারে নাই যে শরীরাত্ম্যন্তরে প্লীহা যন্ত্রটি কি কার্য্য করে। এপ্রকার শ্রুত হওয়া যায় যে একজন অহম্মত্ত ডাক্তার এই যন্ত্র নির্মাণের জন্ত ঈশ্বরের প্রতি অদূরদর্শিতার আরোপ করিয়া নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অপিচ স্বয়ং একটা কুকুরের উপর আক্ষুরিক পরীক্ষাও দ্বারা প্লীহাটী কর্ত্তিত করিয়া দেখিয়াছিলেন; কুকুরটী ছয়পুষ্টি হইয়া দিন কতক জীবিত ছিল। স্মুতরাং ডাক্তারের অত্রান্ত সিদ্ধান্ত অপনৌত হইল না। যাহা হউক এই তামসিক জ্ঞানের সহিত স্মৃশ্রুতোক্ত ধীর শাস্ত্র মতের তুলনা করুন, দেখিবেন উহাতে কি সাম্বিক জ্ঞান রাখি নিহিত রহিয়াছে। স্মৃশ্রুত সূত্র স্থান ১৪ অধ্যায়ে যাহা লিখিত আছে তাহার অনুবাদ এই;—

“পাঞ্চভৌতিক ষড়রসময় চর্বাচোষ্যলেখ্য পেষ এই চতুর্বিধ যে আহার আছে ইহার সম্যক পরিণতির যে তেজোভূত পরমসূক্ষ্ম সার তাহাকে রস বলে । ইহার স্থান হৃদয় । তাহাই হৃদয় হইতে দশ উর্দ্ধে নিম্নে দশ ও তির্য্যগ্ ভাবে চার এইরূপে চতুষ্টিংশতি ধমনীতে প্রবাহিত হইয়া কৃৎস্নশরীরকে বেষ্টনপূর্বক অদৃষ্টকর্ম্মবলে তৃপ্তি প্রদান, বর্দ্ধন, ধারণ, নিঃসারণ ও জীবনৌ শক্তি প্রদান করিতেছে । অতএব ক্ষয়বৃদ্ধিবিকার দ্বারা শারীরিক রসের গতি অনুমান করিবে ।”

এখন এই সর্কশরীর ব্যাপ্ত রস সম্বন্ধে প্রশ্ন এই যে—ইহা জলীয় না আশ্লেয়? স্নিগ্ধতা, সজীবতা, তৃপ্তিসাধন, ধারণাদি দ্রবণীয় পদার্থের গুণ থাকায় ইহা সৌম্য বলিয়াই বোধ হয় । সেই জলীয় রস যকুৎ প্লীহার উপাস্থিত হইয়া রক্তবর্ণ প্রাপ্ত হয় । ঋষি তাহাই অত্র যে দুই শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা এই; “এই যকুৎ প্লীহান্তর্গত রস শরীরস্থ অগ্নিদ্বারা রঞ্জিত হইয়া প্রসন্নতা (নিঃশূলতা ক্লেদহীনতা) প্রযুক্ত রক্ত নামে অভিহিত হয় । জলীয় বলিয়াই স্ত্রীলোকের রক্তকে রজ বলে তাহা দ্বাদশবর্ষে উৎপন্ন হইয়া পঞ্চাশৎ বর্ষে ক্ষয়-প্রাপ্ত হয় ।”

অতএব দেখা গেল যকুৎ প্লীহাই রক্ত প্রস্তুত করিবার যন্ত্র । এই মত পাশ্চাত্য কি পুরাতন বা আধুনিক কোন গ্রন্থে নাই স্মরণ্য ইহা যে ভারতীয় ঋষিগণের মৌলিক মত তাহার কোন সন্দেহ নাই ।

পাশ্চাত্যগণ বলিয়া থাকেন যে হিন্দুগণ চিকিৎসা শাস্ত্র গ্রীকদিগের নিকট শিক্ষা

করিয়াছেন । উপরিউক্ত ঋষিবচন দ্বারা এই প্রলাপও নিরস্ত হইল ।

“শরীরে ৩৬০ খানি অস্থি আছে ইহা বেদবাদী-গণের উক্তি কিন্তু শল্যতন্ত্রদ্বারা ৩০০ খানি অস্থিরই অস্তিত্ব পাওয়া যায় । তাহার মধ্যে শাখা অর্থাৎ হস্তপদ বাহু জানু জঙ্ঘা আদি স্থানে ১২০ খানি ; নিতম্ব পঙ্কর পৃষ্ঠ উদর ও বক্ষে ১১৭ খানি গ্রীবা ও তাহার উর্দ্ধ মস্তকে ৬৩ খানি,—সকলের সমষ্টি ৩০০ খানি ।” শাবীবস্থান ৫ম অধ্যায় ।

এস্থলে বেদের সহিত উক্তি বিভিন্ন হওয়ার ঋষি ভীত হইলেন নাই ; তাঁহার ভয়ের কোন কাবণও ছিল না । কেন না তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ২র্থার্থ মতই ব্যক্ত করিয়াছেন । এ ত আর বাইবেল শাসিত দেশ নহে যে তাহার একটা ভ্রান্ত বচন খণ্ডিত হইলে খণ্ডনকারী শূলোপরি দণ্ডভোগ বা যাবজ্জীবন কারাবাস ভোগ করিবে । ইহা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ । এখানে ভূম্মোদর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা নির্মলীকৃত জ্ঞানলাভ করাই ঋষিগণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল । কপিলদেব যজ্ঞের দোষ উল্লেখ করিয়া মোক্ষের অল্পপযুক্ত বলিয়াছেন তথাপি তিনি বেদে সন্মানই বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন । তিনি রামায়ণে ঈশ্বরাবতার বলিয়া কথিত হইয়াছেন । মহাভারতে তাঁহার বহু প্রশংসা পাওয়া যায় এবং ভগবদ্গীতায় তাঁহার সাংখ্যযোগ জ্ঞান যোগের নামান্তর বলিয়া লিখিত হইয়াছে । পরবর্ত্তীকালেও ধীশক্তি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ যুবা আর্ষ্যভট্ট প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে পৃথিবীর দৈনন্দিন আবর্ত্তন ও শূন্যে সূর্য্য প্রদক্ষিণরূপ স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়া জ্যোতিষীগণের

তর্কের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তজ্জন্ম কোনরূপ দণ্ড ভোগ করেন নাই।

“গর্ভে ভ্রূণের প্রথম মস্তক উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহা শৌনক বলিয়াছেন কারণ মস্তকই দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের মূল। কৃতবীর্যের মতে হৃদয়, কারণ তাহাই বুদ্ধি ও মনের স্থান। পারাশর্য্য বা পরাশর মতে নাভি, যে হেতু নাভি অবলম্বন করিয়া দেহ বন্ধিত হইয়া থাকে। মার্কণ্ডেয় মতে হস্তপদ, কাবণ গর্ভ তাহাই অবলম্বন করিয়া স্পন্দিত হয়। গৌতম স্মভূতির মতে মধ্যশরীর, যেহেতু সকল শরীর তাহাতে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার কোনটাই যথার্থ নহে যেহেতু ধনুস্তরির বলেন শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যুগপৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে; গর্ভের সূক্ষ্মত্বপ্রযুক্ত উপলব্ধি হয় না। উদাহরণস্বরূপ বংশাকুর ও আত্রকল। আত্র পরিপক হইলে কালপ্রভাবে কেশর (আঁশ) মাংস (শাঁস) অস্থি (আঁটি) মজ্জা (কশি) গুলি যেমন পৃথক পৃথক প্রকাশিত হয় তরুণ অবস্থায় সূক্ষ্মত্বপ্রযুক্ত সেইগুলি দৃষ্ট হয় না। কালই তাহার কেশরাদি প্রব্যক্ত করিয়া দেয়। এইরূপে বংশাকুরও বাধ্যত হইতে পারে সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল যে গর্ভের তরুণাবস্থায় সর্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বর্তমান থাকিলেও সূক্ষ্মতানিবন্ধন ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। তাহাই পরবর্তীকালে প্রব্যক্ত হইয়া ওঠে।” শারীরস্থান তৃতীয় অধ্যায়।

এই বচনে পাঠকবর্গ দেখিবেন ধনুস্তরির যুক্তি ও সিদ্ধান্তে কত সারবত্তা রহিয়াছে। তাঁহার যুক্তি অখণ্ডনীয় ও সিদ্ধান্ত দোষশূণ্য। এখানে অনেকগুলি ঋষির মত উদ্ধৃত করা

হইয়াছে। ইঁহার সকলে যে ধনুস্তরির পূর্ববর্তী তাহা বোধ হয় না। স্মভূতি গৌতম ত বুদ্ধদেবের জনৈক আত্মীয় ও শিষ্য এবং কৌমারভূত্য নামক বালচিকিৎসা শাস্ত্রের প্রণেতা। পারাশর্য্য অর্থে পরাশর পুত্র অর্থাৎ ব্যাসদেব। তিনি কোন চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রণেতা কিনা তাহা স্রুত হওয়া যায় নাই। তিনি ধর্ম্মচর্চা ও যোগাভ্যাসেই রত থাকিতেন। তবে আত্রের পুনর্বস্তু ছয় শিষ্যের মধ্যে একজনের নাম পরাশর ছিল এবং জ্যোতির্বেত্তা পরাশরেরও নাম স্রুত হওয়া যায়। ধর্ম্মসংহিতাপ্রবক্তা পরাশর মুনির বিষয়ও শোনা যায়। ইঁহার সকলেই এক বা বিভিন্ন ব্যক্তি তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে নাগার্জ্জুন যে চিকিৎসাশাস্ত্রপ্রণেতা পরাশরকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা আমাদের অনুমান মাত্র।

চরক ও সূশ্রুত উভয় গ্রন্থেই গোমাংসের গুণ ও ব্যবস্থা উক্ত হইয়াছে (চরকবিমান স্থান ৮ম অধ্যায়)। আবার পরক্ষণেই তাহা উষ্ণ অসাত্ম্য—অর্থাৎ যাহা হৃদয় গ্রহণ করিতে চায় না—যাহা আত্মার ভাল লাগে না;—ও অপ্রশস্ত বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। (চরক চিকিৎসাস্থান ১৫ম অধ্যায়)। অতএব ইহা নিশ্চয় যে, এ দেশের পক্ষে ইহা অস্বাস্থ্যকর ও অখাণ্ড।

চরকে ধনুস্তরীয় চিকিৎসকদের বিষয় এবং ধনুস্তরিকে প্রণাম আদি লিখিত থাকায় আত্রের পুনর্বস্তু ও ধনুস্তরির সমসাময়িকতা প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার ঋষিসংঘে সম্মিলিত হইয়া মানব-হিতকল্পে আয়ুর্কর্ষেদের একএকটি অঙ্গের উপদেশ দিতে প্রতিশ্রুত হন। শিষ্যগণ

তাহাই লিপিবদ্ধ করেন। সেই সেই গ্রন্থ শিষ্য নামে সংসারে প্রচারিত হয়। অধুনা চরক ও সুশ্রুতই কালের স্রোত অতিক্রম করিয়া অবশিষ্ট রহিয়াছে। নাগার্জুনের সময় জনক রাজার শালাক্যশাস্ত্র, কোমারভৃত্য

শাস্ত্র এবং অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর হারীত ও ক্ষারপাণি আত্রেয়ের এই ষট্‌শিষ্য-রচিত তন্ত্র বা চিকিৎসাশাস্ত্র বর্তমান ছিল। উত্তর তন্ত্রে ইনি তন্ত্র শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

সেক্সপীয়র সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

ইংরাজী সাহিত্যে সেক্সপীয়র সর্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার নাটকাবলী মানবচরিত্রের দৃশ্যপট স্বরূপ। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, জগতের এই সাহিত্য সম্রাটের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা নাই।

নিকোলাস রো সর্বপ্রথমে সেক্সপীয়রের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছিলেন। তৎপরে ম্যালোন্ বহু অনুসন্ধান ও অধ্যবসায় দ্বারা সেক্সপীয়র সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

কবির পিতার নাম ছিল জন্ সেক্সপীয়র। আশ্চর্যের বিষয় এই যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবির পিতা নিজের নামটী পর্য্যন্ত লিখিতে পারিতেন না! কবির মাতা মেরী আর্ডেন ওয়ারউইক সায়াবের প্রাচীন আর্ডেন বংশ-সম্পত্তা। ষ্ট্রাটফোর্ড নগরে কবির জন্ম।

১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দের ২৬শে এপ্রিল উইলিয়ম সেক্সপীয়রকে খৃষ্টধর্মের দীক্ষিত করা হয়। তদানীন্তন রীতি অনুসারে তিন দিবসের মবজাত শিশুকে দীক্ষিত করা হইত। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে ২৩শে এপ্রিলই সেক্সপীয়রের জন্মদিন। ১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দের ষ্ট্রাটফোর্ড নগরে প্লেগ

ব্যাদির প্রাচুর্ভাবে গড়পরতায় ১৪০০ লোকের মধ্যে প্রায় ২৪০ জনের মৃত্যু হয়। ইংরাজী সাহিত্যের গৌরব বর্ধনের জন্মই বোধ হয় বিধাতা এই শিশুটিকে রক্ষা করিয়াছিলেন!

সেক্সপীয়রের চরিত্রে যে নারীসুলভ কোমলতা এবং সৌন্দর্য্য পরিলক্ষিত হইত সে সমস্ত তাঁহার জননীর আদর্শ এবং শিক্ষা হইতে অর্জিত। স্ত্রীজাতির শ্রেষ্ঠ গুণরাশি তাঁহার জননীর চরিত্রে বর্তমান ছিল, এবং তাঁহার চরিত্র হইতেই তিনি নারীচরিত্র সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

টমাস্ জলিফ্ প্রতিষ্ঠিত (Thomas Jolyffe) ষ্ট্রাটফোর্ডের একটি অবৈতনিক স্কুলে সেক্সপীয়র শৈশবে অধ্যয়ন করেন, এবং একটুখানি ল্যাটিন ও তদপেক্ষাও অল্প গ্রীকভাষা শিক্ষা করেন। সম্ভবতঃ পরে তিনি কিছুকাল এই স্কুলে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন।

অনেকে তাঁহার লেখা হইতে এইরূপ অনুমান করেন, যে তিনি কিছুকাল আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিম্বা তাঁহার আত্মীয় ষ্ট্রাটফোর্ডের এটর্নি টমাস্ গ্রীনের নিকট হইতে তিনি এবিষয়ে যৎসামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও হইতে পারে।

১৫৮২ খ্রীঃ অব্দে ১৯ বৎসর বয়সে সেক্সপীয়র সন্নিকটস্থ শটারি (Shottery) গ্রামের কুমারী অ্যান্ হ্যাথ্‌ওয়েকে বিবাহ করেন। অ্যান্ সেক্সপীয়র অপেক্ষা ৮ বৎসরের বড় ছিলেন। আধুনিক কয়েকজন সমালোচকের মতে সেক্সপীয়র এই বিবাহে সুখী হইতে পারেন নাই। প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার তৎপ্রণীত দ্বাদশ রাত্রি 'Twelfth Night' নাটকের নিম্নলিখিত কয় পংক্তি উদ্ধৃত করেন—

“Let the woman take
An elder than herself ;
So wears she to him,
So sways she level in her
husband's heart.

* * * *

Then let thy love be younger
than thyself,
Or thy affection cannot hold
the bent.”

(II. 4.)

ইহাতে সম্রাট পুরুষবেশী ভায়োলাকে বয়ঃকনিষ্ঠা কোনো রমণীকে বিবাহ করিতে উপদেশ দিতেছেন। সমালোচকেরা বলেন যে সেক্সপীয়র স্বয়ং বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীকে বিবাহ করিয়া পরে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ছিলেন, এবং ঐ ঘটনা স্মরণ করিয়াই এইরূপ লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহা হইতে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়না একথা বলা বাহুল্য। ইহা কেবলমাত্র সমালোচকদিগের একটি অনুমান। সমালোচক হাড্‌সন্ ইহার বেশ উক্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

“কাহারো হৃদয়ে কোনো গুপ্ত বেদনা থাকিলে পরের হৃদয়ের সে বেদনার কথা সে কিছুতেই বলিবে না”।

সমালোচক গ্রাণ্ট হোয়াইট বলেন যে অ্যান্ অতি নীচ প্রকৃতি এবং পুরুষ স্বভাবা ছিলেন। সুতরাং বিবাহের পর অতি অল্পদিনের মধ্যেই সেক্সপীয়র তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করেন, এবং তাঁহার ঘৃণিত সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবার অভিপ্রায়ে লণ্ডন নগরে প্রস্থান করেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। অবশ্য বিবাহের অতি অল্পদিন পরেই সেক্সপীয়র ষ্ট্রাটফোর্ড ছাড়িয়া লণ্ডনে গিয়াছিলেন, কিন্তু সে কেবল অর্থোপার্জনের জন্ত। তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তিনি কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া পুনরায় গৃহে ফিরিয়া জীবনের শেষ অংশটুকু স্ত্রীপুত্রের সহিত একত্রে আনন্দে অতিবাহিত করিবেন।

এই বিবাহে যে সেক্সপীয়র সুখী হন নাই সমালোচকেরা তাহার আর একটা প্রমাণ দিয়া থাকেন। কবির উইল পত্রে আছে,

“I give unto my wife the second best bed, with the furniture.” অর্থাৎ, আমি আমার স্ত্রীকে ভাল পালঙ্কগুলির মধ্যে দ্বিতীয়টি এবং আসবাব পত্র দিলাম।

তাঁহারা বলেন যে, স্ত্রীর প্রতি যে তিনি বীতরাগ ছিলেন ইহাই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ। নাইট সাহেব কিন্তু তাঁহার উল্লিখিত উইলটিকে অল্প অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন সেক্সপীয়রের সমস্ত সম্পত্তিতে ইংরাজী আইনানুসারে তাঁহার স্ত্রীর জীবনস্বত্ব ছিল। আর এই যে শয্যাটি, ইহা সাধ্বী

পতিব্রতা স্ত্রীর নিকট পার্থিব সকল বস্তু অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ বিবেচিত হইবে ইহা জানিয়াই সেক্সপীয়র এইরূপ উইল করিয়া গিয়াছিলেন।

রো সাহেব বলেন যে বাল্যকালে সেক্সপীয়র অগ্রাণ্ড বালকের সংসর্গে সার টমাস লুসির শিকারোত্তানে মৃগশাবক চুরি করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হন। এই ঘটনায় তিনি সার টমাসকে বাঙ্গ করিয়া এক কবিতা রচনা করেন। ইহাতে সারটমাস সেক্সপীয়রের প্রতি এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে ট্রাটফোর্ড ছাড়িয়া লণ্ডনে আসিতে বাধ্য হইতে হয়।

ঘটনাটি সত্য হইলেও হইতে পারে। বিশেষতঃ হরিণ চুরি তখন বড় অন্তায় কাজ বলিয়া পরিগণিত হইত না। ইহা যুবকগণের একটা আমোদের মধ্যে ছিল। এবং সেক্সপীয়রেরও বাল্যজীবন যে একেবারে নিষ্ফলক ছিল না তাহা তিনি নিজেই একটা চতুর্দশপদী কবিতায় বলিয়াছেন—“Most true it is that I have look'd on truth Askance and strangely.”

তিনি সত্যের প্রতি যে সহজ সরল দৃষ্টিতে তাকান নাই একথা তিনি নিজেই স্বীকার করিতেছেন।

সেক্সপীয়রের রঙ্গক্ষেত্র যোগ দেওয়ার তিনটা কারণ সমালোচকেরা নির্দেশ করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ, এই হরিণ চুরির ঘটনা, দ্বিতীয়তঃ নাটক এবং অভিনয়ের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক আসক্তি, এবং তৃতীয়তঃ আর্থিক ছরবস্থা।

সে সময়ে ইংলণ্ডের সর্বত্রই নাটকের

মহা সমাদর। সেক্সপীয়রও অভিনয়ে স্ননিপুণ ছিলেন। অর্চরেই তিনি স্বীয় অসামান্য মেধাবলে নাট্য জগতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিলেন। এই সময়ে ডিউক সাদাম্টন্ তাঁহাকে আর্থিক সাহায্য দেন, এবং কবি ভিনাস্ ও এডোনিস্ এবং লুক্রেস্ কবিতাধর তাঁহাকে উৎসর্গ করেন। রাজ্ঞী এলিজাবেথও তাঁহাকে এবিষয়ে সাহায্য করিতে ও উৎসাহ দিতে কৃষ্টিত ছিলেন না।

১৬১৩ খৃঃ অব্দের ২৯শে জুন গোব খিয়েটাব পুড়িয়া যায়। বোধ হয় তাহার সঙ্গে সেক্সপীয়রের অনেক লেখা নষ্ট হইয়া থাকিবে। ইহা সম্বন্ধে তাঁহার রচিত ৩৮টা নাটক এখন পাওয়া যায়।

শুনা যায় যে রাজ্ঞী এলিজাবেথ্ চতুর্থ হেনরি নামক নাটকের সার জন্ ফলষ্টাফের চরিত্রে এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে তিনি আর একটা নাটকে ফলষ্টাফের প্রেমের কাহিনী শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই অনুরোধেই সেক্সপীয়র পরে Merry Wives of Windsor নামক নাটক প্রণয়ন করেন।

“সেক্সপীয়রের পূর্বে ইংরাজী সাহিত্যের কিরূপ অবস্থা ছিল ডাক্তার হাড্‌সনের কথাগুলি হইতে তাহার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়।—তিনি বলিতেছেন,—

“সেক্সপীয়রের পূর্বে ইংরাজী নাটকগুলি নীচ আদর্শে রচিত হইত, এবং চরিত্রহীন লোকেরাই নাটক লইয়া থাকিত। সেই হীন দশা হইতে উদ্ধার করিয়া শক্তি, সৌন্দর্য এবং সুরস সঞ্চারে ইংরাজী নাটককে সেক্সপীয়র সর্বগুণসম্পন্ন করিয়া তোলেন। নাট্য

বিষয়ক যাহা কিছু সমস্তেরই জন্ত ইংলণ্ড
সেক্সপীয়রের নিকট যে কত ঋণী তাহা বলিয়া
শেষ করা যায় না ।”

১৬০৪ খৃঃ অব্দে সেক্সপীয়র নাট্যশালার
সংসর্গ ত্যাগ করিয়া, শেষ জীবনটুকু
নির্জর্জনে ড্রাটফোর্ডে কাটান। থিয়েটারে
অভিনয় করা তিনি মনে মনে ঘৃণা করিতেন।
তিনি লিখিয়াছেন,—

“ Alas, 'tis true I have gone
here and there

And made myself a motley
to the view.”

শেষ দুই তিন বৎসর তিনি কোনো
কবিতা লেখেন নাই। ১৬১৬ খৃঃ অব্দের
২৩শে এপ্রিল, তাঁহার জন্ম তারিখেই, তাঁহার
মৃত্যু হয়। ৭ বৎসর পরে তাঁহার পত্নী
ইহলোক ত্যাগ করিলে স্বামীর সমাধির পার্শ্বেই
তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

শ্রীদেবাংশুনাথ চক্রবর্তী ।

প্রয়াণ ।

(প্রাঃস্মরণীয়া ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের স্বর্গগমনোপলক্ষে)

নিবিড় নদীর-কোলে অপক্লপ ইন্দ্রধনুসম
মলিন এ মহীমাবে অভিরাম চির-অমুপম,
তুমি ফুটেছিলে দেবি,—আপনার স্বর্গীয় প্রভায়
শুচি-স্নাত করি' এহি পাপে পূর্ণ, পঙ্কিল ধরায়।
হিংসা-দ্বেষ-নির্যাতনে নিত্য বিশ্ব কাঁদে হাহাকারে,
স্বজন শোনিত পান করে স্মৃথে স্বার্থের আধারে ;—
এ শ্মশানে শুধু তুমি মৌন প্রেমে, শাস্ত গরিমায়
ধ্যান-মগ্ন ছিলে বসি' মরতের মঙ্গল-চিন্তায় !
জগত-জননীসম আর্ক্ত-দুঃখে আত্ম-বিস্মরিয়া
অসহায় আতুরের সর্ব জালা দিলে জুড়াইয়া !
করে তব শান্তি-সুধা- মুখে তব সান্ত্বনা সরস,
মুমূর্ষু মেলিত আঁধি লাভি তব সন্নেহ পরশ ;
আজি ওগো জ্যোতির্ময়ি, কোথা চলি' গেলে নাহি জানি।
আধারে ছাইছে বিশ্ব তোমা' বিনা হে দেবি কল্যাণি !

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী ।

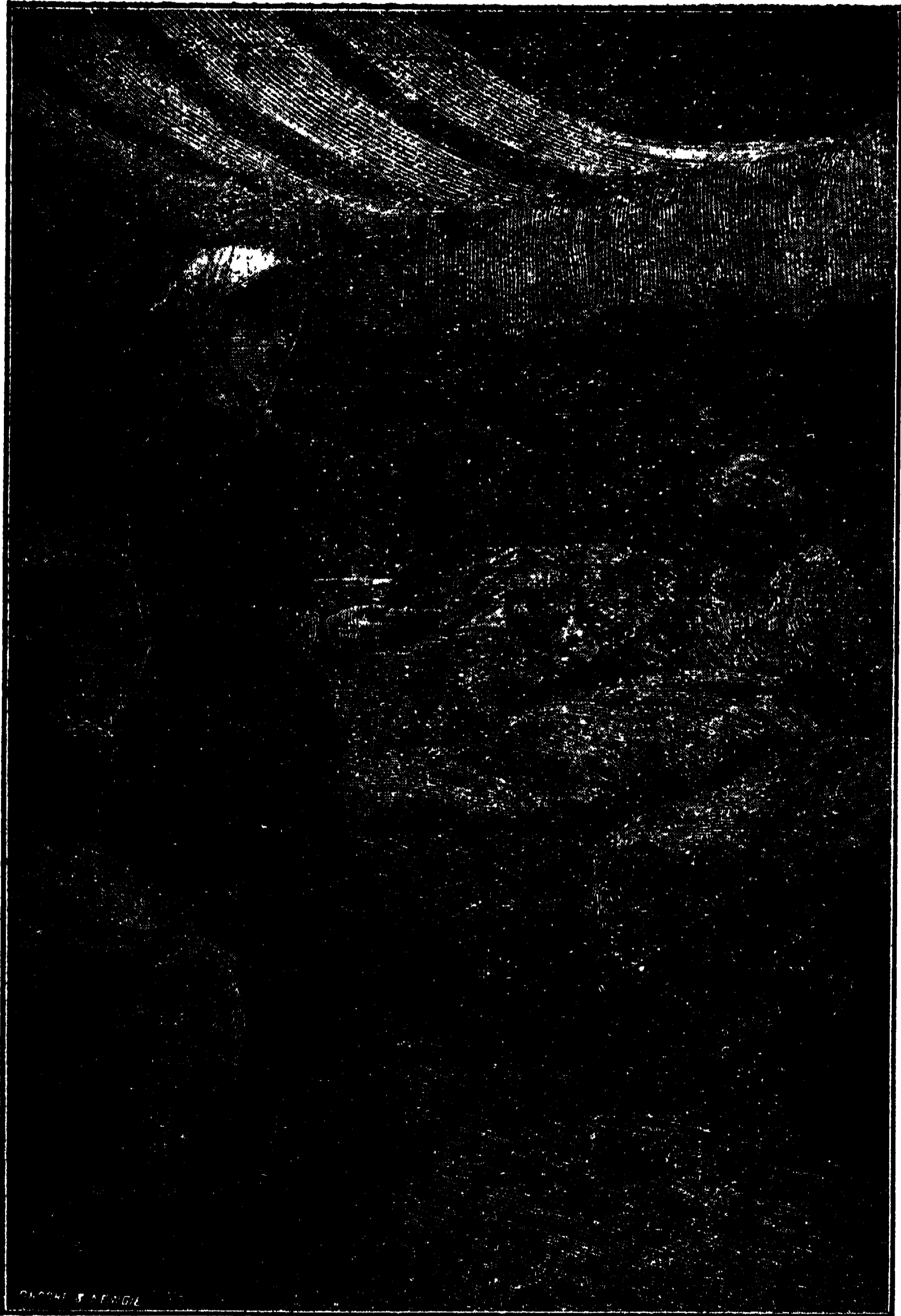
কুমারী নাইটিংগেল।

গত ৪ঠা আগষ্ট তারিখে কুমারী ফ্লরেন্স নাইটিংগেল নবতি বর্ষ বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন— তাঁহার জ্ঞান পরহুঃখকাতরা এবং শুশ্রূষাপরায়ণা রমণী দ্বিতীয় কেহ জন্মিয়াছে কিনা সন্দেহ। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার দয়া এবং পরোপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার নবতিবর্ষের জন্মদিনে পৃথিবীব্যাপী প্রায় সর্বস্থান হইতেই তাঁহাকে উপহার প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাঁহারি যত্ন এবং চেষ্টায় চিকিৎসালয়ে পীড়িতের এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদিগের শুশ্রূষা এবং চিকিৎসার সুব্যবস্থা হইয়াছে। বাল্যাবধি কুমারী ফ্লরেন্স বড়ই কোমলহৃদয়া ছিলেন। প্রকৃতির তরুণতা পশুপক্ষীর সৌন্দর্য্য যেমন তাঁহার হৃদয় আকর্ষণ করিত তেমনি তাহাদের অসহায় অবস্থাও তাঁহার করুণার উদ্রেক করিত। বনের পাখী, কাঠবিড়ালী তাঁহার পোষা হইয়া যাইত। তিনি সর্বদাই তাহাদের নিজের হাতে আহার দিতেন। তাঁহার মাতার টাট্টু ঘোড়াটি পোষা কুকুরের মত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। বাল্যকালে গ্রামের ধর্ম্মযাজকের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল—এই ধর্ম্মযাজকটি প্রচার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার পূর্বে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং অল্প চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। যখন গ্রামে কোনও পীড়া কিম্বা আকস্মিক বিপন্ন বিপদ হইত তখনি তিনি সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সর্বতোভাবে তাহাদের সেবা যত্ন করিতেন। কুমারী ফ্লরেন্সও সেই সকল সময়ে

তাঁহার সঙ্গী হইতেন। এই সময় একটি কুকুর সাংঘাতিকরূপে আহত হয়—কুকুরটি একজন বৃদ্ধ কৃষকের; সে তাহাকে বড় যত্ন করিত। কিন্তু বিত্তাগণের কোন দৃষ্ট বালক প্রকাণ্ড প্রস্তরাঘাতে তাহার পিছনের পা ভাঙিয়া দেয়। তাহার যত্নগা দেখিতে না পারিয়া কৃষক তাহাকে গুলি করিয়া মারিবার ইচ্ছাপ্রকাশ কবে। কিন্তু কুমারী ফ্লরেন্সের যত্নে সে পুনরায় সুস্থ হইয়া উঠে। এই সময় হইতেই আর্ন্ত এবং পীড়িতের শুশ্রূষা কার্য্য রীতিমত শিখিবাব জন্ম তাঁহার মন উৎসুক হয়। ইহার কিছুকাল পরে তিনি একবার সৈনিকদিগের হাঁসপাতাল দেখিতে নেটলিতে যান। সেইখানকার দৃশ্য এবং কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া শুশ্রূষা ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্ম তিনি দৃঢ়সংকল্প হইয়া ইহাই জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে Kaisn Worth নামক একটি ক্ষুদ্র জর্মান নগরে তিনি একদল প্রটেষ্ট্যান্ট শুশ্রূষাকারিণী রমণী দলের সহিত সেবা কার্য্যে যোগদান করেন। পব বৎসর লণ্ডন হাগি স্ট্রীটে পীড়িত শিক্ষয়িত্রীদিগের সেবাভার গ্রহণ করেন। এবং অল্পদিনের মধ্যেই প্রাণপণ চেষ্টা, যত্ন এবং পরিশ্রমে হাঁসপাতালের সুবন্দোবস্ত করিয়া তাহার বিশেষ উন্নতিসাধন করেন। এই সময় তিনি লণ্ডন, এডিনবরা, ডবলিন প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরের চিকিৎসালয়ে বিশেষ যত্নসহকারে শুশ্রূষা কার্য্য শিক্ষা করেন। তাহাতে সেই সকল

চিকিৎসালয়ের বিশেষ উপকার এবং উন্নতি হয়। এইরূপ দারুণ পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় কিছুকালের জন্য তাঁহাকে বিশ্রামে বাধ্য হইতে হয়। কিন্তু অধিককাল নিশ্চেষ্টে

হইয়া বসিয়া থাকা নিতান্তই তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ, তাই বৎসর দুই পরে ক্রিমিয়া যুদ্ধের আরম্ভে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। আজ কালকার মত তখন আহতদিগের সেবার



সেবারত কুমারী নাইটিংগেল

কোনরূপ সুব্যবস্থা ছিল না। তাই আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি এই তনুী স্বকুমারী রমণী যখন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে মঙ্গল

হস্তে, নিঃস্বার্থভাবে নীরবে করুণাপূর্ণ হৃদয়ে পীড়িত সৈনিকদিগের মুখে ঔষধ পথ্য তুলিয়া দিতেন, তাহাদের যত্নগা দূর করিবার

জন্ম কোমল হস্তে তাহাদিগকে সেবা করিতেন, তখন যে তাহারা তাঁহাকে স্বর্গের দেবী বলিয়া মনে করিত তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। সেই ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্রে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত, মৃত এবং আহতদিগের মধ্যে অমানুষিক পরিশ্রমে তাঁহার দিন কাটিত। ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়—তাঁহার স্কুমার দেহযষ্টি কেমন করিয়া অবিশ্রান্ত দিনরাত্রি সেই দারুণ ক্লেশ, অভাব ও পবিশ্রম সহ করিত। সৈনিকেরা তাঁহাকে এতই ভালবাসিত যে তিনি যখন পাশ দিয়া হাঁটিয়া যাইতেন তখন তাহারা নুইয়া পড়িয়া তাঁহার ছায়াকে চুষন করিত। এই অমানুষিক পরিশ্রম এবং দেবদুল্লভ করুণায় তাঁহার নাম জগন্নি যাত হইয়া পড়িল এবং ইংলণ্ডবাসী সকলেই ১৮৫৬ সালে তাঁহার দেশে প্রত্যাগমন সময়ে বিপুল সমারোহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ম উৎসুক হইয়া উঠিলেন। কুমারী ফ্লরেন্স বাগ্যাবধি বাহাড়াধরশূণ্ড এবং মানুষের নিকট যশোমানলাভে অনিচ্ছুক ছিলেন তাই কাহাকেও তাঁহার আগমনবার্ত্তা না জানাইয়া গোপনে আপন দেশে ফিরিয়া আসিলেন। দারুণ পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য চিরকালের মত

ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, জীবিতকালে আর তিনি নিজ হস্তে শুশ্রূষা করিবার সুখ লাভ করেন নাই। ইংলণ্ডবাসীরা যখন তাঁহার নিমিত্ত কোনরূপ সমারোহ করিতে পারিলেন না তখন তাঁহাকে উপহার দিবার জন্ম সার্ক সাত লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিলেন, কিন্তু মহৎহৃদয়া কুমারী ফ্লরেন্স সে অর্থও গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। তখন সেই অর্থ দিয়া কৃতজ্ঞতার সাক্ষ্যস্বরূপ তাঁহার নামে একটি সেবাগৃহ নির্মিত হইল।

জীবনে কুমারী ফ্লরেন্স যে মহৎ সেবাব্রত প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহার স্থান অতি উচ্চে। কি রাজা কি প্রজা কি স্বদেশী কি বিদেশী—আত্মপর উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সকলেই তাঁহার স্বার্থত্যাগ তাঁহার নিরতিশয় পরহুঃখকাতরতা প্রশংসাপূর্ণ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে চিরদিন স্মরণ করিবে। ক্রিমিয়া যুদ্ধে সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি যে অপূর্ব আত্মবিসর্জন দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকিয়া তাহা চিরদিন মানব হৃদয়কে উৎসাহিত এবং মহত্বে প্রণোদিত করিবে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী ।

পলিত পত্র ।

“একে একে সব সাথী করেছে প্রয়াণ,
শীতের শীতল বায়ু সতত কাঁপায়।
আর কেন ? ওহ পর্ণ পাণ্ডু ত্রিয়মান,
এখনও তরুর গায়ে আছে কি আশায় ?”

“গেছে সব ! তাহে কিবা ?—শীতের সমীর
পলে পলে মৃত্যু আনে কাঁপাইয়া কায়া,
ভাবিয়াছি, শেষবিন্দু বুকের কুধির—
শুকাইয়া কিসলয়ে দিব তবু ছায়া।”

শ্রীকালিদাস রায় ।

হেঁয়ালি নাট্য

ভণ্ড সন্ন্যাসীর বটবৃক্ষতলে বসিয়া গাঁজা সেবন ।
ডাকাডাকিতে অভ্যুক্ত রসিকচন্দ্রের প্রবেশ ।

সন্ন্যাসী । বোম্ বোম্—(গাঁজা সেবন)
রসিক । (চমকিয়া) কে আবার !
কোথাও দেখছি নিস্তার নাই!—সর্বস্থানেই
যমদূত !

স । শিব—শিব—হর—হর—বোম্ ।

র । তবু ভাল—গোয়েন্দা নয়,—একজন
সন্ন্যাসী । বোধ হয় আমারই দলের হবে ।
(নিকটে গিয়া) সন্ন্যাসী ঠাকুর, প্রণাম হই ।

স । বোম্—বোম্ । এই ঠো, তোমারা
পাস্ রাখ্ দেও । (কিঞ্চিৎ ভস্ম প্রদান)

র । কেন বাবা ! নাস নিতে হবে !

স । নাস না আছে লেকন এ নাশ ছায় ;
সব পাপ এসিমে নাশ হো যাতা ।

র । আপনার মত অমায়িক প্রকৃতির
লোক আমি আর কোথাও দেখি নাই ।

স । হাম্‌কো মায়িক সাধুকা সাং
কৈ কো বাৎ হোতা নেই । লেকন্ এ খবর
কোই কো মৎ বলো,—সব আদমি আনে সে
হাম্‌কো নাশ কর ডালেগা ।

র । না ঠাকুর, আমি এ খবর কাকেও
বল্‌ব না (স্বগতঃ) একবার একটা ভৌতিক
বিদ্যে শিখে নিতে পারি তাহলে সকলকে মজা
দেখাই ।

স । (গাঁজা সেবন) বোম্—বোম্ ।

র । আচ্ছা, বোম্ বোম্ করেন কেন ?

স । এ সব, তোম সম্‌জেগা নেই ।

র । তা একটু বলুন না কেন ?—বলতে
কি দোষ আছে ?

স । এ সব ধরম্ কা বাৎ,—তোম্ সম-
জেগা নেই ।

র । অ্যা ! কি বল্লেন ধর্ম ?

স । হাঁ, ধার্মিক আদমি এই বাৎ লেতা
ছায় ।

র । সর্বনাশ ! আপনি তাহলে ধার্মিক !

স । হাঁ হাম্ ধার্মিক ছায় ।

র । সর্বনাশ ! আপনি ধার্মিক ?

স । হাঁ ধার্মিক ।

র । Virtuous men are always
ready to die—তা হলে আপনি মরতে
প্রস্তুত ?

স । কা, বোল্‌তা ?

র । বাবা, বোল্‌তাও না ভীমকুলও না ।

স । হাম্‌ কুছ্ সমজ্‌তা নেহি—আচ্ছা
করকে বাতাও ।

র । তা, মরবার সময় কেউ কিছু বুঝতে
পারে না, তোমাকে আচ্ছা করে বাতিয়ে কি
আর লাভ হবে ?

স । হাম্‌ মরেগা কাহে ?

র । আঃ—আপনি যে ধার্মিক বল্লেন ।

স । ধার্মিক আদমি তো মর্তা নেহি ।

র । না বাবা—এখন কলিযুগ—ধার্মিক
হলেই মরতে হয় ।

স । তোমারা ও বাৎ বুঠা ছায় ।

র । না কখনই না । ধার্মিক হলেই
আপনাকে মরতে হবে । তা যদি না হয় ত
বুঝব আপনি বুটা, আপনার এই ভস্ম বুটা,
তামাম্‌ সব্‌ বুটা ।

স । আমি সে ধার্মিক আছি না ।

২। এখন মরবার ভয়ে আছি না বললে কি আর চলে? তুমি এখন মর, আর আমি আমার পথ দেখি।

[সদল বলে পুলিশ ইন্স্পেক্টরের প্রবেশ,—রসিকচন্দ্রের বেগে প্রস্থান ও দূরে বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থান]

১। (সন্ন্যাসীর প্রতি) এই যে, এই সেই বেটা।

২। হাঁ হাঁ সেই বেটাই বটে। যত দেখবে সাধু সন্ন্যাসী সব বেটা—স্বদেশী,—সিডিসনিষ্ট, বোমাপন্থী, বিদ্রোহী। বাঁধ বেটাকে বাঁধ। (সকলে মিলিয়া সন্ন্যাসীকে বাঁধন)।

স। এ ক্যা কর্তা হয়—

১। আবার হিন্দুস্থানী বুলি যেন বাঙ্গলা জানেন না!

২। কি আর করব! এই সকলে মিলে তোমা হেন ধার্মিক সাধু পুরুষকে ভগবদগীতা-উক্ত যোগাসনে বসিয়ে দিচ্ছি। বুঝেছ ত?

স। (ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) বাবা আমি ধার্মিক না আছে—ঠিক বোলতা হয়—হাম ধার্মিক নেহি হয়।

৩। বেটা ওঠ্ এখন; বাঁধন চোটে—সত্যি কথা বেরিয়ে গেছে—ভণ্ড তপস্বী চল এখন।

[সন্ন্যাসীকে ধরিয়া লইয়া সকলের প্রস্থান]।

রসিক। আঃ কি মজা! সন্ন্যাসী ঠাকুর এখন ফাঁসিতে ঝুলুক আমি ঘরে যাই। কি বুদ্ধিটাই জুগিয়েছিল—একেই বলে, কারো পৌষ মাস কারো সর্কনাশ!

শ্রীমদ্রনাথ সাউ।

প্রাচীন বিবাহ প্রথা।

(খৃষ্টীয় চতুর্থপূর্ব শতাব্দী)

অগ্রহায়ণের 'ভারতী'তে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় 'প্রাচীন ভারতে বিবাহ পদ্ধতি' শীর্ষকে এক সুলিখিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা এই সংখ্যায় চাগক্য প্রণীত 'অর্থশাস্ত্র' নামক পুস্তক হইতে খৃষ্টজন্মের চতুর্থ শতাব্দী পূর্বে আমাদের শাস্ত্রকারগণ বিবাহাদি বিষয়ে কিরূপ আদেশ বিধি বন্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধৃত করিব।

বিবাহ সকল প্রকার আচারের অগ্রবর্তী। ব্রহ্ম, দৈব, আর্ষা, প্রজাপত্য, গান্ধর্ব, অসুয়, রাক্ষস এবং পৈশাচ—এই কয় প্রকার বিবাহ প্রচলিত।

এই কয় প্রকার বিবাহ মধ্যে প্রথমোক্ত চারি প্রকারের বিবাহ প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছে এবং কণ্ঠার পিতা সম্মত হইলেই এই সকল বিবাহ ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া বিবেচিত হয়। অত্র প্রকারের বিবাহে পিতামাতা উভয়েরই অনুমোদন আবশ্যিক। কেননা জামাতা তাহাদের কণ্ঠাকে যে গুরু প্রদান করে তাহা তাহারাই গ্রহণ করে। পিতা কিংবা মাতার অনুপস্থিতে কিংবা একের মৃত্যু হইলে অত্র জনে এই গুরু গ্রহণ করিবে। যদি পিতামাতা উভয়েরই মৃত্যু হইয়া থাকে তবে কণ্ঠা নিজেই এই গুরু গ্রহণ করিবে।

যাহারা বিবাহে সংশ্লিষ্ট তাহারা সন্তুষ্ট হইলে সকল প্রকার বিবাহই সিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

পুরুষের দ্বিতীয় বার দ্বার-পরিগ্রহ ।

যদি কোন স্ত্রীলোক জীবিত সন্তান প্রসব না করে, অথবা পুত্র উৎপাদনে অক্ষমা হয়, অথবা বক্ষ্যা হয়, তাহা হইলে তাহার স্বামীর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের পূর্বে অষ্টম বর্ষ অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি পত্নী কেবল কন্যা প্রসব করে, তবে স্বামীকে দ্বাদশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। তৎপর, যদি তিনি পুত্র কামনা করেন, তবে বিবাহ করিতে পারেন। যদি স্বামী এ নিয়মের ব্যতিক্রম করেন, তবে পত্নীকে গুরু, স্ত্রীধন এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান ব্যতীত, রাজাকে ও তাঁহার চব্বিশ পণ প্রদান করিতে হইবে। যে সকল স্ত্রী বিবাহের গুরু বা স্ত্রীধন পায় নাই তাহাদেরও গুরু ও স্ত্রীধন দিয়া এবং স্ত্রীদিগকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও বৃত্তিদান করিয়া পরে স্বামী ইচ্ছানুসারে যতগুলি ইচ্ছা স্ত্রীগ্রহণ করিতে পারেন, কেননা পুত্রার্থেই স্ত্রীর প্রয়োজন। যদি স্বামীর অনেক গুলি পত্নী বা সকল পত্নীই এক সময়ে সন্তানধর্ম্মা হইয়া থাকেন, তবে যাহাকে সর্ব্বাগ্রে বিবাহ করা হইয়াছে অথবা যে স্ত্রী পুত্রবতী তাহাকেই সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিতে হইবে। যদি স্বামী যথাসময়ে * * স্ত্রীর ধর্ম্মরক্ষা না করেন, তবে তাহাকে ৯৬ পণ অর্থদণ্ড দিতে হইবে। পুত্রবতী, ধার্ম্মিকা, বক্ষ্যা, মৃতবৎস্তা, এবং যাহারা সন্তানবতী হইবার বয়স অতিক্রম করিয়াছে, তাহাদের অনভিমতে সহবাস নিষিদ্ধ। কুষ্ঠব্যাদিগ্রস্তা বা উন্মত্তা স্ত্রীর সহিত স্বামীর

একত্র বাস করা না ইচ্ছানুসারে নির্ভর করে। পুত্রার্থে স্ত্রী কুষ্ঠব্যাদিগ্রস্ত বা উন্মত্ত স্বামীর সহবাস করিতে পারেন।

যদি স্বামী কুচরিত্র, বিদেশবাসী, রাজ-দ্রোহী, অথবা স্ত্রীর প্রাণহানি করিতে পারে, এরূপ সম্ভাবনা থাকে, অথবা জাতিচ্যুত, বা ক্লীব হয় তবে স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারে।

স্ত্রীলোকের পুনর্বিবাহ ।

শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ জাতিভুক্তা যে সকল স্ত্রী সন্তান প্রসব করে নাই, তাহারা প্রবাসী স্বামীর জন্ত এক বৎসর অপেক্ষা করিবে। কিন্তু যাহারা সন্তানবতী তাহারা এক বৎসরের অধিককাল স্বামীর জন্ত অপেক্ষা করিবে। যদি তাহাদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে, তবে তাহারা দ্বিগুণকাল অপেক্ষা করিবে। যদি সেরূপ ব্যবস্থা না থাকে তবে তাহাদের ধনী জ্ঞাতিবর্গ তাহাদিগকে চার কি আট বৎসরের জন্ত প্রতিপালন করিবে। তৎপর বিবাহের সময় যাহা দান করা হইয়াছিল তাহা গ্রহণ করিয়া, জ্ঞাতিগণ তাহাদের বিবাহে অনুমতি দিবে। যদি ব্রাহ্মণ স্বামী বিজ্ঞার্থী হইয়া বিদেশে বাস করেন, তবে অপুত্রবতী স্ত্রী দশ বৎসর অপেক্ষা করিবে; এক্ষেত্রে স্ত্রী পুত্রবতী হইলে দ্বাদশ বৎসর অপেক্ষা করিবে। যদি স্বামী ক্ষত্রিয় হন, তবে স্বামীর মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে। কিন্তু বংশনাশ ভয়ে স্ত্রী, সর্ব্বগে বিবাহ করিয়া পুত্রবতী হইলে, সে ঘৃণাস্পদ হইবে না। যদি প্রবাসী স্বামীর স্ত্রীর ভরণপোষণের অভাব হয় এবং ধনী

জ্ঞাতিবর্গ তাহাকে পরিত্যাগ করে তবে স্ত্রী তাহার ইচ্ছানুসারে পুনর্বার যে তাহাকে প্রতিপালন করিতে পারে একরূপ লোককে বিবাহ করিতে পারে।

প্রথমোক্ত চার প্রকারে বিবাহিতা “কুমারী” যাহার স্বামী বিদেশে বাস করিতেছেন এবং যাহার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, সেইরূপ স্ত্রী যদি স্বামীর নাম সাধারণে প্রকাশ না করিয়া থাকে তবে সাতমাস অপেক্ষা করিবে। যদি নাম প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে এক বৎসর অপেক্ষা করিবে। প্রবাসী স্বামীর সংবাদ যদি অবগত না হওয়া যায় তবে সাত মাস অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি স্বামী প্রবাসী হইয়া থাকেন এবং তাঁহার কোন সংবাদ না পাওয়া গিয়া থাকে এবং স্ত্রী যদি শুকের অংশবিশেষ মাত্র পাইয়া থাকেন, তবে স্ত্রী তিন মাস মাত্র অপেক্ষা করিবেন কিন্তু স্বামীর সংবাদ পাইয়া থাকিলে সাত মাস অপেক্ষা করিতে হইবে। সম্পূর্ণ শুক যে স্ত্রী পাইয়াছেন, স্বামীর সংবাদ না পাইলে তিন পাঁচমাস অপেক্ষা করিবেন কিন্তু সংবাদ পাইলে দশ মাস অপেক্ষা করিবেন। পরে, বিচারকগণের (ধর্ম্য হৌ বিসৃষ্টা)

অনুমতি লইয়া ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিতে পারেন; কেননা * * * স্ত্রীর ধর্ম্মরক্ষা না করিলে কোটিল্য বলেন, ‘ধর্ম্ম বধ’ হয়।

যে সকল স্বামী অনেক দিন প্রবাসী, বা যাহারা মৃত তাঁহাদের অপুত্রবতী স্ত্রীগণ এক বৎসর অপেক্ষা করিবেন। এক্ষেত্রে স্ত্রীগণ স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করিতে পারেন। যদি মৃত স্বামীর অনেকগুলি ভ্রাতা থাকে, তবে স্ত্রী মৃত স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর অথবা যে ভ্রাতা ধার্ম্মিক ও তাহাকে প্রতিপালনে সক্ষম হইবেন অথবা যে সর্ব কনিষ্ঠ ও অবিবাহিত তাহাকে বিবাহ করিবেন। যদি মৃত স্বামীর ভ্রাতা না থাকে তাহা হইলে স্বামীর আত্মীয়-গণের সগোত্রে বিবাহ করিবেন। কিন্তু যদি উপযুক্ত অনেকগুলি ব্যক্তি থাকেন, তবে মৃত স্বামীর নিকট-আত্মীয়কে বিবাহ করিবেন।

যদি কোন স্ত্রীলোক উপরি উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করেন, তাহা হইলে ঐ স্ত্রী এবং যে তাহাকে বিবাহ করিয়াছে, যাহারা কণ্ঠকে দান করিয়াছে এবং যাহারা ইহাতে সম্মতি দান করিয়াছে তাহারা সকলেই দণ্ডনীয় হইবেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

চয়ন।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

লানপো (লঙ্ঘন) (১)

লানপো রাজ্য পরিধিতে প্রায় সহস্র লি। ইহার উত্তরে তুষার পর্বত শ্রেণী; অশ্ব তিনদিকে কৃষ্ণ

পর্বত শ্রেণী। প্রায় দশ লি স্থান বেষ্টিত করিয়া রাজধানী অবস্থিত। কয়েক শতাব্দী হইতে রাজবংশ লুপ্ত হওয়ায়, প্রধান ব্যক্তিগণ স্ব স্ব ক্ষমতা পরিচালনের

(১) এই প্রদেশ কাবুল নদীর উত্তর ধারে অবস্থিত। Ancient Geography of India পুস্তকে কনিংহাম সাহেব ইহার স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার পশ্চিমে ও পূর্বে আলিঙ্গর ও কুনার নদী।

জন্তু নিজেদের মধ্যে বিবাদ করিয়া আসিতেছেন ; কেহ কাহারও প্রাধান্য স্বীকার করেন না। সম্প্রতি ইহা কপিশার অধীনস্থ হইয়াছে। এদেশ ধাতু উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং যথেষ্ট ইক্ষু দণ্ড এখানে পাওয়া যায়। দেশে ফলের বৃক্ষ প্রচুর আছে কিন্তু খুব কম ফলই পরিপক্ব হয়। জলবায়ু সুবিধাজনক নয় ; ঘন নীহার যথেষ্ট কিন্তু বরফ বেশী নাই। যথেষ্ট শস্য জন্মে। অধিবাসীরা সঙ্গীত বিদ্যায় অনুরক্ত। স্বভাবতই ইহারা অবিশ্বাসী এবং চৌধার্যবৃত্তি পরায়ণ ; কেহ কাহারও প্রাধান্য স্বীকার করিতে চাহে না। ইহারা খর্বাকৃতি কিন্তু কন্ঠ এবং বলবান। সাধারণতঃ ইহাদের পরিচ্ছদ শুভ্র এবং সাজসজ্জা সুন্দর। প্রায় দশটি সংঘরাম আছে কিন্তু তাহাতে যতির সংখ্যা অত্যল্প। অধিকাংশই মহাযান মতাবলম্বী। দেব-মন্দিরও বেশ আছে। অবিশ্বাসীর সংখ্যা কম। এই প্রদেশ হইতে ১০০ লি দক্ষিণে যাইয়া আমরা বৃহৎ পর্বত উত্তীর্ণ হইয়া ও নদীপার হইয়া নাকিলোহো অর্থাৎ উত্তর ভারতের সীমান্ত পৌঁছি।

নাকিলোহো (নগরহরা) । (২)

নাকিলোহো পূর্ব পশ্চিমে ৬০০০ শত লি এবং উত্তর দক্ষিণে ২৫০ কি ২৬০ লি বিস্তৃত। ইহার চতুর্দিকেই লম্ববান গিরিশৃঙ্গ। রাজধানী পরিধিতে প্রায় ২০ লি। ইহার কোন প্রধান শাসন-কর্তা নাই। সেনাপতি এবং তাঁহার সহকারীগণ কপিশা হইতে প্রেরিত হইয়া থাকেন। দেশে শাকসবজী, পুষ্প ও ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। জলবায়ু আর্দ্র ও উষ্ণ। অধিবাসীরা সরল, সাধু এবং প্রকৃতিতে ইহারা উৎসাহী এবং সাহসী। ইহারা আর্থিক বিষয়ে উদাসীন এবং বিদ্যানুরাগী। ইহারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং অত্যল্প সংখ্যক লোকই অন্য ধর্ম বিশ্বাস করে। সজ্বরাম যথেষ্ট আছে কিন্তু যতি সংখ্যায় অল্প। স্তূপ-

গুলি জনশূন্য ও ধ্বংসাবশেষ যথেষ্ট আছে। দেবতাদের পাঁচটি মন্দির আছে ও একশত ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

নগরের তিন লি পূর্বে তিন শত ফুট উচ্চ রাজা অশোক-নির্মিত স্তূপ আছে। ইহা কারুকার্য শোভিত এবং খোদিত প্রস্তর নির্মিত। বোধিসত্ত্ব-বস্থায় শাক্য এই স্থানেই দীপাঙ্কর বৌদ্ধের দর্শন পান এবং অজিন বিস্তার করিয়া, কেশরাজি উন্মুক্ত করিয়া তদ্বারা বর্দ্ধমাক্ত রাজপথ আবৃত করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তিনি ভবিষ্যতে যে সফলকাম হইবেন এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। যদিও গত কল্পে পৃথিবী ধ্বংস হইয়াছিল তত্রাপি, এই ঘটনার চিহ্ন বিনষ্ট হয় নাই। উপবাসের দিবস আকাশ হইতে নানাপ্রকার পুষ্প পতন হয়। তদৃষ্টে জনপদ বাসীগণও নানাপ্রকারে পূজা করে।

এই স্থানের পশ্চিমে একটা সজ্বরামে কয়েকজন যতি বাস করেন। দক্ষিণে ক্ষুদ্র একটা স্তূপ আছে। এই স্থানেই বোধিসত্ত্ব স্বকীয় চুল দ্বারা বর্দ্ধমাক্ত পথ আবৃত করিয়াছিলেন। রাজা অশোক এই স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। নগরাভ্যন্তরে বৃহৎ স্তূপের ভগ্নাবশেষ বর্তমান। জনশ্রুতি এইরূপ যে, এই স্থানে বুদ্ধদেবের উজ্জ্বল ও বৃহৎ একটা দস্ত ছিল। বর্তমানে সে দস্ত নাই—কেবলমাত্র ভগ্নাবশেষই বর্তমান রহিয়াছে। ইহারই পার্শ্বে ত্রিশ ফুট উচ্চ অগ্নি একটা স্তূপ আছে। কি প্রকারে এ স্তূপ নির্মিত হইয়াছে তাহা জানা যায় না ; তবে লোক পরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে ইহা স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া এই স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। বস্তুতঃই ইহা মনুষ্য সৃষ্ট নহে, অদ্ভুত ব্যাপার।

নগরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অগ্নি একটা স্তূপ আছে। পৃথিবীতে যখন তথাগত বাস করিতেন তখন মনুষ্যকে ধর্ম দীক্ষিত করিবার জন্ত তিনি শূন্য হইতে এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভক্তিপ্লুত হইয়া

(২) সিম্পসন সাহেব নগর হরার সীমা নির্দেশ করিয়াছেন। বিহার জেলায়, মেজর কিটো ভগ্নপ্রায় সুদূর্গে সংস্কৃত খোদিত লিপিতে নগরহরার উল্লেখ পাইয়াছেন।

জনসাধারণে এই স্তূপ নির্মাণ করিয়াছে। এইক্ষণে, স্তূপ জনশূণ্য, ইহাতে কোন যতি বাস করেন না। নগরাভ্যন্তরে রাজা অশোক নির্মিত দুইশত ফুট কি ততোধিক উচ্চ স্তূপ আছে। এই সজ্বরামের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে উচ্চ পর্বত গাত্র হইতে প্রবল স্রোত নির্গত হইয়া জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়াছে। পর্বত গাত্রগুলি প্রাচীরের স্তায়; পূর্বদিকে গভীরগুহাভ্যন্তরে নাগ গোপাল বাস করে। গহ্বরের প্রবেশদ্বার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং ইহা অন্ধকারময়। প্রাচীনকালে গুহাভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের স্বভাব পরিচায়ক এবং উজ্জ্বল ছায়া দৃষ্ট হইত। পরে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। কেবল মাত্র সামান্য সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু যিনি ভক্তি-ভরে প্রার্থনা করেন, তিনি ক্ষণকালের জন্য দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া পরিষ্কার ভাবেই ছায়া মূর্তি দেখিতে পান।

যখন তথাগত পৃথিবীতে বাস করিতেন তখন এই দৈত্য গোপালক ছিল এবং রাজাকে দুষ্ক ও ক্ষীর সরবরাহ করিত। কোন সময়ে কাষ্যে শৈথিল্যতার জন্য তিরস্কৃত হওয়াতে গোপালক ক্রোধাক্ত হইয়া স্তূপে যাইয়া পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করিয়া প্রার্থনা করে যে সে যেন ধ্বংশকারী দৈত্যে পরিণত হইয়া দেশের ও রাজার সর্বনাশ সাধন করিতে পারে। পরে পর্বতারোহণ করিয়া গোপালক লক্ষ্য প্রদান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এবং তৎক্ষণাৎ সে দৈত্যরূপে পরিণত হইয়া এই গুহা অধিকার করিয়া দেশ ও রাজাকে বিনষ্ট করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। তথাগত এই উদ্দেশ্যে অবগত হইয়া করুণাপরবশ হইয়া মধ্য ভারত হইতে এই স্থানে আগমন করেন। দৈত্য তথাগতের আগমনে অহিংসা পরমধর্ম এই সার সত্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। যাহাতে বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ সদাসর্বদা এই গুহার তাঁহাকে পূজা করিতে পারে, সেইজন্য গুহায় বাস করিবার জন্য দৈত্য বুদ্ধদেবকে অনুরোধ করে। বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন যে, “এই স্থানে আমি আমার ছায়া রাখিয়া যাইব এবং তোমার নিকট হইতে অনবরত পূজা

গ্রহণের জন্য পাঁচজন অর্হৎ প্রেরণ করিব। সত্যধর্ম বিনষ্ট হইলেও তোমার দত্ত পূজা গৃহীত হইবে। যদি তোমার অন্তঃকরণে কোন মন্দাভিলাষ জন্মে, তাহা হইলে তুমি আমার ছায়ার দিকে চাহিলে তোমার সে অভিলাষ দূরীভূত হইবে। ভদ্রকল্পে (৩) যে সকল বুদ্ধের আবির্ভাব হইবে তাঁহারা সকলেই স্বীয় স্বীয় ছায়া তোমাকে দান করিবেন।” গুহার বহির্দেশে দুইখানি চতুষ্কোণ প্রস্তর আছে। একখানির উপর তথাগতের পদ চিহ্ন আছে। মধ্যে মধ্যে ইহা উজ্জ্বলিত হইয়া থাকে। গুহার উভয় পার্শ্বে প্রস্তর নির্মিত কক্ষ আছে। এই সকল কক্ষে তথাগতের শিষ্যগণ উপাসনা করিতেন।

গুহার উত্তর পশ্চিম কোণে একটা স্তূপ আছে এই স্থানে বুদ্ধদেব ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্য একটা স্তূপে তথাগতের চুল ও নখাবশিষ্ট আছে। নিকটেই অন্য স্তূপে তথাগত তাঁহার ধর্মের সূক্ষ্ম বিচার করিয়া স্কন্ধ ধাতু আয়তন সম্বন্ধে নিজ মত প্রচার করিয়াছিলেন। গুহার পশ্চিমে বৃহৎ পর্বতে তথাগত নিজ কশায় বস্ত্র ধৌত করিয়া প্রসারিত করিয়া ছিলেন। সূত্রের চিহ্ন এখনও বর্তমান রহিয়াছে।

নগরহরার ৩০ লি দক্ষিণ-পূর্বে হিলোনগর। ইহা উচ্চে অবস্থিত। নগরে যথেষ্ট পুষ্প পাওয়া যায় এবং হ্রদের জল দর্পণের স্তায় স্বচ্ছ। অধিবাসীরা সরল, সাধু এবং সৎ। এখানে দোতলা একটা প্রাসাদ আছে; উহার কড়িগুলি চিত্রিত এবং স্তম্ভগুলি লোহিতবর্ণে রঞ্জিত। দ্বিতলে সপ্তপ্রকার মূল্যবান ধাতু দ্বারা নির্মিত একটা স্তূপ আছে; তথায় তথাগতের করোটির অস্থি রক্ষিত। করোটির পরিধি ১ ফুট দুই ইঞ্চি। চুলের ছিদ্রগুলি এখনও পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বর্ণ কিঞ্চিৎ শুভ্র ও পীত। যাহারা শুভাশুভ লক্ষণ জানিতে চায় তাহারা স্নগন্ধি মৃত্তিকা করোটির উপর স্থাপন করিলে পুণ্যানুসারে মূর্তি অঙ্কিত হইয়া শুভাশুভ সূচনা করে। অন্য আর একটা ক্ষুদ্র স্তূপেও তথাগতের করোটির অস্থি রক্ষিত

আছে। ইহা দেখিতে পদ্ম পত্রের স্তায় এবং ইহার বর্ণ অপর কেরোটির স্তায়। ইহা মূল্যবান আধারে সংরক্ষিত।

অল্প স্তূপে তথাগতের চক্রুর তারা আছে। চক্রুর তারাটি আমড়া ফলের স্তায় বৃহৎ এবং ইহা উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ; ইহাও একটা মূল্যবান আধারে সংরক্ষিত। উত্তম কার্পাস নির্মিত পীত লোহিতবর্ণ বিশিষ্ট তথাগতের সজ্বরাম বস্ত্রও মূল্যবান আধারে রহিয়াছে। যেহেতু অনেক মাস ও বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে সেই জন্য ইহার সামান্য অনিষ্ট হইয়াছে। তথাগতের লৌহ-মণ্ডলবিশিষ্ট যষ্টি এবং চন্দন কাষ্ঠ নির্মিত যষ্টিও মূল্যবান দ্রব্যনির্মিত আধারে রক্ষিত হইতেছে। সম্প্রতি, জটনৈক রাজা এই দ্রব্যগুলি তথাগতের নিজস্ব বলিয়া বলপূর্বক স্বদেশে লইয়া নিজ প্রাসাদে রাখিয়াছিলেন। অল্পক্ষণ পরে ষাইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে দ্রব্যগুলি অক্ষত হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে সেগুলি তাহাদের পূর্বতন স্থানে প্রত্যাগমন করিয়াছে। এই পাঁচটি পবিত্র দ্রব্য অনেক সময় অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন করে।

এইসকল পবিত্র দ্রব্যকে অনবরত পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য উপহার দিবার জন্য কপিশারাজ পাঁচজন সদ ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিয়াছেন। অনবরত জন সাধারণ এই দ্রব্য গুলিকে পূজা করিবার জন্য সমবেত হওয়ায় এবং নির্জনে তপস্যার জন্য, ব্রাহ্মণগণ শাস্তিরক্ষণার্থ পূজার জন্য নির্দ্বারিত শুদ্ধ স্থির করিয়াছেন। যাহারা তথাগতের কেরোটি দেখিতে অভিলাষী হয় তাহাদের এক সুবর্ণ মুদ্রা দান করিতে হয়; যাহারা উহার প্রতিকৃতি গ্রহণেচ্ছুক তাহাদের গন্ধসুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে হয়। অন্যান্যগুলিতেও নির্দ্বারিত শুদ্ধ আছে। যদিচ এই শুদ্ধ অত্যন্ত উচ্চ, তত্রাপি অনেক লোক পূজার্থ একত্রিত হয়।

দ্বিতীয় প্রাসাদের উত্তর-পশ্চিম বোণে নাতিবৃহৎ স্তূপ আছে। স্পর্শমাত্রেই ইহা কাঁপিতে থাকে এবং ইহার ঘণ্টা ও বুনবুনিগুলি শব্দ করিতে থাকে। দক্ষিণ পূর্ব দিকে পাঁচ শত লি গমন করিয়া আমরা কিয়েন-টোলো (গাঙ্কার) রাজ্যে পৌঁছি।

কিয়েনটোলো (গাঙ্কার)

গাঙ্কার রাজ্য পূর্ব পশ্চিম ১০০০ লি এবং উত্তর দক্ষিণে ৮০০ লি বিস্তৃত। ইহার পূর্বসীমায় সিন (সিন্দু) নদী। রাজধানী পোলুনাপুলো (পুষ্পপুর) নামে কথিত হইয়া থাকে। রাজধানীর পরিধি প্রায় ৪০ লি। রাজবংশ নির্বংশ এবং কপিশা হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিগণ রাজ্যশাসন করেন। নগর ও গ্রাম জনশূন্য। রাজকীয় আবাসের সন্নিকটে সহস্র ঘর লোক বাস করে। দেশে শাক, পুষ্প ও ফল যথেষ্ট পাওয়া যায়, ইক্ষুদণ্ডও প্রচুর আছে; এই ইক্ষুদণ্ডের রস হইতে অধিবাসীরা চিনি প্রস্তুত করে। জলবায়ু আর্দ্র এবং উষ্ণ এবং সাধারণতঃ বরফ দেখা যায় না। অধিবাসীরা ভীক এবং নব্র প্রকৃতির। ইহার সাহিত্যানুরাগী। অধিকাংশই ধর্ম্মে অবিখ্যাত এবং অত্যাশংখ্যাই সত্যধর্ম্ম বিশ্বাস করে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই দেশে অনেক শাস্ত্রকার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যথা নারায়ণ দেব, অসংখ্য বোধিসত্ত্ব, বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব, ধর্ম্মত্রাতা, পার্শ্ব প্রভৃতি। প্রায় সহস্র সজ্বরাম আছে কিন্তু সকলগুলিই জনশূন্য ও ধ্বংসাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট। সেগুলি জঙ্গলাকীর্ণ এবং নির্জনে। স্তূপগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। অধিবাসীদিগের শতাধিক মন্দিরে অধিবাসীগণ বাস করে।

রাজধানীর অভ্যন্তরে উত্তর পূর্ব দিকে এক প্রসাদের ভগ্নাবশেষ ভিত্তিমূল দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে এই স্থানে বুদ্ধদেবের পাত্র মূল্যবান প্রাসাদে রক্ষিত হইত। বুদ্ধের নির্বাণের পর, তাহার পাত্র এই প্রদেশে অনেক শতাব্দী ধরিয়া পূজিত হইয়াছিল। এইক্ষেণে পাত্রটি পারশ্বদেশে আছে।

নগর-বহির্ভাগে ৮৯ লি দক্ষিণ পূর্বে প্রকাণ্ডকায় একটি বৃক্ষ আছে। ইহার শাখাগুলি বৃহৎ এবং ইহারই নিম্নে চারিজন বুদ্ধ বসিয়াছিলেন। বর্তমানেও এই স্থানে চারিটি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্রকরে আরও ৯৯৬টা বুদ্ধ এই স্থানে উপবেশন করিবেন। শাক্যতথাগত এই বৃক্ষমূলে দক্ষিণামুখে

উপবিষ্ট হইয়া আনন্দকে বলিয়াছিলেন “আমার নির্বাণের চারিশত বৎসর পরে, কনিষ্ক নামে এক নরপতি এই দেশে রাজত্ব করিবেন। এই স্থানের সন্নিকটে তিনি এক স্তূপ নির্মাণ করিবেন; তথায় আমার অনেক অস্থি ও চর্ম রক্ষিত হইবে।”

পিপুল বৃক্ষের দক্ষিণে কনিষ্কনির্মিত একটা স্তূপ আছে। বুদ্ধের নির্বাণের চারিশত বৎসর পরে কনিষ্ক জম্বুদ্বীপ শাসন করিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না এবং বৌদ্ধধর্ম্মে তিনি আর্দ্রো আস্তাবান ছিলেন না। এক দিবস তিনি জলাভূমি অতিক্রমকালে একটা শ্বেত খরগোস দর্শনে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকেন। খরগোস এই স্থানে আসিয়া সহসা অদৃশ্য হইয়া যায়। সেই সময় তিনি দেখিতে পান যে এক বালক নিকটবর্তী বনে তিনফুট উচ্চ এক স্তূপ নির্মাণ করিতেছে। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বালক, তুমি কি করিতেছ।” বালক উত্তর করিলেন “পুরাকালে শাক্যবুদ্ধ তাঁহার বুদ্ধিবলে নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন “এই দেশে একজন বিজয়ী রাজা এক স্তূপ নির্মাণ করিয়া তথায় আমার স্মরণচিহ্ন রক্ষা করিবেন।” বর্তমানই সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবারই প্রশস্ত সময় এবং সেই জন্ত আমি তোমাকে এই কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্ত আদেশ করিতেছি।” এই কথা বলিয়াই বালক অন্তর্ধান করিলেন।

রাজা এই আদেশে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। বুদ্ধদেব যে ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁহাকে উল্লেখ করিয়াছিলেন এই সংবাদে তিনি নিজেকে সম্মানিত বিবেচনা করিয়া সর্বাস্তঃকরণে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। বালকের প্রস্তুত স্তূপ বেষ্টন করিয়া তিনি প্রস্তরের বৃহৎ স্তূপ নির্মাণ আরম্ভ করিলেন। স্তূপ যতই নির্মিত হইতে লাগিল বালকের ক্ষুদ্র স্তূপও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই প্রকারের ৪০০ ফুট উচ্চ এবং সার্ক শত লি ভিত্তি লইয়া স্তূপ নির্মাণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্তূপ নির্মাণ শেষ হইলেই রাজা দেখিতে পাইলেন যে সহসা ক্ষুদ্র স্তূপটা বৃহৎ ভিত্তিমূলে দক্ষিণ পূর্বকোণে স্থাপিত হইয়া কনিষ্ক নির্মিত স্তূপ ভেদ করিয়া উখিত হইয়াছে।

রাজা এই ব্যাপারে দুঃখিত হইয়া তাঁহার স্তূপ ধ্বংসের আদেশ প্রদান করিলেন। দ্বিতীয়তল পর্য্যন্ত ভাঙ্গা হইলে ক্ষুদ্র স্তূপটা পুনরায় স্বস্থানে আসীন হইল। কিন্তু উচ্চতায় অষ্টটি অপেক্ষা বেশী থাকিল। রাজা নিজ দোষ স্বীকার করিয়া বলিলেন যে দেবতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা অসম্ভব। এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। এই দুইটা স্তূপ বর্তমানেও দেখিতে পাওয়া যায়। কষ্টসাধ্য ব্যাধি হইলে আৰোগ্য লাভের আশায় লোক এই স্থানে গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পোপহার প্রদান করে এবং ভক্তিপূর্ণচিত্তে প্রার্থনা করে। অনেক স্থলেই পীড়িত আরোগ্যলাভ করে।

ক্রমশঃ।

ওলন্দাজি উপনিবেশ সম্বন্ধে কতিপয় মন্তব্য।

(ফেলিসিয়ঁ-শ্বালের ফরাসী হইতে)

বাতাবিয়া—গুক্রবার, ১৯ ডিসেম্বর।
ষবদ্বীপে দ্রুত পরিভ্রমণ করিয়া, লোকের সহিত কথাবার্তা কহিয়া, গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া, ওলন্দাজের উপনিবেশপদ্ধতি সম্বন্ধে আমার

যে ধারণা হইয়াছে, যবদ্বীপ হইতে প্রস্থান করিবার পূর্বে তাহা লিপিবদ্ধ করিব মনে করিতেছি।

আমার বিশ্বাস, এই উপনিবেশ স্থাপনের

বিষয়টি নিঃস্বার্থভাবে অনুশীলন করা আমার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যিক। এই উপনিবেশ-রাজ্যগুলি যুদ্ধের দ্বারা বিজিত হইয়াছে বাহুবলে বশীভূত হইয়াছে—এই ছুতা করিয়া অনেকে—যাহারা যুদ্ধবিগ্রহের স্থানে শান্তিকে ও বাহুবলের স্থানে ঞ্চায়ধর্মকে স্থাপন করিতে চাহেন—উপনিবেশ-সমস্তার সম্বন্ধে বড় একটা আগ্রহ প্রকাশ কবেন না। উপনিবেশ স্থাপনের কাজটাই অন্ডায় ও দুর্নীতিমূলক—এই বলিয়া এককথায় তাঁহারা বিচার নিষ্পত্তি করিয়া বসেন। তাঁহারা ইহা বোঝেন না,—এসম্বন্ধে কোন কাজ করিবার পূর্বে বাস্তবিক অবস্থাটা জানা আবশ্যিক। একথা স্বীকার করিতে হইবে, উপনিবেশ-তন্ত্রটা একটা বাস্তব তথ্য; ভৌগোলিক সংস্থান, ঐতিহাসিক ঘটনা, দেশকালে জাতিবিশেষের আপেক্ষিক অবস্থা—এই সকল কারণে উপনিবেশস্থাপন অনিবার্য। যে জাতি যুরোপীয় নহে, এবং যুদ্ধকার্যে ও আর্থিক হিসাবে যে জাতি দুর্বল, সে জাতিকে কোন যুরোপীয় জাতির অধীনে আসিতেই হইবে—যে যুরোপীয় জাতি যুদ্ধে ও অর্থে সমধিক প্রবল বলবান্। উপনিবেশপত্তনের কাজ আপাতত অনিবার্য—একথা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, ঞ্চায়ানুসারে দেশীয় লোকদিগকে মুক্তিদান করিবার চেষ্টায় উপস্থিতমত বিশেষ-বিশেষ সংস্কার প্রবর্তিত করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে, সুদূরবর্তী রাষ্ট্রবিপ্লবের শুধু একটা অস্পষ্ট আশা হৃদয়ে পোষণ করিলে কোন কাজ হইবে না। সুতরাং উপনিবেশ সমস্তার সমস্ত খুঁটিনাটিগুলি, সমস্ত

মতবাদগুলি, সমস্ত তথ্যগুলি ভাল করিয়া অনুশীলন করা আবশ্যিক। বর্তমান অবস্থাটা জানিতে পারিলে, তৎসম্বন্ধে কর্তব্য নির্ধারণ করা সহজ হইবে।

যবদ্বীপে ওলন্দাজেরা কি করিতে চাহিয়াছিল?—তাহাদের উদ্দেশ্য কি ছিল?—আর কিছুই নহে,—উপনিবেশ-রাজ্যের যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্বল, তাহার উৎকর্ষ সাধন করিয়া, তাহা হইতে ধন উৎপাদন করিয়া ওলন্দাজ-দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করা, স্বদেশকে লাভবান্ করা,—ইহাই উদ্দেশ্য।

ইহা সেই কার্য্যপ্রণালী, যাহা ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে General Vanden Bosch কল্পনা করিয়াছিলেন। উপনিবেশ সম্বন্ধীয় মতবাদের ইতিহাসে, এই প্রণালীটি Boschএর প্রণালী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। প্রণালীটি এইঃ—যুরোপীয় রাজসরকার,—যুরোপীয় কর্ম-চারীর তত্ত্বাবধানে, কতকগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রয়োজনীয় বিদেশী গাছ রোপন ও চাষ করিবার জন্ত দেশীয় লোকদিগকে বাধ্য করেন; দেশীয় লোকেরা তাহাদের কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য, একটা নির্দিষ্ট মূল্যে সরকারের গুদামে দাখিল করিতে বাধ্য। এই সকল উৎপন্ন দ্রব্য যুরোপে চালান করিলে খুব লাভ হয়। কেননা, খুব কম মূল্যে খরিদ করিয়া খুব বেশী মূল্যে বিক্রয় করা হয়।—প্রথমে চিনি, তামাক, চা, নীল প্রভৃতি সকলপ্রকার চাষের সম্বন্ধেই Boschএর প্রণালী অনুসৃত হইত, পরে ক্রমশঃ শুধু কাফির চাষেই এই প্রণালী প্রযুক্ত হইল। এই অনন্তসাধারণ অর্থ-নৈতিক বন্দোবস্তটি—যুগপৎ সরকারের অনুকুল ও প্রজার প্রতিকুল; সরকারের

অনুকূল এইজন্ত যে, একটা সমস্ত বাণিজ্য সরকারের একচেটিয়া; প্রজার প্রতিকূল এইজন্ত যে, খুব অল্প মজুরীতে চাষীদিগকে চাষ করিতে বাধ্য করা হয়। এই প্রণালীটি প্রজাপীড়নের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—এই প্রণালী অনুসারে প্রজাদিগের সর্বনাশ হওয়া দূরে থাক, বরং তাহারা প্রভূত ধনশালী হইয়া উঠে; সামাজিক শ্রমের স্মৃশ্জাল বন্দোবস্ত হইতে এইরূপই আর্থিক লভ্য হইয়া থাকে। এই পদ্ধতিটি যেরূপ সরকারের অনুকূল সেইরূপ যদি প্রজারও অনুকূল হইত, যে প্রভূত অর্থ ওলন্দাজেবা আশ্রয় করে, তাহা যদি দেশীয় চাষাদিগের ভোগে আসিত, তাহা হইলে অচিৎকালে যবদ্বীপবাসীদিগের অবস্থা অনেকটা উন্নত হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই।

যবদ্বীপের ভূমি কর্ষণ করিয়া ধনোৎপাদন ও ধনোপার্জনই ওলন্দাজদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়ায়, এই উদ্দেশ্যের সহিত মিল করিয়া তাহারা রাজ্যশাসনের সমস্ত খুঁটিনাটিগুলি নিপুণভাবে নির্ধারণ করিয়াছে। এইরূপ হীন উদ্দেশ্য হইলেও, অনেক বিষয়ে তাহাদের রাষ্ট্রনীতিকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাহারা দেশীয় লোকের রীতিনীতি আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়া দেশ শাসন করিতেছে। রাজপুরুষেরা যাহাতে দেশের রীতিনীতি সম্মানের চক্ষে দেখিতে পারে এইজন্ত তাহাদিগকে দেশীয় ভাষা শিখিতে বাধ্য করা হয়। দেশের প্রচলিত ধর্মের প্রতিও তাহারা সম্মান প্রদর্শন করে। ইহাদের মতো পরধর্মসহিষ্ণুতা ও ধর্মসম্বন্ধীয় উদাসীনতা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

ইহারা দেশীয় গ্রাম্যমণ্ডলীদিগকে বহুপরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করিয়াছে। ইহারা চীনের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় লোকদিগকে এবং লুক্ক যুরোপীয় উপনিবেশিকদিগের হস্ত হইতে দেশীয় লোকের অধিকৃত কৃষিভূমিকে রক্ষা করিয়াছে। যবদ্বীপের কৃষিভূমি সম্বন্ধীয় বিধিব্যবস্থা একটু নূতন ধরণের। দেশেব অধিকাংশ বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর সরকারের স্বত্বাধিকার। প্রজাদের প্রায়ই অস্থায়ী স্বত্ব—কয়েক বৎসরের জন্ত তাহাদের সহিত বন্দোবস্ত করা হয় মাত্র; কোন কোন জমি ৭৫ বৎসরের জন্ত ইজাবা দেওয়া হইয়া থাকে। সরকারই সাধারণের স্বত্বাধিকারের—দেশীয় লোকের স্বত্বাধিকারের রক্ষক; সুতরাং অগ্রায় অত্যাচার হইলে সরকারকে সময়ে সময়ে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। একদিকে সরকারের এই হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার, এবং অপরদিকে যুরোপীয় উপনিবেশিকদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীন উত্তম—এই উভয়ের মধ্যে যেরূপ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কাজ করা হয় তাহা অতীব প্রশংসনীয়। আমাদের দেশেও কুলপরম্পরাগত চিরস্থায়ী স্বত্বাধিকারের বদলে ক্রমশঃ এইরূপ সীমাবদ্ধ অস্থায়ী স্বত্বাধিকার প্রবর্তিত করিতে পারিলে ভাল হয়।

রাজ্যশাসনের দিক দিয়া দেখিলেও, ওলন্দাজদিগের বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। অব্যবহিত রাজ্যশাসনের লোভ সম্বরণ করিয়া তাহারা শুধু উপরিতন কর্তৃত্বের (protectorate) ভার গ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক যুরোপীয় কর্মচারীর পাশাপাশি সমপদস্থ এক একজন দেশীয় কর্মচারীও অবশ্য আছে। আসল

কমতাটা যুরোপীয় কর্মচারীরই হাতে ; তবে যে, একজন সমপদস্থ দেশীয় কর্মচারীকে তাহার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়, তাহার অর্থ আর কিছুই নহে—দেশীয় লোকের দ্বারাই দেশ শাসিত হইতেছে এইরূপ একটা ভান করা মাত্র । এইরূপ মধ্যবর্তী দেশীয় কর্মচারীকর্তৃক যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা প্রজারা ভাল বুঝিতে পারে ও তাহা সহজে সম্পাদিত হয় । দেশীয় বিচারকদিগের দ্বারাই বিচারকার্য নিষ্পন্ন হয়, তবে প্রধান বিচারপতি একজন যুরোপীয় ; তিনি দেশীয় ভাষা ও দেশীয় রীতি নীতি সমস্তই জানেন । ওলন্দাজেরা দেশীয়দিগের প্রতি অবজ্ঞাসূচক উদ্ধত কর্তৃত্ব প্রদর্শন করিলেও, নিজের প্রকৃত স্বার্থের উদ্দেশে, যেরূপ শাসন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে তাহা দেশীয়দিগের স্বার্থেরও অনুকূল । এইরূপ উপনিবেশ-শাসন-পদ্ধতি অল্প সকল জাতিরই অনুকরণীয় । যপদ্বীপে ওলন্দাজদিগের, ভারতে ইংরাজ-দিগের, ও কোচিন-চীন ও টিউনিসে ফরাসী-দিগের যেরূপ পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা, তাহাতে জটিল, স্বেচ্ছাচারী, বহুব্যয়সাপেক্ষ অব্যবহিত শাসন অপেক্ষা এইরূপ মধ্যবর্তীর দ্বারা শাসন করিবার সাদাসিধা পদ্ধতি যে উৎকৃষ্ট তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয় ।

মানুষের সম্বন্ধে যেরূপ,—জিনিসের সম্বন্ধেও সেইরূপ ওলন্দাজদিগের ‘কেজো’ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় । ভূমি হইতে ধনোৎপাদন করিবার জন্ত তাহারা সুপ্রণালী-ক্রমে যেরূপ বিজ্ঞানের প্রয়োগ করে তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয় । তাহারা অসংখ্য খাল কাটিয়াছে । তাহারা কৃষির উন্নতিসাধন

করিয়াছে, নূতন-নূতন চাষ প্রবর্তিত করিয়াছে । কৃষি ও শিল্পবাণিজ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহারা বুদ্ধিপূর্বক বৃক্ষাদির অনুশীলন করিয়াছে । কিসে বৃক্ষাদির পরিপুষ্টি হয়, কোন্ ভূমির কিরূপ শক্তি, কোন্ সার কোন ভূমির উপযোগী, কোন্ ভূমির কিরূপ রোগ ও কিরূপ প্রতিকার—সমস্তই তাহারা সম্যক্রূপে আলোচনা করিয়াছে । এই কার্যে সরকারের সহিত ব্যক্তিবিশেষেরও সহযোগিতা আছে । Burtenzorg-উদ্ভানে যে ব্যয় হয় তাহার একতৃতীয়াংশ প্ল্যাণ্টারেরা দিয়া থাকে ; সরকার প্ল্যাণ্টারদিগকে বীজ, গাছের কলম, এমন কি, মূলধনের অগ্রিম টাকা পর্য্যন্ত যোগাইয়া থাকেন ।

এইরূপ সুনিপুণ ওপনিবেশিক শাসন-পদ্ধতির দ্বারা ওলন্দাজেরা যবদ্বীপকে বেশ ফলোৎপাদক করিয়া তুলিয়াছে । ৫০ বৎসর পূর্বে যবদ্বীপের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল এখন যে ততটা নাই—সে তাহাদের দোষ নহে । কোন কোন প্রদেশে কাফি-গাছ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে ; সেই সব স্থানে কাফির চাষ রহিত করিতে হইয়াছে । অত্যাগ্ৰ ফলোৎপাদক দেশের প্রতিযোগিতায়—বিশেষত ব্রেজিলের প্রতিযোগিতায়—চিনি ও কাফির মূল্য কমিয়া গিয়াছে ।—পক্ষান্তরে, ওলন্দাজ-দিগের কখন কখন এইরূপ ভয় হয়, পাছে কোন প্রবল রাজশক্তি এই সুন্দর উপ-নিবেশকে আক্রমণ করে । তাই তাহারা অল্প কোন রাজশক্তির সংস্রবে বড়-একটা আসিতে চাহে না । যবদ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইলে, বৈদেশিককে এইজন্ত ছাড়পত্র দেখাইতে হয়, কেন ভ্রমণ করিতে আসিয়াছে তাহার

কৈফিয়ৎ দিতে হয়। বৈদেশিকদের নিকট ওলন্দাজ-কর্মচারীরা সাবধানে কথাবার্তা কহে, দেশ সম্বন্ধে বড়-একটা খোঁজখবর দিতে চাহে না। এই বিষয়ে ইংরাজদের সহিত তাহাদের বিলক্ষণ প্রভেদ; ইংরাজেরা আপনাদের সম্বন্ধে নির্ভয় ও গর্বিত।—সুদ্র হলেণ্ড, বৃহৎ রাজশক্তিদিগকে অত্যন্ত ভয় করে। জাপানও হলেণ্ডের মনে ভয় সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিয়াছে; আমি যখন যবদ্বীপে ছিলাম, চীনদিগের প্রতিকূলে বিধিবদ্ধ বিশেষ-আইন-গুলাকে এড়াইবার জন্ত, তত্রস্থ আড়াই কোটি চীন অধিবাসীর মধ্যে ৬০,০০০ চীন, জাপানী জাতিভুক্ত হইতে চাহিয়াছিল; কেননা, নব-সংস্থাপিত সন্ধির বলে, জাপানীরা যুরোপীয়দিগের সমকক্ষ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাই কতকগুলি ওলন্দাজ এইরূপ মনে করে,—কে জানে যদি জাপানীরা এই চীনদের প্রার্থনা কোন দিন গ্রাহ্য করে, এবং অভিনব জাতিদিগকে রক্ষা করিবার ব্যাপদেশে স্বীয় উৎকৃষ্ট নৌ-বহরের সাহায্যে, এই অরক্ষিত দ্বীপটিকে দখল করিয়া বসে?... এইরূপে পূর্বতন উপনিবেশটি ক্রমশই অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে; বিশেষত সম্প্রতি কোন কোন ভূখণ্ডে যে সকল রাজনৈতিক ঘটনা হইয়া গিয়াছে, সমস্ত রাজ্যসমূহের মধ্যে যেরূপ অর্থনৈতিক পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার উপর ওলন্দাজদিগের কোন হাত নাই। যাই হোক, তাহাদের উপনিবেশ-পদ্ধতির কোন দোষ নাই। তাহাদের পদ্ধতিকে প্রশংসা করিতেই হয়,—উদারতার জন্ত নহে, পরন্তু তাহাদের ‘কেজো’ বুদ্ধির জন্ত।

অবশেষে বক্তব্য,—সমস্ত উপনিবেশিক

রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় নিয়ম স্থাপন করা যাইতে পারে। যদি উপনিবেশ-রাজ্য স্থাপন করা অপরিহার্য্যই হয়, তাহা হইলে শান্তি ও স্থায়ের মিত্রগণ অস্তুত এইটুকু দাবী করিতে পারেন যে, বিদেশী রাজা ও স্বদেশী প্রজা—এই উভয়ের স্বার্থের প্রতি যেন সমান দৃষ্টি রাখা হয়। উপনিবেশরাজ্য স্থাপনের একরূপ উদ্দেশ্য নহে যে কতকগুলি দাস-নিয়োগকারী ব্যক্তি কিংবা অ্যাব্‌স্যাথ (absinth) মতের কতকগুলি বণিক ধনশালী হইয়া উঠে। রাজ্যকর্তা কোন যুরোপীয় জাতি ও প্রজাস্থানীয় দেশীয় লোক—এই উভয়ের মধ্যে সন্মিলন হইয়া যাহাতে উভয়ই লাভবান হয়, ইহাই উপনিবেশ রাজ্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

এই সন্মিলনের ফলে, অর্থ নৈতিক হিসাবে বিদেশী রাজসরকারের বিশেষ লাভ হইয়া থাকে; তাহাদের অধীনস্থ উপনিবেশ-রাজ্য,—“সুবিধা জনক ক্রয় বিক্রয়ের একটা বৃহৎ বিপণি”; অত্র অপেক্ষা তাহারা সহজে স্বকীয় শিল্প সামগ্রী দেশীয় লোকদিগকে বিক্রয় করিতে পারেন এবং সেখান হইতে শিল্প সামগ্রীর যাহা মূল-উপাদান, সেই সকল নিতান্ত আবশ্যকীয় কাঁচা মাল ক্রয় করিতে পারেন। যতই তাহারা দেশীয়দের নিকট হইতে কাঁচা মাল ক্রয় করিবেন এবং দেশীয়দিগকে তাহাদের শিল্প সামগ্রী বিক্রয় করিবেন, দেশীয়দিগের আর্থিক অবস্থারও ততই উন্নতি হইবে। উপনিবেশের উন্নতির পক্ষে দেশীয় লোকেরা একটা প্রধান উপাদান। আবার, তাহাদের এই দূরস্থ উপনিবেশ রাজ্যটি, তাহাদের পররাষ্ট্রীয় কার্য্যসম্বন্ধে, তাহাদের যুদ্ধকার্য্য

সম্বন্ধে, একটা বিশেষ আশ্রয়স্থল ও সহায় হইতে পারে। পক্ষান্তরে, যুরোপীয় শাসনাধীনে, যদি দেশীয় লোকদিগের কোন লাভ না হয়, তাহা হইলে সে শাসন নিতান্ত অগ্রায় বলিয়া পরিগণিত হইবে। কোন যুরোপীয় জাতির সংস্রবে আসিয়া, দেশীয় লোকেরা বেশী স্বাধীনতা লাভ করিবে, বেশী ঞায়বিচার পাইবে, বেশী সুখশান্তি সম্ভোগ করিবে, তবেই উপনিবেশ রাজ্যের সার্থকতা। যদি উপনিবেশ রাজ্যের দেশীয় অধিবাসীরা বিদেশীয় শাসনে উপকৃত হয় তবেই নৈতিক হিসাবে উপনিবেশ রাজ্যাধিকারকে সমর্থন করা যাইতে পারে।

যাহারা অগ্রায় অত্যাচারের প্রতিকূল, যাহারা দেশীয় লোকদিগের ঞায়া অধিকারের পক্ষপাতী, তাহারা অবশু ওলন্দাজি শাসনপদ্ধতির মূল-ভাবটিকে ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। তথাপি দেখা যায়, ভিন্ন আদর্শ অনুসরণ করিয়াও ওলন্দাজেরা যবদ্বীপে কতকগুলি সংস্কারকে কার্যে পরিণত করিয়াছে। যাবায় যেরূপ দেশীয় লোকের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয় সেইরূপ সকল উপনিবেশ-রাজ্যেই হওয়া উচিত; যাবার ঞায় সকল উপনিবেশ-রাজ্যেই—কি ব্যক্তিগত, কি সমবেত—সর্বপ্রকার স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত হওয়া উচিত। যাবার ঞায় সকল উপনিবেশ-রাজ্যেই শাসনকার্য স্বদেশীয় লোকের দ্বারা নির্বাহিত হওয়া উচিত; কেবল পরিচালনের কর্তৃত্ব এমন যুরোপীদিগের হস্তে থাকা আবশ্যক যাহারা দেশীয় ভাষা, দেশীয় রীতি নীতি সমস্তই অবগত আছে। যাবার ঞায় সকল উপনিবেশ রাজ্যেই অন্ততঃ প্রাথমিক

আদালতের বিচারকার্য দেশীয় বিচারপতি কর্তৃক নিষ্পন্ন হওয়া কর্তব্য। অনেকগুলি যুরোপীয় উপনিবেশ-রাজ্যে দেশীয়েরা যেরূপ কষ্ট পায়, এই সামান্য নিয়মগুলি প্রয়োগ করিলে অচিরেই সেই সব কষ্টের লাঘব হইতে পারে।

আর দুই এক শতাব্দীর মধ্যে আরও বড় বড় সমস্তা উপস্থিত হইতে পারে। পৃথিবীতে যে পরিমাণে সুনীতি ও সদনুষ্ঠানের উন্নতি হইবে, সেই অনুসারে, শান্তি ও ঞায়-ধর্মের ভাব সর্বত্র প্রসারিত হইবে, উপনিবেশ সম্বন্ধীয় কর্তব্যসকল যুরোপীয়েরা উত্তরোত্তর আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। তখন তাহারা বুঝিতে পারিবে, উপনিবেশগুলি নিত্যকাল পরাধীন থাকিবে—বিধাতার একপ অভিপ্রায় নহে। তখন তাহারা দেশীয় লোকের কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করিয়া, তাহাদিগকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবে; এবং দেশীয়েরা অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিলেও সেই প্রেমের বন্ধন বরাবর থাকিয়া যাইবে। তাহারা অধীন জাতিদিগকে এতটা সমৃদ্ধ এতটা শিক্ষিত এতটা বলবানু করিয়া তুলিবে যে একদিন সেই সকল জাতির অধীনতা ঘুচিয়া যাইবে, তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিবে; মহৎ ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, এই উপনিবেশ-রাজ্য-পদ্ধতি পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্ত সচেষ্ট হইবে; এবং সেই শুভদিন অগ্রসর করিয়া দিবে যখন সমস্ত জাতি—সকলেই সমান-স্বাধীন—ভ্রাতৃত্বাবে সম্মিলিত হইয়া, মানব সমাজে শান্তির রাজ্য বিস্তার করিবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চন্দ্রলোক।

এই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চন্দ্রদেবের প্রভাব অপরিণীত! বর্ণনায়, উপমায়, বিচ্ছেদে, মিলনে,— অলঙ্কারে, অনুপ্রাসে,—সুধাকর, হিমাংশু, শশাঙ্ক, কলঙ্ক, প্রভৃতি নহিলে কিছুতেই চলে না। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে এইরূপে কেবল সাহিত্য কুঞ্জে লীলাখেলা করিয়া, চন্দ্রের নিস্তার নাই। বিজ্ঞান দৈত্য সে পথ ঘেরিয়া বসিয়া আছে।

যখন অভিমন্যু শোকে, ভদ্রাজ্জুন অত্যন্ত কাতর, তখন তাঁহাদিগের প্রবোধার্থ কথিত হইয়াছিল যে, অভিমন্যু চন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। আমরাও যখন নীলগগন সমুদ্রে এই সুবর্ণের দীপ দেখি, তখন মনে করি, বুঝি এই সুবর্ণময় লোকে সোনার মানুষ সোনার খালে সোনার মাছ ভাজিয়া সোনার ভাত খায়, হীরার সরবত পান করে, এবং অপূর্ব পদার্থের শয্যায় শয়ন করিয়া স্বপ্নগুণ নিদ্রায় কাল কাটায়। বিজ্ঞান বলে, তাহা নহে—এ পোড়া লোকে যেন কেহ যায় না—এ দক্ষ মরুভূমি মাত্র।

বালকেরা শৈশবে পড়িয়া থাকে, চন্দ্র উপগ্রহ। কিন্তু উপগ্রহ বলিলে, সৌরজগতের চন্দ্রের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্দিষ্ট হইল না। পৃথিবী ও চন্দ্র যুগলগ্রহ। উভয়ে এক পথে, একত্র সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে— উভয়েই উভয়ের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের বশবর্তী—কিন্তু পৃথিবী গুরুত্বে চন্দ্রের একাশিগুণ, এজন্য পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি চন্দ্রাপেক্ষা এত অধিক, যে সেই যুক্ত আকর্ষণে কেন্দ্র পৃথিবীস্থিত; এবং এজন্যই চন্দ্র পৃথিবীর প্রদক্ষিণকারী উপগ্রহ। সাধারণ পাঠকে বুঝিবেন, যে চন্দ্র একটি ক্ষুদ্রতর পৃথিবী; ইহার ব্যাস ১০৫০ ক্রোশ; অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের চতুর্থাংশের অপেক্ষা কিছু বেশী।

এই ক্ষুদ্র পৃথিবী আমাদের পৃথিবী হইতে এক বিংশতি সহস্র ক্রোশ—ত্রিশ সহস্র যোজন মাত্র। গাণনিক গণনায় এ দূরত্ব অতি সামান্য—এ পাড়া ও পাড়া মাত্র। ত্রিশটি পৃথিবী গায় গায় সাজাইলে চন্দ্র

গিয়া লাগে। চন্দ্র পর্য্যন্ত রেলওয়ে যদি থাকিত, তাহা হইলে ঘণ্টায় বিশ মাইল বেগে, দিন রাহি চলিলে, পঞ্চাশ দিনে পৌঁছান যাইত।

হুতরাং আধুনিক জ্যোতির্বিদগণ চন্দ্রকে অতি নিকটবর্তী মনে করেন। তাঁহাদিগের কোণে এক্ষণে এমন দূরবীক্ষণ নির্মিত হইয়াছে যে চন্দ্রাদিকে চক্ষু দ্বারা আমরা যত বড় দেখি সেই দূরবীণে তাহার অপেক্ষা ২৪০০ গুণ বৃহত্তর দেখায়। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে, যে চন্দ্র যদি আমাদের নিকটে হইতে পঞ্চাশৎ ক্রোশমাত্র দূরবর্তী হইত, তাহা হইলে আমরা চন্দ্রকে যেমন স্পষ্ট দেখিতাম, এক্ষণেও ঐ সকল দূরবীক্ষণ সাহায্যে সেইরূপ স্পষ্ট দেখিতে পাই। চন্দ্র যদি মেমারি স্টেশনে আসিয়া বাস করিতেন, তাহা হইলে কলিকাতাবাসীরা তাঁহাকে যেমন স্পষ্ট দেখিতেন, ত্রিশৎ সহস্র যোজন দূরবর্তী চন্দ্রকে জ্যোতির্বিদেরা এক্ষণে তেমনি দেখিতেছেন।

এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে, চন্দ্র পাষণময়, আগ্নেয়গিরি পরিপূর্ণ, একটি সুবৃহৎ জড়পিণ্ড। তাহার কোথাও অত্যন্ত পর্বতাবলী—কোথাও গভীর গহ্বররাঙ্গি। আমরা পৃথিবীতে দেখি যে যাহা রৌদ্রদীপ্ত, তাহাই দূর হইতে উজ্জ্বল দেখায়। চন্দ্রও রৌদ্র প্রদীপ্ত বলিয়া উজ্জ্বল। এবং যে স্থানে রৌদ্র লাগে না সে স্থান উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় না। চন্দ্রের কলায় কলায় হ্রাস বৃদ্ধি এই কারণেই ঘটয়া থাকে। চন্দ্রের যে স্থান উন্নত সেই স্থানেই প্রচুর পরিমাণে রৌদ্র লাগে বলিয়া—আমরা তাহা অত্যুজ্জ্বল দেখি—যে স্থানে রৌদ্র প্রবেশ করে না—সে স্থান গুলিই “কলঙ্ক”—অথবা “মৃগ”—প্রাচীনদিগের মতে সেই গুলিই “কদম্ব-তলায় বুড়ী, চরকা কাটিতেছে।”

চন্দ্রের বহির্ভাগের একরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান হইয়াছে যে তাহার ফলে এখন চন্দ্রের উৎকৃষ্ট মানচিত্র প্রস্তুত। তাহার পর্বতাবলী ও প্রদেশ সকল সেই মানচিত্রে বিশেষ বিশেষ নামে পরিচিত এবং তাহার পর্বত-

মালার উচ্চতাও পরিমিত। জ্যোতির্বিদগণ অন্যান্য ১০২টি চান্দ্র পর্বতের উচ্চতা পরিমিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে “নিউটন” নামপ্রাপ্ত পর্বত ২২, ৮২৩ ফুট উচ্চ। এতাদৃশ উচ্চ পর্বত শিখর, পৃথিবীতে আঙ্গন ও হিমালয়ে ভিন্ন আর কোথাও নাই। চন্দ্র পৃথিবীর পঞ্চাশৎ ভাগের এক ভাগ এবং গুরুত্বে একাশি ভাগের একভাগ মাত্র; অতএব পৃথিবীর তুলনায়, চন্দ্রের পর্বত সকল অত্যন্ত উচ্চ।

চান্দ্রপর্বত কেবল যে আশ্চর্য্য উচ্চ, এমত নহে; চন্দ্রলোকে অগ্নিহীন আগ্নেয় পর্বতের অত্যন্ত আধিক্য। অগণিত নির্বাণিত আগ্নেয় পর্বত শ্রেণী ভূতপূর্ব অগ্ন্য-দগ্ধী বিশাল রক্ত সফল প্রকাশিত করিয়া রহিয়াছে—যেন কোন তপ্ত দ্রবীভূত পদার্থ কটাহে জ্বলি প্রাপ্ত হইয়া এককালে টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া জমিয়া গিয়াছে। এই চন্দ্রমণ্ডল সহস্রধা বিভিন্ন, সহস্র সহস্র বিবর বিশিষ্ট,—বিদীর্ণ, ভগ্ন ছিন্ন ভিন্ন, দক্ষ, পাষণময়। হায়! এমন চাঁদের সঙ্গে কে সুন্দরী-দিগের মুখের তুলনা করার পদ্ধতি বাহির করিয়াছিল?

এই ত পোড়া চন্দ্রলোক! এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এখানে জীবের বসতি আছে কি? যদি চন্দ্রলোকে জল বায়ু থাকে, তবে সেখানে জীব থাকিতে পারে। কিন্তু বর্ণ-পরীক্ষক যন্ত্রের (Spectroscope) বিচিত্র পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে; চন্দ্রলোকে জলও নাই বায়ুও নাই। যদি জলবায়ু না থাকে তবে পৃথিবীবাসী জীবের জায় কোন জীব যে তথায় নাই ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

চান্দ্রিক উত্তাপও এক্ষণে পরিমিত হইয়াছে। চন্দ্র এক পক্ষকালে আপন মেরুদণ্ডের উপর আবর্তন করে, অতএব আমাদের এক পক্ষকালে এক চান্দ্রিক দিবস। আমরা যে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এত তাপাধিক্য ভোগ করি, তাহার কারণ শীতকালে দিন

ছোট, গ্রীষ্মকালের দিন তিন চারি ঘণ্টা বড়। যদি দিন তিন চারি ঘণ্টা মাত্র বড় হইলেই, এত তাপাধিক্য হয়, তবে পাক্ষিক চন্দ্রদিবসে না জানি চন্দ্র কি ভয়ানক উত্তপ্ত হইয়া উঠে। তাহাতে আবার পৃথিবীতে জল, বায়ু, মেঘ আছে—তজ্জন্ত পার্থিব সম্ভাপ বিশেষ প্রকারে শমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু চন্দ্রে জল বায়ু মেঘ কিছুই নাই। তাহার উপর আবার চন্দ্র পাষণময়। অতি সহজে উত্তপ্ত হয়। অতএব চন্দ্রলোক সূর্যালোকে কিরূপ তপ্ত হইয়া উঠে তাহা আমাদের কল্পনাভীত। লর্ড রস চন্দ্রের তাপ পরিমিত করিয়া বলিয়াছেন, যে, চন্দ্রের কোন কোন অংশ এত উষ্ণ যে তাহার তুলনায় পৃথিবীর ফুটন্ত উত্তপ্ত জলও অতিশয় শীতল। সে সম্ভাপে কোন পার্থিব জীব রক্ষা পাইতে পারে না—মূর্ত্তের জন্তও রক্ষা পাইতে পারে না।

অতএব সূখের চন্দ্রলোক কি প্রকার, তাহা এক্ষণে আমরা এক প্রকার বুঝিতে পারিয়াছি। চন্দ্রলোক—বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্ন, ভিন্ন, বক্ষুর, দক্ষ পাষণময়। জলশূন্য,—জনহীন, তরুহীন, তৃণহীন, শব্দহীন, উত্তপ্ত, অলস, নরককুণ্ড তুল্য। এই চন্দ্রলোক! ইহাই আমাদের হিমকর, সূধাংশু।

যদি কেহ বলেন, যে চন্দ্র স্বয়ং উত্তপ্ত হউন, আমরা তাহার আলোকের শৈত্য স্পর্শের দ্বারা প্রত্যক্ষ জানিয়া থাকি। বাস্তবিক একথা সত্য নহে—আমরা স্পর্শ দ্বারা চন্দ্রলোকের শৈত্য বাউষ্ণতা কিছুই অনুভব করি না। অন্ধকার রাত্রের অপেক্ষা জ্যোৎস্না রাত্রি শীতল, এ কথা যদি কেহ মনে করেন, তবে সে তাহার মনের বিকার মাত্র। বরং চন্দ্রলোকের যে কিঞ্চিৎ সম্ভাপ আছে তাহা পরীক্ষার দ্বারা স্থির হইয়াছে। তবে সেটুকু এত অল্প যে তাহা আমাদের স্পর্শের অননুভবনীয়।

শ্রীমুখার্জুণ বাগচি।

প্রতিহিংসা।

(গল্প)

আজ বিচারালয় লোকে লোকারণ্য ! সারাদিন ধরিয়া সেই বিপুল জনতা কঠোর উৎকর্ষায় উদ্গ্রীব হইয়া বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষের দীর্ঘ কাহিনীর প্রত্যেক কথাটিকে যেন সাগ্রহে গ্রাস করিতেছিল। এতক্ষণে জুরি তাঁহাদের বিচার নিষ্পত্তির জন্ত বিচার গৃহ ত্যাগ করিয়া নেপথ্যে গমন করিলেন দেখিয়া, সমাগত জনমণ্ডলী একটু বিশ্রামের অবসর লাভ করিল।

এতগুলি উদ্বিগ্ন মুখের মধ্যে কেবল একখানি মুখ নিতান্তই নিরুদ্বিগ্ন স্থিবে। সে মুখ সেই কাঠগড়ার মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ অভিযুক্ত অপরাধীর ! একটা শ্রান্তি ও সন্দেহের কালিমা চিহ্ন সেখানে এখনও স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে সত্য, কিন্তু ইতিপূর্বে সেখানে নৈরাশ্রের যে একটা নিবিড় ছায়া দেখা গিয়াছিল এখন তাহা অপসৃত হইয়াছে,—এখন তাহাকে দেখিলেই মনে হয় সে অদৃষ্ট স্রোতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, যেন এতক্ষণে বুঝিয়াছে যে আজ ভাগ্যদেবীর সকল শক্তিই তাহার বিপক্ষে,—এই বিষম সংগ্রামে তাহার পরাজয় অনিবার্য।

এতক্ষণ সে আপনার নির্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্ত প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়াছে ; তাহার বিরুদ্ধে যে সকল অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটির বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করিয়া সে বার বার বলিয়াছে যে সে তাহার প্রভুর অর্থ কখনই অপহরণ করে নাই,—নিশ্চয়ই কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তি এই কন্ম করিয়া থাকিবে।

এই স্থলে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের একটা বিবরণ দেওয়া আবশ্যিক। এই ব্যক্তি ন্যাথাল কারষ্টিন্ নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট কন্ম করিত। ঞাথানের অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া ব্যবসা ছিল। কিন্তু অল্পদিন পূর্বে কতকগুলি বহুমূল্য অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে কিছু টাকা ঋণ লইয়া যায়। কিছুদিনের মধ্যেই সেই অলঙ্কারগুলি চুরি যায় এবং পরে অন্বেষণে সেগুলি তাঁহার সেক্রেটারির পোর্টমাণ্টে হইতে বাহির হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, সে যখন লুকাইয়া পলায়ন চেষ্টা করিতেছিল তখন অলঙ্কার সমেত ধরা পড়িয়াছে। এবং অলঙ্কারগুলি যে কি প্রকারে তাহার দ্রব্যের মধ্যে আসিল উইল ভেমার তাহার কোনই সহস্তর দিতে পারে নাই।

জুরি বিচার গৃহ ত্যাগ করিবার পরেই বিচারক তাঁহার আপন প্রকোষ্ঠে প্রস্থান করিলেন। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিচারক ধর্ণ চেয়ারে হেলিয়া বসিয়া পড়িলেন, আজ কেমন একটা অভিনব ক্লাস্তি আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে ! একটা যেন কি অজ্ঞাত বেদনা আজ তাঁহার অন্তরের সুপ্ত তন্ত্রীকে আঘাত করিয়া বহুদিনের অতীত স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছে ! আঘাতটা কিসের তাহা তিনিই নিজেই স্থির করিতে অক্ষম !

সে দিন বিচারালয়ে সারাদিন ধরিয়া একটা যেন ছায়াময়ী মূর্তি অতীত প্রেমের প্রেতাত্মার

শ্রায় তাঁহাকে ঘেরিয়া ঘুরিতেছিল,—
যেন মৃত্যুর কঠোর নিষ্পেষণে নিস্তরক
একটি কঠোর ক্ষীণস্বর সারাদিন তাঁহার
শ্রবণ মূলে মৃদুগুঞ্জে কি বলিতেছিল—
তাহার অর্থ তাঁহার নিকট অবোধ্য ।

আজ এতদিন পরে সহসা বিচারগৃহের
পাষাণ দেয়াল বিদীর্ণ করিয়া আইনের নীরস
তর্কজাল ভেদ করিয়া তাঁহার স্নিগ্ধযৌবনা
পরলোকগতা পত্নীর পবিত্র স্মৃতিটি যে কি
কারণে তাঁহার মানসপটে উদ্ভিত হইল এবং
তাহার আকুলস্পর্শে মর্ম্মমধ্যে বহুদিনের বিস্মৃত
বেদনাটিকে জাগাইয়া তুলিল তাহা তিনি
কোনমতেই স্থির করিতে পারিলেন না ।

পত্নীর প্রেম ও সম্ভানের স্নেহে একদিন
তাঁহার হৃদয়টি সন্তপ্রস্ফুটিত পুষ্পের শ্রায় ছিল,
— তেমনই স্নিগ্ধ, তেমনি সুন্দর, তেমনি
সুগন্ধময় ! কিন্তু সে আজ বহুদিনের কথা ।
যেদিন ভীষণ ভূমিকম্পে দক্ষিণ আমে-
রিকার সমৃদ্ধ নগরী ধূলিসাৎ হইল এবং
সেই সঙ্গে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী ও
প্রাণপ্রিয় পুত্র চিরদিনের মত বিদায় লইল,
সেইদিন হইতে তিনি আর সে মানুষ নাই !
এক্ষণে তিনি কঠোর, কর্কশ, নির্ম্মম,—তাই
আজ এই করুণ স্মৃতির আঘাতে তিনি
আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন ।

সহসা কে দ্বারে আসিয়া আকুল আঘাত
করিতে লাগিল, যেন প্রাণপণে সাক্ষাৎ ভিক্ষা
করিতেছে ! খণ চকিতনেত্রে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত
করিয়া দ্বার খুলিলেন । দেখিলেন সম্মুখে
এক আলুলায়িতকুস্তলা, উৎকণ্ঠিত নয়না,
যুবতী ! রমণী বিনা আহ্বানে গৃহে প্রবেশ করিয়া
ঘুরিত করে দ্বার বন্ধ করিল—এবং দ্বারদেশে

পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া ক্ষীত বক্ষে দীর্ঘনিশ্বাস
ত্যাগ করিতে লাগিল । “এথেল !” সহসা
এই নামটি উচ্চারণ করিবা খণ বিস্মিত
নেত্রে নবাগতার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া
রহিলেন, ক্রমে তাঁহার মুখের ভাব কঠোর
হইয়া আসিল ! তিনি বার বার বলিয়া
থাকেন যে বিচারালয়ের মধ্যে তিনি কেবল-
মাত্র আইনের দাস, তথায় বাহিরের কোনও
ব্যক্তিরই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করা
কর্তব্য নহে । ইহা জানিয়াও তাঁহার
ভ্রাতৃপুত্রীর পক্ষে একরূপ সময়ে একরূপ স্থলে
তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসা কোন-
মতেই সম্ভব হয় নাই !

এই যুবতীটি তাঁহার পোষ্য কন্যা । শৈশবে
পিতৃমাতৃহীনা কন্যাটিকে লইয়া তিনি পালন
করেন । দক্ষিণ আমেরিকার সেই বিয়োগান্ত
অভিনয়ের পরে তাঁহার অন্তর মধ্যে যেটুকু
কোমল স্নেহ অবশিষ্ট ছিল, তাহার সবটুকুই
তিনি এই কন্যাটির উপর সমর্পণ করিয়া-
ছিলেন ।

যে তিরস্কারের উচ্ছাস তাঁহার ওষ্ঠাণ্ডে
আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল, তাহা যুবতীর
কাতর দৃষ্টি ও কম্পিত অধর দেখিয়া তৎক্ষণাৎ
কণ্ঠ মধ্যেই মিলাইয়া গেল ।

“খুল্লতাত ! আপনার তাহাকে রক্ষা
করিতেই হইবে—রক্ষা করিতেই হইবে !”
কথা কয়টি রুদ্ধ কঠোর ক্ষীণ গুঞ্জনের শ্রায়
কণ্ঠে বাহির হইল ।

“এথেল, আমি মনে করিয়াছিলাম তুমি
অসুস্থ বলিয়া গৃহে আছ । কিন্তু তুমি এ ভাবে
এখানে উপস্থিত কেন, আর তোমার কথারই
বা অর্থ কি ? কাহাকে রক্ষা করিব !”

যুবতীর গণ্ড বহিরা অশ্রু ঝরিতে লাগিল, সে বলিয়া উঠিল—“যে ব্যক্তি এক্ষণে আপনার নিকট বিচারাধীন আছে তাহাকে। উইল ভেয়ারকেই আমি গোপনে ভাল বাসিয়াছি, এই ব্যক্তিকেই আমি স্বামীরূপে বরণ করিয়াছিলাম! হায়, আপনি যদি লেশমাত্রও দয়াম্বেহ দেখাইতেন, তাহা হইলে আপনার সহানুভূতি লাভের আশায় আশ্বস্ত হইয়া আমি কতই আনন্দের সহিত আপনাকে আমার অন্তরের সকল কথা বলিতাম,—আমাদের প্রথম সাক্ষাতের কথা, দিনে দিনে প্রণয় পরিণতির কথা! কিন্তু,—কিন্তু আমার কেমন একটা ভয় হইত; আজ কেবল আমার সে ভয় আর নাই; আজ তাহাব অপেক্ষা অধিক ভয়ে, আমার প্রিয়তমের জন্ত ভয়ে, সে ভয় পলাইয়াছে!”—বিচারক বজ্রনিম্নে বলিয়া উঠিলেন—চুপ! এই ব্যক্তিই যদি তোমার প্রেমপাত্র হয় তাহা হইলে লজ্জায় তোমার নীরব থাকাই কর্তব্য।”

যুবতী উন্মাদিনীর শ্রায় অধীর হৃদয়ে বলিয়া উঠিল—“আপনি কি মনে করেন এই ব্যক্তির প্রতি প্রেম প্রকাশ করিতে আমার কোন প্রকার লজ্জা বোধ হয়? সে নির্দোষ, আমি বলিতেছি আপনাকে, সে আপনার আমার মতই সম্পূর্ণ নির্দোষ।”

“তাহার নাম পরিবর্তন করিয়া বিদেশে পলায়নের কল্পনা—তাহার আচরণ ও আয়োজন হইতেই বুঝা যায় যে সে পূর্ব হইতেই অপহরণ করিবে বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। তুমি এ সকলের কোন কৈফিয়ৎ দিতে পার?”

“অবশ্যই পারি। আমারই জন্ত সে এই সকল ব্যবস্থা করিতেছিল। সে তাহার বর্তমান ঘৃণ্য জীবন ও জীবিকা ত্যাগ করিবার জন্তই সে পলায়নে উদ্যত হইয়াছিল, আমি সহধর্মিণীরূপে তাহার অনুসরণ করিব স্থির করিয়াছিলাম। সে আমার কাছে তাহার জীবনের কোন কথাই লুকায় নাই। আমি জানিতাম সে এক সময়ে নিতান্ত নির্কোষের শ্রায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছে, কিন্তু আমি তাহার পার্শ্বে থাকিলে যে দেব চরিত্র হইত।”

বিচারক ধর্মের পক্ষে আর ধৈর্য্যরক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

“তাহার মধ্যে যদি এতই মহত্ব ছিল, তাহা হইলে সে যৌবনের শ্রেষ্ঠ কয়েক বৎসর একরূপ জঘন্য সংশ্রবে নষ্ট করিবে কেন? বাঃ, সে তোমাকে আচ্ছা বোকা বানিয়েছে দেখছি!”

“তাহার পালকই চিরদিন শনির মত তাহার সর্বনাশের চেষ্টায় লিপ্ত, সেই তাহাকে বাল্যকালে এই সকল জঘন্য সঙ্গীগণের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। এই ব্যক্তিই তাহাকে রক্ষা না করিয়া তাহার দুর্ভাগ্যের শ্রায় নিয়তই ধ্বংসের পথে প্ররোচিত করিত!”

বিচারকের মুখে স্বগার হাসির একটা ক্ষীণ রেখা আসিয়া দেখা দিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—“তোমার উন্মত্ত অনুরাগ তোমাকে অন্ধ করিয়াছে। লোকটা অতি পাষণ্ড, তাহার প্রভুর দ্রব্য অপহরণ করিয়া সে ষৎপরোনাস্তি অকৃতজ্ঞের শ্রায় ব্যবহার করিয়াছে। এখেল, এই ব্যক্তি সশব্দে আর কোন কথা যেন তোমার কাছে কখনও না শুনি।”

“খুল্লতাত!” যুবতীর কম্পিত অধর হইতে কাতরে এই সঙ্ঘোষনটি বাহির হইল, বিস্ফারিত চক্ষু দুইটি দিয়া বক্ষের বেদনা গলিয়া ঝরিতে লাগিল। “খুল্লতাত, আপনি—আপনি অতি নির্দয়। অনাথিনীর কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করুন। আমার জীবনের সর্বস্ব উইল ভেয়ারের সহিত গ্রথিত এবং সেই উইল-ভেয়ারকে রক্ষা করিবার শক্তি আপনার হস্তে!”

“কি ছেলে মানুষের মত বকিতেছ! তাহার অদৃষ্ট যে জুরির হস্তে নির্ভর করিতেছে তা কি তুমি জান না?”

“কিন্তু তাহার শাস্তি বিধানের শক্তি আপনার হস্তে। আপনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে সামান্য শাস্তি দান করিতে সহজেই সক্ষম। এইটি আপনাকে করিতেই হইবে।

“চুপ!” ঘরে দুইবার আঘাত হইল,—বিচারক তাহার অর্থ বুঝিলেন,—জুরি তাহাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে।

খর্ণ এথেলের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; তাহার রক্তহীন মুর্চ্চিত প্রায় দেহলতা কপাটের উপর হেলিয়া পড়িয়াছে—বাত্যাবিচ্ছিন্ন শতদলের ত্রায় তাহার মুখখানি মলিন ও শুষ্ক! আজ কয় সপ্তাহ অসুস্থতা বশতঃ সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় নাই,—আজ তাহার প্রিয়তমের বিপন্ন অবস্থার সংবাদ পাইয়া তাহার দেহের সকল দুর্বলতা দূর হইয়া গিয়াছে, এবং এই শেষ সময়ে সে বিচারালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে!

বিচারক বিচারগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি মনে মনে কর্তব্যস্থর করিয়াছেন।

আজ তিনি এথেলের প্রতি নির্দয় ভাবে দয়া প্রকাশ করিবেন স্থির করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকালের জ্ঞাত এই নির্যোধ প্রেম-পীড়িতা বালিকা ও তাহার অপদার্থ প্রেমাস্পদের মধ্যে অন্তরায় স্বরূপ কারাপ্রাচীর উত্তোলিত করিবেন স্থির করিয়াছেন। তিনি সময়ের শক্তির পরিচয় জানিতেন এবং এথেল চিরদিনই নম্র ও বাধ্য স্বভাব!

আজ যে ব্যক্তিকে তিনি কর্তব্যের অমুরোধ কারাদণ্ডিত করিতেছেন একদিন এথেল তাহাকে বিস্মৃত হইবে। এই সর্বনাশ হইতে রক্ষা করিবার জ্ঞাত একদিন এথেলই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দান করিবে! ইহাই সংসারের চিরদিনের যুক্তি!

জুরির অগ্রগণ্যকে যখন তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইল তখন বিচার গৃহের চতুর্দিকে সকলেই ‘নির্বাত নিষ্কম্প’ প্রদীপের ত্রায় রুদ্ধশ্বাসে নিশ্চল নিস্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল! উত্তর হইল—“অপরাধী!” বিচারক তাহা পূর্ব হইতেই জানিতেন।

তখন বিচারক খর্ণ অপরাধীকে সঙ্ঘোষন করিয়া গভীর গম্ভীর স্বরে তাহার অপরাধের বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিলেন—

“সাত বৎসর কঠোর কারাবাস।”

শেষ কথা কয়টি উচ্চারণ করিবামাত্র বিচারক ও অপরাধীর চারি চক্ষু মিলিত হইল—অপরাধীর দৃষ্টি বৈরাগ্যবেদনায় কাতর, বিচারকের দৃষ্টি একটা আকস্মিক বিধার আবেগে প্রশময়—আর সে কঠোর তীব্রতা নাই!

সেই ছায়া মূর্তির, সেই অদৃশ্য আত্মার উপস্থিতির অমুভূতি আসিয়া আবার তাঁহাকে

আকুল করিয়া তুলিল ;—বহুদিনের পরিচিত একটা কণ্ঠস্বরের রুদ্ধ কাতর ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কণ্ঠকুহরে থাকিয়া থাকিয়া বাজিতে লাগিল ! ব্যাপারটা একটা মানসিক ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে—মুহূর্ত্ত মধ্যে মিলাইয়া গেল ! পর মুহূর্ত্তেই উইলভেরার বিচার ও শাস্তির গুরু অভিনয় সমাপ্ত হইয়া গেল !

(২)

কয়েক ঘণ্টা পরে বিচারক খণ্ড তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া আছেন,—গভীর চিন্তামগ্ন। সেদিন যে লোকটাকে শাস্তিদান করিয়াছেন সে যেন আজ তাঁহার বুকের ভিতর কি একটা ছুরপনের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে,—যেন কিসের একটা অস্পষ্ট স্মৃতি আসিয়া আজ তাঁহার মস্তিষ্ক দ্বারে অবিরামই আঘাত করিতেছে !

সহসা তিনি দ্বারের দিকে চাহিলেন,—প্রাণটা যেন শিহরিয়া উঠিল,—বাহিরে যেন একটা পদশব্দ শুনা গেল ! বাটার সকলেই নিদ্রিত—এত গভীর রাত্রে ওরূপে নড়িয়া বেড়ায় কে ?

নীরব প্রশ্নের উত্তরে তৎক্ষণাৎ ধীরে ধীরে দ্বারটি উন্মুক্ত হইল এবং সম্মুখে এক দীর্ঘকায় ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহার কুটিল মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই খণ্ড তাহাকে চিনিলেন এবং তাঁহার কণ্ঠ হইতে তৎক্ষণাৎ একটা বিস্ময়ের রুদ্ধ ধ্বনি বাহির হইয়া পড়িল !

খণ্ড আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন,—তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ ! মুহূর্ত্তকাল উভয়ে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

“আমি ভাবিয়া ছিলাম প্রচলিত প্রথায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে,

আপনি হয়ত আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন, সেই জন্ত সন্ধ্যার সময়ে যখন দ্বার খোলা ছিল, সেই অবসরে বাটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া এতক্ষণ লুকাইয়া ছিলাম।” আগন্তকের কণ্ঠস্বর অতি কর্কশ ও মৃদু, অথচ ঈষৎ জয়দর্প মিশ্রিত।

বিচারক ঈষৎ কম্পিতস্বরে বলিলেন—
“এত বক্রপথ অবলম্বন করিবার কোনও আবশ্যক ছিল না। আমি সাক্ষাৎ করিতাম। অস্বীকার করিব কেন ?

আগন্তক একটা কর্কশ অটুহাস্য করিয়া উঠিল।

“আমি সেই অতীতে প্রতিহিংসা গ্রহণের যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা হয় ত’ তোমার আজিও স্মরণ আছে এবং হয়ত তুমি সেই জন্ত ভীত—আমি ইহাই মনে করিয়া ছিলাম।”

বিচারক মস্তক উত্তোলিত করিলেন। এই ব্যক্তির আকস্মিক উপস্থিতিতে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্ত তিনি যেরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে আর সে ভাব নাই,—মুখে সেই স্বাভাবিক কাঠিন্য ও দৃঢ়তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

“আমি কাপুরুষ নহি।” বিচারকের স্বর অতি শান্ত।

“না, তুমি কাপুরুষ নও, তুমি কেবল আমার জীবনের সর্বস্ব অপহারক ভঙ্করমাত্র ! আমি যে নারীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতাম,—যে ভালবাসা জগতের পক্ষে দুর্লভ, যে ভালবাসার ধারণা স্বপ্নেও তোমার পক্ষে অসম্ভব,—তুমি সেই নারীকে অপহরণ করিয়াছিলে।

সে আমার আরাধ্যা দেবী ছিল ; সে আমার এই তমসচ্ছন্ন ঝঞ্ঝাবিস্মৃক ভবসমুদ্রের মধ্যে

ধ্রুবতারকা ছিল; যদি সে তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিত, যদি সে আমার পত্নী হইত, আজ সে আমার জীবনকে পাপমুক্ত পবিত্র করিতে পারিত।” আগন্তুক অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল, তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল,— প্রবল চেষ্টায় আত্মসংযত হইয়া বলিল—“তুমি তাহাকে অপহরণ করিয়া আমার অন্তরা-আঁকে দলিত করিয়াছ,—আজ আমাকে আমার এই বর্তমান শোচনীয় অবস্থায় উপনীত করিয়াছ,—আমাকে অন্তঃসারশূণ্য করিয়াছ,—প্রতিহিংসা ভিন্ন আজ এ অন্তরের সকল বৃত্তিরই বিনাশ করিয়াছ!”

বিচারক মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন—“এত-কাল পরে আর প্রতিহিংসার কথা উত্থাপিত করা বৃথা।” লোকটিকে দেখিয়া বিচারকের পক্ষে অবিচলিত থাকা অসম্ভব, কারণ এক-কালে তাঁহার উভয়ে বাল্যবন্ধু ছিলেন।

তিনি সত্যই তাহার অন্তরে একদিন ব্যথা দিয়াছেন, তাঁহার শ্রায় শ্রায়পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে আজ তাহা অস্বীকার করা অসম্ভব।

“সে সকল অতীত কথা আর স্মরণ কর কেন? এতকাল পরে আমাদের উভয়েরই কি তাহা বিস্মৃত হওয়া কর্তব্য নহে? দেখ যে নারীকে আমরা উভয়েই ভালবাসিতাম সে আজ সমাধিশয্যায় শায়িতা, চিরনিদ্রায় অভিভূতা। হৃদনের জন্ম যে সুখভোগ করিয়াছিলাম, তাহার জন্ম তোমার এক্ষণে হিংসা ত্যাগ করাই কর্তব্য।”

“তাহার সহিত কি তোমার পুত্রও শায়িত?”

বিচারক গম্ভীরস্বরে বলিলেন—“হাঁ,

মৃত্যু আসিয়া পুষ্প ও কোরক উভয়কেই ছিন্ন করিয়া লইয়াছে।”

আগন্তুক একটা কর্কশ বিজ্রপের হাসি হাসিল, বিচারক বিস্মিত হইলেন।

“শুন।” লোকটা একটা কম্পিত হস্ত তুলিল,—তাহার সর্বশরীর কাঁপিতেছিল, কিন্তু কণ্ঠস্বর স্থির ও দৃঢ়। “শুন, হিসাব নিকাশের,—তোমার আমার মধ্যে হিসাব নিকাশের দিন এতদিনে উপস্থিত হইয়াছে। তুমি মনে করিয়াছিলে ভূমিকম্পে তাহার জননী সহিত তোমাব পুত্রও পরলোক গমন করিয়াছে? তোমার সে ধারণা ভ্রান্ত। আমি তখন সেই নগরে উপস্থিত ছিলাম। আমি নিজে রক্ষা পাইয়াছিলাম এবং তোমার অসহায় পুত্রকে—রক্ষা করিয়াছিলাম। সে মরে নাই, আজও জীবিত।”

বিচারক চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন তাঁহার দৃষ্টি স্থির, শূণ্য ও বিস্ময় পূর্ণ।

“আমার পুত্র—আমার সেই পুত্র!” রুদ্ধ-কণ্ঠে এই কথা কয়টি উচ্চারিত হইল। তখন তাঁহার মুখে এক নবালোক আসিয়া উপস্থিত হইল। একটা অতীতপূর্ব ভাবের স্রোত আসিয়া তাঁহাকে ডুবাইয়া দিল। অতীত সমস্ত ঘটনাগুলি যেন তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে রক্ত কুহেলিকার মধ্যে ভাসিতে লাগিল। অবিলম্বে তাঁহার একটা অস্পষ্ট অনুভূতি হইতে লাগিল যেন তিনি তাঁহার অতীত বন্ধুকে বজ্র-মুষ্টিতে ধরিয়া সবলে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—“আজ বিশ বৎসর তুমি আমাকে আমার পুত্র হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ। কোথায় সে, আমার পুত্র কোথায়?” কথা কয়টি দণ্ডের মধ্য দিয়া কষ্টে

বাহির হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ চৈতন্য হইল এবং পরক্ষণেই রুদ্ধশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুচ্ছিতের স্থায় বিচারক ভূমিতলে পড়িলেন।

অপর ব্যক্তি উল্লাসমিশ্রিত বিজ্ঞপের তীক্ষ্ণস্বরে বলিল—

“এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করানই আমার উদ্দেশ্য। তুমি নিতান্ত নির্বোধ বলিয়াই আজও এ সত্য বুঝিতে পার নাই। যে বালককে আজ কারাগারে প্রেরণ করিয়াছি, সেই উইল ভেয়ারই তোমার পুত্র। আজ সে সমাজে লাঞ্চিত ঘণ্য তস্কর মাত্র,—যে দিন হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছি সেই দিন হইতেই আমি তাহাকে এইরূপ শিক্ষাই দিয়াছিলাম। তুমি কি মনে কর আমি দয়া বা স্নেহের বশবর্তী হইয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম? না, তাহা নহে। প্রকৃতির চতুর্দিকের প্রলয় নৃত্যের মধ্যে আমার অন্তরে প্রতিহিংসা বহি জ্বলিতেছিল। সুবিচারক শ্রায়পরায়ণ পিতা তাহার নিজের পুত্রকে আজ কারাগারে প্রেরণ করিয়াছে!”

“যথেষ্ট হইয়াছে!” বিচারক ধীরে ধীরে দাঁড়াইয়া উঠিলেন,—তাঁহার মুখ মৃতের স্থায় রক্তহীন, নিশ্চল। “তোমার এ কথা মিথ্যা!”

আগন্তুক হাসিল। “তাঁহার মুখে কি সেই সাদৃশ্য দেখিতে পাও নাই? সেই চক্ষু সেই দৃষ্টি, সেই কণ্ঠস্বর!”

“যাও!” বিচারক দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন। “হাঁ, আমি এখনই যাইতেছি। আর আমার অপেক্ষা করিবার কোনও কারণ নাই।

আমার আগমনের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে,— আজ আমার প্রতিহিংসা সম্পূর্ণ!”

লোকটা যখন চলিয়া গেল বিচারক প্রস্তর মূর্তির স্থায় অবিচলিত দৃষ্টিতে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। দ্বার পুনরায় বন্ধ হইবামাত্র বালুকা প্রতিমার স্থায় শতধা হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

তাঁহার সেই পত্নীর সন্তান,—তাঁহার পুত্র—আজ তস্কর, কারাদণ্ডিত!

ক্ষোভে, অনুতাপে, ঘৃণায় তাঁহার হৃদয় শতধা হইতে লাগিল—দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া বালকের স্থায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মধ্যে মধ্যে অশ্রুটস্বরে জগৎপতির নিকট দয়া ভিক্ষা ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সে কালরাত্রি অতিবাহিত হইয়া প্রভাতের অরুণ রশ্মি আসিয়া পাঠাগারে দ্বারদেশে আঘাত করিল। বিচারক সেই গৃহ-মধ্যেই বদ্ধ রহিলেন।

সুপ্তোখিত পৃথিবী পুনরায় কলগানে ভরিয়া উঠিল। সহসা দ্বারদেশে একজন আসিয়া বলিয়া উঠিল—“বিশেষ সুসংবাদ আছে, দ্বার খুলুন।”

কণ্ঠস্বর এথেলের।

তিনি দ্বার খুলিবামাত্র এথেল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। খুল্লতাতে গুরু, শীর্ণ ভীষণ মূর্তি দেখিয়া সে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

“খুল্লতাত, সেদিন আমি আপনাকে যে কথা বলিয়াছিলাম তাহা আজ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমার প্রিয়তমের নির্দোষিতা প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে; এখনই তিনি মুক্তিলাভ করিবেন। শ্রাথেলের এক পুরাতন ভৃত্য

স্বীকার করিয়াছে যে সেই অলঙ্কারগুলি তাহার প্রভুর নিকট হইতে অপহরণ করিয়া উইল-ভেয়ারের পোর্টমাণ্টোর মধ্যে রাখিয়াছিল।”

বিচারক হতবুদ্ধির স্তায় এখেলের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন ।

শ্রীমুরেজনাথ ভট্টাচার্য্য ।

বন্দী ।

৩৭

রাজার কথাটাই এখন কেবল আমার মনে পড়িতেছে ! আশ্চর্য্য ! এ চিন্তা মন হইতে যতই দূর করিবার চেষ্টা করি সকলই বৃথা হয় ! দুই কাণের পাশে যেন কে বলিতেছে, “রাজা ! এমন সময় এই সহরের মধ্যেই এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার একটি কক্ষে তিনি বসিয়া আছেন ! আমারই মত অসংখ্য প্রহরী তাঁর দ্বারে দাঁড়াইয়া !” তিনি প্রতিষ্ঠার উচ্চাসনে আর আমি কত নিম্নে—এই প্রভেদ ! তাঁর জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে—কি মহিমা, কি গরিমা, কি যশ, কি উল্লাস ! চারি দিকে প্রেম ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিৰ্কার ঝরিতেছে ! তাঁর সন্মুখে তীব্রস্বর মৃদু, গর্ভিত শির নত হয় ! তাঁর চক্ষুর সমক্ষে স্বর্ণরৌপ্য ঝলসিতেছে ! সভাসদ বেষ্টিত রাজাসনে বসিয়া তিনি আদেশ দিতেছেন ; সমস্ত্রমে সকলে সে আদেশ পালন করিতেছে ! কখনো মৃগয়া-বসন—কখনো নৃত্য-গীত—মুখের কথাটি বাহির হইলে হয়, অমনি অসংখ্য লোক বিলাসপ্রমোদের আয়োজনে শশব্যস্ত হইয়া উঠিবে ।

রাজা ! আমারি মত রক্তমাংসবিশিষ্ট মানুষ, এই রাজা ! তাঁর লেখনীর একটি

ইঙ্গিতে আমার ফাঁসিকাঠ সরিয়া যাইতে পারে ! জীবন, স্বাধীনতা, ঐশ্বর্য্য গৃহ—সকল সুখ নিমেষে আমার করায়ত্ত হইতে পারে ! আরো শুনিয়াছি, তাঁহার চিত্ত করুণায় ভরা ! তবু আমার প্রাণটা কেহ বাঁচাইবে না ? একটা মানুষের প্রাণ !

৩৮

তবে এস সাহস ! মৃত্যুর বিভীষিকা দূর করিয়া দাও ! কিসের আতঙ্ক, কিসের ভয় ? এস মৃত্যু—আমি তোমাকে হস্তমুখে আলিঙ্গন দিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছি ! এস তুমি, মিত্র হও, শত্রু হও, এস তুমি !

চক্ষু মুদিয়া দেখিব—উজ্জ্বল আলোকে চারিদিকে ভরিয়া গিয়াছে—আমার আত্মা সে কি আলোকের হৃদে স্নান করিতে চলিয়াছে । মাথার উপর অনন্ত আকাশ আলোকোজ্জ্বল, আর নক্ষত্রগুলা সেই শুভ্র আলোকের গায় যেন কতকগুলো কৃষ্ণচিহ্নমাত্র ! কালো মধমলের মত আকাশে এখন যেমন হীরার টুকরার মত সেগুলো ঝিক ঝিক করিতেছে—তখন আর সেগুলো এমনটি থাকিবে না ।

কিষ্কা হয়ত, হতভাগ্য আমি দেখিব কোথায় আলো, কোথায়ই বা বায়ু ! বায়ুও

আলোকহীন একটা গহ্বরের মধ্যে যেন নামিয়া পড়িয়াছি, আমার চারিধারে অসংখ্য দানব বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে!

হয়ত বা দেখিব সেই অক্ষুট অঙ্ককারে আমার শিরোহীন দেহটা পড়িয়া আছে—আর কব্দের চারিধারে ভূত প্রেতের উপদ্রব বাধিয়া গিয়াছে! যেন এক বিপুল ঝড়ের আঘাতে পৃথিবীর এক কোণের পর্দা সরিয়া গিয়াছে, আর অসংখ্য দানবের দল পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে! চারিধারে নর-কঙ্কালের পর্কত, তাহারি নিম্নে রক্তের নদী বহিয়া চলিয়াছে! মাথার উপর আকাশে আলো নাই—নক্ষত্রগুলো শুধু অগ্নিময় পাখীর মত উড়িয়া বেড়াইতেছে!

আমার পূর্বে ফাঁসিকাঠে ষাহারা প্রাণ দিয়াছে, তাহারি আমার জন্ত দল বাধিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে—তাদের মূর্তিগুলো যেন আমি চোখে দেখিতে পাইতেছি—সব রক্তহীন শীর্ণ দেহ, কোটরগত চক্ষু, শুকমুখ, কি ভীষণ! অস্পষ্ট আলো-আধারে দাঁড়াইয়া অতিমূছকণ্ঠে তাহারি কথা কহিতেছে—মুখে কাহারো এতটুকু হাসির রেখা নাই—কি এক আতঙ্ক—কি সে উদ্বেগ—তাদের অন্তরে বাহিরে একটা বিরাট দাগ পড়িয়া গিয়াছে। কোনদিকে আর কিছু দেখা যায় না—শুধু ভিলা হোটেলের ঐ নিশ্চয় ঘড়িটা—ফাঁসিকাঠে চড়িবার সময় সে তার রক্ত মূর্তি রক্ত চক্ষু লইয়া অচঞ্চল দৃষ্টিতে বিদায় দিয়াছিল! জগতে কোথাও কিছু নাই—এতটুকু সহানুভূতি, এতটুকু করুণা—কিছু না!

এমন নানা কথা মনের মধ্যে আনাগোনা করিতেছে! এক দণ্ড নিষ্কৃতি নাই!

হার—কি এ মৃত্যু? কে সে? আত্মাটার সহিত তার এত নিরোধ কেন? এক আঘাতে সে যখন দেহটাকে ধ্বংস করিয়া দেয়, তখন মনের এই অনুভূতি, এই প্রেম স্নেহ, দয়া মায়ী এমন সর্বব্যাপী যে চিন্তা—এসব সে কোথায় উড়াইয়া দেয়? পৃথিবী—কঠিন পৃথিবীর কি এতটুকু মায়ী—এমন শক্তি নাই যে এই মৃত্যুটাকেও জয় করিয়া স্বহস্তে সে তার গঠিত জীবনটাকে রক্ষা করে? ভগবান, এ কি বিচিত্র তোমার সৃষ্টিশীল! কি নিষ্ঠুর এ রহস্য! নিশ্চয়ম কোতুক!

৩৯

একটু নিদ্রার জন্ত কাতর হইয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

মাথার মধ্যে রক্তের স্রোত বহিয়া গেল। জীবনে ইহাই আমার শেষ নিদ্রা! স্বপ্ন দেখিলাম!

যেন নিস্তরু গভীর রাত্রি! আমার পাঠাগারে দুইটি বন্ধুর সহিত বসিয়াছিলাম। পার্শ্বের কক্ষে স্ত্রী নিদ্রিতা—কন্তা মেরি তাহারই বৃকের কাছে!

আমরা মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিলাম—কেহ যেন না ভয় পায়! সহসা একটা শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম! তখনি সন্ধানের জন্ত চলিলাম! নিশ্চয় চোর আসিয়াছে!

চারিধারে সন্ধান করিলাম! কেহ কোথা নাই—জনপ্রাণীর চিহ্নও না!

চিমনির পাশে কি 'ও? কে? দেখি, এক নারী—কেশগুচ্ছ রক্ত, মুক্ত, মুখের চারিধারে উড়িয়া পড়িয়াছে—মুখে একটা পক্ষভাব! সে চক্ষু মুদিয়াছিল! আমি কহিলাম, “কে তুই?”

সে সাড়া দিল না। আমরা কহিলাম,
“কে তুই, বল শীঘ্র!” তবু সে কথা কহিল
না, বা চোখ খুলিল না।

এক বন্ধু কহিল, “মুখের কাছে আলোটা
ধর—এখনি চিট্ হবে!”

তার মুখের কাছে আমি বাতি ধরিলাম!
তবু তার মুখে কথা নাই! আমি কহিলাম,
“কথা বল না মাগী!” তবু সে অচঞ্চল
রহিল! আমরা অস্থির হইয়া উঠিলাম! এ
কি আপদ আসিয়া জুটিল!

বন্ধু কহিল, “ধর আলো—মুখে!”

আমি তার চিব্বকের নিচে বাতি ধরিলাম।
সে চোখ খুলিয়া চাহিল! কি ভীষণ তার
সে দৃষ্টি! আমি চক্ষু মুদিলাম। সহসা হাতে

একটা দংশনজ্বালা বোধ করিলাম! উঃ!
চোখ খুলিয়া দেখি, আমার শয্যার সম্মুখে
আচার্য্য দাঁড়াইয়া আছেন!

আমি কহিলাম, “আমি কি অনেকক্ষণ
ঘুমিয়ে ছিলাম?”

তিনি কহিলেন, “হাঁ! এক ঘণ্টা ঘুমাচ্ছ!
তোমার কণ্ঠকে এনেছি, মেরি—দেখিবে
না? তোমাকে জাগাতে না পেরে আমাকে
ডেকেছে—তোমার কন্যা মেরি—”

আমি চীৎকার কবিয়া উঠিলাম, “মেরি!
আমাব কন্যা মেরি—কই সে? কোথা
বলুন! আনুন—আমার বৃকে তুলে দিন
তাকে!” (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

তৈমুর লঙ্গ

হুসেনের এই পরাজয় হইতেই তৈমুর বুঝিলেন যে,
তিনি যে অখারোহী সৈন্য প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার
সাহায্যে সমগ্র আসিয়া মহাদেশ তিনি পদানত করিতে
সমর্থ। তাঁহার প্রজা মেঘপালকেরা তাহাদের অখ-
শালা হইতে শ্রেষ্ঠ অখগুলিকে লইয়া রণবিদ্যায়
শিক্ষিত করিয়াছে এবং শিশুকাল হইতেই তাহা-
দিগকে সৈন্যদলের সহিত চালিত হইতে অভ্যস্ত
করিয়াছে। এই সকল মেঘপালকের অখারোহণ
নিপুণতা এবং অখচিকিৎসাব্যুৎপত্তি পরে তাঁহার
দেশজয় ব্যাপারে বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল।

হুসেনের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তৈমুর
অবাধে সমরখন্দে প্রবেশ করিলেন। এই নগরই
হুসেনের বৃহৎ রাজ্যের রাজধানী ছিল। নগরপ্রান্তে
তৈমুর উপস্থিত হইবা মাত্র বিনা আপত্তিতে তাহার
তোরণ দ্বার মুক্ত হইল এবং প্রজাবৃন্দ অক্ষুণ্ণভাবে
মোগল রাজকুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল।

ইতিপূর্বে তৈমুরের পিতৃপুরুষগণই এই সিংহাসনের
অধিকারী ছিলেন। এই নগরকেই তৈমুর তাঁহার
বিজিত বিপুল সাম্রাজ্যের রাজধানী করিয়াছিলেন।
তাঁহার অসাধারণ শক্তির বলে সমরখন্দ সমগ্র আসিয়ার
ধনসম্পদের ভাণ্ডারভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুস্থান
পারস্ত, সিরিয়া এবং মিশর দেশ জয় লুণ্ঠন করিয়া
তিনি যে বিপুল মণিকাঞ্চন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই
সমরখন্দেই তাহা সঞ্চিত হইয়াছিল।

সমরখন্দের অধিকার হইতেই তৈমুরের রাজত্ব
আরম্ভ হইল বলিতে পারা যায়। মুসলমান ইতিহাস
অনুসারে হিজরা ৭৭১ সালে বা ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে তৈমুর
এই নগর অধিকার করেন। তৈমুরের বয়স তখন
৩৫ বৎসর। বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্দারের জীবনের
সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, যে বয়সে তাঁহার
বিচিত্র জীবনের যবনিকা পতন হইয়াছিল, তৈমুর
সেই বয়সে তাঁহার জীবন আরম্ভ করিতেছেন মাত্র।

কিন্তু একরূপ ভাবে এই উভয় বীরের তুলনা করা সম্ভবত নহে। আলেকজান্ডার রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়াই জয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৈমুরকে নিজের অতুল চেষ্টায় সিংহাসন গড়িয়া লইতে হইয়াছিল। একজন সুশিক্ষিত অগণ্য সৈন্য বিনাচেষ্টায় লাভ করিয়াছিলেন, অপর জন অশিক্ষিত মেঘপালকদের লইয়া এক দুর্ভয় সৈন্য গঠিত করিয়াছিলেন। আলেকজান্ডারের শ্রায় তৈমুরের আরিস্টটলের (Aristotle) মত গুরু ছিল না সত্য, কিন্তু তৎসঙ্গেও চরিত্রগুণে তিনি আলেকজান্ডারের তুল্যই ছিলেন। উপরন্তু তাঁহার অপেক্ষা অনেক বিষয়ে নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন। তৈমুর যিতাচারী, পবিত্র চরিত্র, সংযমী এবং স্বধর্ম্মে নির্ভাবান ছিলেন। অনেকে তাঁতাকে নৃশংসতার অপরাধে অপরাধী করে সত্য, কিন্তু বিদেশবিজয়ী বীরের পক্ষে তাঁহার চরিত্র যে বিশেষভাবে নৃশংস ছিল এমন কথা কোনমতেই বলা যায় না।

নূতন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তৈমুর সাম্রাজ্য বৃদ্ধির সংকল্প করিয়া সমরখন্দের চতুর্দিকস্থ অধিবাসীদিগকে বশীভূত করিতে অগ্রসর হইলেন। আসিয়ার উত্তর দেশ হইতে মধ্য মধ্য যে সকল বীরের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহারা প্রায় সকলেই অনুচর বর্গ লইয়া তুমারধণ্ডিত স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ খণ্ডের ধনধান্যপূর্ণ প্রদেশে বসতি করিয়াছেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষের দিকেই সর্বপ্রথমে এই পান্দত্য-জাতির স্রোত প্রবল বস্তার শ্রায় আসিয়া পড়িল। সিন্ধু নদের তীরে আসিয়া তৈমুর দেখিলেন যে সে প্রদেশের অধিবাসীদের ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁহাদিগের হইতে বিভিন্ন। সে সময়ে তাতারগণ সাধারণতঃ সকলেই মুসলমান ছিল। তিনি নিজে তাঁহাদের পারিবারিক প্রথা অনুসারে চেঙ্গিস্ খাঁর ধর্ম্ম অনুসরণ করিতেন। এই ধর্ম্ম অর্থে এক অনাদি অনন্ত, সর্বশক্তিমান অদৃশ্য বিধাতার বিশ্বাস,—তিনিই সর্বময়, সর্বস্থ, অভেদ অখণ্ড। তৈমুর এই অদ্বৈতবাদে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া কোরাণের বচনকে ঘৃণা করিতেন এবং পৌত্তলিক ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই তিনি বিদ্বেষী ছিলেন। শুনা যায় যীশুখ্রীষ্টের ধর্ম্মের প্রতি

তাঁহার অনাস্থা ছিল না। তাঁহার পত্নী নাকি খ্রীষ্টাবলম্বন করিয়াছিলেন এবং সম্মানদিগকে এই ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। যাহা হউক সাম্রাজ্য বিস্তারের উচ্চাকাঙ্ক্ষার ও পৌত্তলিকতাকে উচ্ছিন্ন করিবার প্রবল আগ্রহে প্রণোদিত হইয়া তৈমুর ভারতের হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন কাবুলই ভারতের উত্তরসীমান্তে প্রধান নগর ছিল। এই নগরের নাম হইতেই সন্নিকটস্থ প্রদেশের নাম কাবুলস্থান হইয়াছিল। তৈমুরের বিজয়ী সেনার সহিত প্রথম যুদ্ধের যে ভীষণ সংঘর্ষ তাহা এই প্রদেশের রাজাকেই সহ্য করিতে হইয়াছিল। তৈমুরই জয়ী হইলেন এবং সমগ্র কাবুলস্থান লুণ্ঠিত, পীড়িত হইয়া তাতারর বশতা স্বীকার করিল। এ যাত্রায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশ রক্ষা পাইল। সহসা এই জয়োন্মত্ত সৈন্তের বন্যা যাইয়া পারস্তের উপরে পড়িল। তৈমুরের এ গতি পরিবর্তনের কারণ কি তাহা কিছুই জানা যায় না, কিন্তু তিনি যে সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ না হইয়াই পশ্চিমে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তাঁহার পারস্ত ও সিরিয়া জয়ের কাহিনী অনেক লেখক লিখিয়াছেন। হেরাট (Herat) জয় ও ধ্বংস করিয়া তিনি খোরাসানের অধিপতি হন। নিকাবোর দুর্গ অধিকৃত হওয়ার পরে জার্জিঙ্গা রাজা তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। কিন্তু পারস্ত দেশ জয় করিতে তৈমুরকে অধিক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। সমগ্র পারস্ত দেশ জয় করিতে দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। অবশেষে শিরাজদুর্গে তৈমুরের বিজয় পতাকা উডডীন হইল দেখিয়া পারস্তবাসীরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল, তখন ভূজবলে ও সদাশয় নীতির ফলে তৈমুর সমগ্র দেশ করায়ত্ত করিলেন। পারস্ত হইতে তৈমুর দুর্ভয় বাহিনী লইয়া আসিয়ার উত্তরতম প্রদেশ অধিকারে অগ্রসর হইলেন। সে প্রদেশে এক মাস দশ দিন ধরিয়া অন্তহীন সূর্য অংশুবিকিরণ করে। সুতরাং সৈন্তের সহযাত্রী ইমানেরা অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেষ্টারা সৈনিকগণকে সান্ধ্য উপাসনা হইতে অব্যাহতি দিলেন।

এই বিজয় যাত্রায় তৈমুর উভয় তাতার প্রদেশ অধিকার করিলেন। কিন্তু পারস্তে সৈন্তের মধ্যে অসন্তোষ জন্মিয়াছে সংবাদ পাইয়া তিনি অবিলম্বে তথায় ফিরিয়া আসিলেন। বাগদাদ রাজ্য তখনও প্রাচীন ব্যাবিলনের স্থায় সমৃদ্ধিশালী ছিল। চেঙ্গিস খাঁর বংশধর এক মোগল, সুলতান বেন্ এভিস্ এই প্রদেশ অধিকার করিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। তৈমুর এই প্রদেশ আক্রমণ করিয়া সুলতানকে বাগদাদ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। বেন্ এভিস্ এখান লইয়া মিশরের সুলতানের আশ্রয় লইলেন।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ তাহার বিশৃঙ্খল সীমান্তে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত করিয়া দুর্দান্ত দস্যর ভাবী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করিতেছিল। কাবুল রাজ্যে দাসত্ব বন্ধন দেখিয়া সিদ্ধুদের পর-পারবর্তী রাজারা সকলেই আত্মরক্ষার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এই সকল রাজারা বিজয়ী তৈমুরের গতিরোধের জন্য বিপুল আয়োজন করিয়া অপেক্ষা করিতে ছিলেন। তাঁহাদের এ ভয় যে ভিত্তিহীন নহে এবং আয়োজন যে নিফল হয় নাই, তাহা অবিলম্বেই প্রকাশ পাইল। কাবুলে বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া সিরিয়া হইতে তাতার সৈন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। কাবুল বশীভূত করিয়াই তৈমুর এবারে সদলবলে হিন্দু-স্থানের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভারতজয়ের এ দ্বিতীয় সুযোগ ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইল।

মুসলমান কাহিনীর মতে হিজরা ৮০০ সালে বা ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে তৈমুর দ্বিতীয় বার ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন তাঁহার ৬৪ বৎসর বয়স। এই সময়েই ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য-স্থাপনের যথার্থ সূচনা হয়।

কাবুল ধ্বংস করিয়া তৈমুর নিশ্চিন্ত চিত্তে হিন্দু-স্থানের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেন। সিদ্ধুদ ও গজাতীরের মধ্যবর্তী সমগ্র প্রদেশই তৈমুরের অধিকারভুক্ত হইল। কিন্তু এই ভুবনবিজয়ী বীর ভারতে আসিয়া যে বীরত্ব, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়

দেখিয়াছিলেন, আসিয়ার অল্প কোনও দেশেই এরূপ দেখেন নাই। আলেকজান্ডারের বিজয়গতি রুদ্ধ করিয়া পুরুবিক্রম যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, ঠিক সেই স্থানে আসিয়াবিজয়ী মোগল বীরের গতিরোধ করিয়া এক নূতন পুরুবিক্রম দণ্ডায়মান হইলেন। উভয়ে যে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিল, তাহা রাজপুতের ইতিহাসে দুঃস্বাপ্য না হইলেও আসিয়ার ইতিহাসে বিরল বলিলেও চলে। ভারতের বীরবৃন্দের শিরোরত্ন চিতোরের রাণা তৈমুরের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন। যুদ্ধের পূর্বে তৈমুর লক্ষ তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া রুচ বাক্যে এক পত্র লিখিলেন। এইরূপ কোশল অবলম্বন করিয়া তিনি পূর্বে অনেক দুর্গ ও প্রদেশ বিনা রক্তপাতে আধিকার করিয়াছেন। তিনি রাণাকে লিখিলেন যে তিনি অবিলম্বে তাঁহার বশ্বতা স্বীকার না করিলে তিনি কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইবেন। যৌবনতেজে উদ্ব্রান্ত রাণা তৈমুরের পত্র পাইয়া অবজ্ঞাভরে উত্তর না দিয়া, প্রবল বাহিনী লইয়া মোগল আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। তৈমুরের অপেক্ষা রাণার সৈন্ত সংখ্যা অনেক অধিক এবং অজেয় রাজপুত বীরে গঠিত। মনে হইল যেন সমগ্র হিন্দুস্থান তৈমুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে। রাণার সহিত রণক্ষেত্রে অন্যান্য এক লক্ষ অশ্বারোহী ছিল। তৈমুরের সহিত ষাটশ সহস্র মাত্র অশ্বারোহী ছিল। কিন্তু তাহাদের সকলেই রণক্ষেত্রে অভিজ্ঞ এবং তাহাদের অধিনায়কের প্রতি প্রবল বিশ্বাসে এবং বহুদিনের অক্ষুণ্ণ জয়োল্লাসে তাহারা অদৃষ্টতেজে দশগুণ অধিক রাজপুত বীরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। উভয় সেনা সম্মুখীন হইবা মাত্র তাতার সেনানায়কেরা শক্রসংখ্যার ভীত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শনের কল্পনা করিতে লাগিলেন। তাহারা পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল—“এরূপে কতদিন আমরা এই কাণ্ডজানহীন খঞ্জের আত্মাবর্তী হইয়া চলিব ? উঁহার একটি পা ত গিয়াছে, তাহার উপর গতযুদ্ধে আবার একটি হাতও গিয়াছে। নিজের স্থায় আমাদিগকে অসহীন পীড়িত করিয়াও কি উঁহার তৃপ্তি হইবে না ? উনি কি ইচ্ছা করেন

যে এই বিপরীত জল বায়ুর মধ্যে আমরা প্রাণ হারাঁইব। কেন না এখানে হিন্দুদের বিবাস্তুর হইতে রক্ষা পাইলেও এখানকার দুঃসহ উত্তাপ অসহ।” সমগ্র সৈন্তের মধ্যে এই ভাবের আলোচনা হইতে লাগিল এবং তাহার সকলে রাণার শক্তি ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া হিন্দুস্থান ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইল। এদিকে যখন এই সকল গোলমাল চলিতে ছিল সে সময়ে তৈমুর লঙ্গ নির্ভরে, তাঁহার সৈন্তের সাহস ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া, শত্রুর অগণ্য সৈন্তের মধ্যে নিশ্চিন্ত চিত্তে আপন শিবিরে নিত্রা যাইতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার নিকটে সংবাদ আসিল যে তাঁহার সৈনিকেরা হিন্দুস্থান জয়ের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিবার সংকল্প বহিতেছে। এরূপ অসন্তোষ নিবারণে অনভিজ্ঞ বলিয়াই হউক বা যুদ্ধে জয়াশা অতি ক্রীণ বলিয়াই হউক, তৈমুরও সৈন্ত লইয়া প্রত্যাবর্তন করাই স্থির করিলেন। শিবির সকল উত্তোলিত হইল এবং রসদ অস্ত্র শস্তাদিও শকটে কবিরী স্থানান্তরিত করিতে আরম্ভ করিল। এরূপ সময়ে এক অখচালক আসিয়া তৈমুরের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিল—“ধর্ম্মাবতার,

এতদিন আপনাকে শত্রু রাজের নিকটে জয়ী হইতেই দেখিয়াছি। পারস্ত ও সিরিয়া পর্যন্ত আপনার পদানত হইয়াছে। আপনার জন্মভূমি জয় করিয়া, আপনি জগতের অবশিষ্ট অংশ আপনার অধিকার বিস্তৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এতকাল আপনার তাতার সৈন্ত আপনাকে অধিনায়ক পাইয়া শত্রু সম্মুখে নির্ভীক চিত্তে অগ্রসর হইত, আজ আপনি স্বয়ং সৈন্তগণের ভয়কাতরতার সমর্থন করিতেছেন। যান, অশিক্ষিত, অগ্রহীন, বিণ্ড্বল হিন্দুসৈন্তের সম্মুখে হইতে পলায়ন করুন! হয়ত' আপনি জীবন লইয়া পলায়ন করিতে পারেন সত্য, কিন্তু ভাবী বিজয় গোরবের আশা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইল।’ একজন হীনতম সৈনিকের মুখে এইবার ধিকারপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া, সকলের অস্তরে ঈশ্বরের প্রেরণার স্মরণ প্রভূত বল আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং যেন পরস্পরের দৃষ্টি হইতে সাহস সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। হয়ত' তৈমুর স্বয়ং এই অখচালককে এইরূপ অভিনয় করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং এক্ষণে এই সুযোগে সৈনিকগণের হৃদয়ে লুপ্ত সাহসের পুনঃ সঞ্চারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

পৌষ্যপুত্র।

৩৫

চন্দননগর ষ্টেশনে নামিয়া একখানা ভাড়াটে গাড়ির সাহায্যে দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া হেমেন্দ্র ও শাস্তিকে যোগেশ তাহার শ্রালীগৃহে আনিয়া উপস্থিত করিল। জনবিরল একটি গলির ভিতর কলমিদল, পদ্ম, ও পানাতরা পুষ্করিণীর পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটেগাঁথা ছোট একখানা পুরাতন বাড়ী। তাহার দেওয়াল আগাছায় ভর্ষি হইয়া গিয়াছে ও দরজায় তালা লাগান। যোগেশ

বলিল, ‘তালাটা ভাঙ্গিয়া ফেলা যাক, হেমেন্দ্র আপত্তি করিল,—“না না তালা ভেঙ্গে পরের বাড়ী ঢোকে না। আর তাছাড়া যোগেশ, এই পচা পুথুরের ধারে এই নোংরা জায়গায় একদিন থাকলে আমি প্লেগে মারা পড়বো। বাড়িওতো একতালা আর সঁৎসেতে বলেই মনে হচ্ছে;—এখানে কি কস্তে আনলে!” যোগেশ মুখ টিপিয়া একটু হাসিল “ই্যা বাড়ীটা তেমন ভাল নয় বটে, তা ছুদিন এইখানেই

কষ্ট করে থাকলে হতো না? টাকাকড়ি তেমন কিছুতো আমাদের সঙ্গে নেই, এই দেখনা—মোট সতের টাকা পাঁচ আনা তিন পয়সা আর বাকি আছে—” এই বলিয়া সে হেমেন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত মনিব্যাগ খুলিয়া তাহাকে দেখাইল। আকস্মিক একটা লজ্জার আঘাতে হেম আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে লজ্জার আবরণ আর টানিয়া রাখিতে পারিতেছিল না; জীর্ণ কস্থার মত তাহার একদিকে টানিতে গেলে অপর দিকের নগ্নতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া লজ্জা বন্ধিত করিতেছিল মাত্র। আহতগর্ভ হেমেন্দ্র মস্তনিকরক বীর্ষাহীন সর্পের মত মনের মধ্যে গুমরিতে লাগিল। জীবনে যে বিনা সংগ্রামে পূর্ণজয়ী হইয়া নিজেকে কমলাসনার বরপুত্র বলিয়া চিনিয়াছিল এখন তাহার সেই প্রচণ্ড অহঙ্কারে এমনি করিয়া আঘাত দান,—একি বিধাতার বিড়ম্বনা!

তালি ভাঙ্গিয়াই বাড়িতে প্রবেশ করা হইল। যোগেশ শান্তিকে পাশেব একটা ঘর দেখাইয়া দিয়া কহিল “আপনি ওই ঘরে গিয়ে খাটের উপর একটু শুয়ে নিন, বড্ডই ক্লান্ত হয়েছেন, আমি এখন সব জোগাড় করে ফেলুম বলে।” শান্তি নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মানব-বর্জিত গৃহ ধূলা ও বুলে ভরিয়া গিয়াছে, ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে কৃষ্ণকলি ও ডেঙ্গোশাকের সঙ্গে বিস্তর বুনোগাছ জন্মিয়াছে, একপাশে তুলসীহীনমঞ্চ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, যোগেশ সামনের ঘরের শিকল খুলিবামাত্র দুইটা চামচিকে পাখী ভাঙ্গা জানলা দিয়া উড়িয়া গেল। ঘরের ঠিক সামনেই খানিকটা স্থান পাখীর পালকাদিতে

অপরিষ্কৃত থাকিয়া গৃহস্থামীর পক্ষি প্রিয়তার সাক্ষ্য দিতেছিল। ঘরের মধ্যে একখানি তক্তাপোষ ও বড় একটা কাঠের সিন্দুকমাত্র পড়িয়া আছে। একটা কুলুঙ্গীতে দু'একটা মুণ্ডভাঙ্গা মাটির পুতুল ও ঘরের মেঝেয় খানকতক ছেঁড়া কাগজ, ভাঙ্গা হাঁড়ি ও আবর্জনার রাশি। হেমেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়াই দুইপদ পিছাইয়া আসিল, ঘরের ভারাক্রান্ত বন্ধ বায়ু মুহূর্তেই তাহাকে হাঁফাইয়া তুলিয়াছিল। যোগেশ জানালাগুলা খুলিয়া দিয়া কোঁচার কাপড়ে তক্তাপোষের ধূলা বাড়িয়া একটা অংশকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া স্তম্ভিত হেমেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিল, “আম্বন ছোটবাবু আপনি এইখানে বসে বিশ্রাম করুন আমি একটা লোক ও কিছু খাবার চেষ্টায় যাই।” হেম চৌকাটের নিকট হইতে খুব সাবধানে কোঁচাটা গুটাইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভীতভাবে বলিয়া উঠিল “এষে ভয়ানক ড্যাম্প! নিশ্চয়ই আমার ডিপ্‌থিরিয়া হয়ে মবতে হবে দেখচি।”

যোগেশ আবার মনে মনে একটু হাসিল, কিন্তু বাহিরে সে সহানুভূতি দেখাইতে কোন ক্রটি করিল না, বলিল “কি করবেন বলুন বিধির বিড়ম্বনা একেই বলে, যাহোক এখন ৩দিন কষ্ট সহ্য করুন আবার আমাদের দিনও ফিরে আসবে। তখন সব দুঃখ মেটাবো, যে আপনাকে এতটা কষ্ট দিলে তার কি কখনও ভাল হবে মনে করেছেন? কখন না, ভগবান আছেন তিনিই বিচার করবেন, দেখুন না কেমন মাগীর জাল ফাঁসাই।” হেমেন্দ্র আবেগের সহিত যোগেশকে আলিঙ্গন করিয়া গদগদ কর্তে কহিয়া উঠিল “ভাগ্যে তোমার

সঙ্গে দেখা হলো যোগেশ, নৈলে আমারতো কোন বুদ্ধিই যোগাচ্ছিল না; তুমিই জগতে প্রকৃত বন্ধু।” যোগেশ বলিল “ও কথা বলবেন না ছোটবাবু। আমরা আপনার ভৃত্য; চিরকাল তো আপনাদের দ্বারেই মানুষ, কি আর কর্তে পারলুম বলুন, ক্ষমতাই বা কতটুকু? তবে এশরীরটা, প্রাণটে দিয়েও যদি আপনাদের বংশের মানমর্যাদা রক্ষা করবার সামান্য সাহায্যটুকুও করতে পারি তাতে পিছুব না। শাস্ত্রে বলে “রাজদ্বারে শ্মশানে চ যঃ তিষ্ঠতি স বান্ধব।” তা আমি রাজদ্বারে দাঁড়াবার সব বন্দোবস্ত করে দেব কোন ভাবনা নেই।” হেমেন্দ্র পুনশ্চ আবেগ রুদ্ধকণ্ঠে কহিল “তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই যোগেশ, ভাগ্যে তোমায় পেয়েছিলুম!”

যোগেশ একজন দাসী ও আহাৰ্য্য সামগ্রীর যোগাড় করিয়া যখন বাড়ি ফিরিল তখন হেমেন্দ্রের ঘড়িতে ডেইটা বাজিয়া গিয়াছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া সে সেই শয্যাহীন তক্তপোষের ধূলি-লাঞ্ছিত বক্ষ আশ্রয় করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের পদশব্দে জাগিয়া উঠিল। প্রতিবেশির নিকট হইতে আনা গ্লাসে খানিক ঠাণ্ডাজল ও কিছু কেনা খাবারে জলন্ত ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া হেম বলিল কি জঘন্য জিনিষই কিনেচ হে! কলেরা না হয়। তা যাহোক যোগেশ, তুমিও কিছু খেয়ে নাও, এসো একটা কিছু পরামর্শ-দাও, আমি তো ভাই দুদিন এ অবস্থায় থাকলে নিশ্চয়ই মারা পড়বো, তা তোমাকে বলে রাখলুম। বাপ্! এমন করে মানুষে বাঁচতে পারে।”

যোগেশ হঠাৎ ঈষৎ রুদ্ধস্বরে বলিয়া ফেলিল “বৌদিকে একবার দেখবে না? আশ্চর্য্য লোকতো আপনি দেখচি! সে বেচারা এখনও যে মুখে একটু জলও দেয়নি, আমরাতো তবু শ্রীরামপুরে চা টা, খেয়ে নিয়োঁছিলুম।” হেমেন্দ্র একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল, তারপর একটু ভাবিয়া কহিল, “তুমিই গিয়ে বলোনা।” যোগেশের সমস্ত হৃদয় তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেইদিকেই টানিতে উদ্বৃত হইয়াছিল কিন্তু তথাপি সে সেই প্রলোভন হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া চঞ্চলস্ববে বলিল “না না তাকি হয় তিনি কি ভাবলেন, আপনি যান, আমি ঝিটাকে দিয়ে বরং খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি, ঝি ঝি গেল কোথা”—“হেমেন্দ্র অনিচ্ছার সহিত উঠিল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া যোগেশ মনের মধ্যে শাস্তি অনুভব করিল না।

হেমেন্দ্র আসিয়া দেখিল বন্ধুতার ক্ষুদ্র ঘরের ধুলির উপর শাস্তি চূপ করিয়া বসিয়া আছে। সে তাহার মুখ দেখিতে পাইল না কিন্তু ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিল সে কাঁদে নাই, এবং অনেকক্ষণ হইতেই এই অবস্থায় রহিয়াছে। মনে মনে একটু ভীত হইল, তাহাকে কাঁদিতে দেখিলে বরং সে সাহস পাইত। কাছে আসিয়া একটু সঙ্কুচিতভাবে ডাকিল “শাস্তি!” শাস্তি উত্তর দিল না, হেমেন্দ্রও অনেকক্ষণ চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এমন বিপদেও সে পড়িয়াছে যে বলিবার নয়, একি গ্রহ! অপচ রাগ করাও অনর্থক, বুঝিবে কে? এবার একটু উচ্চ কারিয়া ডাকিল “শাস্তি শুনচো?” শাস্তি মুখ ফিরাইল, প্রশ্নহান মৌনদৃষ্টি একবারমাত্র

স্বামীর মুখে স্থাপন করিয়া আবার চোখ নীচু করিল। ঈষৎ লজ্জার সহিত হেম নত হইয়া তাহার হাত ধরিল,—“ওঠো মুখে একটু জল দাও, উঠে এসো।” কোন কথা না কহিয়া শুধু সে হাতখানা টানিয়া লইল। নির্ঝাঁক ওষ্ঠ একটুখানি কম্পিত হইয়াই ধামিয়া গিয়াছিল, চোখের পাতা আর একটুখানি নামিয়া আসিলমাত্র। নিতান্ত অপমানিত বোধে হেমের দ্রুতপদে চলিয়া গেল। যোগেশকে গিয়া বলিল “বলুন তুমি বলগে তা হলোনা”—ব্যর্থরোধে জলিয়া সে যোগেশের প্রতিই আক্রোশ মিটাইয়া লইল। “তোমাদের কেবল আমার জালাতন কর্কার ফন্দি বৈতো নয়!” যোগেশ বিরক্ত না হইয়া বরং খুসী হইয়াই উঠিয়া গেল।

ঘরের নিকটে আসিয়া যোগেশ ‘বৌদি’ বলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার সম্মুখেই কি কোন ক্ষমতা-পন্ন চিত্রকর নির্ঝাঁসিতা সীতার চিত্র আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছে নাকি? ঠিক সেই রকমই মুখের ভাবটুকু, বসিবার ধরণটিও যেন তেমনি! করুণস্বরে যোগেশ বলিল ‘বৌদি, উঠে আসুন, মুখ হাত ধুয়ে একটু জল টল খেয়ে নিনু, নৈলে আমি প্রসাদ পাইনে যে।’ এবার শাস্তির নিশ্চলপ্রায় হৃদপিণ্ড সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তুষার যেমন সূর্য্য কিরণে সহসা গলিয়া জলে পরিণত হইয়া যায় তাহার বুকের মধ্যের জমাট বাঁধা বেদনা তেমনি সেই সহঃসুভূতির স্বরটুকুতেই গলিয়া আসিল। কষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া সে মাথার উপর ঘোমটা টানিয়া দিল, যোগেশ একবার চকিত কটাক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আবার বলিল—এবার একটু

স্বর ছোট করিয়া একটু কাছে আসিয়া বলিল; “আমার কথা শুনুন, আমার বিশ্বাস করুন, আমি প্রকৃতই আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী,—আমি শীঘ্রই সব ঠিক করে দোব, হুদিনেই আবার আপনি লক্ষ্মীপুরের লক্ষ্মীরূপে সেখানে ফিরে যাবেন, আমার প্রাণ থাকতে আপনাদের কোন ক্ষতি হতে দোব না এই আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করলুম।” যোগেশের গলা কাঁপিতেছিল, হঠাৎ সে চুপ করিল। শাস্তির চোখ দিয়া এতক্ষণ পরে বিন্দুর পর বিন্দু কবিয়া অসহ্য বেদনাবাশি অশ্রুর আকারে ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল, সে বিশ্বয়ের সঙ্গে প্রতিজ্ঞাকারীর প্রতি চাহিয়া দেখিয়া তাহার উৎসাহিত মুখের আগ্রহ দৃষ্টিতে নিতান্ত আশ্চর্য হইল। যোগেশ একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া পুনশ্চ আবেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিল “বলুন আমি আপনার জন্ত কি করতে পারি? আমার লজ্জা করবেন কেন? আপনি লক্ষ্মীপুরে যেতে চান—না রজনীবাবুর কাছে? বলুন—আমি তারি বন্দোবস্ত করে দেব—” শাস্তির সমস্ত শরীরের মধ্যে প্রতি শিরায় শিরায় উত্তেজনার আনন্দ স্রোতের মতন বহিয়া গেল, সে বালিকার মত সরলবিশ্বাসে উৎকুল হইয়া বলিয়া উঠিল “আমি লক্ষ্মীপুরে জোঠা মহাশয়ের কাছেই যাবো—” যোগেশ আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া সসম্মমে কহিল, “আমি তারি জন্তে চেষ্টা করবো আর বিশ্বাস করুন সে চেষ্টা সফলও হবে।”

এদিককার সব এক রকম বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া যোগেশ হেমকে বলিল “টাকার জন্তেই তো বড় মুন্সিল দেখছি ছোটবাবু।

এখনও মশারি আর একটা ড্রেসিং টেবিল কিনতে বাকি এর মধ্যেই তো দেড়শো টাকা ধার হয়ে গ্যাছে, কি করি ?” হেমেন্দ্র বিছানায় পড়িয়া কুঞ্চিত ক্রুর মধ্য হইতে অপরিচ্ছন্ন দেওয়াল ও ছাদ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। যোগেশেব অভিযোগ শুনিয়া তাহাব অপ্রসন্ন চিত্ত আরো অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, অধীভাবে মাথা নাড়িয়া কহিয়া উঠিল “নাওনা শ-পাঁচেক টাকা কারু কাছে ধাব কবে। আশাব কি কোথাও তালুক মূলুক আছে !” “তাইতো, শুধু হাতে এখানে যে কেউ ধার দিতে রাজি হয় না, বলে সত্য জমিদার হলে কি ঐ বাড়িতে থাকে ! এ আবার ফরাসীর মূলুক, ওরা ভয় পায় যদি এর পব কিছু গোল হয়। আমারও তো জানো ‘অণু ভক্ষণমুণ্ডণ !’ হেমেন্দ্র চূপ করিয়া রহিল, সে কি পরামর্শ দিবে ? তাহাব নিকট তো আর একটি কপর্দকও নাই ! সে কি হাতে কিছু রাখিত, বাগা পাইত তাহাতেই তাহাব খরচ পত্রে কুলাইয়া উঠিত না—তবে এখন কি উপায় ?

কি ভয়ানক ! এমনি ভয়ঙ্কর স্থান এই সংসারটা যে এক মুহূর্ত্ত মাত্র তাহার মধ্যে বাস করিতেও অর্থের দরকাব ! একটা দিন পর্য্যন্ত কেহ কাহারও পাওনা মাপ করিবে না ? বেশ, তবে সেইবা কেন তাহার প্রাপ্য ছাড়িয়া দিবে ? সেইবা কেন এ অপমান এ কষ্টের প্রতিশোধ লইবে না ? কেন লইবে না, নিশ্চয় নিশ্চয় লইবে ! প্রতারণাকারিণী মায়াবিনীর কোন্ শাস্তি তাহার কৃতকর্মের উপযুক্ত হইতে পারে ? সে কোন শাস্তি ?

হেমেন্দ্রকে নীরব দেখিয়া যোগেশ বলিল

“এক কাজ করো না কেন ;—তোমার খুশুরকে লেখনা কেন কিছু টাকা পাঠাতে ?”

গভীর ঘণার সহিত তীব্রস্বরে হেমেন্দ্র বাধা দিল, “চূপ করো ও নাম আমার কাছে করোনা। এই নাও ঘড়িটা ও চেনটা রেখে কোথাও থেকে টাকা আনো। জানো তো ওটা বড় কম দামী জিনিষ নয়।” রাত্রে সুন্দর জ্যোৎস্না ফুটিয়াছিল। আকাশ একেবারে মেঘ-শূণ্য। চাঁদের আলোকে আকাশভরা নক্ষত্র দীপ্তিমান দেখাইতেছে। হেমেন্দ্রের শয়ন গৃহের খোলা জানালার মধ্য দিয়া গৃহতলে জ্যোৎস্নালোক প্রবেশ করিয়াছিল, অল্প অল্প বাতাস গৃহসম্মুখস্থ বাঁশ বনের পাতা কাঁপাইয়া, ঘরের মধ্যে মশারী ও আনলার কাপড় ঢলাইয়া ফিরিতেছিল। যোগেশ শাস্তির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল “বৌদিদি !” ধ্যানমুগ্ধার মত শাস্তি নীরবে জানলার নিকট বসিয়াছিল, চমকিয়া মুখ ফিরাইয়াই প্রথমে মাথার কাপড় টানিতে যাইতেছিল ; যোগেশের অনুমোদনে নিবৃত্ত হইয়া তাহা যথাস্থানে স্থাপন করিল। যোগেশ বিস্ফারিত নেত্রে তাহার জ্যোৎস্না বিধৌত মুখের পানে চাহিয়া রহিল, সে তাহাকে কি বলিতে আসিয়াছিল বোধ হয় তাহা স্মরণও হইতেছিল না। প্রত্যাশিতনেত্রে শাস্তিও তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, তাহাকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া আপনা আপনি তাহার চোখ নীচু হইয়া আসিল, আবার ক্ষণপরে দৃষ্টি উঠাইয়া দেখিল তখনও সে তেমনি করিয়া চাহিয়া আছে, ঈষৎ অস্বস্তি অনুভব করিয়া সে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; যোগেশ তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত বাহিরের লোক মাত্র !

শান্তিকে উঠিতে দেখিয়া যোগেশ নিজের দুর্বলতায় নিতান্ত লজ্জিত হইয়া আপনাকে তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া কহিল “আপনি শুতে যান বৌদি ; রাত হয়ে গ্যাছে।” তাহাব কথায় ও স্বরে শান্তির বিশ্বাস ও আশা আবার যেন তাহার হতাশাকার হৃদয়প্রান্তে সহসা জাগিয়া উঠিয়া তাহার সেই এক মুহূর্তের সন্দেহতার জন্ত সবেগে তিরস্কার করিয়া উঠিল। আত্মবিস্মৃত হইয়া সে তখন আগ্রহে বলিয়া উঠিল “কবে আমি লক্ষ্মীপুবে যেতে পারব আমায় আগে বলুন ..”

যোগেশ আনন্দরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল “নিশ্চয়ই শীঘ্র যাবেন। আমি—আমি সব ঠিক করে ফেলব। বিনোদবাবুর বউ মেজে যে মাগী আপনার এই কষ্টের কারণ হয়ে এসেছে সেই জালিয়াতনীকে জেল খাটান তবে আমার নাম যোগেশ মিত্তির, কিন্তু আপনি আমায় ভুলবেন না।”

পথের মধ্যে চলিতে চলিতে বিশ্বাসী পথিক সহসা সম্মুখে দংশনোত্ত কালসর্পকে ফণা ধরিয়া দাঁড়াইতে দেখিলে নির্ঝাঁক আতঙ্কে যেমন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে যোগেশের কথায় শান্তিও ঠিক তেমনি কবিয়া সেইখানেই আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তবে তাহার কোনখানে আশা নাই? তবে সে যে এতক্ষণ আবার নূতন আশায় কত নূতন নূতন কল্পনার কানন সৃজন করিতেছিল সে সকল কি হুই নয়? সব মিথ্যা, সব প্রতারণা কোথা ও আর তাহার আশা নাই!

তাহার মনের অবস্থা ঠিক না বুঝিলেও সে যে তাহার কথায় বিশেষ খুসী হয় নাই যোগেশ তাহা বুঝিল। কিন্তু তাহাকে কি বলিলে সস্তুষ্ট

করিতে পারিবে, সে কথাটা সে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিল না, দূরে বারদোয়ারির ঘড়িতে রাত্রি দ্বিপ্রহর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে অদূর পথে চৌকিদার হাঁকিয়া উঠিল। যোগেশ একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া সসম্মুখে কহিল “যান আপনি শুতে যান, বড় রাত হয়ে গ্যাছে—”

কলের পুতুলের মতন সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ঘরে ঢুকিতে পা জড়াইয়া আসিতে লাগিল ; বিদ্রোহী চিত্ত পুনঃ পুনঃ বিমুগ্ধ হইয়া সবলে তাহাকে বিপরীত দিকে টানিতেছিল,— তথপি সে অনিচ্ছামন্ত্রগতিতে ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া বিছানাব নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। হেমেন্দ্র তখনও ঘুমায় নাই, জাগিয়াই ছিল, শান্তির চুড়ির শব্দে চাহিয়া দেখিল। “এতক্ষণ ওঘরে কি হচ্ছিল শান্তি?” প্রশ্নটা শুনিয়াই শান্তির হাতখানা মুহূর্তে মশাবীর প্রাপ্ত হইতে সরিয়া আসিল। সে নিশ্চল হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইল, আর নড়িল না। বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া ঈষৎ ক্রুদ্ধকণ্ঠে হেমেন্দ্র বলিল, “যোগেশ আমার খুব বন্ধু তা সত্যি, কিন্তু তাই বলে রাত দুপুর পর্যন্ত তার সঙ্গে বসে গল্প করা আমি পছন্দ করি না, ওরকম নিল্লজ্জ ব্যবহার তোমার বাপ তোমায় শিখিয়েছেন তা আমি জানি, কিন্তু আমি ওসব চক্ষে দেখতে পারি না।” মানুষের শরীর কিম্বা মনের ঠিক যেখানটার সম্প্রতি খুব বড় রকম একটা আঘাতের বেদনা সর্বদা দপ্‌দপ্‌ করিতেছে সেইখানটিতেই আবার সামান্য একটুখানি আঘাত লাগিলে অত্যন্ত সহিষ্ণু যে সেও আচমকা একটা যন্ত্রণাধ্বনি করিয়া উঠে। আজিকার তিরস্কারে

প্রতিহিংসার বিষ নিষ্ঠুরভাবেই হেমেন্দ্র
ঢালিয়া দিয়াছিল। পিতা ও কণ্ঠ্য তাহার
প্রতি ব্যবহার সে ভুলে নাই,—সুযোগ পাই-
লেই তাই তাহার প্রতিশোধের স্পৃহা জাগিয়া
ওঠে !

কিন্তু আজিকার এ আঘাত শাস্তির পক্ষে
সহ সীমানার বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সে
এক মুহূর্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া
পরমুহূর্তে আহতভাবে ঘর হইতে দ্রুতপদে
বাহির হইয়া গেল। মনের ঝাল ঝাড়িয়া
লইতে পাইয়া হেম ঈষৎ লঘুচিত্তে আবার
শয্যা আশ্রয় করিল। সমস্ত দিন ধরিয়া সে

শাস্তিকে অপমানিত করিবার পস্থা খুঁজিয়া
পাইতেছিল না।

তখন তাহার পাশের ঘরে শাস্তির পরি-
ত্যক্ত ভূমিতে শয্যা প্রস্তুত করিয়া লইয়া
যোগেশ শয়ন করিয়া জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নক্ষত্র
ভূষিত আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল,
“হেনের কার্য্যে আমার প্রাণ দিতে হয় তাও
আমি দোব। অহা আমার দ্বারা যদি তার
এ স্টু উপকারও হয় তাহলে আমার জন্ম
সফল হবে। আমার আর এতে লাভ কি ;—
শুধু একটু দয়া বৈতো নয় ! কিন্তু হেম কি
চূর্ভাগ্য এমন রত্ন পেয়েও চিনলে না !

দেবদূতের প্রতি রাজা অরিষ্টনেমি।

(যোগবাণিষ্ঠ প্রথম সর্গ)

চির বসন্ত বিরাজিত সেই নন্দন উপবন !
গন্ধ প্রবাহি স্নিগ্ধ পবনে মুগ্ধ হৃদয় মন !
যন্ত্র মিলিত স্বর্গ রাগিণী দিবস রাত্রি বাজে,
কি মরী গাহে কোকিল কণ্ঠে ! মোহন অপূর্ব সাজে !
অপ্সরা সেথা চিরসঙ্গিনী—সঙ্গী দেবতা সব ;
শয্যা আসন পারিজাত রাশি, পানীয় স্বর্গাসব ;
উপাধান সেথা সুররমণীর সুললিত ভূজপাশ,—
শুনে কাঁপে প্রাণ ! ফিরে যাও দূত চাহিনা স্বর্গবাস ।
বোলো দেবরাজে জানায়ে প্রণতি, দাস আমি চির তাঁর,—
অধমের প্রতি অর্ঘ্যচিত রূপে প্রেরিলা করুণা ভার ;
সেবক তাঁহার পাবিল না নিতে তাঁর সে করুণা রাশি,—
চাহে না স্বর্গ সুখভোগ দেব, ক্ষুদ্র মর্ত্যবাসী !
যাও নিজালয়ে ওগো দূতবর ! প্রণাম তোমারো পায় ;
কঠিন কঠোর সাধনা মগ্ন রহিব যাবৎ কায় ।
সুকৃতি ফুরালে আবার আসিব জন্ম ও কর্মের তরে !—
কেন্দ্র ব্রহ্ম উক্কা তারাটির মত এই পৃথিবীরই পরে ?

শ্রীঅম্বরূপা দেবী

বিদায় ও আগমন ।

আজ প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ মনস্বী দার্শনিক ও উদার নৈতিক লর্ড মলি ভারত সচিবের পদ গ্রহণ করিয়া ভারত শাসনে নিযুক্ত হন। বিগত নভেম্বরে তিনি এই কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। লর্ড মলির নিয়োগকালে ভারতের চতুর্দিকে যে কি অসন্তোষ ও অশান্তি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা আমাদের কাহারও অবদিত নাই। কিন্তু দেশেব সেই দুর্দিন ও দুর্দশা সশ্বেও বৃদ্ধ মলি এই গুরুভার গ্রহণে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। তাঁহার চিবদিনেব উদারতা, তেজস্বিতা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা এবং সর্কজীবে সহানুভূতি হইতে আমরা স্বভাবতঃই আশা করিয়াছিলাম যে এতদিনে ভারতবাসীর নিষ্ফল ক্রন্দন বৃষ্টি যুঁচবে, এইবার বৃষ্টি লর্ড কর্জনের যথেষ্ট ব্যবহারের প্রতিকার হইবে। কিন্তু এখন তাঁহার কর্মের অবসরকালে হিসাবনিকাশের সময় আমরা বলিতে বাধ্য যে লর্ড মলির ত্রায় পুরুষের নিকটে আমরা যতটা পাইব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, ততটা আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। তাহার জন্ত লর্ড মলি নিজেও দায়ী হইতে পারেন, বা অপরাপব কারণ ও অবস্থাও দায়ী হওয়া আশ্চর্য্য নহে। এই যেমন বঙ্গবিভাগ একটি! এ বিষয়ে লর্ড মলি স্পষ্টাক্ষরে রাজপুরুষগণের অস্থায় স্বাকার করিয়াও ইহার প্রতিকারে হস্তক্ষেপ করা দূরে থাক, উপরন্তু বলিয়াছিলেন যে তাঁহার মতে উহা চিরস্থায়ী ব্যাপারের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। এইরূপ তাঁহার আরও অনেক

কর্ম ও মতের সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই বা বিশেষ আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হইবার কোনও কারণ দেখি নাই। কিন্তু দুইটি কর্মের জন্ত তাঁহার নাম ভারতের ইতিহাসে চিরস্থায়ী হইবে এবং সেই দুইটি কর্মের জন্ত আমরা সকলেই তাঁহার নিকটে অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞ। প্রথম ভারতে রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ-নীতি পরিবর্তিত করা। কর্জনের কৃপায় দেশে রাজা ও প্রজার মধ্যে যেরূপ দুস্পৃহনীয় সম্বন্ধ দাঁড়াইতেছিল, তাহা স্থায়ী হইলে আমাদের উভয়ের পক্ষেই অমঙ্গল ও অনিষ্ট ভিন্ন আর কিছুই হইত না। বিলাতে লর্ড মলি ও ভারতে লর্ড মিন্টো দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াই এই অপ্রিয় ভাবটিকে দূর করিবার জন্ত বন্ধপরিকর হইলেন। ইহাদের চেষ্টায় যে আবার উভয়ের মধ্যে অনেকটা সদ্ভাব ও আমাদের অন্তরে আবার আশা ও আনন্দ সঞ্চারিত হইয়াছে যে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় কর্ম, ভারতের শাসন সংস্কার। এই সংস্কারের সহিত আমরা সকল স্থানে একমত হইতে না পারিলেও আমরা তাঁহার বিচক্ষণতা, সহানুভূতি, দৃবদৃষ্টি ও সাধু চেষ্টার স্মৃতি না করিয়া থাকিতে পারি না। এই দুই মহৎ কর্ম সাধিত করিয়া লর্ড মলি ইংলণ্ড ও ভারতের এক মহা সমস্যা দূর করিয়াছেন।

আগামী বড়দিনে লর্ড মলির বাহান্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হইবে। তিনি ভারত সচিবের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও, রাজ্য কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই।

লর্ড মলির স্থানে লর্ড জু ভারত সচিবের

পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও মনস্বী লর্ড রোজবেরির জামাতা। ইতিপূর্বে তিনি ইংলণ্ডের উপনিবেশ-সচিবের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি বালককাল হইতেই উদারনৈতিক এবং বহুদিন হইতেই পার্লামেন্টে লর্ড সভার উদারনৈতিক-গণের নেতৃপদ অধিকার করিয়া আছেন। অনিতেছি তাঁহার ত্রায় ভদ্র, অমায়িক, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সূচতুর কর্মচারী খুব বিরল। ১৮৯২ হইতে ১৮৯৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি আয়ারল্যান্ডের

রাজ-প্রতিনিধি-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যদিও তাঁহার সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করার সময় এখনও আসে নাই। তথাপি আশা করি তিনি লর্ড মর্লির দৃষ্টান্তেরই অনুসরণ করিবেন এবং কায়মনোবাক্যে প্রজারঞ্জে যত্নবান হইবেন।

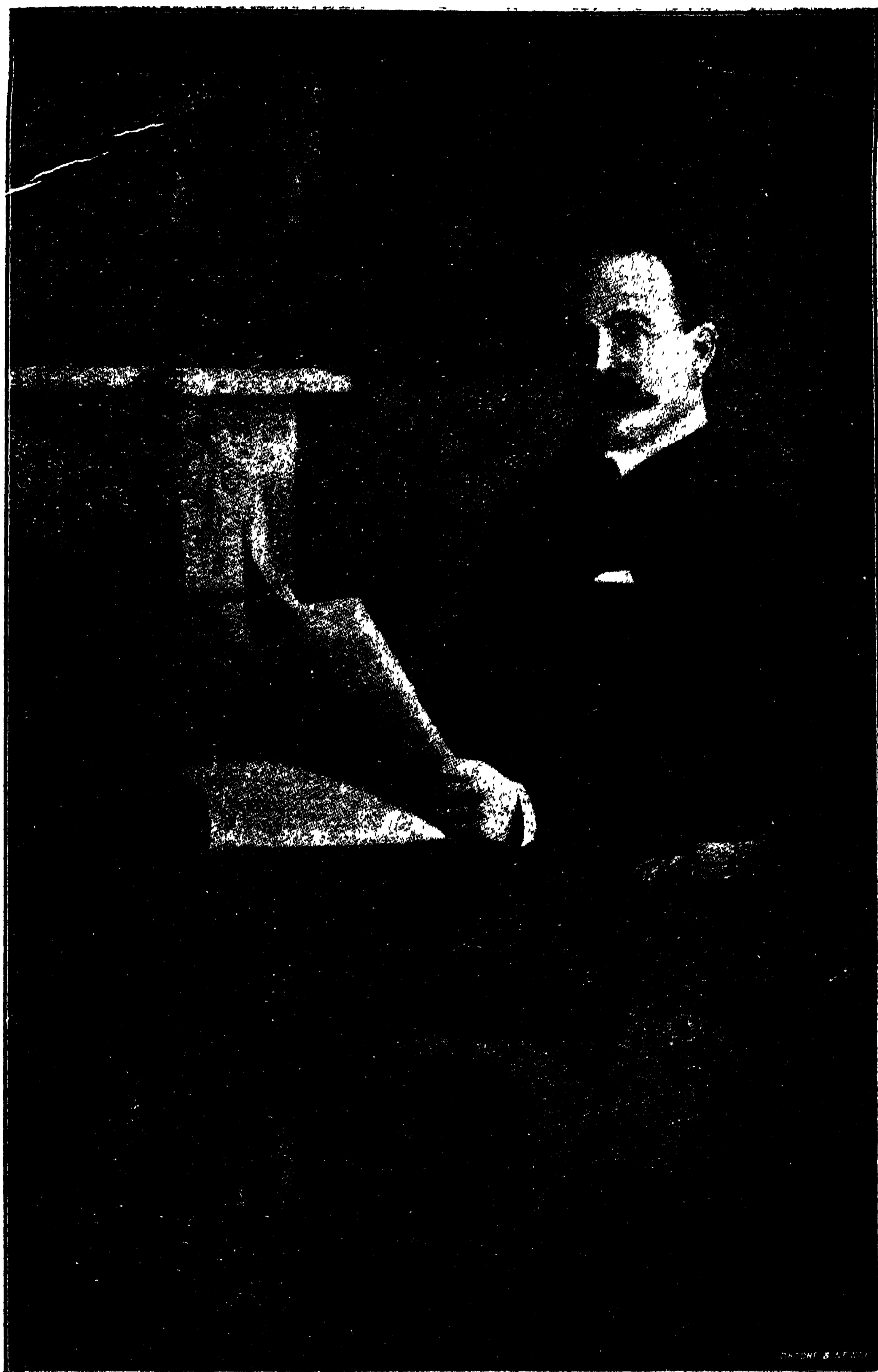
ভারতেও সাম্রাজ্যের শাসনভার হস্তান্তরিত হইয়াছে। গত নভেম্বরের শেষে লর্ড মিটো লর্ড হার্ডিংকে শাসনভার অর্পণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। বিদায়ের



লর্ড মর্লি

পূর্বে সিমলাশৈলের রাজকর্মচারীরা তাঁহার বিদায় অভিনন্দনের জন্ত ইয়ুনাইটেড্ সার্ভিস ক্লাবে একটি সান্ধ্য ভোজনোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া লর্ড মিণ্টো যে দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা গত পাঁচ বৎসবে তাঁহার ভারত শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিলেও হয়। ভারতে আসিয়া লর্ড মিণ্টোর ধৈর্য্য, দূরদর্শিতা, উদারতা ও বিচক্ষণতাব যে কি কঠোর পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং তিনি কিরূপ সগৌরবে যে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহা তাঁহার বক্তৃতা পাঠেই বেশ বুঝা যায়। লর্ড বর্জনের তীব্র প্রতিভার ফলে এবং কতকটা কালেরও গুণে লর্ড মিণ্টো যখন ভারতে পদার্পণ করেন, তখন হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত চতুর্দিকেই অসন্তোষ ও অশান্তি গর্জিয়া উঠিতেছিল। প্রতিভাবান হৃদয়বান রাজ-প্রতিনিধি প্রথমেই বুঝিলেন এ আগুন নিবাইতে হইলে দেশের শাসন-বিধির সংস্কার আবশ্যিক। বুঝিবামাত্র তিনি সহস্র বাধা বিঘ্ন, সন্দেহ ও প্রতিবাদেব মনো আপন চিত্তের অটল সাহস ও ধীরতার উপর নির্ভর করিয়া সংস্কার-পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহার পরের ইতিহাস আমরা সকলেই জানি, সুতরাং এ স্থানে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যিক। তবে তাহার বক্তৃতার দুই এক স্থানের সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি, সহানুভূতি ও বিচক্ষণতা দেখাইব মাত্র। ভারতের অশান্তি সম্বন্ধে লর্ড মিণ্টো বলিয়াছেন— “আমি ভারতে পদার্পণ করা হইতে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কথাই আমার চিত্তে

সর্বপ্রধান ছিল। আমি এদেশে আসিয়া বুঝিলাম যে ভারতের রাজনৈতিক আকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন ও বজ্রপাতোন্মুখ হইয়া আছে। আমি ইহা বেশ অনুভব করিতাম। দিন দিন যতই অভিজ্ঞতা বাড়িতে লাগিল, ততই দেখিলাম যে চতুর্দিকেই ঘোর অতৃপ্তি ও অসন্তোষ বিরাজ করিতেছে—অনেক রাজভক্তের হৃদয়েও ঘোর অতৃপ্তি। বিদ্রোহ-নীতি হইতে স্বতন্ত্র একটা দেশব্যাপী রাজ-নৈতিক অশান্তি ছিল। এমন সকল শক্তির ক্রিয়া হইতেছিল যে ভারতগবর্মেণ্টের পক্ষে সেগুলিকে অগ্রাহ করা অসম্ভব। এমন সকল আকাজক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, যে তাহার শাসনস্বত্ব অধিকারকে অস্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু এ আকাজক্ষা কিসের? অদৃশ্য এ স্থলে আমি বিদ্রোহবাদীদের কথা বলিতেছি না। এক কথায় মোটের উপর বলিতে গেলে আমার বিশ্বাস যে অনেক শিক্ষিত ভারতবাসীই স্বদেশের শাসন কর্ম্মে অধিক অধিকার লাভের জন্ত ব্যগ্র হইয়াছিল। এ আকাজক্ষার ভিত্তি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ সালের ঘোষণাপত্র। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট নিয়মিত রূপে যে শিক্ষার বীজ এককাল বপন করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহারই ফলে এই সকল আকাজক্ষা পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তবে জাপানের রুদ্রযুদ্ধে জয়লাভে তাহারা একটু শীঘ্র পুষ্ট হইয়াছে মাত্র। কিন্তু তাহা না হইলেও আমাদেরই স্বহস্তে রোপিত বীজ যে একদিন অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতই সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই সকল শাস্য আকাজক্ষাকে স্বীকার করিয়া আমাদের



লর্ড কু

কর্তব্যই পালন করিয়াছি, ভবিষ্যতের নানা প্রকার বিপদ হইতে ভাবতকে রক্ষা করিয়াছি।”

পরে তিনি বলিয়াছেন—“দেশের এই রাজনৈতিক জাগরণকে নিরস্ত কবিনার দুইটি পথ ছিল। এক পক্ষে ভাবত গবর্মেণ্ট বলিতে পারিতেন—“এ সকল নূতন ভাব আমবা গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নহি, এ সকল ভাব ব্রিটিশ শাসনের স্থায়ীত্বের বিবোধী।” অপর পক্ষে তাহাদের গ্ৰাযাতা স্বাকার করিয়া দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা অনুসারে শাসন বিধি-পরিবর্তিত করাই আমাদের দ্বিতীয় পথ ছিল। দ্বিতীয় পথই যে শ্রেয় পথ সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহমাত্র ছিল না। * * * প্রথম পথ অবলম্বন করিলে আমরা ভারতে অশান্তি ও অসন্তোষকেই স্থায়ীত্ব দান করিতাম।”

এ সকল উক্তি শুনিলে লর্ড মিন্টোব উদারতা, সুস্বদৃষ্টি ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার প্রশংসা না কবিয়া থাকা যায় না। তাঁহার সকল কর্ম বা মত আমাদের মনোমত না হইলেও, তিনি যে ভাবতের মঙ্গল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া পদে পদে ভারতবাসীর মঙ্গল-সাধনেই রত ছিলেন একথা কেবল আমরা কেন, ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস চিরদিনই স্বীকার করিবে। ব্রিটিশ শাসনকর্তাদিগের মধ্যে যাহারা ধর্মপথে থাকিয়া ষথার্থ প্রজা-পালনে ও প্রজারঞ্জে রত ছিলেন ও থাকিবেন, লর্ড মিন্টোর নাম সেই সকল প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষের সহিত সমাসনে স্থান পাইবে। এই স্থলে লর্ড মিন্টোর মহত্ব ও সদাশয়তার কথাও উল্লেখ করিতে আমরা বাধ্য। তিনি খেরুপ সরল ও অমায়িকভাবে

আমাদের দেশের নারীদিগের সহিত মিশিতেন এবং খেরুপ সহানুভূতিব সহিত নারীদের কল্যাণ কর্মে যোগদান করিতেন, খেরুপ আমাদের ভাগ্যে খুব অল্পই ঘটে। তাঁহার ব্যবহারেব শুণে তিনি যে কেবল আমাদের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ কবিতেন তাহা নহে, তিনি আমাদের সকলকেই ভালবাসার বন্ধনে এমন নিবিড় কবিয়া বাঁধিয়া ছিলেন, যে তাঁহার ভাবত ত্যাগের সময়ে আমরা বন্ধুবিচ্ছেদের ক্রায় বেদনা অনুভব করিয়াছি। তিনি ও তাঁহার স্বামী যখন আমাদের নিকট বিদায় লইলেন তখন অশ্রু-আবেগে তাঁহাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। রাজাপ্রজায় একরূপ আন্তরিক অনুবাগ প্রকাশ আমরা বহুদিন দেখি নাই। এই অবস্থাটি স্বায়ী হইলে আমাদের উভয়েব পক্ষেই কত সুখের ও শান্তির কারণ হইয়া উঠে !

আমাদের নূতন লর্ড হার্ডিং সম্বন্ধে আমরা এখনও বিশেষ কিছুই জানি না, সুতবাং তাঁহার সম্বন্ধে এক্ষণে কোনও মতামত প্রকাশ করাও সম্ভব হইবে না। তবে ইংলণ্ড হইতে বিদায় উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে তাঁহার আদর্শের আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু লর্ড কর্জনের প্রসাদে আমাদের বক্তৃতার মোহ ও মৌখিক আশ্বাসের নেশা অনেকটা কাটিয়াছে। লর্ড মিন্টোকে দেখিয়াও আমরা বুঝিয়াছি যে কর্তব্যের পক্ষে অধিক কথার আবশ্যক হয় না। তবে লর্ড হার্ডিংও অধিক কথার ছটা প্রকাশ করেন নাই। সেই জন্তই আশা হয় তাঁহার শাসনকালে আমরা প্রকৃত মঙ্গল কর্মেরই পরিচয় পাইব। তাঁহার বক্তৃতার



মেডি সিনেটা



बाहू निःन्टा

শেষ ভাগে তিনি বলিয়াছেন—“শাসনকর্তা মাত্রেই কতকগুলি নীতির অনুসরণ করা কর্তব্য। সার রবার্ট পীল তাঁহার পিতামহ লর্ড হার্ডিংকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনিও তাহারই অনুসরণ করিবেন। পীল লিখিয়াছিলেন—“যদি তুমি শাস্তি রক্ষা করিতে পার, বাণিজ্যের উন্নতি করিতে পার, ব্যয় কমাইতে পার, ভারতবাসীর মনে আমাদের গ্রামপরাশ্রয়তা ও দয়ার উপর বিশ্বাস জন্মাইয়া আমাদের ভারত-ধিকারের ভিত্তি দৃঢ় করিতে পার, তাহা হইলে স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে তুমি এখানে যে আন্তরিক আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিবাদন পাইবে তাহা দ্বাদশ যুদ্ধজয়ী বীবের অভিবাদন অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক আন্তরিক।” লর্ড হার্ডিং বলিয়াছেন “এই নীতি স্বরণ রাখিয়া ভারতবাসীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্বাভাবিক সহানুভূতির সহিত তিনি তাঁহার কর্তব্যপালন করিবেন এবং ভারতবাসীর আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির জন্ত যথাসাধ্য যত্নচেষ্টা করিবেন। শাসন কর্তার পক্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নীতি আর হইতে পারে না। তিনি তাঁহার কর্মের দ্বারা এই উচ্চনীতি সফল করিতে পারিলে, ভারতবাসী মাত্রেই ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন সন্দেহ নাই।

লর্ড হার্ডিংকে বিদায় দিবার জন্ত তাঁহার বিদ্যালয়ের সহপাঠীরা একটি সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। এই সভাতে তিনি ইংলণ্ডে ইংরাজ ও ভারতবাসী ছাত্রের মধ্যে মিলন সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে “এই উভয় শ্রেণী ছাত্রের মধ্যে যে সন্তাব ও

মিলন নাই সেটা নিতান্তই শোচনীয় ব্যাপার। এই কারণেই ভারতবাসী ছাত্রেরা কুসঙ্গে মিশিতে বাধ্য হয়। বিলাতে ভারতীয় ছাত্র-দিগকে সাহায্য ও রক্ষা করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। হারো স্কুলে এই সকল ছাত্রের সহিত ইংরাজেরা যেরূপ আত্মীয়ের তায় ব্যবহার করে, সকল বিদ্যালয়েই সেইরূপ হওয়া উচিত। ভারতবাসীদের প্রতি ব্যবহার ইংরাজ সাম্রাজ্য রক্ষার পক্ষে বিশেষ মনোযোগের বিষয়।” ভারতে অশান্তি সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন যে,—ভারতে জনসাধারণের রাজভক্তি সম্বন্ধে সন্দেহান হইবার উপযুক্ত কারণ তিনি কিছুই দেখিতে পান না। ছই চারি জন বিকৃত মস্তিষ্ক ভিন্ন সিডি-শন প্রচারে যে প্রজাসাধারণের কোনও সহানুভূতি আছে এরূপ বিশ্বাস করা অসঙ্গত। তাঁহার স্থির বিশ্বাস যে সহানুভূতি ও করুণার প্রভাবে ভারতের অশান্তি অচিরে লোপ পাইবে!

সহানুভূতি ও করুণার প্রভাবে জগতের সকল অশান্তিই লোপ পায়। লর্ড হার্ডিং যদি এই দুইটা আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার শাসনকর্ম পরিচালিত করেন তাহা হইলে তিনি যে অচিরে দেশের লোকের পূজ্য হইয়া উঠিবেন এবং চতুর্দিকে শান্তি ও সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। শক্তির অপব্যবহারেই অশান্তির উৎপত্তি। পুণ্যবৃত্তির দ্বারা শক্তিকে সরল ও সংযত করিলে তাহা প্রেমের আকার ধারণ করে। পিতামাতা শাসন করিলেও তাহা প্রেমেরই শাসন।

লর্ড হার্ডিং ইংলণ্ড ত্যাগের পূর্বে একটি

বেশ কৌতুকজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন এমন সময়ে সহসা ট্রেন ছাড়িয়া দিল। সেখানে ত'



লেডি হার্ডিং

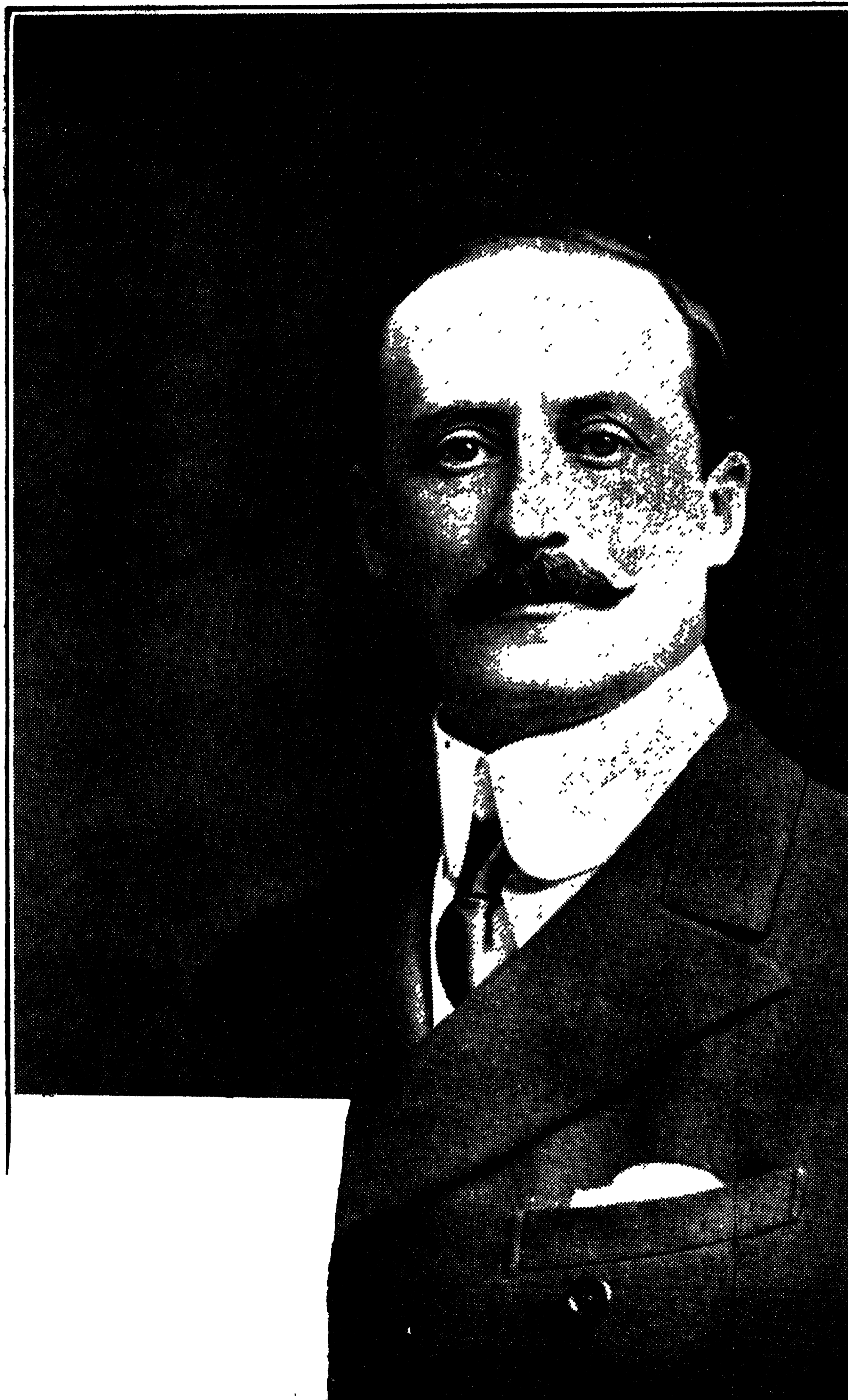
এখানকার গ্রাম নিযুক্ত বড় লাটের জন্ত স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা নাই। তাহার পর আবার গাড়ীটিকে পিছনে হটাইয়া ষ্টেশনের মধ্যে আনা হয়, তখন আমাদের রাজ-প্রতিনিধি তাহাতে আরোহণ করেন। গাড়ী ছাড়িবার কিছু পূর্বে লেডি হার্ডিং চীৎকার করিয়া উঠিলেন; “ঐ তোমার পকেট হইতে চুরি করিতেছে।” লর্ড হার্ডিং ফিরিয়া দেখেন এক বৃদ্ধ তাঁহার পকেট কাটিবার চেষ্টা করিতেছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ভিড়ের মধ্য দিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া তাহাব স্কন্ধে হস্ত দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার চিত্ত পরিবর্তিত হইল, বৃদ্ধকে কিছু না বলিয়াই ফিরিয়া ষ্টেশনে আসিলেন। রাজপ্রতি নিধি তাহাকে মুক্তি দিলেন দেখিয়া পুলিশেও আর তাহাকে কিছু বলিল না, বিনা উপদ্রবে চোর অন্তর্ধান করিল।

কাউন্ট লিও টলষ্টয়

মানব সমাজকে ধর্ম, সমাজশক্তিতে এবং স্বাধীনতায় উন্নত ও সঞ্জীবিত করিবার জন্ত বর্তমান যুগে যতগুলি মহৎ জীবনের অমূল্য শক্তি নিয়োজিত হইয়াছে, তন্মধ্যে রুশিয়ার জনসাধারণের গুরু, ধর্মসংস্কারক, সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও রাজনৈতিক সংস্কারক কাউন্ট লিও টলষ্টয়ের আসন সর্বশীর্ষে অবস্থিত। এই মহাপুরুষ সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়া, সম্পদ বিপদের দুর্গম পথের মধ্য দিয়া দীর্ঘ দিনের অবসানে এক চিরশান্তিময় বিশ্রামপূর্ণ স্থানে গিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। মৃত্যু আসিয়া মহৎ জীবনের পুত প্রবাহকে রুদ্ধ করিয়া দেয়

এবং মানবসমাজের অন্তরালে এক অনন্তরাজ্যে লইয়া যায় বটে, কিন্তু ইহাদের বাণীকে শত শত শতাব্দীর স্তর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারে না। ইহা প্রচ্ছন্নভাবে মানবের অন্তঃকরণকে উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখে।

টলষ্টয়ের জন্মকালে রুশিয়া ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। সুপ্তিজাল জড়িত রুশিয়া তখনও সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বিজয়গীতি—যাহা ইউরোপের অপরাপর দেশকে মুখরিত করিতেছিল, শ্রবণ করিতে পায় নাই। দুর্দমনীয় রাজশক্তি নির্মমভাবে অসহায় প্রজা-



শাক্তিকে নিষ্পেষিত করিতেছিল। কত শত হতভাগা যে বিনা বিচারে, বিনা অপরাধে রুশিয়ার নরকতুল্য ভাষণ কায়াগারে অশেষ যাতনার পর জীবনত্যাগ করিতেছিল এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া হিমময় চিরতুষারাবৃত সুরুর সাইবিরিয়া প্রদেশে চিরনির্বাসিত হইতেছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। তখন দুর্ভিক্ষক্লষ্ট হতভাগ্যদের আকুলক্রন্দনে রুশিয়ার আকাশ

পরিপূর্ণ। কত নিরাশ্রয় জননী বাস্পরুদ্ধকণ্ঠে : নিজের এবং শিশুসন্তানের মৃত্যুকামনা করিতেছিল! এইরূপ সময়ে কোন এক ধনার গৃহে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অগষ্টে টলষ্টয় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বাল্যকালেই তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হয় এবং কোন এক গর্বিতা এবং নীচমনা আত্মীয়্যার হস্তে তাঁহার প্রতিপালনের এবং শিক্ষার ভার পতিত



হওয়ায়, মাতা শিশুর কোমল হৃদয়ে স্নেহ শিশিরশিক্ত করুণার ও ভালবাসার যে উৎস সৃজন করিয়াছিলেন তাহা অকালে রুদ্ধ হইয়া গেল। ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয়ে বিলাসিতার ও উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব প্রবল হইয়া উঠিল এবং ঐ সকলের বিষময় স্রোতে পতিত

হইয়া দিন দিন তিনি ধ্বংসের মুখে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। কিছুদিন পবে তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন, এবং বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ না করিয়াই সাময়িক বিভাগে প্রবেশ করিলেন।

আর্মেনিয়ার যুদ্ধের সময় তিনি তথায়

গ্রহণ করিয়া দেশ ভাসাইয়া প্লাবন উপস্থিত করিল। তাঁহার পুস্তক সকল পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া মানব হৃদয়ে ভালবাসার ও ধর্মের বীজ অঙ্কুরিত করিতেছে। সাহিত্যের কোন এক বিশেষ শাখা যে তাঁহার প্রিয় ছিল তাহা নহে; তিনি উপন্যাস, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং অর্থ-নৈতিক বিষয়ে বহু পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহার War and peace, Kingdom of God is unto you, Anna Karenina, Power of darkness on life, Resurrection প্রভৃতি পুস্তক রুশিয় সাহিত্যের পত্তন বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না।

যখন তিনি দেশের প্রচলিত খৃষ্টধর্ম উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন তখন তাঁহার হৃদয় হুঃখে পূর্ণ হইয়া গেল। ধর্মের নামে ধর্মসমাজের নেতাগণ যে সকল গহিত কার্য করেন তাহা টলষ্টয়ের অসহ্য হইয়া উঠিল। দেশব্যাপ্ত কুসংস্কারকে বিতাড়িত করিবার জন্ত এবং বাহ্যিক কার্যকলাপ (ceremonies) ত্যাগ করিয়া একমাত্র জগৎ পিতার উপাসনা করিবার জন্ত ধর্মনেতাদের এবং রাজশক্তিকে ধর্ম করিয়া তিনি আপনার বাণী জগতের সম্মুখে প্রচার করিলেন। ইহাতে রাজপুরুষ-গণের বিরাগভাজন হইলেন এবং ধর্ম-পুরোহিতেরা রাগান্বিত হইয়া তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে গ্রীক খৃষ্টীয় সমাজ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হইল। একরূপ ব্যাপার নূতন নহে। জগতের মঙ্গলের জন্ত যখন কোন মহাপুরুষ আপনার বাণী প্রচার করিতে উদ্বৃত

হন, তখন কত মোহাক্ষ জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি তাঁহাকে প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ইহার প্রবল পুণ্য প্রবাহকে ইচ্ছের ঐরাবতও বাধা দিতে পারে না; তাহা আপনার হৃদমনীর বেগে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। আজ ক্রমের তৃষ্ণাতুব দেশে ইহার করণাবর্ষণে প্রেমের অমৃতপ্লাবন আনয়ন করিয়াছে। এখন কি ছাত্র, কি সাধারণ লোক, কি প্রজা তাঁহাকে দেবতার ত্রায় ভক্তি করে, এবং তাঁহার মৃত্যুস্থান পবিত্র তীর্থে পরিণত হইয়াছে।

আজ ৮২ বৎসর পরে এই মহাপুরুষের জীবনপ্রদীপ নিৰ্ব্বাপিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার জীবনের কথা যখন মনে করি তখন বোধ হয় শত সহস্র বৎসর পূর্বে এই আর্ধ্য-ভূমির কোন এক মহাপুরুষ অজানা অমৃত-ময় রাজ্য হইতে অবতীর্ণ হইয়া ইউরোপের বিলাসিতাপূর্ণ আকাশে এক স্পন্দনের সঞ্চার করিয়া দিয়া গেল। যে দুর্লভ সহানুভূতির পুত প্রবাহে সকল ভেদ ভাসিয়া যায় সেই সহানুভূতি ও প্রেমের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মৃত্যুকালেও তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন, “There are millions of suffering people in the world, why are there so many of you around me?” অর্থাৎ “পৃথিবীতে কোটি কোটি ক্লিষ্ট জীব রহিয়াছে, তাহাদের ত্যাগ করিয়া তোমরা এত লোকে আমার কাছে রহিয়াছ কিসের জন্ত?” মৃত্যুর সম্মুখে বসিয়া, সকল জালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যিনি এই কথা উচ্চারণ করিতে পারেন, জানি না তাঁহার হৃদয় কতখানি ভালবাসার ও সহানুভূতিতে পূর্ণ।

য স্নেহের স্পর্শে, প্রেমের স্পর্শে তিনি
মাপনার হৃদয়-বীণাকে স্পন্দিত ও ঝঙ্কত
করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন, আমরা যদি
তাঁহার বিন্দুমাত্রও লাভ করিতে পারি তবে
জীবন ধন্য মানিব। হে অমৃতের পুত্র, তুমি
যে অনন্ত পুণ্যলোকে নিজের অমর আত্মাকে
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে সেই লোকের দিকেই
যদি আমরা আমাদের চিত্তকে সতত উন্মুখ
রাখিতে পারি, তবে তোমার এই পৃথিবীতে
জন্মগ্রহণ ধন্য হইবে ও আমরাও ধন্য হইব।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার।

টলষ্টয় সম্বন্ধে লিখিবার ও জানিবার কথা
এত আছে যে তাহা একরূপ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রকাশ
করা সম্ভব নহে। যদি সুবিধা হয় ত পরে
তাঁহার আলোচনার চেষ্টা করিব। আজ
কেবল তাঁহার জীবনের দুই চারিটি মূলমন্ত্র
সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব মাত্র।

টলষ্টয় তাঁহার জীবনে যে মহামন্ত্র
জগতকে দান করিয়াছেন সংক্ষেপে বলিতে
গেলে সেটি হচ্ছে—“আঘাতের দ্বারা অসংকে
বাধা দিও না; সর্বাগ্রে আপনাকে সম্পূর্ণ
করিতে যত্নবান হও।”

তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগ হইতেই তিনি
পুস্তক লিখিতে আবস্ত করেন। কিন্তু একরূপ
কর্ম্মে তাঁহার সন্তোষ জন্মিল না। তাঁহার মনে
হইল যে তাঁহার শিক্ষা দিবার যথার্থ সামগ্রী
তিনি জীবনে কি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা
ভাল করিয়া না জানিয়া, শিক্ষকরূপে জগতের
সম্মুখে দাঁড়াইতে—তিনি অধিকারী নহেন।
এই মনে করিয়া টলষ্টয় রাজধানী সেন্ট
পিটার্সবার্গ ত্যাগ করিয়া এক পল্লীগ্রামে
গমন করিলেন; এই স্থানেই তিনি জন্মগ্রহণ

করেন এবং জীবনের অধিকাংশকাল অতি-
বাহিত করেন। টলষ্টয় বলেন যে পঞ্চাশ
বৎসর বয়সে জীবনের কর্ম্ম ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে
তাঁহার মতের পরিবর্তন হয়, কিন্তু আমরা
তাঁহার প্রথমজীবনের লেখার মধ্যেই তাঁহার
পরজীবনের মতের অক্ষুর প্রচ্ছন্ন দেখিতে
পাই। বিলাসবহুল জীবনের আবরণে তাহা
তাঁহার অন্তরের অগোচর ছিল মাত্র।

এইভাবে একদিন তাঁহার অন্তরে এই
মহাপ্রশ্ন জাগিয়া উঠিল—আমার এ জীবনের
অর্থ কি? তাঁহার মনে হইল এ প্রশ্নের
মৌমাংসা করিতে না পারিলে, তাঁহার জীবন-
ধারণ অসম্ভব।

কত দীর্ঘ দিন বিনিদ্র রাত্রি ধরিয়া তিনি
এই তত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন—কিন্তু
কোন পথেই তাহার যথার্থ উত্তর খুঁজিয়া
পাইলেন না। অবশেষে সলোমন, বুদ্ধ
প্রভৃতি মহাপুরুষগণের অদৃষ্টে যাহা ঘটয়াছিল
টলষ্টয়ের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল। তাঁহার
মনে হইল এ জীবনটা কেবল পাপ তাপ
যন্ত্রণাময়! নিজে কিছু নিস্পত্তি করিতে না
পারিয়া তিনি বিজ্ঞানবিদগণের নিকটে যাইয়া
উপাস্থত হইলেন। তাঁহারা এ বিষয়ে আধু-
নিক অভিব্যক্তিবাদের বচন ছাড়া আর কিছুই
বলিতে পারিলেন না। টলষ্টয় জিজ্ঞাসা
করিলেন “আমি এ পৃথিবীতে আসিলাম
কিসের জন্ত?” বিজ্ঞানবিদেরা উত্তর করি-
লেন “আমরা এ পৃথিবীতে আসিলাম কি
উপায়ে!” উভয়ে সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন!

ইহাদের নিকটে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া
টলষ্টয় ধর্ম্মযাজকদিগের নিকটে যাইয়া উপস্থিত
হইলেন। ইহারা প্রশ্নটাকে স্বীকার করিলেন

বটে, কিন্তু কোন সম্পূর্ণ উত্তর দিতে পারিলেন না। মানুষ যুদ্ধের নামে যে ভীষণ স্বৈচ্ছাকৃত হত্যাসাধন করিয়া থাকে, সেইটাই টলষ্টয়ের অভিজ্ঞতার এ পৃথিবীর হীনতম অসৎ ব্যাপার। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে এই সকল ধর্মযাজক যে কেবল যুদ্ধ নিবারণে সচেষ্ট নহেন তাহা নহে, অনেকেই ইহার পক্ষে সমর্থনেব জগু বিশেষ উৎসাহী। কেবল তাহাই নহে, প্রেম ও ধর্মের নামে তাহারা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে অশেষ প্রকারে নির্যাতন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এক ধর্মের মধ্যেও এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের ঘোর বিরোধী এবং পরস্পরের অনিষ্টসাধনে সততই সচেষ্ট। তিনি এই ধর্মযাজকগণের মতামুগারে আপনাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর্যামী সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না।

পরে তিনি প্রাচ্যদেশের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অবশেষে বাইবেলের মধ্যেই তিনি তাঁহার মহাপ্রশ্নের সর্বাপেক্ষা সরল ও সুন্দর উত্তর দেখিতে পাইলেন। জন্ম, মৃত্যু, জীব ও জগদীশ্বর সম্বন্ধে মত জগতের সকল ধর্মগ্রন্থেই প্রায় এক, কিন্তু তিনি তাঁহার নিজেদের ধর্মগ্রন্থেই জীবনের সত্যকে উজ্জ্বল ভাবে উপলব্ধি করিলেন।

যাহা হউক টলষ্টয় অবশেষে জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে উত্তর পাইলেন তাহা এই, — যাহা সৎ তাহাকে উপলব্ধি করিবার এক শক্তি আমার মধ্যেই নিহিত আছে, এবং 'আমি সেই শক্তির সহিতই যুক্ত রহিয়াছি; আমার বিচার ও বিবেক সেই শক্তি হইতেই

উদ্ভূত। এই শক্তির ইচ্ছা সম্পন্ন করাই আমার এ অস্তিত্বের উদ্দেশ্য, অর্থাৎ মঙ্গল সাধনই আমার ধর্ম।

যীশুখ্রীষ্টের যে প্রসিদ্ধ দ্বাদশটি আজ্ঞা বা উপদেশ আছে, তাহার মধ্যেই টলষ্টয় আমাদের জীবনের সকল নীতি পাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে যীশুর নিম্নলিখিত পাঁচটি উপদেশ পালন করিলেই, এমন কি পালন করিতে চেষ্টা করিলেও আমাদের মানবসমাজের জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া যায় :—

- (১) কদাচ ক্রোধ করিবে না ;
- (২) কদাচ ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইবে না ;
- (৩) বিবেক ভিন্ন অপর কাহারও বশতা-স্বীকার করিবে না ;
- (৪) তোমার মতের বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্ট করিবে না ;
- (৫) শত্রু মিত্র সকলকেই ভালবাসিবে।

টলষ্টয় বলিতেন অমঙ্গলকে নষ্ট করিয়া মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করিবার দুইটি উপায় আছে। প্রথম পথটি জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা চিরদিনই অবলম্বন করিয়াছেন। এই পথ অবলম্বন করিতে হইলে, প্রথমে সকল বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্য অনুসন্ধান করা আবশ্যিক পরে সতেজে সেই সত্য প্রকাশ করা আবশ্যিক এবং জীবনে সেই সত্য পালন করিতে চেষ্টা করা আবশ্যিক। উদ্ভিদরাজ্যে বৃষ্টিধারা ও সূর্য্যকিরণের গ্রায় লোকের জীবন প্রভাব জনসমাজের মধ্যে নীরবে ব্যাপ্ত হইয়া ক্রিয়া করিতে থাকে। এই প্রভাবের স্রোত দেশে দেশে, যুগে যুগে প্রবাহিত হইতে থাকে।

দ্বিতীয় পথের লোকেরা অপরের কৃত্য সম্বন্ধে একটা ধারণা স্থির করিয়া পরে

আবশ্যিক হইলে বলপ্রয়োগ পর্য্যন্ত করিয়া
অপরকে নিজের ধারণানুসারে চলিতে বাধ্য
করে। কিন্তু এ প্রভাব সেই সকল ব্যক্তির
জীবনব্যাপী মাত্র—জীবনান্তে তাহা ইষ্ট
অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক করিতে থাকে।

ভারতের আৰ্য্য সম্ভানের নিকটে এ সত্য
ও তত্ত্ব চিরপুরাতন। কিন্তু পাশ্চাত্যের

শিক্ষা দীক্ষা সাধনার মধ্যে থাকিয়া এই সত্য
উপলব্ধি করা ও জীবনে পরিণত করার জগুই
টলষ্টয়ের মহত্ব। এই সত্যের সহিত পরিচিত
হইবার পর হইতে টলষ্টয় ধন জন বিলাস সুখ
ত্যাগ করিয়া ভোগত্যাগী হিন্দুর জায় জীবন
অতিবাহিত করিতেন।

শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

রাবণ বধ ।

বঙ্গের প্রায় প্রত্যেকেই রামচন্দ্রের
ছুর্গোৎসব এবং রাবণবধের বিষয় রামায়ণপাঠে
অবগত আছেন। বিকানীর রাজ্যে দশহরা
ও দীপাবলীর সময় এই পর্ব যেরূপে সম্পন্ন
হয় তাহা বেশ একটু কৌতুকজনক। নিম্নে
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

প্রাচীন বিকানীর রাজ প্রাসাদ অতি সুদৃঢ়
প্রস্তর নির্মিত অত্যাচ প্রাচীর বেষ্টিত কেল্লার
ভিতরে অবস্থিত। আজও পর্য্যন্ত সিংহাসন সেই
পুরাতন প্রাসাদেই। কেল্লার ভিতরে অনেক
দেবদেবীর মন্দিরও আছে। বর্তমান মহারাজা
কেল্লা হইতে দেড়মাইল দূরে নব্যধরণের এক
প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া তথায় অবস্থান
করেন। দেবদেবীর পূজা কিম্বা দরবার
উপলক্ষে তিনি প্রাচীন প্রাসাদে গমন করেন।
দশহরার দিন মহারাজার জন্মদিন; তাই সেদিন
ঠাহাকে দেবীর আরাধনায় এবং জন্মোৎসব
দরবারে যোগদান করিতে পুরাতন প্রাসাদে
আসিতে হয়। নেটিবগণ অর্থাৎ ভারতীয় সমস্ত
অফিসার দরবারে এবং দেবী নিকেতনে নিমন্ত্রিত
হইয়া থাকেন। দশহরার দিন এগারটার সময়
যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া আমরা মহারাজার

আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায়
একটার সময় তিনি কেশরিয়া অর্থাৎ হলুদ
রঙের আচকান, ছাকা এবং হীরক ও মণিমুক্তার
হারে ভূষিত হইয়া দেবী পূজায় অগ্রসর হইলেন।
এবং একে একে কয়েক জায়গায় পূজা সমাপ্তির
পর দরবারে উপস্থিত হইয়া সিংহাসনে আসীন
হইলেন। দরবার প্রকোষ্ঠ কিম্বা কারুকার্য্যখচিত
সিংহাসন এবং সুবর্ণস্তম্ভোপরি চক্রাতপাদির
বর্ণনায় প্রবন্ধকলেবর বৃদ্ধির আবশ্যিকতা
দেখি না। রাজা সিংহাসন গ্রহণ করিলেন;
পশ্চাদ্দেশে এক ব্যক্তি শাসন দণ্ড, দ্বিতীয়
ব্যক্তি ঢাল তরবার এবং তৃতীয় ব্যক্তি
চামর লইয়া দাঁড়াইল। চিরন্তন প্রথানুযায়ী
নজর সেলামী হইয়া গেল। তার পর রাজা
অপর আঙ্গিনায় গিয়া সাধারণের সেলামী
গ্রহণ করিলেন এবং তিন চারি জন স্থানীয়
লোককে জন্মদিনের উপাধি অর্থাৎ অমুগ্রহ
সূচক নিদর্শন প্রদান করিলেন। এদিকে
গরীবদের ভিতর স্থানে স্থানে আহাৰ্য্য বণ্টন
হইতে লাগিল। এইরূপে প্রায় বেলা শেষ
হইয়া আসিল। একটা কথা উল্লেখ করিতে
ভুলিলাম। দরবারের সময় প্রাঙ্গণে

নর্তকীগণ দল বাঁধিয়া মাজলিক গীত গাইতেছিল।

তার পর সন্ধ্যার প্রাকালে রাবণবধের জন্ত বিশেষ আয়োজন চলিতে লাগিল। কেলা হইতে আনুমানিক অর্ধমাইল দূরে মাঠের ভিতর ৪।৫ ফুট উচ্চবেদির উপর একখানা ২০ ইঞ্চি পরিমিত রাবণ চিত্র দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছে। কেলা হইতে চিত্র পর্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে ষ্টেটের সমস্ত সশস্ত্র অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য শ্রেণী বাঁধিয়া মহারাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং হাজার হাজার দর্শকের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিতেছিল। আনুমানিক ৬টার সময় রাজা রাবণ বধ করিতে অশ্বারোহণ করিলেন। এইখানে বলা আবশ্যিক বিকানীর রাজা দেববংশ সম্বৃত বলিয়া বিবেচিত। আমরা পদব্রজে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। সুখের বিষয় রামানুচরের ঞায় রাজার অনুসরণে আমরাদিগকে সেতুবন্ধনের জন্ত কোনরূপ প্রয়াস পাইতে হয় নাই। তবে কিনা অফিসারদিগকে পদব্রজে অর্ধমাইল যাইতে আসিতেই অনেকটা অবসন্ন হইতে হইয়াছিল। যে রাজপুত্রগণ অনশনে অনিদ্রায় দিনরাত বিজনকাননে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্ষণেকর তরেও ক্লান্তি বোধ করিতেন না আজ তাঁহাদের বংশধরগণ এক মাইল পথ চলিতেও কাতর। এখানে দেখিতে পাই পঁচিশ ত্রিশ টাকা বেতনের কেরাণীও পদব্রজে চলিতে ফিরিতে কিম্বা সিকি মাইল দূরস্থ আফিষে যাইতে লজ্জা বোধ করেন। পতিত জাতির যতটা অধঃপতন সম্ভবপর তাহা হইয়াছে। যাহা হউক রণসাজে সাজিয়া যখন দশস্কন্ধ-

রাবণকে বধ করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম তখন বাস্তব ঘটায় দিগ্‌মণ্ডল নিনাদিত হইতে লাগিল। কতক দূর অগ্রসর হইলে পর মিছিল থামিয়া গেল। মহারাজা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া এক কুল বৃক্ষের নীচে দেবীর আরাধনায় নিয়োজিত হইলেন। পুরোহিতগণ সজোরে মন্তোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কুলবৃক্ষ এবং খেজুরি নামক এক জাতীয় বাবুল এ অঞ্চলে অতি পবিত্র। প্রায় অর্ধ ঘণ্টায় দেবীর আরাধনা সমাপ্ত হইল; তৎপর একটা ছাগশিশুর হত্যার পর মিছিল সোৎসাহে রাবণের দিকে ছুটিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া পৌঁছিলাম। দশস্কন্ধ রাবণকে বধ করিব বলিয়া এক মন্তু আশা পোষণ করিতেছিলাম কিন্তু সেখানে গিয়া এক মাথা এবং দুই হাত বিশিষ্ট রাবণকে দেখিয়া একটু উৎসাহ যেন কমিয়া গেল। রাজা পুনরায় অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, এবং ধনুর্বাণ হস্তে লইয়া প্রায় পাঁচ হাত দূর হইতে রাবণকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন। তীক্ষ্ণশর রাক্ষসরাজ রাবণের বক্ষভেদ করিয়া দূরে চলিয়া গেল। এদিকে অনুচরবর্গ ক্ষিপ্ৰহস্তে রাবণচিত্রকে ধণ্ড বিধণ্ড করিয়া ধূলিসাৎ করিল। এমন কি ঐ চিত্র যে ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান ছিল সে ভিত্তির উপরের স্তর পর্যন্ত দূরে নিক্ষিপ্ত হইলে পর অনুচরগণের আক্রোশ প্রশমিত হইল। রাবণ চিত্রের টুকরা এখানে মাজলিতে পুরিয়া ছেলে-মেয়েদের গলায় দেওয়া হইয়া থাকে; উহাতে নাকি তাহাদের ব্যারাম পীড়ার আশঙ্কা কম থাকে। রাবণের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দিক জয় ধ্বনিতে নিনাদিত হইতে লাগিল, তোপ-

খানার ১০১টী তোপ ধ্বনিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে চতুর্দিকে বিজয় সন্দেশ বিজ্ঞাপিত হইয়া গেল। জয়োল্লাসে মাতোয়ারাপ্রায় আমরা মহাসমারোহে কেল্লায় প্রত্যাবর্তন করিলাম। ফিরিবার বেলায় মহারাজা স্তব্ধ এবং মণি-মুক্তাধচিত হাওদা এবং আন্তরণে ভূষিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। প্রায় আটটার সময় আমরা নিজ নিজ বাড়ীতে চলিয়া আসিলাম।

দ্বিতীয় দিবস পুনরায় নজরসেলামীর দরবার বসিল এবং পূর্বদিনের গায় সেলামী হইয়া গেল। প্রথম দিন জন্মোৎসব এবং দ্বিতীয় দিবস দশহরা উপলক্ষে সেলামী। দরবারের পর আমরা এক আঙ্গিনা বিশেষে সম্মিলিত হইলাম, সেখানে আমাদের ভিতর “জোয়ারী” অর্থাৎ দশহরার বক্সিস্ বা পাবিতোষিক বিতবিত হইল। আমরা প্রত্যেকেই দুইটি টাকা এবং ছয়টি নারিকেল পাইলাম। পূর্বে প্রত্যেককে একটি বিকানীর ষ্টেট মুদ্রা এবং একটি ব্রিটিশ মুদ্রা প্রদত্ত হইত। কিন্তু আজকাল বিকানীব ষ্টেটে মুদ্রা প্রস্তুত না হওয়ায় এবং সঞ্চিত বিকানীরী মুদ্রা নিঃশেষিত হওয়ায় এ বছর হইতে দুইটাই ব্রিটিশ মুদ্রা দেওয়া হইয়াছে।

দেওয়ালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াই আজ এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এ অঞ্চলে দেওয়ালীতে মহাসমারোহ হইয়া থাকে। বঙ্গের ছোট বড় ধনী দরিদ্র সকলেই যেমন দুর্গোৎসব ব্যাপারে মহাব্যস্ত; এখানে সেইরূপ দেওয়ালীতে সকলেই ব্যস্ত। এমন কি, দীনদরিদ্রগণ পর্য্যন্ত এখানে একবেলা ভোজন করিয়াও দেওয়ালীর জন্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চয়

করিয়া থাকে। এখানে ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে প্রস্তর অথবা ইষ্টক নির্মিত পাকা দালান এবং গরীবের কাঁচা দালান বা কোঠা-বাড়ী, বঙ্গের গায় কাহারও বাড়ীতে খড়ের ছাউনী নাই। দেওয়ালীর প্রায় একমাস পূর্ব হইতেই সকলে বাড়ী ঘর, পরিষ্কার করিয়া কোঠাগুলি অনেকটা গেরুয়া রঙের একপ্রকার মাটীতে লেপ দিতে আরম্ভ করে। তারপর উঠান এবং দরজার চারিদিক আলিপনাচিত্রিত হইয়া থাকে। পিতা মাতা ভাই বন্ধু কোন নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে এক বৎসর কাল ইহারা বাড়ী ঘর রং করে না; যেহেতু ঐ বৎসর ইহাদের শোকের বৎসর।

কার্ত্তিকের অমাবস্তার দিন প্রধান দেওয়ালী। এ অঞ্চলে দেওয়ালী তিন দিন। ত্রয়োদশীর দিন যম দেওয়ালী, চতুর্দশীতে কালী দেওয়ালী এবং অমাবস্তার দিন রাণী দেওয়ালী। প্রথম দুইদিন অর্থাৎ যম এবং কালী দেওয়ালীতে ততটা সমারোহ হয় না। কোন কোন জায়গায় কিছু আলোকমালা এবং আতসবাজী দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বঙ্গে শ্রামাপূজার দিন অমাবস্তা রাত্রি দীপাবলিতা হইয়া থাকে এখানে ঐদিন লক্ষ্মী পূজা। ঘরে ঘরে একখানা লক্ষ্মীদেবীর চিত্র টাঙ্গাইয়া গৃহস্বামীগণ সেদিন নিজে নিজেই উহার পূজা করিয়া থাকে। কোন কোন অবস্থাপন্ন ব্যক্তির বাড়ীতেই পুরোহিত আসে। চিত্রের সম্মুখে নারিকেল, গুড়, চিনি, লাড়ু, ভাজাভূজি প্রভৃতি রাখা হয়। রাণী দেওয়ালীর দিন এবং তার পর দিন শুধু আফিস নহে বাজারের ক্রয় বিক্রয় এবং কৃষকের কর্ষণ প্রভৃতিও বন্ধ থাকে। আমাদের

অঞ্চলে সরস্বতী পূজার দিন যেমন দোয়াত পরিষ্কার করা হয় এবং স্বদেশী নলের কলম ব্যবহার করা হয় এ অঞ্চলে দেওয়ালীব দিন সেইরূপ পরিষ্কার দোয়াত, নলের কলম, স্বদেশী কালী, এবং জয়পুরী কাগজ ব্যবহার করা হয়। ঐ দিন যেন হালখাতার কাষ আরম্ভ হয়, ষ্টেটের ভিন্ন ভিন্ন অফিসেও ঐ দিন হইতে নূতন জিনিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রাণী দেওয়ালীর দিন রাত্রিতে খুব সমা-
রোহ। আলোক মালায় অমাবস্তার রাত্রিও
যেন দিনের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠে। বিকানীর
সহরে অনেক লক্ষপতির বাস;—যদিও এ রাজ্য
রাজপুতানার মরুভূমিতে অবস্থিত তথাপি
বিকানীরে যত ধনাঢ্য বণিকের বাস ভাবতের
আর কুত্রাপি—তেমন নাই; এই জন্ত বিকা-
নীর ভারতের চিকাগো নামে পরিচিত।
বিকানীর রাজ্যে ছয় শতের উপর লাখপতি,
ইহার মধ্যে আবার কতকগুলি ক্রোরপতি, অথচ
এ মরুভূমিতে কৃষি নাই বলিলেও চলে; যত কিছু
ধনৈশ্বর্য্য সমস্তই বাহির হইতে আহরিত।
যে ব্যবসাবাণিজ্যের প্রতি এতদিনে বাঙ্গালীর
মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে শুদ্ধ সেই ব্যবসা-
তেই ইহারা লাখপতি ক্রোরপতি হইয়া দাঁড়া-
ইয়াছে। ইহাদের অনেককে কলিকাতা
বোম্বে প্রভৃতি বড় বড় সহরে নিঃসম্বল গিয়া
ফেরিওয়ালার কাষ পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে।
অনেককে প্রথম অবস্থায় স্বেচ্ছা কাপড়ের বস্তা
লইয়া “খুতি, সাড়ি, কাপড়” “এক টাকায়
তিন খানা কাপড়” বলিয়া গলিতে গলিতে
ফেরি করিয়া ঘুরিতে হইয়াছে। বাণিজ্যে
বাস্তবিকই লক্ষ্মীর বাস, তাই এ অঞ্চলে
দেওয়ালীতে লক্ষ্মীপূজার এত জাঁক। বিকানীর

সহরে ধনী বণিকদের মূল্যবান প্রস্তর অট্টালি-
কার সংখ্যা যথেষ্ট। সেদিন বোম্বের দেওয়ালী
বিবরণীতে দেখিয়াছি যে তাড়িতালোক
আজকাল তেলের বাতির স্থান দখল করি-
য়াছে। এখানে রাস্তা ঘাট এবং রাজপ্রাসাদ
তাড়িতালোকে উদ্ভাসিত হইলেও পর্কোপলক্ষে
তাড়িত আলোকমালার বন্দোবস্ত এখনও
হয় নাই। কিন্তু তাড়িতের আলো না
হইলেও সেদিন মাড়োয়ারী বণিকদের বাড়ী
আলোক রশ্মিতে ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছিল।

উপসংহারে ষ্টেটের দেওয়ালী উৎসব
সম্বন্ধে দুই একটা কথা উল্লেখ করিব। রাণী
দেওয়ালীর দিন সন্ধ্যাবেলায় আমরা নির্দিষ্ট
সময়ে কেলায় সমবেত হইলাম, কিছুক্ষণ পরে
মহারাজা নূতন প্রাসাদ হইতে কেলায় উপস্থিত
হইয়া লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে গিয়া দেবী অর্চনা
করিলেন। তার পর সকলে পদব্রজে প্রাসাদের
বাহিরে অপর এক মন্দিরের বারেন্দায় গমন
করলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কয়েকজন
ব্যক্তি সমাগত প্রত্যেকের হাতেই দুইটা করিয়া
মশাল দিল। মশালগুলি অনেকটা
আমাদের হাওয়াই বাজীর মত, নলের
মাথায় তেলের ছোট ছোট মশাল।
প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে একটা সুসজ্জিত
বলদ রক্ষিত হইতেছিল। আমরা সকলে মসালে
আগুন লাগাইয়া মহাবাজা নিক্ষেপ করার পর
একসঙ্গে মশালগুলি বলদের দিকে নিক্ষেপ
করলাম। বলাবাহুল্য মশালগুলি মাত্র পাঁচ
হাত দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। তার পর
বলদকে তথা হইতে লইয়া গেল। অনেককে
জিজ্ঞাসা করিয়াও ইহার কারণ বুঝিয়া উঠিতে
পারিলাম না। অনেকেই বলিল, প্রাচীন কাল

হইতে এই প্রথার প্রচলন আছে। কারণ অমু-
সন্মানে তাহারা নিতান্তই নিস্পৃহ। তার পর
মহারাজা এক শিবিকা বা দোলনার
চড়িয়া অপর এক মন্দিরে চলিলেন, আমাদের
কাষ ঐ পর্য্যন্তই শেষ হওয়ার আমরা বাড়ী
ফিরিলাম। মশালগুলি সাধারণ লোকে
কুড়াইয়া লইল। উহা ঘরে থাকিলে নাকি
অসুখ বিসুখের আশঙ্কা কম থাকে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় আবার আমরা
কেল্লায় সমবেত হইলাম। সেদিন মহারাজা
উপস্থিত হইতে পারেন নাই। শাসন দণ্ড, চামর,
ঢাল তরওয়ার প্রভৃতি তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ
ধরিয়া লওয়া হইল। মন্দিরে মন্দিরে পূজা হইল,

তার পর প্রাসাদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে হাতি দৌড়,
এবং ঘোড়াদৌড় দেখিয়া রাত্রি আটটার বাড়ী
ফেরা গেল। পরদিন প্রাতে অনেকটা বাজালা
দেশের বিজয়া সন্তোষণ। জাপানের ঞ্চার সকলে
পরস্পর দেওয়ালীর রাম রাম জানাইতে বাহির
হইলাম। ঐ দিবস এগারটার সময় নজর
দরবার বসিল। মহারাজা সশরীরে উপস্থিত না
হওয়ার সিংহাসন দণ্ড প্রভৃতিকে প্রতিনিধি
ধরিয়া নজর সেলামী শেষ করা হইল। তার
পর দশহরার ঞ্চার আমরা প্রত্যেকে নারিকেল
এবং দুই টাকার জোয়ারী লইয়া ঘরে
ফিরিলাম।

শ্রীষহুনাথ সরকার ।

অন্তঃপুর প্রসঙ্গ ।

লক্ষ্মীর শ্রী ।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার আবশ্যকতা
বুঝিলে কোনও বিজ্ঞানগ্নে শিকার জন্ত যাইতে
হয় না। মহিলাগণ নিজে নিজেই ঘরে
ঘরে সে ব্যবস্থা করিতে পারেন। আমরা
স্বভাবতঃ এক হিসাবে অপরিষ্কার। “বিছানা
শেষ” মাসান্তেও ধোপার বাড়ী যায় না
এমন গৃহস্থ বিস্তর। পরিধেয় বসন নিত্য
তিন চার বার ধোয়া হয়—কিন্তু মলিনতার
দিকে দৃষ্টি আদপে আমাদের নাই! অনেকে
বলিবেন যে “আমরা চব্বিশ ঘণ্টা রান্না
বান্না নিয়া ছেলে পিলে নিয়া ব্যস্ত থাকি ;
আমরা গরীব মানুষ—আমাদের মেম সাজিবার
অবসরও নাই, অত ধোপার কড়ি দেবার
পরসাত নাই।” এক কথায় ইহা সকলেরই

সঙ্গত মনে হইবে। কিন্তু আলোচনা করিয়া
দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে অবসর বা
অভাবের জন্ত যে আমরা সর্বদা অপরিচ্ছন্ন
থাকি তাহা নহে; সে দিকে আমাদের
দৃষ্টি নাই বলিয়াই আমরা অপরিচ্ছন্ন থাকি।

ছেলেবেলা গল্প শুনিয়াছি রাজকন্ঠা
“গোসা” ঘরে গিয়া শয়ন করিয়া আছেন
শুনিয়া রাজা রাণী অস্থির—“কেন মা
তুমি রাগ করিয়া কাঁদিতেছ কেন।”
অনেক সাধ্য সাধনায় রাজকন্ঠা বলিলেন
—“আমার ধূলামুঠি কাপড় চাই।” তখন
রাজা ও রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন
—“তুমি আমাদের সর্বস্ব—সাত রাজার ধন
এক মাণিক, আর যা চাও তাই দিব—কিন্তু

ধূলামুষ্টি কাপড় দিতে পারিব না।” এই কথার অর্থ এই যে, শিশু খেলা করিতে করিতে অপরিষ্কার হাতে মুঠা করিয়া কাপড় ধারবে সেই অপরিষ্কার কাপড় তিনি চাহেন অর্থাৎ তাঁহার সন্তান হয় নাই তাই মনঃকষ্ট। অতএব দেখা যাইতেছে শিশু সন্তান ঘরে থাকিলেই ঘরদ্বার পার্শ্বের বসন প্রভৃতি অপরিষ্কার অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এবং ইহাও সত্য যে রাজকন্তারা যে “ধূলামুষ্টি কাপড়” পরিভেন তাহা অসচ্ছলতা বশতঃ নহে অভ্যাস বশতঃ।

এই যে সর্বদা অপরিচ্ছন্ন থাকা আমাদের অভ্যাস ইহা আমাদের বহুদিনের। ধনীগৃহেও ইহার প্রচলন খুব বেশি। প্রচুর দাস দাসী থাকিলেও ঘর দ্বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেও বিছানা বা শিশু সন্তানের কাপড় চোপড় বা মহিলাদের বসন সর্বদা মলিন দেখা যায়। অনেক সুশিক্ষিত ভদ্রলোকের এখনও এমন বিশ্বাস যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেই সে “বাবু” সে “অকম্পন্য”। সামান্য আয়াসেই যে পরিচ্ছন্ন থাকা যায়—ইহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। রেলওয়ে স্টেশনের ধারে ধারে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাম্বচারীদের বাসা দেখা যায়—তাহা দেখিবা মাত্রই বুঝিতে পারা যায় যে ইহাতে বাঙ্গালী অথবা ফিরিঙ্গী বসবাস করিতেছেন। সেই একই বাড়িতে কখনও বাঙ্গালী কখনও ফিরিঙ্গী বাস করেন—কিন্তু ফিরিঙ্গী হইলেও তাহার শ্রী ও পরিচ্ছন্নতা সকলের দৃষ্টি যে বিশেষ করিয়া আকর্ষণ করে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই ফিরিঙ্গী যে ধনী এবং তাঁহার দাস দাসী

যে অনেক তাহা নহে—কেবল অভ্যাস বশেই তাঁরা পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারেন। অভাব যদি অপরিচ্ছন্নতার মূল হইত তবে ধনী গৃহে অপরিচ্ছন্নতা দেখা যাইত না। আমাদের একটী ধনী আত্মীয়া মহিলা সর্বদা দুই তিন সের সোণার গহনা পরিধান করিয়া থাকিতেন—কিন্তু মলিন বস্ত্রের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার সন্তানাদি ছিল না তথাপি আমি কখনও পরিষ্কার বস্ত্র পরিভেন দেখি নাই। কেবল একদিন কোন নিমন্ত্রণ স্থলে প্রচুর অলঙ্কার ও বহুমূল্য বারাগসী বস্ত্রে ভূষিত দোখিয়া-ছিলাম। আমাদের দেশে অপরিচ্ছন্নতা অর্থাৎ মলিন বস্ত্র পরিধান বিনয়ের লক্ষণ। মাহলা-গণ নিমন্ত্রণে বারাগসী বোম্বাই শিক প্রভৃতির সাদু পায়রা গিয়াছেন—বসিবার জন্ত আসন দিবার অপেক্ষা করিয়া থাকা অসম্ভব; “বড় মানুষের” পরিচায়ক; অতএব পরিষ্কার বসন যতই বহুমূল্য হউক না কেন “বুপ” করিয়া যেখানে সেখানে বসিয়া না পড়িলে নিন্দার ভাজন হইতে হয়। এই সকল ভাবলে দেখা যায় যে অপরিচ্ছন্নতা আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। আচার অনুষ্ঠানের ক্রটির দিকে যেমন আমাদের ধর দৃষ্টি অপরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি একেবারেই নাই। উঠানের এক কোণে নিকান’ পৌছান তুলসী মঞ্চ—আর এক কোণে আবর্জনার রাশি। সে আবর্জনা যদি প্রতিদিন বেড়ার ও পারে ফেলা হইত তবে উঠানটি ত পরিষ্কার থাকিত। ইহাতে কিছুমাত্র ব্যয় হইত না। মুষ্টি মুষ্টি আবর্জনা জমা হইয়া এখন একটা ভূতের বোঝা হইয়াছে এখন

আর পয়সা ব্যয় ভিন্ন পরিষ্কার হয় না।

পরিধেয় বসন সর্বদা অল্প আয়্যাসেই পরিষ্কার যে রাখা যায় তাহা অনেকেই জানেন। প্রত্যহ নিয়মিত শিশুদের ও নিজেদের কাপড় গুলি যদি শুধু “জল কাচার” পরিবর্তে একটু সাবান দিয়া লওয়া হয় তবে সর্বদা পরিষ্কার থাকে। যথেষ্ট ময়লা না হইলে সামান্য সাবান ও অল্প সময়েই কাপড় পরিষ্কার হয়! অনেক মহিলাকে দেখা যায় সস্তানদের জামাটা কিম্বা ধুতি খানা লইয়া ছেলেকে হুধ খাওয়াইতে বসিলেন তার পর তাহাতে হুধ মোছা কাদা মোছা শেষে ঘর শুদ্ধ মোছা হইল—তাব পর জলে ধুইয়া দেওয়া হইল পর দিন আবার বালক তাহাই পরিবে। এই প্রকারে যে বস্ত্র ময়লা হয় তাহা শুধু জলে কেন ধোয়ার বাড়ী গিয়াও ভালরূপ শাদা হয় না। অতএব কাপড় গুলি যাহাতে যত কম ময়লা হয় প্রথমে পরিবারস্থ সকলের সে দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। জামা কাপড়ে কোন মতেই কাদা ধুলা পোঁছা উচিত নহে। অনেক মহিলার আঁচলে হাত মোছা অভ্যাস আছে। তরকারী খাইয়া হাত ধুইয়া আঁচলে হাত মুছিলে তেল ঘি হলুদ কাপড়ে মাখামাখি হয়। এ সকল পরিহার করা কর্তব্য। তার পর নিত্য স্নানের সময় নিজ নিজ পরিধেয় বসন ও শিশু সস্তানদের কাপড় গুলি নিয়মিত সাবান দিয়া ধুইয়া দিলে বিশেষ সময় বা পয়সা ব্যয় হয় না। প্রত্যহ এক পয়সার সাবানে ৪।৫ খানা বড় ধুতি ও ছোট ছোট তোয়ালে রুমাল মোজা

প্রভৃতি ৫।৭ খানা অনায়াসে ধুইয়া লওয়া যায়। ইহাতে ধোবার ব্যয়ও কমান যায়। যাহাদের দাসদাসীর অপ্রতুল নাই তাঁহারা নিয়মিত দাসদাসীদের দ্বারা সাবান দিয়া কাপড় ধোয়াইতে পারেন। তবে যাহারা মনে কবেন যে সাবানের একটা পয়সা থাকিলে মোহন ভোগ কিনিয়া দিব, এবং যতক্ষণ কাপড় ধুইব ততক্ষণ একটু গড়াইয়া বাঁচিব, তাঁহাদের প্রতি নিবেদন এই যে, সাবানে সাবান খরচ করিলে চারি আনার বারসোপে এক মাস চালান যায়। কি ধনী দরিদ্র ভাত সকল ঘরেই রান্না হয়। এই ভাতের ফেনে একটু সাবান ফেলিয়া গুলিয়া তাহাতে ৪.৫ খানা কাপড় বেশ পরিষ্কার হয়। একটু গরম গরম আছড়াইয়া লইলে শীঘ্র ময়লা দূর হয়।

সকলেই অনুভব করিতে পাবেন যে যেদিন ধোপা আসে সে দিন বেশ একটু সচ্ছন্দতা অনুভব করা যায়—মনটা প্রফুল্ল হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে মলিনতা অপ্রফুল্লকর।

অতি শিশুকাল হইতে মলিনতার দিকে যদি শিশু সস্তানের ঘৃণা জন্মাইয়া দেওয়া যায় তবে ক্রমশঃ বয়স বৃদ্ধির সহিত সে আপনিই অপরিচ্ছন্নতা হইতে দূরে থাকিবে। জল ঘাঁটিতে সকল শিশুই ভালবাসে; যে কোন কিছু আহারের পর হাত ধুইয়া দেওয়া বা হাত ধুইতে বলায় শিশুরা বিরক্ত হয় না। আমরা ভাত ব্যঞ্জনের বাটীটা যদি স্পর্শ করি তাহা হইলে হাত ধুইয়া ফেলি,—কিন্তু হুধের সরটা হাত দিয়া তুলিয়া বা রসগোল্লাটা ছেলেকে খাওয়াইয়া অনায়াসে কাপড়ে হাতটা মুছিয়া রাখিতে পারি।

কারণ তাহা সখড়ি নহে। এইজন্য সচবাচর দেখা যায় খাবার খাইয়া ছেলেরা হাত ধোয় না। তারপর সেই হাতে দুনিয়াব জিনিষ ধবে। কিছুকাল হইতে এই সকলে ঘুণা জন্মাইলে বালকবালিকা আপনা-আপনি ধূলাকাদা হইতে পরিধেয় বস্তাদি রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। ৪।৫ বৎসরের বালকবালিকা স্নানের সময় অনায়াসে নিজের নিজের কাপড় সাবান দিয়া ধুইয়া দিতে পারে।

একজন গৃহস্থেব বাড়ীতে প্রবেশ কর— বাড়ীব গৃহিণী কেমন তাহা “এক নজরেই” বোঝা যায়। সুগৃহিণীব যেখানে সেখানে যখন যাও দেখিবে সমস্তই পরিপাটি। আলনার কাপড়গুলি গোছান থাকিলে যে ঘরের কতখানি শোভা বৃদ্ধি হয়— বিশৃঙ্খলা কতখানি দূব হয় তাহা সুগৃহিণী বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। বাড়ীব মধ্যের সর্বোৎকৃষ্ট ঘরটিই আমাদের শয়নগৃহ— অতিথি যে কোন মহিলাই সেইখানে অভ্যর্থনা লাভ করেন। সেই ঘরে গিয়া দেখিবে একদিকে একখানা খাট তার আধখানা মসারি ফেলা আধখানা তোলা ২,৩টা বালিস এলোমেলো ভাবে পড়িয়া আছে— একখানা চাদর জড় করা আছে, একটী ছেলে ঘুমাইতেছে। ওধারে ঘোড়া তক্তা পাতা তার এক পাশে, কতক-গুলি লেপ কাঁথা বালিস স্তপাকৃতি, এ পাশে

কতকগুলি ছোট বালিস কাঁথা, ছোট ছেলের জামা ছড়ান, আর এক ধারে আলনার উপর কর্তার কামিজ কোট, গৃহিণীর ডুরে সাড়ী হইতে ছেলেদের সব কাপড়,—রাশিকৃত ময়লা ফরসা বিবিধ প্রকাবের বস্ত্রের বোঝা, আর দিকে আলমাবীর মাথায় রাজ্যের বাজে জিনিষ—ঘরের মেঝেতে দুধের বাটী বিহুক শালপাতা খাবারের গুঁড়া জল কাদা—ইহার মধ্যে কোন মতে আগছকের স্থান হইল। আর যাহাই হউক ইহা যে অশোভন তাহা অস্বীকার করা যায় না। সুগৃহিণীর ঘরে দ্বারে এমন দৃশ্য কোন সময়েই কখনও দেখা যায় না। ঘর দ্বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, মলিনতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করা যে কেবলমাত্র সুগৃহিণীর গৃহিণী-পনাম সাধিত হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। “সকড়ির বিচার” ও “ওচির আচারের” সহিত পরিচ্ছন্নতা মিলিত হইলে আমাদের প্রত্যেক গৃহস্থেব গৃহই সৌন্দর্য্যময় করিতে পারে। একজন দরিদ্র ফিরিঙ্গী মহিলার ঘর দ্বার যে আমাদের সম্ভ্রান্ত মহিলাদেব ঘর দ্বারকে দিকার দিতে পারে ইহা গোববেব বিষয় নহে। অশোভনতার দিকে দৃষ্টি পড়িলে অল্প আয়াসে ও স্বল্প ব্যয়ে ঘরে ঘরে পরিচ্ছন্নতা আনিতে পারা যায়। ইহাতে লক্ষীর শ্রীও বৃদ্ধি হয়।

সমালোচনা।

ঠগী কাহিনী। শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মাত্র। গ্রন্থখানি মেডোস টেলর রচিত সুবিখ্যাত সাঞ্চাল মল্লিক প্রণীত। হিতবাদী পুস্তকালয় হইতে ইংরাজী গ্রন্থের (Confessions of a Thug) প্রকাশিত হিতবাদী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা বঙ্গানুবাদ। মূল গ্রন্থের উপকারিতা ও হৃদয়গ্রাহিতা

বিশ্ববিশ্রুত। গ্রন্থখানি এক অত্যাচারের ভীষণ কাহিনী, পাঠে শরীরে রোমাঞ্চ হয়। অনুবাদের ভাষাও বেশ সরল ও মিষ্ট হইয়াছে। আগাগোড়া দিব্য কৌতূহল জাগরুচ রাখে। অনুবাদকের পক্ষে ইহা কৃতিত্বের পরিচায়ক। যাঁহার Sensational নভেল প্রভৃতির পক্ষপাতী, এ গ্রন্থখানি তাঁহাদিগকে বিশিষ্ট আনন্দদান করিবে।

পাগলের কথা । ৮ দেবেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত। দাস যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। স্বর্গীয় গ্রন্থকার শিক্ষাকার্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রোফেসর ডি, এন, দাস নামেই তাঁহার পরিচয়। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। সরলভাবে এবং এমন একপট আন্তরিকতার সহিত জীবনকাহিনী অল্প লেখকই বর্ণনা করিতে পারেন। তেজস্বী আচার্যের জীবনত্যাগ ও আত্ম-নির্ভরতার কাহিনীতে সমুজ্জ্বল। বিলাত ফেরত হইয়া তিনি যে অনাড়ম্বর জীবন বহন করিয়া গিয়াছেন আধুনিক বিলাত ফেরত সম্প্রদায় এবং বঙ্গবাসীমাত্রেই পক্ষে তাহা অনুকরণীয়। আমরা আপামর সাধারণকে এই গ্রন্থ পাঠে অনুরোধ করি,—ইহা মনুষ্য বিকাশের পক্ষে যে প্রভূত সহায়তা করিবে, তাহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। গ্রন্থকারের একখানি হাফটোন চিত্র গ্রন্থাগ্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

কাননিকা । বৈভ্রাজিকা । শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা প্রণীত। ভারতমিহির প্রেসে মুদ্রিত। দুইখানিই কবিতাগ্রন্থ। কাব্যরচনায় লেখিকার এই প্রথম প্রয়াস। কবিতাগুলির অধিকাংশই জন্মভূমির প্রতি অনুরাগব্যঞ্জক। লেখিকার সাধনা সফল হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

পাপ ও পুণ্য । শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ লাহিড়ী প্রণীত। ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। এখানি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ। ভারত সত্ৰাট

অশোকের পুত্র কুণালের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এখানি ক্ষুদ্র কাব্য, মাঝে মাঝে লেখকের কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইসলাম চিত্র । মৌলবী শেখ আবদুল জব্বার সম্পাদিত। বনগ্রাম গফরগাঁও, যয়মসিং হইতে প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। লেখক অল্লায়ত্বনের মধ্যে মুসলমান সমাজের দোষাদি নিরূপণ ও তন্নিকরণের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। লেখকের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ও সরল, এবং সামাজিক যত্নাদি বেশ সংবতভাবেই তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। সেগুলির গ্রহণীয়তা অবশ্য মুসলমানগণের বিচার্য। লেখকের রচনায় একটা বিশেষ ক্রটি উচ্ছ্বাসের অতিরিক্ত প্রাবল্য! লেখক এ বিষয়ে অবহিত হইবেন কারণ উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে বক্তব্য পরিষ্কৃত হইতে পারেন না।

মক্কা শরীফের ইতিহাস । মৌলবী শেখ আবদুল জব্বার প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য বার আনা মাত্র। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতলাভ করিয়াছি। ইহাতে মক্কার ইতিহাস, বেশ সুশৃঙ্খল ধারাবাহিকতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। ভাষাটুকুও সুন্দর। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা । শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ গুপ্ত কবিরাজ প্রণীত। ৯৪/২নং বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য চারি আনা। এই ক্ষুদ্র স্তব্ধকথানিতে পারা, গন্ধক পর্পটী প্রভৃতির শোধনপ্রণালী, কাথ, অরিষ্ট, মধ্যমনারায়ণ তৈল, ছাগলাঢ় ঘৃত প্রভৃতির পাকপ্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রণালীগুলি অল্পব্যয় সাধ্য বলিয়াই কবিরাজ মহাশয় নির্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীসত্যব্রত শর্মা।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কাস্ট্রিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মাস্তা দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসত্যব্রত শর্মা দ্বারা প্রকাশিত।



রচনা-নিরত রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ১৪ই পৌষ ১৩১৭ তারিখে অঙ্কিত

ভারতী

৩৪শ বর্ষ]

মাঘ, ১৩১৭

[১০ম সংখ্যা

সামঞ্জস্য ।*

এই বিশ্বচরাচবে আমরা বিশ্বকবিব
ষে লীলা চারদিকেই দেখতে পাচ্ছি সে হচ্ছে
সামঞ্জস্যের লীলা। সুর, সে যত কঠিন
সুরট হোক, কোথাও ভ্রষ্ট হচ্ছে না; তাল,
সে যত দৃক্ তালই হোক, কোনো জায়গায়
তার অগনমাত্র নেই। চারদিকেই গতি এবং
ক্ষুদ্রি, স্পন্দন এবং নর্তন, অথচ সর্বত্রই
অপ্রমত্ততা। পৃথিবী প্রতিমুহূর্তে প্রবলবেগে
সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, সূর্য প্রতিমুহূর্তে
প্রবলবেগে কোন এক অপরিজ্ঞাত লক্ষ্যের
অভিমুখে ছুটে চলেছে, কিন্তু আমাদের
মনে ভাবনামাত্র নেই—আমরা সকাল
বেলায় নির্ভয়ে জেগে উঠে দিবসের
তুচ্ছতম কাজটুকুও সম্পন্ন করবার জন্তে
মনোযোগ করি এবং রাত্রি একথা
নিশ্চয় জেনে শুতে যাই যে, দিবসের
আয়োজনটি যেখানে যেমনভাবে আজ ছিল
সমস্ত রাত্রির অন্ধকার ও অচেতনতার পবেও
ঠিক তাকে সেই জায়গাতেই তেমনি করেই
কাল পাওয়া যাবে। কেননা, সর্বত্র সামঞ্জস্য
আছে; এই অতি প্রকাণ্ড অপরিচিত
জগৎকে আমরা এই বিশ্বাসেই প্রতিমুহূর্তে
বিশ্বাস করি।

অথচ এই সামঞ্জস্য ত সহজ সামঞ্জস্য
নয়—এ ত মেঘে ছাগে সামঞ্জস্য নয়, এ যেন
বাধে গোকতে একঘাটে জল খাওয়ানো।
এই জগৎক্ষেত্রে যে সব শক্তির লীলা তাদের
যেমন প্রচণ্ডতা তেমনি তাদের বিরুদ্ধতা—
কেউবা পিছনের দিকে টানে কেউবা সামনের
দিকে ঠেলে, কেউবা গুটিয়ে আনে, কেউবা
ছড়িয়ে ফেলে, কেউবা বজ্রমুষ্টিতে সমস্তকে
তাল পাকিয়ে নিরেট করে ফেলবার জন্তে চাপ
দিচ্ছে, কেউবা তার চক্রবস্তুর প্রবল আবর্তে
সমস্তকে গুঁড়িয়ে দিবে দিগ্বিদিকে উড়িয়ে
ফেলবার জন্তে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই
সমস্ত শক্তি অসংখ্যবেশে এবং অসংখ্যতালে
ক্রমাগতই আকাশময় ছুটে চলেছে, তার
বেগ, তার বল, তার লক্ষ্য, তার বিচিত্রতা
আমাদের ধারণাশক্তির অতীত; কিন্তু এই সমস্ত
প্রবলতা, বিরুদ্ধতা, বিচিত্রতার উপরে অধিষ্ঠিত
অবিচলিত অথচ সামঞ্জস্য। আমরা যখন
জগৎকে কেবল তাব কোনো একটামাত্র দিক
থেকে দেখি তখন গতি এবং আঘাত এবং
বিনাশ দেখি কিন্তু সমগ্রকে যখন দেখি তখন
বেধতে পাই নিস্তক সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যই
হচ্ছে তাঁর স্বরূপ যিনি শাস্ত্রং শিবমদৈবতং।

জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শান্তং, সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শিবম্, আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি অদ্বৈতম্ ।

আমাদের আত্মা যে সত্য সাধনা তার লক্ষ্যও এই দিকে, এই পরিপূর্ণতার দিকে— এই শান্ত শিব অদ্বৈতের দিকে; কখনই প্রমত্ততার দিকে নয়। আমাদের যিনি ভগবান তিনি কখনই প্রমত্ত নন; নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টিপরম্পরার ভিত্তি দিয়ে অনন্ত দেশ ও অনন্তকাল এই কথাই কেবল সাক্ষ্য দিচ্ছে। “এম সেতু বিধরণ লোকানামসম্ভেদায় ।”

এই অপ্রমত্ত পরিপূর্ণ শান্তিকে লাভ করার অভিপ্রায় একদিন এই ভারতবর্ষের সাধনার মধ্যে ছিল। উপনিষদে ভগবদ্গীতায় আমরা এম পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি।

মাঝখানে ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের যখন আধিপত্য হল তখন আমাদের সেই সনাতন পরিপূর্ণতার সাধনা নির্বাণের সাধনার আকার ধারণ করলে। স্বয়ং বুদ্ধের মনে এই নির্বাণ শব্দটির অর্থ যে কী ছিল তা এখানে আলোচনা করে কোনো ফল নেই কিন্তু ছুংথের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্তে শূণ্যতাব মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করাই যে চরম সিদ্ধি এই ধারণা বৌদ্ধযুগের পর হতে নানা আকারে নানাধিক পরিমাণে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়েছে।

এমনি কবে পূর্ণতার শান্তি একদিন শূণ্যতার শান্তি আকারে ভারতবর্ষের সাধনা-ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত করে সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায় এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্র মূল বিস্তার করে দাঁড়াল সেইদিন থেকে

ভারতবর্ষের সাধনায় সানঞ্জশ্বেব স্থলে রিক্ততা এসে দাঁড়াল; সেইদিন থেকে প্রাচীন তাপসা-শ্রমের স্থলে আধুনিককালের সত্যসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠল এবং উপনিষদের পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্যের শূণ্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হলেন।

কেবলমাত্র কঠোর চিন্তার জোরে মানুষ নিজেব বাসনা ও প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে জগদ্বৃক্ষাণ্ডকে বাদ দিয়ে শবীরের প্রাণক্রিয়াকে অবরুদ্ধ কবে একটি গুণলেশহীন অবচ্ছিন্ন (abstract) সত্তার ধ্যানে নিযুক্ত থাকতেও পারে কিন্তু দেহমনহৃদয়বিশিষ্ট সমগ্র মানুষের পক্ষে একমম অবস্থায় অবস্থিতি করা অসম্ভব এবং সে তার পক্ষে কখনই প্রার্থনীয় হতে পারে না। এই কারণেই তখনকার জ্ঞানীরা যাকে মানুষের চরম শ্রেয় বলে মনে করতেন তাকে সকল মানুষের সাধ্য বলে গণ্যই করতেন না। এই কারণে এই শ্রেয়ের পথে তাঁরা বিশ্বসাধারণকে আহ্বান করতেই পারতেন না—বরঞ্চ অধিকাংশকেই অনধিকারী বলে ঠেকিয়ে রাখতেন এবং এই সাধারণ লোকেরা মূঢ়ভাবে যে-কোনো বিশ্বাস ও সংস্কারকে আশ্রয় করত তাকে তাঁরা সক্রম অবজ্ঞাভরে প্রশ্রয় দিতেন। যে মনে যেটা যেমনভাবে আছে ও চলচে, তাই নিয়েই সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট থাকুক এই তাঁদের কথা ছিল, কাবণ, সত্য মানুষের পক্ষে এতই সুদূর, এতই দূরধিগম্য, এবং সত্যকে পেতে গেলে নিজের স্বভাবকে মানুষের এমনি সম্পূর্ণ বিপর্যাস্ত করে দিতে হয়!

দেশেব জ্ঞান এবং দেশের অজ্ঞানের মধ্যে, দেশের সাধনা এবং দেশের সংসারযাত্রার

মধ্যে এতবড় একটা বিচ্ছেদ কখনই সুস্থভাবে স্থায়ী হতে পারে না। বিচ্ছেদ যেখানে একান্ত প্রবল সেখানে বিপ্লব না হলে তার সমন্বয় হয় না, কী রাষ্ট্রতন্ত্রে, কী সমাজতন্ত্রে, কী ধর্মতন্ত্রে !

আমাদের দেশেও তাই হল। মানুষের সাধনাক্ষেত্র থেকে জানী যে হৃদয় পদার্থকে অত্যন্ত জোর করে একেবারে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করে দিয়েছিল সেই হৃদয় অত্যন্ত জোবের সঙ্গেই অধিকার-অনধিকারের বেড়া চুবমার করে ভেঙে বন্টার বেগে দেখতে দেখতে একেবারে চতুর্দিক প্রাবিত করে দিলে, অনেকদিন পবে সাধনার ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন খুব ভরপূব হয়ে উঠল।

এখন আবার সকলে একেবারে উন্টো সুর এই ধরলে যে, হৃদয়বৃত্তির চরিতার্থতাই মানুষের সিদ্ধির চরম পরিচয়। হৃদয়বৃত্তির অত্যন্ত উত্তেজনার যে সমস্ত দৈহিক ও মানসিক লক্ষণ আছে সাধনায় সেইগুলির প্রকাশই মানুষের কাছে একান্ত শ্রদ্ধালাভ করতে লাগল।

এই অবস্থায় স্বভাবত মানুষ আপনার ভগবানকেও প্রমত্ত আকাবে দেখতে লাগল। তাঁর আর সমস্তকেই খর্ব করে কেবলমাত্র তাঁকে হৃদয়াবেগ-চাঁঞ্চল্যের মধ্যই একান্ত করে উপলব্ধি করতে লাগল এবং সেই রকম উপলব্ধি থেকে যে একটি নিরতিশয় ভাব-বিহ্বলতা জন্মায় সেইটেকেই উপাসনার পরাকাষ্ঠা বলে গণ্য করে নিলে।

কিন্তু ভগবানকে এই রকম করে দেখাও তাঁর সমগ্রতা থেকে তাঁকে অবচ্ছিন্ন করে

দেখা। কারণ মানুষ কেবলমাত্র হৃদয়পূজা নয়, এবং নানাপ্রকার উপায়ে শরীর মনের সমস্ত শক্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের ধারায় প্রবাহিত করতে থাকলে কখনই সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের যোগে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসাধন হতে পারে না।

হৃদয়াবেগকেই চরমরূপে বধন প্রাধাত্য দেওয়া হয় তখনই মানুষ এমন কথা অনায়াসে বলতে পারে যে, ভক্তিপূর্বক মানুষ যাকেই পূজা করুক না কেন তাতেই তার সফলতা। অর্থাৎ যেন, পূজার বিষয়টি ভক্তিকে জাগিয়ে তোলবার একটা উপায়মাত্র ; যার একটা উপায়ে ভক্তি না জন্মে তাকে অগ্র যা-হয় একটা উপায় জুগিয়ে দেওয়ার যেন কোনো বাধা নেই। এই অবস্থায় উপলক্ষ্যটা যাই হোক, ভক্তির প্রবলতা দেখলেই আমাদের মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়—কারণ প্রমত্ততাকেই আমরা সিদ্ধি বলে মনে করি।

এই রকম হৃদয়াবেগের প্রমত্ততাকেই আমরা অসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তির লক্ষণ বলে মনে করি তার কারণ আছে। যেখানে সামঞ্জস্য নষ্ট হয় সেখানে শক্তিপূজা একদিকে কাং হয়ে পড়ে বলেই তার প্রবলতা চোখে পড়ে। কিন্তু সে ত একদিক থেকে চুরি করে অন্যদিকে ক্ষীণ করা। যেদিক থেকে চুরি হয় সেদিক থেকে নালিশ ওঠে, তার শোধ দিতেই হয় এবং তাব শাস্তি না পেয়ে নিষ্কৃতি হয় না। সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের মধ্যে প্রতিসংহরণের চর্চায় মানুষ কখনই মনুষ্যত্বলাভ করেনা এবং মনুষ্যত্বের যিনি চরম লক্ষ্য তাঁকেও লাভ করতে পারে না।

নিজের মনের ভক্তির চরিতার্থতাই যখন মানুষের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল, বস্তুত দেবতা যখন উপলক্ষ্য হয়ে উঠলেন এবং ভক্তিকে ভক্তি করাই যখন নেশার মত ক্রমশই উগ্র হয়ে উঠতে লাগল, মানুষ যখন পূজা করার আবেগটাকেই প্রার্থনা কবলে, কা'কে পূজা করতে হবে সেদিকে চিন্তামাত্র প্রয়োগ করলে না এবং এই কারণেই যখন তার পূজার সামগ্রী ক্রতবেগে যেখানে-সেখানে যেমন তেমন ভাবে নানা আকার ও নানা নাম ধরে অজস্র অপরিমিত বেড়ে উঠল, এবং সেইগুলিকে অবলম্বন করে নানা সংস্কার নানা কাহিনী নানা আচার বিচার জড়িত বিজড়িত হয়ে উঠতে লাগল ;—জগদ্ব্যাপারের সর্বত্রই একটা জ্ঞানের, শ্রাস্তের, নিয়মের অমোঘ ব্যবস্থা আছে এই ধারণা যখন চতুর্দিকে ধূলিসাৎ হতে চলল, তখন সেই অবস্থায় আমাদের দেশে সত্যের সঙ্গে রসের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির একান্ত বিচ্ছেদ ঘটে গেল।

একদা বৈদিক যুগে কর্মকাণ্ড যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল তখন নিরর্থক কর্মই মানুষকে চরমরূপে অধিকার করেছিল ; কেবল নানা জটিল নিয়মে বেদি সাজিয়ে, কেবল মন্ত্র পড়ে কেবল আহুতি ও বলি দিয়ে মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে এই ধারণাই একান্ত হয়ে উঠেছিল ; তখন মন্ত্র এবং অমুষ্ঠানই দেবতা এবং মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াল। তার পরে জ্ঞানের সাধনার যখন প্রাচুর্য হল তখন মানুষের পক্ষে জ্ঞানই একমাত্র চরম হয়ে উঠল—কারণ, যার সম্বন্ধে জ্ঞান তিনি নিঃশূণ নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো-প্রকার সম্বন্ধ হতেই পারে না ; এ অবস্থায়

ব্রহ্মজ্ঞান নামক পদার্থটাতে জ্ঞানই সমস্ত, ব্রহ্ম কিছুই নয় বলেই হয়। একদিন নিরর্থক কর্মই চূড়ান্ত ছিল; জ্ঞান ও হৃদ্বৃত্তিকে সে লক্ষ্যই করেনি, তার পবে যখন জ্ঞান বড় হয়ে উঠল তখন সে আপনার অধিকার থেকে হৃদয় ও কর্ম উভয়কে নির্বাসিত করে দিয়ে নিরতিশয় বিস্মৃত হয়ে থাকবার চেষ্টা করলে। তার পরে ভক্তি যখন মাথা তুলে দাঁড়াল তখন সে জ্ঞানকে পায়ে তলার চেপে ও কর্মকে রসের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে একমাত্র নিজেই মানুষের পরম স্থানটী সম্পূর্ণ জুড়ে বসল, দেবতাকেও সে আপনার চেয়ে ছোট করে দিলে, এমন কি ভাবের আবেগকে মথিত করে তোলবার জন্যে বাহিরে কৃত্রিম উত্তেজনার বাহ্যিক উপকরণ গুলিকেও আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ করে নিলে।

এইরূপ গুরুতর আত্মবিচ্ছেদের উচ্ছ্বলতার মধ্যে মানুষ চিরদিন বাস করতে পারে না। এই অবস্থায় মানুষ কেবল কিছুকাল পর্যন্ত নিজের প্রকৃতির এ ধংশের তৃপ্তি সাধনের নেশায় বিহ্বল হয়ে থাকতে পারে কিন্তু তার সর্বাংশের ক্ষুধা একদিন না-জেগে উঠে থাকতে পারে না।

সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে এদেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতবর্ষে তিনি যে কোনো নূতন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়, ভারতবর্ষে যেখানে ধর্মের মধ্যে পরিপূর্ণতার রূপ চিরদিনই ছিল, যেখানে বৃহৎ সামঞ্জস্য, যেখানে শাস্তঃশিবমবৈতম্ সেইখানকার সিংহদ্বার তিনি সর্বসাধারণের কাছে উদ্বাটিত করে দিয়েছিলেন।

সত্যের এই পরিপূর্ণতাকে এই সামঞ্জস্যকে পাবার ক্ষুধা যে কি রকম প্রবল, এবং তাকে আপনার মধ্যে কি রকম করে গ্রহণ ও ব্যক্ত করতে হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনে সেইটেই প্রকাশ হয়েছে।

তাঁর স্নেহময়ী দিদিমাব মৃত্যুশোকের আঘাতে মহর্ষির ধর্মজীবন প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেই যে ক্ষুধার কান্না কেঁদেছে তার মধ্যে একটি বিস্ময়কর বিশেষত্ব আছে।

শিশু যখন খেলবার জন্তে কাঁদে তখন হাতের কাছে যে-কোনো একটা খেলনা পাওয়া যায় তাই দিয়েই তাকে ভুলিয়ে বাধা সহজ কিন্তু সে যখন মাতৃপুত্রের জন্তে কাঁদে তখন তাকে আর-কিছু দিয়েই ভোলাবার উপায় নেই। যে লোক নিজের বিশেষ একটা হৃদয়াবেগকে কোনো একটা কিছুতে প্রয়োগ করবার ক্ষেত্রনাত্র চায় তাকে থামিয়ে রাখবার জিনিষ জগতে অনেক আছে—কিন্তু কেবলমাত্র ভাবসন্তোষ যার লক্ষ্য নয় যে সত্য চায়, সে ত ভুলতে চায়না, সে পেতে চায়। কাজেই সত্য কোথায় পাওয়া যাবে এই সন্ধান তাকে সাধনার পথে বেবতেই হবে—তাতে বাধা আছে, দুঃখ আছে, তাতে বিলম্ব ঘটে, তাতে আত্মীয়েরা বিরোধী হয়, সমাজের কাছ থেকে আঘাত বর্ষিত হতে থাকে—কিন্তু উপায় নেই—তাকে সমস্তই স্বীকার করতে হয়।

এই যে সত্যকে পাবার ইচ্ছা এ কেবল জিজ্ঞাসা মাত্র নয় কেবল জানে পাবার ইচ্ছা নয়—এর মধ্যে হৃদয়ের দুঃসহ ব্যাকুলতা আছে ;—তাঁর ছিল সত্যকে কেবল জ্ঞানরূপে নয় আনন্দরূপে পাবার বেদনা। এইখানে

তাঁর প্রকৃতি স্বভাবতই একটি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যকে চাচ্ছিল। আমাদের দেশে এক সময় বলেছিল—ব্রহ্মসাধনার ক্ষেত্রে ভক্তির স্থান নেই এবং ভক্তিসাধনার ক্ষেত্রে ব্রহ্মেব স্থান নেই কিন্তু মহর্ষি ব্রহ্মকে চেয়েছিলেন জ্ঞানে এবং ভক্তিতে, অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে সম্পূর্ণ করে তাকে চেয়েছিলেন—এই জন্তে ক্রমাগত নানা কষ্ট নানা চেষ্টা নানা গ্রহণ বর্জনেব মধ্য দিয়ে যেতে যেতে যতক্ষণ তাঁর চিত্ত তাঁর অমৃতময় ব্রহ্মে, তাঁর আনন্দের ব্রহ্মে, গিয়ে না ঠেকেছিল ততক্ষণ একমুহূর্ত তিনি থামতে পাবেনি।

এই কারণে তাঁর জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান একটি বিশেষত্ব লাভ করেছিল এই যে, সে জ্ঞানকে সর্বসাধারণের কাছে না ধরে তিনি ক্ষান্ত হননি।

জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান কেবল জ্ঞানীর গণ্ডীর মধ্যেই বদ্ধ থাকে। সেই জন্তেই এদেশের লোকে অনেক সময়েই বলে থাকে ব্রহ্মজ্ঞানের আবার প্রচাব কী!

কিন্তু ব্রহ্মকে যিনি হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি করেছেন তিনি একথা বুঝেছেন ব্রহ্মকে পাওয়া যায়, হৃদয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ পাওয়া যায়— শুধু জ্ঞানে জানা যায় তা নয়, রসে পাওয়া যায় কেননা সমস্ত রসের সার তিনি—রসো বৈ সঃ। যিনি হৃদয়-দিয়ে ব্রহ্মকে পেয়েছেন তিনি উপনিষদের এই মহাবাক্যের অর্থ বুঝেছেন :—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

জ্ঞান যখন তাঁকে পেতে চায় এবং বাক্য-প্রকাশ করতে চায় তখন বার বার ফিরে

ফিরে আসে কিন্তু আনন্দ দিয়ে যখন সেই আনন্দের যোগ হয় তখন সেই প্রত্যক্ষ যোগে সমস্ত ভয় সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়।

আনন্দের মধ্যে সমস্ত বোধের পরিপূর্ণতা, মন ও হৃদয়ের, জ্ঞান ও ভক্তির অথও যোগ।

আনন্দ যখন জাগে তখন সকলকে সে আহ্বান করে ;—সে গভীর মধ্যে আপনাকে নিয়ে আপনি রুদ্ধ হয়ে বসে থাকতে পারে না। সে একথা কাউকে বলে না যে, তুমি দুর্বল, তোমার সাধ্য নেই, কেননা আনন্দের কাছে কোনো কঠিনতাই কঠিন নয়,— আনন্দ সেই আনন্দের ধনকে এতই একান্ত করে এতই নিবিড় করে দেখে যে সে তাঁকে ছুঁয়াপ্য বলে কোনো লোককেই বঞ্চিত করতে চায় না—পথ যত দীর্ঘ যত দুর্গম হোক না এই পরমলাভের কাছে সে কিছুই নয়।

এই কারণে পৃথিবীতে এপর্যন্ত যে কোনো মহাত্মা আনন্দ দিয়ে তাঁকে লাভ করেছেন তাঁরা অমৃতভাণ্ডারের দ্বার বিশ্ব-জনের কাছে খুলে দেবার জন্তেই দাঁড়িয়েছেন—আর যারা কেবলমাত্র জ্ঞান বা কেবলমাত্র আচারের মধ্যে নিবিষ্ট তাঁরাই পদে পদে ভেদবিভেদের দ্বারা মানুষের পরস্পর মিলনের উদার ক্ষেত্রকে একেবারে কণ্টকাকীর্ণ কবে দেন! তাঁরা কেবল না-এর দিক্ থেকে সমস্ত দেখেন, হাঁ-এর দিক্ থেকে নয় এই জন্তে তাঁদের ভরসা নেই, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নেই এবং ব্রহ্মকেও তাঁরা নিরতিশয় শূণ্যতার মধ্যে নির্কাসিত করে রেখে দেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিন্তে যখন ধর্মের ব্যাকুলতা প্রবল হল তখন তিনি যে অনন্ত

নেতি নেতিকে নিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পাবেন নি সেটা আশ্চর্যের বিষয় নয় কিন্তু তিনি যে সেই ব্যাকুলতার বেগে সমাজের ও পরিবারের চিবসংস্কারগত অভ্যস্ত পথে তাঁর ব্যথিত হৃদয়কে সমর্পণ করে দিয়ে কোনো মতে তার কান্নাকে থামিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন নি এইটেই বিশ্বয়ের বিষয়। তিনি কাকে চাচ্ছেন তা ভাল করে জানবার পূর্বেই তাঁকেই চেয়েছিলেন জ্ঞান যাকে চিরকালই জানতে চায় এবং প্রেম যাকে চিরকালই পেতে থাকে।

এই জগৎ জীবনের মধ্যে তিনি সেই ব্রহ্মকে গ্রহণ করলেন, পরিমিত পদার্থের মত করে যাকে পাওয়া যায় না এবং শূণ্যপদার্থের মত যাকে না-পাওয়া যায় না—যাকে পেতে গেলে একদিকে জ্ঞানকে খর্ব করতে হয় না অতীতকে প্রেমকে উপবাসী করে মারতে হয় না—যিনি বস্তুবিশেষের দ্বারা নির্দিষ্ট নন অথবা বস্তুশূণ্যতার দ্বারা অনির্দিষ্ট নন, যার সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেছেন, যে, যে তাঁকে বলে আমি জানি সেও তাঁকে জানে না, যে বলে আমি জানিনি সেও তাঁকে জানেনা। এক কথায় যার সাধনা হচ্ছে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের সাধনা।

যাঁরা মহর্ষির জীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই দেখেছেন ভগবৎ-পিপাসা যখন তাঁর প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তখন কি রকম দুঃসহ বেদনার মধ্যে তাঁর হৃদয়কে তরঙ্গিত করে তুলেছিল! অথচ তিনি যখন ব্রহ্মানন্দের রসাস্বাদ করতে লাগলেন তখন তাঁকে উদ্দাম ভাবোন্মাদে আত্মবিস্মৃত করে দেয় নি। কারণ তিনি যাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত

করেছিলেন তিনি শাস্ত্রম্ শিবম্ অধৈতম্— তাঁর মধ্যে সমস্ত শক্তি সমস্ত জ্ঞান সমস্ত প্রেম অতলস্পর্শ পরিপূর্ণতায় পর্যাপ্ত হয়ে আছে। তাঁর মধ্যে বিশ্বচরাচর শক্তিতে ও সৌন্দর্য্যে নিত্যকাল তরঙ্গিত হচ্ছে—সে তরঙ্গ সমুদ্রকে ছাড়িয়ে চলে যায় না, এবং সমুদ্র সেই তরঙ্গের দ্বারা আপনাকে উদ্বল করে তোলে না। তাঁর মধ্যে অনন্ত শক্তি বলেই শক্তির সংঘম এমন অটল, অনন্ত রস বলেই রসের গাঙ্গীর্ষ্য এমন অপরিমেয়।

এই শক্তির সংঘমে এই রসের গাঙ্গীর্ষ্যে মহর্ষি চিরদিন আপনাকে ধারণ করে রেখেছিলেন, কারণ, ভূমার মধ্যেই আত্মাকে উপলব্ধি করবার সাধনা তাঁর ছিল। যারা আধ্যাত্মিক অসংঘমকেই আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় বলে মনে করেন তাঁরা এই অবিচলিত শাস্ত্রের অবস্থাকেই দারিদ্র্য বলে কল্পনা করেন, তাঁরা প্রমত্ততার মধ্যে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়াকেই ভক্তির চরম অবস্থা বলে জানেন। কিন্তু যারা মহর্ষিকে কাছে থেকে দেখেছেন, বস্তুতঃ যারা কিছুমাত্র তাঁর পরিচয় পেয়েছেন তাঁরা জানেন যে তাঁর প্রবল সংঘম ও প্রশান্ত গাঙ্গীর্ষ্য ভক্তিরসের দীনতাজনিত নয়। প্রাচীন ভারতেব তপোবনের ঋষিরা যেমন তাঁর গুরু ছিলেন তেমনি পারশুর সৌন্দর্য্যাকুঞ্জের বুলবুল হাফেজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর জীবনের আনন্দপ্রভাতে উপনিষদের শ্লোক-গুলি ছিল প্রভাতের আলোক এবং হাফেজের কবিতাগুলি ছিল প্রভাতের গান। হাফেজের কবিতার মধ্যে যিনি আপনার রসোচ্ছ্বাসের সাড়া পেতেন তিনি যে তাঁর জীবনেশ্বরকে কি রকম নিবিড় রসবেদনাপূর্ণ মাধুর্য্যধন

প্রেমের সঙ্গে অন্তরে বাহিরে দেখেছিলেন সে কথা অধিক করে বলাই বাহুল্য।

ঐকান্তিক জ্ঞানের সাধনা যেমন গুরু বৈরাগ্য আনে, ঐকান্তিক রসের সাধনাও তেমনি ভাববিহ্বলতার বৈরাগ্য নিয়ে আসে। সে অবস্থায় কেবলি রসের নেশায় আবিষ্ট হয়ে থাকতে ইচ্ছা করে, আর-সমস্তের প্রতি একান্ত বিতৃষ্ণা জন্মে, এবং কর্মের বন্ধনমাত্রকে অসহ্য বলে বোধ হয়। অর্থাৎ মনুষ্যত্বের কেবল একটামাত্র দিক অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠাতে অন্য সমস্ত দিক একেবারে রিক্ত হয়ে যায়, তখন আমরা ভগবানের উপাসনাকে কেবলই একটিমাএ অংশে অত্যাগ্র করে তুলি, এবং অন্য সকল দিক থেকেই তাকে শূন্য করে রাখি।

ভগবৎলাভের জগু একান্ত ব্যাকুলতা সত্ত্বেও এই রকম সামঞ্জস্যচ্যুত বৈরাগ্য মহর্ষির চিত্তকে কোনোদিন অধিকার করেনি। তিনি সংসারকে ত্যাগ করেন নি, সংসারের সুরকে ভগবানের ভক্তিতে বেঁধে তুলেছিলেন। ঈশ্বরের দ্বারা সমস্তকেই আচ্ছন্ন করে দেখবে, উপনিষদের এই উপদেশ বাক্য অনুসারে তিনি তাঁর সংসারের বিচিত্র সম্বন্ধ ও বিচিত্র কর্মকে ঈশ্বরের দ্বারাই পরিব্যাপ্ত করে দেখবার তপস্যা করেছিলেন। কেবল নিজের পারিবার নয়, জনসমাজের মধ্যেও ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার সমস্ত বিঘ্ন দূর করতে তিনি চিরজীবন চেষ্টা করেছেন। এই-জগু এই শাস্ত্রনিকেতনের বিশাল প্রাস্তরের মধ্যেই হোক আর হিমাশয়েব নিভৃত গিরি-শিখরেই হোক নির্জর্জন সাধনায় তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি।—তাঁর ব্রহ্ম একলার ব্রহ্ম নয়,

তাঁর ব্রহ্ম শুধু জ্ঞানীর ব্রহ্ম নয়, শুধু ভক্তের ব্রহ্মও নয়. তাঁর ব্রহ্ম নিখিলেব ব্রহ্ম;—নির্জনে তাঁর ধ্যান, সজনে তাঁর সেবা, অন্তরে তাঁর স্ববণ, বাহিরে তাঁর অনুসরণ; জ্ঞানের দ্বারা তাঁর তত্ত্ব উপলব্ধি, হৃদয়ের দ্বারা তাঁর প্রতি প্রেম, চরিত্রের দ্বারা তাঁর প্রতি নিষ্ঠা এবং কর্মের দ্বারা তাঁর প্রতি আত্মনিবেদন। এই যে পরিপূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম, সর্বাঙ্গীণ মনুষ্য হের পরিপূর্ণ উৎকর্ষের দ্বারাই আমরা যঁার সঙ্গে যুক্ত হতে পারি—তাঁর যথার্থ সাধনাই হচ্ছে তাঁর যোগে সকলের সঙ্গেই যুক্ত হওয়া এবং সকলের যোগে তাঁরই সঙ্গে যুক্ত হওয়া—দেহ মন হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দ্বারাই তাঁকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর উপলব্ধি দ্বারা দেহমন-হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে বলশালী করা—অর্থাৎ পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের পথকে গ্রহণ করা। মহর্ষি তাঁর ব্যাকুলতার দ্বারা এই সম্পূর্ণতাকেই চেয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনেব দ্বারা এঁকেই নির্দেশ করেছিলেন।

ব্রহ্মেব উপাসনা কাকে বলে সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব—তাতে প্রীতি করা এবং তাঁর প্রিয়কার্য সাধন কবাই তাঁর উপাসনা। একথা মনে রাখতে হবে আমাদের দেশে ইতিপূর্বে তাঁর প্রতি প্রীতি এবং তাঁর প্রিয়কার্য সাধন, এই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল। অন্তত প্রিয়কার্য শব্দের অর্থকে আমরা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করে এনেছিলুম; ব্যক্তিগত শুচিতা এবং কতকগুলি আচার পালনকেই আমরা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য বলে স্থির করে রেখেছিলুম। কর্ম যেখানে দুঃসাধ্য, যেখানে

কঠোর, কর্ম যেখানে যথার্থ বীর্যের প্রয়োজন, যেখানে বাধার সঙ্গে সংগ্রাম কবতে হবে, যেখানে অমঙ্গলের কণ্টকতরুকে রক্তাক্ত হস্তে সমূলে উৎপাটন করতে হবে, যেখানে অপমান নিন্দা নির্ধাতন স্বীকার কবে প্রাচীন অভ্যাসের স্থূল জড়ত্বকে কঠিন দুঃপে ভেদ করে জনসমাজের মধ্যে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করতে হবে সেইদিকে আমরা দেবতার উপাসনাকে স্বীকার করিনি। দুর্বলতা বশতই এই পূর্ণ উপাসনায় আমাদের অনাস্থা ছিল এবং অনাস্থা ছিল বলেই আমাদের দুর্বলতা এপর্যন্ত কেবলি বেড়ে এসেছে। ভগবানের প্রতি প্রীতি ও তাঁর প্রিয়কার্য সাধনের মাঝখানে আমাদের চরিত্রের মজ্জাগত দুর্বলতা যে বিচ্ছেদ ঘটবে দিয়েছিল সেই বিচ্ছেদ মিটিয়ে দেবার পথে একদিন মহর্ষি একলা দাঁড়িয়েছিলেন—তখন তাঁর মাথার উপরে বৈষয়িক বিপ্লবের প্রলয় ঝড় বইতেছিল এবং চতুর্দিকে বিচ্ছিন্ন পরিবার ও বিরুদ্ধ সমাজের সর্বপ্রকার আঘাত এসে পড়ছিল, তারি মাঝখানে অবিচলিত শক্তিতে একাকী দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর বাক্য ও ব্যবহাবে এই মন্ত্র ঘোষণা করেছিলেন তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য সাধননঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভারতবর্ষ তার দুর্গতি-দুর্গের যে ঋদ্ধধারে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাপন করেছে, আপনার ধর্মকে সমাজকে আপনার আচার ব্যবহারকে কেবলমাত্র আপনার কৃত্রিম গণ্ডীর মধ্যে বেষ্টিত কবে বসে রয়েছে, সেই দ্বার বাইরের পৃথিবীর প্রবল আঘাতে আজ ভেঙে গেছে; আজ আমরা সকলের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছি, সকলের সঙ্গে আজ

আমাদের নানা প্রকার ব্যবহারে আস্তে হ্রাস হইয়াছে। আজ আমাদের যেখানে চরিত্রের দীনতা, জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা, হৃদয়ের সঙ্কোচ, যেখানে যুক্তিহীন আচারের দ্বারা আমাদের শক্তিপ্রয়োগের পথ পদে পদে বাধাগ্রস্ত হইয়া উঠে, যেখানেই লোকব্যবহারে ও দেবতার উপাসনায় মানুষের সঙ্গে মানুষের দুর্ভেদ্য-ব্যবধানে আমাদের শতখণ্ড কবে দিচ্ছে, সেই-খানেই আমাদের আঘাতের পর আঘাত, লজ্জার পর লজ্জা পেতে হচ্ছে, সেইখানেই অকৃতার্থতা বারম্বার আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে ধূলিসাৎ কবে দিচ্ছে এবং সেইখানেই প্রবল-বেগে চলনশীল মানবস্রোতের অভিব্যক্তি সহ্য করতে না পেয়ে আমরা মুচ্ছিত হইয়া পড়ে যাই—এই রকম সময়েই যে সকল মহাপুরুষ আমাদের দেশে মঙ্গলের জয়ধ্বজা বহন কবে আবির্ভূত হবেন তাঁদের ব্রতই হবে জীবনের সাধনার ও সিদ্ধির মধ্যে সত্যের সেই বৃহৎ সামঞ্জস্যকে সমুজ্জল করে তোলা যাতে করে এখানকার জনসমাজের সেই সাংঘাতিক বিশ্লিষ্টতা দূর হবে, যে বিশ্লিষ্টতা এদেশে অস্তরের সঙ্গে বাহিরের, আচারের সঙ্গে ধর্মের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির, বিচার-শক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রবল বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আমাদের মনুষ্যত্বকে শতজীর্ণ করে ফেলতে।

ধনীগৃহের প্রচুর বিলাসের আয়োজনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং আচারনিষ্ঠ সমাজের কুলক্রমাগত প্রথার মধ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া মহর্ষি নিজের বিচ্ছেদ-কাতর আত্মার মধ্যে এই সামঞ্জস্য-অমৃতের জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠেছিলেন; নিজের জীবনে

চিরদিন সমস্ত লাভক্ষতি সমস্ত সুখদুঃখের মধ্যে এই সামঞ্জস্যের সাধনাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং বাহিরে সমস্ত বাধাবিরোধের মধ্যে শাস্তম্ শিবমধৈতম্ এই সামঞ্জস্যের মন্ত্রটি অকুণ্ঠিত কণ্ঠে প্রচার করেছিলেন। তাঁর জীবনের অবসান পর্য্যন্ত এই দেখা গেছে যে তাঁর চিন্তা কোনো বিষয়েই নিশ্চেষ্ট ছিল না, ঘরে বাইরে, শয়নে আসনে, আহারে ব্যবহারে, আচাবে অনুষ্ঠানে, কিছুতেই তাঁর লেশমাত্র শৈথিল্য বা অমনোযোগ ছিল না। কি গৃহকর্ম, কি বিষয় কর্ম, কি সামাজিক ব্যাপারে, কি ধর্ম্যানুষ্ঠানে সুনিয়মিত ব্যবস্থার স্থাপন তিনি কোনো কারণেই অলমাত্রও স্বীকার করতেন না; সমস্ত ব্যাপারকেই তিনি ধ্যানের মধ্যে সমগ্রভাবে দেখতেন এবং একেবারে সর্দঙ্গীণ ভাবে সম্পন্ন করতেন—তুচ্ছ থেকে বৃহৎ পর্য্যন্ত বাহ্যিকের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল তাঁর কোনো অংশেই তিনি নিয়মের ব্যতিচার বা সৌন্দর্যের বিকৃতি সহ্য করতে পারতেন না। ভাষায় বা ভাবে বা ব্যবহারে কিছুমাত্র ওজন নষ্ট হলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে আঘাত করত। তাঁর মধ্যে যে দৃষ্টি, যে ইচ্ছা, যে আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল তা ছোটবড় এবং আন্তরিক বাহ্যিক কিছুকেই বাদ দিত না, সমস্তকেই ভাবের মধ্যে মিলিয়ে, নিয়মের মধ্যে বেঁধে, কাজের মধ্যে সম্পন্ন করে তুলে তবে স্থির হতে পারত। তাঁর জীবনের অবসান-পর্য্যন্ত দেখা গেছে তাঁর ব্রহ্মসাধনা প্রাকৃতিক ও মানবিক কোনো বিষয়কেই অবজ্ঞা করে নি—সর্বত্রই তাঁর ঐশ্বর্য্য অক্ষুণ্ণ ছিল। বাল্যকালে আমি যখন তাঁর সঙ্গে ডালহৌসী পর্বতে একবার গিয়েছিলুম, তখন দেখেছিলুম

একদিকে যেমন তিনি অন্ধকার রাতে শয্যা-
ত্যাগ কবে পার্কভাগ্নেহব বারান্দায় একাকী
উপাসনার আসনে বসতেন, ক্ষণে ক্ষণে
উপনিষৎ ও ক্ষণে ক্ষণে হাফেজের গান
গেয়ে উঠতেন, দিনের মধ্যে থেকে থেকে
ধ্যানে নিমগ্ন হতেন, সন্ধ্যাকালে আগার
বালককণ্ঠেব ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণ করতেন—
তেমনি আবার জ্ঞান আলোচনার সহায়স্বরূপ
তাঁর সঙ্গে প্রকৃতির তিন খানি জ্যোতিষ্ক
সম্বন্ধীয় বই, কাণ্টের দর্শন ও গিবনেব
রোমের ইতিহাস ছিল ; — তা ছাড়া এদেশের
ও ইংলণ্ডের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র হতে
তিনি জ্ঞানে ও কর্মে বিশ্বপৃথিবীতে মানুষেব
যা কিছু পরিণতি ঘটচে সমস্তই মনে মনে
পর্যবেক্ষণ করতেন। তাঁর চিন্তের এই
সর্বব্যাপী সামঞ্জস্যবোধ তাঁকে তাঁর সংসার-
যাত্রায় ও ধর্মকর্মে সর্বপ্রকার সীমালঙ্ঘন
হতে নিয়ত রক্ষা করেছে ; — গুরুবাদ ও
অবতারবাদের উচ্ছৃঙ্খলতা হতে তাঁকে নিবৃত্ত
করেছে এবং এই সামঞ্জস্যবোধ চিরন্তন সঙ্গী-
রূপে তাঁকে একান্ত দ্বৈতবাদের মধ্যে পপভ্রষ্ট বা
একান্ত অদ্বৈতবাদের কুহেলিকারাজ্যে নিরুদ্দেশ
হতে দেয় নি। এই সীমালঙ্ঘনেব আশঙ্কা
তাঁর মনে সর্বদা কি রকম জাগ্রত ছিল তার
একটি উদাহরণ দিয়ে আমি শেষ করব।
তখন তিনি অসুস্থ শরীরে পার্ক স্ট্রীট বাস
করতেন—একদিন মধ্যাহ্নে আমাদের জোড়া-
সাঁকোর বাটি থেকে তিনি আমাকে পার্কস্ট্রীটে
ডাকিয়ে নিয়ে বলেন, দেখ আমার মৃত্যুর
পরে আমার চিত্তভঙ্গ নিয়ে শান্তিনিকেতনে
সমাধি স্থাপনের একটি প্রস্তাব আমি শুনেছি ;
কিন্তু তোমার কাছে আমি বিশেষ করে বলে

যাচ্ছি কদাচ সেখানে আমার সমাধিরচনা
করতে দেবেনা।—আমি বেশ বুঝতে পারলুম
শান্তিনিকেতন আশ্রমের যে ধ্যানমূর্তি তাঁর
মনের মধ্যে বিবাজ করছিল, সেখানে তিনি
যে শান্ত শিব অদ্বৈতেব আবির্ভাবকে পরিপূর্ণ
আনন্দরূপে দেখতে পাচ্ছিলেন তার মধ্যে
তাঁব নিজের সমাধিস্তম্ভেব কল্পনা সমগ্র
পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যকে সৃষ্টিবিদ্ধ করছিল—
সেখানে তাঁব নিজেব কোনো স্বরণ চিহ্ন
আশ্রমদেবতার মর্গ্যাদাকে কোনোদিন পাছে
লেশমাত্র অতিক্রম করে সেদিন মধ্যাহ্নে এই
আশঙ্কা তাঁকে স্থির থাকতে দেয় নি।

এই সাধক যে অসীম শান্তিকে আশ্রয়
করে আপনার প্রশান্ত গভীরতার মধ্যে
অনুভবঙ্গ সমুদ্রেব ত্রায় জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেই শান্তি তুমি, হে শান্ত
হে শিব ! ভক্তের জীবনের মধ্য হতে তোমার
সেই শান্তস্বরূপ উজ্জলভাবে আমাদের জীবনে
আজ প্রতিফলিত হোক ! তোমার সেই
শান্তিই সমস্ত ভুবনের প্রতিষ্ঠা, সকল বলের
আধার। অসংখ্য বহুধা শক্তি তোমার এই
নিস্তর শান্তি হতে উচ্ছৃঙ্খিত হয়ে অসীম
আকাশে অনাদি অনন্তকালে বিকীর্ণ পরিকীর্ণ
হয়ে পড়চে, এবং এই অসংখ্যবহুধা শক্তি
সীমাহীন দেশকালের মধ্য দিয়ে তোমার এই
নিস্তর শান্তির মধ্যে এসে নিঃশব্দে প্রবেশ
লাভ করচে। সকল শক্তি সকল কর্ম সকল
প্রকাশের আধার তোমার এই প্রবল বিপুল
শান্তি আমাদের এই নানা ক্ষুদ্রতায় চঞ্চল,
বিরোধে বিচ্ছিন্ন, বিভীষিকায় ব্যাকুল.দেশের
উপরে নব নব ভক্তের বাণী ও সাধকের
জীবনের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষরূপে অবতীর্ণ

হোক! কুবক যেখানে অলস এবং দুর্বল, যেখানে সে পূর্ণ উত্তমে তার ক্ষেত্র কর্ষণ করে না, সেইখানেই শঃশুর পরিবর্তে আগাছায় দেখতে দেখতে চারিদিক ভরে যায়—সেই-খানেই বেড়া ঠিক থাকে না, আল নষ্ট হয়ে যায়, সেইখানেই ঋণেব বোঝা ক্রমশই বেড়ে উঠে' বিনাশের দিন দ্রুতবেগে এগিয়ে আসতে থাকে ;—আমাদের দেশেও তেমনি করে দুর্বলতার সমস্ত লক্ষণ ধর্মসাধনায় ও কর্মসাধনায় পরিস্কৃত হয়ে উঠেছে—উচ্ছৃঙ্খল কার্লানিকতা ও যুক্তিবচারণীন আচারের দ্বারা আমাদের জ্ঞানের ও কন্সেব ক্ষেত্র, আমাদের মঙ্গলের পথ, সর্বত্রই একান্ত বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে ; সকল প্রকার অদৃত অমূলক অসঙ্গত বিশ্বাস অতি সহজেই আমাদের চিত্তকে জড়িয়ে জড়িয়ে ফেলতে ; নিজের দুর্বল বুদ্ধি ও দুর্বল চেষ্টায় আমরা নিজে যেমন ঘবে বাহিবে সকল প্রকার অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে পদে পদেই নিয়মের স্বপ্ন ও অব্যবস্থাব বীভৎসতাকে জাগিয়ে তুলি তেমনি তোমার এই বিশাল বিশ্বব্যাপারেও আমরা সর্বত্রই নিয়মহীন অদৃত যথেষ্টাচারিতা কল্পনা করি, অসম্ভব বিভীষিকা সৃজন

করি, সেই জন্তই কোনোপ্রকার অন্ধ সংস্কারে আমাদের কোথাও বাধা নেই, তোমার চরিতে ও অস্থশাসনে আমরা উন্নততম বুদ্ধিব্রষ্টতার আবোপ করতে সঙ্কোচমাত্র বোধ করিনে এবং আমাদের সর্বপ্রকার চির-প্রচলিত আচার বিচারে মূঢ়তার এমন কোনো সীমা নেই যার থেকে কোনো যুক্তিতর্কে কোনো শুভবুদ্ধি দ্বারা আমাদের নিবৃত্ত করতে পারে। সেই জন্তে আমরা দুর্গতির ভয়সঙ্কুল সুদীর্ঘ অমাবস্তার রাত্রিতে দুঃখদারিদ্র্য অপমানের ভিতর দিয়ে পগভ্রষ্ট হয়ে কেবলি নিজের অন্ধতার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হে শান্ত, হে মঙ্গল, আজ আমাদের পূর্বাঙ্কণে তোমার অক্ষণবাগ দেখা দিয়েছে, আলোকবিকাশের পূর্বেই দুটি একটি করে ভক্ত বিহঙ্গ জাগ্রত হয়ে সুনিশ্চিত পঞ্চম স্বরে আনন্দবাক্তা ঘোষণা করচে, আজ আমরা দেশের নব উদ্বোধনের এই ব্রাহ্মযুহর্তে মঙ্গল পরিণামের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকে শিরোধার্য করে নিয়ে তোমার জ্যোতির্ময় কল্যাণসূর্যের অভ্যুদয়ের অভিমুখে নবীন প্রাণে নবীন আশায় তোমাকে আনন্দময় অভিবাদনে নমস্কার করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মান ও প্রেম।

মান চাহে তাপনার প্রভুত্বের বলে
প্রিয়জনে রাখিবারে ভূত্যের মতন।

প্রেম শুধু নম্র পদে ধীরে আসে চলে
বুকে লয়ে ক্ষমাময় আত্ম-সমর্পণ।

শ্রীকুমুদরজন ঘোষ।

স্বামী রামতীর্থ।

স্বামী রামতীর্থ বা গোঁসাই রামতীর্থ এম,এ, সন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দীপাবিতার পরদিনে, পঞ্চনদের গুজরানওয়ালা জেলার অন্তর্গত মুরলীওয়ালা গ্রামে, গোঁসাই হীরানন্দের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদগণ ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন এই শিশু জীবিত থাকিলে, কালে একজন মহাপুরুষ হইবেন।

হিন্দী রামায়ণ প্রণেতা মহাত্মা গোঁসাই

তুলসিদাস ইঁহার পূর্বপুরুষ। গুজরানওয়ালার গোঁসাইবংশ ধর্মচর্য্যার জন্ম চিরদিনই সুপ্রসিদ্ধ। ইঁহারা বংশপরম্পবাক্রমে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আফগানিস্থান প্রবাসী হিন্দুদিগের অধ্যাপনা ও পৌরহিত্যকার্য্যে নিযুক্ত। শিষ্যদিগের গুরুদক্ষিণা ইঁহাদের পারিবারিক ভরণপোষণের একমাত্র উপায় ও অবলম্বন।

বাল্যকাল হইতেই রামতীর্থ একজন



স্বামী রামতীর্থ।

ভক্তিপরায়ণ লোক ছিলেন। গ্রামে যে কোন গৃহে “কথকতা”, রামায়ণ পাঠাদি হইত রামতীর্থ তথায় গমন করিয়া শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে আগ্রহেব সহিত তাহা শ্রবণ করিতেন। মহাভারত রামায়ণ ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়া বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মনে ধর্মভাবের বিশেষরূপে উদ্দীপনা হয়। যাহা শুনিতেন বা পাঠ করিতেন শ্রদ্ধা সমন্বিত হইয়া বার বার সে বিষয়ে আলোচনা ও চিন্তা করিতেন এবং প্রত্যেক বর্ণনা ও ঘটনা হইতে একটি না একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বলাভ করিতে চেষ্টা করিতেন। দেব মন্দিরের আরতির সময় যখন শঙ্খ ঘণ্টাদি বাজিয়া উঠিত তখন রামের প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিত। তিনি দেবমন্দিবে প্রবেশ করিয়া প্রতিমা দর্শন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

শৈশবকালেই তাঁহার ভক্তিভাব ও স্মৃতীক্ষু বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া লোকে অবাক হইয়া যাইত। এখনও তাঁহার বৃদ্ধ গ্রামবাসিগণ তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, চিন্তাশীলতা নির্জ্বল-প্রিয়তা ও ভক্তিসত্তার কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন।

শিক্ষালয়ে তিনি শিক্ষকদিগের অতি প্রিয় ছিলেন, সকলেই তাঁহাকে আদর যত্ন ও শ্রদ্ধা করিতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল পরীক্ষায় তিনি উচ্চস্থান অধিকার করেন। বি, এ পরীক্ষায় ইনি প্রথম হন এবং অক্ষশাস্ত্রে এম, এ, দেন।

অক্ষশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। অক্ষশাস্ত্র আয়ত্ত্বাধীন করিতে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত পুরাণ সিংহের * প্রমুখ্যৎ শুনিয়াছি অধ্যয়ন-কালে তাঁহার অধ্যাপক একদিন তাঁহাকে অক্ষ শাস্ত্রেব একটী জটিল প্রশ্ন সমাধান করিতে দেন। রামতীর্থ দিব্যরাত্রি পরিশ্রম করিয়াও সেই সমস্যা নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া দুঃখে ক্ষোভে ছুরিকা দ্বারা আত্মহত্যা করিতে উত্তত হইয়াছিলেন। অবশেষে অতি পবিশ্রম ও তজ্জনিত অত্যধিক ক্লান্তিবশতঃ রাত্রি শেষে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। নিদ্রাবহায় নাকি তাঁহার নিকট ঐ জটিল প্রশ্নেব সূচাক সমাধান প্রতিভাত হয়। পবদিন অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার প্রশ্নের এইরূপ সহজ সমাধান দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

রাম দুই বৎসরের জন্তু লাহোর ক্রিস্চান কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং কিছুদিনের জন্তু লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজের পাঠক (Reader) নিযুক্ত হন। লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বেল সাহেব † (Mr. W. Bell) রামতীর্থের গুণের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। রামতীর্থ প্রাদেশিক শাসনবিভাগে কার্য গ্রহণ করেন ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অক্ষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত রামতীর্থের এ কার্য গ্রহণে ইচ্ছা হইল না। তাঁহার বড় সাধ ছিল তিনি অক্ষ-শাস্ত্রের লীলাভূমি কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া “নীল ফিতা”

* শ্রীযুক্ত পুরাণ সিংহ এফ্., সি, এস, Imperial Forest Chemist, স্বামী রামতীর্থের প্রিয়তম শিষ্য তাঁহার জীবন চরিতাখ্যক ও তাহার গ্রন্থাবলীর সম্পাদক।

† এখন Director, Public Instruction, Punjab.

(Blue Ribbon) পরিধান করিবেন। সেইজন্য তিনি সরকারী বৃত্তি লাভ করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন এবং যদিও সে বৎসর বৃত্তি তাঁহারই পাইবার কথা কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তাহা পাইলেন না। তাই রামতীর্থের নীল ফিতা আর পরা হইল না। তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং বৎসরকালের মধ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ধর্মার্থে জীবন উৎসর্গ করিলেন।

স্বামী রামতীর্থ চিরপ্রফুল্ল ছিলেন। সংসারের কোনও ঘটনাই তাঁহার সদানন্দ ভাবকে তিরোহিত করতে পারে নাই। তাঁহার সদানন্দভাব যে দেখিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। আমেরিকার Great Pacific Railroad Companyর কাৰ্য্যাধ্যক্ষ তাঁহার এই সদানন্দভাব দেখিয়া বলিয়াছিলেন ইহার হাস্য স্বতঃ উৎসারিত,* কিছুতেই ইহার প্রফুল্লতা বিনষ্ট হইতে পারে না। সেন্ট লুই প্রদর্শনীতে (St. Louis Exhibition) তাঁহার প্রশান্ত হাস্যোজ্জ্বল বদনমণ্ডল সকল চক্ষুর বন্দন হইয়াছিল।

স্বামী রামতীর্থের প্রেমোজ্জ্বল বদনমণ্ডল দেখিয়া মানুষ কি যেন একটা নূতন জিনিষের আভাষ পাইত, নবজীবনের দ্বার যেন তাহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়া যাইত, নবাকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিয়া উঠিত। তাঁহার নিকট কেহ স্থির শান্তভাবে বসিলে তিনি যেন তাহাকে উদ্ভে তুলিয়া ধরিতেন, নীচতা, ক্ষুদ্রতা হীনতা, মগ্নতা, সকল বিদূরিত হইয়া যেন স্বর্গীয় ভাবে তাহার মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

তাঁহার আত্মতত্ত্ব ও ভগবদ্ব্যবহার ব্যাখ্যা শুনিয়া লোকে মুগ্ধ হইয়া যাইত।



স্বামী রামতীর্থ—সন্ন্যাসীবেশে।

তাঁহার সেই স্নানধুব হাস্যময়, চিরপ্রফুল্ল বদনমণ্ডল দেখিয়া প্রাণমন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। তিনি যখন হাসিতেন কয়েক মিনিট ধরিয়াই হাসিতেন—মনে হইত কি যেন এক অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া আনন্দে বিভোর গিয়াছেন।

স্বামী রামতীর্থ অদ্বৈতবাদী ছিলেন। কিন্তু বর্তমান সময়ের বিকট অদ্বৈতবাদ তাঁহার অদ্বৈতবাদ এক নহে। তাঁহার অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা শুনিয়া অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা বিদূরিত হইয়াছে।

তিনি যখন বজ্র গম্ভীর স্বরে তাঁহার

* "His smiles are irresistible." "A cheerfulness that nothing could mar was his

স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় বলিতেন— “আমি রান বাদসা, আমার সিংহাসন তোমাদের হৃদয়ে সন্নিহিত। আমি যখন বেদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম, আমি যখন কুরুক্ষেত্রে জেরুসেলেমে, মেকায় ধর্ম শিক্ষা দিয়াছিলাম তখন তোমরা আমাকে চিনিতো পাব নাই। আমি এখন আবার গগনভেদী বাণী উখিত করিতেছি তোমরা শ্রবণ কর। আমার বাণী তোমাদেরই বাণী। যাহা দেখিতেছি শুনিতেছি তাহা তুমিই স্বয়ং, অশ্রু কেহ নহে “তত্ত্বমসি”। রাজা প্রজা দেব দানব কেহই এই সত্যের অপলাপ করিতে পারিবে না, সত্যের জর অপরিহার্য, সত্যের আদেশ অপরিবর্তনীয়। ভীত হইও না। আগাব মস্তক তোমারই মস্তক, কাটিতে হয় কাটিয়া ফেল কিন্তু ভাই জানিও এটি একটি ক্ষুদ্র মস্তকেব পরিবর্তে সহস্র মস্তক উখিত হইবে।”

তখন যেন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিত।

বামের প্রাণ প্রেমে পূর্ণ ছিল। একে অদ্বৈতবাদী তাহাতে আবার প্রেমিক। কোথায় পার্থক্য!! কোথায় বিচ্ছেদ!!! তাঁহার নিকট ভেদাভেদ কিছুই ছিল না; ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেই সমান, সকলেই এক। তিনি সকলকেই সমান ভাবে আলিঙ্গন করিতেন, এমন কি তাঁহার কাগজ কলম ছুঁই কাঁচি, পেন, পেনসিল সকলি প্রিয় সম্বোধনে সম্বোধিত হইত। সুহৃদব পুরাণ বলিয়াছেন, তিনি ইতব পশু পক্ষীদিগকে সম্মান সমৃতির গায় সম্বোধন করিতেন। তাঁহার নিকট কেহ পর কেহ ঘৃণ্য বা ঘণ্য ছিল না। সকলেই তাঁহার,

তিনি সকলের, সকলেই তাঁহার আশ্রয় তাঁহার আশ্রয় অংশ, সকলেই “আমি” মোহহং মোহহং।

কাহারও সহিত ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে রামতীর্থ সর্বতোভাবে তাঁহার সহিত আপনার ঐক্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেন। যখন মনে করিতেন তাহাব সহিত তাঁহার কোনও প্রকাব অনৈক্যভাব ভেদ বা পার্থক্য জ্ঞান নাই তখন শিব ধীর সমাহিতভাবে সত্যের নামে আপনার বক্তব্যগুলি বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। কথা বলিতে বলিতে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেন, তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিত এবং মুখ হইতে পারশ্রু কবিদিগের সুমধুর কবিতা সকল অনর্গল বাহির হইতে থাকিত। কিয়ৎক্ষণ পরে “ওঁ” “ওঁ” “ওঁ” করিতে করিতে নিস্তব্ধ হইয়া যাইতেন, তাঁহার চক্ষু হইতে দর দর ধারে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইয়া বক্ষস্থল সিক্ত করিত। তাঁহার সেই সুমধুর দেব দুর্লভ স্বর্গীয় ভাষা দেখিলে মনে হইত তিনি যেন আপনাকে ভুলিয়া তন্ময় হইয়া সমাধিমগ্ন হইয়াছেন।

সন ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার জাপানের রাঙ্কিন, (Ruskin) পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক ওকাকুরা (Okakura) ভারতে আগমন করেন। স্বামী বিবেকানন্দের সভাপতিত্বে জাপানে-সিকাগো ধর্মমহামণ্ডলের অনুষ্ঠায়ী একটি ধর্ম মহাসম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করা এবং যদি যুক্তিসঙ্গত ও সম্ভবপর হয় তাহা হইলে ভারত হইতেই তাহার বন্দোবস্ত করিয়া যাওয়া তাঁহার ভারত আগমনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

এই প্রস্তাবের অনুরূপে ভারতীয় সংবাদ পত্র সকল সদযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ভারতের প্রধান প্রধান নেতাগণ এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে অধ্যাপক ওকাকুরার সহিত এক যোগে কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একদিকে স্বামী বিবেকানন্দেব হঠাৎ অকাল মৃত্যু হইল, অন্যদিকে অধ্যাপক ওকাকুরা আপন স্বদেশবাসীদিগের মতামত গ্রহণ না করিয়া ভারতপ্রবাসকালেই এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন বলিয়া জাপানে তাঁহার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালিন্দল সংঘটিত হইল। তাহারা অভিমানে ও আক্রোশে এই ধর্ম্মমহাসম্মিলনের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালিত করায় এই প্রস্তাব জাপানে অগ্রাহ্য হইয়া গেল।

এই অশুভ সংবাদ ভারতে পৌঁছিতে বহু সময় লাগিয়াছিল। ভারতীয় সংবাদ পত্র সকল এই সংবাদ না পাইয়া অতি আগ্রহের সহিত জন সাধারণকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করিতেছিলেন। ভারতেব নানা স্থানে এই মহা সম্মিলনে যোগ দিবার জন্য প্রতিনিধি নিয়োজিত হইয়াছিল। এমন কি প্রতিনিধিগণ কোন জাহাজে জাপানে যাইবেন তাহা পর্য্যন্ত ঠিক হইয়া গিয়াছিল।

যখন ভারতে এই সব আন্দোলন হইতেছিল তখন স্বামী রামতীর্থ হিমাচল প্রদেশে (Tehri Garhwal) বাস করিতে ছিলেন। তিনি এসব আন্দোলনের কোন প্রকার সংবাদ জানিতেন না। হঠাৎ একদিন সংবাদপত্র পাঠে টিরৌরাজ এই ধর্ম্ম মহা-সম্মিলনের সংবাদ জানিতে পারিয়া স্বামী

রামতীর্থকে তাহার প্রতিনিধিরূপে এই মহাসম্মিলনে যোগদান করিতে অনুরোধ করিলেন। টিরৌরাজ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া প্রিয়শিষ্য শ্রীমান নারায়ণসহ স্বামী রাম কলিকাতা হইয়া জাপান যাত্রা করিলেন। পিনাং, হংকং প্রভৃতি স্থানে বিশ্রাম করিয়া পঞ্চবিংশ তিদিবস পরে তিনি ইয়োকোমাতে উপস্থিত হইলে। হংকং প্রবাসী ভারতীয় হিন্দু মুসলমানগণ তাঁহাকে অতি সমাদরে ররসহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

যদিও তিনি হিন্দু সন্ন্যাসী ছিলেন তথাপি মুসলমানগণও তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। এমন কি তাঁহারা তাঁহার মুসলমান শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের প্রিয়তম হাফেজের, এবং তাঁহাদের ভক্তিভাজন শামস্বা-ব্রেজের স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া সম্মান করিতেন। ইহা একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর পক্ষে কম সম্মানের বিষয় নহে।

স্বামী রামেরও মুসলমানধর্ম্মের প্রতি একটা ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ছিল। মুসলমান শাস্ত্র হইতে কোন বচন অথবা কোন মুসলমান সাধু সন্ন্যাসীর উক্তি স্বামী রাম অতি ভক্তিসহকারে উল্লেখ করিতেন।

স্বামী রাম ষ্টীমার বাসকালে প্রতি সন্ধ্যায় সহযাত্রীদিগকে লইয়া বেদান্তের আলোচনা করিতেন। তাঁহার প্রমুখাৎ বেদান্তের সূক্ষ্মধুর ও সরল ব্যাখ্যান শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন।

রামতীর্থ দুইদিন মাত্র ইয়োকোহামায় অবস্থান করিয়া টোকিও নগরে গমন করেন।

সেখানে কয়েকটি ভারতবাসী ছাত্র ইন্দো-জাপানিজ ক্লাব (Indo-Japanese Club) নামে একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত পুরাণ সিংহ মহাশয় সেই ক্লাবের সম্পাদক ছিলেন। রামতীর্থ ইন্দো-জাপানিজ ক্লাবের নাম শুনিয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হন।

শ্রীমান নারায়ণ, পুরাণকে উদ্দেশ্য করিয়া তাঁহার নিবাস কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে “আমরা বিশ্ববাসী” * বলিয়া পুরাণ উত্তর প্রদান কবেন। স্বামী রাম তৎক্ষণাৎ আপনার প্রশান্ত বদনমণ্ডল উত্তোলনপূর্বক গম্ভীর স্বরে বলিলেন “সর্বজীবে হিতসাধন আমাব ধর্ম”। তাঁহার এই বিশ্বজনীন প্রেমের বার্তা শুনিয়া সকলে ভক্তি গদগদ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় স্বামী রাম প্রোফেসর চাটার (Prof. Chatre) কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার শর্কাস দেখিতে গমন করেন। সেখানে টোকিও রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক তাকা কাৎসু (Taka Katsu) উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বামী রামের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া বলিয়াছিলেন যে স্বামী রাম একজন সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক। সুবিখ্যাত দার্শনিকদ্বয়

অধ্যাপক হিরাই (Hirai) এবং অধ্যাপক তানাকা (Tanaka) স্বামী রামের সহিত আলাপ পরিচয়াদি করিয়া অত্যন্ত শ্রীত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক তানাকা বলিয়া-ছিলেন “আমি অধ্যাপক মোক্ষমূলারের বাড়ীতে ও জর্মানিতে অনেক সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় পণ্ডিত ও দার্শনিকগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি কিন্তু রামের গ্রাম বেদান্ত দর্শনের একটি জীবন্ত প্রতিমূর্তি দেখি নাই। ইনি একজন অদ্ভুত মানুষ। †

টোকিও Higher Commercial College এর অধ্যক্ষ Baron Kanda স্বামী রামের সহিত আলাপ পরিচয়াদি করিবার জন্ত আপন ভবনে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি কেন সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন এবং তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করায় স্বামী রাম উত্তর করিয়াছিলেন “আনন্দে আমার অন্তর ফুলিয়া উঠিতেছে, আমি আনন্দে অধীর হইয়া আমার প্রিয়তম ভাই ভগিনীদিগকে এই অপার আনন্দ সম্ভোগ করিবার জন্ত আহ্বান করিতেছি। ভাই ভগিনীদিগের নিকট এই অপার আনন্দের সংবাদ প্রচার করা ভিন্ন আমার জীবনের অত্র কোন উদ্দেশ্য নাই। আমি সংসার

* তৎকালীন জাপান প্রবাসী স্বর্গীয় বঙ্গুবর রমাকান্ত রায় প্রমুখ ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ আপনাদিগকে বিশ্ববাসী বলিয়া পরিচয় দিতেন। রমাকান্তবাবু লেখককে সর্ব্ববাহি “তোমার সিকাইজেন (বিশ্ববাসী) বলিয় পত্র লিখিতেন। সিকাইজেন শব্দটি জাপানি ও ইংরাজি ভাষার অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

† Though I have met many Indian Pandits and philosophers at professor Max Mullar's house in Germany but I never saw before a living Picture of Vedanta philosophy as Rama. They knew Vedanta but this man is the teacher of Vedanta and he has full title to the claim. He is simply wonderful.

ত্যাগী নই, আমি ঘোর সংসারী।” ব্যারণ কান্দা রামের সেই আনন্দ বিচ্ছুরিত সমুজ্জ্বল বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া স্বয়ং আনন্দে অধীর হইয়া পরিবারস্থ সকলের সহিত রামেব পরিচয় করিয়া দিলেন।

অধ্যাপক তাকাকাংসুব বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, টোকিও রাজবীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রাম বেদান্তের ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করেন। কিন্তু অধ্যাপক চাটার আপন মার্কাস দল লইয়া আমেরিকা যাইবার জন্ত একটা জাহাজ ভাড়া লইয়া স্বামী রামতীর্থকে সেই জাহাজে আমেরিকা গমন করিতে অনুবোধ করায় এবং স্বামী রামের জাপানী ভাষায় অনভিজ্ঞতা বশতঃ বেদান্তেব বক্তৃতা প্রদত্ত হয় নাই।

যদিও তিনি জাপানে অত্যল্প সময় অবস্থান করিয়াছিলেন তথাপি ব্যারণ কান্দার অনুরোধে তিনি তাঁহার কলেজে Secret of Success সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতার সারমর্ম জাপান টাইমস্ (Japan Times) পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা পাঠ করিয়া জাপানের রুঘ দূত আলাপ পরিচয়াদি পরিবার জন্ত স্বামী রামকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। দুঃখের বিষয় এই নিমন্ত্রণ পত্র পাইবার দুইদিন পূর্বে স্বামী রাম জাপান পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন।

স্বামী রাম অগ্রত বহু শ্রোতৃমণ্ডলী সমক্ষে মহাত্মা বুদ্ধ সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সিকাগো ধর্মমহামণ্ডলে নৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধি

মহাত্মা হিরাই বলিয়াছিলেন স্বামী রাম যথার্থই একজন ঈশানুপ্রাণিত ব্যক্তি বটে।

স্বামী রাম প্রিয়শিষ্য নারায়ণকে ভারতে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিয়া সন ১৯৯২ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে আমেরিকার সান ফ্রান্সিস্কো (San-Francisco) নগরে উপস্থিত হন। তখন তাহার নিকট যথেষ্ট অর্থ ছিল না বা কোথায় যাইবেন তাহারও কোন স্থিরতা ছিল না। জাহাজ বন্দবে আসিবামাত্র আরোহীগণ নামিবাব জন্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন, কিন্তু স্বামী রাম স্থির ধীর গন্তীরভাবে ডেকের উপর পাদচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই নিশ্চিন্ত-ভাব দেখিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন, যে তিনি জাহাজের কোন লোক হইবেন। তাঁহার এই নিশ্চিন্তভাব দেখিয়া কোতূহলবশত আমেরিকার একটা সুবিখ্যাত সংবাদপত্রের প্রতিনিধি তাঁহার নিকট আসিয়া প্রশ্ন করিলেন :—

আপনার নাম কি ?

রাম। আমি একজন ফকীর।

প্রতি। আপনাকে দেখিয়া মনে হইতেছে আপনি একাকী আসিয়াছেন। আপনি কি জাহাজ হইতে নামিবেন না ?

রাম। আমি সর্বদাই একাকী আপন ভাবে থাকি।

প্রতি। আপনার কোন জিনিস পত্র নাই ?

রাম। আমি বাহা বহন করিতে পারি তদনুরূপ জিনিস রাখিয়া থাকি। তদতিরিক্ত কিছুই রাখি না।

প্রতি। আপনার নিকট যথেষ্ট অর্থ আছে ত ? আমেরিকা বড় শক্ত দেশ এখানে টাকা কড়ি না থাকিলে কেহ থাকিতে পারে না।

রাম। না, আমি টাকা কড়ি রাখি না।

প্রতি। আপনি তবে কি করিয়া এদেশে থাকিবেন ?

রাম। আমি আমার প্রতিবেশীদের সহিত প্রেমযোগ স্থাপন করি মাত্র। তাহার পর দেখিতে পাই আমার যখন যাহা প্রয়োজন তখন তাহাই পাই। আমার তৃষ্ণার সময় জলের বা আহারের সময় খাদ্যের অভাব হয় না।

প্রতি। বেশ ভাল কথা! কিন্তু ইহাতেই হইবে না। আমেরিকা আপনাব ভারতবর্ষ নয়। এখানে হয় টাকাকড়ি না হয় বন্ধু বাজ্বব চাই। এখানে আপনার কোন বন্ধু নাই ?

রাম। হা, এখানে আমার একজন দয়ালু বন্ধু আছেন।

প্রতি। আমি কি তাহার নাম জানিতে পারি ?

রাম সন্মুখে তাঁহার স্কন্ধোপরি আপন হস্ত স্থাপন করিলেন। ডাক্তার হিলার পূর্ব হইতেই রামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। রাম যখন তাঁহার স্কন্ধোপরি আপনার হস্ত স্থাপন করিয়া জানাইলেন যে তিনিই তাঁহার দয়ালু বন্ধু তখন ডাক্তার হিলার যেন কৃতার্থ হইলেন।

সেই দিন হইতেই রাম ডাক্তার হিলারের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মিসেস্ হিলার কোন বিশেষ কাৰণে অত্যন্ত মানসিক কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছিলেন। তাঁহার অব্যবস্থিত চিত্ত ও মানসিক চাঞ্চল্য দেখিয়া ডাক্তার হিলার অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত ছিলেন। রামকে পাইয়া তাঁহার সহিত ধর্মালোচনা ও ধর্ম চর্চা করিয়া মিসেস্ হিলারের মানসিক অবসাদ দূর হইল। ডাক্তার ও মিসেস্ হিলার রামকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তাঁহারা রামের প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহাদের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তাঁহার ধর্মপ্রচার কার্যে উৎসর্গ

করিতে চাহিয়াছিলেন। ডাক্তার হিলার সান্ ফ্রান্সিস্কোর যাবতীয় সংবাদপত্রে রাম সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখিতে লাগিলেন। ইহাতে নানা শ্রেণীর লোক রামের সহিত আলাপ পরিচয়াদি করিবার জন্য ডাক্তার হিলারের গৃহে প্রতি সন্ধ্যায় সমবেত হইতেন। তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া ধর্মালোচনা ও বেদান্ত চর্চা করিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে মানবাত্মা, ঈশ্বর, ইহকাল, পরকাল প্রভৃতি নানা বিষয়ে নানা প্রকাৰ প্রশ্ন করিতেন। ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তরে রাম বিশেষ আনন্দ পাইতেন। একদিন আত্মীয় স্বজন কর্তৃক অশেষ প্রকারে নিগৃহীতা একটা মহিলা রামের নাম শুনিয়া শান্তি পাইবার আশায় তাঁহার নিকট আসিয়া আত্মকাহিনী বলিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার আত্মকাহিনী বলিয়া যাইতেছেন আর তাঁহার চক্ষুদিয়া দর দর ধারে অশ্রুজল পড়িতেছে ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন। রাম যোগাসনারূঢ় হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে সেই তৃষ্ণপূর্ণ কাহিনী শুনিতেছেন, সময়ে সময়ে উচ্চৈঃস্বরে ওঁ ওঁ, মা মা বলিতেছেন, আর এক একবার সেই রোক্তমানা মহিলার প্রতি সক্রম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। রামের এই স্বর্গীয় ভাব দর্শন করিয়া মহিলার মনঃপ্রাণ ধীরে ধীরে শান্তভাব ধারণ করিল, তাঁহার নিকট নব আত্মতত্ত্ব প্রকাশ হইল;—তিনি যেন পরম শান্তি লাভ করিলেন। আত্মার অনন্ত ঐশ্বর্য্য দেখিতে পাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার ক্ষুদ্র ভাব বিদূরিত হইল, তাহার ক্ষুদ্র দুঃখ ক্ষুদ্র অশান্তি যেন অনন্তের মধ্যে মিলিয়া গেল, তিনি উচ্চ জীবনের আনন্দ পাইলেন এবং এই নব তত্ত্ব লাভ করিলেন

যে বিশ্বসংসারে মঙ্গলময় বিধাতার রাজ্যে দুঃখ কষ্ট শোক অশান্তি বলিয়া কোন বাস্তব পদার্থ নাই; একবার আপনাকে অনন্তের সুরে মিলাইয়া দাও দেখিতে পাইবে এ জীবন তানলয়যুক্ত একটি সুমধুর সঙ্গীত।

স্বামী রাম ইহার এই সুমধুর পরিবর্তন দেখিয়া ইহার সূর্য্যানন্দ নাম দিয়াছিলেন। ইনি অগ্র কেহ নন, ভারত প্রদক্ষিণকারিণী সুপরিচিত মিসেস্ ইভা ওয়েলমেন। (Mrs. Eva Wellman]

আর একটা মহিলা আপনার একমাত্র পুত্র হারাইয়া রামকে ঈশ্বরজ্ঞানে শান্তি পাইবার জন্ত তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রামকে বলিলেন, আমি যখন দেখিতেছি আমার মৃত পুত্র ফিরিয়া আসিবে না এবং মৃত্যুর মধ্যে কি যে এক অদ্ভুত রহস্য নিহিত রহিয়াছে তাহা ভেদ করা যখন আমার জ্ঞানের অগম্য তখন আপনার নিকট আমার এই বিনীত নিবেদন যে, আমি যাহাতে সুখী হইতে পারি আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহার একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিন। স্বামী রাম উত্তর করিলেন, “আমি যাহা করিতে বলিব তাহা যদি অকপট হৃদয়ে করিতে পার, ও তাহার যদি মূল্য দিতে প্রস্তুত হও তাহা হইলে আমি একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতে পারি।” “আপনি যে কোন মূল্য চাহিবেন আমি তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি” এইরূপ উত্তর প্রাপ্ত হইয়া স্বামী রাম বলিলেন,—হে নারী আমি তোমার নিকট আমেরিকান ডলার* চাহি না, আমার

সুখের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে আমি যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিব তাহাই দিতে হইবে। মহিলাটা ইহাতে সন্মত হইলে রাম বলিলেন হে মাতঃ তোমার গৃহের সম্মুখ দিয়া ঐ যে কাফ্রি বালক যাইতেছে তাহাকে যদি আপন পুত্রের স্থায় ভালবাসিতে পার এবং তাহার মধ্যে আপন প্রিয়তম মৃত পুত্রকে দেখিতে শেখ তাহা হইলে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি তুমি প্রকৃত সুখ পাইতে পারিবে। মহিলাটা বলিলেন, এ যে বড় কঠিন আদেশ। রাম বলিলেন, এ রাজ্যের এই নিয়ম।

মিষ্টার উইলিয়াম গিবন্স্ (Mr. William Gibbons) নামে এক সদাশয় ব্যক্তি রামের সহিত আলাপ পরিচয়াদি করিয়া রামকে খ্রীষ্টাত্মা (Crist-soul) বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। রাম তাঁহাকে স্বামী “নারদ” বলিয়া সম্বোধন করিতেন। যতদূর জানা গিয়াছে ইনি এখন সংসার ত্যাগী হইয়া ক্যালিফোর্নিয়াতে প্রেমানন্দে নারদীয় জীবন যাপন করিতেছেন।

স্বামী রাম আমেরিকার যেখানেই গিয়াছেন সেইখানেই সকলে তাঁহাকে মহা সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বেদান্ত ও ধর্মসম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। পূর্ব সাত্রাজ্যের মিনেসিওটা (Minnesota) বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি “থরো, এমার্সন, ওয়ালট্, হুইটম্যান, ও কার্লাইল (Thoreau, Emerson, Walt Whitman, Carlyle) উদ্ভাসিত “নবধর্ম চিন্তায় বেদান্তের প্রভাব” সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। তাহা শ্রবণ করিয়া সুপ্রিয়গুণী

* প্রায় তিন টাকা।

মুগ্ধ হইয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন যে স্বামী রাম ধর্ম ইতিহাসে নবপত্র সংযোজিত করিলেন। রামের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহা বা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ উপাধি প্রদান করিবার জন্ত প্রস্তাব উপস্থিত করেন। উপাধি প্রদানের কথা শুনিয়া রাম হাসিতে হাসিতে এই বলিয়া উপাধি গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন যে যিনি মাননকে “ঈশ্বরত্বের” উপাধি প্রদান করিতে চান তাহাকে তোমরা আব কি উপাধি দিবে।

মিসব দেশেও স্বামী রাম অতিশয় সম্মানিত হইয়াছিলেন! স্বামী রাম যেখানেই গিয়াছেন সেইখানেই আপন ধর্ম প্রাণতা, সলজ্জ বিনয় ও সরল মধুর ভাবের দ্বারা সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। ঠাহার তাঁহার সম্পর্কে আসিয়াছিলেন তাঁহার চরিত্রের প্রভাব, তাঁহারাই বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

স্বামী রাম যে কেবল ধার্মিক বা গণিতজ্ঞ ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন প্রভূত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়া প্রবাসকালে ডাক্তার হিলার তাঁহাকে একদিন শাস্ত্রা প্রসঙ্গের (Shasta spring) রমণীয় উপত্যকাভূমি দেখাইবার জন্ত লইয়া যান। সেখানে কয়েকটা ভদ্রলোক তথাকার সর্বোচ্চ পর্বতে কে প্রথমে উঠিতে পাবেন তাহা লইয়া বাজী রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আল্প পর্বত উল্লঙ্ঘনকারী কয়েকজন ভদ্রলোকও ছিলেন। কিন্তু স্বামী রামই সর্বপ্রথমে সর্বোচ্চ স্থানে উঠিয়া গেলেন। স্বামী রাম আর একবার একজন আমেরিকান

সৈনিক পুরুষের সহিত ত্রিশ মাইল ব্যাপী দৌড়ে নিযুক্ত হন, এখানেও তিনি সৈনিক পুরুষের কয়েক মিনিট পূর্বে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

স্বামী রামতীর্থ ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের বড়দিনের সময় ভাবতে প্রত্যাগমন করবেন। তিনি আমেরিকার কি কাজ করিয়াছিলেন তাহা সংবাদপত্র পাঠে জানিবার উপায় নাই। তাঁহার কার্যাবলীর বিবরণ যাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল তাঁহার আমেরিকার বন্ধুবান্ধবেরা ভারত আগমনকালে তাহা তাঁহাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সেই সব বিবরণ সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তিনি আমেরিকা হইতে আপন কার্যাবলীর কোন সংবাদ দেন নাই বা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই।

স্বামী রামতীর্থ ভারতে আগমন করিলে তিনি কোন নূতন ধর্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিবেন কিনা তাঁহাকে প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভারতে অনেক ধর্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি কোন নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চান না। তাঁহার সকল সম্প্রদায়ের সহিত যোগ রাখিয়া সার্বভৌমিক সত্য ও বিশ্বজনীন প্রেম প্রচার করিবার ইচ্ছা ছিল। তবে যতদূর আমরা জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছি ব্রাহ্মসমাজের সহিতই তাঁহার মতের বিশেষ ঐক্য ছিল।

স্বামী রাম ভারতে আসিয়া দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, দেৱাদুন প্রভৃতি স্থানে আপনার ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। কালীধামে গিয়া সেখানকার ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্যদিগের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।

অব্রাহাম শাস্ত্রে একান্ত বিশ্বাসবান পণ্ডিতবর্গ সরল যুক্তি মার্গেব আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহারা প্রত্যেক প্রতিপাদিত সত্যকে শাস্ত্রবচন দ্বারা সমর্থিত দেখিতে একান্ত প্রয়াসী। যে তর্কের মূলে শাস্ত্রের সমর্থন নাই তাহা অতীব যুক্তিসঙ্গত ও ত্রায়াসুমোদিত হউক না কেন তাঁহাদের নিকট তাহার কোন মূল্য নাই। স্বামী রাম তাঁহাদের মত শাস্ত্রে বিশেষ পাবদর্শী ছিলেন না, বিশেষতঃ শাস্ত্রবচন তাঁহার একেবারেই কণ্ঠস্থ ছিল না, সেই হেতু আপন ধর্মমত প্রচারে বিশেষ ফললাভ করিতে পারেন নাই। তিনি নিজেই শাস্ত্রালোচনা করিবার জন্ত টিরীরাজের আশ্রয়ে ভাগীরথে তাঁরে “রামাশ্রম” প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর তারিখে স্নান করিতে গিয়া হঠাৎ তিনি জলমগ্ন হন। স্নানান্তে ভাগীরথীকূলে বসিয়া প্রাণায়ামে নিযুক্ত ছিলেন হঠাৎ প্রবল জলস্রোত আসিয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। তাঁহার মৃতদেহ দৃষ্টে মনে হয় তিনি তৎকালে সমাধিমগ্ন ছিলেন। স্বামী রামও রাজর্ষি রামমোহনের ত্রায় মানবজাতির একটা প্রকৃতিগত একতা দেখিতে পাইয়া ছিলেন। এই উদার সার্বভৌমিক ভাব একদিকে তাঁহাতে বিশ্বজনীন প্রেম অন্তর্দিকে অসাধারণ স্বজাতি প্রীতি ও স্বদেশ বাৎসল্য উৎপন্ন করিয়াছিল। তিনি “আমেরিকাবাসীদের নিকট নিবেদন” শীর্ষক বক্তৃতায় হতভাগিনী জন্মভূমিনী জন্মভূমির কথা এইরূপে বলিয়াছিলেন—

“সত্য বটে অতীত কালে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ

ভাবে ভারত জগতকে বিভিন্ন ধর্ম প্রদান করিয়া ছিলেন কিন্তু রাম আজ তোমাদিগকে বলিতে চাহিতেছেন যে আজ কাল যে সকল নব ধর্ম ও নব মত ইউরোপ ও আমেরিকাকে আলোড়িত করিতেছে তাহারও আলোক এখনও ভারত হইতে আসিতেছে। তোমাদিগের নব চিন্তা, নব ধর্মতত্ত্ব, প্রেত বিদ্যা, (Spiritualism) ঐষ্টবিজ্ঞান, মানসিক চিকিৎসা (Mental Healing) প্রভৃতি যাহার জন্ম আজ তোমরা এত গৌরব অনুভব করিতেছ ইহাদের সকলেরই মূল পুণ্য ভারত ভূমি। যে দেশ পুরাকালে এবং বর্তমান সময়ে জগতকে নানাবিধ দর্শন শাস্ত্র প্রদান করিয়াছেন রাম আজ তোমাদিগকে সেই দেশের কথাই বলিতেছেন। দর্শনেতিহাস আজ সুস্পষ্টরূপে প্রচার করিতেছেন প্লেটো, সক্রেটিস্, পিগা গোরাস্, প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকগণ ভারতবাসীর দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। সপেনহার স্নাগেল, স্মিলিং, কুজিন্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা শঙ্কর, বুদ্ধ, উপনিষদ ও গীতা হইতেই উদ্দীপনা লাভ করিয়া ছিলেন। যে দেশের উচ্চ চিন্তা ও মহৎ আদর্শ তোমাদিগের ভক্তিভাজন এমার্শন, ছুইটম্যান, আর্নল্ড, মোক্ষমুলার প্রভৃতিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, রাম আজ তোমাদিগকে সেই শঙ্কর ও শ্রীকৃষ্ণের দেশের কথাই বলিতেছেন। ভারত যে কেবল উচ্চ চিন্তা ও মহৎ আদর্শ কাব্য ও দর্শনের জন্মভূমি তাহা নহে তিনি শৌর্য বীর্যের জন্মও সুবিখ্যাত। যে দেশ এককালে ধনরত্নে পরিপূর্ণ ছিল, যাহার ধনরত্ন আহরণ করিয়া জাতির পর জাতি ঋদ্ধিমান হইয়াছেন এবং যে লোভনীয় দেশের অনুসন্ধানে বাইয়া কলম্বুস্ আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া ফেলেন, রাম আজ তোমাদিগকে সেই দেশের কথাই বলিতেছেন। ভারত যে কেবল শৌর্য বীর্যে জগতের শীমস্থানীয় ছিলেন তাহা নহে, ভারত জ্ঞানে, গুণে ও ধর্মে জগতের শীম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। যে মাতা জগতকে কাব্য ও দর্শন, উচ্চ চিন্তা ও উন্নত ধর্মদ্বারা পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন জগতের সেই প্রাচীন শিক্ষাদাত্রী জননী

আজ রোগশয্যায় শাঙ্কিত। তোমরা কি এখন তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইবেনা?”

রাম ভাবতের দুঃখ কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া উন্নতের ঞায় বলিয়া-
ছিলেন যে,—

“তোমরা রামের দেহকে পরিত্যাগ করিতে পার, রামকে নিষ্পেষিত করিতে পার, রামকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পার, রামের দেহ লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার কিন্তু দোগাই তোমাদের ভারতের পক্ষ অবলম্বন কর, সত্যের পক্ষ অবলম্বন কর।”

জাতিভেদেব কথা বলিতে গিয়া বলিয়া-
ছিলেন,—

“কে তুমি কে আমি যে নিম্নশ্রেণীর কার্যকে নীচ বলিব বা ঘৃণা করিব। পুরোহিত যোদ্ধা বা ব্যবসায়ী অপেক্ষা তাঁহাদিগের কার্য কিম্বে হীন? ভারতের অবস্থা এমনই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে পথ দিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যেরা গমনাগমন করেন সে পথ দিয়া শূদ্রের যাইবার অধিকার নাই। যে গ্রামে ব্রাহ্মণ কাযস্থ বাস করিবেন সে গ্রামে নিম্নশ্রেণীর বাসের অধিকার নাই। যদি শূদ্রের ছায়া ব্রাহ্মণের উপর পতিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে স্নান করিয়া পবিত্র হইতে হইবে, যদি নিম্নজাতির লোক কোন দ্রব্য স্পর্শ করেন তাহা হইলে তাহা অপবিত্র কলুষিত হইয়া উচ্চ জাতির ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া যায়। নিম্ন জাতির বালকগণ উচ্চ জাতির বালকদিগের সহিত একই বিদ্যালয়ে পড়িতে পায় না। ইহা অপেক্ষা অমানুষিক অত্যাচার আর কি হইতে পারে। এমন কথা ভাবিতে রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়!”

নারী জাতিকে রাম বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাদের উল্লেখ কবিয়া বলিয়া-
ছিলেন,—

“ইহারা স্বর্গীয় জিনিস, ইহাদিগকে পূজা করিতে হয়। ইহারা দেবতা, আত্মদেব সৌন্দর্য্যসূচ্যের সমুজ্জ্বল রশ্মি। যে শাস্ত্র, যে বিধি নারী ও শূদ্রকে

অজ্ঞানাকারে নিবন্ধিত রাখিতে চায় তাহাকে কৰ্ম্মনাশার জলে নিক্ষেপ কর।”

স্বামী রাম বেদান্তদর্শনের জীবন্ত প্রতিমূর্তি ছিলেন। অনেকে বেদান্ত পাঠ কবিয়াছেন বেদান্ত আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু কেহ রামের মতন জীবনে বেদান্ত প্রতিপালন করেন নাই। কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য দার্শনিক যিনিই রামের সহিত আলাপ করিয়াছেন, সহবাস করিয়াছেন, তিনিই একবাক্যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

রাম সত্যের জ্ঞান দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিনি কোনও দিনই শাস্ত্রের অর্থ কদর্য্য করিয়া আপনার মত সমর্থন করেন নাই। যেখানেই শাস্ত্রের সহজ ও সরল অর্থের সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য হইয়াছে সেখানেই সুস্পষ্টরূপে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এখানেও রাঙাধি রামমোহনের কথা মনে পড়ে। তিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তিনি কোনও স্বার্থসিদ্ধির জ্ঞান শাস্ত্রের কদর্য্য করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই।

স্বামী রাম সরলতার আদর্শ ছিলেন। তাঁহার সরল অমায়িক ভাব দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা সরল স্পষ্ট কথায় বলিয়া যাইতেন। লোক বা সমাজ বিশেষের খাতির রাখিতেন না। দেবতানুষ্ঠান আর্য্যসমাজ মন্দিরে বক্তৃতাকালে তাঁহাদের অতি প্রিয় “হোমযজ্ঞের” অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপলক্ষে বলিয়াছিলেন—

“অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কবিয়া বায়ু পরিষ্কার করিবার জ্ঞান হোমের প্রয়োজন নাই। এতি গৃহে শত সহস্র

অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইতেছে, কত শত বনাগ্নি সংঘটিত হইতেছে তাহাতে বায়ু সংশোধিত হইতেছে না আর আর্ধ্য সমাজে কয়েকটা হোম যজ্ঞ করিলেই বায়ু পরিষ্কৃত হইয়া যাইবে ইহা অতি অবৈজ্ঞানিক কথা, অতি অসত্য কথা।”

অনেকে বিদেশে গিয়া এদেশের কুরীতি ও কুনীতি সকলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কবিয়া আপনাদিগের গৌরব করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বামী রাম এ সব ঘৃণা করিতেন।

যাহা লইয়া ভারতের যথার্থ মহত্ত্ব সেই শাস্ত্রত সত্যের উপর দৃষ্টিমান হইয়া স্বামী রাম মাতৃভূমির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

এমন ধার্মিক, বিনয়ী, সত্যপরায়ণ, সরলতার সৌম্যমুদ্রি স্বদেশভক্তের অকাল-মৃত্যুতে ভারতের কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ভগবানই জানেন। লীগাময় বিধাতার লীলা কে বৃথিবে ?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

পরীক্ষার্থী

পাস কোবতেই হবে এই মনে কোরে যখন সুরেশ তার ছোট পড়বার ঘবটির দরজা জানলা খুলে দিয়ে ‘ভবিষ্যুক্ত’ হোয়ে পড়তে বসল, তখন সবে ভোর হয়েচে। দরজাব ভিতর দিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে প্রভাতেব বায়ু, অনন্ত পুকষের আশীর্বাদেব মত, অবাদে ঘরে প্রবেশ করে তার সর্বাঙ্গে কোমল স্পর্শ বুলিয়ে গেল। সুরেশ আনমনে সাইকলজির পাতা উল্টাতে লাগল। ভোর যে হয়েচে সে কথা পাখীবা প্রথম রটিয়ে দিলে। পাখীর প্রভাতী সঙ্গীত রক্তেব প্রবাহের মত তার শিরায় শিরায় ছুটে গেল। সে মাথা তুলে চেয়ে দেখলে, ছোট ছোট শাদা শাদা মেঘ আকাশময় ছড়িয়ে পড়ে আছে। যখন তা দেব উপর সূর্যোর কিরণ এসে পড়ল তখন মনে হল যেন বিষ্ময়ে ও আনন্দে আকাশ রোমাঞ্চিত হোয়ে উঠেছে। প্রভাতের আসার সংবাদ ক্রমে পৃথিবীর কাছে এসে পৌঁছল। গাছগুলো হাত পা মেলে লাগল, পাতাগুলো বাতাসের

উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের শরীর দোলাতে লাগল, ফুগের কুঁড়ি জগতের প্রাণের ভিতর ঢোকবার জন্তে সৌরভ নিয়ে বেরিয়ে এল। পথ দিয়ে ছ’একটা লোক চলতে আরম্ভ করলে। পৃথিবীর লোক কাজের জন্ত ছুটল। একাজের কি শেষ নেই? কি নিশ্চয় কাজ। সুখ দুঃখ রাখবার ঠাই নেই, হৃদয়ের পানে তাকাবার অবসব নেই, প্রাণের প্রতি সুরিচার কোরবার সুযোগ নেই। কি নিষ্ঠুর কাজ! বিয়োগবিধুবা জননী নিঃশব্দে চোখের জল মুছে গৃহকাজে রত হলেন, পতিহীনা রমণী মনেব আশুগ চাপা দিবার জন্ত উননের আশুগ জ্বালেন, শোকসন্তপ্ত পিতা পুত্র-শোক ভুলবার জন্তে সাংসারিক হিসাবে মনোনিবেশ কোরেন। এত দুঃখ এ পৃথিবীতে, এত কষ্ট এ জীবনে! ছ’পাতা সাইকলজি পড়ে কি এ দুঃখ দূব হবে, এক চ্যাপটার লজিক কি এ কষ্টের অপনোদন কোরবে! সুরেশ বই ফেলে রেখে পৃথিবীর

কাজের ভিতর আপনার মন নিয়ে প্রবেশ কোরে দেখলে, এ কাজের বিরাম নেই, এ কাজের অন্ত নেই। নিষ্ঠুর কাজ বিরাট অজগর সর্পের মত মানুষের হৃদয় পিষে দিচ্ছে। সুরেশের তখন আর পড়া হল না।

বেলা এগারটাব সময় সুরেশের মা সুরেশের ঘরের দরজা থেকে ডেকে বোললেন, সুরেশ, নাবি খাবি আয় বাবা। পড়ে পড়ে যে শরীরটা নাটি হোয়ে গেল, ধন। সুবেশ মায়ের কথা শুনে লজ্জিত হোয়ে বই বন্ধ কোরে স্নান কোরতে গেল। দেখলে, তার জন্মে স্নানের জল তোলা আছে, কাঁচের বাটিতে জবাকুসুম তেল ঢালা আছে। কাপড় খানি ও গামছা খানি পর্য্যন্ত হাতের কাছে সাজান আছে। সুরেশের ছোট বোন মালতী মায়ের আদেশে দাদাকে তেল মাখাতে ব'সল, এবং সুরেশের মা তার ভাত বাড়তে রান্নাঘরে গেলেন। সুরেশ পরীক্ষা দেবে বোলে বাড়ী-শুদ্ধ লোক শশব্যস্ত। সুরেশের বাবা আফিস চলে গিয়েছেন কিন্তু আফিস যাবার আগে গৃহিনীকে বিশেষ ভাবে বোলে গিয়েছেন যেন সুবেশের আহারের উপর নজর রাখা হয়। গৃহিনী তাই সুরেশের জন্ম ভোজের আয়োজন কোরেছেন। সুরেশ যখন খেতে বসল তখন তার মা কাছে বসে, 'এটি খাও ওটি খাও' বোলে অনুযোগ কোরতে লাগলেন, মাছের কাঁটা বেছে দিলেন, নিজে হাতে দুখে অনেক কোরে ভাত মে। দিলেন। সুরেশ ভাত খেতে খেতে ভাবলে, সকালে যেমন পড়া হয় নি, দুপুর বেলা এমন মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে, যাতে সকালের ক্ষতিটা পূরণ হয়। ভাত খাওয়া শেষ হোলে যখন সে

পড়তে গেল তখন সুরেশের মা বাড়ীর সব মেয়েদের ডেকে নিয়ে উপরে চলে গেলেন এবং তাদের বার বার কোরে বোলে দিলেন যেন তারা সুরেশের পড়বার ঘরের দিকে একেবারে না যায়। দাদা পরীক্ষা দেবে বোলে সুরেশের ছোট ছোট ভাই বোনেরা অতি সন্তুষ্টের সহিত সুরেশের পড়বার ঘরটি এড়িয়ে গেল। সমস্ত দিন তারা চুপে চুপে খেলা কোরতে লাগল। কেউ গোলমাল কোরলে মালতী অমনি বোলে উঠল, চুপ, কর ভাই, দাদা পড়ছে। সুরেশ পড়বার ঘরের সকল দরজা বন্ধ কোরে দিয়ে কেবল একপাট জানালা খুলে রেখে পড়তে ব'সল। নীতিশাস্ত্রের দরজা ধোরে যখন সুবেশের বুদ্ধিটা বিস্তর কাঁকাকাঁকি কোরতে এমন সময় সুরেশের তন্দ্রা এল। ঘুমের ভারে তার চোখের পাতা বুজে এল, সে বইয়ের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল'। ছুর্গরক্ষককে অনবধান দেখলে বন্দী যেমন এক দিক দিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ে, সুরেশের মনও সেই রকম সুরেশকে নিদ্রিত দেখে ওখাও হোয়ে অনন্তের পথে ছুটল'। বাড়ীর উপর দিয়ে কতক গুলি কাক একসঙ্গে কাকা কোরতে কোরকে উড়ে গেল। আততায়ীর দেশে সশস্ত্র সৈনিকের মত, হুঃস্বপ্নময় ঘুম থেকে সুরেশ চমকে উঠে বসল। সেই সময় অনেক দূরে একটা চিল চীৎকার কোরে উঠল। তার চীৎকারে আকাশের আধখানা কেঁপে উঠল। প্রকৃতির নিস্তরুতা তরঙ্গায়িত হোয়ে উঠল। ঠিক সেই সময় আবার বাড়ীর পাশেব রাজ-মিস্ত্রীরা সমস্বরে গান ধরলে,—রাধে গো তোরা সাধের তরী লেগেছে প্রেমের ঘাটে। বাড়ীর

পাশ দিয়ে কতক গুলা রাজহাঁস এক জোটে প্যাঁক প্যাঁক কোরতে কোরতে পাড়া জাগিয়ে চোল্লো। চিলের চীৎকারের সঙ্গে মানুষের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আর সেই হাসের ডাকের সঙ্গে সুরেশের মনের কি ষড়যন্ত্র ছিল জানি না। কিন্তু সেই চীৎকার আর সেই গান আর সেই ডাক আর সুরেশের ঘরের শত্রু মন এমন কোরে সুরেশকে মাতিয়ে দিলে যে সে আর কিছুতেই ঘরের মধ্যে চূপ কোরে বসে থাকতে পারলে না। সুরেশের মনে হ'ল যেন সমস্ত বিশ্বজীবন তাব জীবনকে ডেকে নিচ্ছে। তার প্রাণ যেন সব নিস্তব্ধতা সব শব্দের ভিতর তার প্রিয়-তমের সাড়া পেয়েছে। অপরিচিতের মধ্যে মাতৃহারা শিশু যেমন ফুকুরে কেঁদে ওঠে, সুরেশের হৃদয়ও তেমনি শুষ্ক কঠোর অক্ষর রাশির মধ্যে কেঁদে উঠল'। সুরেশ তাড়া-তাড়ি ঘরের বার হোয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। রাস্তার রৌদ্রতপ্ত ধূলি এমন কোরে তার পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেল যেন তারা সুরেশের চরণে শরণ লাভ কোরে বাচল। শেষ বেলার পড়ন্ত রৌদ্র কিরণ এমন ভাবে সুরেশের গায়ের উপর এসে পড়ল যেন সেও সুরেশকে পেয়ে বড় খুসি। আকাশ তার স্থির চক্ষু বিস্তার কোরে নীরব তিরস্কার জানিয়ে যেন বোললে, নীতিশাস্ত্র ও শাস্ত্রশাস্ত্রের চেয়ে তারই সুরেশের উপর বেশি দাবী। আকাশ বাতাস ও আলোর মধ্যে সুরেশ নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

সন্ধ্যার সময় সুরেশের পিতা রামতারণবাবু আফিস থেকে ফিরে এসে দেখলেন, সুরেশ তখনো বই হাতে কোরে বসে আছে। ঈষৎ

ভৎসনার সুরে তিনি সুরেশকে বল্লেন, “সন্ধ্যা হয়েছে, আর কেন? এখন একটু বেড়িয়ে এস গিয়ে। সন্ধ্যার সময় ঘরে বসে থাকলে অস্থখ করবে যে!” সুরেশ খাবার খেয়ে বেরিয়ে গেলে পর রামতারণবাবু স্ত্রীকে বল্লেন, “আমার ত সাতাশ বছর চাকরী করা হল। তা আমি এই মাস থেকেই পেনসন নিচ্ছি।” স্ত্রী বল্লেন, “ভালই হল। তোমার শরীরটা বড় খারাপ হোয়ে গিয়েছে। আর খাটবার বয়স নেই—আর সুরেশও ত মানুষ হয়ে উঠল।” রামতারণবাবু বোল্লেন, “আমি তাই ভেবেই ত পেনসন নিলাম। এই কটা মাস বৈ ত নয়। সুরেশ বিয়েটা পাস কোরতে পারলে আর দুঃখ থাকবে না। বড় সাহেবকে বোলেছিলাম, তিনি ভরসা দিয়েছেন ছেলে বিয়ে পাস কোরলে নিশ্চয়ই বড় চাকরী কোরে দেবেন।” সুরেশের মা তাই শুনে ভারী খুসি হলেন। সুরেশ ভাল ছেলে, বিয়ে পাস কোরবেই। এখন তার বিয়ে দিয়ে একটি সুন্দর বৌ আনতে পারলেই তাঁর সকল সাধ পূর্ণ হয়। রামতারণবাবু আফিসের কাপড় ছাড়তে ছাড়তে জিজ্ঞাসা কোরলেন, “আজ ঘটক ঠাকরুণের আসবাব কথা আছে না?” স্ত্রী ঘর ঝাঁট দিতে দিতে বল্লেন, “হাঁ আজকেই ত আসবে, আমি কিন্তু বোলে দিয়েছি নগদ তিন হাজার টাকার কম ছেলের বিয়ে দেব না। মালতী দিদি তার ছেলের বিয়ে দিয়েচে দেখেচ ত? ছেলে ভারী ত একটা পাস কোরেচে। তবু সাড়ে তিন হাজার টাকা নগদ নিয়েচেন, তা ছাড়া ঘড়ি, ঘড়ির চেন, ছেলের জন্মে বাইসিকেল। এ ছাড়া মেয়েকে এক গা গয়না দিয়েছে। আমার ছেলে কি

যেমন তেমন ছেলে। তবু ত আমি তিন হাজার টাকার বেশি বলি নি।” রামতারণবাবু রসগোল্লাটি গালে পুরে দিয়ে বোলেন, সুরেশের বিয়ের জন্তে আবার ভাবনা কিসের? ওরা তিন হাজার টাকা না দেয় আমি হরি সান্যালের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব, তারা চার হাজার টাকা দিতে চেয়েচে। সুরেশের মা, ‘বেশি লোভ কোরতে নাই গো’ বোলে প্রদীপটি জ্বলে নিয়ে রান্নাঘরে গেলেন। ভাতের হাঁড়িটা উননে চাপিয়ে সরা চাপা দিয়ে যখন তিনি আলুর খোসা ছাড়াতে বসেছেন তখন ঘটক ঠাকরুণ ‘বাড়ীর সব কোথা গো’ বোলে হেলে ছলে পান চিবুতে চিবুতে এনে হাজির হলেন। সুরেশের মা বটিখানা সরিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি একখানা পিঁড়ি পেতে দিলেন আর মেয়েকে বোলেন, “যালো তোরা বিরাজী মাসিকে ডেকে নিয়ে আস। বোল্গে ঘটক ঠাকরুণ এসেছে, শীগগীর এস।” বিরাজী ঠাকরুণ আঁচলে চাবির গোছা ঘেঁধে হাসতে হাসতে এসে উঠলেন। তখন ঘটক ঠাকরুণ ও ছেলের মা ও ছেলের মাসী গয়নার ফর্দ আর টাকার পণ নিয়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত কোরলেন। মেয়ের বাপ মোটে আড়াই হাজার টাকার পণ দিতে স্বীকৃত হওয়ায় বিরাজী ঠাকরুণ গালে হাত দিয়ে বলে উঠলেন, “ও মা এই না কি কথা! তিনটে পাস করা ছেলের বিয়ে কি আড়াই হাজার টাকায় হয়? সুরেশের মা কোলের মেয়েটাকে ধপ কোরে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে ডালের হাঁড়িতে সজোরে কাঠি নাড়তে লাগলেন। সে রাত্রে কিছুই মীমাংসা হল না।

তার পর দিন সকালে ঘটক ঠাকরুণ

পুনরায় এসে বোলে গেলেন যে মেয়ের বাপ তিন হাজার টাকাই দিতে স্বীকার কোরে-ছেন। তখন বিরাজী ঠাকরুণ শাঁখাটা নিয়ে সজোর তিনবার ফুঁ দিলেন, বাড়ীর বি বিয়েতে নগদ নেবে বোলে সুরেশের মার কাছে বায়না ধরলে, ঘটক ঠাকরুণ বোল্লে, আমি দশ টাকার কম বিদেয় নেব না। সুরেশের ছোট ভাই বিপিন বোল্লে, দাদার বিয়েতে আমি জুগী গালী চলব। বিরাজী ঠাকরুণের পাঁচ বছরের একটি ছেলে রস-গোল্লার ভারী ভক্ত। সে বোল্লে, বিয়েতে আমি রসগোল্লা পরিবেশন কোরব। সুনীতি বোল্লে, আমি উলু দেব আর শাঁখ বাজাব। সুরেশের মা হাসতে হাসতে কর্তাকে সুখবরটা দিতে গেলেন। কর্তা শুনে বল্লেন, দেখ বিয়ের টাকা থেকে এক হাজার টাকা আমায় দিতে হবে, আমি একটা কাপড়ের দোকান খুলব ভাবচি। গিন্নী বল্লেন, আমার বাড়ীব তৈরী না হোলে আমি কাউকেই কিছু দে না। কর্তা বল্লেন, তা হবে এখন।

তার পর মিত্তিরদের বাড়ীর মিস্ত্রী, ভটচাঁকের বৌ হরিদাসী, সরকারী উকিলের পিসতত ভাইয়ের নাতজামাইয়ের আপন খুড়ির সহোদর বোন নবীনকালী, জজের পেস্কারের শালীর পুত্রবধূ ভুবনমোহিনী, এক এক কোরে এসে হাজির হলেন। কেউ বল্লেন মাসি, কেউ বল্লেন দিদি, কেউ বল্লেন বোন, ছেলের বিয়ে দিচ্ছ আমরা যেন ফাঁক না ঘাই। সুরেশের মা হাসতে হাসতে সকলকেই বোল্লেন ওমা তাই নাকি হয়! তোমাদের আগে খবর দেব। তোমরাই হোলে ছেলের মা মাসি। তোমরা কর্কে কস্মাবে না ত পথের লোক ধোরে আনব?

এতগুলো লোকের সাধ আছল্লাদ মিটাবার ভার যার উপর সে লোকটা কিন্তু ঘরোয়া বিবাদে মাটি হতে চোল্লো। সে যখনই বই হাতে কোরে বসে, তখনি তার মনটা আকাশপথে ছুটে যায়, তার প্রাণটা পথে ঘাটে হাতে বাজারে লোকজনের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। সুরেশ বেচারি স্মৃতি শক্তির সাহায্যে কোন রকমে পরীক্ষা অরণ্য পার হচ্ছিল কিন্তু বাইরের জগৎ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কোরে তাকে এমন বিপথে নিয়ে ফেললে যে সে কিছুতেই আর নিজেকে উদ্ধার কোরতে পারলে না।

সুরেশের ফেল হওয়াতে বাড়ীতে শোকের ঝড় বহে গেল। কর্তা দিন কতক ধোরে নিবিষ্ট চিত্তে রামায়ণ মহাভারত পড়তে লাগলেন। গিন্নী অর্ধেক দিন রান্নাঘবেই কাটাতেন। ভাত রান্না খাওয়া হোয়ে গেলেও খোলা চড়িয়ে বসে থাকতেন। মুড়ি ভেজে মুড়ির চাল কোরে নিজের মনকে শান্ত কোরতেন। ঘটক ঠাকরুণ বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আর এক বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। সুরেশের বন্ধুবান্ধবেরা কেউ মৌখিক কেউ বা আন্তরিক সহানুভূতি দেখালে। সুধাংশুর মা—যার ছেলে তিনবার ধোরে এফ্ এ ফেল হচ্ছিল—আঙুল মটকাতে মটকাতে বল্লেন, “ঐ দেখ, অত অহঙ্কার কি আর সহ হয়! দর্পহারী মধুসূদন ত আছেন! সুধাংশু আর সুরেশ একসঙ্গে এফ্ এ পরীক্ষা দেয়। সুধাংশু ফেল হয়, সুরেশ পাশ হয়ে যায়। সুরেশের মা ছেলের পাশ হওয়ার সন্দেশ বলে সুধাংশুর মার কাছে এক থালা গোলা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সুধাংশুর মায়ের সে

গোলা আজও পর্যাস্ত জীর্ণ হয় নি। পাড়া-বেড়ানী, উমাসুন্দরী যখন সুধাংশুর মার কাছে দৈনিক গেজেট নিয়ে এল, তখন সুধাংশুর মা তাকে হাসতে হাসতে বল্লেন, ওলো সুরেশের মাকে বলিস,—ছেলের বিয়ের সন্দেশটা যেন পাই।

সুরেশ মার্ক আনিয়ে দেখলে সে মোটের উপর আট নম্বরের জুজ ফেল হয়েচে। তবু সে ফেল! সে অশ্বের পাসের সঙ্গে নিজের ফেলের তুলনা কোরে তার সঙ্গে নিজের মোটে এক বিষৎ তফাৎ মনে কোরে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল কিন্তু সে অতি শীঘ্রই টের পেলে যে এই এক বিষৎ জায়গাতে সমস্ত পৃথিবীটা তার মান অপমান ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্য্য সুখ দুঃখ প্রভেদ নিয়ে এসে দাঁড়াল। সম্মান ঐশ্বর্য্য সুখ তার চোখের সামনে ঘুবতে লাগল কিন্তু সে তাদের কাছ থেকে যেন একটা জীবন পিছিয়ে পড়ল। ব্রজলালের মা যখন নগদ তিন হাজার টাকা, এক প্রস্থ রূপার বাসন এবং সোণা দিয়ে মোড়া বধুটিকে বরণ কোরে ঘরে তুল্লেন তখন রামের মা, শ্রামের মা, হরির মা, সকলেই সমন্বরে বল্লেন, আহা, তা হবে না কেন,! ছেলেও যে তেমনি, তিনটে পাস! যথাসময়ে উমাসুন্দরীর মারফৎ ব্রজলালের মার সৌভাগ্যের কথা সুরেশের মার কাছে পৌঁছাল। সুধাংশুর মা উমাসুন্দরীকে গয়নার ফর্দ লিখে দিয়েছিলেন। এই ধর সিঁথের সিঁতি, কানে মাকড়ী, নাকে নখ, বাজু, সাতনর, চিক, চন্দ্রহার, বালা, অনন্ত। এক একখানা গহনা এক একটা কাঁটার মত সুরেশের মার বুকে বিঁধে গেল।

অল্প দিনের মধ্যে সুরেশের পিতাও

রোগশয্যায় আশ্রয় নিলেন। তাঁর স্বাস্থ্য আগে থেকেই ভেঙ্গে ছিল, পুত্রটি ফেল হওয়ায় তিনি মনে যে আঘাত পেলেন তাতে শরীর আরো বিগড়িয়ে গেল। স্নুস্থ শরীরে পেনসনের অল্প টাকায় এক রকম চলে যেত। এখন রোগের খরচ বেড়ে যাওয়ায় বড় টানাটানি পড়ল। সংসারে দারিদ্র্যের ছায়া দেখা দিলে। তাঁর উপর ব্রজলালের ডেপুটী হওয়ার খবর নিয়ে এ পাড়ার মাসী, ও পাড়ার পিসী, নতুন পাড়ার জেঠী সুরেশের মার কাছে এসে সুরেশের ফেল হওয়ার জন্তে কর্তার অশুখের জন্তে আর সংসারে টানাটানি পড়ার জন্তে বিলক্ষণ রসান দিয়ে গেলেন। কর্তার বিছানার কাছে বসে আধখানা ঘোমটা খুলে দিয়ে ব্রজলালের মার স্নুথ ঐশ্বর্যের সঙ্গে সুরেশের মার দুঃখ দারিদ্র্যের তুলনা কোরতে লাগলেন। মাসী বললেন, আহা ব্রজলাল বড় ভাল ছেলে গো। পিসী বললেন, উপযুক্ত ছেলে, বিয়ে পাস কোরেচে। তবে ত ডেপুটী হয়েছে। জেঠী বললেন, তাতেই ত তাদের সংসারে স্নুথ ঐশ্বর্য উথলে উঠেছে। শুনে সুরেশের মা গোপনে চোখের জল মুছলেন, সুরেশের বাবা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সুরেশ যে দিকে বসেছিল, সে দিক থেকে অত্নদিকে চোখ ফেরালেন।

তাঁর পর সুরেশের বাবা মারা গেলেন। সুরেশের উপর সংসারের ভার পড়ল। সে অনেক কষ্টে অনেক উমেদারী কোরে কোন জমিদারের কাছাণ্ডিতে কুড়ি টাকা বেতনে একটা চাকরী যোগাড় কোরলে। এতদিন পরে সে আট নম্বরের প্রভেদ বুঝতে পারলে। সে ফেল হয়েছে—তাঁর মানে সে কর্তব্য

পালন করে নি। ছাত্রজীবনের যা সর্বোচ্চ পাপ সে তাই অর্জন কোরেচে। জগতের বিচার ঠিকই হয়েছে। অকৃতকার্যতার দণ্ড জগৎ এই রকমেই দিয়ে থাকে। তাঁর ব্রহ্মচারী হোয়ে তপস্যা করা উচিত ছিল। সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত কোরে সাধনা করা উচিত ছিল, সমস্ত অন্তর্জগৎকে অধ্যয়নের কাজে নিযুক্ত করা উচিত ছিল—সে তা পারে নি, তাই তাঁর দাম আজ কুড়ি টাকা। ব্রজলাল পেরেছিল, তাই তাঁর দাম আজ দুশো টাকা। সুরেশ ঠিক কোরলে, সে এবার তপস্যা কোরবে। সে সকালে আর বিকালে কাছারীর কাজ করে, দুপুর বেলা কলেজে যায়। রাশি রাশি বেকন দেকার্ট মিলের টাকা দিয়ে হৃদয়কে চাপা দিয়ে রাখলে, ইংরেজ কবিগণের পার্থিব উন্নতিবিষয়ক শত শত নীতি বচন দ্বারা প্রাণটাকে আঠে পৃষ্ঠে বেধে রাখলে। এক বৎসর এইভাবে সংযম কোরে পরীক্ষা যজ্ঞে দীক্ষিত হল।

কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এসেই সে রোগে পড়ল। যে উত্তেজনা ভিতরকার মানুষটাকে চাপা দিয়ে তাঁর উপর বুদ্ধির সঙ্গীন চাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সে উত্তেজনা সরে পড়বামাত্র ভিতরকার মানুষটা সুরেশকে দণ্ড দেবার জন্য উদ্ধত হোয়ে উঠল। বুকের ভিতর দুর্কলতা, মাথার ভিতর দুর্কলতা, প্রাণের ভিতর দুর্কলতা—সুরেশ ভাল কোরে হাত পা মেলতেও কষ্ট বোধ করতে লাগল। সে বেশ বুছতে পারলে তাঁর জীবনের দিন শেষ হয়ে এসেছে।

এক দিন রাত্রে বড় বাড়াবাড়ি হল। ডাক্তার কাছে বসে আছেন। সুরেশের মা

সুরেশের মাখায় হাত বুঁলিয়ে দিচ্ছেন। সুরেশ বোলে, জানালাটা খুলে দাও, গরম লাগচে। সুরেশের মা তাড়াতাড়ি জানালা খুলে দিলেন। নিদাঘের নিশ্চল আকাশ অনন্তনীল কাগজের মত চোখের সামনে পড়ে ছিল। সুরেশের মনে হল সে আজ বিশ্বপতির বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে বসেছে। আজ তার জীবনের পরীক্ষা হবে। আজ তার হৃদয়টা কত বড়, তার প্রাণটা কত মহৎ, তার জীবনটা কতখানি কাজের— সমস্ত জগতের সামনে তারই পরীক্ষা হবে। শত শত তারা উদ্গ্রীব হয়ে চেয়ে আছে, সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত হয়ে আছে, বাতাসটি পর্যন্ত স্থির হয়ে আছে। এতবড় পরীক্ষা সুরেশ কখন দেয়নি, পরীক্ষা দিয়ে এত

আনন্দ সুরেশ কখন পায়নি! তার চক্ষু স্থির হয়ে এল, তার মুখে মহিমার শ্রী ফুটে উঠল, তার বুক শান্ত হয়ে এল। সে তার সমস্ত হৃদয়টা আকাশের গায়ে মেলে দিলে, আকাশ আরো কোমল নিশ্চল স্নিগ্ধ হয়ে গেল। সে তাব সমস্ত জীবনটা তারার উপর ঢেলে দিলে, তাবাগুলো আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে তাব সমস্ত প্রাণটা নিঃশেষ কোরে দিয়ে লিখে চলো।

রাত ছটোর সময় ডাক্তার বল্লেন, এবার নীচে নামাও। আধঘণ্টার মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল।

তার পর দিন সকালে টেলিগ্রাম এল— সুরেশ পাস হয়েছে।

শ্রীনির্মানীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দু মুসলমানের একতা

হিন্দু মুসলমানের একতা কথা লইয়া রীতিমত আন্দোলন বাধিয়াছে। কথাটি যখন উঠিয়াছে, তখন তাহার আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয় তাহাতে কর্তব্যের পথ নির্দিষ্ট হয় এবং তাহাতে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল।

প্রথমে দেখা যাউক, হিন্দু মুসলমানের এই মিলন বাঞ্ছনীয় কি না? কারণ অনেকে আবার এই মিলন আদৌ পছন্দ করেন না। এই প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে—

ভারতে এমন প্রদেশ নাই যেখানকার অধিকাংশ মুসলমান হিন্দুজ্যোতির্বিদ ও অপরাপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাদর না করেন,

যেখানে হিন্দুদিগের পক্ষোৎসবে মুসলমানগণ আমোদ প্রমোদ না করেন, যেখানে আপনাদের বিবাহকার্যে প্রতিবাসী হিন্দুগণকে নিমন্ত্রণ না কবেন। (স্বর্গীয় ভূদেব বাবু)

ভারতে এমন প্রদেশ নাই, যেখানকার হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে স্নেহ না করেন, মুসলমানের মসজিদদরগাদি সম্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে না দেখেন, যেখানকার হিন্দু মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে দৈনন্দিন সংসারিক কার্যে সহায়তা না করেন। তবে কেমন করিয়া বলি ভারতে হিন্দু মুসলমানের একতা বাঞ্ছনীয় নহে। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় সার সৈয়দ আহম্মদ হিন্দু নামক

পত্রে যাগা লিখিয়াছিলেন আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদ উদ্ধৃত করিলাম।

হিন্দু মুসলমান! একাত্ম হইতে চেষ্টা কর। কারণ একত্রিত হইলে, পরস্পর পরস্পরকে বিপন্ন আপদে সাহায্য করিতে পারিবে। আর যদি একত্রিত না হও, তাহা হইলে তোমাদের বিরোধ উভয়কে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে। হে হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃগণ! তোমরা কি একই দেশে বাস কর না? তোমরা কি একই দেশে জন্ম গ্রহণ কর নাই? তোমরা কি একই মাতা ধরিত্রী হইতে আহাৰ্য্য দ্রব্য পাওনা? জানিও “হিন্দু,” “মুসলমান” শব্দদ্বয় কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পার্থক্য বুঝাইবার জন্তই, নতুবা সকল ভারতবাসী এক ও একই “নেশন।” এইহেতু ‘নেশন’ শব্দ দ্বারা আমি হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য ভারতবাসীকে নির্দিষ্ট করি। আমি এই শব্দ দ্বারা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত বুঝি না, কেবল বুঝি যে, আমরা একই দেশের অধিবাসী, একই রাজার প্রজা—একই সূত্র ছুঁথের ভাগী। আমাদের সকলেরই দেশের উন্নতিব জন্ত একত্রিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য। এবং এইজন্ত আমি সকল ভারতবাসীকে এক “হিন্দু” নামে অভিহিত করি।

আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন হিন্দু-গণের সহিত একতা হইতেই পারে না,—যেহেতু তাহারা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, তাহারা মুসলমানের গো কোরবাণিতে বাধা দিয়া থাকে, তাহারা নাটকে, নভেলে, কাব্যে, উপন্যাসে মুসলমানদিগকে অকথা ভাষায় নিন্দাবাদ ও মুসলমান নরনারীর চরিত্র কৃষ্ণবর্ণে অঙ্কিত করে।

এখন দেখা যাউক, এগুলি কতদূর সত্য,—এবং সত্য হইলেও বাস্তবিকই মিলনের অন্তরায় কি না?

হিন্দুগণ বিধর্ম্মী অতএব তাহাদের সহিত একতা হইতে পারে না—এ কথাই কোন সার্থকতা দেখি না। কারণ, একতা ধর্ম্ম লইয়া নহে; একতা স্বার্থ লইয়া। আমার স্বার্থ দেশের উন্নতি সাধন করা, তোমারও স্বার্থ দেশের উন্নতি সাধন করা। আমার স্বার্থ দেশের দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষাদি নিবারণ করা, তোমারও স্বার্থ দেশের দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা। এইভাবেই একতার সূত্রপাত হয়। আর মানুষের বৈষয়িক স্বার্থ এক হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতিও একতা সূত্রে গ্রথিত হইতে পারে। আবার বৈষয়িক স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটিলে সহোদরে সহোদরেও ঘোর শত্রুতা উপস্থিত হয়।

ইহাই যখন একতাব সারতত্ত্ব তখন হিন্দু মুসলমানের একতা হইবে না কেন?

আর হিন্দু মুসলমানের একতা অর্থে ইহা নয় যে হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করুক কিংবা মুসলমান হিন্দু হইয়া গিয়া এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করুক।

এখানে আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে হিন্দু-মুসলমানের ঘেঁষ হিংসা মারে কে?

স্বীকার করি, হিন্দু মুসলমানের হৃদয় ঘেঁষ হিংসায় পরিপূর্ণ। কিন্তু পৃথিবী ত আর স্বর্গ নয় যে এখানে ঘেঁষ হিংসা বিবাদ কলহ একেবারে থাকিবে না। যখন পৃথিবী—‘পৃথিবী’ তখন অবশ্যই এখানে ঘেঁষ হিংসা বিবাদকলহ কিয়ৎপরিমাণে থাকিবেই। ঘেঁষ হিংসা কাহার মধ্যেই বা নাই? বিপক্ষবাদীগণ হয়ত বলিবেন, কই

খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি জাতির মধ্যে ঘেঘ হিংসা ত আদৌ নাই। যাহাবা একথা বলেন, তাঁহারা খৃষ্টান মুসলমানগণের ইতিবৃত্ত—সম্যক জ্ঞাত নহেন।

খৃষ্টানগণের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টের অত্যাচার বিভীষিকাময় বিরোধকাহিনীতে ইতিহাসেব পৃষ্ঠা পূর্ণ।

মুসলমানগণেব মধ্যেও দুইটী দল আছে সিয়া ও সুনী। সিয়া-সুনীর মধ্যে ঘেঘ হিংসা যেরূপ পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়, বোধ হয় জগতের আব কোন জাতিয় মধ্যে সেরূপ নাই। সে গুলিব বিবরণ শুনিলে পাঠক হয়ত চমকিত হইয়া উঠিবেন।

ইহাদের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব এত প্রবল যে কোন সিয়া একটী সুনীকে প্রাণে মারিতে পারিলে পরম সম্ভাষ লাভ করেন। সিয়াগণ ধর্ম্মপ্রাণ সুনীর পবিত্র মসজিদকে অপবিত্র করিতে পারিলে বড়ই পুণ্যের কার্য্য মনে করেন। হজরত আচুবাকার, হজরত ওমার, হজরত তাখমান, হজরত আলী এই চারি জন খলিফাকে সুনীগণ অতীব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। কিন্তু সিয়াগণ এই শেষোক্ত খলিফা ব্যতীত অল্প তিনজনকে এতদূর ঘৃণা কবেন যে তাহাবা সুনীগণের প্রাণে ব্যথা দিবার জন্ত, আপনাদের বিনামায় ঐ তিন জন মহাত্মার নাম লিখিয়া রাখে ও সুনীগণকে দেখাইয়া বলে এই দেখ তোমাদের আচুবাকার, ওমার, তাখমান আমাদের পায়ের নীচে। সুনীগণের প্রতি সিয়াগণেব কিরূপ বিজাতীয় ঘৃণা তাহা সবিস্তাবে বলিতে গেলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে।

আবার সুনীগণ যে নিতান্ত নিরীহ ভাবে

সহ করেন তাহাও নহে। তাঁহারাও এ ক্ষেত্রে সিয়াগণ হইতে কোন অংশে কম নহেন। সিয়ার মরন উৎসবে সুনীগণ বাধা প্রদান করিয়া থাকে ও সুনীধা পাইলে অকারণে সিয়াগণকে নির্গ্যাতিত কবে। সুনীগণও ঘৃণাবশত সিয়াগণের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার কবে না। তাহাদিগের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। এইরূপ বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু সে বিবাদেব বিবরণী দ্বাৰা প্রবন্ধের কলেবব বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না।

স্বাভাবিক ঘেঘ হিংসাদি যে একতাব অন্তরায় নয়, প্রাপ্তক বিষয়গুলি হইতে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

মুসলমানগণের দ্বিতীয় আপত্তি, গো কোর-বাণীতে হিন্দুবা বাধা প্রদান করিয়া থাকে। হিন্দুর পক্ষে এই কার্য্য নিতান্ত স্বাভাবিক; এবং ইহাকে একত'র অন্তরায় বলা যাইতে পারে না। কারণ, হিন্দুগণ গাভীকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। সূতবাং হিন্দুব পক্ষে গাভী সংবন্ধেব প্রয়াস সর্ব-প্রকারে সমর্থন যোগ্য। এই একই কারণে পাবাবত বধে মুসলমানের ঘোর আপত্তি। কেননা পাবাবত মুসলমানের চক্ষে শ্রদ্ধার সামগ্রী।

তৃতীয় আপত্তি, হিন্দুগণ নাটকে, নভেলে, মুসলমান নরনারীকে অঘথা নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন।

স্বীকার কবি অনেক হিন্দু মুসলমান-দিগকে অঘথা গালাগালি দিয়া থাকেন। তন্মধ্যে বঙ্কিম প্রমুখ সাহিত্যরথীগণ প্রধান। বাস্তবিকই বঙ্কিমবাবুব একরূপ কার্য্য নিতান্তই

ক্ষোভের উদ্রেক করে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে একতার অন্তরায় বলা যাইতে পারে না।

বেশহিসাদি যখন একতার অন্তরায় নয়, তখন এক মায়েব দুইটি সম্ভাবন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মধ্য স্থাপন না হইবে কেন? আমাব এক বিজ্ঞ বন্ধ বলেন—“হিন্দু মুসলমানে অসদ্ভাব কিসে? এবং কোথায়? যাহারা খাঁটি হিন্দু, তাহারা দোকানপাট চালায়, চায়বাস করে, করিম দাদা, রহীম মামা প্রভৃতি মুসলমান প্রজাদের সহিত বাড়ীর উঠানে কথাবার্তা করে, চাষ আনাদের বন্দোবস্ত করে, আর কথা শেষ হইয়া গেলেই যে যাহার ঘরে গিয়া উঠে। আদাব মুসলমান-কৃষা দাদাঠাকুরেব ছেলে মেয়েব জন্য ভালটা-বেলটা আনিয়া দেয়, গরু বাছুর গোয়ালে তোলে, বাড়ী যাইবাব সময়ে মাঠাকরণ বা দিদিঠাকরণেব নিকট হইতে তেল, লবণ, লক্ষা শাকশাক্কা চাহিয়া লইয়া যায়। ইহাতে অসদ্ভাবের লক্ষণ ত কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। আব যাহাবা খাঁটি হিন্দু, খাঁটি মুসলমান তাহাদের মধ্যে কোনস্থায়ী বিরোধেব সম্ভাবনাই নাই। ইহাব হেতু এই যে, খাঁটি হিন্দু নিজেব গণ্ডাব মধ্যে থাকিতে জানে, নিজেব অধিকার বুঝিয়া কথা কহিতে জানে, আর খাঁটি মুসলমানও কখনও নিজেব গণ্ডা কাটিয়া বাহির হয় না। যত গোল বাধিয়াছে বাবুব দলেব মধ্যে;— বাবু-হিন্দু এবং বাবু-মুসলমান কোনোমতেই সদ্ভাবে থাকিতে পারে না, যেহেতু উভয়েই গণ্ডা কাটিয়া বাহির হইয়াছে। উভয়েই যেন এক স্বামীর পত্নী, অতএব সপত্নীবিরোধ

অনিবার্য; প্রণয়ে অক্ষমতা মারাত্মক বিরোধের মূল। ফলে, এ বিরোধ সহজে লয় হইবাব নহে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই,—মিলনের বাধা কোথা হইতে আসিল? যাহা পূর্বে ছিল না, তাহা এখন জন্মিতেছে কেন? ইহা কেবল বাহিরেব মোকের প্রবোচনাম। একজন বাড়ীবা চাকর তাহাব মনিবেব সদয় ব্যবহারে মনুষ্ট আছে। এখন একজন বাহিরেব লোক আসিয়া সেই চাকরকে যদি ক্রমাগত বলে ঐ দেখ, তোমাব প্রভু তোমাকে ভাল করিয়া থাইতে দিল না। তবে সে হয়ত ক্রমে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। প্রকৃতপক্ষে কথাটা হইতেছে তাহাই।

মুসলমানের পক্ষে ভাবতভূমিকে মাতৃভূমি স্বরূপ জ্ঞান না করা মিলনের অগ্রতম অন্তরায়। অর্থাৎ মুসলমান যদি এই স্বর্ণপ্রসূ ভারত-ভূমিকে মাতৃভূমি বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে তথাকথিত মিলনের অন্তরায় অচিরেই দব হয়। মিলনের পক্ষে ইহাই সুপ্রশস্ত বিধান। কথাটা আরো পরিষ্কার করিয়া বলি। পূর্বেই বলিয়াছি আমাদের একতা স্বার্থ লইয়া অর্থাৎ দেশেব শ্রীবুদ্ধি সাধনের জন্ত; কেবল এক পরাক্রমে বসিয়া আহার করিবার জন্ত নহে।

কিন্তু সাধারণ মুসলমান এই জাতীয় স্বার্থ দেশের শ্রীবুদ্ধি কথাটার মর্ম্ম আদৌ বুঝেন না। তাই তাহাবা তাব স্বরে বলিয়া উঠেন “একতায় কি হইবে? দেশের উন্নতি আবার কি? আমাদের আদাব দেশ কি? আরব ত আমাদের দেশ—ইত্যাদি।” কোন ভূতপূর্ব কালে আরব জাতি ভারতে আসিয়া মুসলমান

ধর্ম সংস্থাপন করিয়াছেন বলিয়া এইরূপ মনে করা যেমন হাস্যকর তেমনি অসার-অযৌক্তিক। প্রকৃতপক্ষে ভারতের অধিকাংশ মুসলমানই হিন্দুসন্তান; অতএব ধর্ম ভিন্ন আসলে আমাদের ভেদ কিছুই নাই।—আমরা উভয় ধর্ম সম্প্রদায়ই ভারতসন্তান, এবং উভয়ে মিলিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান হইলে অনতি-বিলম্বে যে আমাদের প্রগট্ট গৌরব আমরা ফিরাইয়া আনিতে পারিব তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরিশেষে সর্বজন মাননীয় ভক্তিভাজন নবাব আবদুল জব্বার সি, আই, ই, সাহেবের কথায় এ প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিতেছি। গত ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতাব কোন এক সভায় এইরূপ বলিয়াছিলেন—

আমি আশা করি হিন্দুমুসলমান ভ্রাতার ঞ্চায় কার্য্য করিবে ও রাজনৈতিক অনুশীলনে পরস্পরকে সাহায্য করিবে। প্রতি ষ্ণন্দিতায় ক্ষতি নাই, কিন্তু ষ্ণেষ হিংসা ষ্ণণাই ও ক্ষতিকর। উভয় জাতির সম্বন্ধ সর্দদা সাম্যভাব সৃচক হইবে। যেখানে শান্তি নাই, সেখানে উন্নতিও নাই। প্রজাপুঞ্জের সৃথ ব্যতীত কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না।

যে দেশেব লোক অহরহ কলহে মগ্ন সে দেশে বিজ্ঞান বা সাহিত্যের সম্যক বিকাশ অসম্ভব। যেখানে ভূমিবিষয়ক বিবাদ বিদ্যমান সেখানে শস্য কদাচিৎ জন্মায়। সার্কজনীন শান্তি ব্যতীত শিল্পকলারও বিস্তার হয় না। এমন কি মনে শান্তি না থাকিলে দেবারাধনাও সম্ভব নহে। বাহারা দেশে শান্তি স্থাপনের প্রয়াস পান তাঁহারাই প্রকৃত দেশহিতৈষী। আর বাহারা ঐ বন্ধুত্বকে ভঙ্গ করিতে উদ্যত, তাঁহারাই মানব জাতির শত্রু। আমরা হিন্দু-মুসলমান একই দেশের অধিবাসী ও একই রাজার প্রজা,—বিবাদে আমরা কিছুই লাভ করি না; তাহাতে কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হই। এ দেশেব কুলতিলক স্বনামধন্য মহানুভব মুর্শিদাবাদ নওয়াব বাহাদুরের ঞ্চায় বাহারা আমাদের সখ্যভাবে থাকিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই আমাদের প্রকৃত হিতৈষী। মতের বিভিন্নতা সময়ে সময়ে হইতে পারে, কিন্তু তাহা যেন আমাদের মন্দ অভিপ্রায় বা ঈর্ষার পথে না লইয়া যায়। শান্তিই আমাদের এখন একমাত্র আদর্শ হউক!

শ্রীমৈনুদ্দীন হোসেন।

বক্তব্য ।

যে হিন্দুমুসলমান এতকাল পাশাপাশি আশ্রমের মত সঙ্ঘাবে বাস করিতেছিল, আজ তাহাদের মধ্যে অকারণে একটা অপ্রীতির লক্ষণ আসিয়া দেখা দিয়াছে। সমাজের একরূপ সঙ্ঘট সময়ে উভয় পক্ষেরই উদারতা ও সহানু-ভূতির একান্ত আবশ্যিক। প্রবন্ধকার মহাশয়

এই উভয় সম্প্রদায়ের মিলন সম্বন্ধে যেরূপ অপক্ষপাত উদার মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তাহার ঞ্চায় মিলনব্রতী হিন্দুমুসলমানের . সংখ্যা দেশে অধিক থাকিলে, আমাদের মধ্যে এ মনোমালিঞ্জের সম্ভাবনাই ঘটিত না। কিন্তু

এই প্রবন্ধে একটা কথা বলিয়া দেওয়া আমবা কর্তব্য মনে করি। বোধ হয় অনেক শিক্ষিত মুসলমানেরই ধারণা যে হিন্দু লেখকেরা মুসলমান জাতিকে অগ্রায় আক্রমণ কবিয়া থাকেন। কিন্তু একটু প্রণিধান পূর্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, সম্প্রদায় বিশেষকে আক্রমণ করা তাঁহাদের কখনই উদ্দেশ্য নয়। মুসলমানেরা এ দেশে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা কালে যে সকল আনুষ্টিক অত্যাচার হইয়াছিল, এ নিন্দার তাহাই প্রধান লক্ষ্যস্থল। বঙ্কিমবাবু ব্যক্তিগতভাবে স্থানে স্থানে মুসলমানের চিত্র হীন বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি ওসমান, আয়েষা, মবারক, মৌবকাসিম প্রভৃতি সুন্দর চরিত্রেরও

গুণগানে কুঠাবোধ কবেন নাই। আর এক কথা, আধুনিক মুসলমানেরা অধিকাংশই হিন্দু সম্ভান এবং বিজেতৃবংশের বাঁহারা এখনও বিত্তমান আছেন তাঁহারাও বহুকাল ধরিয়া আত্মীয়েরই অগ্রায় আমাদেরই প্রতিবেশী হইয়া বাস করিতেছেন। একরূপ স্থলে তাঁহাদিগকে অকারণ আক্রমণ করা কোন হিন্দুর পক্ষেই সম্ভব নহে। আসল কথা ভাল মন্দ লোক সকল সম্প্রদায়েই আছে। মন্দ লোকের নিন্দা করিলেই ভাল লোকের চরিত্রকে খর্ব করা হয় না, বরং অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াই উঠে। আশা করি ব্যক্তি বিশেষের নিন্দা দেখিলে শিক্ষিত সহৃদয় মুসলমানেরা তাহা তাঁহাদের সম্প্রদায়ের উপর আরোপ করিয়া লইবেন না।

প্রাতঃসূচ্য

আঁত সুন্দর গাঁতি মধুর
ভরি অম্বর রাজে ।
দীপ্ত মহিমা স্বর্ণ প্রতিমা
শৃণু নীলমা মাঝে ।
শুভ্র আলোক দিব্য গোলক
ধৌত ছালোক ধায়,
চরণ প্রান্তে আজি একান্তে
ভুলোক বন্দে তায় ।
নিত্য ধারায় চিত্ত হারায়
মৃত্যু করায় ত্রাণ,
নশ্বর যত বিশ্বের শত
বন্ধন ক্ষত প্রাণ ।

উজ্জ্বল শিখা মঙ্গল লিখা
নিম্নল রেখাপাত,
শ্রান বরণী সুপ্ত ধরণী
জাগ্রত তার সাথ ।
বিধ কেদ্র বিঘাট তন্ত্র
মিলন মন্ত্র গাহে,
অসাম বক্র কালের চক্র
পূত একত্র তাহে ।
চেতন বিন্দু জীবন ইন্দু
ভুবন সিন্ধু মাঝ—
জগত লক্ষ্য উদিত চক্ষ
বক্ষে হৃদয়রাজ ।

শ্রীহেমলতা দেবী ।

শ্রীপঞ্চমী ।

থাধাজ—কাওয়ালী ।

১
মঙ্গল পঞ্চমী আজি ভারতী
গাও পুণ্য স্মিলন গান ;
সুভাব সঙ্গীত বহু সারিতে
যুচাও,—যুচাও এ ভাবতে —
দেষ বিদেষ, হীন স্বার্থ অভিমান ।

২
অর্ন্তশোণিত পাতে, দাপ কবোটি ভাতে!
হের গো—ভারতী !
একি তোমারি অর্চনা—আরতি !
পুণ্য পূজা—অপমান !

দীন অভাজনে, করুণা বিতরণে
দেহ চেতনা—
নিবাব পাপ, কর সুধা বর দান ।

৩
প্রসাদ উথলিত, নীরব নিনাদিত
বীণাতানে
দোব, প্রীতি পূবিত কর পৃথী বিমান !
বাক্যে কন্ঠে ভাবে, ধম্মে বজ্র-বাগে—
প্রাণে প্রাণে গো—
বহাও মিনন রাগ—উদার জ্ঞান ।
শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ।

স্বরলিপি ।

॥ সী -া সী গা । গা -ধা ধা পা । পদা মা গরা গা । মা -া -া -া ।
ম • জ ল প • ধ মী আ জি ভা ব তা • • •
I -া -া মা -গা । মা -গা ধা গা । ধগা -পা ধা গা । সী -ধা ধগা সী II
• • গা ও পু • গ্য স্ম মি • ল ন গা • • ন্
॥ { মা মা -গা মা । পা -মা পা পা । পা -গা ধা -গা । সী না সী -া ।
সু ভা • ব স • স্তী ত ব • ত্রা • স রি তে
। সী -না র'সী -া । া -া গা- ধা । (ম'গা -া -া পা । ধা -া -া -পা) II
যু • চা • • • ও • যু • • • চাও • • •
। ধগা -সী -পধা -গা । ধগা সী -গধা -পমা I মা মা- গা মা ।
ভা • র • তে • • • সু ভা • ব
। পা মা পা পা । পা -গা ধা গা । সী না সী -া I নসী -রী সী সী ।
স • স্তী ত ব • ত্রা • স বি তে • দ্ধে • ক বি
। সী -গা গা -ধা । ধা পা মা গা । মা পা ধা -গা ॥
দ্ষে • ষ • হী ন স্বার্থ অভিমা ন ॥

॥ {পা - ধা ধা ধা। ধা ধা ধা ধা। ধা -া ধা ধা। ধা ধা ধা ধা I

(১) আ • উ শো নি ত পা তে দী • প ক রো টি ভা তে

(২) প্র সা • দ উ থ লি ত নী • র ব নি না দি ত

I ধগা পা গা -া। -া -া গা গা। ধা -গা -র্সা -া। গা -ধা -পা -মা I}

(১) হে র গো • • • ভা র তী • • • • • এ কি

(২) বী • গা • • • ৭ • ভা • • • নে • • • • • • • • •

I পা -া র্সা গা। গা- ধা ধা পা। পা মা মা গা। গমা -রা গা -া I

(১) তো • মা বি অ • চ্চ না আ • র তি পু • গ্য •

(২) দে • বি • • • প্রী • তি পূ বি ত ক ব পু • শী বি

I মা -া -া রা। গা -া -া রা। সা -া -া -া। -া -া -া -া I

(১) পৃ • • • জা অ • • • প মা • • • • • ন্

(২) মা • • • • • • • • • • • • • • • • • ন্

I {মা -া গা মা। পা -মা পা পা। পা গা ধা -গা। র্সা না র্সা র্সা I

(১) দী • ন অ ভা • জ নে ক রু গা • বি ত র গে

(২) বা • ক্যে ক • স্মে ভা বে ধ • স্মে য • জ্ঞ যা গে

I র্সা না র্সা -া। -া -া গা -পা। (র্সা -া -া -পা। -না -া -া -পা) I}

(১) দে হ চে • • • • • ত • • • • • না • • • • • • • • •

(২) প্রা •

I ধগা -র্সা -পমা -গা। -ধগা -র্সা -গধা -পমা I

(১) না •

(২) প্রা • গে •

I মা -া গা মা। পা -মা পা পা। পা গা ধা -গা। র্সা না র্সা র্সা I

(১) দী • ন অ ভা • জ নে ক রু গা • বি ত র গে

(২) বা • ক্যে ক • স্মে ভা বে ধ • স্মে য • জ্ঞ যা গে

I নর্সা রা -া র্সা। র্সা -গা গা -ধা। ধা পা মা গা। মা পা ধা গা ॥

(১) নি বা • র পা • প • ক র সূ ধা ব র দা ন্ ॥

(২) ব ভা • ও মি • ল ন রা • গ উ দা র জ্ঞা ন্ ॥

পোষ্যপুত্র ।

৩৭

মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া মুক্ত কর্ণে কাঁদিয়া উঠিতে ইচ্ছা করিলেও সমস্ত মানসিক শক্তি প্রাণপণ বলে সংগ্রহ করিয়া শান্তি সেই অদম্য প্রলোভনকে জয় করিয়া ঠোঁটে ঠোঁটে চাপিয়া দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া পাথরের মতন শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গভীর রাত্রি,—বাঁশবনের মধ্য হইতে মধ্যে মধ্যে শৃগালের ডাক ভিন্ন আর কোন রকম সাড়াশব্দে কোন জীবিতপ্রাণীর অস্তিত্ব বুঝা যাইতেছিল না। মাথার উপর এক আকাশ নক্ষত্র ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহাদের মাঝখানে রৌপ্য কিরণবর্ষী চন্দ্র বিরাজমান। এই বৈচিত্র্যময়ী সুখোজ্জ্বলা ধরণী, এই পরিপূর্ণ আশাবিহ্বল রাগিণীর অনাদিগান, এ সমস্তই ব্যথিতপ্রাণা শান্তির নিকট যেন কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন নিরানন্দ হইয়া উঠিয়াছিল।

নিস্তরু জ্যোৎস্নায় দাঁড়াইয়া স্পন্দনহীন প্রায় চক্ষু সে একবার অতীতের পানে ফিরিয়া চাহিল। অতীত সুখের, অতীত সাধের জীবন ! —সে কি আনন্দের কি গৌরবের দিনই গিয়াছে ! এতক্ষণ পরে শান্তির মস্তিষ্কের ভিতরে ফুটন্ততরঙ্গ একটুখানি স্থির হইয়া আসিল। শৈশবের সেই নিশ্চিন্ত সুখ কত মধুর ! সেই তাহারা ছুটি ছোট ভাই বোনে একসঙ্গে খেলা করিত। একসঙ্গে ঘুমাইত, একসঙ্গে ছুটি ছোট প্রজাপতির মতই তাহাদের বাগানে ছুটিয়া বেড়াইত, ছোট পাখীদের মত আপনার মনে গান গাহিত, হাসিত, খেলা করিত।

জগতে আর কাহারও সহিত কি শান্তির পরিচয় ছিল না ? ছিল—ছিল সবই গিয়াছে ! ক্ষুদ্র একখানিগাত্র হৃদয়—তাহার উপরে কত দিক হইতে কতখানি স্নেহ বর্ষিত হইত। কি অপূর্ব সে সুখ কি অনাবিল সে শান্তি ! শান্তির চোখ দিয়া হুহু করিয়া জ্বল করিয়া পড়িল। সে স্বপ্ন তাহার কেন ভাঙ্গিল, কোনো রকমেই কি আর সেই অতীত দিনে ফিরিয়া যাইতে পারেনা ? হে ভগবান, শুধু একবার শুধু একটিবার ? “এখনো আপনি জেগে আছেন বৌদি ?” এই কথাটি শুনিয়াই সে চমকাইয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল,—যোগেশ। যোগেশের আবির্ভাবে সহসা সচেতন হইয়া শান্তি শিহরিয়া উঠিয়া দেখিল, স্বপ্নের পরিবর্তে বাস্তব তাহার বিরাট অন্ধকার ও অপরিপূর্ণ বেদনা লইয়া স্তরু রজনীর অবিচ্ছিন্ন রাগিণীর তালে জাগিয়া রহিয়াছে, অসহায় সে ইহারই মাঝখানে একেবারে একা। যোগেশের দ্রুত নিশ্বাসেব শব্দ সহসা সেই নিস্তরুতা ভঙ্গ করিয়া শান্তির নিস্পন্দ প্রায় শরীরে শক্তি সঞ্চালন করিয়া দিয়া উত্তেজনায় তাহার মাথার ভিতবে দর্দপ্ করিয়া উঠিল। বিস্ময়হীন কোমল কর্ণে যোগেশ কহিল “বৌদি তুমি কি চাও আমার ভাল করে বুঝিয়ে দাও—ত। তুমি যা বলবে আমি তাই করতে রাজী আছি, শুধু তুমি বলো একবার,—নিজের মুখে হুকুম দাও—।”

শান্তির চোখের সম্মুখে কুহেলিকাময়

জগৎশ্রোত তালে তালে ঘুরিয়া উঠিল ; সে অক্ষুটকণ্ঠে বলিল “না না তুমি আমার সঙ্গে কথা কয়ো না, আমি কিছুই চাই না তোমাব কাছে, শুধু তুমি আমার সঙ্গে কথা কয়ো না।” বলিতে বলিতে সে পাগলের মত হেমেন্দ্রেব ঘবের দাবের দিকে ছুটিয়া গেল। যোগেশ তাহাব এরকম অদ্ভুত বাবহারের কোন অর্থ না পাইয়া প্রথমে কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া গেল, তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সমুদয় ব্যাপাবটা তাহাব চোখেব সম্মুখে পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল। শাস্তি ঘরে প্রবেশ করিবার পবই সে যেন একবার হেমেন্দ্রেব উত্তেজিত কণ্ঠেব সাড়া পাইয়াছিল ;—ঠিক হইয়াছে,—তাহার মধ্যে যেন যোগেশেরও নাম ছিল না ?—যোগেশ বোষে ক্ষোভে অপর দংশন করিল—“বটে, এইটুকু পর্য্যন্ত সহ্যে নাই, বটে ? আচ্ছা দেখা যাক্ এই যোগেশ নইলে তোমাব কেমন দশা হয় ; একবার তবে দেখ। অকৃতজ্ঞ ! এত সন্দেহ ! এত ভয়—তোমার !”

যোগেশ সহসা একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, —“সেও কি কোন রকম সন্দেহ, অবিশ্বাস করেছে ? তাই যেন মনে হয়,—ছি ছি ! না আমি এমনিই কি দোষ করেছি ? আমার উদ্দেশ্য কিছুই মন্দ ছিল না, শুধু দয়া ! ওদের অনেক খেয়েছি অনেক পাবারও আশা রাখি তাই। তবে চাঁদকে দেখে চোখ বুজবে এমন মূর্খ কে আছে ? ফুলট দেখলে মন যে সুন্দর বলে তারিফ করবে, তাতে দোষই বা কি ?”

খোলা জানালার মধ্য দিয়া সূর্য্য কিরণ

গৃহে প্রবেশ করায় খুব সকালেই হেমেন্দ্রেব ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার ইচ্ছা ছিল না। জানালাটা বন্ধ করিতে বলিতে গিয়া হঠাৎ পূর্ব রাত্রির ঘটনাটা মনে পড়িয়া গিয়া মনটা একটু খাবাপ হইয়া গেল। শাস্তি গেল কোথায় ? এই অজানা জায়গা বিশেষ বাড়ীব গায়েই ওই একটা পুঁহু আছে। নতুন করিয়া আঁব যুমান হইল না। উঠিয়া বাহিবে আসিতেই দেখিল ; ঘরের পাশে মাটিতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া শাস্তি ঘুমাইয়া রহিয়াছে। আকস্মিক দুর্ভাবনার আতঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া সে হাঁফ ছাড়িল।

সকাল হইয়াছিল। আজ উজ্জল সুন্দর প্রভাত। উদার উন্মুক্ত আকাশে বিহঙ্গ-পক্ষের মত লঘু শুভ্র মেঘ প্রাতঃসূর্য্যের স্বর্ণময় কিরণে বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিককার গাছপালা হইতে একটা পাখীকাকলী, পাতার মর্ম্ব ও ফুলের গন্ধ একসঙ্গেই নিশ্চল স্নিগ্ধ বাতাসে ভাসিয়া উঠিতেছিল।

হেমেন্দ্র চলিয়া যাইতে উত্তত হইয়া হঠাৎ কি ভাবিয়া একটু দাঁড়াইল।

সেই রাগামেঘের ছায়ায় শাস্তির বিবর্ণ ললাটে, গণ্ডে কি স্নিগ্ধ রক্তিমাই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আলুথালু কৃষ্ণচুলের রাশি ধুলিয়া পড়িয়া পত্রান্তরালস্থিত ফুলটির মতন আধখানা মুখকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে ; মুখখানির উপর হইতে সর্বসম্ভাপহরা নিদ্রাদবী তাহার সকল বেদনা সকল ক্লান্তি নিঃশেষ করিয়া মুছিয়া লইয়া তাহাকে প্রশান্ত বিশ্রাম দান করিয়াছিলেন, তথাপি সেই নিদ্রা নিম্নীলিত চোখের কোলে অশ্রুজলের একটি

বিন্দু সকালবেলাকার শিশির কণাটিরই মত টলটল করিতেছিল। প্রাতঃ সূর্যেরই মতন সেই গৌরবোজ্জ্বল মুখ একবার হেমেন্দ্রের অঙ্ককার চিত্তের মধ্যে তাহার কিরণ রশ্মি ছড়াইয়া দিয়া তাহাব হৃদয়ে প্রেমের আলো জ্বালিয়া তুলিল। হেম শান্তিব মাথা নিজের কোলে তুলিয়া লইয়া সেইখানে বসিয়া ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে তাহাব মুখের উপর হইতে চুলের গোছাটা সবাইয়া দিয়া অত্যন্ত আদরের সহিত অনুভূতাপ ও আত্মগ্লানি পূর্ণচিত্তে তাহার অধরে চুম্বন করিল।

“শান্তি আমার মাপ কবো শান্তি, কাল-মাথাটা ঠিক ছিলনা তোমার অন্তায় বকেচি ভুলে যাও।” জাগিয়া প্রথমটা শান্তি বুঝিতে পারে নাই সত্যই হেম তাহাকে আদর করিতেছে। ভাবিতোছিল সে স্বপ্ন দেখিতেছে।

হেম আবার মুখের উপর নত হইয়া ডাকিল “শান্তি, রাগ করোনা কথাটা বড় শক্ত বলে ফেলিচি—”

শান্তি আশ্চর্য্যে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, সত্য! হেমেন্দ্রের এই সস্তাষণ! অকস্মাৎ তাহার বেদনা বিদ্ধ বক্ষ আলোড়িত করিয়াও বহুদিনের আঘাত ও অভিমানের ব্যথা একসঙ্গে জাগিয়া উঠিল,—সে স্বামীর কোলে মুখ লুকাইয়া সহসা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আজিকার গ্লান প্রভাত তাহার নবীন সূর্য্যকরে না জানি কি সন্মোহন শক্তি প্রয়োগ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আকাশে বাতাসে নাজানি আজ কি করণার কি প্রেমের রাগিনী বাজিয়া উঠিয়াছে, হেমেন্দ্র শান্তির

অশ্রুসিক্ত কপোলে চুম্বন করিয়া আদর করিয়া বলিল,—“আমি তোমায় লক্ষ্মীপুরেই পাঠিয়ে দেবো, শান্তি কেঁদোনা তুমি।” হরিদীনবন্ধু! একি সম্ভব! সত্যই কি শান্তির দুঃখ তোমায় স্পর্শ কবিয়াছে প্রভু! শান্তি চোখেব জল মুছিবাব রুগা চেষ্টা করিতে করিতে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কবিল “আজই তবে যাবে কি?—” হেম তাহার চুলের উপর হাত বাগিয়া তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ছিগ। প্রশ্নটায় একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল, কথাটা সে শুধু সাস্বনা দিবার জন্তই বলিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু—কিন্তু তাছাড়া উপায়ই বা কি? এমন করিয়া কদিন চলবে? দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল “না—কাল তোমায় পাঠিয়ে দেব,—আজ আর থাক।” শান্তির গ্লান চোখে আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল; স্বামীর বক্ষে মুখ রাখিয়া ছই হাতে তাহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া সাগ্রহে কহিয়া উঠিল “সেখানে আমরা খুব সুখেই থাকবো,—” হেমেন্দ্র বাধা দিল “তুমি সুখেই থেকো, আমিতো যাবোনা—” শান্তিব বাহুপাশ মুহূর্ত্তে স্বামীর কণ্ঠচাত হইয়া পড়িল; বিষ্ময়ে নির্ঝাঁক হইয়া সে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। হেমেন্দ্র উঠিয়া গন্তীর হইয়া কহিল “আমি সেখানে যাবো না, আর নাই বা গেলুম আমার জন্তে কার কি ক্ষতি? কে আমায় চায়? তুমি যাও,—সুখে থেকো আমার যা খুসী তাই করবো। আমার প্রতি তোমার তো মায়া নেই আমার বেঁচে না থাকাই ভাল।” হেমেন্দ্রের শেষ কথাগুলো জড়াইয়া আসিতেছিল। শান্তি দেখিল, তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। উঠিয়া বসিয়া সে বেদনাপূর্ণ লজ্জায় স্বামীর হাত

ধরিল “তোমার পায়ে পড়ি ও সব কথা বলোনা, তোমার উপর কার স্নেহ কম? কেন ওরকম মনে করবো? ফিরে যাই চলো, আমি সব ছেড়ে তোমার সেবা করবো।” হেমেন্দ্রের চিত্ত উদ্বেগিত হইয়া উঠিল। শাস্তির হৃদয়ের সমস্তটাই তাহাব;—সেই উৎসর্গিত প্রাণের সত্ক্রি পুত্রার সযত্ন সেবা—আর কিছু না হোক অন্ততঃ সেইটেও তো সে পাইবে, সেই কি কম? কই আজিকার মত আনন্দ তো ইহার পূর্বে শত ভোগবিলাসের মধ্য হইতেও সে লাভ কবে নাই? কি সুন্দর, কি কোমল কি উচ্চ তাহার এই স্বা! আর সে অনেকের মত এত দিন তাহাকে চাহিয়া দেখে নাই! বাগ্ন করে সে শাস্তিকে বুকে টানিয়া লইতে গেল, আবেগ তাড়িতকণ্ঠে বলিতে গেল “তোমার শক্তি তুমি আমায় দিও শাস্তি তোমার জন্ম আমি সব সহ করবো—” কিন্তু তাহাব পূর্বেই পাশের ঘরের দরজা খোলার শব্দে শাস্তি চমকিয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল, যোগেশ বারান্দায় পড়িয়া হঠাৎ ফিবিতেছিল কিন্তু দেখিল তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া ঘোমটা টানিয়া শাস্তি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল, হেম ডাকিল, “যোগেশ!”

হেমেন্দ্রের জন্ম তা তৈরি করিয়া নতুন রাধুনিকে রান্নার জোগাড় করিয়া দিয়া যোগেশ হেমেন্দ্রের ঘরে আসিয়া দেখিল শাস্তি ও হেম নিবিষ্ট মনে কি কথাবার্তা করিতেছে। দুজনের মুখেই একটা উৎসাহের দীপ্তি; শাস্তির অধরপ্রান্তে একটুখানি লজ্জাবিজড়িত সুখের হাসি, হেমেন্দ্রের মুখে তাহার স্বাভাবিক রুক্ষ অপ্রসন্নতার পরিবর্তে একটা কোমল ভাব পরিব্যক্ত!

যোগেশ ভাবিল “একেই বলে দম্পতি কলহট্টেচব বহ্নাবশ্বে লবুক্ৰিয়া” ডাকিল হেম। শাস্তি তৎক্ষণাতঃ উঠিয়া চলিয়া গেল। হেমেন্দ্র প্রসন্ন চিত্তে ডাকিল,—“এস না যোগেশ।”

আসন গ্রহণ করিয়া যোগেশ কহিল “আমার তো এখনি বাড়ি যেতে হবে ছোট বাবু, ছেলেটার ব্যায়াম দেখে এনেছি।”—হেমেন্দ্র হাসিয়া উঠিল “এতক্ষণে ছেলেব কথা মনে পড়লো? তা বেশতো যোগেশ, কালই একসঙ্গে সবাই যাবো এখন। আমরাও তো আবার লক্ষ্মীপুবেই ফিরছি—”

“বটে, আরতোমার যোগেশকে দরকার নাই তবে?” প্রকাণ্ডে বলিল “হ্যাঁ তাইচলুন, মিথ্যে কেন কষ্ট পাবেন, তার চেয়ে বড়লোকের বাড়ি গোমস্তাগিরি করাও ভাল। বৌদিকে বলে দেবেন সিধুঠাকুরের হবিষ্যি বেড়ে যেন একটু ভাল করে ঘি ঢালেন তবু প্রসাদটা আশটাও মিলতে পারবে—”

মুহূর্তের মধ্যে হেমেন্দ্রের ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল, তাহার মাথার ভিতরে এককালে ঈর্ষার সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিয়া উঠিল, চোখের সম্মুখে সমস্ত আলোকের উপর একখানা কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিয়া এক মুহূর্তেই সব অন্ধকার করিয়া ফেলিল।

শাস্তিনার ও সহানুভূতির সহিত ধীরকণ্ঠে যোগেশ কহিতে লাগিল “আপনার খশুর খুব চালাক লোক। কর্তাকে তিনিই উইল করতে বারণ করেচেন। তাঁর মতলব বোধ হয় বড় মরলে তোমায় অক্ষম প্রমাণ করে নিজেই না-বালকের অভিভাবক হয়ে বসবেন। তারপর বুঝেছ তো?”

হেমেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াছিল,—এ কি

ব্যাপার! যোগেশ একি বলিতেছে! সত্য সত্যই তাহার বিরুদ্ধে ঘোরতর একটা ষড়যন্ত্রই চলিতেছে নাকি? হ্যাঁ সম্ভব বটে,—ঠিক তাই! সে কি মুখ, ছিঃ, ভাগ্যে যোগেশ ছিল! সে একটু নড়িয়া বসিল, সন্দ্বিগ্নভাবে বলিল “তাঁই কি হবে? আমায় না দেখতে পারলেও নিজের মেয়ে তো আছে?” “হ্যাঁ: তুমিও যেমন! মেয়ে আছে আছেই! মেয়েরও ওপোর ভারী দরদ দেখতে পেলেনা? ওরা টাকা বোঝে নিজের স্বার্থ বোঝে। তোমাব মতন তো ভালমাত্র নয়, নিজের সর্স্ব ওদের ধরে দিয়ে পথে দাঁড়ালে যেমন! তা যাহোক ছোট বাবু আমাকে তো আজ যেতেই হচ্ছে, ঘরে তো একটা কড়িও নেই! ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে! আমরা ত আর বড় লোক বাপ নই,—ছেলে মেয়েই আমাদের প্রাণ!”

উত্তপ্ত জল একটুখানি তাপ পাইয়াই যেমন টগবগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠে হেমেন্দ্রের প্রতি শিরাস্থ শোণিত স্রোতও তেমনি করিয়া ফুটিয়া উঠিল। মুঢ়! এতটুকু বুদ্ধিবার শক্তিও তাহার নাই! কি মোহেই সে ডুবিতেছিল! যোগেশের হাত ধরিয়া বলিল, “যোগেশ তুমি আমায় ছেড়ে যেওন,—আমার তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমার বল বুদ্ধি ভরসা সব তুমিই। কি করে আমি আমার ণায় সঙ্গত অধিকার ফিরে পাব বলো। আদালতে কি প্রমাণ হবে ও মাগী বিন্দার বউ নয়?” যোগেশ মনের মধ্যে জয়ের হাসি হাসিয়া দস্ত করিয়া বলিল “বলো কি তুমি! ওতো হয়ে রয়েইছে! ওর ক্ষণে আবার ভাবনা! বৃন্দাবনের বিশ-টে সাক্ষী

হলপ নিয়ে বলবে যে ও বিনোদবাবু বিয়ে করা স্ত্রী নয়। কুছ পরোয়া নেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে ভাবনা এই যে, তোমার মনের সংগাহস আবার না কোন সময় বৌদির চোখের জলে ধুয়ে সাফ হয়ে যায়। তাঁব হুকুম তামিল তো হওয়া চাই তা—” নিতান্ত অপমানিত বোধ করিয়া হেমেন্দ্র গর্জন করিয়া উঠিল “বেখে দাও তোমার বৌদিদি! আমায় কি এমনই ভীক পেয়েছ? তবে আমাব এখন কি করতে হবে বলো দেখি?” “তোমায় আব কি করতে হবে বল, তবে আগে ববং একখানা উকিলের চিঠি বুড়কে পাঠান যাক। কি বলো? যদি ভালয় ভালয় দেয় তা মন্দ কি? নৈলে তখন—হাতেই তো উপায় রয়েছে।” হেমেন্দ্র একটু চিন্তিত ভাবে আপনা আপনি বলিল “উকিলের চিঠি—কেমন একটা মঙ্কোচ বোধ হয়, হাজার হোক জ্যেষ্ঠা হন, এতদিন কাছে ছিলাম।” “ঐ তো গোড়াতেই বলেচি, ওসব আপনার কস্ম নয়। লক্ষ্মীপুবেই ববং ফিরে যান। তবে মাপ কর্কেন তাঁরা কি আপনাকে মায়া কবেছিলেন? আপনার খণ্ডর যে শেয়াল কুকুরের মতন করে সেই রাত্রে”—“যোগেশ থামো—তুমি যা বলবে আমি করতে রাজি আছি। ভদ্রতা, চক্ষুলজ্জা-সব ধুয়ে গ্যাছে, ভাই ভাগ্যে তুমি ছিলে।”

ইহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া দুই বন্ধুতে মিলিয়া পবামর্শ চলিল। এবং বলা বাহুল্য ইহার ফলে যোগেশের বাড়ী যাওয়া ও শাস্তির লক্ষ্মীপুরে যাওয়া উভয় যাত্রাই বন্ধ হইয়া গেল।

লক্ষ্মীপুরের বাটীতে আবার নিরানন্দ ও হতাশা দিগুণিত হইয়া উঠিয়াছিল, শ্রামাকান্ত

পীড়িত। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ও কবিরাজের
বাড়িপাঁচন ব্যবস্থার ক্রটি না থাকা সত্ত্বেও
সে রোগের কিছুমাত্র উপশম হইতেছিল না।
যে রোগ শরীরের অপেক্ষা মনেরই বেশি,
ঔষধে তাহার কি করিতে পারিবে?

শিবানী তাঁহার যথাশক্তি সেবার ক্রটি
করিত না। কিন্তু শ্রামাকান্তেব তথাপি সকল
সময় মনে হইত শাস্তি হইলে ইহার স্থলে এই
করিত, এটা না বলিয়া হয়ত অল্প কিছু বলিত।
প্রতিনিদ্রাহীন রজনীতে স্তিমিতালোক কক্ষে
দ্বারের দিকে সোৎসুকনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া
অবশেষে গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া
পাশ ফিরিয়া শুইতেন, মনে হইত যেন এখনি
ঐ দ্বারপথে নিঃশব্দে সে প্রবেশ করিয়া
সাবধান গতিতে তাঁহার শয্যাপাশ্বে আসিয়া
দাঁড়াইবে। বুঝি তাঁহার স্তম্ভাঙ্গিয়া যাইবার
ভয়ে স্বাপ রুদ্ধ করিয়া হাতের চুড়ি গুলির
শব্দ বাঁচাইয়া সশঙ্ক ব্যাকুলতায় সে মুখেব
দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। কি সে করুণা-
মাখা কোমল দৃষ্টি! স্নেহ কাতবা জননী রুগ্ন
সন্তানের মুখে যে দৃষ্টি প্রেরণ করেন তাহাতে
কত মাধুর্য্য কত মহিমা!

কতদিন মরিচীকাবৎ আশার প্রতারণার
প্রতারিত বৃদ্ধ সোৎকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিয়াছেন
'মা এলি গো! "অমনি স্বপ্নেব মোহ টুটিয়া
জলন্ত বাস্তব উচ্চ উপহাসে হাহা করিয়া
উঠিয়া উত্তব কবিয়াছে 'না।"

কোথা গেলে তুমি স্নেহময়ী জননি! তুমি
কেন গেলে! শুধু তোমারি জন্ম তোমারি
অভাবে শুধু এতো কষ্ট এত হতাশা। আর
না হয় তুমিই এসো হে বরণ্য মৃত্যু! তুমিই
এই বহনক্ষম শরীরকে তাপক্লিষ্ট জীবনকে

মুক্তি দান করো। হে বন্ধু! হে সূহৃৎ!
তাই তুমিই এসো।

অমূল্য নূতন ঠেলাগাড়িতে বেড়াইয়া
আসিয়া চাকবের হাত ছাড়াইয়া পালাইয়া
আসিয়া নালিশ করিল "দাদামশাই আমায়
কেস্ট নাস্তায় নাম্তে দেয়নি, ও বড় ছুতু
হয়েচে। শ্রামাকান্ত স্তম্ভোচ্ছিতের ত্রায় চমকিয়া
উঠিয়া শিশুকে ব্যগ্রভাবে কাছে টানিয়া
পুনঃ পুনঃ চুশ্বন করিতে লাগিলেন; হুই চোখ
দিয়া জলধাবা গড়াইয়া পড়িয়া হৃদয়ের পাষণ
ভাব সামান্ত মাত্র লম্বু করিয়া দিতে সক্ষম
হইল। এই টুকুই যে তাঁহার সান্ত্বনার
অবশেষ! কিন্তু অভাগ্যের ধন অঙ্কের
নড়িটুকুর উপর দৃষ্টি ফেলিতেও যে সাহস হয়
না, নিরাশ্বের অবলম্বন যদি তাঁহার দৃষ্টিতে
শুখাইয়া যায়!

এই ধনৈশ্বর্য্য পূর্ণ প্রকাণ্ড অট্টালিকায়
বাস করা শিবানীর পক্ষেও একান্ত অসম্ভ
হইয়া উঠিতেছিল। আজকাল যদিও
শিশুরের সেবা ও তাঁহার চিন্তায় তাহার বিক্ষিপ্ত
চিত্তকে অনেকখানি অবলম্বন দিয়া তাহাকে
সংসারের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে, তথাপি
তাহার নিকট সকলি অন্ধকার।

সময় পাইলেই সে বালক বিনোদের
পড়িবার ঘরের চাবি খুলিয়া ঘরে প্রবেশ
করিত। চারিদিকে পুস্তকভরা আলমারি,
দেওয়ালে বঙ্গের খ্যাতনামা মনীষীগণের চিত্র;
ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে লিখিবার টেবিলের
ডয়্যারের মধ্যে বিনোদকুমারের হাতের লেখা
ও তাহার টুকিটাকি দ্রব্য সকল সাজান।
শিবানী সস্তর্পণে একবার ডয়্যার খুলিয়া জিনিষ
পত্রগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া আবার পূর্কের

মতন করিয়া যথাস্থানেই সাজাইয়া রাখিত । আঁচল দিয়া টেবিলটি মুছিয়া কেদারাখানি ঝাড়িয়া সেই আঁচলখানি মাথায় ঠেকাইয়া তারপর অপরিভূষ্ট চিত্তে আবার দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিত । কই সেখানে তো তাহার জন্ম কোন সাস্থনা, কোন আশ্রয়ই নাই! সে যে বিনোদকে জানিত—যে তাহার স্বামী— তাহার স্মৃতি—তাহার যোগ ত ইহাদের মধ্যে সে দেখিতে পায় না! হাতেব লেখাগুলি এমন সুন্দর এমন রচনাসরস! মূর্খ শিবানী তো তাঁহার হস্তাক্ষর পূর্বে কখনও দেখে নাই তাই তাহার নিকটে তাহাদেরও শক্তি যেন মস্তানিরুদ্ধবীর্য্য! এখানে আসিয়া শিবানী তাহার খাণ্ডির শক্তিত্যক্ত গৃহে স্থান পাইয়াছিল। সেই ঘরের প্রবেশ দ্বারের উপরে একখানা বিচিত্র ফ্রেমে বাঁধান বিনোদের চিত্র। কিশোর বিনোদ, অজাত গুম্ফ, কুঞ্চিত কেশ উৎসাহ চঞ্চল দৃষ্টি, মাতা ভুবনমোহিনীর কোল ঘেসিয়া তাঁহারই বাহুর উপর ঈষৎ হেলিয়া রহিয়াছে। শিবানী প্রভাতে সর্ব দেবতার পূর্বে ইঁহাকেই প্রণাম করিত।

প্রথম ভাগ্য পরিবর্তনের বিষয় ও শাস্তির ভালবাসার আবর্তে পড়িয়া কিছুদিন যেন সে একটু শান্তি পাইয়াছিল। কিন্তু শাস্তির গমনে তাহার অন্তরে পূর্কের মতন হাহাকারই পুনরায় জাগিয়া উঠিয়াছে। সিদ্ধেশ্বরী মেয়েকে এখনও চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই, আর যে কখনও পারিবেন সে আশাও অধিক ছিল না। সেই সব ভাবিয়া চিন্তাইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে বেইমানি মেয়েকে

কোন কথাই আর বলিবেন না। তবে নেহাৎ মায়েব প্রাণ কিনা সেইজন্মই যা মধ্যে মধ্যে এক-আধ দিন নেহাৎ অসৈরণ হইলে তাহারি ভালর জন্ম ছুঁকথা না বলিলেও, চলে না। পোড়া মেয়ের 'বরাত' যে এখনও মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছে, শ্বশুরকে দিয়া ইহার একটা প্রতিকার করান যে তাহার পক্ষে কর্তব্য এই সামান্য কথাটি 'আবাগীর বেটি'কে না বোঝাইয়াই বা থাকেন কেমন করিয়া? কিন্তু একগুঁয়ে মেয়ে এখনও সেই পূর্কের মতনই নিজের গোঁয়ে হয় চূপ করিয়া শুনিয়া যায়, না হয় কাষ্ঠের মতন শক্ত হইয়া শুধু বলে "আমি বলব না"। এদিকে সিদ্ধেশ্বরী শুনিয়াছেন কর্তা নাকি উইল কবিতেছেন তাহাতে হেম ও হেমের বউ তাঁহার অর্দ্ধেক বিষয় পাইবে। এমন সময় শিবানী যদি শ্বশুরকে বলে—মেটা ঠিক নয়—তবে অনায়াসে কার্য্য-সিদ্ধ হয়,—তাত সে বলিবে না! পোড়া কপাল অমন বুদ্ধির! রাগ করিয়া একদিন সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন 'আমার এখানে আর মন টিকচে না আমি বৃন্দাবনে যাই, কি বলিস্?' শিবানী আগ্রহে তৎক্ষণাৎ বালল, 'তাই চল মা তাই চল, আমরা দুজনেই যাই।'

হা রে বুদ্ধি! সিদ্ধেশ্বরী আর উচ্চ বাচ্য করিলেন না। কিন্তু শিবানীর চিত্তে এই সম্ভাবনাটা যেমন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছিল তেমনি শীঘ্রই মিলাইয়া গেল না। এক-দিন রাত্রে সে মায়ের ঘরে গিয়া তাঁহার কাছে বসিল। সিদ্ধেশ্বরী একটু বিস্মিত হইয়া গেলেন। সে বড় একটা আপনা হইতে তাঁহার কাছে

আসিয়া বসে না। কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন “কিরে শিবু? এমন সময় এলি যে?” শিবানী ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, “এই এলুম একবার।” সিদ্ধেশ্বরী একবার সন্দ্বিগ্ন নৈত্রে কণ্ঠ্য পানে চাহিয়া দেখিলেন কিছু বলিলেন না, কথাটা গোপন্য তেমন বিখ্যাস হইল না। বিমলাদাসী তাঁহার পায়ে তেল মাশিশ করিয়া আগুনের তাপ দিতেছিল তাহার কার্য্য শেষ হইলে আগুনের কড়া লইয়া সে বাহিবে চলিয়া গেল। তখন শিবানী বলিল ‘মা’? ‘কি মা?’ বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী সন্মোহে চাহিয়া দেখিলেন। শিবানী সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া কহিল ‘মা চলনা কেন আমরা আমাদের সেই নিজের ঘরেই আবার ফিবে যাই!’ সিদ্ধেশ্বরীর ওষ্ঠ প্রান্তে দুঃখের হাসি ফুটিয়া উঠিল। পাগলী! হাঁয়ারে দিন দিন কচিটি হচ্চিস না কি? কি বলিস্ বলদেখি? অমুটার কি হবে?’ শিবানী উত্তর দিল “সে এখানে থাক না, শুধু আমরা দুজনে চল চলে যাই মা; চলো আর আমি এখানে থাকতে পারচি না।”

শিবানীর কণ্ঠস্বরে আজ সিদ্ধেশ্বরী রাগ না করিয়া বরং বেদনা বোধ করিলেন। তাহার প্রাণের প্রচ্ছন্ন ব্যথা, নিগূঢ় অভিমান ও শূন্যতা তাঁহাকে এক মুহূর্ত্ত যেন আঘাত করিল। সত্যিই তো কেমন করিয়া এখানে তাহার মন টিকিবে? চারিদিকে স্মৃৎ ঐশ্বর্য্য সবই ছড়ান অথচ সে সকল ভোগেই বঞ্চিত! যার জন্ত সব—সেই আজ কোথায়? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন “যেমন কপাল করে এসেছিলি! কি করবি বাছা, সহি কর। সত্যি ভগবান কি কখনও মুখ তুলে চাইবেন না? এখন কোথায় যাবি—এ যে তোরাই ঘর।” শিবানীর

সর্কশরীরে তাড়িত সঞ্চালিত হইয়া গেল। ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিবেন? চাহিবেন কি? ওগো সর্কাস্তুর্য্যামী! তবে আব কতদিনই বিমুখ থাকিবে? একবার মুখ তোল’ একবার চাহিয়া দেখ তোমাব একটুখানি দৃষ্টির উপর এখনও কি সব নির্ভর কবিতেছে না? এ কথা সে ত প্রায় ভুলিয়াই আসিয়াছিল; যদি আবার স্মরণ করাইয়া দিলে তবে কৃপা দৃষ্টি দাও”। সিদ্ধেশ্বরী শিবানীকে নীরব দেখিয়া তাড়াতাড়ি কথাটা উল্টাইয়া ফেলিবার আশায় বলিয়া উঠিলেন “এবার ‘টৈপরাগে’ অন্ধ কুম্ভ হবে। মনে কচি ‘ছান’টা করে চুলগুলো মুড়িয়ে আনবো, কল্লাবাস কর্কারও বড় সাধ আছে। মেজবোন, নিস্তারিণী ওরাও যেতে চায়; দেখি শরীরটা ভাল থাকে তো যাবো।”

শিবানী সে কথাগুলো হয়ত সব শুনিতোও পায় নাই, সে তখন ভাবিতেছিল, যদি তাই হয়, তা হলে সবি আবার কিরে আসে! তিনি নিশ্চয় ঠাকুরপোকে ফিরিয়ে আনেন। চাও ঠাকুর মুখ তুলে চাও।”

যোগেশ মধ্যে মধ্যে বাহিরের ঘরে গ্রামাকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে হেমেন্দ্রের সংবাদ দিয়া যাইত। একদিন সে আসিয়া জানাইল; হেমেন্দ্র শিবানীকে ও তাহার পুত্রকে জাগ প্রমাণ করিবার জন্ত শীঘ্রই মোকদ্দমা আনিবে। শুনিয়া বৃদ্ধ জমাদার অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া একদিকে চাহিয়া রহিলেন, জগৎ প্রপঞ্চ স্বপ্নেব মতই অলৌক প্রতীয়মান হইতেছিল। তারপর বজ্রাহতের মতন সভয়কণ্ঠোজ্জ্বলিত করিলেন; “সত্যি কি হেম এমন কেলেঙ্কারীর কাজটা করতে পারবে? যোগেশ তুমি ত তার বন্ধু তুমি তাকে

বুঝিও বাবা। শুধু শুধু একটা ঝোঁকে পড়ে সে যেন একেবারে কুলমর্যাদা ভুলে গিয়ে শত্রু পক্ষের মুখ হাসায় না। আমি ত তাকে আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি চুলচেবা ভাগ করে দিতে এখনি রাজি রয়েছি। সে আমার কাছে না থাকতে চায় স্বতন্ত্র বাড়িতে থাকতে পারবে। তুমি তাকে ফিরে আসতে বলা। না হয় সে কোথায় আছে—আমায় নিয়ে চল। সেখানে গিয়ে আমি তাদেব সঙ্গে করে নিয়ে আসি।”

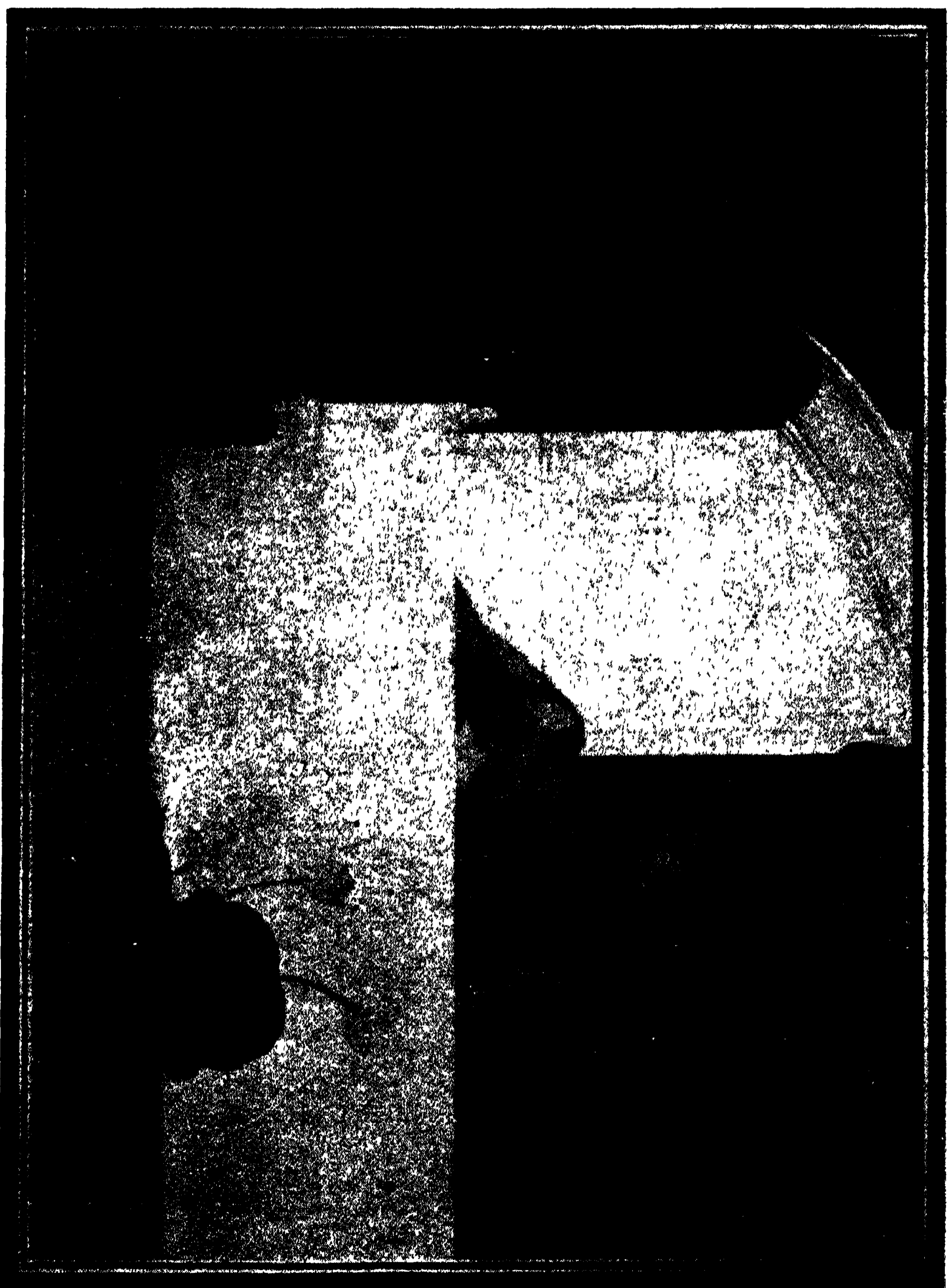
চতুর যোগেশ টলিল না। বৃদ্ধের কাতবোক্তিতে মনে কল্পনা আসিতেছিল কিন্তু হেমকে এখন তাহার জ্যেষ্ঠাব হাতে সঁপিয়া দিলে তাহার কি লাভ হইল? শুধুই কি এতদিন তাহার বেগার খাটা সার! না, নিজের একটা উপায় না করিয়া শিকার ছাড়া বাইতে পারে না। হেম দারিদ্র্যে মধ্যে এমনি উত্তপ্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে যে অর্দ্ধেক বিষয়েই হয়ত সম্মত হইতে পারে। বলিল, “আপনি হঠাৎ গেলে, সে যে রকম ছেলে হয়ত একেবারেই নৈঁকে বসবে, বিশেষতঃ আপনাকে তাদের খপর দিয়েছি, জানতে পারলে আমাব উপব গুরু অবিশ্বাস হয়ে যাবে, কোন কাশই হবে না। তার চেয়ে বরং আমি তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যাতে নোয়াতে পারি তারি চেষ্টা করি। দেখুন আমরা পুরুষানুক্রমে আপনাদেরই খেয়ে মানুষ!—আপনাদেরই সেবক আমরা—আমার দ্বারা চেষ্টার কিছু ফ্রটি হবে না। এক কাজ করুন তাদের তো একটা কড়া কড়িও হাতে নেই, বোঠাকরুণের গহনা বাঁধা রেখে পরশু চারশো টাকা ধার করে দিয়েছি—জানেনতো আমার অবস্থা! আমার

নিজের তো কিছুই নেই। তা সেই টাকাটা বরং আমায় চুপে চুপে দিন, গহনা খালাশ করে দিইগে। জিজ্ঞেস করলে না হয় বলব, অথ জায়গা থেকে ধাব কবে ছাড়িয়ে এনেছি। আহা বোঠাকরুণেরই কষ্ট!”

মর্মের মধ্যে তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়া যোগেশ খোঁসাইয়া তুলিল। যোগেশ চলিয়া গেলে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া শ্রামাকান্ত বালকেব মতন কাঁদিয়া বলিলেন “মা আমার! কি চণ্ডালের হাতে তোকে দিলুম!”

দেওয়ানকে ডাকাইয়া সেইদিন রজনী-নাথকে পত্র লিখাইলেন “হেম শুনিতেছি সম্পত্তি প্রাপ্তিব জন্ত নাশিশ করিবে। আমি স্থিব কবিয়াছি তাহাব পূর্বেই আমি আমার বিষয় বিভাগ করিয়া ফেলিব। অন্ধাংশ বিনোদের পুত্রকে ও অন্ধাংশ তাহাকে দিয়া আমি নিশ্চিত হইতে চাই। তুমি একবার আসিয়া তাহার বন্দোবস্ত কবিয়া যাও। মা ও হেম শারীরিক ভাল আছে বলিয়া শুনিলেও আমার তাহা বিশ্বাস হয় না। যোগেশ তাহাদের দেখিতেছে, সে বড়ই ভাল ছেলে। শুনলাম চন্দন নগরে তাহারা আছে। কোথায় আছে হেমের বিরক্তির ভয়ে তাহা বলিতে সাহস কবিল না।” তিনদিন পরে রজনীনাথের নিকট হইতে পত্র আসিল। এতদিন ধরিয়া শ্রামাকান্ত মনে মনে অনেকখানি আশা গড়িয়া রাখিয়া ছিলেন পত্রপাঠ তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। সে পত্র এইরূপ—

“কিসের পুরস্কাব স্বরূপ আপনি তাহাকে এত বড় একটা সম্পত্তির অধিকার দান করিতে চাহিতেছেন? উচ্ছৃঙ্খলতার? অবাধা-



ମାତା ଜ୍ଞେୟା

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅପରାଜିତାମାତା ଯାକୁବ ଆକ୍ଷୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ

ଝିଅ, ଦାସ କରୁକ ଝରା

କର୍ମାନ୍ତର, ଶ୍ରୀମତୀ

তার? ঈর্ষার? অকৃতজ্ঞতার—কিসেব? বিষয় আপনার, আপনি যদি তাহা রাস্তার লোক ডাকিয়াও বিলাইয়া দেন তাহাতে বাধা দিবার আমার অধিকার কি? কিন্তু আমার সহিত তাহাদের যে সম্বন্ধ ছিল তাহারই জ্ঞ শুধু এইটুকু স্মরণ কবাইয়া দেওয়া উচিত বলিয়া মনে করিতেছি। দোষীকে দণ্ডেব পবিবর্ত্তে পুণ্ডার দান যদি নিতান্তই আপনার অভিপ্রেত হয় অথ কাহাবও দ্বারা সে কার্য

করাইয়া লইবেন আমায় ক্ষমা করুন। আবশ্যক হইলে আপনার দলিলপত্র পাঠাইয়া দিতে পারি কিন্তু আমায় অনুগ্রহ করিয়া কোন সংবাদই দিবেন না।”

কি ভয়ানক! সেই রজনীনাথ সেই সম্মান বংশল পিতা! প্রাণাধিক মেহেব কণ্ঠার সম্বন্ধে আজ তাঁহাব এই নির্ভীক ছন্দমহীন পদ!

শ্রামাকান্ত মর্শ্বাহিত হইলেন।

দুঃখিনী ।*

থে'তে পায়নি, ছ'দিন ধরে';
তার উপবে রোগেব জ্বালা,
আছে তাহাব তিনটি শিশু,—
অন্ন বিনে হাড়ের মালা!
একটি ঘােরের সামনে এসে
“ভিক্ষে দাওগো” বললে খালি;
“কোন্ অভাগী, দূর হ!” বলে,
কে বেন তায় পাড়ল গালি!
গরীব বলে' এম্নি করে'
সবাই তা'বে করুছে ঘৃণা;
দেয় না তা'রে কেউ যে কিছুই
গালি কিম্বা প্রহাব বিনা!
মধ্যাকাশে তপন তখন
প্রথর তেজে জলুতেছিল;
এম্নি কালে, বক্ষে-শিশু-
মাকে আমার তাড়িয়ে দিল!
শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

স্বপ্রকাশ ।

আপন বসন্তবাগে সেথা তুমি পূর্ণ প্রস্ফুটিত
সেথা নাহি দখিন পবন।
নিঃশব্দ বীণায় তব সেথা জাগে সমাপ্ত সঙ্গীত
সেথা নাহি কাকলী কুজন!
অনন্ত মিলন সেথা, চির ভালবাসা;
সেথা স্তব্ধ গুঞ্জরণ, নাহি বাওয়া আসা;
বিরহদহন নাহি, নাহি লুক্ক আশা;
নাহি স্বপ্ন শুধু জাগরণ!
সেথা তব তন্দ্রাহীন আঁধ জাগে দিনবাত্রি পারে
সেথা নাহি ক্ষণ-চন্দ্র-লেখা।
সেথা পদপ্রান্তে তব চির মেঘ-যুক্ত বক্তরাগ,
সেথা নাহি উষাকরণ-রেখা!
নাহি দীপ্তি ক্ষণিকেব, নাহি অন্ধকার;
চিরতৃপ্তি, নাহি অতৃপ্তির হাহাকাব;
আছে মুক্তি, নাহি সেথা বন্ধন বিকার;
নাহি সঙ্গ, নহ সেথা একা!
শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* গত পৌষ মাসের ভারতীতে অয়ান নামক কবিতায় নিবিড় নীরদ স্থলে ভুলক্রমে 'নিবিড় নদীর' হইয়া পড়িয়াছে।

ভ্রমণ ।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি ।

সিউড়ির দক্ষিণাংশে ও স্তূপের পূর্ব দিকে তিন ফুট ও পাঁচ ফুট উচ্চ দুইটি খোদিত স্তূপ আছে। আকৃতিতে তাহারা বৃহৎ স্তূপের ন্যায়। চার ফুট ও ছয় ফুট উচ্চ দুইটি বুদ্ধদেবের মূর্তি আছে। মূর্তিগুলি বোধি বৃক্ষতলে যোগাসনে আসীন বুদ্ধদেবের মূর্তির ন্যায়। সূর্য্যরশ্মি যখন এই মূর্তিগুলির উপর পতিত হয়, তখন এগুলি উজ্জ্বল সূবর্ণমূর্তির ন্যায় বোধ হয়। এতদেশীয় বুদ্ধেবা বলিয়া থাকে যে “কয়েক শতাব্দী পূর্বে ভিক্তিমূলের ছিদ্রে বৃহৎ সূবর্ণ পিপীলিকা বাস করিত। প্রস্তর নির্মিত সিউডিতে ইহাদের দংশনের চিহ্ন অদ্যাপিও বর্তমান রহিয়াছে এবং তাহারা যে সূবর্ণ বালুকা রাখিয়া গিয়াছে তাহাতেই বুদ্ধদেবের এইপ্রকার সূবর্ণমূর্তি দেখা যায়।”

বৃহৎ স্তূপের সিউড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে ষোড়শ ফুট উচ্চ বুদ্ধদেবের চিত্রিত মূর্তি আছে। মূর্তিটির মধ্যদেশ হইতে উপরান্ন দুইভাগে বিভক্ত। প্রাচীন কিংবদন্তীতে জানা যায় যে এক দরিদ্র ব্যক্তি নিজ জীবন রক্ষার জন্তু অপরের অধীনে কার্য্য করিত। বেতন স্বরূপ একটা সূবর্ণ মুদ্রা পাইলে সে বুদ্ধদেবের মূর্তি নির্মাণে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়; স্তূপের সন্নিকটস্থ একজন চিত্রকরকে নিজের দৈন্যতা জানাইয়া বুদ্ধদেবের সুন্দর একটা মূর্তি একটা সূবর্ণ মুদ্রায় নির্মাণ করিতে বলে। চিত্রকর তাহার ভক্তি ও দৈন্যতার বিষয় অবগত হইয়া মূল্যের সম্বন্ধে কিছু না বলিয়াই মূর্তি নির্মাণে প্রস্তুত হয়। অন্ত একটা ঐরূপ দরিদ্র ব্যক্তিও একটা সূবর্ণমুদ্রা দ্বারা বুদ্ধদেবের প্রতিমা নির্মাণে অভিগাষী হয় এবং উপরোক্ত চিত্রকরকে সূবর্ণ মুদ্রা দান করিয়া মূর্তি নির্মাণে অনুরোধ করে। চিত্রকর পূর্বোক্ত প্রকারে দুইটা সূবর্ণ মুদ্রা প ইয়া উৎকৃষ্ট রং সংগ্রহ করিয়া চিত্র প্রস্তুত করে। একই দিনে উভয় ব্যক্তি ঐ মূর্তি ক পূজার্থ তথায় উপস্থিত হইলে, চিত্রকর উভয়কেই

একই মূর্তি দেখাইয়া বলে যে এই মূর্তি উভয়েরই। দরিদ্র ব্যক্তির ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হওয়াতে চিত্রকর তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলে যে সে তাহাদের অর্থ অপহরণ করে নাই এবং উভয়েরই অর্থ যে ঐ চিত্রে ব্যয়িত হইয়াছে তাহা প্রমাণ করিবার জন্তু মূর্তির নিকট প্রার্থনা করে। অবিলম্বে দৈব-শক্তিতে ঐ মূর্তির উপরান্ন দ্বিখণ্ড হইয়া যায় এবং উভয় খণ্ডই তুল্যজ্যোতি বিকাশ করিতে থাকে। এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া সকলেই আনন্দ মুগ্ধ হইয়া যায়।

বৃহৎ স্তূপের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে খেতপ্রস্তর নির্মিত অষ্টাদশ ফুট উচ্চ বুদ্ধ মূর্তি আছে। এই মূর্তির অনেক অলৌকিক ক্ষমতা এবং ইহা হইতে উজ্জ্বল জ্যোতি নির্গত হয়। কোন কোন সময় এই মূর্তি বৃহৎ স্তূপটী প্রদক্ষিণ করে, লোকে এরূপ দেখিয়া থাকে। কিছুদিন পূর্বে দম্মাগণ চৌর্য্যভিলাষে স্তূপের নিকট উপস্থিত হয়। বুদ্ধমূর্তি তৎক্ষণাৎ স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্তূপের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, দম্মাগণ ভীত হইয়া পলায়ন করে; মূর্তিও স্বস্থানে প্রত্যাগমন করে। দম্মাগণ এই দৃশ্যে মোহিত হইয়া, দম্মাবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া এই অপূর্ব অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিল। বৃহৎ স্তূপের বামে ও দক্ষিণে একশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ আছে। ইহার প্রত্যেকটীই সূকোশলে নির্মিত। মধ্যে মধ্যে এই সকল স্তূপ হইতে স্নগন্ধ উদ্ভিত ও নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে এবং ঋষি ও পুণ্যবাণ ব্যক্তিগণও মধ্যে মধ্যে স্তূপ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, এইরূপ দেখা যায়। তথাগত বলিয়া গিয়াছেন যে এই স্তূপটী সাতবার পুনর্নির্মিত হইলে বৌদ্ধধর্ম পৃথিবী হইতে লোপ পাইবে। প্রাচীন কাগজপত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে মন্দিরটী তিনবার ভস্মীভূত ও তিনবার পুনর্নির্মিত হইয়াছে।

যখন আমি প্রথম এই দেশে আসি, তাহার অব্যবহিত পূর্বেই এই স্তূপটি ভস্মীভূত হয়। পুনরায় নির্মিত হইতেছে। কিন্তু নির্মাণ কার্য শেষ হয় নাই।

বৃহৎ স্তূপটির পশ্চিমে রাজা কনিষ্ক কর্তৃক নির্মিত প্রাচীন সজ্বরাম আছে। ইহার উচ্চ প্রাসাদ, ছাদ, কক্ষ সকলই যে সমস্ত যতিগণ এই স্থানে থাকিয়া কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। যদিও এইক্ষণ ইহার কিছু ক্ষয় হইয়াছে, তাহা হইলেও ইহার অলৌকিক নির্মাণ কৌশল সহজেই প্রত্যক্ষমান হয়। মাত্র কয়েকজন যতি এই স্থানে বাস করেন; ইহারা হীনমতাবলম্বী। সজ্বরাম নির্মাণকাল হইতে অনেক শাস্ত্রপ্রণয়নকাব্য যতিগণ এই স্থানে বাস করিয়া অহরহ লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের খ্যাতি বহুদূর পয্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তাঁহাদের আদর্শ ধার্মিক জীবনের প্রাণসা এখনও শোনা যায়।

তিনতলাতে মাননীয় পার্শ্বিকের কক্ষ; ইহা অনেক-কাল পূর্বে ধ্বংস হইয়াছে কিন্তু লোকে এখানে স্মারক লিপি স্থাপন করিয়াছে। পার্শ্বিক প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু অশীতিবৎসর বয়সে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণাভিলাষে সংসার পরিত্যাগ করেন। নগরের বালকেরা তাঁহাকে নিম্নলিখিতভাবে বিদ্রূপ করিতে লাগিল “হে মূর্খ, অজ্ঞ বৃদ্ধ! তুমি কি জাননা যে যাহারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী তাহাদের উপাসনা ও শাস্ত্র পাঠ করিতে হয়? তুমি এইক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছ! এইক্ষণে শ্রমণ ব্রত গ্রহণে তোমার কি ফললাভ হইবে? তুমি কেবল আহার করিতেই জান—আর ত কিছুই জান না।” পার্শ্বিক বিদ্রূপাত্মক এই কথা শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতদিন তিনি ত্রিপিটকে পারদর্শী না হইবেন, যতদিন তিনি অসদিচ্ছা প্রতিকরণে সক্ষম না হইবেন যতদিন তিনি অভিজ্ঞ না হইবেন এবং বিমোক্ষলাভে সক্ষম না হইবেন ততদিন তিনি শয়ন পয্যস্ত করিবেন না। সেইদিন হইতে দিবাকালে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত পুস্তক পাঠ এবং রাত্রিতে উপবেশন করিয়া ধ্যান করিতেন। তিন বৎসরে তিনি ত্রিপিটকে এবং ত্রিবিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। লোকে সেই

সময় হইতে তাঁহাকে মাননীয় পার্শ্বিক নামে অভিহিত এবং যথেষ্ট সম্মান করিত। পার্শ্বিকের কক্ষের পূর্বে অল্প একটি পুরাতন গৃহ আছে; তথায় বহুবন্ধু বোধিসত্ত্ব অভিধর্মকোষ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ এই স্থানে একটি স্মারকলিপি রহিয়াছে।

বহুবন্ধুর গৃহের প্রায় পঞ্চাশপদ দূরে দ্বিতল গৃহে শাস্ত্রজ্ঞ মনোহৃত বাস করিতেন। এই বিজ্ঞ পণ্ডিত বুদ্ধদেবের নির্বাণের সহস্র বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যৌবনকালে তিনি বিদ্যাভ্যাসে রত এবং বিশেষ প্রতিভাশালী ছিলেন। ধার্মিকদের মধ্যে তাঁহার যথেষ্ট সূচশ ছিল এবং বিষয়ী লোকও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিত। এই সময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত নরপতি বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিতেন। দৈনিক তিনি পাঁচ লক্ষ সূবর্ণমুদ্রা বিতরণ করিতেন। তিনি দরিদ্র, অনাথ ও আতুরের অভাব মোচন করিতেন। বিক্রমাদিত্যের কোষাগার অচিরে শূন্য হইবে এই আশঙ্কায় তাঁহার কোষাধ্যক্ষ মহারাজকে এইরূপ নিবেদন করিল, “মহারাজ! আপনার খ্যাতি চরাচর ব্যাপ্ত হইয়াছে। আপনি আমাকে প্রত্যহ পাঁচলক্ষ সূবর্ণমুদ্রা আর্ন্তের উপকারার্থ ব্যয় করিতে আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে আপনার কোষাগার শূন্য হইবে এবং কৃষিগণের উপর কর বৃদ্ধি করিতে হইবে; ক্রমাগত ইহাতে ভূমির উর্বরাশক্তি লোপ পাইবে। ইহাতে প্রজা অসন্তুষ্ট হইবে। মহারাজ দানের জন্তু প্রশিক্ষিত করিবেন কিন্তু মন্ত্রীবর্গের কুৎসা প্রচারিত হইবে।” রাজা উত্তর করিলেন “আমি আমার ব্যয়বশিষ্ট হইতেই দরিদ্রের উপকার করিবার চেষ্টা করি। নিজের সুবিধার জন্তু অবিবেচনাপূর্বক আমি কখনও প্রজাপীড়ন করিব না।” এই প্রকারে রাজা প্রত্যহ পাঁচলক্ষ সূবর্ণমুদ্রা ব্যয় করিতেন। কিছু দিবস পরে, রাজা বিক্রমাদিত্য যুগযাণালীন শূকর অনুধাবন করিতেছিলেন। শূকর অনুসন্ধান সাহায্যকারী ব্যক্তিকে তিনি লক্ষমুদ্রাদান করিয়াছিলেন। মনোহৃত একদিন তাঁহার মস্তকমুণ্ডনকারীকে লক্ষ সূবর্ণমুদ্রাদান

করিয়াছিলেন . প্রধান ঐতিহাসিক এই দানের কথা আখ্যায়িকায় লিপিবদ্ধ করেন । রাজা ইহা পাঠে লজ্জিত হইয়া মনোহৃতকে শাস্তি দিবার জন্ত ব্যগ্র হন । তদুদ্দেশ্যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী একশত বিজ্ঞ ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া এইরূপ আদেশ দেন “আমি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীগণের অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ করিতে চাই ; বর্তমান প্রকৃত অপ্রকৃত নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য । এইজন্ত অচ্য আমার আদেশ পালনে আপনারা বিশেষ যত্নবান হউন ।” তর্কের জন্ত সকলে সমবেত হইলে তিনি এইপ্রকার দ্বিতীয় আদেশ প্রচার করিলেন যে, “শাস্ত্র বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয় পক্ষেই উপযুক্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন । বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণের তাহাদের নিয়মাবলী যথাযথ প্রতিপালন করা উচিত । যদি ইহাদি জয়লাভ করে, তবে উহাতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাববৃদ্ধি পাইবে কিন্তু যদি উহারা পরাজিত হয়, তাহা হইলে উহাদের বিনষ্ট করিতে হইবে ।” মনোহৃত এই আদেশে, বিপক্ষপক্ষীয় ৯৯ জনকে পরাজিত করিলেন । তৎপর, সামান্য বুদ্ধিবিশিষ্ট একজন তাঁহার সহিত তর্কের জন্ত অগ্রসর হইলে, মনোহৃত তাহাকে অগ্নি ও ধূমের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন । এই প্রশ্নে রাজা ও অবিশ্বাসীগণ বলিয়া উঠিল “সর্বশাস্ত্রজ্ঞ মনোহৃত অগ্রে ধূম ও পরে অগ্নি না বলিয়া প্রথমে অগ্নি ও পরে ধূমের কথা বলিয়াছেন ; সুতরাং তিনি পরাজিত হইয়াছেন ।” মনোহৃত কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু জনতা তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিল । ইহাতে তিনি লজ্জিত হইয়া নিজ জিহ্বা কঠন করিয়া শিষ্য বসুবন্ধুকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন “পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিগণের নিকট স্মরণ বিচার নাই ; প্রত্যয়কগণের নিকট বিচার নাই ।” এই লিখন সমাপ্ত হইলেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন ।

কিছুদিন পরে, রাজা বিক্রমাদিত্য সিংহাসনচ্যুত হইলেন এবং অল্প একজন নরপতি রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন । বসুবন্ধু পূর্বোক্ত কলঙ্ক অপনয়ন করিবার জন্ত এই নুতন নরপতির নিকট আসিয়া

বলিলেন “মহারাজ, আপনার সদ্গুণাবলী দ্বারা আপনি রাজ্য শাসন করিতেছেন । আমার গুরু মনোহৃত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন । পূর্ববর্তী রাজা বিদ্বেশবশতঃ আমার গুরুকে তাঁহার যশ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন । আমি সেই অপমানের প্রতিশোধ লইতে চাই ।” রাজা বসুবন্ধুর এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং যে সকল অবিশ্বাসী মনোহৃতের সহিত তর্ক করিয়াছিলেন তাহাদের আহ্বান করিলেন । বসুবন্ধু তাঁহার গুরুর সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বার প্রচার করাতে অবিশ্বাসীগণ লজ্জিত হইয়া তর্কস্থান পরিত্যাগ করিল ।

রাজা কনিষ্কনির্মিত সজ্বরাম লইতে ৫০ লি উত্তর-পূর্বে আমরা এক বৃহৎ নদী উত্তীর্ণ হইয়া পুষ্কলাবতী নগরীতে উপস্থিত হই । নগরীর পরিধি ১৪ কি ১৫ লি ; লোকসংখ্যা এবং বাসোপযোগী গৃহ যথেষ্ট । নগরের পশ্চিমদ্বারের বাহির্ভাগে একটা দেব-মন্দির আছে । তন্মধ্যস্থিত দেবমূর্তি সঙ্গমাকর্ষক এবং অনবরত অলৌকিক ঘটনা সম্পন্ন করেন । নগরের পূর্বদিকে রাজা অশোকনির্মিত স্তূপ—এই স্থানেই ভূতপূর্ব চারি জন বুদ্ধ ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন । পূর্বতন ধর্ম এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের অনেকে মধ্য ভারতবর্ষ হইতে এই স্থানে ধর্মপ্রচারার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন । দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে অভিধর্ম প্রকরণপদ-প্রণেতা শাস্ত্রজ্ঞ বসুমিত্র এইস্থানে আগমন করিয়াছিলেন ।

নগরের ৪৫ লি উত্তরে প্রাচীন সজ্বরাম আছে— তথায় জনমানব নাই । জনকয়েক হীনমানাবলম্বী যতি থাকেন । সজ্বরামের নিকটে কয়েকশত ফুট উচ্চ রাজা অশোক-নির্মিত স্তূপ আছে । ইহা কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্মিত । শাক্য বুদ্ধ যখন এদেশের রাজা ছিলেন তখন এইস্থানে বোধিসত্ত্বের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছিলেন । প্রার্থীগণের আবেদনে তিনি সকল দ্রব্যই দান করিয়াছিলেন এবং নিজ শরীর দান করিতেও পরাধ্বু হইয়াছেন নাই । এই দেশে, তিনি সহস্রবার রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া সহস্রবারই নিজ চক্ষু পরহিতার্থে দান করিয়াছিলেন ।

নিকটেই শতফুট উচ্চ দুইটা প্রস্তর স্তূপ আছে। দক্ষিণেরটা রাজা ব্রহ্মদেব কর্তৃক এবং বামেরটা শত্রু কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। উভয়ই বহুমূল্য রত্ন-মণ্ডিত। বুদ্ধদেবেব মৃত্যুর পরে এই সকল রত্নগুলি সাধারণ প্রস্তরে পরিণত হইয়াছিল। যদিও স্তূপগুলির অবস্থা বর্তমানে সুন্দর নহে, তথাপি দেখিতে এখনও তাহার যথেষ্ট উচ্চ। এই ২টা স্তূপ হইতে ৪০ লি উত্তর-পশ্চিমে আর একটা স্তূপ আছে। এই স্থানে শাক্য তথাগত ব্রাহ্মসংঘের মাতাকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং মনুষ্যের প্রতি তাহার প্রকৃতিগত হিংসা দূর করিয়াছিলেন। এই জন্ত এতদ্দেশীয় জনসাধারণ সন্তানকামনায় তাহাকে পূজা করে।

এই স্থান হইতে নূনাধিক ৫০ লি উত্তরে আর একটা স্তূপ আছে। এইস্থানে সামক বোধিসত্ত্ব তাহার অন্ধ পিতাকে শুশ্রূষা করিতেন। একদিন, যখন তিনি উহাদের জন্ত ফল আহরণ করিতেছিলেন তখন মৃগবার্ষ রাজা ভ্রমবশতঃ বিষাক্ত তীর দ্বারা তাহাকে আহত করেন। ইন্দ্র দয়াপরবশ হইয়া ঔষধাদিদ্বারা ক্ষত আরোগ্য করেন।

এই স্থানের দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় ২০০ লি যাইয়া আমরা পোলুমানগরে পৌঁছি। এই নগরের উত্তরে একটা স্তূপ আছে। তথায রাজপুত্র সুদান তাহার পিতার বৃহৎ হস্তী দান করার নিন্দিত ও রাজ্য হইতে বহিস্কৃত হইয়া এই স্থানে তাহার বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইয়াছিলেন। নিকটেই অল্প সঙ্খরামে হীনয়ানমতাবলম্বী ৫০টা পুরোহিত বাস করেন। পূর্বকালে এইস্থানে শাস্ত্রজ্ঞ ঈশ্বর অভিধর্ম-প্রকাশসাধনশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। নগরের বহির্ভাগ সঙ্খরামে মহায়ানমতাবলম্বী প্রায় অর্ধ শত পুরোহিত বাস করেন। রাজা অশোক এই স্থানে স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। নির্বাসিত রাজপুত্র সুদান দণ্ডলোক পর্বতে বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানে এক ব্রাহ্মণ তাহার পুত্র ও কন্যাকে ভিক্ষা প্রার্থনা করাতে সুদান তাহাদের বিক্রয় করিয়াছিলেন।

পোলুমানগর পরিত্যাগ করিয়া আমরা দণ্ডলোক

পর্বতে পৌঁছি। ঐ পর্বতের শৃঙ্গোপরি রাজা অশোক এক স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে নির্জনে রাজপুত্র সুদান বাস করিতেন। রাজপুত্র তাহার পুত্র কন্যাকে এক ব্রাহ্মণকে দান করাতে ব্রাহ্মণ তাহাদের এত প্রহার করেন যে এ স্থানে রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকে। অত্যাচারিত অত্রস্থ ব্রাহ্মণতাদি রক্তবর্ণ। পর্বতগুহার রাজপুত্র ও তাহার পত্নী ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। উপত্যকার মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণ তাহাদের ডাল সকল নত করিয়া দিত। এই স্থানে পূলকালে রাজপুত্র বিশ্রাম করিতেন। এই বনের পার্শ্বে পর্বতগুহায় এক বৃদ্ধ ঋষি বাস করিতেন। পর্বত গুহা হইতে ১০০ লি দূরে আমরা একটা ক্ষুদ্র ও একটা বৃহৎ পর্বতের নিকটে পৌঁছি। পর্বতের দক্ষিণে সঙ্খরামে মহায়ানমতাবলম্বী কয়েকজন যতি বাস করেন। ইহারই নিকটে রাজা অশোক নির্মিত স্তূপ আছে। এই স্থানেই পূর্বকালে একশৃঙ্গ ঋষি বাস করিতেন। এই ঋষি এক বেণুদ্বারা প্রতারিত হইয়া স্বধর্ম নষ্ট করিয়াছিলেন। ঐ স্ত্রীলোক তাহার স্কন্ধে চড়িয়া নগরে প্রত্যাগমন করিয়াছিল।

পোলুমানগরের ৫০ লি উত্তর-পূর্বে উচ্চ পর্বতোপরি পৌতবর্ষের প্রস্তর নির্মিত ঈশ্বরদেবের স্ত্রী ভীমা দেবীর মূর্তি আছে। উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের ধারণা যে এ মূর্তি আপনা হইতেই গঠিত হইয়াছে। ইহা অনেক অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন করিতে পারে এবং সেই জন্ত ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতেই লোকে উন্নতি কামনায় এখানে আসিয়া ইহার পূজা করে। ধর্মী দরিদ্র সকলেই এই স্থানে সমবেত হয়। যাহারা দেবতার স্বর্গীয় রূপ দর্শনে অভিলাষী হয়, তাহারা সাত দিবস উপবাসী থাকিয়া অসম্মিদ্ধচিত্তে ধ্যান করিলে ঐ মূর্তি দেখিতে পায় এবং প্রায়ই তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইয়া থাকে। পর্বত নিম্নে মহেশ্বর দেবের মন্দির; উন্মাদাদিত অবিখ্যাসীগণ এই স্থানে পূজার্থ সমবেত হয়। ভীমার মন্দির হইতে ১৫০ লি দক্ষিণপূর্বে ও হিন্দদেশে উপস্থিত হই। এই নগর প্রায় ২০ লি বিস্তৃত এবং ইহার দক্ষিণে সিন্ধু নদী। অধিবাসীরা বনৌ এবং

সমৃদ্ধিশালী। চতুর্দিক হইতে এই স্থানে মূল্যবান পণ্যাদি আমদানী হয়। এই নগরের উত্তর পশ্চিমে পোলোটুলো (সলাতুর) নগরে পৌঁছি। এই স্থানে ঋষি পাণিনী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে অনেকগুলি বর্ণ (অক্ষর) ছিল; পৃথিবী বিনষ্ট হইলে দেবতাগণ জনসমূহকে শিক্ষা দিবার জন্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হন। এই প্রকারে প্রাচীন বর্ণ ও রচনার উৎপত্তি হয়। এই সময় হইতে ভাষার বিস্তৃতি হয়। আবশ্যকানুযায়ী দৃষ্টান্তাদি ব্রহ্মা ও দেবেন্দ্র স্থির করেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঋষিগণ নানাপ্রকার বর্ণ সৃষ্টি করেন। পরবর্তীকালে মনুষ্যগণ এই সকল ব্যবহার করিতে থাকে। যখন মনুষ্যগণের পরমায়ু শতবর্ষকালব্যাপী হয়, তখন ঋষি পাণিনী জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। পাণিনী ঈশ্বর দেবের সাক্ষাৎ পাঠলে তিনি পাণিনীকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। পরে অনেক দিন পরিশ্রম করিয়া অনেক শব্দ সংগ্রহ করিয়া একসহস্র শ্লোক প্রণয়ন করেন। পুস্তক সমাপ্তি হইলে তিনি উহা রাজার নিকট প্রেরণ করিলে রাজা মহাসমাদরে উহা গ্রহণ করেন এবং রাজ্য-মধ্যে সর্বত্র উহা পাঠের জন্ত আদেশ প্রচার করেন। রাজা ইহাও প্রকাশ করেন যে, যিনি উহা আদ্যোপান্ত শিক্ষা করিতে পারিবেন তিনি সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক পাইবেন। একাল হইতে শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে উহা শিক্ষা দিতেছেন এবং এই জন্তই এই নগরের ব্রাহ্মণগণ উচ্চশিক্ষিত এবং বিশেষ প্রতিভাপন্ন।

এই নগরে একটা স্তূপ আছে। তথায একজন অহং পাণিনীর একজন শিষ্যকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তথাগতের নিব্বাণের পাঁচশত বৎসর পরে কাশ্মীর দেশে একজন অহং আগমন করিয়া ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। এই স্থানে আসিয়া উক্ত অহং দেখিতে পান যে জনৈক ব্রহ্মচারী তাঁহার এক শিষ্যকে শাসন করিতেছেন। ঐ দৃশ্যে অহং ব্রহ্মচারীকে বলিলেন “এবালককে তুমি কেন কষ্ট দিতেছ?” ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন “আমি উহাকে

শব্দ বিদ্যা শিক্ষা দিতেছি। কিন্তু বালক কিছুই শিক্ষা করিতে পারিতেছে না।” অহং ইহাতে হাশ্ব সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মচারী তদৃষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন “শ্রমগণ সাধারণতঃ সর্বজীবের প্রতি দয়াবান। মহাশয় আপনি কি জন্ত হাশ্ব করিলেন?” অহং উত্তর করিলেন “তুচ্ছ কথা সকল সময় শোভা পায় না এবং আমি যাহা বলি তাহা আপনি বিশ্বাস করিবেন না। আপনি অবশ্যই ঋষি পাণিনীর কথা শুনিয়াছেন?” ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন “এই নগরের বালকগণ সকলেই তাঁহার শিষ্য, সকলেই তাঁহাকে সম্মান করে এবং তাঁহার স্মরণার্থ এক মূর্তি এখন পর্যন্তও দৃষ্ট হয়।” অহং বলিতে লাগিলেন, যে বালককে আপনি এইক্ষণ শাসন করিতেছেন, এই বালকই সেই প্রাজ্ঞ ঋষি পাণিনী। পার্থিব শাস্ত্রেই পাণিনী নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে তাহার কেবল পুনর্জন্ম হইতেছে। পূর্ব স্মৃতি বলে তিনি আপনার শিষ্যরূপে এইবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু পার্থিব পুস্তকাদি দ্বারা তাঁহার কোনই উপকার হইবেনা। তথাগতের শিক্ষাই প্রকৃত সুখ ও জ্ঞান আনয়ন করে। দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলে প্রাচীন বৃক্ষের কোটরে পাঁচশত বাছড় বাস করিত। কোন সময় একদল বণিক ঐ বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। শীত নিবারণের জন্ত বণিকগণ বৃক্ষের নিম্নে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। বৃক্ষে অগ্নি লাগাতে বৃক্ষ ক্রমে ক্রমে ভস্মীভূত হইয়া গেল। এই সময়ে বণিকগণের একজন অভিধর্মপিটক আবৃত্তি করিতে থাকেন। বাছড়গণ অগ্নিদেও ঐ আবৃত্তিতে মোহিত হইয়া বৃক্ষ পরিত্যাগ না করায় সকলেই প্রাণ পরিত্যাগ করিল এবং তাহাদের পূর্ব-জন্মার্জিত ফলে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিল। উহার সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া ধর্মার্জন করিয়া অহং প্রাপ্ত হয়। কিছুকাল পূর্ব রাজা কনিষ্ক কাশ্মীর দেশে পাঁচশত ঋষিকে এক সভায় আহ্বান করেন। এই পাঁচশত ঋষিই সেই বৃক্ষের পাঁচশত বাছড়। এ মুখও সেই পাঁচশতের একজন। এই প্রকারেই মনুষ্য কেহ অগণ্য ভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করে, কেহবা

উচ্ছে ওঠে। কিন্তু এইক্ষণে, হে ব্রহ্মচারি, আপনার শিষ্যকে সংসার পরিত্যাগে আদেশ করুন! বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে কি ফল লাভ হয়, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।”

অর্চৎ এই বলিয়াই অন্তর্ধান হইলেন। ব্রহ্মচারী এই বৃত্তান্তে মুগ্ধ হইয়া, এই কাহিনী সর্বত্র প্রচার করিলেন এবং উক্ত বালককে সন্ন্যাস

গ্রহণে অনুমতি প্রদান করিলেন। পরন্তু, তিনি নিজে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইলেন। গ্রামের জনসাধারণ তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূন্যক শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং বর্তমানেও গ্রামবাসীরা ঐ ধর্মাবলম্বী রহিয়াছে।

এই স্থান হইতে আমবা কষেকটি পর্ষত ও নদী পার হইয়া উদয়ানায় পৌঁছিলাম। (ক্রমশঃ)
(দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত)

বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা

ভূমিকা।

মহাকাব্য ক্ষেমেন্দ্র খৃষ্টীয় দশমশতাব্দীর প্রথমার্শে কাশ্মীর দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পুত্র সোমেন্দ্র পিতৃকৃত অবদান কল্পলতা গ্রন্থের উপক্রমাণকা লিখনকালে উল্লেখ করিয়াছেন যে মহারাজ অনন্তদেব যখন কাশ্মীর রাজ্য শাসন করেন তাহার সপ্তবিংশ সম্বৎসরে অবদানকল্পলতা গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। এখন রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরেতিহাস গ্রন্থ আলোচনা করিয়া জানা যায় যে অনন্তদেবের রাজ্যকালের সপ্তবিংশ-সংবৎসর খৃষ্টীয় :০৩৫ সাল।

ক্ষেমেন্দ্র অবদানকল্পলতা, চারুচরিত্রাশতক দর্পদলন, ভারতমঞ্জরী প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় বহুতর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে অবদানকল্পলতা গ্রন্থটাই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ। এই গ্রন্থে ভগবান্ বুদ্ধের পূর্ব পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত কখনকালে অনেক উপদেশ গর্ভ সার কথা আছে। ইহার কবিত্বও অতি মনোরম এবং ভাষা অত্যন্ত প্রাজ্ঞ। এই গ্রন্থটী মূল সংস্কৃত ও তিব্বতীয় অনুবাদ সহ এতিয়াটিকসোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত

হইতেছে। আমিই ইহার সংস্করণ কার্য্য করিতেছি। প্রায় তিন অংশ ছাপা হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশও যথাসম্ভব সম্ভবই প্রকাশিত হইবে।

যৎকালে এ গ্রন্থটী লিখিত হয় তখন কাশ্মীরদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রাভুত্ব ছিল এবং তিব্বতীয় পণ্ডিতগণ তথায় সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন। তিব্বতীয় রাজার আদেশে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় কবিতাকারে অনুবাদ হইয়াছিল এবং এই অনুবাদ ও মূল সংস্কৃত উভয়ই ১২৪০ সংখ্যক কাষ্ঠফলকে তিব্বতীয় অক্ষবে খোদিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই এক একটী কাষ্ঠফলক দুই ফুট দীর্ঘ ও ৫ ইঞ্চি প্রস্থ। এই কাষ্ঠফলক হইতে ছাপা হইয়া উহা তিব্বত দেশে বহুকালাবধি প্রচার ছিল। ভারতে এ গ্রন্থের সৃষ্টি হইলেও কালক্রমে এখানে উহার লোপ ঘটিয়াছিল।

খৃঃ ১৮৮২ সালে আমি যখন লাসা নগরে উপস্থিত হই তখন বৈশাখ মাসে এই গ্রন্থের অনুসন্ধান পাইয়া বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

এই গ্রন্থটি ১০৮ সংখ্যক পল্লবনামক পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ৯৩তম পল্লবটি সুরমাগধাবদান। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম বাতীত জৈন ধর্ম নামে আরও একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম লুপ্ত হইলেও জৈন ধর্ম এখনও প্রচলিত আছে। বুদ্ধের নামও জিন। ইহাতে পুণ্ড্রবন্ধন নামে যে দেশের উল্লেখ আছে উহা আধুনিক গৌড়দেশ।

এই সুরমাগধাবদানটি ভারতী পত্রিকার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলাম ইতি।

শ্রীশরচ্ছন্দ্র দাস গুপ্ত ।

৯৩ তম পল্লব ।

(মূল সংস্কৃত হইতে অনুবাদ)

সুরমাগধাবদান

শ্লাঘ্যা জয়ন্তি জিন ভক্তি বিশেষ ভাজাং

শ্রদ্ধা সুরমাগধাবদান নির্বার শীকরাস্তে ।

নিশ্চতনোহপ্যচিৎ চেতনতা মিতৈবতি

যঃ পূজ্যপূজন বিধৌ কুসুমাদিবর্গঃ ॥১॥

জিনের প্রতি বিশিষ্ট ভক্তিমানু জনগণের শ্রদ্ধারূপ সুরমানির্বারিণীর শ্লাঘনীয় বিন্দুগুলিই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। পূজ্য ব্যক্তির পূজার জন্ত পুষ্প প্রভৃতির যে আয়োজন করা হয় উহা নিশ্চতন হইলেও যেন সমুচিত চৈতন্যবানের মতই হইয়া থাকে ॥১॥

পুরাকালে শ্রাবস্তীনগরীতে বিজন জেতকাননে সমাসীন ভগবানের নিকট সমাগত হইয়া অনাথপিণ্ড তঁহাকে বলিয়াছিলেন। “ভগবন্! মহাশুণবতী মদীয় কন্যা সুরমাগধা ভবদীয় ভক্তির গায় সর্বত্রই খ্যাতিলাভ

করিয়াছে। এক্ষণে পুণ্ড্রবন্ধন নগরে শ্রীমান্ সার্থনাথের পুত্র বৃষভদত্ত তাহার পাণিগ্রহণ ইচ্ছা করিতেছেন। আপনি যদি সম্মতি দেন তাহা হইলে আমি তঁহাকে কন্যাদান করি। আমার ধন ও প্রাণ সমস্তই আপনার অধীন। আপনার আজ্ঞাই আমার একমাত্র আশ্রয়ণীয় ॥ ২, ৩, ৪, ৫ ॥

অনাথপিণ্ড এই কথা বলিলে পব বৎসল ও বিমলাশয় ভগবান বলিলেন। দোষ কি? তাহাকেই কন্যাদান কর ॥৬॥

অনাথপিণ্ড ভগবানের আজ্ঞা গ্রহণপূর্বক তঁহাকে সাদরে প্রণিপাত করিয়া নিজালয়ে গমন করিলেন ॥৭॥

তৎপরে তিনি প্রচুর বিভব, ভূঁর রত্ন এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রদানপূর্বক তঁহাকে কন্যাদান করিলেন ॥৮॥

প্রদত্তা সুরমাগধা দূবতর দেশে যাইবার সময় ভগবচ্চরণ স্মরণ করিয়া সবাঙ্গনয়না হইয়াছিলেন ॥৯॥

সুরমাগধা অনেকদিনে পুণ্ড্রবন্ধন নগরে উপস্থিত হইয়া এবং পতির শুশ্রূষায় রত হইয়া পতিগৃহে বাস করিয়াছিলেন ॥১০॥

একদা তঁহার স্বর্গ ধনবতী ভোজ্যাস্তারকাযো অসংখ্য বায় করিতে উত্তত হইয়া তঁহাকে বলিয়াছিলেন। “সুরমাগধে তুমি সমস্ত পূজ্যোপকরণ সাজ্জিত কর। জগৎপূজ্যশুণ ভগবান্ জিন (জৈনধর্ম প্রবর্তক) কল্যাণপ্রাপ্তে আমাদের গৃহে আগমন করিবেন ॥১১, ১২ ॥

সুরমাগধা স্বর্গ কর্তৃক এইরূপ আদিষ্টা হইয়া কার্য্যারম্ভে তৎপরা হইয়াছিলেন। যে সকল জৈন ভিক্ষুগণ সেই পরিকল্পিত পূজার বিষয়

জানিতে পারিয়া তৎপবদিনে নগ্ন ও কেশশূন্যর উল্লঙ্ঘনের জন্ত অত্যন্ত ক্লেশপ্রাপ্ত অবস্থায় ঐ গৃহে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে নির্লজ্জ নগ্ন ও মাসভক্ষণাভ্যাসে স্কলকায় মহিষের ত্রায় দেখিয়া সূমাগধা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বস্ত্রারাবদন আচ্ছাদনপূর্বক খেদ ও নিবেদে বিনত হইয়া গুরুজনসমক্ষে স্বশ্রুদিগকে বলিয়াছিলেন ॥১৩—১৭॥

অহো বহুকাল পরে আমি এইরূপ অচার দেখিতে পাটলাম যে দিগম্বরগণেব সমক্ষে বদ্বজন অবস্থিতি করিতেছে। এই সকল গৃহস্থীন পশুগণ আপনাদের গৃহে ভোজন করিতেছে। ইহাবা মনুষ্য নহে এজন্তই অঙ্গনাগণ ইহাদিগকে দেখিয়া লজ্জিত হন না। অস্থানে আপনাদের ভক্তি দেখিতেছি। এ কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল নিয়ম। যে ব্যক্তি ভোজন ত্যাগ কবিত্তে পারে নাই সে কিরূপে বস্ত্র ত্যাগ করে ॥১৮—২০॥

ইহাদিগের কেশ উন্মূলন কৰ্ম্ম দ্বারা ই নিষ্কণতা প্রকাশিত হইয়াছে। কোপীন বস্ত্র বর্জন দ্বারা ই সংস্রভাবের আধ কথাই নাই। দম্ভবশতঃ ভয়ঙ্কর ইহাদের বদনে ক্রোধ স্পষ্ট দেখা বাইতেছে। ইহাবা নগ্ন কিন্তু ভোজনার্থী এবং নিয়মবান্ অতএব ইহারা পশুতুল্য ॥২১॥

এই সকল পশুগণ যেখানে পূজনীয় সেখানে তাড়নীয় কে হইবে জানিনা। অথবা ইহা দেশেরই দোষ। লোকসকল গতানু-গতিকই হইয়া থাকে ॥২২॥

সূমাগধা এই কথা বলিলে পর তাঁহাব স্বশ্রু বিষধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন। “ভদ্রে! তোমার পিত্রালয়ে কিরূপ লোকের পূজা করা হইয়া থাকে তাহা বল ॥২৩॥

তিনি বলিলেন আমার পিত্রালয়ে ভগবান্ জিনের (বুদ্ধের) পূজা করা হয়। তিনি কারুণ্যবশতঃ সমস্ত জগতের কুশললাভের জন্ত সতত উত্তত থাকেন ॥২৪॥

ভগবান্ জিন সর্বদাই ধানে স্তমিতনয়ন তিনি পূর্ণলাবণ্যের সিন্ধুরূপ। তাঁহার নাসা বংশীর ত্রায় বিপুল ও সরল এবং সেতুর ত্রায়। তাঁহাব বিস্তৃত কর্ণপাশ ভূষা শূন্য হইলেও রমণীয়। অধিক কি তাঁহার কাণ্ডি দেখিয়াই বিবজ্জনের হৃদয়ে অনির্বচনীয় শান্তি উদয় হয় ॥২৫॥

তাঁহার মস্তকে একটি স্বাভাবিক মণি আছে তাহার আলোক অত্যন্ত উজ্জ্বল। তাঁহার বাহুদ্বয় করিকরমদৃশ। তাঁহার কাণ্ডি তপ্তকাঞ্চনের ত্রায়। তাঁহার করতলে শঙ্খ, ধ্বজ ও পদ্মমালা রেখা আছে। তিনি শান্তি ও সংযমের সাম্রাজ্যের উপযুক্ত লক্ষণ ধারণ করেন ॥২৬॥

মহামুনিগণেবও অভিনাষজনক সেই মহাপুরুষের স্বভাব সর্বপ্রকার অভিলাষ-বর্জিত। তিনি সর্বজ্ঞ ও সদাই আনন্দময় এবং অনুরাগবর্জিত। তাঁহার অধর অত্যন্ত রক্তবর্ণ ॥২৭॥

তাঁহার মুক্তি দেখিলেই গাঢ় আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হয়। মৈত্রী তাঁহার মনে সতত শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার কাণ্ডি তন্ময়তাকারিণী। তাঁহার হৃদয়বর্তিনী দয়া গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। তিনি বহুদয়িতাষ আসক্ত হইয়াও সকলেরই আশা পূর্ণ করেন। তিনি অপূর্ব মুনি তাঁহার মহিমা অসাধারণ। তাঁহার শান্তির মধ্যও বৈরাগ্য রহিয়াছে ॥২৮॥

যিনি আমাদের গৃহে পূজিত হন তাঁহার উপদিষ্ট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া শীলবান্ সজ্জন-গণের মন মোহাবরণ হইতে মুক্ত হয় ॥২৯॥

তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রক্ষামণিস্বরূপ । তাঁহাকে স্মরণ কবিলেও রাগদেহরূপ উগ্র দংশিত্রায়শালী সংসারমর্ষ আর প্রাণীকে পীড়িত করিতে পারে না ॥৩০॥

শ্রদ্ধা শ্রোত্রেব বসায়নস্বরূপ স্মাগধাব এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্ত্বঃ প্রমোদবশতঃ বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত হইয়া হর্ষসহকাবে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ॥৩১॥

হে বরাননে ! তাঁহার দশনের কোন উপায় আছে কি । তাঁহার পুনাসম্পর্কে আমরাও কি অমৃতাম্পদ হইতে পাবি ॥৩২॥

শ্রদ্ধা সমাদরবুদ্ধি ও অমুনয় সহকাবে এইরূপ প্রার্থনা কবিলে পব ভক্তিমানিনী স্মাগধা বলিলেন যে আমি তোমাঙ্গিকে তাঁহাকে দেখাইব ॥ ৩৩ ॥

স্মাগধা এইরূপ মহাপ্রতিজ্ঞাভার নিরীহ করিতে অভিলাষবতী হইয়া সংশয়দোলায় আরোহণ পূর্বক ক্ষণকাল ধ্যানপরায়ণ হইয়া ছিলেন ॥৩৪॥

তৎপরে প্রাণাদে আবোহণপূর্বক ক্ষণকাল ভগবৎসেবিত দিক লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে প্রাণিপাতপূর্বক পূজ্যপূজোপযুক্ত কুমুমাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৫॥

তিনি পুষ্প, ধূপ ও উদক দ্বারা পূজা করিয়া ভগবানের পাদপদ্ম স্মরণপূর্বক আনন্দ বাস্পে সংরুদ্ধ নয়নদ্বয় সেইদিকে প্রেরণ করিয়া বলিয়াছিলেন ॥৩৬॥

হে ভগবন্ তোমার আশ্রমের মুণীস্বরূপ আমি যে রত্নত্রয় (বুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্জ) বিবজ্জিত

হইয়া এই দুবদেশে আসিয়াছি ইহা তোমার অনুকম্পাই হইয়াছে । হে দয়ালো আমি দূরস্থ হইলেও তোমার পাদপদ্মযুগলেব শরণাগত । দৃষ্টিরারা আমাকে স্পর্শ কর । বাৎসল্যবান্ মহজ্জনের করুণা প্রবাসবশতঃ দুবীকৃত জনে অল্লতা প্রাপ্ত হই না । ॥৩৭, ৩৮॥

হে ভগবন্ আপনাব দাসকত্তা আমি অস্ত্র আপনাকে নিমন্ত্রণ করিতেছি । হে বিভো প্রাতঃকালে আগমন করিয়া আমার মান বক্ষা করিবেন ॥৩৯॥

স্মাগধা এই কথা বলিয়া বিচিত্র কুমুমাঞ্জলি সমর্পণ করিলে পর উহা সজীব ভক্তিদূতিকাির শ্রাব আকাশমার্গে গমন করিতে লাগিল ॥৪০॥

শ্বেত, রক্ত, হবিত ও অসিতবর্ণ এবং ধূপম্ম শোভিত ঐ স্মাগধা-প্রদত্ত পুষ্পাবলী আকাশমার্গে ধীরে ধীরে গমন কবিত্তেছিল । উহা দোখয়া বোধ হইয়াছিল যেন শচীপতি ইন্দ্রের ধনু বালাস্বদ সংলগ্ন হইয়া আকাশে সঞ্চারণ করিতেছে ॥৪১॥

অতঃপর ভক্তিশালিনী ঐ পুষ্পাবলী ক্ষণকালমধ্যে জেতবনে উপস্থিত হইয়া শাস্তা অর্থাৎ ভগবানের পাদপদ্মদ্বয়ের উপর পতিত হইয়াছিল ॥৪২॥

সর্বজ্ঞ ভগবানও স্মাগধার সমস্ত অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া করুণাবশতঃ পুরোবর্তী আনন্দকে বলিয়াছিলেন ॥৪৩॥

কল্যা প্রাতঃকালে আমাদিগকে পুণ্ডবর্কন নগরে যাইতে হইবে । স্মাগধা আমার ও মদীয় সজ্জগণের পূজা কবিবার জন্ত প্রার্থনা করিতেছেন ॥৪৪॥

পুণ্ডবর্দ্ধন নগর এখান হইতে শত যষ্টি যোজনেরও অধিক। একদিনেই সেখানে যাইতে হইবে। এস্থলে বিলম্ব করা উচিত নহে। যে সকল প্রভাবশালী ভিক্ষুগণ আকাশমার্গে যাইতে পারেন তাঁহাদিগকেই তুমি নিমন্ত্রণশলাকা (১) সমর্পণ কর ॥৪৫,৪৬॥

আনন্দ এইরূপে সুগতকর্তৃক প্রেরিত হইয়া ভিক্ষুগণকে নিবেদন করিয়াছিলেন যে যাহাবা একাহমধ্যে পুণ্ডবর্দ্ধন নগরে গমন করিতে পারিবেন শলাকা দ্বারা তাঁহাদিগকেই নিমন্ত্রণ করা হইতেছে ॥৪৭॥

ত ন মহাক্ৰিমান ভিক্ষুগণ শলাকা গ্রহণ করিলে পর পূর্ণকুন্তোপধানী এক স্থবিরও উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৪৮॥

প্রভাববান্ স্থবির শলাকাগ্রহণার্থে হস্ত-প্রসারণ করিলে পর আনন্দ কিঞ্চিৎ হাশ্রু করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। এই দুইপদ দূরবর্তী অনাথপিণ্ডদগৃহে আপনি যান না কিন্তু শতযষ্টিযোজন দিনার্দ্ধে গমন করিতেছেন ॥৪৯,৫০॥

আনন্দ এই কথা বলিলে পর স্থবির লজ্জায় অধোবদন হইয়া চিন্তা করিলেন যে নিজ দলমধ্যে নূনতা প্রকাশ বড়ই দুঃসহ। অনাদিকাল সঞ্চিত ক্লেণ, জন্ম ও জরাদি সমস্তই যত্নদ্বারা বিনাশ করিতে পারা যায় কিন্তু কতদূর বা ঋদ্ধিপদ পাইয়াছি তাহা কি দেখাইতে পারিব না ॥৫১,৫২॥

এইরূপ তাঁর সংবেগযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা চিন্তা-

পরায়ণ ও বিশুদ্ধচিত্ত ঐ স্থবিরের মহাক্ৰিষ্ণকাল মধ্যেই প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল ॥৫৩॥

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে সমস্ত ভিক্ষুগণ নানা প্রকার দেববেশ গ্রহণপূর্বক বিনানদ্বারা আকাশমার্গে গমন করিয়া-ছিলেন ॥৫৫,৫৬॥

ইত্যবসরে মহাবস্তু ও উদ্ভোগপূর্ণ সুমাগধার ভর্তৃগৃহে ঋশা, ঋশুর ও ভর্তৃসহ ভগবদর্শনাভিলাষে প্রাসাদসমারূঢ়া হইয়া পুষ্প ও ধূপদ্বারা পূজারচনার সংগ্রহ কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ॥৫৫,৫৬॥

তৎপরে প্রথমে দিব্যাক্ষিসম্পন্ন ও বিবিধ আশ্চর্যজনক অজ্ঞাতকোণ্ডিন্য নামক ভিক্ষু অশ্বরথে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন দেখা গেল ॥৫৭॥

ঋশুরাদিগণ সূর্যাসদৃশ তেজস্বী ভিক্ষুকে দেখিয়া প্রীতিসহকারে সুমাগধাকে বলিয়া-ছিলেন যে “ইনি কি ভগবান্”। সুমাগধা বলিলেন “ইনি ভগবান্ নহেন। ইনি সূর্য্য-সম তেজস্বী ও অপ্রতিহততেজাঃ ভিক্ষু অজ্ঞাত-কোণ্ডিন্য বলিয়া বোধ হইতেছে” ॥৫৮,৫৯॥

ক্রমে ক্রমে রথ সকল আসিতে লাগিল এবং প্রত্যেকবারেই ঋশুরাদিগণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন “ইনি কি ভগবান্”। সুমাগধা বলিলেন ইনি ভগবান্ নহেন। ইহারা সকলেই ভগবানের শাসনাধীন ভিক্ষুগণ। ইহারাও শাস্তিগুণে শ্লাঘনীয় ও তপোবলে প্রদীপ্ততেজাঃ ॥৬০,৬১॥

(১) পুরাকালে ভারতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের এই প্রথা ছিল যে তাঁহারা নিমন্ত্রণকালে কর্পূর, চন্দন কস্তুরিকা প্রভৃতি সুগন্ধদ্রব্যদ্বারা নির্মিত এক একটা শলাকা পত্রসহ পাঠাইতেন। এখনও তিব্বতে ঐরূপ শলাকার সুগন্ধ প্রাবারক দেওয়া ব্যবহার আছে।

যিনি কমনীয় হেমময় দ্রুমদ্বারা রমণীয় শৈলশৃঙ্গে অধিকৃত রহিয়াছেন ইনি আশ্চর্য্য-কারী মূর্ত্তিমান্ প্রভাবস্বরূপ ইহার নাম মহাকাশ্রপ ভিক্ষু ॥৬২॥

যিনি জলপূর্ণ মেঘের ত্রায় গভীর ঘোষকারী পঞ্চাননরথে অধিকৃত হইয়া আকাশমার্গে আসিতেছেন ইনি বিখ্যাত গুণবান্ ভিক্ষু শারিপুত্র ॥৬৩॥

যিনি কৈলাসপর্বতবৎ শুভ্র চতুর্দণ্ড-সমন্বিত হস্তীতে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন ইনি মহা পুণ্যবান্ মৌদ্গল্যনামা ভিক্ষু ॥৬৪॥

যিনি বৈদূর্য্যময়, মুগালমণ্ডিত ও রত্নাকুরবৎ কেশরদ্বারাশোভিত কনকপদ্মে আরোহণ করিয়া সৌরভ বিস্তার করিয়া আসিতেছেন ইনি বিখ্যাত ভিক্ষু অনিরুদ্ধ ॥৬৫॥

যিনি গরুড়োপরি অধিকৃত হইয়া পক্ষানিল দ্বারা মেঘ সকল উৎসারিত করিতে করিতে আকাশাগ্রে অবগাহন করিতেছেন ইনি নৈত্রায়ণীপুত্র ভিক্ষু সুপূর্ণ ॥৬৬॥

যিনি নিতান্ত শান্ত অনন্তে অবস্থান করিয়া প্রভামৃতদ্বারা দিব্যুথ তর্পিত করিয়া আসিতেছেন ইনি সত্ত্বমহোদধি, প্রভাববান্ ভিক্ষু এষ্যজিৎ ॥৬৭॥

যিনি বিলোল বল্লীবলয়মণ্ডিত বিশাল সুবর্ণময় তালে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন ইনি পুণ্যপূর্ণদ্রুতি, মতিমান্ ভিক্ষু উপালী ॥৬৮॥

যিনি সুবর্ণ ও রত্নে উজ্জ্বল পত্ররেখামণ্ডিত বৈদূর্য্যময় বিমানের শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া প্রভাদ্বারা বিলেপন করিতে করিতে আসিতেছেন ইনি ভিক্ষু কাত্যায়ন ॥৬৯॥

যিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী বৃষোপরি অধিকৃত

হইয়া আকাশে অবগাহন করিতেছেন ইনি প্রতিষ্ঠাবান্ ও গরিষ্ঠবুদ্ধি ভিক্ষু কোষ্ঠিল ॥৭০॥

যিনি বিমান হংসের ছাতিদ্বারা অন্তরীক্ষকে হাশ্রতরঙ্গে উদ্ভাসিত করিয়া আসিতেছেন ইনি তপোনিধি পিলিন্দবৎস নামক ভিক্ষু ॥৭১॥

যিনি সমুৎফুল্ল লতাবনমধ্যে বিহার করিতে করিতে আসিতেছেন ইনি অক্ষুধ শোভাবান্ ও গৃহাপেক্ষাবিহীন প্রসিদ্ধ ভিক্ষু শ্রোগকোটি ॥৭২॥

যিনি হেমপ্রভাবারা দিগ্বিভাগ ভূমিত করিয়া অপর সুমেরু পর্বতবৎ সংলক্ষিত হইতেছেন ইনি ভগবানের পুত্র চক্রবর্ত্তী রাহুলক ॥৭৩॥

এই সকল বিচিত্র রত্নময় আসন ও বাহন-স্থিত অসংখ্য ও অদ্ভুতকর্ম্মা ভিক্ষুগণ পর্বতগণ, দিগন্তর, পৃথিবীমণ্ডল ও আকাশতট হইতে আসিতেছেন ॥৭৪॥

সুমাগধা কর্তৃক এইরূপ ক্রমে ক্রমে নিবেদ্যমান ভিক্ষুসংঘকে সম্মুখে অনন্তদৃষ্টিতে বিলোকন করিয়া তাঁহারা যুগপৎ হর্ষ, ও অদ্ভুত সন্মের বর্শীভূত হইয়াছিলেন ॥৭৫॥

অতঃপর জগৎ যেন কাঞ্চনবর্ণবৎ উজ্জল-বর্ণ ও শতসূর্য্য প্রকাশজনিত আলোকে আলোকিত হইল। এবং অশেষ সস্তাপের প্রশমন হওয়ায় শাতাংশুশতমায়া দ্বারা যেন জগৎ শীতল হইয়া গেল ॥ ৭৬ ॥

অনন্তর ধনপতি, ইন্দ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ কর্তৃক অনুগম্যমান ও বিপুল গগন-যাত্রার অনুরূপ সেব্যমান এবং অমরপুরের পুরন্দ্রীগণকর্তৃক পুষ্পাজলি দ্বারা বিকীর্যমাণ ভগবান্ জিনেন্দ্র ঐ সকল পুণ্যবান্ গণের নয়নগোচর হইলেন ॥ ৭৭ ॥

ভগবান্ অষ্টাদশ মূর্তিতে অষ্টাদশ দ্বার সমন্বিত ঐ নগরে যুগপৎ প্রবেশ করিয়া সুমাগধার গৃহ ঘেন শশিকান্ত মণির প্রভাময় করিয়াছিলেন ॥ ৬৮ ॥

তত্রত্য সকলেই প্রণিপাত পূর্বক বহু-প্রকার পরিপূর্ণ উপচার দ্বারা ভগবানের পূজা করিয়াছিল। পুর্ববাসী জনগণও বহির্দেশে ভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত ভগবানেব পূজা করিয়াছিল ॥ ৭৯ ॥

দয়ালু ভগবান্ সুমাগধার প্রতি রূপাবশতঃ সজ্ব সহ পূজা গ্রহণ করিয়া অমুগ্রহালোকন দ্বারা সকলের প্রতিই প্রসাদ বিধান করিয়া-ছিলেন ॥ ৮০ ॥

শ্বশুরাদি বর্গ সহিত সুমাগধা এবং অশ্রুশ্রু সমস্ত পুর্ববাসী জনগণ শাস্তার উপদেশ দ্বারা বিগুহাশয় হইয়া তৎক্ষণাৎ সত্যদর্শন করিয়াছিল ॥ ৮১ ॥

ভিক্ষুগণ সুমাগধার কুশলসম্বৃত পুণ্য ও বিপুল প্রভাব নিলোকন করিয়া কোতূহলবশতঃ ভগবান্কে পূর্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন ॥ ৮২ ॥

সুমাগধার পূর্বজন্মবৃত্তান্ত।

সর্বদশী ভগবান্ সভাস্থলে ভিক্ষুগণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া দস্তপ্রভা দ্বারা দিব্যুথ আলোকিত করিয়া সুমাগধার কুশলের হেতু বলিয়াছিলেন ॥ ৮৩ ॥

পুরাকালে বারাগসীতে কুকি নামক রাজার কাঞ্চনমালা নামে এক কন্যা ছিল। তিনি কাশ্যপ নামক শাস্তার প্রতি সতত ভক্তি-শালিনী ছিলেন। তিনি পঞ্চশত সখীগণ সহ তাঁহার পরিচর্যা করিয়াছিলেন ॥ ৮৪, ৮৫ ॥

একদা রাজা কুকি বিকৃত স্বপ্ন দর্শন করিয়া ভয় ও সংশয়ে ভীত হইয়া স্বপ্নকলঙ্ক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। দৈবজ্ঞগণ রাজসুতার প্রতি বিদেষ বশতঃ তাঁহাকে বলিয়াছিল যে অতি প্রিয়জনের হৃৎপিণ্ড হোম করিলে মঙ্গল হইবে ॥ ৮৬, ৮৭ ॥

রাজা দৈবজ্ঞগণের এইরূপ ক্রুরতর বাক্যে অনাদর করিয়া কন্যার কথাগুসারে ভগবান্ কাশ্যপকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তথায় গিয়া তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন যে আমি অশ্রু এক বিকৃত স্বপ্ন দেখিয়াছি হে সর্বজ্ঞ ইহার ফল কি হইবে আপনি তাহা বলুন ॥ ৮৮, ৮৯ ॥

আমি দেখিয়াছি যে এক রুদ্ধপুচ্ছ গজ বাতায়ন মার্গে নির্গত হইতেছে। এবং কৃপ তৃষিত জনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। একজন মুক্তাপ্রস্থ বিক্রয় দ্বারা শত্রুপ্রস্থ লাভ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে। কতকগুলি কুকাঠ চন্দনেব সমান করা হইয়াছে। একটা হস্তি-শাবক একটা মহাগজকে বুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। একটা বানর অশ্রুচি লিপ্তাঙ্গ হইয়া অশ্রুলোকের দেহে লেপন করিয়া পলাইতেছে। কুৎসিত ও চপল একটা বানর স্ফীত রাজ্যে অভিবিক্ত হইয়াছে। একটা পট অষ্টাদশ পুরুষ কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়াও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই। রমণীয় পুষ্পফলশোভিত উদ্যান চোরগণ কর্তৃক লুপ্তিত হইতেছে। বহুলোক বিদেষ, উপহাস, ও কলহে আসক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত অদ্ভুত স্বপ্নের যোরতর ফল অন্যলোক বলিয়াছে। রাজকর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ কাশ্যপ বলিয়া ছিলেন ॥ ৯০-৯৫ ॥

শমশ্রুগাথিত, অমৃতসাগর, ভগবান্ জিন

শাস্তা শাক্যমুনি রূপে শতায়ুঃ জনমধ্যে জন্ম গ্রহণ করিবেন তাহাই তুমি স্বপ্নে হস্তী দর্শন করিয়াছ । তাঁহারও পশ্চিম কালে শ্রাবকগণ কলহ আশ্রয় করিয়া শীল, গুণ ও আচার ত্যাগপূর্বক বিপ্লবকারী হইবে ।

ইহারা স্বয়ং সেবা অবলম্বন করিয়া অপক ও অল্প বিবেক সম্পন্ন গৃহস্থগণের নিকট বলপূর্বক ধর্মঘোষণা করিবে । যিনি প্রার্থনীয় তিনিই প্রার্থীরূপে সেবার জন্য ধাবমান হইবেন তাই তুমি স্বপ্নে তৃষিতের পশ্চাদ্ ধাবমান কুপ দেখিয়াছ । ইহারা ই লোভান্ন ও মোহহত হইয়া শক্তু প্রস্থলোভে বোধান্নরূপ মুক্তাপ্রস্থ বিক্রয় কবিবে । ইহারা মূর্খতা প্রযুক্ত তীর্থবাহু কুদাকগুলি বুদ্ধভাষিতরূপ চন্দনের সমান বলিয়া প্রতিপাদন করিবে কোনরূপ প্রভেদ করিবে না । কোথায়ও বা বিনীত ও ভদ্র ভিক্ষুরূপ কুঞ্জরকে দেখিয়া ছুঃশীল কলভরূপ ভিক্ষু স্পর্ধাপূর্বক তাঁহাকে ধিকৃত করিবে । চপলতারূপ অশুচি দ্বারা লিপ্তান্ন ভিক্ষুরূপ মর্কট সূশীল ভিক্ষুগণকে নিজদোষে লিপ্ত করিয়া নিজতুল্য কবিবে । কপিসদৃশ ষণ্ডকেরও অভিষেক হইবে । সংবুদ্ধের শাসনপদ কুষ্যমাণ হইয়াও নষ্ট হইবে না । ভিক্ষু সংঘের দ্রব্যরূপ ফলোত্তানে চুরি হইবে । তাহারা পরস্পর নিন্দা করিয়া কলহপরায়ণ হইবে । তোমার স্বপ্নের

পরিণামে এই সকল ফল পৃথিবীতে প্রাহুভূত হইবে । রাজা কৃকি শাস্তার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন ॥ ৯৬-১০৬ ॥

অতঃপর ভগবান্ অনুচরগণ সমন্বিত রাজার ধর্মদেশনা করিয়া কাঞ্চনমালার কুশলাহঁতা আদেশ করিলেন ॥ ১০৭ ॥

ইনি জন্মান্তবে নারঙ্গমালা দ্বারা স্তূপে অর্চনা করিয়াছিলেন । সেই পুণ্যে হেমমালাঙ্কিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১০৮ ॥

সেই কাঞ্চনমালাই মহাপুণ্যপ্রভাবে সুমাগধারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অণু কুশলসেতুতা প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১০৯ ॥

ভগবান্ জিন এই কথা বলিয়া ভিক্ষুগণসহ আকাশমার্গে কাস্তিদ্বারা দিগ্‌মণ্ডল পূরিত করিয়া জেতবনে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১১০ ॥

জনগণ সংকুলের অভ্যুদয়ের জন্য বৃধা পুত্র কামনা করে । পুত্র যদি গুণবান্ না হয় তাহা হইলে সমস্ত কুলই দূষিত হয় । একরূপ গুণবতী কন্যাও উৎপন্ন হয় যিনি নৌকার ন্যায় নিজ পুণ্যপ্রভাবে উভয় কুলকেই সংসাররূপ ভীষণ সমুদ্রে পার করিয়া থাকেন ॥ ১১১ ॥

ইতি ক্ষেমেন্দ্র কৃত বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতার সুমাগধাবদান নামক ত্রিনবতিতম পল্লব সমাপ্ত ॥

পুণ্ড্রবর্ধন—অর্থাৎ গোড়নগর বৌদ্ধযুগে সভ্যতার কিরূপ উচ্চশিখরে সমারুঢ় ছিল—এবং ভারতে নারীজাতি তখন কিরূপ সুশিক্ষিতা ও সম্মানিতা ছিলেন তাহা এই প্রবন্ধটি হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় ।--

জয়পুর।

(ফেলিসিটাস-শ্যালের ফরাসী হইতে)

২৮।২৯ জানুয়ারী ১৯০০

জয়পুরের যে একটি চিত্তবিমোহন সঙ্গীতিক সৌন্দর্য আছে তাহা আমি কিরূপে অশ্রুত হৃদয়ঙ্গম করাইব? এই নগরীটিকে একটি রাগিনী বলিলেও হয়। এই রাগিনীর বাদী-স্বরটি গোলাপী।

নগরের প্রাচীর গোলাপী। নগরের দ্বারগুলি গোলাপী। রাজপথেব সমস্ত বাড়ী গুলি গোলাপী। প্রাসাদগুলি গোলাপী। দেবালয়গুলি গোলাপী। উঠানে গোলাপী। স্বর্ণাভ গোলাপী আলোকে সমস্ত উদ্ভাসিত।

রাস্তায় জীবন-উত্তমের অসীম ক্ষুধা; সুশ্রী পুরুষেরা শ্রমগণ; ইহাদেব কাপড় অতি উৎকৃষ্ট, উজ্জ্বল, প্রায়ই গোলাপী রঙের। তরুণীগণ স্নিতমুখী। সুন্দর শিশুগুলি একে-বারে নগ্নকায়। রাস্তার মাঝে, হাতী, উট, জেব্রা, মহিষ, ছাগল, গাধা, গরু। বাড়ীর ছাদে—বানর, পায়রা, ময়ূব, টিয়া, কাক। রাস্তায় বিবাহের বরযাত্রী চলিয়াছে—আগে-আগে কোলাহলময় বাগুভাগু, বাব বৎসর বয়স্ক বরের হাসি মুখ। মহারাজার একজন ভৃত্য, শিকলে-বাধা একটা নেকড়েকে লইয়া রাস্তায় ফিরাইতেছে।

আমরা মহারাজার একজন মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। তিনি একটি গোলাপী রঙের বাড়ীতে থাকেন; বাড়ীর গায়ে বড়-বড় সাদা হাতী চিত্রিত। বৃদ্ধ মন্ত্রী দেখিতে

সুশ্রী, ইহার অপূর্ণ ধরণেব বড়-বড় চোখ। মন্ত্রী, তাঁহাব ছোট ছেলেদিগকে আমাদের সম্মুখে আনিলেন। তাহারা গোলাপী রঙের কাশ্মীরী কাপড় পবিয়াছে। জাফানের ও পেস্তার মেঠাই, ছোটো-ছোটো কমলালেবু, ছাড়ানো বেদানা, এই সব তিনি আমাদের হাতে দিলেন...

এখানকার সমস্ত পরিবেষ্টনটা একরূপ অপূর্ণ, আমাদের অভ্যস্ত কন্মক্ষেত্র হইতে এতটা তফাৎ যে, বাস্তবতার ভাবটা যেন মন হইতে শীঘ্রই তিবোহিত হয়। এই সুন্দর দৃশ্য দর্শনে সর্বপ্রকার ভাবনা চিন্তা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া হৃদয় অসীম আনন্দে,—এক প্রকার লগ্ন ধরণের অহেতুক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

এই গীতি-নাট্যের সাজসজ্জাব মধ্যে মানুষ যে বাধা হইয়া, বাস্তব-বোধে জীবনের কাজ কন্ম করিয়া যাইতেছে—ইহা যেন সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না, একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির কবিত্তে হয়। জয়পুরের আশপাশ হুর্ভিক্ষে উজাড় হইয়া গিয়াছে। এই স্বর্ণপুরীর দ্বারদেশে, শত সহস্র হতভাগ্য ব্যক্তি অনাহারে মরিতেছে। জয়পুরের নিকটবর্তী মাঠ ময়দানের উপর দিয়া যখন আমাদের গাড়ী চলিতেছিল, অনেকগুলা মৃতদেহ আমাদের পথের সম্মুখে পড়িয়াছিল। মৃত্যুই তাহাদিগকে ভবয়ঙ্গনা হইতে উদ্ধার করিয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাণ্ডুরা

ছোট খাট গ্রাম হইলেও পাণ্ডুরা ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা চুঁচড়া হইতে প্রায় ১৭ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রাচীনত্বে হুগলি জেলার মধ্যে ইহা সপ্তগ্রামের অনুরূপ। কথিত আছে এক সময় ইহা জনৈক হিন্দু নৃপতির রাজধানী ছিল। ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে শাহ সোফি (Shah Sofi) নামক এক মুসলমান নরপতি উক্ত নৃপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া পাণ্ডুরা অধিকার করেন। এই পাণ্ডুরা অধিকার সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ একটি জন-শ্রুতি আছে।

একদা পুত্রের জন্মোৎসব-উপলক্ষে পাণ্ডুরা-রাজ এক ভোজের আয়োজন করেন। ঠিক সেই দিনই তাঁহার এক মুসলমান কর্মচারীও আপন বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে এক প্রীতিভোজের আয়োজন করেন, এবং সেই উপলক্ষে একটি গো বৎস নিহত হয়। হিন্দু-দিগের অসন্তোষ উৎপাদন ভয়ে তিনি নিহত গো-বৎসের অস্থি ও মাংসাদি কোন নিভৃত স্থানে প্রোথিত করান। কিন্তু রজনীযোগে শৃগালেরা সেই সকল অস্থি মাংসাদি মৃত্তিকা হইতে প্রকাশ্য রাজপথে টানিয়া বাহির করে। পরদিন প্রত্যুষে এই ব্যাপার দেখিয়া সমুদয় হিন্দু অধিবাসী উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং রাজপুত্রকেই সকল অমঙ্গলের কারণ বিবেচনা করিয়া প্রথমে তাহাকে হত্যা করিয়া পরে মুসলমানদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করে। মুসলমানেরা পাণ্ডুরারাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া নিরাশ হয়; তখন তাহারা দিল্লীতে পলায়ন করে এবং সেখানে

যাইয়া সম্রাটের নিকট তাহাদের সমুদয় দুঃখ নিবেদন করে। সম্রাট সমস্ত ব্যাপার জানিয়া পাণ্ডুরারাজের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধের পর হিন্দুবা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়।

কাহারো মতে পাণ্ডুরারাজপুত্রের এ বৎ উক্ত মুসলমান কর্মচারীর পুত্রের জন্মোৎসব একই দিনে হয়। সেই দিনই ঐ মুসলমান কর্মচারী গো-বৎস হত্যা করিয়া আপন বন্ধুবান্ধব-গণের প্রীতিভোজ দিয়াছিলেন। এবং হিন্দুবা রাজপুত্রকে হত্যা করে নাই,—মুসলমান কর্মচারীর পুত্রকেই হত্যা করিয়াছিল।

উক্ত যুদ্ধের প্রারম্ভে মুসলমানেরা বহুবার হিন্দুদের নিকট পরাস্ত হয়। কথিত আছে পাণ্ডুরা সহরের সন্নিকটে অলৌকিক প্রভাব সম্পন্ন এক পবিত্র কুণ্ড ছিল। যুদ্ধকালে হিন্দুরা এই কুণ্ড হইতে জল লইয়া আহত সৈন্যদিগের গাত্রে ছিটাইয়া দিলে সেই জলস্পর্শ তাহারা তখনই আরোগ্যলাভ করিত এবং প্রবল উৎসাহে পুনরায় মুসলমান দিগকে আক্রমণ করিত। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত মুসলমান-গণ এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করিল। তাহারা জানিত হিন্দু গো-মাংস স্পর্শ করে না। একদিন তাহারা একখণ্ড গো-মাংস লইয়া হিন্দুদিগের সমক্ষেই সেই কুণ্ডের মধ্যে তাহা ফেলিয়া দেয়। অতঃপর হিন্দুরা আর সে জল ব্যবহার করিত না,—কাজেই মুসলমানেরা অতি সহজে হিন্দুদিগকে পরাস্ত করিতে পারিল। যে স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়া-

ছিল অধিবাসীরা সেই স্থানটিকে জঙ্গ ময়দান নামে অভিহিত করে ।

শুনা যায় এই যুদ্ধে পাণ্ডুরাজ মহানাথ বা মণুরাজের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন । পাণ্ডুরা হইতে মণ্ড কয়েক ক্রোশ মাত্র দূবে অবস্থিত ।

এই যুদ্ধেব স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ মুসলমানেরা একটা মিনার স্থাপন করেন । এই মিনারটী পাণ্ডুরা মিনার নামে প্রথিত । বাংলা দেশের মধ্যে এইটীই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্তম্ভ বলিলে অতুক্তি হয় না । সমগ্র মিনারটী উচ্চতায় প্রায় ১২৫ ফুট ।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ইহার জীর্ণ অংশগুলি সুসংস্কৃত হইয়াছে । গম্বুজ এবং চূড়াটুকু ছাড়িয়া দিলেও ইহা পঞ্চতল বিশিষ্ট । ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দেব ভীষণ ভূমিকম্পে

পঞ্চতল এবং গম্বুজ চূড়া প্রভৃতি ভগ্ন হইয়া যায় । এক্ষণে ইহা সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত হইয়াছে । তলদেশ হইতে গম্বুজ পর্যন্ত সমুদয় সোপান-শ্রেণী উত্তমরূপে মেরামত করা হইয়াছে ।

মিনারটীর ঠিক পূর্ব দক্ষিণে মুসলমান-দিগেব এক বৃহৎ মসজিদ আছে । ইহাও এযাবৎকাল জীর্ণ অবস্থায় ছিল । মিনারের সঙ্গে ইহারও কিয়দংশ মেরামত করা হয় । ইহার সর্বোচ্চ চূড়া সাত আট মাইল দূর হইতে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় । এই মসজিদই 'পেঁড়োর মসজিদ' নামে বিখ্যাত । এই মসজিদের পূর্বদিকে প্রায় ১০০ শত গজ দূরে একটা বৃহৎ পুকুরিণী আছে । সেই পুকুরিণীর পার্শ্বে আর একটা পুৰাতন মসজিদ আছে । এই মসজিদটি প্রায় ২০০ শত বৎসরের প্রাচীন ।



পাণ্ডুরা মসজিদ (বর্তমান অবস্থা)

এই মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে মুসলমান দিগের গোরস্থান। গ্রাণ্ডট্রঙ্ক রোডের পার্শ্বেই সা সোফির সমাধি মন্দির।

পাণ্ডুয়ার পূর্বদিকে আর একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীর নাম পির পুকুর'। ইহার চতুর্পার্শ্বে মুসলমানদিগের গোরস্থান। কথিত আছে হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধের সময় যে সকল মুসলমান যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিল এগুলি তাহাদিগেবই সমাধি মন্দির। পাণ্ডুয়ায় প্রতি বৎসর মাঘমাসে এক বৃহৎ মেলার অধিষ্ঠান হয়। মেলায় প্রায় দুই তিন সহস্র লোকের সমাগম হয়।

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ পাণ্ডুয়ায় অত্যধিক। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ছয় মাসের মধ্যে প্রায় ১২০০ অধিবাসী এবং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ৭০০০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ৫২০০ অধিবাসী কাল-গ্রাসে পতিত হয়।

হুগলী জেলার মধ্যে পাণ্ডুয়া মুসলমান দিগের একটি কেন্দ্র স্থান। কিন্তু সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে প্রায় চতুঃপঞ্চমাংশ হিন্দু। পাণ্ডুয়ার মুসলমানেবা আসরফ্ (Ashrof) শ্রেণীভুক্ত এবং আমেদার (Aimadars) নামে অভিহিত। যখন ইংরাজেরা প্রথম বাংলাব শাসনভার গ্রহণ করিলেন সেই সময়ে প্রজাসমষ্টির জন্ত রাজ্য পরিচালনের অনেক ভার এ দেশবাসীর হস্তেই অর্পণ কবিয়াছিলেন। রাজস্ব আদায় এবং বিচার কার্যা প্রভৃতি মুসলমান কাজিদিগের হস্তেই বৃত্ত থাকিত। এই সকল কাজি সাধারণত পাণ্ডুয়ার আমেদারগণের মধ্য হইতেই নির্বাচিত হইত। প্রধান কাজির পদ পাণ্ডুয়ার এক

সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার বংশপরম্পরায় ভোগ করিয়া আসিতেন। সেই বংশের শেষ কাজির নাম—কাজি মহম্মদ মজ্হর।

এক্ষণে পাণ্ডুয়ার সে পূর্ব গোবব না থাকিলেও ইহা অত্যা অল্প অনেক পল্লী অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। এখানে একটা থানা এবং মিউনিসিপালিটি আছে। বেলওয়ায় ট্রেন আছে। এবং সম্প্রতি একটা ইংবাজি বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে।

পাণ্ডুয়াব নিকটে অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রাম।

মণ্ড—পাণ্ডুয়া হইতে চারি মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহাও পূর্বে এক হিন্দু নৃপতির রাজধানী ছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি পাণ্ডুয়ারাজের সহিত মুসলমানদিগেব যুদ্ধের সময় ইনি তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এখানকাব প্রসিদ্ধ 'জীবৎ কুণ্ড' এখনও বর্তমান এবং অধিবাসীগণ প্রাচীন জনশ্রুতিব উপর বিশ্বাস স্থাপন কবিয়া ইহাকে এখনও অমৃতবেব সহিত ভক্তি কবিয়া থাকে। এখানে একটা শিবমন্দির আছে। এই শিব জাগ্রত দেবতা বলিয়াই কিস্বদস্তী। শিবরাত্রি উপলক্ষে সেখানে বৃহৎ মেলার অধিবেশন হয়।

দ্বারবাসিনী—মণ্ড বা মহানাথ হইতে দুই ক্রোশ পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত। এই গ্রাম সম্বন্ধেও পূর্বেক্লরূপ একটা গল্প প্রচলিত আছে। দ্বারবাসিনী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় এ বিষয়ে যাহা বিগিয়াছেন আমরা এখানে তাহা অবিকল উদ্ধৃত কবিয়া দিলাম—

“মুসলমানেবা যখন বাংলা দেশ আক্রমণ কবেন সেই সময়ে সদগোপ জাতীয় কতিপয়

হিন্দুপতি দ্বারবাসিনীর অধিপতি ছিলেন। এই বংশীয় শেষ নৃপতি দ্বারপাল যখন রাজত্ব করিতেছিলেন সেই সময়ে মাহম্মদ আলি তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। প্রথম যুদ্ধে হিন্দুরা জয়লাভ করে। কথিত আছে রাজবাটীর সন্নিকটেই যে পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায় পূর্বে ইহাকে ‘জীবৎ কুণ্ড’ বলিত। এই পুষ্করিণীতে অবগাহন করিলে শরীরের সমুদয় ক্ষত এবং আহত স্থান তৎক্ষণাৎ আবেগ্য লাভ করিত এবং আহত ব্যক্তি বিগুণ বল লাভ করিয়া পূর্ণ উৎসাহে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইত। একদিন সা জোকি নামক একটা মুসলমান স্নান করিবার কালে একখণ্ড গো মাংস গোপনে সেই কুণ্ড মধ্যে রাখিয়া আসে। গো মাংস স্পর্শে কুণ্ডের জল অপবিত্র হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ব শক্তিও নষ্ট হয়। ইহার পর হইতে হিন্দুরা সে কুণ্ডে অবগাহন করিয়াও কোন সফল লাভ করিত না। কাজেই দ্বিতীয় যুদ্ধে দ্বারপাল সম্পূর্ণ পরাজিত হন এবং রাজপ্রাসাদের মধ্যেই সপরিবারে চিতানলে প্রাণ বিসর্জন করেন। রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষকে এখানকার অধিবাসীরা ‘ধনপতি’ বলিয়া পরিচয় দেয়।”

‘জীবৎ কুণ্ড’ পুষ্করিণীর এক্ষণে আর সে শ্রী নাই। জলও তেমন গভীর নহে; ক্রমশই তাহা শুকাইয়া যাইতেছে। এই পুষ্করিণীর দক্ষিণে আর একটা বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীটির নাম ‘কামনা’। লোকের

বিশ্বাস এই পুষ্করিণীতে কামনামান করিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। ‘জীবৎ কুণ্ড’র পূর্বপার্শ্বে সা জোকির কবর ভূমি। পূর্বোক্ত কয়েকটা পুষ্করিণী ব্যতীত এখানে আরও কয়েকটা প্রসিদ্ধ পুষ্করিণী আছে, যথা—চন্দ্রকুপ,—পাপহরণ,—সাত সতীন * ইত্যাদি।

জনশ্রুতি আছে অনেক সময়ে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে এখানে বিস্তর ধনরত্ন এবং অনেক সময়ে প্রস্তরের বহু ভগ্ন প্রতিমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। প্রস্তর মূর্তি এখনও পাওয়া যায়। দ্বারবাসিনীর অনেক স্থান এক্ষণে উত্তর পাড়ার জমিদার রাজা প্যারি মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক অধিকৃত। প্রাচীন নীলকুঠাধ্বংসাবশেষগুলি দেখিলে স্বর্গীয় দীনবন্ধুর নীলদর্পণের কথা সহজেই মনে জাগিয়া উঠে।

পাণ্ডুরার ঝায় দ্বারবাসিনীতেও ম্যালেরিয়ার যথেষ্ট প্রকোপ আছে।

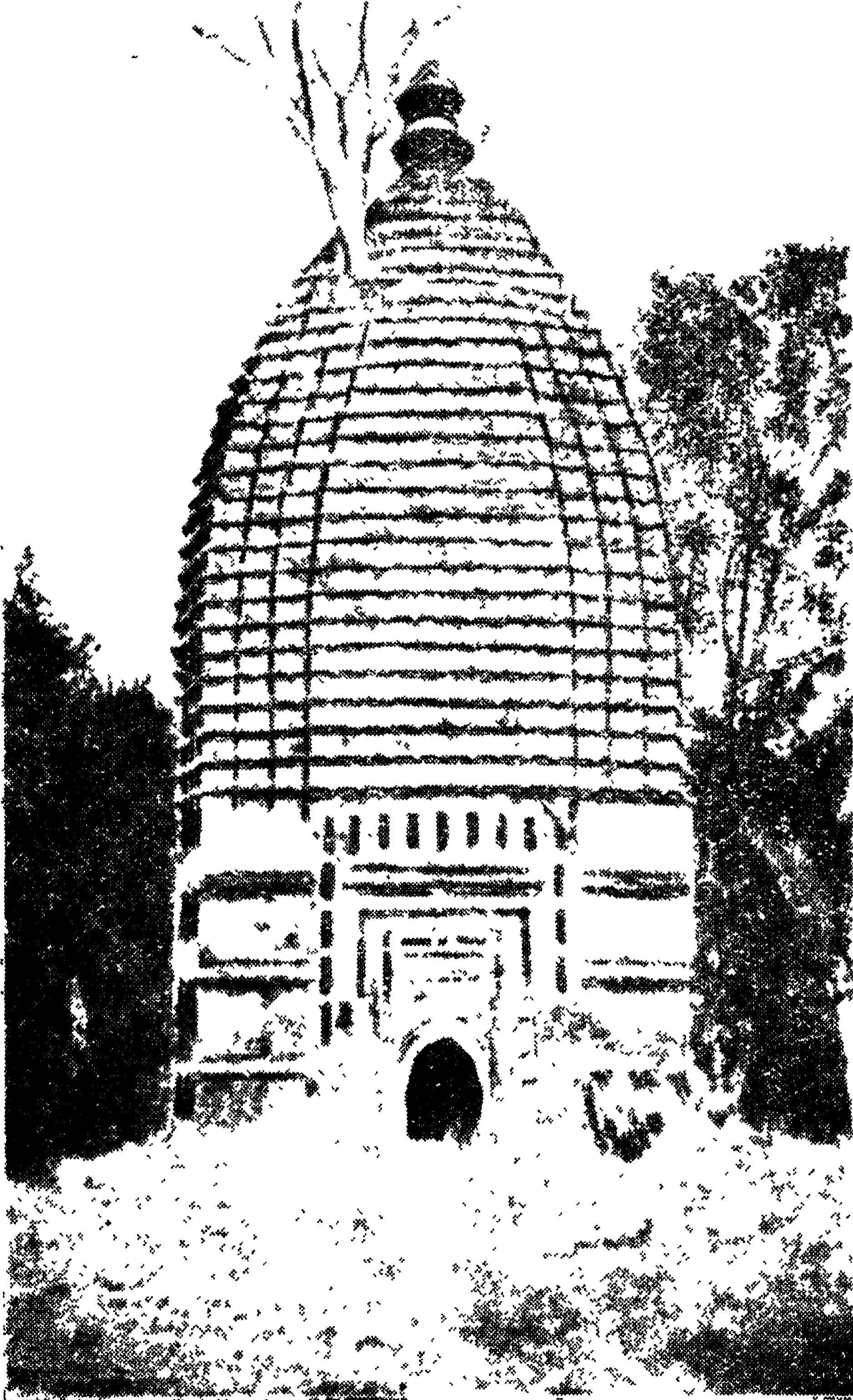
বৈঁচী পাণ্ডুরার অতি সন্নিকটে আর একটা ছোট গ্রাম। গ্রাম্য জমিদারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা স্ত্রী জীবনসত্বে ভোগ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে ইহা গভর্ণমেন্টের হাতে আসিয়াছে। দাতব্য কার্যের সহায়তা করলে গভর্ণমেন্ট এক্ষণে বৈঁচীগ্রাম ট্রষ্ট সম্পত্তিরূপে রক্ষা করিতেছেন।

বৈঁচীতে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসস্তুপ আছে। তাহার গাত্র-ফলক হইতে জানা যায় এই মন্দির ১৬০৪ শকাব্দীতে ইংরাজী ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! সে আজ

* দ্বারপালের সপ্ত স্ত্রীর নাম অনুসারে যে সাতটা পুষ্করিণী খনিত হইয়াছিল তাহাই সাত সতীন, নামে প্রসিদ্ধ।

কতযুগের কথা! কিন্তু কালের প্রভাবে - ইহা অল্প আনন্দ ও গৌরবের কথা
তাহার শেষ চিহ্ন এখনো অন্তর্হিত হয় নাই -

শ্রীশঙ্করদাস আদক ।



নৈচির মন্দির ।

তৈমুর-লঙ্গ ।

(মানুষী হইতে)

তৎক্ষণাৎ তাতার সৈন্যের বাহু রচিত হইল। তৈমুর তাহার স্বল্প সৈন্য লইয়া অসংখ্য শত্রুসেনার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু একপাশে যুদ্ধে জ্বলাভের সম্ভাবনা অল্প জানিয়া তৈমুর এক কোণল অবলম্বন করিলেন। তাহার পশ্চাতে তিনি এক সঙ্কীর্ণ গিরিপথ রাখিলেন এবং তাহার প্রবেশপথে কতকগুলি সুদক্ষ তাতার সৈনিক রাখিয়া দিলেন। হিন্দুগণ আক্রমণ করিবামাত্র ভয়ে ভয় করিয়া তাহারা পশ্চাতে পলায়ন আবৃত্ত করিল। দ্রুতগামী অগ্নিবাহী তৈমুরের অশ্বারোহী সৈন্য নিমেষমধ্যে প্রদৃশ্য হইয়া নিকটস্থ এক পর্বতের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া বহিল। হিন্দুবা প্রবল বেগে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল, এবং ছানপথে তাতারদিগকে পরাজিত করিয়া সেই সঙ্কীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করিল। নিবাট হিন্দুবাহিনীর প্রায় অর্ধভাগ গিরিপথের পরপারে উপস্থিত হইবামাত্র পলাতক শত্রুগণ ফিবিয়া দাঁড়াইয়া বিছাড়েগে হিন্দুদিগের উপর পাড়িল। এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণেই হিন্দুবা পরাজিত হইল। বিজয়ী তৈমুর সমগ্র হিন্দুস্থানের অধিকার হইলেন। রাণা নিকপাথ দেখিয়া বিজয়া বীরের সহিত সঙ্কল্পস্থাপনে বাধ্য হইলেন। স্বাধীন হিন্দুনাগরপতি তৈমুরকে বাৎসরিক কর দান করিতে অস্বীকৃত হইলেন। হিন্দুস্থানের প্রধান প্রধান দুর্গে ৩৫০০০ শাসনকর্তা নিযুক্ত হইল। দিল্লী তখন পার্শ্বানরাজের রাজধানী। তৈমুর তাঁহাকেও অব্যাহতি দিলেন না। সেখানেও এক তাতার শাসনকর্তা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই পরাজয়ের দিন হইতে হিন্দুবাজারী যুদ্ধক্ষেত্রে আর আর কখনও শত্রুর পশ্চাদ্ধাবিত হন নাই, শত্রু আক্রমণ করিলে তাহারা প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেন মাত্র। বাহা ইউক বিজয়ী তৈমুর ভারতের অমূল্য ধনসম্পদ হরণ করিয়া অতুল গৌরবে সমরকন্দে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কিন্তু এত শক্তিসম্পদ লাভ করিয়াও বৃদ্ধ তৈমুর সম্ভোগলাভ করিতে পারিলেন না। উচ্চ আকাজকার তাড়নে তিনি তখনও নূতন শক্তিবিস্তারে লোলুপ। যে বয়সে সাধারণ মানুষের দেহমন অবসন্ন হইয়া আসে, সেই বয়সে তৈমুর যৌবনতেজে নূতন জয়-যাত্রায় সমরকন্দ ত্যাগ করিলেন। সুলতান বেন-এভিসের উপবই তাহার প্রথম রোধদৃষ্টি পড়িল। ইহঁকে তৈমুর পূর্বে পরাজিত করিয়া বগদাদ্ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু মিশরসুলতানের সাহায্যে তিনি পুনরায় স্বকায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অদিকন্তু তিনি তৈমুরের পুত্র মিরজার রাজ্যভুক্ত পাবলু ইরাই দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তৈমুর তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করিবার জন্য সর্বপ্রথম অগ্রসর হইলেন। সুলতান বেন-এভিস পারলু হইতে বহিষ্কৃত হইয়া নাটোলিয়া দেশে বাজায়েৎ নৃপতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তৈমুর ডামকাস্ অধিকার করিয়া বগদাদ্ লুণ্ঠন করিলেন। তাহার নামে লোকে এত ভয় পাইল যে তিনি যেখানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন অমনি সেখানকার লোকেরা তাহার বশতা স্বীকার করিতে লাগিল। যে মিশরসুলতান প্রথমে বেন-এভিসকে সাহায্য করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনিই তৈমুরের ইচ্ছানুবর্তী হইলেন এবং তৈমুরের মঙ্গলের জন্য তাহার বাজ্যের প্রত্যেক নসজিদে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার আদেশ প্রচার করিলেন।

একমাত্র কেবল বাজায়েৎ আজিও ছবস্ত তাতারের দুর্দর্শ শক্তির পরিচয় পান নাই, এবং সেইজন্য তিনি তাহাকে বড় একটা গ্রাণের মধ্যেও আনিতেন না। কেবল তাহাই নহে, বাজায়েৎ তৈমুরের দুইজন মিত্ররাজার প্রতিও অত্যাচার করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। বাজায়েৎও তৈমুর অপেক্ষা অল্প যশস্বী ছিলেন না। হাঙ্গেরির রাজা ও ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ বীরগণকে বুলগেরিয়াতে পরাজিত করিয়া তিনি

কনষ্টান্টিনোপল আক্রমণ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। ইতিপূর্বেই তিনি সম্রাট ইমানুয়েলের নিকট হইতে উক্ত নগরের প্রান্তবর্তী স্থান সমূহ লইয়া মুসলমানের অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন এবং তথায় মসজিদ ও মুসলমান বিচারালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি রুমের সুলতান অর্থাৎ গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি এই উপাধি গ্রহণ করিয়া মিশরের সুলতানকে তাহা স্বীকার করিতে পধ্যস্ত বাধ্য করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে তিনি তৈমুরের চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাতারবীর আসিয়া-মধ্যে তাহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর উচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেইজন্য তিনি খৃষ্টান রাজা ইমানুয়েলের পক্ষ লইয়া মুসলমান বাজায়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

সমগ্র তাতার সৈন্য বাজায়েতের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ৰবেগে যুদ্ধযাত্রা করিল। সকলেই প্রচুর লুণ্ঠনের আশায় উৎফুল্ল, কেবল তৈমুর নীরবে চিন্তাঘ্নিত পদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনেকে মনে করিল বার্কোকের অবসাদ হেতু তিনি এরূপ বিষয়; আবার অনেকে মনে করিল বাজায়েতের স্ত্রায় বিজয়ী বীরের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের আশা অল্প বলিয়াই তিনি এরূপ বিষম্ব হইয়া আছেন। যোদ্ধা পরিবেষ্টিত তৈমুরকে এক সেনাপতি সাহস করিয়া তাহার এ বিষম্বতার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—“আমার চিন্তার বাহা কারণ তাহা দূর করা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব,—আমি ভাবিতেছি আমার অশুচরগণের মধ্যে আমাদের নববিজিত সাম্রাজ্যের শাসনভার বহনক্ষম বাজায়েতের শূন্য সিংহাসনের উপযুক্ত কোন লোক আছে কি না।” এই আশাপূর্ণ উত্তরে তাতারগণের হ্রয়ে আবার সাহস আসিয়া দেখা দিল। তৈমুর প্রথমে কতকগুলি দূরবর্তী নগর অধিকার করিয়া রাখিলেন, নচেৎ পরাজয় হইলে সসৈন্তে তাহার শত্রুমধ্যে আশ্রয়লাভ সম্ভব হইবে না। পম্পি (Pompy) যে রণক্ষেত্রে মাইথ্রিডেটিকে (Mithridates) পরাজিত

করিয়াছিলেন, এই উভয় বীরের বিরাতবাহিনী সেই পুণ্যক্ষেত্রে মিলিত হইল।

তাতারেরা ধর্মবিদ্যায় যেকণ পারদর্শী, মুসলমানেরাও খড়্গ চালনায় সেইরূপ সুনিপুণ জানিয়া তৈমুর দূর হইতে যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন, কারণ তাহাতেই তিনি শত্রু বিনাশ করিতে পারিবেন, এবং তাহার নিজের সৈন্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। তদনুসারে তিনি তাতারগণকে বলিয়া দিলেন তাহারা যেন তাঁর নাহায্যে শত্রুকে নষ্ট করিতে পারে এরূপ দূরে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করে, এবং শর-নিষ্ক্ষেপের পরমমূহূর্তেই যেন তাহারা পলায়ন করে এবং পুনশ্চ শরযোজনা সম্পন্ন হইলে যেন ফিরিয়া শত্রুকে আক্রমণ করে। ফলে তাতারের প্রথম আক্রমণই অতি ভীষণ ও প্রবল হইয়া দাঁড়াইল। শরজালে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল এবং মূহূর্তমধ্যে রণক্ষেত্র মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মুসলমানেরাও উন্মত্তভেজে যুদ্ধে অসি লইয়া তাতারগণের পশ্চাদ্ধাবন করিল, যে কোন দল তাহাদের প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে পড়িল তাহাই তৎক্ষণাৎ ছিন্ন ভিন্ন ও পরাস্ত হইতে লাগিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার বিজয়ী সৈন্তের প্রতি শরবৃষ্টি হইয়া মাত্র, তাতারেরা পুনরায় তাহাদের ভ্যক্তভূমি অধিকার করিতে লাগিল। উভয় পক্ষের দুই অসাধারণ অধিনায়ক অপূর্ব কৌশলে সৈন্তপরিচালনা করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ ধরিয়া উভয় পক্ষেরই জয় পরাজয় অনিশ্চিত রহিল, অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী তৈমুরের প্রতিই প্রসন্ন হইলেন। বাজায়েতের সৈন্তমধ্যে কতকগুলি তাতার সৈনিক ছিল। তাহারা তাহাদের স্বদেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বিশেষ অসন্তোষ বোধ করিতেছিল। এক্ষণে তাহাদের স্বজাতির সর্বশ্রধান বীরের এরূপ পরাজয়ে গোবরহানির ভয়ে তাহারা বাজায়েতকে পরিত্যাগ করিয়া তৈমুরের পক্ষ লইল। জয়লাভের পক্ষে আর কোন দ্বিধা রহিল না; মুসলমান বাহিনী বহুধা বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। এই সুযোগে তাতার অখারোহীরা পলাতক

মুসলমানদিগকে খড়্গাঘাতে বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। তৈমুরের যোদ্ধারা পরাজিত শত্রুর বহুদূর অনুসরণ করিয়া চলিল। বাজায়েৎ ক্ষিপ্রগতি তাতার অখারোহীর আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইলেন না কিছুদূর যাইয়াই তিনি বন্দী হইলেন। এই বিপদের মধ্যে পড়িয়া বাজায়েৎ তাতারবীরের দয়া ও মনুষ্যত্বের প্রথম পরিচয় লাভ করিলেন। বিজিত শত্রুর দুঃবস্থা দেখিয়া তৈমুর কোনদিন হৃদয় প্রকাশ করেন নাই। প্রতিদিন তৈমুরের শিবিরের ঠিক পার্শ্বই বেজায়েতের জন্ত এক শিবির স্থাপিত হইত, তথায উভয়ে একত্রে আহার ও আলপ করিতেন। বাজায়েতের সহিত তৈমুর অতিশয় সন্মানের সহিতই ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহার মনস্তত্ত্বের যথাসম্ভব আয়োজনের ক্রটি করিতেন না। শুনা যায় প্রথমে তৈমুর নাকি বাজায়েৎকে লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন; কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য কোনও ঐতিহাসিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ গ্রীকগণ তাঁহার দুর্দশার চিত্র অতিরঞ্জিত করিবার উদ্দেশ্যেই এই কথা সৃষ্টি করিয়াছেন।

মুসলমান ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় বিক্রম বশতঃই হউক, বা বিজয়ী শত্রুর নিকট অপমানিত হইবার আশঙ্কাতেই হউক, বাজায়েৎ বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তৈমুরেরও মৃত্যু হয়। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ইতিহাসের বিবরণ মুসলমান ইতিহাসের বিবরণ হইতে স্বতন্ত্র। কোন্টাক্টিক স্থির করিয়া বলা কঠিন। মুসলমানেরা বলেন তৈমুর চীনরাজ্য আক্রমণ কালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন এ কথা সত্য নহে। গানমুদ্র ভারতবর্ষ

অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে তিনি যখন ভারতে প্রবেশের আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময়ে কাবুলে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে তাতারগণের মধ্যে দুই সৈন্যদলের মধ্যে যে ভীষণ প্রাণান্তকর যুদ্ধক্রীড়া প্রচলিত ছিল, তৈমুর তাহা বন্ধ করিবার জন্ত প্রাণপণ যত্ন করিতেন, এমন কি এই অপরাধের জন্ত তিনি প্রাণদণ্ড আজ্ঞা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এরূপ করিবার যথেষ্ট কারণও ছিল; এই যুদ্ধক্রীড়ার তাঁহার যে সৈন্যক্ষয় হইত রোগে বা শত্রুর সহিত সংগ্রামে তাঁহার সেরূপ সৈন্যক্ষয় হইত না। এই নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার তৃতীয় পুত্র মিরজা তাঁহার পিতা ও সেনাপতির আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া একদল তাতার সৈন্য লইয়া অপর একদল সৈন্যের সহিত এরূপ ভীষণ যুদ্ধে নিযুক্ত হন, যে উভয় পক্ষেই মুষ্টিমেয় সৈনিক মাত্র জীবিত ছিল। এই অবাধ্যতায় তৈমুর ক্রোধান্বিত হইয়া দুই দুইবার তিনি তাঁহার পুত্রের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন, অবশেষে অনুতপ্ত হইয়া দুইবারই তাহা রহিত করেন। শাসন কর্তার কর্তব্যবোধ ও সম্মানস্নেহ এই উভয় প্রবল ভাবের তাড়নাতে তাঁহাকে পীড়িত করিয়া তুলে। বান্ধক্য, মনস্তাপ, উদ্বেগ, ও দেশের উত্তাপে তাঁহার রোগ কঠিন আকার ধারণ করে। মোগল ইতিহাসের মতে তৈমুর ছয় বৎসর নয় মাস বাইশ দিন রাজত্ব করিয়া, হিজরা ৮০৬ মাসের অর্থাৎ ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃতদেহ কাবুলেই সমাধিস্থ হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে।

(সমাপ্ত)

শ্রীমুরেল্লনাথ ভট্টাচার্য।

বন্দী।

৪০

মেরি! গোলাপের মত রঙ, আঙুরের মত তার ঠোঁট-ছটি—সুন্দরা মেরি!

কালো পোষাকটিতে কি সুন্দর তাহাকে

মানাইয়াছিল! আমি তাহাকে বুকে তুলিয়া লইলাম,—তার গালে কপালে অজস্র চুমা দিলাম!

তার মা-ও কেন আসিল না? তার অমুখ!

আমার পানে কি বিশ্বয়ের সহিত সে চাহিয়াছিল! চোখে একটা কেমন সেন ভাব! যেন একটা কাতরতার লক্ষণ! মাঝে মাঝে সে শুধু ঘবের কোণে তাব ধাত্রীর পানে চাহিতেছিল—ধাত্রী কাঁদিতেন।

মেরির গালে চুমা দিয়া তাকে বুকেব মধ্যে চাপিয়া রুদ্ধস্বরে আমি ডাকিলাম,—“মেবি, মেরি আমাব!”

মেরি আমাকে মৃহভাবে ঠেলিয়া মুখ সরাইয়া লইল! কহিল, “আঃ—ছাড়ুন আপনি আমাকে!”

‘আপনি!’ প্রায় এক বৎসব পরে সাক্ষাৎ! এই এক বৎসরে সে আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে! আমার কথা, আমার মুখ, আমাব আদর আজ মনের মধ্যে কোথায় সব মিলাইয়া গিয়াছে! তারই বা অপরাধ কি?

আমার এই দীর্ঘ শ্মশ্রু, মস্তকে জটার মত কেশের ভাব, শীর্ণ পাণ্ডুব মুখ, কয়েদীব পোষাক, রুদ্ধ ভগ্ন কণ্ঠস্বর—কি করিয়া সে চিনিতে পারিবে?

একমাত্র যে আমাকে মনে রাখিবে বলিয়া হৃদয়ে সাস্থনা ও সুখ ভোগ করিতে ছিলাম আজ সে,—সে-ই আমাকে ভুলিয়া বসিয়াছে—চিনিতেও পারে না! হা ভগবান!

আজ আমি তার ‘বাবা’ নহি! নিজের কণ্ঠার মুখে পিতৃসম্বোধন, কচি ফুলের পাপড়ির মত তার হাসিমাখা মুখে সেই মধুর সম্বোধন, “বাবা”! হায়, আজ আমি তাহা হইতেও বঞ্চিত! কি এ দারুণ অভিশাপ!

এ সময়, জীবনের এই শেষ মুহূর্ত্তে, একবার, শুধু একবার ঐ একটি

সম্বোধনের পবিবর্ত্তে আমার কণ্ঠার মুখের ঐ একটি আহ্বান মুহূর্ত্তের জন্ত শুনিতে পারিলে, চল্লিশ বৎসরের এই সুদীর্ঘ জীবন আমি হাত্মমুখে দান করিতে পারিতাম!

“মেরি”—তার ছটি হাত মুঠার মধ্যে পুরিয়া আমি ডাকিলাম, “মেরি, মা আমার—আমাকে চিনতে পাচ্ছ না?”

সে তার উজ্জ্বল দীপ্ত চক্ষু আমার পানে ফিরাইয়া, ভংসনার স্ববে কহিল, “না!”

আমি কহিলাম, “দেখ, ভাল কবে চেয়ে দেখ—কে আমি?”

সে কহিল, “আপনি—আপনি একজন ভদ্রলোক!” কি অম্লান তার কণ্ঠস্বর!

হায়—জগত্বেব যে একটি প্রাণীর প্রতি সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছি, যাব একটা কথা, একটু হাসিব জন্ত সর্ব্ব বিকাইয়া দিতে পারি, তার মুখে আজ এই কথা, তার চক্ষুতে আজ এই দৃষ্টি! কি বিড়ম্বিত এ জীবন!

আমি কহিলাম, “মেরি,—তোমার বাবা আছে?”

সে কহিল, “আছেন!”

আমি কহিলাম, “কোথায় সে?”

মেরি আমার পানে চাহিয়া বলিল, “তিনি বলুন!”

হা রে কথা আমার! হা রে দীর্ণ পিতৃ-হৃদয়ের ব্যাকুলতা! আমি কহিলাম, “কোথায় তিনি?”

মেরিব চক্ষে নিমেষে একটা শানিমা লক্ষ্য করিলাম—মেরি কহিল, “তিনি স্বর্গে!”

আমি কহিলাম, “স্বর্গে? মেবি, জানো, এ স্বর্গ কোথায়? এ স্বর্গের মানে কি?”

মেরিও চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সে শুধু ঘাড় নাড়িল! আমি মেরির মুখে চুমা দিলাম।

আমি কহিলাম, “মেরি একবার ভগবানকে ডাক।”

সে কহিল, “না মশায়,—দিনে তুপুরে বিনা কাজে তাঁকে ডাকতে নেই—সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকতে হয়! সন্ধ্যাবেলা তাঁকে ডাকতে আমি প্রার্থনা করব!”

আমার সাবা চিত্র অস্থির হইয়া উঠিতেছিল! এ কথা—এই মেরি—আমারি, আমারি সে বুকের ধন—হায়, তবু সে আমার নয়—আমি আজ কত দূবে চলিয়া গিয়াছি! না, না, যেমন করিয়া পাবি, তাকে বুঝাইব, আমি—তাব সেই “বাবা!” স্বর্গে নয়, নরকে নয়, মর্ত্যে—এই জেলের মধ্যে ফাঁসির জন্ত প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিয়াছি!

আমি কহিলাম, “মেরি, তুমি চিনতে পাচ্ছনা, আমিই তোমার বাবা।”

ভৎসনার স্বরে সে কহিল, “মশায়—”

আমি কহিলাম, “কেন মাণিক, আমাকে চিনতে পাচ্ছনা! দেখ, চেয়ে, দেখ,—সেই তোমাদের গোলাপগাছগুলার ধারে চাতালে বসে তোমাকে গল্প বলতুম—কত পবিত্র গল্প, রাজার গল্প—”

মেরির ছোট মুখখানি আমি বুকে চাপিয়া ধরিলাম!

মেরি কহিল, “আঃ, ছাড়ুন, লাগে!”

তখন তাহাকে আমার হাঁটুর উপর বসাইয়া আমি বলিলাম, “তুমি পড়তে জানো?”

“জানি!”

আমি একখানা খবরের কাগজ টানিয়া

একটা জায়গা তাঁর সম্মুখে ধরিলাম, সে পড়িতে লাগিল, “প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামী—”

হঠাৎ সবলে আমি কাগজখানা টানিয়া লইলাম—কাগজখানা তাব ধাত্রী কিনিয়াছিল—কাগজওয়ালারা খুব বড় বড় অক্ষরে আমার নামের জয়ধ্বজা তুলিয়া দিয়াছে। ফাঁসির তায়াসা দেখিবার জন্ত লক্ষ দর্শককে সমারোহের সহিত বিজ্ঞাপন দিয়াছে!

আমার মনের ভাব অক্ষবে বুঝাইবার নয়! আমার সে কক্ষ শূন্য মূর্তি দেখিয়া মেরি ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল! সে বলিল, “দাও, আমার কাগজ দাও! আমি জাগাজ করব!”

ধাত্রীর হাতে কাগজ দিয়া আমি কহিলাম, “একে নিয়ে যাও—আর বাড়ীতে বনো—” মুখে কথার মুখেই রহিয়া গেল! কি বলিব—জানি না! তাব পর জানালার ধাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম—চক্ষু মুদিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিলাম—মাথার মধ্যে সোঁ সোঁ করিয়া রক্তের স্রোত ছুটিয়াছে!

কোথায় তারা—যমালয়ের ছরপু দূতগুলা! আহুক তারা—আর কি! জগতে আমার কেহ নাই, কিছু নাই, জীবনে আমার স্পৃহা নাই! যে শৃঙ্গলটি দ্বারা ইহলোকেব সহিত বন্ধ ছিলাম—আজ সে শৃঙ্গলও ছিন্ন হইয়াছে—তবে আর কেন,—আর কেন—?

আচার্য্যের হৃদয়ে করুণা আছে, কারা-ধাক্কের প্রাণটাও পাষণে গঠিত নয়! ধাত্রী যখন মেরিকে লইয়া গেল, তখন তাদেরও চোখে জল আসিয়াছিল!

শেষ! এখন সব শেষ! শুধু সাহস, বল, —মৃত্যু! পথে বিপুল জনতা, ফাঁসিকাঠের

নিকট অগ্রসর হওয়া—তার পর, কোথায়
জগৎ, কোথায়ই বা আমি !

৪২

কেহ হাসিবে, কেহ আনন্দে করতালি
দিবে, কেহ বা চীৎকার করিবে ! অথচ
ইহাদেরি মধ্যে কত লোক—অদূর ভবিষ্যতে
আমারি পথের পথিক হইবে ! আমার জন্ম
আজ যাহারা তামাসা দেখিতে আসিয়া দল
বাড়াইয়াছে, একদিন আবার তাহাদেরি
মধ্যে কত লোক, নিজেদের প্রয়োজনেই এখানে
আসিবে !

৪৩

মেবি ! মাণিক আমাব ! ধাত্রী তাহাকে
লইয়া গিয়াছে ! গাড়ীর জানালার মধ্য দিয়া
সে এই বিপুল জনতা নিশ্চয় লক্ষ্য করিবে,
ভাবিবে, দেশে আজ কি এক প্রকাণ্ড তামাসাব
আয়োজন হইয়াছে ! কিন্তু এই “ভদ্রলোকটির”

কথা তার তখন মনেও থাকিবে না—অথচ
এই ‘ভদ্রলোক’কে দেখিবার জন্মই আজ এত
লোক আসিয়াছে এবং সেই ভদ্রলোক আর
কেহই নহে, তারই স্বর্গগত “বাবা !”

তার জন্ম কয় ছত্র লিখিয়া যাই—একদিন
সে পড়িয়া বুঝিবে ! এবং পনেরো বৎসর
পরে সে আজিকার দিনের এই মুহূর্তটির
কথা ভাবিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়া যাইবে !

হাঁ ! আমাব সমস্ত কাহিনী আমি
তাহার জন্ম লিখিয়া যাইতে চাহি ! সমস্ত
কথা একপটে বলিয়া যাইব—আমার সমগ্র
ইতিহাস—কেন আজ দেশেব বৃক রক্তের
অক্ষরে আমাব নাম চিবকালের জন্ম লিখিত
বহিল ! সেই কাহিনী টুকু এই কয় মুহূর্তেব
মধ্যে লিখিয়া ফেলি !

(ক্রমশঃ)

শ্রীমৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ।

মেম্বু ।

১

“ভুবনে অতুল তুমি !—একি অপরূপ !
কোথা পলে কুহকিনি ! এ মোহন রূপ ?
ধরারে করে গো ধরা তোমার ও রূপ-বশা,
শোকহরা উষার আলোক ;
তোমার চরণ স্পর্শে, মুঞ্জরি উঠেগো হর্ষে
জনি-তক, অরুণ অশোক !
আমি গো বকুলতরু, কাঁপিতেছি ছক ছক
তোমার ও মুখগানি চুম্বে ;—
অধরে কি করে বাস, বারমাস মধুমাস ?
ছেয়ে দিলে কুসুম কুসুম্বে !”—
এই চাকু সধোধনে, সে রূপসী নারী-ধনে
ভূষিতেছিলাম সঙ্গোপনে :

হেনকালে শব গব, রোসে তনু শব্ধ থব,
স্ত্রী আমার, গঞ্জেন্দ্রগমনে,
আসিয়া রাগিয়া কহে—“এতো প্রাণে নাহি সহে !
চিরদিন জ্বলাইয়ে হাড !

এত যে হয়েছ বুড়া, তবুও রসিক-চূড়া !
অবাক !—যুবক মানে হার !”—

শুনি কথা, অপরাধী মোরা দুইজনে,
হাসি মুছ, থাকি বসে’ আনত বননে !

২

“কাড়িয়া লয়েছ তুমি বিশ্বের সৌন্দর্য্য !
গরবিনি ! একি তব রূপের ঐশ্বর্য্য !
একি লাভণ্যের সৃষ্টি !— এহেন চকল দৃষ্টি
নাই নাই, হরিণ-নয়ানে !

হেরি তব কেশগুচ্ছ, প্রসারিত শিখী পুচ্ছ
নৃত্যলীলা ভোলে অভিমানে।

লাজে হয় হীনবর্ণ চম্পক-অতসী স্বর্ণ
চাহি তব চন্দ্রানন পানে !

বিদ্বাধরে একি হাসি ! দম্বকুন্দ পরকাশি,
কি সুধা ঢালিছ নোর প্রাণে !”—

এত বলি, বসি চূপে, বিমুক্ত সুন্দরী-রূপে,
মুখ তার হেরি বার বার !

হেনকালে পেয়ে সাড়া, ক্রুদ্ধা পাগলিনী পারা
স্ত্রী আমার হয় আগুসার !

ঘন ঘন হাত নাড়ি, আকাশ উপাড়ি পাড়ি,
কত কহে ঘৃণিত-লোচনা !

লোলজিহ্বা, অসিকরা, ত্রিনয়নী ভয়ঙ্করা,
কালী যেন করালবদনা !

হেরি সেই দাবাগ্নির দাউ দাউ শিখা,

স্কন্ধ হই মোরা দুই নায়ক-নায়িকা !

৩

“তব স্পর্শে পুলকে ধরণী হোলো সারা !

উর্ধ্বশী, মেনকা, রক্তা, কোথা লাগে তারা !

তুমি মম সুখ স্বপ্ন, ভব জলধির রত্ন ;

জনম জনমে তব ধ্যানে,

দিবানিশি অবিরত, কবেছি তপস্যা কত ;

তুমি এলে বিধির বিধানে !

আহা কিবা মনোহরা, তোমার ও ভ্রু জোড়া,

অনুচর যেন দুটি ধনু !

নেত্র-ভূষণ মনোহর করিয়াছে অর অর,

আমার এ বাণবিদ্ধ তনু !”—

এত বলি, অতঃপর, এই আমি অগমর,

অধর-অমৃত-পান হেতু,

কোথা হ’তে আচম্বিত, আসি তথা উপস্থিত
স্ত্রী আমার, কাল-ধুমকেতু !

“ও যেন যুবতী বালা, পাইতে চিরকাল,
আকুল ব্যাকুল ওর চিত ;

কিন্তু তুমি এত বুড়া, তবু চাও প্রেমসুখা !
স্বভাবের একি বিপরীত !”—

শুনি কথা, আপনারে মানি অতি তুচ্ছ ;—

আমি যেন দাঁড়কাক, পরি শিখীপুচ্ছ !

৪

“তিল ফুল জিলি নাসা, মরি কি সুন্দর ;

দোহল হুলিছে তাহে সোনার বেসর !

শ্রাবণে সুনীল হুল, চাকু বুমুকার ফুল
ধরা যেন পরিয়াছে কানে !

নেত্রে জাগে কি পিয়াস, কিছুতে মিটেনা আশ,
চাহি ধনি তব মুখপানে !

কিছুদিন, হেথা থাকি, তুমি যাবে, চক্রবাকি,
আনু দেশে করিবে প্রয়াণ,

কেমনে ধৈরজ ধরি, পোহাইবে বিভাবরী,
আমার এ চক্রবাক-প্রাণ ?”

এতবলি, ছল্ ছল্ নেত্রে বহে অশ্রুজল !—
কোথা হ’তে আসি নোর প্রিয়া,

গালভরা শুভ্র হাসি, আচম্বিতে লয় আসি,
সুন্দরীরে ক্রোড়েতে তুলিয়া !

“ছয় বছরের কন্যা, রূপে গুণে তুই ধন্যা
স্নেহময়ী মোদের নাতিনী,

বহু পূণ্যপূজফলে, বহু তপস্যার বলে,
পাইয়াছি এ হেন সতিনী !”

শুনি কথা মেহু দেয় ঘন করতালি ;

সে গো মোর ব্রজরাণী, আমি বনমালী !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মেন।

জ্ঞান ও কর্ম ।*

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা, প্রথম অভ্যাসকালে এদেশবাসীর মধ্যে এক বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। তখন অন্ধ অনুকরণেব প্রবল উচ্ছ্বাসে দেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষের অবস্থায় প্রথম এইরূপই ঘটিয়া থাকে। ক্রমশঃ এভাবেব বৃত্তা চলিয়া যায় কিন্তু একটি সন্দেহের আবর্ত তাহার স্থান অধিকার করে। জাতির পক্ষে সে বড় দুর্দিন! পুরাতন রীতিনীতি, পুরাতন আচার ব্যবহার, পুরাতন ধর্মভাব অক্ষুণ্ণভাবে রাখা অসম্ভব, অথচ নূতনের সমাবেশ করা বড় সহজ নয়! এই সঙ্কটের সময় সমরোচিত সংস্কার দ্বারা সামঞ্জস্য বিধান ও জাতীয় জীবন উন্নত করিবার জন্ত স্বতঃই চেষ্টা জাগিয়া উঠে। এই সংস্কার কার্য অতাপিও চলিতেছে এখনও হিন্দুসমাজ পরিবর্তিত আকারে গঠিত হইয়া উঠে নাই। আরও কতকাল লাগিবে তাহা বলা যায় না। এই সময়ে চিন্তাশীল লেখকের পুস্তক সমাজের হিতের জন্ত বিশেষ উপযোগী। এইজন্ত মনস্বী শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েব 'জ্ঞান ও কর্ম' নামক গ্রন্থখানির আমাদের নিকট বিশেষ সমাদর।

মনুষ্যত্ব বিকাশই মানবজীবনের চরম সার্থকতা। যে গ্রন্থ যে পরিমাণে উহার সহায়তা করিবে, সেই পরিমাণে সে গ্রন্থের উৎকর্ষ স্বীকার করিতে হইবে। এ হিসাবেও

এ গ্রন্থখানি মূল্যবান। এখানে আর একটি কথা বলা কর্তব্য মনে করি। অনেকে উপদেশ দিয়া থাকেন এবং অনেকে গ্রন্থ লেখেন, কিন্তু সকলের কথা সমান ফলপ্রসূ হয় না। 'The Deserted Village' নামক প্রসিদ্ধ কবিতায় গ্রাম্য পাদ্রিব বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন যে তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত বাণী যেন দ্বিগুণ প্রভাব লাভ করিত। এ কথা কেবল ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে। আজন্মনির্মলস্বভাব, সাঙ্ঘিক প্রকৃতি, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ হইতে জ্ঞান ও কর্মের যে মহতী বাণী উচ্চারিত হইয়াছে, তাহার যে একটা স্বতন্ত্র শক্তি আছে তাহা বলা নিস্পয়োজন।

এই পুস্তকেব বিষয়লোচনা করিবার পূর্বে ইহার ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যুক্তিসূক্ত মনে করি। বিষয়টা গভীর দার্শনিক এবং জটিল সামাজিক সমস্যাপূর্ণ কিন্তু ভাষা স্বচ্ছন্দ প্রবাহ ও লঘুগতি নদীর ত্রায় অবাদে চলিয়াছে। কোথাও আবিলতা বা অস্পষ্টতা বেশ নাই। সর্বত্র গ্রন্থের প্রতিপাত্ত বিষয় যুক্তিতর্কের অনুসারী। বাহুল্য বর্ণনায় গ্রন্থের কোন অংশই গুরু-ভারাক্রান্ত হয় নাই।

সমুদয় গ্রন্থখানি প্রায় তুল্যাংশে দুইখণ্ডে বিভক্ত। প্রথমভাগে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, অন্তর্জগৎ, বহির্জগৎ জ্ঞানের সীমা, জ্ঞান-

* জ্ঞান ও কর্ম। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। এস, কে লাহিড়ী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

লাভের উপায়, জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য এই সাতটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে । দ্বিতীয়ভাগে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ, কর্তব্যালক্ষণ, পারিবারিক নীতিসিদ্ধি কর্ম্ম, সামাজিক নীতিসিদ্ধি কর্ম্ম,

রাজনীতিসিদ্ধি কর্ম্ম, ধর্ম্মনীতিসিদ্ধি কর্ম্ম, কর্ম্মের এই সাতটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে । যুগ-যুগান্ত হইতে যে সকল প্রশ্ন মানবের চিন্তে গভীরভাবে উদ্বোধন করে, তরঙ্গ তুলে, বহু-



শ্রীশুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ।

শাস্ত্রকার ও দার্শনিক পণ্ডিত যাহাদের মীমাংসায় ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছেন, আত্মজ্ঞান, অভিব্যক্তিবাদ, কার্য্যকারণ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, অদ্বৈতবাদ, বিবর্তবাদ, জগতের শুভাশুভ প্রভৃতি অনেক দার্শনিক সমস্যা গুরুদাস বাবু কেবল আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আপনার স্বাভাবিক মনীষা বলে, সে সকলের প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিবার জন্ত যত্নবান হইয়াছেন। দার্শনিক তত্ত্ব গুলিতেই অনেকে ভয় পাইয়া থাকেন, কিন্তু এস্থলে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। স্বীকার করি দার্শনিক প্রসঙ্গ স্বভাবতঃ নীরস এবং অনেক সময় তাহার আলোচনায় নীরসতা বাড়িয়া উঠে এবং আলোচ্য বিষয় অধিকতর হুর্কোধ্য হইয়া পড়ে! কিন্তু সে দোষ কাহার? বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝিতে না পারিলে সে বিষয়ে তাহার আলোচনা বিকলাঙ্গ এবং দীর্ঘ দীর্ঘ 'কোটেশন' আপনার বক্তব্যের অভাব পূর্ণ করিতে বাধ্য হইতে হয়।

আলোচনা দ্বিবিধ এক মূল কারণানু-সন্ধান, আর বাবহারিক কার্য্যে তাহার প্রয়োগ নিরূপণ। গুরুদাস বাবু উভয় ভাবেই 'জ্ঞান ও কর্ম্মের' আলোচনা করিয়াছেন। এ গ্রন্থে, একদিকে যেমন বৃহস্পতি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শাস্ত্র বিজ্ঞানের নিগূঢ় রহস্যজাল কিরূপে অনায়াসে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে দেখিয়া বিশ্বয় বিমূঢ় হইবেন অত্ৰদিকে সাধারণ পাঠক জ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং কর্ম্মে বলিষ্ঠ হইবার উপযোগী চরিত্রগঠনের অনেক উপাদান পাইবেন। সরসতা বিধানের জন্ত ইহাতে মধ্যে মধ্যে মনোহর গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

অনেকের স্ববণ থাকিতে পারে যে লড কর্জনের শাসনধানে ছাত্রনিবাস সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। সে সম্বন্ধে গুরুদাস বাবুর অভিমত জানিবার জন্ত অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে, তজ্জন্ত আমরা নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

যে সকল ছাত্র দূর হইতে আইসে ও যাহাদের কোন অভিভাবক নিকটে নাই, তাহাদের থাকিবার জন্ত বিদ্যালয়ের নিকটে ও বিদ্যালয়েব কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ছাত্র-নিবাস থাকিলে ও তথায় ছাত্র ও শিক্ষক একত্রে অবস্থিতি করিলে সুবিধা হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে অসুবিধাও আছে। বহুসংখ্যক ছাত্রের একত্রবাস সুগৃহ্মলামত হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার এবং তত্ত্বাবধানের একটু ত্রুটি হইলেই অনেক অনিষ্টেব সম্ভাবনা। স্বজনবর্গের মধ্যে থাকিলে শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তিব যেরূপ বিকাশ হইতে পারে, ছাত্রনিবাসে, শিক্ষকের নিকটে থাকিলেও সেরূপ হওয়া সম্ভাবনীয় নহে। ছাত্রগণ স্ব স্ব আবাসে থাকিলে স্বাভাবিক ও সংসারের সর্বদিকে দেখাশুনা অভ্যাস করিতে পারে, ছাত্রনিবাসে থাকিলে তাহা না। সুশাসিত ছাত্রনিবাসে ছাত্রগণ কলের মত পরিচালিত হইতে পারে, কিন্তু স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া মানুষের মত চলিতে শিখে কি না সন্দেহের স্থল। অতএব নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে, এবং তত্ত্বাবধারণের বিশেষ সুযোগ না থাকিলে ছাত্রনিবাসে থাকা বাঞ্ছনীয় বোধ হয় না। কেহ কেহ মনে করেন, ছাত্রনিবাসে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সর্বদা সমাবেশ হইতে পারে, অতএব ছাত্র নিবাসে অবস্থান প্রাচীন ভারতে

গুরুগৃহে বাসের শ্রায় ফলপ্রদ। এ কথা ঠিক নহে। কারণ প্রথমতঃ ছাত্রনিবাস গুরুগৃহ নহে, গুরু তথায় সপরিবারে অবস্থান করেন না, এবং নিজের বা গুরুর স্বজন পরিবৃত থাকিয়া ছাত্র যেক্রপ পালিত ও শিক্ষিত হইতে পারে, ছাত্রনিবাসে তাহা হইতে পারে না। এবং দ্বিতীয়তঃ পুৰাকালে শিষ্য গুরুকে ভক্তি উপহার দিত ও স্নেহ প্রতিলান পাইত। ভক্তি ও স্নেহ এই দুই মাত্র আদান প্রদানের সামগ্রী ছিল এবং এ দুয়ের বিনিময়ই এক অপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করিত। বর্তমান কালে ছাত্রনিবাসে ছাত্র কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তদুপযুক্ত বাসস্থান ও খাদ্যদ্রব্যাদি পায় ও বৃত্তিয়া লয় বা লইবাব চেষ্টা কবে। এই অর্থ ও দ্রব্যের আদান প্রদান মূলক ব্যাপার সেই ভক্তি ও স্নেহের সমস্ত সঙ্কল্পের সহিত কোনমতে তুলনীয় হইতে পারে না।

যে স্থলে মতভেদ, সে স্থলে গুরুদাসবাবু নিজের স্বাধীনমত জ্ঞাপন করিতে কখন কুষ্ঠাবোধ করেন নাই। বীরের শ্রায় অগ্রসর হইয়াছেন কখন পশ্চাৎপদ হন নাট।

যে দুইটা সামাজিক বিষয়ে মৃতপ্রায় হিন্দু-সমাজকেও বিচলিত করিয়াছে পারিবারিক “নীতিসিদ্ধ কর্ম” পরিচ্ছেদে গুরুদাসবাবু কিছু বিস্তৃতভাবে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। সে দুইটা বিষয়—

১। অল্প বয়সে বিবাহ।

২। বিধবা বিবাহ।

আজকাল এই দুইটা বিষয়ে অনেক বাদ প্রতিবাদ, সভাসমিতি হইতেছে। এক পক্ষে প্রাচ্যভাবে নিমজ্জিত রক্ষণশীলতা অপর পক্ষে পাশ্চাত্যভাবে অগুপ্রাণিত পরিবর্তনপ্রিয়তা

—এতদুভয়ের মধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব চলিতেছে। ইহার ফলাফল জানিবার জন্ত যখন সর্ব চিত্ত অধীভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে, তখন গুরুদাসবাবু কিরূপে এই দুইটা জটিল প্রশ্নের সমাধান করিলেন, তাহা অবগত হইতে কাহার না বিশেষ ইচ্ছা হইবে? যদিও এ সকল বিষয়ে মতবিভেদ অবশ্যম্ভাবী, তথাপি যেক্রপ ধীরতার সহিত ও গভীর ভাবে গুরুদাসবাবু ইহার প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন এবং যেক্রপ যুক্তি তর্ক অবলম্বনে আপনার প্রতিপাদ্য স্থির করিয়াছেন, তাহার কেবলমাত্র উল্লেখ করিলাম; সম্যক পরিচয় পুস্তকে পাইবেন।

এই সকল স্থানে আমাদের মনে হয় তিনি যেন বিচারপতির আসনে বসিয়া নিরপেক্ষভাবে উভয় পক্ষের বক্তব্য অবহিত হইয়া শুনিয়া, অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তিগুলি একে একে পর্যালোচনা করিয়া স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এ কথা যেন কেহ মনে না করেন, যে প্রাচীন প্রথা হইলেই তিনি তাহার সমর্থন করিবেন কিম্বা অবিকৃতভাবে রাখিবার পরামর্শ দিবেন। সহসা কোন প্রাচীন প্রথার আমূল পরিবর্তন করা বিগহিত এই মতের তিনি পক্ষপাতী। ইহাতে তাঁহাকে রক্ষণশীল বলিতে হয় বলুন, এ হিসাবে মহামতি এড্‌মণ্ড বাকও রক্ষণশীল। তিনি একস্থানে যথার্থই বলিয়াছেন যে সংস্কারকদিগের পক্ষে চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া সাবধানে চলি আবশ্যক। গতির বেগ বৃদ্ধির সহিত গতির দিক স্থির রাখিতে হইবে। এ পুস্তকের বিশেষত্ব এই যে সর্বত্রই একটি শাস্ত্র সংযতভাবে বিরাজ করিতেছে। এমন উদারতার সহিত প্রতি-

পঙ্কের মতের আলোচনা একান্ত হুল্লভ !
এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি গ্রন্থের
সর্বত্র সকলের মতের ঐক্য হটক না হটক
কাহারও চিত্ত ক্ষুব্ধ হইবে না !

এ পুস্তক পড়িয়া মন উন্নত হয় প্রাচীন
আদর্শের প্রতি সন্মমের ভাব জাগিয়া উঠে
এবং জীবনের উদ্দেশ্য ও গতি লক্ষ্যাভিমুখে
সহজে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে ।

হাইকোর্টের বিচারপতির আসন হইতে
অবসব লাভ করিয়া দেশেব কল্যাণকামনায়
গুরুদাসবাবু বঙ্গের প্রতিগৃহ যে অমৃত বিত-

রণের জন্ত সোৎসুক, আশা করি এ সুধার
আশ্বাদ হইতে যেন কেহ না বঞ্চিত হন ।
তিনি তাঁহার শান্তিময় বিরাম-অবসরে পরিণত
চিত্তার সুমধুর ফল দেশবাসীকে মধ্যো মধ্যো
উপহার দিয়া কৃতার্থ করুন, ভগবৎ-সমীপে
ইহাই আমাদের প্রার্থনা ।

পরিশেবে একটি বক্তব্য আছে ।
আমাদের এই দরিদ্র দেশে এই প্রয়োজনীয়
পুস্তক খানির একটি মূল্য সংস্করণ হওয়া
অত্যাবশ্যক ও বাঞ্ছনীয় । তাহা হইলে ইহা
সহজেই সাধারণেব করায়ত্ত হইতে পারিবে ।

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় ।

জাপানের সংবাদপত্র ।

জাপানে সংবাদপত্রের প্রবর্তন বেশী
দিনের কথা নহে । ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কিশিদা
নামক জনৈক জাপানী একজন ইংরাজেব
সহিত মিলিত হইয়া সর্বপ্রথম এক পাক্ষিক
সংবাদপত্র বাহির কবেন । তাহার পর হইতে
দেখিতে দেখিতে জাপানে সংবাদপত্রের প্রচলন
এত বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে পৃথিবীর অত্র
কোন দেশে তেমন দেখা যায় না । জনসাধারণ
সকলেই শিক্ষিত এবং সকলেরই জ্ঞান ভাষা
এতদূর প্রবল যে উহাদের বিশ্বাস যে দৈনিক
সংবাদপত্র না পড়িয়া কোন ব্যক্তি জীবনাতি-
বাহিত করিতে পারে না । মুটে মজুবেব
বাড়ীতেও অন্ততঃ একখানা দৈনিক পত্র
আসিয়া থাকে । আমাদের একটা চাকরকেও
দৈনিক পত্রিকা রাখিতে দেখিয়াছি । সকলেই
স্ব স্ব কার্যে বাহির হইবার পূর্বে মোটামুটি
দিনের নূতন খবরগুলি দেখিয়া লয় । অবসর

না থাকিলে গাড়া কিম্বা ট্রামে উঠিয়া
অথবা রাস্তায় চলিবার বেলায় দেখিয়া লয় ।
অবসর মত গাড়োয়ান গুলিও (রিকশাওয়ান)
তাহাদের গাড়ার উপর বসিয়া সংবাদপত্র পাঠে
ব্যস্ত । দোকানে ছেলে মেয়ে যাহারা
দোকান রক্ষার ভার লইয়া বসিয়া থাকে,
দৈনিক সংবাদপত্র তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ কবা
তাহাদের একটা প্রধান কায । কোন কোন
দোকানে ৫০।৬০ বছরের বুন্ধাকেও ৮শমা
পরিয়া সংবাদপত্রপাঠে ব্যস্ত থাকিতে
দেখিয়াছি । বড় বড় দোকানে গেলে
দোকানদার গ্রাহকের হাতে সেইদিনের
সংবাদপত্র পড়িতে দিয়া ৫।৭ মিনিটেব মধ্যে
গ্রাহকের অভাষ্ট জিনিষ খুঁজিয়া আনিয়া
দেয় । নাপিতের দোকানে কিম্বা টিফিন ঘরে
গিয়া কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে বৃথা সময়
অতিবাহিত না হয় এজন্ত আগন্তকের সুবিধার

দিকে দৃষ্টি রাখিয়া টেবিলের উপর নানারকম দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং পাক্ষিক পত্রিকা রাখিয়া দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য রেল ষ্টেশনে ত পত্রিকা আছেই। বড় বড় ষ্টেশনে আরোহীদের সুবিধার জন্য জাপানী পত্রিকার সহিত দুই একখানা দৈনিক ইংরাজী পত্রিকাও থাকে।

আমাদের দেশে কোন গ্রাম্য সহরে একখানা দৈনিকপত্র চলিতে দেখা যায় না। অগতঃ জাপানে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট গ্রামে সুন্দরভাবে দৈনিকপত্র চলিতেছে। জাপানের উত্তর প্রদেশে ইয়োছো বা হোকাইকো দ্বীপ। ঐ স্থান শীতপ্রধান। বছরে ৫৬ মাস প্রায় বরফে আচ্ছন্ন থাকে। মধ্যযুগে ঐ দ্বীপে জাপানের অসভ্য পরাজিত আইনুজাতি বাস করিত। এখন লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুসভ্য ভদ্রলোকও তথায় গিয়া বসতি বিস্তার করিতেছেন। ঐ দ্বীপে লোকসংখ্যায় যে সহরটি তৃতীয় তথায় আমি প্রায় এক বৎসরকাল অবস্থান করি। তথাকার লোকসংখ্যা ন্যূনাধিক পঞ্চাশ হাজার। আমি তথায় গিয়াই আমার জনৈক সহাধ্যায়ীকে জিজ্ঞাসা করিমাছিলাম যে তথায় কোন দৈনিক খবরের কাগজ আছে কিনা। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন এ দ্বীপও জাপানের অন্তর্গত—কাগজেই এখানেও জাপানী সভ্যতা নিশ্চয়ই বর্তমান। যদিও এ দ্বীপের লোকসংখ্যা বিশেষতঃ শিক্ষিত ভদ্রের সংখ্যা তুলনায় কম তথাপি এই সহরে ছয়খানা দৈনিকপত্র আছে। এবং বিগ মাইল দূরবর্তী দ্বীপের দ্বিতীয় সহর ও তরু নামক স্থানে ইহার চেয়ে বেশী সংখ্যক দৈনিক খবরের কাগজ প্রচলিত।

তিনি আরো বলিলেন যে এমন কি এই দ্বীপেরই কয়েকটা বড় গ্রামে দৈনিকপত্র ছাপা হয়।

রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় হইতে সংবাদ পত্রের সংখ্যা জাপানে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সঠিক সংখ্যা অবগত হইতে পারি নাই। তবে তৎপূর্বের পাঁচ বৎসরের তালিকা আলোচনা করিলেই অনেকটা ধারণা হইতে পারে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ৮২৯ খানা। কিন্তু পাঁচবৎসরে অর্থাৎ ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে উহার সংখ্যা ১৪৯৯ খানায় দাঁড়ায়। আশ্চর্য মনে হয় এখন হয়ত ঐ সংখ্যা অন্ততঃ দুই হাজারে পরিণত হইয়াছে। দুই বৎসর পূর্বে কোন ভারতীয় সংবাদপত্রে জাপানের সংবাদপত্রের সংখ্যা চারি হাজার বলিয়া উল্লেখ করে। বোধহয় শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, সাহিত্য, গণিত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক মাসিক, ত্রৈমাসিক রিপোর্ট বা বিবরণীকে সংবাদপত্রের তালিকাভুক্ত করিলে চারিহাজারের নূন হইবে না।

জাপানের অধিকাংশ বড় বড় কাগজই ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে সম্পাদক খুঁজিতে গিয়া দেখিতে পাইয়াছি যে কোম্পানীর প্রত্যেক অংশীদারই তাঁহাদের কাগজের সম্পাদক। “জিজি” নামক পত্রিকার সম্পাদক পঞ্চাশজনের কম নহে।

মফস্বলস্থ সহরে এজেন্টের দ্বারা কাগজ বিলি করা হয়। অনেক কাগজ শুধু পুরুষের দ্বারা, কতক স্ত্রীপুরুষ উভয়ের দ্বারাই এবং কতক শুধু স্ত্রীলোকের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। অধিকাংশ স্কুল কলেজ এবং প্রত্যেক সমিতি হইতে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক

কিষ্কা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ সকল পত্রিকায় ছেলেমেয়েদের এবং সাধারণের শিক্ষণীয় বিষয়ের অবতারণা করা হয়। সামান্য সামান্য ব্যবসায়ীদেরও মাসিক পত্রিকা দেখিয়াছি। যথা ধোপা, নাপিত, দুধওয়ালা, চামার, দরজি প্রভৃতি। উহাতে উহাদের ব্যবসাবিষয়ক বিবরণ এবং উন্নতির পন্থাদি বিবৃত হইয়া থাকে।

শিশুদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক বলিয়া অধিকাংশ কাগজেরই বেশ কাটতি। ব্যবসা বাণিজ্যে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে কাজেই বিজ্ঞানেরও অভাব নাই। ইত্যাদি কারণে কাগজ দামেও সুলভ। বিখ্যাত দৈনিক-গুলির মূল্যই পাঁচ আনা হইতে স-ছয় আনা পর্যন্ত। জাপানী ভাষায় জিজি, কোকুমিন, মাইনিচি, মিয়াকো, হোচি, চুয়ো, নিপ্পন, দেম্পো, নিরোকু, আছাচি, চুগাঁই, শোম্বিও, ইমোমিটারি, এবং ইমোরোজু প্রভৃতি কয়েকখানা দৈনিকই তোকিও সহরের প্রধান পত্রিকা। জাপান টাইম্‌স্‌ নামক একখানা দৈনিক জাপানীদের দ্বারা ইংরাজিতে পরিচালিত হইয়া থাকে। ইংরাজী ছাড়া জার্মান, ফরাসী এবং রুশভাষার পত্রিকাও জাপানে রহিয়াছে। ইংরাজ, জার্মান, মার্কিন এবং রুশগণও তথায় পত্রিকা প্রকাশ করিয়া থাকে। বৈদেশিক দ্বারা ইংরাজীতে জাপান য্যাড্‌ভাটাইজার, জাপান ক্রনিকল্, জাপান গেজেট, জাপান হেরাল্ড, জাপান মেল কোবে হেরাল্ড, নাগাসাকি প্রেস প্রভৃতি কয়েকখানা উল্লেখ যোগ্য পত্রিকা প্রকাশিত থাকে।

ইংরাজী পত্রিকার কাটতি কম। প্রবাসী

বৈদেশিকদের ভিতরই উহার অনেকটা কাটতি দেখা যায়। কাষেই উহা তেমন সুলভ নহে; দৈনিক দুই আনা হইতে চারি আনা।

বিশেষ বিশেষ ঘটনার সময় অতিরিক্ত পত্রের (গোঙ্গাই) বিশেষ সমারোহ দেখিতে পাওয়া যায়। রুশজাপানযুদ্ধের সময় প্রত্যেক বড় পত্রিকার অফিস ছাড়াও অনেক স্থান হইতে দিনের মধ্যে কতবার গোঙ্গাই অর্থাৎ তারের সংবাদ অতিরিক্তপত্র প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি।

প্রায় প্রত্যেক বড় বড় সংবাদপত্রের দুই চারিজন পরিচালক ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে গিয়া পরিচালন কার্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করতঃ সংবাদপত্র লিখিতে আরম্ভ করেন। কাষেই বিদেশের নানারূপ আচার ব্যবহার, লোকচরিত্র, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সর্বসমক্ষে সুন্দরভাবে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইতেন। ভারত সঙ্ঘেও অনেক সময় অনেক বিষয় লিখিত থাকে সত্য, কিন্তু ভারতবাসীকে সেদেশে আজকাল অনেকটা অসভ্য বর্কর বলিয়া গণ্য করে তাই আমাদের যাহা কিছু সুন্দর তাহা গোপন করিয়া কেবল কেলেঙ্কারীর কথা অতিরঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটা এস্থলে উল্লেখ করিলাম। ভারতে বালবিধবা নিগ্রহ সঙ্ঘে একজন লিখিয়াছে যে, “কোন বালিকা বিধবা হইলে শ্বশুর, শাশুড়ী এবং বাড়ীর অন্যান্য সকলে বলিয়া থাকে এই অলক্ষ্মীর জন্মই আমাদের ছেলের অকাল মৃত্যু হইল। বালিকাকে নানাভাবে উৎপীড়ন আরম্ভ

করে। তাহার সুন্দর বসন ভূষণ কাড়িয়া লয়, মস্তকের দিব্য কেশ কাটিয়া ফেলে, সুখাণ্ডে বঞ্চিত করে, এমন কি মাত্র একবেলা সামান্য কিছু খাইতে দেয়। বাড়ীর অগ্রাণ্ড সকলে কোন কোন পর্কোপলক্ষে আমোদ উৎসবে মাতোয়ারা হয় কিন্তু ছুঃখিনী বালিকাকে নির্জনে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় ইত্যাদি।”

আব একদিন দেখিলাম “ভাংতেব বালাবিবাহ অতি আশ্চর্য। তিন বৎসবে নেয়েদেব বিবাহ হয় এবং ছয় সাত বৎসব বয়সে তাহাদের সম্ভান হয়।” “নানাক্রম বাসায়ানিক ভ্রবোর আবিষ্কার সংস্কৃত পঢ়া গোববে যব পরিষ্কার করা হয়। উহাতে বাবামের বীজ এবং দুর্গন্ধ নাশ করার পবিবর্ত্তে বং উহার সহায়তা কবে।” “বংশ মর্গাদা বজায় রাখিবার জন্ত কুলীনেব যবে ৫০।৬০ বছরের কুমারী দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে তিন বছরের ছেলে ৮।১০ টা বিবাহ করিয়া বসে। এবং কোন কোন স্ত্রীর বয়স ২০।২৫ বৎসর।”

সংবাদ পত্রের এইরূপ টিকা টিপ্তনী এবং সহাদ্যারীদের উপহাসব্যঞ্জক মন্তব্যে কত যে ঝালাপালা হইয়াছি তাহা বলা যায় না। • বালক বালিকাদিগেব প্রথম শিক্ষার গ্রন্থে আমাদের দেশীয় লোকের যেরূপ আকৃতি ও গঠনের বর্ণনা করিয়াছে তাহা রামায়ণের রাক্ষসের চেহারার চেয়ে কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে। তবে একটা কথা এই যে, জাপানে অনেক বিষয়ে ভারত-বাসীকে হীনতা স্বীকার করিতে হইলেও স্কুল কলেজে, ভদ্রলোকের বাড়ীতে, হোটেলে এবং দোকানে এখনো ততটা নিগ্রহ সহ

করিতে হয় না। সভাভূমি আমেরিকায় সাধাবণের ভিতর ভারতবাসী নিগ্রহের সীমা নাই। তাহা বোধ হয় অনেকেই সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হইয়া থাকিবেন। আমার এক বন্ধু লিখিয়াছিলেন তিনি সমস্ত দিন হোটেলে হইতে হোটেলাশ্রমে স্থান না পাইয়া একদিন এক পল্লীর ধারে গাছ তলায় শুইয়া রাত্রি যাপন করেন। বলা বাল্যে তাঁহার হাতে টাকাও ছিল অথচ হোটেলেওয়ালারা ইহা হোটেলে নহে বলিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দেয়। একপ ব্যবহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হওয়ারই কথা। কিন্তু উহাব পব আমাদের ভারতীয় কোন এক বিশেষ শিক্ষিত ব্যক্তি সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া জাপানে আইসেন। তিনি এক এক সুসভ্য দেশে ৫।৬ মাস কাটাইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক চবিত্র এবং ভিন্ন ভিন্ন ইন্টিটিউশন তন্ন তন্ন কবিয়া দেখিয়াছিলেন। আমি জাপানে তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি যে, তাঁহাকেও অনেক হোটেলে হাতে টাকা লইয়াও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হইয়াছিল।

সংবাদ পত্র সম্বন্ধে লিখিতে লিখিতে কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কি করিব অবস্থায় টানিয়া আনে। জাপানের সাময়িক ‘পঞ্চ’ হাশ্যোদ্দীপক ব্যঙ্গব্যঞ্জক বং-তামাসাজনক চিত্রে পূর্ণ। সেখানকার অনেক কাগজে মজার গল্প, হেঁয়ালী প্রভৃতি থাকে। ইহা ছাড়া ঐতিহাসিক এবং উপন্যাসিক গল্পের কাগজ ত আছেই।

সংবাদ পত্রের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হওয়ার রসদ সংগ্রহ করা মুশ্কিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই অতি নগণ্য সংবাদ সমূহেরও স্থানাভাব দেখিতে পাওয়া যায় না।

অগ্রাণু দেশের ঞায় জাপানেও ভিন্ন ভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন মতের সংবাদ-পত্র আছে কিন্তু সকলেরই মুখা উদ্দেশ্য দেশের উন্নতিতে সহায়তা করা। আমাদের দেশে উহার বেশ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। যঁাহারা দেশে পরিবাসিত, দেশের বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ এবং দেশবাসীভাব অভাব অভিযোগ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত কাগজ একরূপ; আব যঁাহারা অগ্রদেশ হইতে নূতন এদেশে পদার্পণ করেন এবং দেশের আভ্যন্তরিক কেন বাহ্যিক বিষয়ও একবার মনোযোগের সহিত দেখিতে প্রয়াস পান না তাঁহাদের পরিচালিত কাগজ অগ্ররূপ। উভয়ের ভিতর এত পার্থক্য যেন উভয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত।

জাপানে কয়েক বৎসরে প্রেসেব বিরুদ্ধে একটী মাত্র মোকদ্দমা দেখিয়াছি। যখন বাণ্টিক ক্লিট জাপানের বিরুদ্ধে আসিতে-ছিলেন, সেই সময় জাপান গবর্নমেন্ট ঘোষণা করেন যে জাপানেব কোন পত্রিকা, জাপানের সেনাপতি সৈন্য সামন্ত অ্যাড্‌মিরাল এবং যুদ্ধ জাহাজ প্রভৃতি শত্রুপক্ষীয়দের জন্ত কখন কোথায় প্রতীক্ষা করে তাহা যেন প্রকাশ না করে। পক্ষান্তরে শত্রুপক্ষীয়দের গতিরোধ উল্লেখ করিতে এবং যুদ্ধের ফলাফল প্রকাশ করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত।

এদিকে বাণ্টিক ক্লিট্‌ মাদাগাস্কার অতিক্রম করিলে এক খানা পত্রিকা প্রকাশ করে যে রুশের জাহাজ অগ্রসর হউক কোন ভয়ের কারণ নাই। আমাদের অ্যাড্‌মিরাল তাঁহা হইতে তাঁহার উপযুক্ত অনুচরগণসহ শত্রুপক্ষ সমূলে নিধন করিতে দক্ষিণ অঞ্চলে চীন সাগরের কোম প্রদেশে প্রতীক্ষা করিতেছেন।

গবর্নমেন্ট ঘোষণা অগ্রাণু করিয়া এই সংবাদ রটনা করায় এবং ইহাতে শত্রুদের সুবিধা হইবার সম্ভাবনা এই ভাবিয়া বিচাবে সেই সংবাদপত্রেব পাঁচশ ইয়েন অর্থাৎ উনচল্লিশ টাকা অর্থ দণ্ড হয়।

কাগজ পাঠ সমাপ্তির পর যিনি যে বিষয় ইচ্ছা করেন কাটিয়া সবতনে রাখিয়া দেন। এবং পুরাতন কাগজ বিক্রয় করিয়া ফেলেন। জাপানেব দোকানদার যে কোন জিনিষ হউক না কেন অনাবৃত্ত অবস্থায় গ্রাহকের হাতে দেয় না। বিক্রীত দ্রব্যাদি সম্ভ্রান্ত দোকানে সাদা কাগজে এবং ছোট ছোট মাথাবণ দোকানে পুরাতন সংবাদ পত্রে মোড়াইয়া সুন্দর রঙিন ডোরে বাঁধিয়া, ধবিয়া লইবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের দেশের বাবুদের ঞায় জাপানের বিশিষ্ট লোক ও বাজারের ক্রীত ভারী দ্রব্য হস্তে করিয়া বাড়ী লইয়া যাইতে লজ্জা বোধ কবেন না।

শ্রীযত্ননাথ সরকার।

মৃত্যু।

মৃত্যু যদি হয় সখা অমৃতের দ্বার
আমাদের পরে তার আছে অধিকায়;

কিংবা যদি জীবনের এই সমাপন
ইথে কোন আশঙ্কার নাহি প্রয়োজন।

শ্রীবিরজাশঙ্কর গুহ।

এলাহাবাদে জাতীয় সম্মিলন।

কর্তব্য

এবার আমাদের জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন এলাহাবাদে হইয়াছিল। ইতিপূর্বে দুই বৎসর সমিতিতে যোগদান লইয়া দেশের দুই পক্ষের মধ্যে যে শোচনীয় মতভেদ দাঁড়াইয়াছিল, এবারকার প্রতিনিধি সংখ্যা দেখিয়া আশা হয়—যেন উভয়পক্ষই ব্যক্তিগত মতামত ত্যাগ করিয়া দেশের এই সাধারণ কক্ষে যোগদান করাই কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাহা ছাড়া কিছুদিন হইতে স্থানে স্থানে মুসলমানেরা হিন্দুর রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে স্বতন্ত্র থাকিবার জন্য যে উপদেশ দিয়া আসিতেছেন, তাহাও বার্থ হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। জনকয়েক শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ মুসলমানও সমিতিতে উপস্থিত ছিলেন এবং এই জাতীয় কক্ষে হিন্দুর সহিত সম্মুখে যোগদান করিতেও তাঁহারা কুণ্ণাবোধ করেন নাই। সুতরাং এবারকার জাতীয় সমিতিতে যথার্থ জাতীয় সম্মিলন বলা যাইতে পারে।

ভারতের কলাগর ও উদারনৈতিক স্বনামধন্য শ্রদ্ধেয় সার উইলিয়ম ওয়েদারবর্গ তাঁহার বাদ্যক্য সম্বন্ধে দেশের সকল সময়ে ভারতে আসিয়া সমিতির সভাপতি পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের মঙ্গল সাধনই তাঁহার মহৎ জীবনের এত। প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল তিনি ভারতবাসীর উন্নতির জন্য কায়মনোবাক্যে প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহার এই অপূর্ব আয়োজনের ও পরার্থপরতার জন্য ভারতবাসী মাঝে মাঝে সন্মানস্বরূপে কণ্ঠ এবং এবাবে আমরা তাঁহাকে আমাদের জাতীয় যক্ষের অধিপতি নির্বাচিত করিয়া সেই কৃতিত্বেরই পরিচয় দিয়াছি মাত্র।

সার ওয়েদারবর্গের বক্তৃতার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। দেশের রাজনৈতিক কক্ষ ও ব্যবস্থার তিনি উল্লেখ পয্যন্ত করেন নাই—করা আবশ্যিকও বোধ করেন নাই। সকল দেশের সকল জাতির সকল কক্ষের মূলে যে তিনটি মহাশক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, তিনি তাহাই ভারতের রাজা ও প্রজা উভয়ের চক্ষের

সম্মুখে উজ্জ্বলবর্ণে ধরিয়া দিয়াছেন মাত্র। বক্তৃতার প্রারম্ভেই তিনি বলিয়াছেন—“আশা, প্রীতি ও সমবেত উদ্যমই আমাদের সকল কক্ষের মূলমন্ত্র হওয়া আবশ্যিক।” আশা,—ভারতের ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের উপর, ভারতবাসীর উত্থানশক্তির উপর, রাজপক্ষের উদারতা ও প্রজারঞ্জনের আন্তরিক ইচ্ছার উপর। প্রীতি,—ভারতের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে, রাজনৈতিক বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে এবং প্রধানতঃ রাজা ও প্রজার মধ্যে। আর সমবেত উদ্যম ৩’ সর্বকালে সর্ব সমাজেই আবশ্যিক। এই তিনটি নীতিই তাঁহার মুখ্য বক্তব্য। ওয়েদারবর্গ সাহেবের বক্তৃতার মধ্যে নূতন কথা নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব ও চেষ্টার ফলে তিনি আমাদের মধ্যে এই তিনটি নীতিকে সার্থক করিবার যত্ন করিলে অনেকটা সফল হওয়া সম্ভব বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

ওয়েদারবর্গ এই প্রীতি ও সমবেত চেষ্টা প্রতিষ্ঠার সূচনা করিয়া যাইবার যত্ন করিতে গিয়াছেন নাই। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বাহাতে ভবিষ্যতে অপ্রীতির কোন কারণ না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে তিনি দেশের উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃগণকে লইয়া একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এবাবে একরূপ একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহাদের চেষ্টা কতদূর সফল হইবে তাহা অবশ্য আমরা জানি না, কিন্তু একরূপ মিলনের চেষ্টাতেও যে একটা সফল আছে, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

ওয়েদারবর্গ সাহেবের মতে আমাদের সমবেত উদ্যম তিনটি পথে চালিত হওয়াই কর্তব্য,—প্রথম, ভারতবাসীকে শিক্ষাদান করা, দ্বিতীয় প্রস্তাবিত সংস্কার লইয়া গবর্নমেন্টের নিকট উপস্থিত হওয়া এবং তৃতীয় ইংলণ্ডে তাঁহাদের প্রার্থনা প্রচার করা।

সার ওয়েদারবর্গ মনে করেন প্রীতি বৎসরেই জাতীয় সমিতির কয়েকজন প্রতিনিধির তাঁহাদের প্রস্তাব লইয়া বড়সার্টের নিকট উপস্থিত হওয়া

কর্তব্য। এরূপ চেষ্টা পূর্বেও দুইবার হইয়াছিল, কিন্তু লর্ড এলগিন ও লর্ড কর্জেন উভয়েই কংগ্রেসের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করেন। সৌভাগ্যবশতঃ লর্ড হাডিং সঙ্কীর্ণ মতাবলম্বী নহেন। ওয়েদারবর্ন সাহেব তাঁহার নিকট এইরূপ প্রতিনিধি প্রেরণের অভিলাষ জ্ঞাপন করায় তিনি তাঁহার সম্মতি জানাইয়াছিলেন এবং গত ৫ই জানুয়ারি প্রাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃগণ ও কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতিগণ ওয়েদারবর্ন সাহেবকে সঙ্গে লইয়া বড়লাটের প্রাসাদে যাইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া আপনাদের অভাব জ্ঞাপন

করেন। লর্ড হাডিং যেরূপ ভদ্রতা ও উদারতার সহিত তাঁহাদের প্রস্তাবের উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে আমরা আশা করিতে পারি সাধারণের সমবেত ভিক্ষাকে তিনি কর্জেনের স্তায় পদাঘাত করিবেন না। লর্ড হাডিং স্পষ্টতঃ যে তাঁহাদের কোন কথা কার্যে সম্পন্ন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহা নহে, বরং বলিয়াছেন কতকগুলি বিষয় কর্ত্তে পরিণত করিতে হইলে অতিরিক্ত ব্যয়ের আবশ্যিক। তবে দেশের অভাবটাকে যথার্থ অভাব বলিয়া স্বীকার করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই, এবং যথাসম্ভব সহানুভূতির সহিত তাহা দূর করিতে যে তিনি যত্ন করিবেন

তাহারও আভাষ দিয়াছেন। যাহা হউক এতদিনে গবর্নেন্ট যে কংগ্রেসকে গ্রাহ্য করিলেন, ইহাই আমাদের পরম লাভ বলিতে হইবে।

জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের পরে শিল্পসমিতি, হিন্দুমুসলমান মিলনসমিতি, সমাজ সংস্কার সমিতি, নারী সমিতি ও আরও দুই একটি সমিতির অধিবেশন হয়। শিল্প সমিতির সভাপতি হইয়া শ্রদ্ধয় শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুণ্ডো-পাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার সকল কথাই সহিত আমরা একমত হইতে না পারিলেও, তাহা তাঁহার স্তায় বিজ্ঞ ব্যবসাবিষয়ীদের যোগ্যই হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার দুইটি প্রস্তাব বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। একটি সমগ্র ভারতের ৩৩য় এক বিরাট শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা;



স্যার উইলিয়ম ওয়েদারবর্ন।

অপরটি ভারতের অর্ধশতাব্দী নূতন শিল্পের রক্ষার জন্য গবর্নমেন্টের সাহায্য। এরূপ একটা শিল্প বিদ্যালয়ের যে নিতান্তই আবশ্যিক সে কথা বলাই বাহুল্য। শিল্পোন্নতি শিল্প ভারতবাসীর আয়রক্ষার আর অন্য উপায় নাই। গবর্নমেন্টও এ বিষয়ে যে বিশেষ উৎসাহী সে কথা বলা যায় না। সুতরাং আমাদের জাতীয় চেষ্টার এরূপ একটা ব্যবস্থা না করিলে দেশের হাহাকার ও অধঃপতন অনিবার্য।

আমাদের ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে গবর্নমেন্টের সাহায্য করা সম্বন্ধে আমাদের নূতন বলিবার কিছুই নাই। রাজেন্দ্রবাবু যাহা বলিয়াছেন গবর্নমেন্টের জানোৎপাদনের পক্ষে তাহাই বথেষ্ট। লর্ড হার্ডিং তাঁহার শাসন কালে যদি এরূপ একটা সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া যান, তাহা হইলে ভারতে তাঁহার কীর্তি অমর হইয়া থাকিবে।

শ্রীমতী সরলা দেবী প্রবর্তিত ভারতে নারীজাতির অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য যে নারীসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল, বিজয়ন গ্রামের রাণী তাহার

অধিনায়িকা হইয়াছিলেন। নারীজাতির কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতাটি করিয়াছেন তাহা হৃদয়গ্রাহী। আমাদের দেশের উচ্চপদস্থা মহিলারা যে সমাজতির উদ্ধার করে এরূপ আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা দেশের পক্ষে সুলক্ষণ। বক্তৃত্ত দেশে নারীসমাজ যতদিন শিক্ষায়, জ্ঞানে, কর্ম্মে ও ধর্ম্মে উন্নতিলাভ না করিবে ততদিন আমাদের উন্নতির চেষ্টা কেবল ভিত্তিহীন প্রাসাদের কল্পনা মাত্র।

সার উইলিয়াম ওয়েদারবার্ণ স্বদেশ প্রত্যাগমনের পূর্বদিন বঙ্গ-শিল্প-বিদ্যালয় (Bengal Technical Institute) পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা দেখিয়া তিনি অতিশয় প্রীত হইয়াছেন। নিজের চিত্রটি বিদ্যালয়েই লওয়া হয়। মধ্যে সার উইলিয়াম, দক্ষিণে তাঁহার সহচরী নার্স ও সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; বামে অনারেবল মদনমোহন মালব্য ও অনারেবল গঙ্গাপ্রসাদ বন্দ্য। পশ্চাতে গুরুদাস বাবুর দিক হইতে প্রথমে অনারেবল দেবপ্রসাদ



সর্বাধিকারী, পরে শ্রীযুক্ত সদ্যানন্দ বসু, শ্রীযুক্ত পৃথীশচন্দ্র রায়, ডাক্তার ইন্দুনাথ মল্লিক, বিদ্যালয়ের একজন কর্মচারী, মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ঋষিধর মুখোপাধ্যায় ও বিদ্যালয়ের ন্যায়ালঙ্কার

মহাশয় দণ্ডায়মান। সার উইলিয়মের শরীর এতই অসুস্থ যে একজন 'নাস'কে সঙ্গে লইয়া ভারতে আনিতে হইয়াছে।

অন্তঃপুর প্রসঙ্গ ।

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় সন্তান পালন ।

টাইম্‌স্‌ নামক বিখ্যাত সংবাদপত্রের লেখক বলেন, সন্তানপালন সম্বন্ধে ইংলণ্ড আমেরিকায় প্রভেদ এই যে, ইংলণ্ডে পুত্রের এবং আমেরিকায় বস্ত্রের প্রতি সমধিক যত্ন প্রকাশ করা হয়। কিসে কন্যাটি সুখে থাকিবে, কেমন করিয়া নিত্য নূতন আমোদ উপভোগ করিতে পারিবে, আমেরিকায় পিতা-মাতার ইহাই বিশেষ চেষ্টা। কন্যার উপর সেখানে প্রায় কোন কর্তব্যের গুরুভার অপণ করা হয় না, তাহার আনন্দবিধানের জন্ত পরিবারের সকলেই সঙ্গীত সচেষ্টিত থাকেন।

আমেরিকায় বালিকা-জীবন দুই অংশে বিভক্ত, এক বিশ্ববিদ্যালয়ের—দ্বিতীয় সামাজিক। এই দুই জীবন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যাহারা সামাজিক জীবনধারণে মনোনিবেশ করেন তাহাদের সময় অতি লঘুভাবেই কাটিয়া যায়। কিসে লোকপ্রিয় হওয়া যায় স্ত্রীলোক মাত্রেই তাহা সহজসংস্কারবশত বুদ্ধিতে বিলম্ব হয় না এবং সেই লক্ষ্য সম্বন্ধে রাখিয়া সমাজপ্রিয় রমণী আপন বুদ্ধি এবং চেষ্টাকে নিয়োজিত করেন। কোন পরিচ্ছদ কেমন ভাবে পরিলে সুন্দর দেখাইবে, কোন বিষয়ের আলোচনায় অতিথি অভ্যাগতকে সমধিক প্রতিদান করিতে পারা যাইবে ইহাই তাঁহার বিশেষ ধ্যানধারণার বিষয় হইয়া থাকে। স্বভাবতঃই তাঁহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং প্রকৃতি প্রফুল্ল, তাহার সহিত কথাবাণী কহিয়া বড়ই আনন্দলাভ করা যায়। বেশবিষ্ঠাসবিনয়ে যে রীতি সর্কাপেক্ষা নূতন তিনি তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকেন; বাক্য ব্যবহারে তাঁহার চতুরতা, উত্তর প্রত্যুত্তরে ক্ষিপ্ৰকৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি যে কেবলমাত্র সুন্দর এবং মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন; এমন নয় প্রত্যেক সামান্য

খুঁটিনাটির প্রতি মনোযোগ দান করেন, এহঁ নিমিত্ত যখন সাজিয়া বাহিরে আসেন তখন তাঁহাকে একখানি জীবন্ত ছবির মত দেখায়। যেখানেই দৃষ্ট পড়ে সেখানেই সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্য দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। ইংরাজ মহিলা বর্ণনৌকুমার্যে, কেশেব প্রাচুর্যে, এবং স্বাস্থ্যের লালিত্যে আমেরিকার রমণীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াও সাজসজ্জায় তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন না। সাজিয়া দুইজনে পাশাপাশি দাঁড়াইলে আমেরিকা মহিলাকে অধিকতর মনোরম দেখায়। সামাজিক জীবনের পারদর্শিতাতে ইংরাজ মহিলাকে পরাস্ত করিয়া থাকেন। জীবনের অধিকাংশ সময় নগর হইতে দূরে অবস্থান জন্ত ইংরাজ বালিকা বহুকাল অবধি একটু অধিক লজ্জা কাতর থাকে, এবং সমাজে যে সহজ প্রফুল্ল চতুর কুশল ব্যবহার আদৃত তাহাতে অভ্যস্ত হইতে কিছুকাল তাহার বিলম্ব হয়। নগর হইতে দূরে নিস্তর প্রাকৃতিক দৃশ্যে সুন্দর পল্লীগ্রামে বাস করিয়া যদিও ইংরাজবালিকা নিয়ত নগরবাসিনী আমেরিকা বালিকার চর্চালাভ করে না, তবুও এই পল্লীবাসের জন্ত অর্জিবনকাল তাহার প্রকৃতির সহিত একটি মধুর সম্বন্ধে প্রতিধাকে, আকাশ বাতাস, সুন্দরী তটিনী, পুষ্পপল্লব, পাখীর আনন্দগান চিরদিনই তাহাদিগকে আকৃষ্ট এবং আনন্দিত করে। বাস্তবিক প্রত্যেক বালিকাকেই কোন না কোন লোকহিতকর কার্যে সংস্কৃত থাকিতে হয় বলিয়া তাহাদের স্বভাব দয়াদাক্ষিণ্য এবং পরদুঃখকাতরতায় শোভিত হয়। আমেরিকায় যাহারা লোকহিতকর কার্যে জীবন উৎসর্গ করেন তাহারা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত স্বতন্ত্র একটি সম্প্রদায়,—তাঁহার জীবনের অস্ত্র সকল

কর্তব্যই প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন। আমেরিকার রমণী সমাজে যে সকল পুরুষের সংসর্গে আসেন প্রায় তাহাদের সকলেরি তীক্ষ্ণ বাণিজ্য বুদ্ধি, এই আলাপ পরিচয়ের ফলে রমণীগণের বিষয় বুদ্ধি পরিণত হইয়া উঠে—তাহারা স্চচাক্র নিপুণতার সহিত আপন আপন বিনয় কর্ম চালাইয়া থাকেন। যদিও ধনলাভই তাহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে তবুও সাধারণ্যে প্রতিপত্তি লাভ যে তাহাদের জীবনের লক্ষ্য ইহা অস্বীকার করা যায় না। দেশ ভ্রমণের উৎসাহে, নিত্য নূতনের আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল হইয়া তাহারা কত স্থানে উপনিবেশ স্থাপনের নেতা হইয়াছেন, কেবলমাত্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে জনঘের সহানুভূতি এবং আবিষ্কারকৌতুহল সংঘত করিয়া বাধা তাহাদের স্বভাব নয়, তাহাদের দয়া সর্বত্র ব্যাপিনী। ইউরোপ, আফ্রিকা, অতি শুদূরতম দেশেও তাহাদের হৃদয়ের সমবেদনা প্রসারিত হইয়া যায়, রোগ শোকদারিদ্র্য মুকুহস্তে দান করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হইবেন না। ইংরাজ মহিলাগণ রাজনীতি এবং ব্যায়ামের বিশেষ পক্ষপাতী, তাহাদের স্বাস্থ্যময় জীবন এবং নির্মল চিত্তবৃত্তি সকল এই পক্ষপাতিতার বিশেষ সহায়।

আমেরিকার রমণা স্বভাবতঃই ইংরাজ রমণীগণের অপেক্ষা স্থিরচিত্ত, সহসা কোন বিষয়ে উত্তেজিত হওয়া কিম্বা অধিক ভালবাসায় কাতর হওয়া তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, পুরুষের সহিত তাহাদের প্রণয় অপেক্ষা বন্ধনের সম্বন্ধই সুলভ। আমেরিকা দেশের পুরুষগণ তাহাদিগকে সিংহাসনপ্ৰস্তুত দেবতার গায় স্বতন্ত্র এবং উন্নততর লোকবাসীর গায় ভক্তি করিয়া থাকেন। যদিও অস্বীকার করিবেন তবুও মনে হয় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এখনও তাহাদের ধারণা মধ্যযুগের অনুরূপ। আর এক বিষয়ে ইংরাজ এবং আমেরিকাবাসীর বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য হয়। বিবাহের পূর্বে ইংরাজ মহিলায় সহিত তাহার ভাবী স্বামীর দেখা সাক্ষাৎ তেমন অধিক হয় না। কিন্তু বিবাহের পর স্ত্রী সর্ববিষয়ে গৃহে, সমাজে, সাধারণে তাহার সহযোগিনী, সহধর্ম্মিনী

এবং সহায়স্বরূপ। কিন্তু আমেরিকায় বিবাহের পূর্বে বাকদত্ত স্ত্রীপুরুষের বন্ধন সুদৃঢ়, আমোদ প্রমোদ কিম্বা কর্তব্য কার্যে সর্বদাই উভয়ে উভয়ের সহায়ক, কিন্তু বিবাহের পর তাহাদের এ সম্বন্ধ আর থাকে না, উভয়ের জীবন যেন স্বতন্ত্র হইয়া যায়। স্বামী আপন ব্যবসায় বাণিজ্যে একেবারে নিমগ্ন হইয়া থাকেন এবং স্ত্রী গৃহকার্যের অবসরকাল সামাজিক আয়োদে অতিবাহিত করেন—তখন আর তাহাদের উভয়ের সাধারণ পারিবারিক জীবন থাকে না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় স্বামীর দোষেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। কেননা স্বীকৃতি তিনি কোন কঠিন কর্তব্যের সহযোগিনী না করিয়া তাহাকে খেলার পুতুলের মত সুন্দর করিয়া সাজাইয়াই স্ত্রী হন। স্ত্রী স্বামীর জীবনের কোন দায়িত্বের অংশই বহন করেন না, স্বামীর আয় ব্যয় বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—কেবল আবশ্যিক সময়ে যথেষ্ট টাকা পাইয়া থাকেন মাত্র। আমেরিকার রমণী আপনাদিগকে স্বাধীন মনে করিয়া বতই গোরব অনুভব করেন না কেন কিন্তু একটু বুদ্ধি দেখিলেই স্পষ্ট প্রকাশ পাইবে, তিনি নিতান্তই পরাধীন; কেননা একটিমাত্র পয়সার জন্তও তাহাকে স্বামীর নিকট হাত পাতিতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক ভদ্র ইংরাজ মহিলা বিবাহ সময়ে সম্পত্তি লাভ করেন।

আমেরিকার রমণীগণ তাহাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুন্দর হৃদয় বৃত্তি, এবং উন্নত শিক্ষার অধিকারী হইয়াও ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের উন্নতিসাধন করিতে পারিবেন না ইহা অসম্ভব মনে হয়। বর্তমানে যদিও তাহাদের এই সকল গুণ ব্যর্থ এবং অপব্যয়িত হইতেছে, তবে নিরাশ হইবার কারণ নাই, এখনই কতকগুলি চিন্তা দেখা যাইতেছে যাহা হইতে মনে হয় তাহারা আর অধিক দিন কর্তব্যবিমুখ থাকিবেন না; নিকট ভবিষ্যতে তাহাদের সৌন্দর্য্য, নিঃস্বার্থ সেবা, উন্নততর চেষ্টি, জাতীয় জীবনে নবীন যুগ অনয়ন করিবে।

আসামে খাসীদিগের মধ্যে নারীর প্রাধান্য।

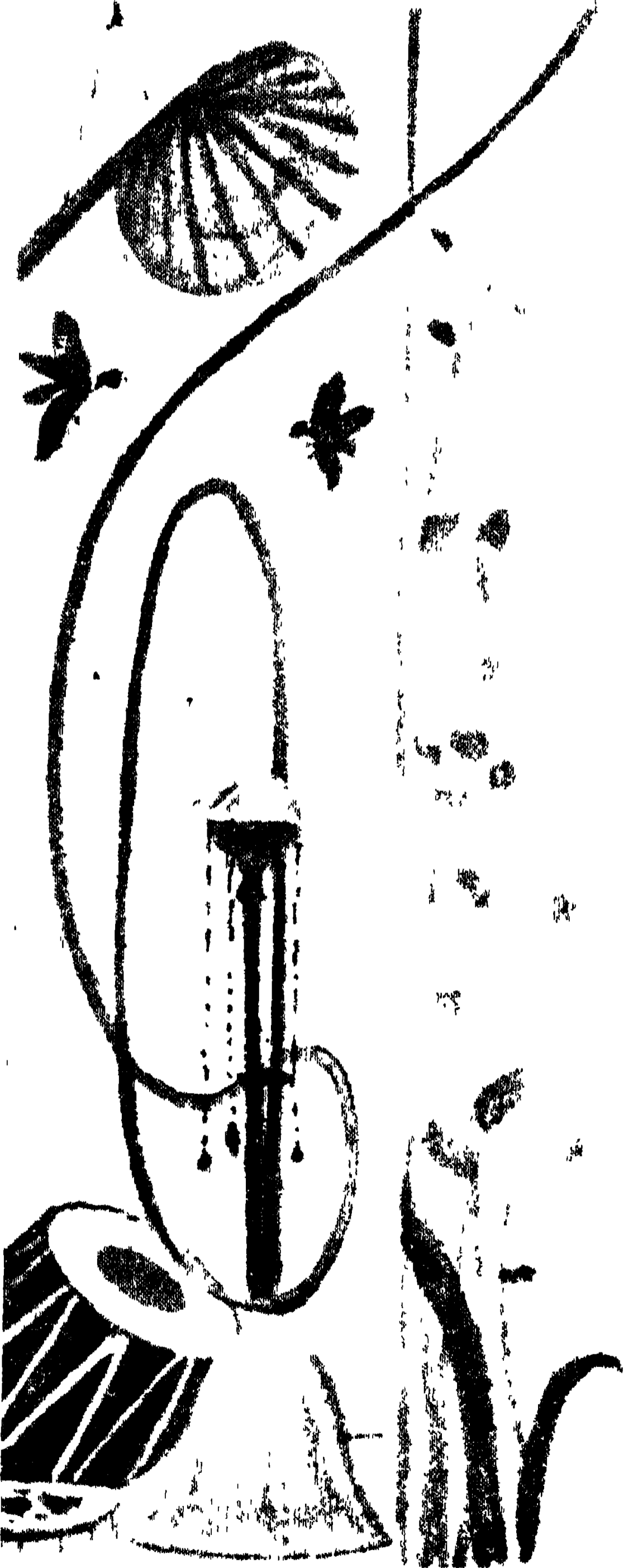
ভারতের অনেক আদিম পার্শ্বতা অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক বিষয়ে নারীদিগের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। খাসীদিগের মধ্যে এই নীতিটা কিছু অধিক প্রবল। তাহাদের মধ্যে বিষয়ের উত্তরাধিকারত্ব নারীর দিক হইতেই নামিয়া আসে। ইহাদের মধ্যে বিবাহপ্রথা যেমন সরল, বিবাহভঙ্গও সেইরূপ সহজ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্বন্ধেদের আবশ্যিক হইলে সেই মর্মে প্রথমে একটা সাধারণ ঘোষণাপ্রচারিত হয়। পরে পুরুষটি তাহার স্ত্রীকে সামান্য পাঁচটি মুদ্রা দেয়, স্ত্রী আর পাঁচটি মুদ্রা সমেত তাহা স্বামীকে ফিরাইয়া দেয়। স্বামী সেইগুলি লইয়া ছড়াইয়া ফেলিয়া দিবা মাত্র উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ-ছেদ সম্পূর্ণ হয়। খাসীদের মধ্যে ৩৫ বা ৪০ বৎসরের একজন পুরুষ ৩৭ বার বিবাহ করিয়াছে একপ লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। স্বনামধন্য পূর্ববঙ্গের লাট ফুলার সাহেব তাহার ভারত সম্বন্ধে নূতন পুস্তকে খাসীদের বিষয়ে অনেক কথা লিখিয়াছেন। মাতা-মহীই খাসী-পরিবারের প্রধান ব্যক্তি। খাসীরা পত্রের শেষে নাম লিখিবার সময়ে লিখিয়া থাকে—“তোমার আন্তরিক বন্ধু—মেরি য়ানের পিতা।” ফুলার সাহেব

বলেন খাসীদের সহিত তিব্বত বা ব্রহ্মের লোকের কোন সাদৃশ্যই নাই। তাহারা ভারতব্যাপী একটা বহু প্রাচীন জাতির অবশিষ্ট অংশ মাত্র। ইহাদের ধর্ম বিশ্বাস আসামের অন্যান্য পার্শ্বতাজাতিরই প্রায় অনুরূপ, কিন্তু তাহাদের একটা সংস্কারের বিশেষত্ব আছে। তাহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে এক সময়ে এক অজাগর সর্প বা গুেন অসংখ্য মনুষ্য ও পশুকে হত্যা করিতে আরম্ভ করে। অবশেষে এক অসম-সাহসী খাসী তাহাকে নানা কৌশলে হত্যা করে। তখন খাসীরা সেই সর্পকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া আহার করে। অসাবধানতাবশতঃ একটা ক্ষুদ্র মাংস খণ্ড অভুক্ত ছিল। সেই খণ্ড হইতে আবার অসংখ্য ‘গুেনের’ জন্ম হইল। এক একটি ‘গুেন’ এক একটি পরিবার মধ্যে আশ্রয় লইল। খাসীদিগের বিশ্বাস যে নরবলির দ্বারা এই সকল বাস্তু ‘গুেন’কে দস্তুষ্ট করিতে পারিলে গৃহস্থের শৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। এই সংস্কারের ফলে তাহারা যে কত ভীষণ নরহত্যা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ কাল তাহারা অনেকেই সভ্য শাস্ত্র হইতেছে। খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ তাহাদের মধ্যে অনেককেই খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। শ্রীতঃ।

শিষ্যসমিতির দানপ্রাপ্তি।

| | | | |
|----------------------------|-------|-----------------------|--------|
| পূর্বের ভের | ৯২।।০ | শ্রীমতী মণিকুমলা রায় | ২। |
| শ্রীযুক্ত সুকুমার পাকড়াশী | ১। | ” সৌদামিনী রায় | ১। |
| শ্রীমতী কিরণশশী দেবী | ১। | ” পুষ্পবিহারিণী দাসী | ১। |
| জনৈক ভদ্রমহিলা | ২০। | ” হরিপ্রিয়া মিত্রা | ১। |
| মিসেস এন, চৌধুরী | ২। | ” ইন্দিরাকুমারী রায় | ১। |
| শ্রীমতী প্রতিভাময়ী রায় | ১। | | |
| | | | ১৩৫।।০ |

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কাস্টিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মাল্লা দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীমতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



দেশের উন্নতি

যে দেশে
 উন্নতি
 ক'রে

দেশের উন্নতি

দেশের উন্নতি

শ্রীমতী বালিনী প্রকাশন সংস্থা, কলকাতা, ভারত

ভারতী

৩৪শ বর্ষ]

ফাল্গুন, ১৩১৭

[১১শ সংখ্যা

কর্মযোগ ।

জগতে আনন্দযজ্ঞে তাঁর যে নিমন্ত্রণ আমরা আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছি তাকে আমাদের কেউ কেউ স্বীকার করতে চাচ্ছে না। তারা বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা করে দেখেছে। তারা বিশ্বের সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটন করে এমন একটা জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে যেখানে সমস্তই কেবল নিয়ম। তারা বলছে ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে—দেখচি, যা কিছু সব নিয়মেই চলছে এব মধ্য আনন্দ কোথায়? তারা আমাদের উৎসবের আনন্দরব শুনে দূরে বসে মনে মনে হাসছে।

সূর্য্যচক্র এমনি ঠিক নিয়মে উঠছে অস্ত যাচ্ছে যে, মনে হচ্ছে তারা যেন ভয়ে চলছে পাছে এক পল-বিপলেরও ক্রটি ঘটে। বাতাসকে বাইরে থেকে যতই স্বাধীন বলে মনে হয় যারা ভিতরকার খবর রাখে তারা জানে ওর মধ্যেও পাগলামি কিছুই নেই—সমস্তই নিয়মে বাঁধা। এমন কি, পৃথিবীতে সব চেয়ে খামখেয়ালি বলে যাকে মনে হয়, সেই মৃত্যু, যার আনাগোনার কোনো খবর পাইনে বলে যাকে হঠাৎ ঘবের দরজার সামনে দেখে আমরা চম্কে উঠি তাকেও জোড় হাতে নিয়ম পালন করে চলতে হয় একটুও পদস্থলন হবার জো নেই।

মনে কোরো না এই গুট খবরটা কেবল বৈজ্ঞানিকের কাছেই ধরা পড়েছে। তপোবনের ঋষি বলেছেন—“ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে”—তাঁর ভয়ে, তাঁর নিয়মের অমোঘ শাসনে বাতাস বইছে; বাতাসও মুক্ত নয়—“ভীষাস্মাদগ্নিশ্চক্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ”—তাঁর নিয়মের অমোঘ শাসনে কেবল যে অগ্নি চক্রসূর্য্য চলছে তা নয়, স্বয়ং মৃত্যু, যে কেবল বন্ধন কাটবার জগ্গেই আছে, যার নিজের কোনো বন্ধন আছে বলে মনেও হয় না সেও অমোঘ নিয়মকে একান্ত ভয়ে পালন করে চলছে।

তবে ত দেখ্চি ভয়েই সমস্ত চলছে কোথাও একটু ফাঁক নেই। তবে আর আনন্দের কথাটা কেন? যেখানে কারখানা ঘরে আগাগোড়া কল চলছে সেখানে কোনো পাগল আনন্দের দরবার করতে যায় না।

বাঁশিতে তবু ত আজ আনন্দের সুর উঠেছে এ কথা ত কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। মানুষকে ত মানুষ এমন করে ডাকে, বলে চল্ ভাই আনন্দ করবি চল্? এই নিয়মের রাজ্যে এমন কথাটা তাঁর মুখ দিয়ে বের হয় কেন?

সে দেখতে পাচ্ছে, নিয়মের কঠিন দণ্ড

একেবারে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ; কিন্তু তাকে জড়িয়ে জড়িয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে যে লতাটি উঠেছে তাতে কি আমরা কোনো ফুল ফটতে দেখিনি ? দেখিনি কি কোথাও শ্রী এবং শান্তি, সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য ? দেখ্চিনে কি প্রাণের লীলা, গতির নৃত্য, বৈচিত্র্যের অজস্রতা ?

বিশ্বেব নিয়ম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকেই চরমরূপে প্রচার করচে না—একটি অনির্ক্সনায়ের পবিচয় তাকে চারিদিকে আচ্ছন্ন কবে প্রকাশ পাচ্ছে। সেই জন্তেই, যে উপনিষৎ একবার বলেছেন, অমোঘ শাসনের ভয়ে যা কিছু সমস্ত চলেছে, তিনিই আবার বলেছেন “আনন্দাক্ষৌব খন্নিমানি ভূতানি জায়ন্তে।” আনন্দ থেকেই এই যা-কিছু সমস্ত জন্মাচ্ছে। যিনি আনন্দস্বরূপ মুক্ত, তিনিই নিয়মের বন্ধনের মধ্য দিয়ে দেশকালে আপনাকে প্রকাশ করছেন।

কবির মুক্ত আনন্দ আপনাকে প্রকাশ করবার বেলায় ছন্দের বাধন মানে। কিন্তু যে লোকের নিজের মনেব মধ্যে ভাবের উদ্বোধন হয়নি, সে বলে, এর মধ্যে আগাগোড়া কেবল ছন্দের ব্যায়ামই দেখ্চি। সে নিয়ম দেখে, নৈপুণ্য দেখে, কেননা সেইটেই চোখে দেখা যায়—কিন্তু যাকে অন্তর দিয়ে দেখা যায় সেই রসকে সে বোঝে না—সে বলে রস কিছুই নেই সে মাথা নেড়ে বল্চে, সমস্তই যন্ত্র, কেবল বৈজ্ঞানিক নিয়ম।

কিন্তু ঐ যে কার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ এমন নিতান্ত সহজ সুরে বলে উঠেছে—
রসো বৈ সঃ। কবির কাব্যে তিনি যে অনন্ত রস দেখ্তে পাচ্ছেন। জগতের

নিয়ম ত তাঁর কাছে আপনার বন্ধনের রূপ দেখাচ্ছে না, তিনি যে একেবারে নিয়মের চরমকে দেখে আনন্দে বলে উঠেছেন—
“আনন্দাক্ষৌব খন্নিমানি ভূতানি জায়ন্তে।”
জগতে তিনি ভয়কে দেখ্চেন না, আনন্দকেই দেখ্চেন সেই জন্তেই বল্চেন “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন” ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি সর্বত্র জানতে পেরেছেন তিনি আর কিছুতেই ভয় পান না। এমনি কবে জগতে আনন্দকে দেখে প্রত্যক্ষ ভয়কে যিনি একেবারেই অস্বীকার করেছেন—তিনিই বলেছেন “মহদভয়ং বজ্রমুত্তমং য এতৎ বিহরমৃতাস্তে ভবন্তি” এই মহদভয়কে এই উত্তম বজ্রকে যাবা জানেন তাঁদের আব মৃত্যুভয় থাকে না।

যারা জেনেছে, ভয়ের মধ্য দিয়েই অভয়, নিয়মের মধ্য দিয়েই আনন্দ আপনাকে প্রকাশ করেন তারাই নিয়মকে পার হয়ে চলে গেছে। নিয়মের বন্ধন তাদের পক্ষে নেই যে তা নয় কিন্তু সে যে আনন্দেরই বন্ধন,—সে যে প্রেমিকের পক্ষে প্রিয়তমের ভূজবন্ধনের মত ; তাতে দুঃখ নেই, কোনো দুঃখ নেই। সকল বন্ধনই সে যে খুঁসি হয়ে গ্রহণ করে, কোনোটাকেই এড়াতে চায় না, কেননা সমস্ত বন্ধনের মধ্যেই সে যে আনন্দের নিবিড় স্পর্শ উপলব্ধি করতে থাকে। বস্তুত যেখানে নিয়ম নেই, যেখানে উচ্ছ্বাল উন্নততা, সেইখানেই তাকে বাধে, তাকে মারে, সেইখানেই অসীমের সঙ্গে বিচ্ছেদ, পাপের যন্ত্রণা। প্রবৃত্তির আঁকর্ষণে সত্যের সূদৃঢ় নিয়মবন্ধন থেকে যখন সে স্বাধীন হয়ে পড়ে তখন সে মাতার আলিঙ্গনক্রমে

শিশুর মত কেঁদে উঠে বলে “মা মা হিংসীঃ,” আমাকে আঘাত কোবোনা। সে বলে বাঁধো, আমাকে বাঁধো, তোমার নিয়মে আমাকে বাঁধো, অন্তবে বাঁধো, বাহিরে বাঁধো, আমাকে আচ্ছন্ন করে, আবৃত করে বেধে রাখো, কোথাও কিছু ফাঁক বেখোনা—শক্ত করে ধর, তোমারই নিয়মেব বাহুপাশে বাঁধা পড়ে তোমাব আনন্দের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকি—আমাকে পাপের মূহ্যবন্ধন থেকে টেনে নিয়ে তুমি দৃঢ় করে রক্ষা কর ।

নিয়মকে আনন্দের বিপরীত জ্ঞান ক’রে কেউ কেউ যেমন মাংলামিকেই আনন্দ বলে ভুল করে তেমনি আমাদের দেশে এমন লোক প্রায় দেখা যায় যারা কস্মকে মুক্তির বিপবীত বলে কল্পনা করেন। তাঁরা মনে কয়েন কস্ম পদার্থটা স্থূল, ওটা আত্মার পক্ষে বন্ধন ।

কিন্তু এই কথা মনে রাখতে হবে নিয়মেই যেমন আনন্দের প্রকাশ, কস্মেই তেমনি আত্মাব মুক্তি। আপনাব ভিতবেই আপনার প্রকাশ হতে পারে না বলেই আনন্দ বাহিবের নিয়মকে ইচ্ছা করে, তেমনি আপনার ভিতরেই আপনার মুক্তি হতে পারে না বলেই আত্মা মুক্তির জন্মে বাহিবের কস্মকে চায়। মানুষের আত্মা কস্মেই আপনার ভিতর থেকে আপনাকে মুক্ত কবচে, তাই যদি না হত তাহলে কখনই সে ইচ্ছা করে কস্ম করত না ।

মানুষ যতই কস্ম করচে ততই সে আপনার ভিতরকার অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলচে, ততই যে আপনার সুদূরবর্তী অনাগতকে এগিয়ে নিয়ে আসচে। এই উপায়ে মানুষ আপনাকে কেবলি স্পষ্ট করে

তুলচে—মানুষ আপনার নানা কস্মের মধ্যে রাষ্ট্রের মধ্যে সমাজের মধ্যে আপনাকেই নানাদিক থেকে দেখতে পাচে।

এই দেখতে পাওয়াই মুক্তি। অন্ধকার মুক্তি নয়, অস্পষ্টতা মুক্তি নয়। অস্পষ্টতার মত ভয়ঙ্কর বন্ধন নেই। অস্পষ্টতাকে ভেদ করে উঠবার জন্মেই বাঁজেব মধ্যে অন্ধুরের চেষ্টা, কঁড়ির মধ্যে ফুলেব চেষ্টা। অস্পষ্টতাব আবরণকে ভেদ করে সুপরিষ্কৃত হবার জন্মেই আমাদের চিত্তের ভিতরকার ভাববাণি বাইরে আকার গ্রহণের উপলক্ষ্য খুঁজে বেড়াচে। আমাদের আত্মাও অনির্দিষ্টতার কুহেলিকা থেকে আপনাকে মুক্ত কবে বাইরে আনবার জন্মেই কেবলি কস্ম সৃষ্টি করচে। যে কস্মে তার কোনো প্রয়োজনই নেই, যা তার জীবনযাত্রার পক্ষে আবশ্যিক নয় তাকেও কেবলি সে তৈবি করে তুলচে। কেননা সে মুক্তি চায়। সে আপনার অন্তঃস্খাদন থেকে মুক্তি চায়, সে আপনাব অরূপেব আবরণ থেকে মুক্তি চায়। সে আপনাকে দেবতে চায়, পেতে চায়। ঝোপঝাড় কেটে সে যখন বাগান তৈবি কবে তখন কুকপতার মধ্য থেকে সে যে সৌন্দর্য্যকে মুক্ত করে তোলে সে তার নিজেরই ভিতরকার সৌন্দর্য্য—বাইরে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে অন্তবেও সে মুক্তি পায় না। সমাজের যথেষ্টাচারেব মধ্যে সূনিয়ম স্থাপন করে অকল্যাণেব বাধার ভিতর থেকে যে কল্যাণকে সে মুক্তি দান করে, সে তারই নিজের ভিতরকার কল্যাণ—বাইরে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে অন্তরেও সে মুক্তিলাভ করেনা। এমনি করে মানুষ নিজের শক্তিকে, সৌন্দর্য্যকে, মঙ্গলকে, নিজের

আত্মাকে নানাবিধ কন্মের ভিতরে কেবলি বন্ধনযুক্ত করে দিচ্ছে। যতই তাই করচে, ততই আপনাকে মহৎ করে দেখতে পাচ্ছে— ততই তার আত্মপরিচয় বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

উপনিষৎ বলেছেন—“কুর্ক্নেবেহ কন্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ”—কন্ম করতে করতেই শত বংসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে। যারা আত্মার আনন্দকে প্রচুররূপে উপলব্ধি করেছেন এ হচ্ছে তাঁদেরই বাণী। যারা আত্মাকে পরিপূর্ণ করে জেনেছেন তাঁরা কোনোদিন দুর্ক্লম মুহমানভাবে বলেননা, জীবন দুঃখময় এবং কন্ম কেবলি বন্ধন। দুর্ক্লম স্কুল যেমন বোঁটাকে আলাগা করে ধরে এবং ফল ফলবার পূর্বেই খসে যায়—তাঁরা তেমন নন। জীবনকে তাঁরা খুব শক্ত কবে ধরেন এবং বলেন, আমি ফল না ফলিয়ে কিছতেই ছাড়চিনে। তাঁরা সংসারের মধ্যে কন্মের মধ্যে আনন্দে আপনাকে প্রবলভাবে প্রকাশ করবার জন্তে ইচ্ছা করেন। দুঃখ তাপ তাঁদের অবসন্ন করে না, নিজের হৃদয়ের ভারে তাঁরা ধূলিশায়ী হয়ে পড়েন না। সুখ দুঃখ সমস্তের মধ্য দিয়েই তাঁরা আত্মার মাহাত্মাকে উত্তরোত্তর উদ্ঘাটিত করে আপনাকে দেখে' এবং আপনাকে দেখিয়ে বিজয়ী বীরের মত সংসারের ভিতর দিয়ে মাথা তুলে চলে যান। বিশ্বজগতে যে শক্তির আনন্দ নিরন্তর ভাঙাগড়ার মধ্যে লীলা করচে—তারই নৃত্যের ছন্দ তাঁদের জীবনের লীলার সঙ্গে তালে তালে মিলে যেতে থাকে ;— তাঁদের জীবনের আনন্দের সঙ্গে সূর্যালোকের আনন্দ, মুক্ত সমীরণের আনন্দ সুর মিলিয়ে দিয়ে

অন্তরবাহিরকে সুধাময় করে তোলে। তাঁরাই বলেন “কুর্ক্নেবেহ কন্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ” কাজ করতে করতেই শত বংসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে।

মানুষের মধ্যে এই যে জীবনের আনন্দ, এই যে কন্মের আনন্দ আছে, এ অত্যন্ত সত্য। একথা বলতে পারব না এ আমাদের মোহ, একথা বলতে পারব না যে এ'কে ত্যাগ না করলে আমরা ধর্মসাধনার পথে প্রবেশ করতে পারব না। ধর্মসাধনার সঙ্গে মানুষের কন্মজগতের বিচ্ছেদ ঘটানো কখনই মঙ্গল নয়। বিশ্বমানবের নিরন্তর কন্মচেষ্টাকে তার ইতিহাসের বিরাট ক্ষেত্রে একবার সত্য-দৃষ্টিতে দেখ। যদি তা দেখ তাহলে কন্মকে কি কেবল দুঃখের রূপেই দেখা সম্ভব হবে? তাহলে আমরা দেখতে পাব কন্মের দুঃখকে মানুষ বহন করচে এ কথা তেমন সত্য নয় যেমন সত্য, কন্মই মানুষের বহু দুঃখ বহন করচে, বহু ভার লাঘব করচে; কন্মের শ্রোত প্রতিদিন আমাদের অনেক বিপদ ঠেলে ফেলচে অনেক বিকৃতি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ কথা সত্য নয় যে মানুষ দায় পড়ে কন্ম করচে,—তার একদিকে দায় আছে, আর একদিকে সুখও আছে; কন্ম একদিকে অভাবের তাড়নায়, আর এক দিকে স্বভাবের পরিতৃপ্তিতে। এই জন্তেই মানুষ যতই সত্যতার বিকাশ করচে ততই আপনার নূতন নূতন দায় কেবল বাড়িয়েই চলেছে, ততই নূতন নূতন কন্মকে সে ইচ্ছা করেই সৃষ্টি করচে। প্রকৃতি জোর করে আমাদের কতকগুলো কাজ করিয়ে সচেতন করে রেখেছে—নানা ক্ষুধাতৃষ্ণার তাড়নায় আমাদের যথেষ্ট খাটিয়ে

মারচে। কিন্তু আমাদের মনুষ্যত্বের তাতেও কুলিয়ে উঠলনা ;—পশু পক্ষীর সঙ্গে সমান হয়ে প্রকৃতির ক্ষেত্রে তাকে যে কাজ করতে হচ্ছে তাতেই সে চূপ করে থাকতে পারলে না,—কাজের ভিতর দিয়ে ইচ্ছা করেই সে সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে হয়। মানুষের মত কাজ কোনো জীবকে করতে হয় না। আপনার সমাজের মধ্যে একটি অতি বৃহৎ কাজের ক্ষেত্র তাকে নিজে তৈরি করতে হয়েছে ; এইখানে কতকাল থেকে সে কত ভাঙচ গড়চে, কত নিয়ম বাধ্চে কত নিয়ম ছিন্ন করে দিচ্ছে, কত পাথর কাট্চে কত পাথর গাঁথ্চে, কত ভাব্চে কত খুঁজ্চে কত কাঁদ্চে ; এই ক্ষেত্রেই তার সকলের চেয়ে বড় বড় লড়াই লড়াই হয়ে গেছে ; এইখানেই সে নব নব জীবন লাভ করেছে, এইখানেই তার মৃত্যু পরম গৌরবময় ; এইখানে সে দুঃখকে এড়াতে চায়নি নূতন নূতন দুঃখকে স্বীকার করেছে ; এইখানেই মানুষ সেই মহত্ত্বটি আবিষ্কার করেছে যে, উপস্থিত যা তার চারদিকেই আছে সেই পিঞ্জরটার মধ্যেই মানুষ সম্পূর্ণ নয়, মানুষ আপনার বস্তুমানের চেয়ে অনেক বড়, এই জন্তে কোনো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে তার আরাম হতে পারে কিন্তু তার চরিতার্থতা তাতে একেবারে বিনষ্ট হয়—সেই মহতী বিনষ্টিকে মানুষ সহ্য করতে পারে না—এই জন্তেই, তার বর্তমানকে ভেদ করে বড় হবার জন্তেই, এখনো সে যা হয়ে ওঠেনি তাই হতে পারবার জন্তেই, মানুষকে কেবলি বারবার দুঃখ পেতে হচ্ছে ; সেই দুঃখের মধ্যেই মানুষের গৌরব ; এই কথা মনে রেখে মানুষ আপনার কর্মক্ষেত্রকে

সঙ্কুচিত করে নি ; কেবলি তাকে প্রসারিত কবেই চলেছে ; অনেক সময় এতদূর পর্যন্ত গিয়ে পড়্চে যে, কর্মের সার্থকতাকে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে, কর্মের স্রোতে বাহিত আবর্জনার দ্বারা প্রতিহত হয়ে মানবচিন্তা এক একটা কেন্দ্রের চারদিকে ভয়ঙ্কর আবর্ত রচনা করচে, স্বার্থের আবর্ত, সাম্রাজ্যের আবর্ত, ক্ষমতাভিমানের আবর্ত ; কিন্তু তবু যতক্ষণ গতিবেগ আছে ততক্ষণ ভয় নেই, সঙ্কীর্ণতার বাধা সেই গতির মুখে ক্রমশই কেটে যায়, কাজের বেগই কাজের ভুলকে সংশোধন করে ; কারণ চিন্তা অচল জড়তার মধ্যে নিদ্রিত হয়ে পড়লেই তার শক্তি প্রবল হয়ে ওঠে, বিনাশের সঙ্গে আর সে লড়াই করে উঠতে পারে না। বেঁচে থেকে কর্ম করতে হবে, কর্ম করে বেঁচে থাকতে হবে এই অনুশাসন আমরা শুনেছি। কর্ম করা এবং বাচা, এই দুয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে।

প্রাণের লক্ষণই হচ্ছে এই, যে, আপনার ভিতরটাতেই তার আপনার সীমা নেই ; তাকে বাইরে আসতেই হবে। তার সত্য অন্তরে এবং বাহিরের যোগে। দেহকে বেঁচে থাকতে হয় বলেই বাইরের আলো, বাইরের বাতাস, বাইরের অম্লজলের সঙ্গে তাকে নানা যোগ রাখতে হয়। শুধু প্রাণশক্তিকে নেবার জন্তে নয় তাকে দান করবার জন্তেও বাইরেকে দরকার। এই দেখনা কেন, শরীরকে ত নিজের ভিতরের কাজ যথেষ্টই করতে হয় ; এক নিমেষও তার ছুঁপিও থেমে থাকে না, তার মস্তিষ্ক তার পাকঘরের কাজের অস্ত নেই। তবু দেহটা নিজের ভিতরকার এই অসংখ্য প্রাণের

কাজ করেও স্থির থাকতে পাবে না। তার প্রাণই তাকে বাইরের নানা কাজে এবং নানা খেলায় ছুটয়ে বেড়ায়। কেবলমাত্র ভিতরের রক্ত চলাচলেই তার তৃষ্টি নেই, নানা প্রকারে বাইরের চলাচলে তার আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।

আমাদের চিন্তেরও সেই দশা। কেবলমাত্র আপনার ভিতরের কল্পনা ভাবনা নিয়ে তার চলে না। বাইরের বিষয়কে সর্বদাই তার চাই—কেবল নিজের চেতনাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্তে নয়, নিজেকে প্রয়োগ করবার জন্তে—দেবাব জন্তে এবং নেবার জন্তে।

আমল কথা, যিনি সত্যরূপ, সেই ব্রহ্মকে ভাগ করতে গেলেই আমরা বাঁচিনে। তাঁকে অন্তরেও যেমন আশ্রয় কবতে হবে বাইবেও তেমনি আশ্রয় করতে হবে। তাঁকে যদিকে ত্যাগ করব সেইদিকে নিজেকেই বঞ্চিত করব। নাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোং—ব্রহ্ম আমাকে ত্যাগ করেননি, আমি যেন ব্রহ্মকে ত্যাগ না করি। তিনি আমাকে বাহিরে ধরে রেখেছেন তিনি আমাকে অন্তরেও জাগিয়ে রেখেছেন। আমরা যদি এমন কথা বলি যে, তাঁকে কেবল অন্তরের ধ্যানে পাব বাইবেব কস্ম থেকে তাঁকে বাদ দেব, কেবল হৃদয়ের প্রেমের দ্বারা তাঁকে ভোগ করব বাইবেব সেবার দ্বারা তাঁর পূজা করব না—কিছু একেবারে এর উণ্টো কথাটাই বলি, এবং এই বলে জীবনের সাধনাকে যদি কেবল একদিকেই ভাবগ্রস্ত কবে তুলি তাহলে প্রমত্ত হয়ে আমাদের পতন ঘটবে।

আমরা পশ্চিম মহাদেশে দেখছি সেখানে

মানুষের চিত্ত প্রধানত বাহিরেই আপনাকে বিকীর্ণ করতে বসেছে। শক্তির ক্ষেত্রই তার ক্ষেত্র। ব্যাপ্তির রাজ্যেই সে এফান্ত খুঁকে পড়েছে, মানুষের অন্তরের মধ্যে যেখানে সমাপ্তির রাজ্য, সে জায়গাটাকে সে পরিত্যাগ করবার চেষ্টায় আছে, তাকে সে ভাল করে বিশ্বাসই করেনা। এতদূর পর্যন্ত গেছে যে সমাপ্তির পূর্ণতাকে সে কোনো জায়গাতেই দেখতে পায় না। যেমন বিজ্ঞান বলতে বিশ্বজগৎ কেবল পরিণতির অন্তহীন পথে চলেছে তেমনি যুরোপ আজকাল বলতে আবস্ত কবেছে, জগতের ঈশ্বরও ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠছেন। তিনি যে নিজে হয়ে আছেন এ তারা মানতে চায় না, তিনি নিজেকে করে তুলছেন এই তাদের কথা।

ব্রহ্মেব এক দিকে ব্যাপ্তি আর একদিকে সমাপ্তি; একদিকে পরিণতি, আর একদিকে পরিপূর্ণতা; একদিকে ভাব আর একদিকে প্রকাশ—তুই একসঙ্গে, গান এবং গান গাওয়ার মত অবিচ্ছিন্ন মিলিয়ে আছে এটা তারা দেখতে পাচ্ছে না। এ যেন গায়কের অন্তঃকরণকে স্বীকার না করে বলা, যে, গান কোন জায়গাতেই নেই কেবলমাত্র গেয়ে যাওয়াই আছে। কেননা, আমরা যে গেয়ে যাওয়াটাকেই দেখছি, কোনো সময়েইত সম্পূর্ণ গানটাকে একদঙ্গে দেখচিনে—কিছু তাই বলে কি এটা জানিনে যে সম্পূর্ণ গান চিন্তের মধ্যে আছে?

এমনি করে কেবলমাত্র করে যাওয়া চলে যাওয়ার দিকটাতেই চিত্তকে খুঁকে পড়তে দেওয়াতে পাশ্চাত্যজগতে আমরা

একটা শক্তির উন্নততা দেখতে পাই। তারা সমস্তকেই জোর করে কেড়ে নেবে, আঁকড়ে ধরবে এই পণ করে বসে আছে— তারা কেবলই করবে, কোথাও এসে থামবে না, এই তাদের জিদ—জীবনের কোনো জায়গাতেই তাবা মৃত্যুর সহজ স্থানটিকে স্বীকার কবে না—সমাপ্তিকে তাবা সুন্দর বলে দেখতে জানেনা।

আমাদের দেশে ঠিক এর উল্টো দিকে বিপদ। আমরা চিন্তেব ভিতবের দিকটাতেই বাঁকে পড়েছি। শক্তির দিককে ব্যাপ্তিব দিককে আমরা গাল দিয়ে পরিত্যাগ কবতে চাই। ব্রহ্মকে ধ্যানের মধ্যে কেবল পরিসমাপ্তির দিক দিয়েই দেখব তাঁকে বিশ্বব্যাপারে নিত্য পবিগতির দিক দিয়ে দেখব না এই আমাদের পণ। এইজন্য আমাদের দেশে সাধকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্নততার দুর্গতি প্রায়ই দেখতে পাই। আমাদের বিশ্বাস কোনো নিয়মকে মানে না, আমাদের কল্পনাব কিছুতেই বাধা নেই, আমাদের আচারকে কোনোপ্রকার বৃত্তির কাছে কিছুমাত্র জবাবদিহি করতে হয় না। আমাদের জ্ঞান বিশ্বপদার্থ থেকে ব্রহ্মকে অবচ্ছিন্ন কবে দেখবার ব্যর্থ প্রয়াস করতে কবতে শুকিয়ে পাথর হয়ে যায়, আমাদের হৃদয় কেবলমাত্র আপনার হৃদয়াবেগের মধ্যেই ভগবানকে অবরুদ্ধ করে ভোগ করবার চেষ্টায় রসোন্মত্ততায় মুছিত হয়ে পড়তে থাকে। শক্তির ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান বিশ্ব-নিয়মের সঙ্গে কোনো কাববার রাখতে চায় না, স্থানু হয়ে বসে আপনাকেই আপনি নিরাক্ষণ করতে চায়, আমাদের হৃদয়াবেগ বিশ্বসেবার

মধ্যে ভগবৎপ্রেমকে আচার দান করতে চায় না, কেবল অশ্রদ্ধে আপনাব অগ্নে ধুলোয় লুটাপুট করতে ইচ্ছা করে। এতে যে আমাদের মনুষ্যত্বের কতদূব বিকৃতি ও দুর্বলতা ঘটে তা ওজন করে দেখবার কোনো উপায়ও আমাদের ত্রিসোমানায় রাখিনি— আমাদের সে দাড়িপাল্লা অন্তর বাহিরের সমস্ত সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলেছে, তাই দিয়েই আমরা আমাদের ধর্মকর্ম ইতিহাস পূর্বাণ সমাজ সভ্যতা সমস্তকে ওজন কবে নিশ্চিত হয়ে থাকি, আব কোনো প্রকার ওজনের সঙ্গে মিলিয়ে নিখুঁতভাবে সত্য নির্ণয় করবার কোনো দরকারই দেখিনে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অন্তর বাহিরের বোঙ্গে অপ্রমত্ত। সত্যেব একদিকে নিয়ম, একদিকে আনন্দ। তাব একদিকে ধ্বনিত হচ্ছে ভয়াদশ্রাণিস্তপতি, আর একদিকে ধ্বনিত হচ্ছে আনন্দান্দোব খল্লিনানি ভূতান জায়ন্তে। একদিকে বন্ধনকে না মানলে অত্ৰদিকে মুক্তি পাবার জো নেই। ব্রহ্ম একদিকে আপনাব সত্যেব দ্বাবা বন্ধ, আর একদিকে আপনার আনন্দেব দ্বারা মুক্ত। আনবাও সত্যের বন্ধনকে যখন সম্পূর্ণ স্বীকার করি তখন মুক্তিব আনন্দকে সম্পূর্ণ লাভ করি।

সে কেমনতর? যেমন সেতারে তার বাঁধা। সেতারেব তার যখন একেবারে ঠিক সত্য করে বাঁধা হয়, সেই বন্ধনে স্বব-তন্ত্রের নিয়মেব যখন লেশমাত্র অগ্নন না হয় তখন সেই তারে গান বাজে, এবং সেই গানের সুরের মধ্যেই সেতারের তার আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে যায়, সে মুক্তি লাভ করতে থাকে। একদিকে সে নিয়মের

মধ্যে অবিচলিতভাবে বাঁধা পড়েছে বলেই অগ্ৰদিকে সে সঙ্গীতের মধ্যে উদারভাবে উন্মুক্ত হতে পেরেছে। যতক্ষণ এই তার ঠিক সত্য হয়ে বাঁধা হয়নি ততক্ষণ সে কেবল-মাত্রই বন্ধন, বন্ধন ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তাই বলে এই তার খুলে ফেলাকেই মুক্তি বলে না—সাধনার কঠিন নিয়মে ক্রমশই তাকে সত্যে বেঁধে তুলতে পারলেই সে বন্ধ থেকে এবং বন্ধ থাকতেই পবিত্র সার্থকতার মধ্যে মুক্তিলাভ করে।

আমাদের জীবনের বীণাতেও কন্ঠের সক্র মোটা তারগুলি ততক্ষণ কেবলমাত্র বন্ধন যতক্ষণ তাদের সত্যের নিয়মে ক্রম করে না বেঁধে তুলতে পারি। কিন্তু তাই বলে এই তারগুলিকে খুলে ফেলে দিয়ে শূন্যতার মধ্যে ব্যর্থতার মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা লাভকে মুক্তিলাভ বলে না।

তাই বস্তুহীন, কন্ঠকে ত্যাগ করা নয় কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের কন্ঠকেই চিরদিনের সুরে ক্রমশ বেঁধে তোলবার সাধনাই হচ্ছে সত্যের সাধনা, ধর্মের সাধনা। এই সাধনারই মন্ত্র হচ্ছে—যদ্বৎকন্ঠ প্রকুবীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ—যে যে কন্ঠ করবে সমস্তই ব্রহ্মকে সমর্পণ করবে—অর্থাৎ সমস্ত কন্ঠের দ্বারা আত্মা আপনাকে ব্রহ্মে নিবেদন করতে থাকবে—অনন্তের কাছে নিত্য এই নিবেদন করাই আত্মার গান, এই হচ্ছে আত্মার মুক্তি। তখন কি আনন্দ যখন সকল কন্ঠই ব্রহ্মের সঙ্গে যোগের পথ, কন্ঠ যখন আমাদের নিজের প্রবৃত্তির কাছেই ফিরে ফিরে না আসে—কন্ঠে যখন আমাদের আত্মসমর্পণ প্রতিদিন একান্ত হয়ে ওঠে—

সেই পূর্ণতা, সেই মুক্তি, সেই স্বর্গ,—তখন সংসারই ত আনন্দনিকেতন।

কন্ঠের মধ্যে মানুষের এই যে বিরাট আত্ম-প্রকাশ, অনন্তের কাছে তার এই যে নিরন্তর আত্মনিবেদন, ঘরের কোণে বসে একে কে অবজ্ঞা করতে চায়, সমস্ত মানুষে মিলে বৌদ্ধে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কালে কালে মানব মাহাত্ম্যের যে অল্পভেদী মন্দির রচনা করতে কে মনে করে সেই স্মৃষ্টিব্যাপার থেকে স্মৃষ্টি পালিয়ে গিয়ে নিভৃত বসে আপনার মনে কোনো একটা ভাববসন্তোগই মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলন, এবং সেই সাধনাই ধর্মের চরম সাধনা। ওরে উদাসীন, ওরে আপনার মাদকতার বিভোর বিহ্বল সন্তানী, এখন শুনতে কি পাচ্চনা, ইতিহাসের স্মৃষ্টিপ্রসারিত ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রশস্ত রাজপথে মানবাত্মা চলেছে, চলেছে মেঘমল্লগর্জনে আপনার কন্ঠের বিজয় রথে—চলেছে, বিশ্বের মধ্যে আপনার অধিকারকে বিস্তীর্ণ করতে। তার সেই আকাশে আন্দোলিত জয়পতাকার সম্মুখে পর্ষতেব প্রস্তররাশি বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে; বনজঙ্গলেব ঘনছায়াচ্ছন্ন জটিল চক্রান্ত সূর্যালোকের আঘাতে কুহেলিকার মত তার সম্মুখে দেখতে দেখতে কোথায় অন্তর্ধান করছে; অস্থখ অস্থাস্থা অব্যবস্থা পদে পদে পিছিয়ে গিয়ে প্রতিদিন তাকে স্থান ছেড়ে দিচ্ছে; অজ্ঞতার বাধাকে সে পরাভূত করছে, অন্ধতার অন্ধকারকে সে বিদীর্ণ কবে ফেলছে—তার চারদিকে দেখতে দেখতে শ্রীমদ্ভদ্র কাব্যকলা জ্ঞানধর্মের আনন্দলোক উদ্ঘাটিত হয়ে যাচ্ছে। বিপুল ইতিহাসের দুর্গম দুর্ভাগ্য পথে মানবাত্মার এই যে বিজয় রথ অহোরাত্র

পৃথিবীকে কম্পান্বিত করে চলেছে তুমি কি অসাড় হয়ে চোখ বুজে বলতে চাও তাব কেউ সাবধী নেই? তাকে কেউ কোনো মহৎ সার্থকতার দিকে চালনা করে নিষে যাচ্ছেনা? এটখানেই, এই মহৎ সুখতঃখ বিপৎসম্পদের পথেই কি রথীৱ সঙ্গে সারথীৱ যথার্থ মিলন ঘটেছে না? রথ চলেছে, শ্রাবণেব অমারাত্রির তুর্যোগও সেই সারথীৱ অনিমেষ নেত্রকে আচ্ছন্ন করতে পারবে না—মধ্যাহ্নতুর্যেব প্রথব আলোকেও তাঁৱ ঙ্গবদৃষ্টি প্রতিহত হচ্ছে না:—আলোকে অন্ধকারে চলেছে বথ, আলোকে অন্ধকারে মিলন বথীৱ সঙ্গে সেই সাবধীৱ—চলতে চলতে মিলন, পথের মধ্যে মিলন, উঠবাব সময় মিলন, নাৱবার সময় মিলন, রথীৱ সঙ্গে সারথীৱ । ওরে কে সেই নিতা মিলনকে অগ্রাহ্য করতে চায়: তিনি যেখানে চালাতে চান কে সেখানে চলতে চায় না! কে বলতে চায় আমি মানুষেব ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে সূদূরে পালিয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে একলা পড়ে থেকে তাঁৱ সঙ্গে মিলব । কে বলতে চায় এই সমস্তই মিথ্যে, এই বৃহৎ সংসার, এই নিতাবিকাশমান মানুষেব সভ্যতা, অন্তরবাহিরেব সমস্ত বাধাকে ভেদ করে আপনাব সকল প্রকাব শক্তিকে জয়যুক্ত করবার জন্তে মানুষেব এই চিরদিনেব চেষ্টা, এই পরমহুঃখের এবং পরমসুখের সাধনা । যে লোক এ সমস্তকেই মিথ্যে বলে কত বড় মিথ্যে তাঁৱ চিত্তকে আক্রমণ করেছে! এত বড় বৃহৎ সংসারকে এত বড় ফাঁকি বলে যে মনে করে সে কি সত্যস্বরূপ ঙ্গধরকে সত্যই বিশ্বাস কবে! যে মনে করে পালিয়ে গিয়ে

তাঁকে পাওয়া যায় সে কবে তাঁকে পাবে, কোথায় তাঁকে পাবে, পালিয়ে কত দূরে সে যাবে, পালাতে পালাতে একেবারে শূন্যতার মধ্যে গিয়ে পৌছবে এমন সাধ্য তাঁৱ আছে কি! তা নয়—ভাব যে, পালাতে যে চায় সে কোথাও তাঁকে পায় না—সাহস কবে বলতে হবে এই যে তাঁকে পাচ্ছি, এই যে এখনি, এই যে এখানেই—বাব বার বলতে হবে আমার প্রত্যেক কর্মেব মধ্যে আমি যেমন আপনাকে পাচ্ছি তেমনি আমাব আপনাব মধ্যে যিনি আপনি তাঁকে পাচ্ছি; কর্মের মধ্যে আমাব যা কিছু বাধা, যা কিছু বেসুৱ; যা কিছু জড়তা, যা কিছু অব্যবস্থা সমস্তকেই আমাব শক্তির দ্বারা সাধনার দ্বারা দূর করে দিয়ে এই কথাটি অসঙ্কোচে বলবার অধিকারটি আমাদের লাভ করতে হবে যে, কর্মে আমাব আনন্দ, সেই আনন্দেই আমাব আনন্দময় বিরাজ করচেন ।

উপনিষদে “ব্রহ্মবিদাংৱবিষ্ঠ” ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাকে বলেচেন? আত্মক্রীড়া আত্ম-রতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাংৱবিষ্ঠঃ । পরমাত্মায় যাব আনন্দ পরমাত্মায় যাব ক্রীড়া এবং যিনি ক্রিয়াবান্ তিনিই ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । আনন্দ আছে অথচ সেই আনন্দেব ক্রীড়া নেই এ কখনো হতেই পারে না—সেই ক্রীড়া নিষ্ক্রিয় নয়—সেই ক্রীড়াই হচ্ছে কর্ম । ব্রহ্মে যাব আনন্দ, তিনি কর্ম না হলে বাঁচবেন কি কবে? কারণ, তাঁকে এমন কর্ম করতেই হবে যে কর্মে সেই ব্রহ্মেব আনন্দ আকার ধারণ কবে বাহিরে প্রকাশমান হয়ে ওঠে । এই জন্ত যিনি ব্রহ্মবিৎ, অর্থাৎ জানে যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি আত্মরতিঃ, পরমাত্মাতেই তাঁৱ আনন্দ, এবং তিনি আত্মক্রীড়াঃ, তাঁৱ

সকল কাজই হচ্ছে পরমাশ্রম মধ্য ; তাঁর খেলা, তাঁর স্নান আহার, তাঁর জীবিকা অর্জন, তাঁর পরহিত সাধন সমস্তই হচ্ছে পরমাশ্রম মধ্য তাঁর বিহার, তিনি “ক্রিয়াবান,” ব্রহ্মের যে আনন্দ তিনি ভোগ করেন তাকে কর্মে প্রকাশ না কবে তিনি থাকতে পারেন না। কবিব আনন্দ কাব্যে, শিল্পীব আনন্দ শিল্পে, বীরের আনন্দ শক্তির প্রতিষ্ঠায়, জ্ঞানীর আনন্দ তত্ত্বাবিকায়ে যেমন আপনাকে কেবলি কর্ম আকাবে প্রকাশ করতে যাচ্ছে ব্রহ্মবিদেব আনন্দ তেমনি জীবনে ছোটবড় সকল কাজেই, সত্যের দ্বারা সৌন্দর্যের দ্বারা শৃঙ্খলাব দ্বারা মঙ্গলের দ্বারা অসীমকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

ব্রহ্মও ত আপনাব আনন্দকে তেমনি করেই প্রকাশ করছেন—তিনি “বহুধাশক্তি যোগাৎ বর্ণনেনে কান্নিহিতার্থো দধতি।” তিনি আপনার বহুধা শক্তিব যোগে নানা জাতির নানা অন্তর্নিহিত প্রয়োজন সাধন কবচেন। সেই অন্তর্নিহিত প্রয়োজন ত তিনি নিজেই। তাই তিনি আপনাকে নানা শক্তিব ধারায় কেবলি নানা আকাবে দান করছেন। কাজ করছেন, তিনি কাজ করছেন—নইলে আপনাকে তিনি দিতে পারবেন কি করে। তাঁর আনন্দ আপনাকে কেবলি উৎসর্গ করচে, সেই ত তাঁর সৃষ্টি।

আমাদেরও সার্থকতা ঐখানে—ঐখানেই ব্রহ্মের সঙ্গে মিল আছে। বহুধাশক্তি যোগে আমাদেরও আপনাকে কেবলি দান করতে হবে—বেদে তাঁকে “আত্মদা বলদা” বলেছে—তিনি যে কেবল আপনাকে দিচ্ছেন তা নয়, তিনি আমাদের সেই বল দিচ্ছেন যাতে করে

আমরাও তাঁর মত আপনাকে দিতে পারি। সেই জন্তে, বহুধা শক্তির যোগে যিনি আমাদের প্রয়োজন মেট'ছেন ঋষি তারই কাছে প্রার্থনা করছেন, মনো বুদ্ধা শুভয়া সংযুক্ত—তিনি যেন আমাদের সকলের চেয়ে বড় প্রয়োজনটা মেটান, আমাদের সঙ্গে শুভবুদ্ধিব যোগ সাধন কবেন। অর্থাৎ শুধু এ হলে চলবেনা যে, তাঁর শক্তিবযোগে তিনি কেবল আপনি কর্ম করে আমাদের অভাব মোচন করবেন, আমাদের শুভবুদ্ধি দিন তাহলে আমরাও তাঁর সঙ্গে মিলে কাজ করতে দাঁড়াব তাহলেই তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ সম্পূর্ণ হবে। শুভ বুদ্ধি হচ্ছে সেই বুদ্ধি যাতে সকলের সার্থকে আমারই নিহিতার্থ বলে জানি, সেই বুদ্ধি যাতে সকলের কর্মে আপন বহুধা শক্তি প্রয়োগ করাতেই আমার আনন্দ। এই শুভ-বুদ্ধিতে যখন আমরা কাজ করি তখন আমাদের কর্ম নিয়মবদ্ধ কর্ম কিন্তু যন্ত্রচালিতের কর্ম নয়,—আম্মার তৃপ্তিকর কর্ম কিন্তু অভাব-তাড়িতের কর্ম নয়,—তখন আমাদের কর্ম দেশের অন্ধ অনুকরণ নয়, লোকাচারের ভীক অন্তর্ভুক্ত নয়। তখন, যেমন আমরা দেখচি “বিচৈতি চাস্তে বিখমাদৌ” বিশ্বের সমস্ত কর্ম তাঁতেই আরম্ভ হচ্ছে এবং তাঁতেই এসে সমাপ্ত হচ্ছে তেমনি দেখতে পাব আমার সমস্ত কর্মের আরম্ভে তিনি এবং পরিণামেও তিনি, তাই আমার সকল কর্মই শান্তিময় কল্যাণময় আনন্দময়।

উপনিষৎ বলেন তাঁর “স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ” তাঁর জ্ঞান, শক্তি এবং কর্ম স্বাভাবিক। তাঁর পরমাশক্তি আপন স্বভাবেই

কাজ করচে—আনন্দই তাঁর কাজ, কাজই তাঁর আনন্দ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য ক্রিয়াই তাঁর আনন্দেব গতি।

কিন্তু সেই স্বাভাবিকতা আমাদের জন্মায় নি বলেই কাজের সঙ্গে আনন্দকে আমরা ভাগ করে ফেলেছি। কাজের দিন আমাদের আনন্দের দিন নয়; আনন্দ করতে যেদিন চাই সেদিন আমাদের ছুটি নিতে হয়। কেন না হতভাগ্য আমরা, কাজেব ভিতরেই আমরা ছুটি পাইনে। প্রবাহিত হওয়ার মধ্যেই নদী ছুটি পায়, শিথাক্রমে জলে ওঠার মধ্যেই আগুন ছুটি পায়, বাতাসে বিস্তারিত হওয়ার মধ্যেই ফুলের গন্ধ ছুটি পায়—আপনার সমস্ত কর্মের মধ্যেই আমরা তেমন করে ছুটি পাইনে। কর্মের মধ্য দিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিইনে বলে, দান করিনে বলে কর্ম আমাদের চেপে রাখে। কিন্তু, হে আত্মদা, বিশ্বের কর্মে তোমার আনন্দমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করে কর্মের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা আগুনেব মত তোমার দিকেই জ্বলে উঠুক, নদীর মত তোমার অভিমুখেই প্রবাহিত হোক, ফুলের গন্ধের মত তোমার মধ্যেই বিস্তারিত হতে থাকুক। জীবনকে তার সমস্ত সুখঃখ, সমস্ত ক্ষয় পূরণ, সমস্ত উত্থান পতনের মধ্য দিয়েও পরিপূর্ণ কবে ভালবাসতে পারি এমন বীৰ্য্য তুমি আমাদের মধ্যে দাও। তোমার এই বিধকে পূর্ণশক্তিতে দেখি, পূর্ণশক্তিতে গুনি, পূর্ণশক্তিকে এখানে কাজ করি। জীবনে সুখ নেই বলে, হে জীবিতেশ্বর, তোমাকে অপবাদ দেব না। যে জীবন তুমি আমাকে দিয়েছ এই জীবনে পরিপূর্ণ করে আমি বাঁচব, বীরের মত একে আমি গ্রহণ করব

এবং দান করব এই তোমাব কাছে প্রার্থনা। দুর্বল চিত্তের সেই কল্পনাকে একেবারে দূর করে দিই যে কল্পনা সমস্ত কর্ম থেকে বিযুক্ত একটা আধারহীন আকারহীন বাস্তবতাহীন পদার্থকে ব্রহ্মানন্দ বলে মনে করে। কর্মক্ষেত্রে মধ্যাহ্ন সূর্যালোকে তোমার আনন্দরূপকে প্রকাশমান দেখে হাতে ঘাটে মাঠে বাজারে সর্বত্র যেন তোমার জয়ধ্বনি কবতে পারি। মাঠের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমে কঠিন মাটি ভেঙে যেখানে চাষা চাষ করচে সেইখানেই তোমার আনন্দ শ্রামল শস্ত্রে উচ্ছসিত হয়ে উঠে; যেখানেই জলাজঙ্গল গর্ভগাড়াকে সরিয়ে ফেলে মানুষ আপনার বাসভূমিকে পরিচ্ছন্ন করে তুলে সেইখানেই পারিপাট্যের মধ্যে তোমার আনন্দ প্রকাশিত হয়ে পড়ে; যেখানে স্বদেশের অভাব দূর করবাব জন্তে মানুষ অশ্রান্ত কর্মের মধ্যে আপনাকে অজস্র দান করচে সেইখানেই শ্রীসম্পদে তোমার আনন্দ বিস্তারিত হয়ে যাচ্ছে। যেখানে মানুষের জীবনের আনন্দ চিত্তেব আনন্দ কেবলি কর্মে রূপ ধারণ করতে চেষ্টা করচে, সেখানে সে মহৎ, সেখানে সে প্রভু, সেখানে সে দুঃখকষ্টের ভয়ে দুর্বল ক্রন্দনের সুরে নিজের অস্তিত্বকে কেবলি অভিগাপ দিচ্ছে না। যেখানেই জীবনে মানুষের আনন্দ নেই, কর্মে মানুষেব অনাস্থা সেইখানেই তোমার সৃষ্টিতত্ত্ব যেন বাধা পেয়ে প্রতিহত হয়ে যাচ্ছে, সেইখানেই নিখিলের প্রবেশদ্বার সঙ্কীর্ণ—সেইখানেই যত সঙ্কোচ, যত অন্ধ সংস্কার, যত অমূলক বিভীষিকা, যত আধিব্যাধি এবং পরস্পরবিচ্ছিন্নতা।

হে বিশ্বকর্মণ, আজ আমরা তোমার

সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই কথাটি জানাতে এসেছি, আমার এই সংসার আনন্দের, আমার এই জীবন আনন্দের। বেশ করেছ আমাকে ক্ষুধাতৃষ্ণার আঘাতে জাগিয়ে রেখেছ তোমার এই জগতে, তোমার এই বহুধা শক্তির অসীম লীলাক্ষেত্রে। বেশ করেছ তুমি আমাকে হুঃখ দিয়ে সম্মান দিয়েছ—বিশ্ব সংসারে অসংখ্য জীবের চিন্তে হুঃখ-তাপের দাহে যে অগ্নিময়ী পরমাসৃষ্টি চলচে বেশ করেছ আমাকে তার সঙ্গে যুক্ত করে গৌরবান্বিত করেছ! সেই সঙ্গে প্রার্থনা করতে এসেছি, আজ তোমার বিশ্বশক্তির প্রবলবেগ বসন্তের উদ্যম দক্ষিণ বাতাসের মত ছুটে চলে আসুক, মানবের বিশাল ইতিহাসের মহাক্ষেত্রের উপর দিয়ে ধেয়ে আসুক, নিয়ে আসুক তার নানা ফুলের গন্ধকে, নানা বনের মর্ম্মবধ্বনিকে বহন করে—আমাদের দেশের এই শব্দহীন প্রাণহীন শুষ্কপ্রায় চিত্ত-অরণ্যের সমস্ত শাখাপল্লবকে ছলিয়ে কাঁপিয়ে মুখরিত করে দিক্—আমাদের অন্তরের নিদ্রোখিত শাক্ত ফুলে ফলে কিশলয়ে অপৰ্য্যাপ্তরূপে সার্থক হবার জন্তে কেঁদে উঠুক! দেখতে দেখতে

শতসহস্র কস্মচেষ্ঠার মধ্যে আমাদের দেশের ব্রহ্মোপাসনা আকার ধারণ করে তোমার অসীমতার অভিমুখে বাহুতুলে আপনাকে একবার দিগ্বিদিকে ঘোষণা করুক। মোহের আবরণকে উদ্বাটন কর, উদাসীনতার নিদ্রাকে অপসারিত কবে দাও—এখন এই মুহূর্ত্তে অনন্ত দেশেকালে ধাবমান বৃর্ণমান চিরচাক্ষুর মধ্যে তোমার নিত্যবিলাসিত আনন্দরূপকে দেখে নিই, তারপরে সমস্ত জীবন দিয়ে তোমাকে প্রণাম করে সংসারে মানবাত্ম্যাব সৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করি, যেখানে নানা দিক্ থেকে নানা অভাবের প্রার্থনা, হুঃখেব ক্রন্দন, মিলনের আকাঙ্ক্ষা এবং সৌন্দর্যের নিমন্ত্রণ আমাকে আহ্বান করচে, যেখানে আমাব নানাভিমুখী শক্তির একমাত্র সার্থকতা সুদীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষা করে বসে আছে এবং যেখানে বিশ্বমানবের মহাযজ্ঞে আনন্দের হোমহুতাশনে আমার জীবনের সমস্ত সুখহুঃখ লাভক্ষতিকে পুণ্য আহুতির মত সমর্পণ করে দেবার জন্তে আমার অন্তরের মধ্যে কোন্ তপস্বিনী মহানিশ্চয়মণের দ্বার খুঁজে বেড়াচ্ছে।

শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেবশক্তি ।

জলিয়া উঠেছে অগ্নি ধরি ধীর বেশ,
জগতের তমোরাশি করিবারে শেষ,
তিরোহিত করিবারে সর্ব্বহুঃখ ভয়
জীবনের সর্ব্বগ্লানি নিখ্যা সমুদয়
করিতে নিঃশেষ,—যাহে মানব জীবন
অন্ধকারে মোহ ঘোরে থাকে অচেতন।
সর্ব্বগ্রাসী বিশ্বনাশি অগ্নি মহাবীর
প্রজ্বলিত করি শিখা হইল বাহির :—

বিগুহ-মঙ্গল-মুর্তি, নাশি পাপ ভাব,
বিনাশিয়া জগতের গূঢ় অন্ধকার,
সাধিয়া মঙ্গল, তবে হইল নির্যাগ,
দিব্য রথে শৃণু পথে করিল প্রয়াগ।
সেথা হতে শান্তিধারে হয়ে বরষণ
সুন্দর শ্রামল করি তুলিবে ভুবন।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী।

পোষ্যপুত্র।

৩৮

গ্রামাকান্তের প্রথম পত্রের উত্তর যে রজনীনাথ তেমন নিঃস্বভাবে দিয়াছিলেন, তাহার একটা গোপন রহস্য ছিল।

শান্তির প্রতি অবিচার দণ্ড প্রদান করিবার পব যখন অন্তঃস্বপ্ন চিত্ত বেদনার কষা পুনঃ পুন আঘাত করিয়া বলিল ‘মুঢ়, তুমি নিতান্তই মুঢ়, ধিক্ তোমার বিদ্বাবুদ্ধি জানে। এই বুদ্ধিতে তুমি নিরীহ মকেল ঠকাইয়া থাকো।’ তখন ইহাও স্মরণ হইল যে হেমেন্দ্র কোথায় গিয়াছে সে সন্ধান বাহিব করিবারও কোন উপায় রাখা হয় নাই। সেদিন তাহাদেব সঙ্গে কোন লোকও দেন নাই—যে তাহারা কলিকাতা ত্যাগ করিল, কিম্বা কলিকাতার ভিতরেই রহিল, অস্তিত্বঃ এইটুকুও জানা যাইবে। ছিঃ ছিঃ, একি আত্মবিস্মৃতি! একি বিচারের ভানে পূর্ণ অবিচারকে আশ্রয় করা! শান্তির সেই জলসিক্ত পদ্মপাপড়ির মত সজল চোখ দুটি বেদনার্বিক্ষত বক্ষে রাত্রি দিন কাটার মতন বিধিতে লাগিল।

অনুসন্ধানের পথ নাই, কাহারও নিকট বালতে আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে, বসুমতী অসুস্থতার দোহাই দিয়া শয্যাশ্রয় করিয়াছেন তাহার নিকটেই বা সাহুনা কোথায়? গুরুভার চিত্ত কর্মশ্রোতে ভাসাইয়া দিন কাটিতে-ছিল বটে কিন্তু বিদ্রোহী রাত্রি যেন কিছুতেই আর পোহাইতে চাহিত না। নিঃশব্দে নিরানন্দে সময় নিজের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সুকু এখন অনেকটা বড় হইয়াছিল, সে

এখন লোকের সুখদুঃখ অনেকটা অনুভব করিতে পারে, দিদি হঠাৎ আসিয়া অসুস্থ্যান হইয়া যাইবার পর হইতেই যে পিতার মনে কষ্ট আশ্রয় লইয়াছে তাহা সে প্রায় সর্বদাই তাহার মুখের ভাবে বুঝিতে পারত। ওবু দিদির সম্বন্ধে অদম্য কোতূহল ও আগ্রহ সত্ত্বেও পিতাকে কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিত না। কিন্তু এবার দিদি স্বপ্নরবাড়ি গিয়ে তাহার চারখানা চিঠির একখানাও জবাব দিলে না কেন? এপ্রশ্ন সে বসুমতীকে দিনের মধ্যে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়া বলিত, দিদি কি যেন হচ্ছে। ‘দিদি আশ্রয় বোধ হয় ভুলে গ্যাছে!’ বালিয়া অভিমান করত; আবার মধ্যে মধ্যে ‘মা আম দাদির কাছে যাব, আমার পাঠিয়ে দাওনা’ এই আকার ধারণা কাঁদিয়া রাগিয়া মাঝে আশ্রয় করিয়া তুলিত।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও রজনীনাথ আজ ঘর হইতে বাহির হন নাই। চাকর তাহাকে একখানা ডাকের চিঠি আনিয়া দিল। চিঠিখানা লইয়া ডাকের ছাপ ও হাতের লেখার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই চকিত ভাবে রজনীনাথ বলিয়া উঠিলেন ‘চৌধুরী মশায়ের চিঠি—’ ক্ষিপ্রহস্তে খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, মানসিক উদ্বেগে থর থর করিয়া হাত কাঁপিতে ছিল। কোন সংবাদ আছে নাকি? তারা কি তবে সেখানে? পত্রপড়া শেষ হইলে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কাগজ-খানার উপরেই দৃষ্টি স্থির করিয়া নত মুখে রহিলেন। তবে তাহারা ফিরিয়া আইসে

নাই! তবু খপর তো পাওয়া গেল, ফরাসডাঙ্গা কি এমন মস্ত সহর সেখানে তাদের সন্ধান—মিলিবে না? সুপ্রকাশ আসিয়া উৎফুল্ল চক্ষে তাঁহার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রজনীনাথ কিছু পবে সাগ্রহ আনন্দে পুত্রকে বুকে টানিয়া লইয়া হঠাৎ অজস্র চুষনে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন, সুসংবাদের আনন্দ চাপিয়া রাখা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। সুকুও বুঝিয়াছিল এ আদরটা ঠিক তাহার জন্ত নহে এর মধ্যে তাহার দিদির প্রাপ্যই অধিকাংশ। জিজ্ঞাসা করিল “বাবা দিদি ভাল আছে?” রজনীনাথ চিঠিখানা আবার একবার পড়িতে পড়িতে উত্তর দিলেন “ভাল আছে।” “দিদি কি আর আসবেনা বাবা?” পিতা শিহরিয়া উঠিলেন বুকের মধ্যে চলন্ত রক্তশ্রোত সহসা একটা বাধা প্রাপ্ত হইয়া থমকিয়া গেল, কিন্তু তখনি জোর করিয়া মনকে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, —আমি কাল তোরেই তাকে আনতে যাবো।’ সুপ্রকাশ আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল “আর আমি?” “তুমি তোমার মার কাছে থাকবে, দিদির জন্তে নতুন নতুন জিনিষ সব তৈরি করে রাখবে, দিদি এসে বলবে সুকু যেন বাঙ্গলার বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন্ হয়েচে।” গৌরবে বালকের ললাট ও নেত্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

একটা শিল্পকাৰ্য্য লইয়া বসুমতী অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোর কাছে বুকিয়া পড়িয়া নিবিষ্টচিত্তে সেলাই করিতেছিলেন, কিন্তু কাজ কিছুই অগ্রসর হইল না। আজকাল আঙ্গুরের মধ্যে সূঁচ বিঁধিয়া যায়, চোখের ভিতর কর-কর করে, এমনি নানা রকম বাধার আজ

কাল শিল্পকুশলা বসুমতীর সকল কাৰ্য্যই অসমাপ্ত পড়িয়া থাকে, তথাপি সময় কাটাইবার একটা অবলম্বন তো চাই।

সবে মাত্র একটা ভুল করিয়া মনটা উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় বাহিরে ছপ দাপ শব্দ সুপ্রকাশের আগমন বার্তা ঘোষণা করিল। রজনীনাথেরও সাড়া পাইয়া বসুমতী হঠাৎ কাজের উপর অত্যন্ত মনঃসংযোগ করিয়া ফেলিলেন। সুকু ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিল “মা মা, বাবা কাল সকালবেলাই দিদিকে আনতে যাবেন” সেলাইটা বসুমতীর হাত হইতে ভূমে পড়িয়া গেল, বিজ্ঞানসঞ্চালিতের মতন স্বামীর পানে ফিরিলেন। রজনীনাথ ধীরকণ্ঠে কহিলেন “আমি কাল ফরাসডাঙ্গায় যাবো।” “ফরাসডাঙ্গা! কেন, সেখানে—” “হ্যাঁ সেখানে তাবা আছে খপর পেয়েছি।”

দাসীকে ডাকিয়া বসুমতী হরিরলুটের বন্দোবস্ত করিতে আদেশ দিলেন। ফরাসডাঙ্গায় গিয়া একজন ধনী মক্কেলের সাহায্যে তাহাদের অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু হেমেন্দ্রের বাসার সন্ধান কেহই আনিতে পারিল না। কাজে কাজেই রজনীনাথতে সে রাত্রি সেইখানেই থাকিতে হইল।

পরদিনও অনুসন্ধান ব্যর্থ হইল। ডাকঘরেও খপর লওয়া হইল, হেমেন্দ্র চৌধুরীকে কেহই চেনে না। হতাশ হইয়া রজনীনাথ ফিরিয়া চলিলেন। কলিকাতা ফিরিয়া যোগেশের সন্ধান লক্ষ্মীপুরে যাইবেন স্থির করিলেন। ষ্টেশনে পৌঁছিয়া প্রবেশ পথের সম্মুখেই দেখিলেন যোগেশের বাহু অবলম্বনে প্রবেশ করিতেছে হেমেন্দ্র। অভাবনীয় সাক্ষাৎ! প্রথমটা দুইজনেই হতবুদ্ধি হইয়া গেল,

এবং রজনীনাথও বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে সৰ্ব্বপ্রথমেই প্রহ্লাৎপন্নমতিশ্বে যোগেশ আপনাকে সামলাইয়া লইয়া চুইহস্তে রজনীনাথের পদধূলী মাথায় গ্রহণ করিয়া নিতান্ত সরলভাবে জিজ্ঞাসা কবিল “এখানে এসেছিলেন, কাজ ছিল?” হেম যোগেশের আড়ালে আপনাকে একটুখানি ঢাকিয়া অল্পদূরেই দাঁড়াইয়া বহিল, সন্মুখেও আসিল না প্রণাম পর্য্যন্ত করিল না। রজনীনাথ উত্তর করিলেন “হ্যাঁ কাজেই এসেছি, তবে সে কাজ এখনও আমার বাকি রয়েছে, যোগেশ! শান্তিব কাছে আমায় নিয়ে চলো, আমি বাড়ির সন্ধান করতে না পেয়ে ফিরছিলুম।” যোগেশ হেমেন্দ্রের দিকে চকিত কটাক্ষনিষ্কপ করিল, দেখিল তাহার মুখ ঈর্ষার বিদেষে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, কি একটা বলিবার জন্ম অপর কম্পিত হইতেছিল। উদ্ভিতে যোগেশ তাহাকে নিবৃত্ত কবিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল “বেশতো আসুন না, আপনি না এলে আমিই বোধ হয় কাল আপনাব ওখানে যেতুম।—দাঁড়ান্ একটা গাড়ি ঠিক করি”—যোগেশ গাড়ি ডাকিতে একটু অগ্রসর হইয়া গেল, তাহার অনুসরণ করিয়া হেমেন্দ্র বিরক্তির স্বরে বলিল “যোগেশ তোমার মতলবটা কি? ওকে কেন তুমি নিয়ে যেতে রাজি হলে? কি তেজ দেখেচ? আমাকে দৃকপাতও নেই, যেন দেখতেই পেলেন না! মনে করেছেন মেয়ে নিয়ে যাবেন, দিচ্ছি তাই নিয়ে যেতে!” যোগেশ মুহূর্ত্তের বাধা দিল “খামো না, লোকটাকে চটিয়ে কি হবে? দেখনা! সহজেই কাজ সারা যাবে এখন, তবে আমার ওপোর যদি নির্ভর করো তো তুমি একটিও কথা

করোনা, আর যদি পারতো ভাল ব্যবহারই করো।”

হেম যোগেশের ক্রীড়াপুতুলিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে তাহাকে মেমন গড়িতেছে শিব বা বানব সে নির্বিবাদে তাহা চুইতেই প্রস্তুত আছে। সে সন্মত হইল। গাড়ি আসিলে প্রথমেই রজনীনাথ উঠিয়া বসিলেন, হেমের দিকে না চাহিয়াই বলিলেন “এনা যোগেশ।” যোগেশের উদ্ভিতে হেম সন্মুখে আসিয়া প্রণাম করিল। যোগেশ ও হেম গাড়িতে উঠিলে মুমূর্ষপ্রায় অশ্বদ্বয় চাবুকাঘাতে জর্জরিত হইয়া মন্দগতিতে চলিতে আরম্ভ কবিল।

পথ অনেকটা দীর্ঘ, অশ্বের গতি অত্যন্ত মৃদু, সন্ময় লাগিল অনেক। পথেব মধ্যে যোগেশ বলিল; “আপনার কাছে যাবো বলছিলুম এইজন্মে যে বোঠাকরণের মাথাটা যেন দিন দিন খারাপ হুয়ে যাচ্ছে তাই ছোটবাবু বড় ভয় পেয়েছেন। এই আজই তিনিই আমায় বলছিলেন আমি হঠাৎ রাগেব মাথায় বড়ই গর্হিত কাজ করে ফেলেছি, এখন কি করবো ভেবে পাচ্ছি না, কেমন করেই বা ওঁদের কাছে মুখ দেখাই, তাছাড়া তোমার বোঠাকরণেরও যে কি হুয়েচে সে কিছুতেই লক্ষ্মীপুরে বা কলকাতায় যেতে চায় না। জোর কবে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে বলে ট্রেনের তলায় পড়ে মরবো, তুমি কিছু উপায় করো। তা দেখুন এর আর আমি কি করবো? আমার সামান্য বুদ্ধিতে মনে হোল এই যে আপনাকে আমি গিয়ে সব বলি। আপনি যখন নিজেই এসেছেন তখন আর কথাই কি? আমরা নিশ্চিত হলাম আপনি তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে যান।”

রজনীনাথ ভালমন্দ কোন কথাই বলিলেন না, কিন্তু মনের মধ্যে হঠাৎ যে বেআঁচাতের জালা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, গাঙ্গুর্যোর চেষ্টার মধ্য দিয়াও তাগা মুখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। যোগেশ পুনশ্চ একটা সুগভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিল “নিশ্চয়ই মাথা ধারাপ হয়ে গ্যাছে, তা নৈলে আব অমন বুদ্ধি কি এমনি ভয়েই বদলে যায়? কর্তার নামও শুনতে পাবেন না, আপনার কাছে যাবাব কথা শুনলেও;—তা ওসব কথায় কাজ নেই আর, আপনাকে দেখলে হয়ত আবার মন ফিরতেও পারে। আমি কত বোঝালুম তা বল্লেন কি,—আমি মনে কবি আমার কেউ নেই, এখন বুঝতে পেরেচি স্বামীই জগতে শুধু আপনার, কেউ আপনার নয়,—কারকে চাই না।”

রজনীনাথের আশ্বস্বরণ করা শুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছিল, তথাপি একটা সন্দেহ, একটা আশা—কিন্তু লাভ কি? যোগেশের এত মিথ্যা বলিয়া লাভ কি? লাভ থাকিলে অনেক লোকে মিথ্যাকে কি রকম সাজাইয়া তুলিতে পারে সে কথা রজনীনাথ ভালই জানিতেন, কিন্তু একি অহেতুক মিথ্যা নয়? কষাঘাতে জর্জরিত অথ একটা গলির সম্মুখে থামিলে তেমনি আশ্বজর্জরিতচিত্তে রজনীনাথ যখন সেই প্রদর্শিত গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সঙ্গীদ্বয়ের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন আবার তাঁহার হৃদয় অমুতাপ পূর্ণ বেদনায় আলোড়িত হইয়া উঠিল। নিশ্চয়ই তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কেননা এইখানে সে বাস করিতেছে আর

সেই ব্যবহার পাইবার পর! কিন্তু হায়! বুথা তাহাকে দোষী করিতেছেন। সম্মুখেই হেমেন্দ্রের বাড়ী, যোগেশ দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইল, রজনীনাথকে একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া যোগেশের ইঙ্গিতে হেম কহিল “আসুন”। যোগেশ কহিল “হাঁ, আসুন আপনার কথা শুনলে তাঁর মন ফিরতেও পারে।”

রজনীনাথ কিছুই বলিলেন না, বলিবার শক্তিও বোধ হয় অল্পই ছিল, আবার দারুণ সন্দেহ ও আশঙ্কা জাগিয়া উঠিয়া হৃদয়কে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছিল। সত্যই কি তবে সে এতখানি ভুল বুঝিয়াছে! পিতার একান্ত বিশ্বাস ও স্নেহও কি সেই দণ্ডের মধ্যে সে প্রকটিত দেখিতে পায় নাই? সে কি জানেনা কি কষ্টই এতদিন ধরিয়া তিনি ভোগ করিতেছেন? কই সে বুঝিয়াছে? এতদিন একখানা পত্রও কি সে কোন রকমে লিখিতে পারিত না? হায়! বৃকেব রক্ত দিয়া গড়া তাঁহার শাস্তি। উত্তেজনায় মাথায় ও মুখে গরম রক্ত কাঁ কাঁ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে হেমেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া, কহিল সে দেখা করতে চায় না,—বলে—“রজনীনাথ উত্তত আঘাতের হস্ত হইতে আশ্ববক্ষা করিবারই জন্ত যেন দুই পদ পিছাইয়া গিয়া আর্ন্তকণ্ঠে বাধা দিয়া উঠিলেন “থামো আমি শুনতে চাই না সে কি বলে, নিজে একবার”—“তীক্ষ্ণ শ্লেষের মূহু হাসি হাসিয়া হেমেন্দ্র বলিল “তবু শুনুন কি বলে। সে বলে কুকুর শেয়ালের মত তো রাতহুটোর সময় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন, তাতেও কি সাধ মেটে নি, আর কেন? একবার চলুন দেখা কর্কেন,

আমার কোন আপত্তি নেই—”নমরনিপুণ সেনাপতি যেমন তাঁহার দৃঢ় বর্ষা ছাদিত বক্ষে সহসা একটা জলন্ত গাণার আঘাত পাঠিলে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও অক্ষয় বেদনাত্রস্ত হইয়া উঠে সেইরূপ আশাহতভাবে রজনীনাথ দ্রুতপদে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যোগেশও তাঁহার অনুসরণ করিল। হেমেশ্বরকে আসিতে ইঙ্গিত করিলেও সে গেল না। নিকটে গিয়া যোগেশ তাঁহার ভূতাত্ত্বের মত বিকৃত মুখে দিকে চাহিয়া একটু যেন চমকিয়া উঠিল একটু যেন অশ্রুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু স্বাভাবিক স্বার্থপরতা করুণাকে সর্বদা পবাক্ষয় করিয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও অশ্রুরের জয় হইল। হেমেশ্বর স্বস্তুরের সহিত মলিত হইলে মোকর্দ্দমাটা বাধে না, তাহা না বাধিলেও যোগেশ যে তাহার ভাঙ্গা বাড়ি মেবামত কবিয়া দ্বিতল গৃহ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে তাহা অসমাপ্তই থাকিয়া যায়, সেজবধূর কোমবেব বিছা ও ডায়মণ্ডকাটা তাবিজ পবার সাধও অপূর্ণ থাকে। যোগেশ শ্রামাকাণ্ডের জায় রজনীনাথকেও তাহার স্বার্থদিক্কার কল প্রস্তুতের লোভে সঙ্গে আসিয়াছিল। আসিয়া কুণ্ঠিতভাবে কহিল— “আমার মাপ কববেন,—নিজে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা কবলেই ভাল হতে না, হেম যদি ঠিক না বুঝতে পাবে থাকে। তা ছাড়া যদি অভিমান কবেই কিছু বলে থাকেন, আপনারই ত সন্তান—” রজনীনাথ দাঁড়াইলেন, তাঁহার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল “আমার সন্তান? না আমার সন্তান হলে আমার অপমান করে কিরিয়ে দিতে পারত না, এ আমি কাকে খুঁজতে কোথায় এসে পড়েছিলাম। আমার

সন্তান কাকে বলচো যোগেশ! যে আমার চেনে না সে আমার সন্তান? না”।

রজনীনাথ একরকম প্রায় ছুটিয়াই গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন, ডাকিয়া বলিলেন “ষ্টেশন চलो, হাঁকাও”। হতবুদ্ধি যোগেশ দাঁড়াইয়া রহিল, বুঝিল সবাই শ্রামাকাণ্ড নহে। হেমেশ্বর যখন সেই জনহীন প্রায় নিস্তরক বাড়ীতে প্রবেশ করিল, তাহার দুই চোখে যেন একটা আগুনবহু হুকা বাহিব হইতেছিল। তাহার ওষ্ঠে নিষ্ঠুর মুহু হাসি অত্যন্ত গোরবেব ভাবে ফুটিয়া উঠিয়া তাহার সুন্দর চেহারাথানাকে উপাখ্যানবর্ণিত দৈত্যের মতন ভয়ানক করিয়া তুলিয়াছিল। সেদিনকার অপমানের প্রতিশোধ সে যে অক্ষবে অক্ষরে মিলাইয়া লইতে পারিয়াছে তাহার জন্ত যোগেশকে ও নিজেকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল। স্বস্তুরের সম্মুখে মনটা এখনও সঙ্কুচিত হইয়া আইসে বটে কিন্তু তথাপি সে পৌরুষেব সাহায্যে সেই দুর্ভাগতার হাত হইতে আত্মবক্ষা করিতে পারিয়াছে।

পশ্চিম দিকের ছোট ঘরখানায় তন্ত্র-পোষের উপরে মলিন শস্যায় স্নান ছায়া থানির মতন শান্তি শয়ন করিয়া আছে। সন্ধ্যার পূর্বেই ঘর কনকনে হইয়া উঠিয়াছিল, দুএকদিন বোধ হয় মেঝের কাঁট পড়ে নাই। হেমেশ্বর দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বলিল “আমি মনে করছি একবার আজ কল্কাতা যাবো। কাঁহাতক আর এই বনের মধ্যে পড়ে থাকি। তোমার অস্থিত ত কমই আছে?” শান্তি দেওয়ালের দিক হইতে মুখ ফিরাইল “আমি? আমি ভালই আছি—বাইরে কে এলো?”

ও জুতোর শব্দ যে আমি চিনি,—উঠতে
গেলুম পারলুম না, কে এলো ?”

হেমেন্দ্র একটু চকিত একটু বিস্মিত
হইল, কিন্তু তখনি সামলাইয়া লইয়া উত্তর
দিল “ও একটি বাবু, ঐ রায়েদের বাড়ির” ।
শাস্তি ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদু স্বরে
আপনা-আপান করিল “বাবার মতন জুতোর
শব্দ কিন্তু—“হেমেন্দ্র মনে মনে আশ্চর্যানুভব
করিলেও প্রকাশে ব্যঙ্গ করিতে ছাড়িল না,
বিক্ষিপ্ত করিয়া বলিল “হ্যাঁগো হ্যাঁ, তোমার
বাবার ত তোমার জন্ত ঘুম হচ্ছে না । তুমিই
বাবা, বাবা করে মব, তাঁর ত ভারী মায়া !”
আহত ভাবে শাস্তি মাথা তুলিল “অমন কথা
বলোনা, তাঁর দোষ কি ? তিনি তো
বলেছেন জ্যোঠামশাই ক্ষমা করলেই তিনি
ক্ষমা করবেন, আমরা”—

হেম অধৈর্য্য হইয়া উঠিল—“থামো
থামো আমার লোকচার গুনবার সাবকাশ
নেই । আমি চল্লুম কালও হয়ত আসতে
পারব না, যা দরকার হয় ঝিকে দিয়ে
করিও, আমি একেবারে হাঁফিয়ে উঠেছি
আর পারছি না—”

হেমেন্দ্র গমনোত্ত হইল, শাস্তি ক্ষীণ
কাতর কণ্ঠে করিল “পারবার দরকার কি ?
আমার জ্যোঠামশায়ের কাছে দিয়ে এসোনা—”

হেমেন্দ্র উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, হাসিতে
হাসিতে বলিল “ক্ষেপেচ ।”

সেদিন সন্ধ্যার পর রজনীনাথ বাড়ি
পৌছিলে প্রথমেই সুপ্রকাশ গাড়ির কাছে
ছুটিয়া আসিল । “দিদি এলি ভাই ?”
গাড়ির মধ্য হইতে রজনীনাথ ধীরভাবে
বাহির হইয়া আসিলেন । গাড়ির ভিতরে

দিদির কোন চিহ্নই না পাইয়া বালক তাহার
গভীর আনন্দের মধ্যে অত্যন্ত আঘাত বোধ
করিল । বিশ্বয়বেদনারাবক্ষারত নেত্রে
পিতার পানে তাকাইয়া মৃদুবে জিজ্ঞাসা
করিল “বাবা, দাদ ?” রজনীনাথ কোন
উত্তর করিলেন না বা পুত্রের দিকে চাহিয়া
দেখিলেন না, একেবারে নিজের পাঠাগারে
প্রবেশ করিলেন । শ্রামাকাণ্ডের পত্রের উত্তর
লিখিয়া ভূতাকে তাহা ডাকে দিতে দিয়া যখন
অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন তখন রাত্রি দশটা
বাজিয়া গিয়াছে । স্বামী ফিরিয়া আসিয়াছেন
বহুমতী পূর্বেই জানিয়াছিলেন, শাস্তি যে
আহসে নাই তাহাও জানতে বা ক ছিল না,
ভয়ে ভাবনায় তান শুখাইয়া উঠিয়াছিলেন,
সুপ্রকাশ ঘুমাইয়া পাড়িয়াছিল ।

৩৯

যমুনার পোলের উপর হইতে মথুরাপুরীর
প্রাসাদমন্দিরময়ী সমৃদ্ধনগরী বড়ই
মনোরম দেখায় । সারি সারি উচ্চাচ
প্রাসাদমালা ও তাহার নীচে প্রশস্ত প্রস্তর
সোপান শ্রেণী অগ্রসর হইয়া যমুনার সুনীল
জলতলে নামিয়া গিয়াছে । প্রতি ঘাটেই
ঘাট আলো করিয়া অপূর্ব গৌরঙ্গী
ব্রজরমণীগণ স্নান করিতেছে, তাহাদের হাশ্বের
ঝঙ্কারে ও সৌন্দর্য্যের ছটার জড়প্রকৃতি যেন
সজীব হইয়া উঠিয়াছেন । নীরদ গাড়ীর
গবাক্ষ হইতে প্রীতপূর্ণনেত্রে চারিদিককার
দৃশ্য পরম আগ্রহের সহিত দেখিতেছিল ।
অনেকদিনের পর কোন আত্মীয়জনকে
দেখিতে পাইলে মনের মধ্যে যেমন একটা
অব্যক্ত আনন্দ জাগিয়া উঠিয়া নানা কথা,
নানা স্মৃতিকে চারিদিক হইতে টানিয়া

আনে তেমনিতর একটা স্মৃতিপূর্ণ আনন্দের ভাব তাহার চিত্তকে ইহাদের দিকেই টানিতে লাগিল। ক্রমে পোল ছাড়াইয়া হরিৎ শত্রু ও পুষ্পখচিত মাঠের মধ্য দিয়া কৃষক বালিকার স্কোভুক কালোচোখের সখুম দিয়া মুহম্মদ গমনে ট্রেনখানি যথাস্থানে আসিয়া থাকিল। সঙ্গে দ্রবসামগ্রীর মধ্যে একটিমাত্র ব্যাগ ও একখানা ছাতা, কাজেই কুণীদের কাঁক চারিদিক হইতে ঘেরিয়া ফেলিল না বটে তবে ঘেরিয়া ফেলিল পাগুবা। কি নাম? গোত্র কি? কোথায় নিবাস? বাসা স্থিৎ আছে কিনা? ইত্যাদি প্রশ্ন ও তাহাদের পরস্পরের শিকার পাকড়াইবার বিবানে যাত্রাকে এক মুহূর্তেই কণ্ঠাগত প্রাণ করিয়া তুলিল। নীরদ তার্খদর্শন করিতে আসেন নাই, আশ্রয় গৃহে আসিয়াছেন এই সামান্য কথাটা কোনমতেই যখন তাহাদের বুঝাইয়া নিতে পারিল না, তখন অসহায়ভাবে তাহাদের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়া বলিল ‘তবে আমার কোথায় যেতে হবে না হয় চলো তাই যাই।’ কিন্তু তাহাতেও মুক্ত পাইল না। সে কাহাব ভাগের সম্পত্তি তাহা স্থির না হইলে কেহই তো ছাড়িয়া দিবে না। ক্রমে রীতিমত সংগ্রাম বাধিয়া হাতাহাতির উপক্রম হইল, একজন নীরদের ডান হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল “চলুন বাবু আমি আপনার পাগু হলাম, রঘুঞ্জয় মিশ্র সাড়েসাত ভাই আমরা, আমরাই সকলেই প্রধান; আমার সঙ্গে চলুন” আর একজন তাহাকে ধাক্কা দিয়া তাহার অস্ত্র হস্ত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল, বলিল “কি মতলববাজ লোক

তুমি! এ বাবু আমার, এসো বাবু আমি তোমার ভাল বাড়ি দোব আমার সঙ্গে এসো।”

এইরূপে অনেকক্ষণ ধরিয়াই পণ্যদ্রব্যের মতন কাড়াকাড়ি টানাটানির পর নীরদ অবশেষে প্রথম পাগুর অংশভুক্ত স্থির হইলে বাকি সকলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য শিকারের সন্ধানে চলিয়া গেল। নীরদ মুক্তিব নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া ভাবিল, রক্তপিপাসু কুকুরগুলাই বা ইহাদের চেয়ে কি বেশি অত্যাচার করে!

গাড়িওয়ালারাও একবার এইরকম একটা অভিনয় করিবাব ইচ্ছার প্রস্তুত ছিল কিন্তু সে ‘গাড়ি চাহিনা’ বলিয়াই তাড়াতাড়ি তাহাদের সোমানা ছাড়াইয়া আসায় একটু ডাকাডাকি করিয়াই অগত্যা তাহারা ক্ষুর মনে নিবৃত্ত হইল। নীরদ ট্রেন পাব হইয়া সহরের দিকে গেল না, বিপরীত পথ ধরিল, দেখিয়া সঙ্গী পাগু কহিল “বাবু এই তোমার পাগু চাইনা, এক্ষুণি পথ ভুল করলে, ও রাস্তা নয় এই সববে ঢুকবার রাস্তা” নীরদ দাড়াইল, পকেট হইতে মনিব্যাগটি বাহির করিয়া তাহা হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া পাগুর হাতে দিয়া বলিল, “তোমার যা পাওনা তা দিলাম বাবু, তুমি ঘরে যাও, আমার সঙ্গে ঘুরতে তুমি পেবে উঠবে না।” পাগু বিস্মিত হইয়া নূতনধরণের লোকটাকে সন্দেহভাবে দেখিতে লাগিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল ঠাকুর দেখবেন না? নীরদ বলিল “তোমার কাজতো হয়ে গেল, তুমি কেন এইবার যাওনা।” পাগু ভাবিল এলোকটা নিশ্চয় খুশান! যাই হোক দুইটা টাকাতো দিয়াছে

অথচ পরিশ্রমও লাগিল না! সে আশীর্বাদ করিয়া ফিরিয়া গেল। নীরদ সম্মুখে লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

তিন দিকে অসীম প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে, একদিকে ষমুনা। মাঠের মধ্যে মধ্যে গম, সরিষা, ও ছোলা মটরের ক্ষেত অর্ধ পক শস্তে হরিভাভ হইয়া উঠিয়া মাতা বসুন্ধরার শ্রামাঙ্কলের মতন শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে কলাইসুঁটির প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছ বেগুনী রংয়ের উজ্জ্বল আভাষ ভায়োলেটের মতন ক্ষেত আলো করিয়া রহিয়াছে! কোথাও সর্ষে ফুলের নিকট মোমাছির দল মাতাল হইয়া ঘুরিতেছিল। মৃহ বাতাসে গাছের মাথা মুইয়া মুইয়া পড়িয়া একটা সর সর তর্ তর্ শব্দ উঠিতেছে, এবং তাহার সহিত মিশিয়া ষমুনার তার হইতে কোন একটি যুবকের স্মৃতি কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতের একটি চরণ ভাসিয়া আসিতেছিল। নীরদ সুধু এষ্টটুকু বুঝিতে পারিল “কैसे ষাউরে ষমুনা?” নীরদ মুন্ধনেত্রে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। পশ্চিমদিকে সোমান্ত রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত বাধাহীন মাঠের শেষ সূর্যাস্তেব বিপুল সৌন্দর্য্য তাহার চিত্তকে আকর্ষণ করিল। ভূমার সহিত ভূমির, ক্ষুদ্রের সহিত মহতেব এই যে অনাদি সম্বন্ধ-চিরসম্বন্ধ রহিয়াছে ইহা কি কোন একদিনের জন্মও ছেদিত হইতে পারে! রক্তবর্ণ কিরণছটা সহস্রবাহু বিস্তার করিয়া ধরণী বক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় চাহিতেছে; আকাশে পুঞ্জমেঘের শুভ্র স্তর তাহার গোলাপী আভাষ রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। নীরদ নিকটবর্তী একটা দেবদারু গাছের তলায়

বসিয়া দেখিতে লাগিল। আর অল্পক্ষণ পরেই সসীমের সহিত অসীমের মিলনে যে একট বাধা আছে অঙ্ককার সেটুকুও মুছিয়া দিবে। এই যে মিলনের জন্ম ব্যগ্র ব্যাকুলতা, এই যে দুই বাহু বাড়াইয়া কাতর আবাহন, অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণতার মধ্যে সমর্পণ পূর্বক সম্পূর্ণ হইবার যে একটা ঐকান্তিকতা ইহাদের তো ফল আছে? নীরদ নীরবে চাহিয়া রহিল। চারিদিকের সাড়াশব্দ ভূবিয়া আসিয়াছে। সঙ্গীতের মূর্ছনা, মধুকরের গুঞ্জন ও রাখাল সখার হাশ্ব পরিহাস খামিয়া এখন কেবল এক আবছিন্ন মহারাগিণীর অনন্ত অব্যক্ত সঙ্গীত জনহীন প্রান্তরে ও অঙ্ককার জগতে ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। নীরদ নক্ষত্র বিরল আকাশের পানে চাহিল। স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময় সেই অনন্ত আকাশ চিরপ্রশান্ত চিরউদামীন ভাবে সম্মেহ নেত্রপাতে জাগিয়া আছে। সূর্য্যের প্রতাপ কিরণ গ্রহ তারকার বিমল জ্যোতিঃ কিছুই তাহাকে পরিবর্তিত করিতে পারে না, কি মহান্ উদারতা কি অপূর্ব মাহিমা! নীরদ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, স্তব্ধ অঙ্ককারে ঝিল্লীর একতান বিশ্বতপোবনোচ্চারিত এক অনাদি ধ্বনির সহিতই নিশ্চিত হইয়া গিয়াছিল, শীত রাত্রির মুক্ত আকাশ ঘন কুয়াশার আবরণে ঢাকিয়া গিয়া ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে অঙ্ককার বিশ্বপ্রকৃতিকে যোগীন্দ্রের সমাধিমূর্তির মতনই স্থির ও প্রশান্ত দেখাইতেছিল।

নীরদ উঠিয়া দাঁড়াইল, কিসের লজ্জা কিসের সঙ্কোচ! এখনও এত অভিমান! আমিদের এতখানি অঙ্কার এখনও হৃদয়দ্বারের কপাট চাপিয়া গ্রহরা দিতেছে?

না—বিচ্ছিন্ন বিখণ্ডিত বিভক্ত যেমন এই একের মধ্যে মিশ্রণ এক অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড ও অবিভক্ত ভাবে পারণত হইয়া গেল তেমনি করিয়া লজ্জা সঙ্কোচ সব সেই এক কণ্ডবোর মধ্যে ডুবাইয়া ফেলিতে হইবে। অন্ধকারে কষ্টে পথ চিনিয়া সে সহরের দিকে ফিরিয়া চলিল।

সূর্য্য পৃথিবীকে ও গ্রহগণকে, আকর্ষণ করিতেছেন, সেই আকর্ষণেব বলে সূর্য্যের পানে তাহাদের অবিরাম গতি, আবার গ্রহগণেব দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া উপগ্রহ সকল তাহাদের চারদিকে ঘূর্ণিতেছে। এইরূপে কত কোটি সূর্য্য, কত গ্রহ, উপগ্রহকে অবিপ্রাপ্ত আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে বলিতে পারে। আবার সেই সমুদয় সৌরজগৎই যে কোন এক অতীন্দ্রিয় মহাশক্তির পাশ্বে ক্ষুদ্র নক্ষত্রবিন্দুরই মতন আকৃষ্ট হইয়া অহোরহঃ ভ্রমণ করিতেছে না তাহারই প্রমাণ কোথায়! আকর্ষণই সৃষ্টির ধর্ম্ম, তাই দৃষ্ট পদার্থমাত্রেরই আকর্ষণধর্ম্মী, পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণে আকৃষ্ট! নীরদ কল্পনানেত্রে দেখিতে লাগিল যমুনা-তীরের সেই ক্ষুদ্র বাতায়নটি। যমুনার জল স্থিবি হইয়া রহিয়াছে আকাশ আপ্রান্তনক্ষত্র খচিত, বাতাস গাছের পাতার মধ্য দিয়া থামিয়া থামিয়া বহিতেছিল, আর সেই স্তব্ধ নিজ্জনগৃহে দূরআকাশের দিকে অচঞ্চল নিনিমেষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া একজন একা বসিয়া। কোথাও কোন মনুষ্যের সাড়াশব্দ নাই, বিশ্রাম শয়নে সকলেই শান্তি উপভোগ করিতেছে, শান্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলকেই তাঁহার স্নেহাঞ্চলের ছায়ায় ঢাকিয়া

রাখিয়াছেন। শুধু সেই একা জাগিয়া! নীরদ নিজেও অজ্ঞাতে ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল, ওই যে ওটি নিদ্রাহীননেত্র তাহাদের স্নর্দীর্ঘ কৃষ্ণপল্লবের মধ্য হইতে যুগল তারকার মত রাত্রির পর রাত্রি অনিমেঘে চাঁহিয়া আছে, ওই যে হৃদয়খানি তাহার বাহিরের সকল ঝটিকা, সকল বহুনাদ উপেক্ষা করিয়া মৌন দৃঢ়তায় আপনাতে আপনি নিমগ্ন থাকিয়া সত্ত্বজাগ্রত রহিয়াছে, উহাদের মধ্যে কি একটা আকর্ষণশক্তি নিহত নাই?

জগতে কোন শক্তি ব্যর্থ যায় না, চুষক লোহাকে বুঝি এমনি করিয়াই টানিয়া আনে? গভীর রাত্রে বন্ধগৃহের দ্বার ঠোলয়া স্পন্দিত বক্ষে "রুদ্ধপ্রায় নীরদ ডাকিল "শিবানী! শীতের রাত্রে রুদ্ধদ্বার প্রতিবাসীগণ সকলেই নিদ্রামগ্ন, গলির মধ্যে অন্ধকার নিবিড় হইয়া জামিয়া রহিয়াছে, সম্মুখেই জল কল কল শব্দ কারয়া বাহিয়া চলিয়াছে, ঘুমস্তরাত্রে কেবলমাত্র পল্লার প্রান্তবর্তী কোন স্থান হইতে এসরাজী ও তবলার চাটির সঙ্গে একটা সঙ্গীতের সাড়া আসিতোছিল ও প্রমত্তকণ্ঠে 'হাহাঃ, অথবা 'হায় হায়' ইত্যাদি সঙ্গত শোনা যাইতেছে। নীরদের আহ্বান তাহারি বক্ষে কম্পিত হইয়া উঠিল, কেহই উত্তর দিল না। গৃহে কেহ বাস করিতেছে এমন কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না, কোথাও আলোকের রেখাটি পর্য্যস্ত নাই। হঠাৎ সে দেখিতে পাইল দ্বারে বাহির হইতেই তালা বন্ধ। নীরদের হৃদয় স্তম্ভিত বেদনায় নিশ্চল হইয়া পড়িল। অবশিষ্ট রাতটুকু—যে দ্বারে সে একদিন আশ্রয়হীন, নিরাশ্রয় ও রোগাক্রান্ত আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং সেই নিতান্ত

ছরদ্বৈর] সমস্ত যে তাহাকে নিজের কোলে
সাদরে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, আবার
একদিন যাহার অনুরোধ তিরস্কার ও মিনতি
উপেক্ষা করিয়া সে তাহার নিকট হইতে
নিজেকে নির্ক্ষিপিত করিয়াছিল সেই দ্বারে
বসিয়াই সে কাটাইল। যেটুকু সুখ সে
মাতৃহীন হইবার পর লাভ করিয়াছিল, তাহা
এইখানেই—সেকথা আজ সে অনুভব করিতে
পারিল। অভাগিনী যে তাহাকে তাহার
মর্কশই দিয়াছিল, আর সে তাহার মূল্য না
বুঝিয়া তাহাকে ধূল্য ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিল,
এতদিন পরে আবার সেই অনাদৃত দান
কুড়াইয়া লইতে আসিয়াছে, কি কই?
তাহার পশ্চাতে কি এই ক্ষুদ্র দ্বার চিবুক
হইয়া গিয়াছে?

ভোবের আলোক প্রকাশিত হইতে না
হইতে রাস্তায় লোক চলাবলা আরম্ভ হইয়া
গেল, ঠাকুরবাড়িতে নহবতে ভৈরবী
রাগিনী বাজিতে লাগিল, নারদ নিকটবর্তী
দোকানের সম্মুখাগ্রত ছোকরা দোকানীকে
সিক্কেখরীর বাটীর আধবাসীদের সংবাদ
জিজ্ঞাসা করিল। এ দোকানী নূতনলোক
নারদকে চিন্ত না, সে বাঙ্গালী বাবুকে
একজন ভাল খদ্দের মনে করিয়া খাতির
দেখাইয়া বলিল “আপনি ও বাড়ী
ভাড়া নেবেন? তা নেন না, কলি
ফিরিয়ে নিলেই সব দোষ কেটে যাবে এখন।
না হয় একটু বিলিতি ওষুধ ছড়িয়ে দিলেই
হবে।” নারদ তাহার কথার প্রকৃত ভাবার্থ
স্বদৃষ্টি করিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে
জিজ্ঞাসা করিল “কেন ও বাড়ির কি হয়েছে?
বাড়ীর লোকেরাই বা গেল কোথায়?”

দোকানী গম্ভীর হইয়া বলিল “আর সে
কি কথা বলবো বাবু! ঐ সে দিন পেলেগ
হয়ে বাড়িতে ছজন মারা গেল না! আহা
মেরোট নয় যেন সাফাৎ রাধিকা ঠাকুরগ
একখানি খানপরা—তাতেই যেন রূপ ফেটে
পড়চে—”

নারদ আর দাঁড়াইল না।”

বন্ধন কাটিয়া আসিতেছে! শিবানী
নাই, পাষণ্ডব নিষ্ঠুর অত্যাচার বক্ষে লইয়া
নারবে জীবনের জংঘতাব বহন করিয়া সে
সকল যন্ত্রণার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে!
বার্থ জীবনের মর্ম্মছেদি তুষ। আজ তাহার
প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের কানায় কানায় ভরিয়া
নাই। অনাহত সেই প্রেমমালা যাহা সে
ছিঁড়িয়া মাটিতে ছড়াইয়া দিয়াছিল, সেই
স্মরণি হার আজ যাহার কণ্ঠ হইতে কোনদিন
স্থলিত হইবার আশঙ্কা নাই তাহার
বক্ষে লুপ্তিত! অনাদৃত ও অনাদৃত
উভয়কেই তিনি তাহার অমৃত বক্ষে তুলিয়া
লইয়া সাদরে স্থান দিয়াছেন!

নারদ আজ মুক্ত! যে বন্ধনের ব্যথা
বন্ধন ছাড়াইয়া গিয়াও তাহাকে মুহুর্তেও জঘ
ছাড়ে নাই, আবার যে বন্ধনের মধ্যে
আসিতে হইবে মনে করিয়া লজ্জা ক্ষোভ ও
ভাবনায় তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া থামিয়া
গিয়া তাহাকে পৌরুষহীন জড়ে পারবর্তিত
করিয়া ফেলিতে প্রায় সক্ষম হইয়া আসিয়াছিল
সে আজ স্বয়ংই যখন তাহার বন্ধনরজ্জু
কাটিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে শুনি তখন নারদ,
—কই মনে করিতে ত পারিল না যে সে আজ
ভাগ্যবান, সে আজ মুক্ত! মুক্ত! এরি নাম
মুক্তি? সে কি ইহাই চাহিতেছিল?

সে অনাহারে অনিদ্রায় যেমনি আসিয়াছিল তেমনি ফিরিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে হিম কুহেলিকার আঁশ সমস্ত নগরী তাহার চকের নশ্বুর হইতে অদৃশ্য হইয়া দূবে মিলাটয়া গেল। বাস্পঘন প্রচুর ধূমোদ্গারণের সহিত উচ্চ চৌৎকার করিত করিত দূব হইতে দূরান্তরে ছুটিয়া চলিল। দুই পাশে গরি, নদা দেবালয় গ্রাম ও সুবিষ্ণুর্গ নাঠ বায়স্কোপের বিচিত্র চিত্রের মতন একটার পর একটা দেখা দিয়া আবার অদৃশ্য হইয়া যাইতেছিল। কত পুণ্যতনৈব স্মৃত, কত নূতন অধাবসায়, কত সুখহঃখ, হাসি কান্নার সম্মিলিত রূপ ইহাদের মধ্যে মিশ্রিত, কতদিনের কত কথাই ইহাদের সহিত আবর্জিত রহিয়াছে। নীরদ অশ্লকনেত্রে চাহিয়া রাহল। চলন্ত গাড়ির সহিত দৃশ্য সমুদয়ও চলিতেছে, চঞ্চল চিত্রের ভিতরেও সহস্র স্মৃত ওতপ্রোত ভাবে উঠিত পড়িতেছিল, তাহার জীবনের গাতও এই রকম মুহূর্মুহুঃ পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছিল না কি? বেদনায় বুকের ভিতর হৈ হৈ করিয়া উঠিতেছে, মাথার মধ্যে কিম্বিকিম্বি করিতেছিল, হাত পায়ের তলা শীতল ও বলহীন হইয়া আসিতেছিল। হায়! কোন দিনই কি সে শান্তির মুখ দেখিতে পাইবে না? অভিষপ্ত! এমনি করিয়া কি আমরণ বিমান মার্গে কেজ্জুত গ্রহের মতন লক্ষ্যহীন পথেই ঘুরিয়া বেড়াইবে, কক্ষায় ফিরিতে পারবে না?

ইহার পূর্বে আর কখনও তাহার আশা উৎসাহ ও উন্নতির সাহিত শিবানীর কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই, বরং তাহাদের নিকট হইতে মুখ শিবানীকে সে

সম্বর্ষণে দূবেই সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু যখনই সে কল্পনা করিতেছিল তাহার তপোবনে ওই ক্ষুদ্র আশ্রম গৃহের মধ্যে শিবানী গৃহলক্ষ্যার আসনে উপবিষ্টা,—কোম্য-বসনা শঙ্খবলয়ধৃত প্রশান্তবদনা নারী তাহার পুত্ৰস্তুে আশ্রম খানিকে পাবত্রতম করিয়া তুলিয়াছে, আনন্দময়া জননী রূপে শিষ্যবৃন্দকে সেবা শুশ্রূষা দ্বারা সে তাহার কন্মভার লঘু করিয়া দিয়া নিজে তাহার অংশ গ্রহণ করিতেছে, আবার নিয়ামত পূজা উপাসনা কালে তাহার পার্শ্বে বরাজতা রাহিয়া তাহার শাস্ত্রালোচনা, তাহার শাস্ত্র ব্যাখ্যায় প্রাণ ঢালিয়া দিয়া অবশ্রামে কয়ে ক্লাস্ততে সুখেহঃখে এক হইয়া গিয়াছে,—যখন এমন কারণে ওপ স্নানা সহধাম্মনার একখান ছাবকে বড়ই সাবধানের সহিত অল্পে অল্পে হৃদয় ফলকে ফুটাইয়া তুলিয়া তাহার দিকেই লোলুপ দৃষ্টি সংশ্লিষ্ট করিতেছিল। তখন নারদের সেই আশা কল্পনা যেন মক মরিচাকা বাগান পুষ্পবৎ কল্পনাতে পর্যাবসিত হইয়া গেল। শূণ্য কামরার জানলার কাঠের উপর মাথা রাখিয়া নীরদ জ্বালাময় চক্ষু মুদিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, হায় সে যদি আরও কিছুদিন আগে আসিত! সেই যখন আসলই তখন এত বিলম্ব করিল কেন!

হাটরাস্ জংশনে গাড়ি থামিয়া গিয়াছে আরোহিগণের এইখানেই, অল্প গাড়ি ধরিবার কথা। কুলীর “বাবু! বাবু!” ডাকে সজাগ হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি নীরদ নামিয়া পড়িল—তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

অদূরে বিশ্রাম স্থান, পঞ্জাবমেল আসিতে তখনও প্রায় আধঘণ্টা দেরি, একটা কুলীর

হাতে ব্যাগটা দিয়া নিশ্চল প্রায়-চরণকে টানিয়া
সে ধীরে ধীরে অগ্রনর হইতে লাগিল শরীর
ষেন বহিতে পারিতেছিল না, মাথা ঘুরিয়া
পড়িতেছিল। এমন সময় ‘মিঃ রায় না ?
এই যে তুমি কোথা থেকে ?’ বলিয়া-
পিছন হইতে কে কাঁধে হাতে দিল।
নীরদ ফিরিয়া দেখিল মাহারার একটি
পরিচিত বন্ধু বীরেশ্বর। নীরদকে দেখিয়া
সে খুব আনন্দ প্রকাশ করিল তাহার
পরে জিজ্ঞাসা করিল “কোথা গেছলে ? এখন
যাচ্ছো কোথায় ?” নীরদ বলিল “বুন্দাবন
থেকে আসছি, বোধ হয় কলকাতায় যাবো”
“বোধ হয় ?” নীরদ একটু খানি
ইতস্ততঃ করিল ‘না কলকাতাতেই যাবো ?
তুমি কোথায় ?’ “আমি যাচ্ছি একটু ভ্রমণ।
এই দিল্লি। তুমি গিয়েছিলে ? নীরদ ঘাড়
নাড়িয়া জানাইল যে না। “বলোকি
জগতের মধ্যে একটা প্রধান জিনিষই দেখলে
না, এঁা ? না না, তাকি হয় চলো
আমার সঙ্গেই চলো একটু ঘুরে আসবে।

কটা দিনই বা ! তাব পর আমি চন্দন নগর,
আর তুমি হাবড়া বাস ; কিহে কথা কওনা
যে, যাচ্ছো তো তাহলে ? তোমার চেহারাটা
বড় শুবিরে গ্যাছে তা অসুখ বিসুখ হলে
কিছু ভয় নেই, আমার সঙ্গে এই দেখো
হোমিওপ্যাথিক বন্ধ, ‘রুবিনীর কাম্ফার
‘কুইনিন’ এই সব। পেটেন্ট টেটেণ্টও
কিছুই আমি কিন্তে বাকি বাখিনি, আমার
হৃদয়টা ভারি দুর্বল কিনা তাই ওষুধের
বিজ্ঞাপন দেখলেই পড়ি,—হ্যা তবে আমার
বোগটার একটা সুসঙ্গ এই, সকল রকম
বোগের ব্যবস্থার সঙ্গেই মেলে। এখন ডাক্তারের
হুকুমে বেড়াতে বেরিয়েচি। হ্যা তাহলে তুমি
দিল্লিই যাচ্ছো কেমন ? একা মন লাগেনা”।

নীরদ দুটো দিন তাহার অন্তরেব আঘাতটা
সামলাইয়া লইবার জন্তুও ব্যয় করার প্রয়োজন
বুঝিয়াই উত্তর করিল “চলো তবে কিন্তু ঐখান
থেকেই ফিরবো”। বীরেশ্বর মহাক্ষুভির সহিত
তাহার হাতটায় একটু কাঁকা দিয়া সোৎসাহে
কহিয়া উঠিল “ভয় নেই তাই হবে”।

অন্তরতর ।

তখন ছ’জনে দেখা হয়েছিল
সেখায় মুক্ত মাঠের মাঝে ;
ফাল্গুনে মিঠে বসন্ত বায়
বহোঁছিল ধীরে উদাস সাঁঝে ।
দুব হ’তে সেই দেখেছিল তাবে,
লুক আমার ছ’টি আঁখি ভবে’,
কি জানি কি ভেবে হেরিয়া গো মোরে
চকিতে অরি,
আনত চক্রে চলে’ গেলে তুমি
লো সুখাময়ি !

এখন যে হেথা কঙ্কণ-করে
কুস্তলজাল এলিয়ে দিয়ে—
লীলায় বহিছে মন্দ মলয়
পুলকে আঁচল ছলিয়ে নিয়ে ।
কাছাকাছি আজি রয়েছি হেণায়,
চেয়ে চেয়ে চেয়ে দেখিগো তোমায়,
সরম-পাতার বাঁধন টুটিয়া
হুটিয়া যেন—
‘শুষ্ঠন টানি’ নাহি চল’ গিয়ে
হাসিছ কেন ?

শ্রীবগলাসঙ্গন চট্টোপাধ্যায় ।

জাপানের খেলা।

জাপানীরা ক্রীড়ায় বড় সিদ্ধহস্ত ; বুড়াবুড়ি পর্যন্ত খেলিবার জন্ত পাগল। জাপানের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ বিজ্ঞানার্চ্য কৃষিকলেজের অধ্যাপক কে সিয়াবে ডি, এম্, সি (হার্কার্ড) প্রতি নববর্ষ দিনে তাঁহার কলেজস্থ যাবতীয় বৈদেশিক ছাত্রকে নিমন্ত্রণ করেন। তথায় আহা বাস্তে খেলা আবস্ত হয়। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের উপর। তাঁহার স্ত্রীর বয়স দুই এক বৎসর কম। খেলায় তিনি তাঁহার স্ত্রীপুত্রসহ যোগদান করেন। জাপানের অনেক খেলাতেই সর্ভ থাকে। ইহাতে পরাজিত ব্যক্তিকে হয়ত নাচিতে হয়, গাইতে হয় অথবা জন্তুর ত্রায় অব্যক্ত শব্দ কবিত্তে হয় ; স্থল কথা কোন না কোন উপায়ে হাসাইতে হয়। আবার কোন কোন খেলায় পরাজিত ব্যক্তির মুখে চুনকালী দিতে হয়। অধ্যাপকের বাড়ীতে শেষোক্ত সর্ভে খেলা আরম্ভ হইল। ছাত্রগণ এবং অধ্যাপক সাহেব পরাজিত হইলে পরস্পর পরস্পরকে রঙে সাজাইতে লাগিলেন। কিন্তু যে সময় অধ্যক্ষ পত্নী পরাজিত হইলেন তখন ছাত্রগণ তাঁহাকে সাজাইতে দ্বিধা বোধ করিতে লাগিল। বৃদ্ধ অধ্যক্ষ মহাশয় সানন্দে পত্নীকে রঙে ঢাকিয়া ফেলিলেন।

তোকিও সহবে মুক্ত করেদীদিগকে সংপথে চালাইতে এবং তাহাদের দ্বারা দেশের অনেক রকম মঙ্গলজনক কায করাইতে অনেকগুলি আশ্রম আছে। এইরূপ একটি বিখ্যাত আশ্রমের সেক্রেটারী মিঃ হারা। মিঃ হারার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। তিনি

ভারতীয় ছাত্রদের পরমবন্ধু। তাঁহার এক ছেলে ভাবতের পঞ্জাব প্রদেশে আছেন। তিনি ভারতীয় ছাত্রদিগকে তাঁহার বাড়ীতে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন এবং অনেক সময় ভারতীয় ছাত্রদের বাড়ীতেও নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। বৃদ্ধ বৃদ্ধা এবং পরিবারস্থ সকলেই সর্ভের খেলা খেলিতে বড় আমোদ বোধ করিয়া থাকেন। অনেক সময় বুড়াবুড়ীকে অব্যক্ত জন্তুর ডাক ডাকিতে শুনিয়াছি। কোন পরিবারে নিমন্ত্রিত হইলেই বুকিতে হইবে সেখানে কোন না কোন খেলায় যোগ দিতে হইবেই। কোন জায়গায় ৫০ জন মিলিত হইলেই তথায় হাসি তামাসা এবং রসিকতার ফোয়ারা ছুটিতে থাকে।

জাপানে গরমের দিনে অনেকে দোলনার (হেমকে) তুলিতে বড় পছন্দ করে। আমাদের বাড়ীতে একটা দোলনা ছিল। একদা কলেজ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখি আমাদের ৬৫ বৎসব বয়স্কা বৃদ্ধা বি (ওবাছান) কষ্টশ্রেষ্ঠে কেদারায় ভর করিয়া তাহার উপর উঠিয়া এক যষ্টির সাহায্যে তুলিতেছে।

ইহাতেই বেশ বুকিতে পারা যায় যে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে এবং যুবক যুবতী খেলিবার জন্ত কত বেশী উদগ্রীব। জাপানের প্রাচীন খেলা অধিকাংশই বীর-জনোচিত। দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি, লাঠিখেলা, তলোয়ার খেলা, ধনুর্কাণ চালান, কুস্তি, ডন প্রভৃতি সে কালের খেলা। আজও পর্যন্ত বিশেষ আগ্রহের সহিত উহারা এসব খেলা

খেলিয়া থাকে। বরফ এবং বৃষ্টিপাতের সময় ঘরের ভিতর কারুতা (তাস) সতরঞ্চ এবং গোলকধাঁধা ধরণের কতিপয় খেলা এবং গৌ খেলা হয়। আমাদের দাবার খায় গৌ খেলিতে বেশ বুদ্ধির দরকার। কাষ্ট ফলকে ৩৬১টি ঘুঁটি রাখিবার ঘর আছে। দুই ব্যক্তি সমান সংখ্যক ঘুঁটি অর্থাৎ সৈন্ত লইয়া বুদ্ধি ও কৌশলে ঘর দখল করিতে থাকে। এই গৌ খেলায় যিনি যত বেশী ঘর দখল করিতে পারেন তিনি উহাতে তত বেশী নিপুণ। সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে বিখ্যাত গৌ খেলোয়ারদের নাম দেখিতে পাইতাম।

ছেলেদের প্রধান খেলা যুদ্ধবিগ্রহ। রাস্তাঘাটে ভদ্র লোকের ছেলেদের সাধারণত স্থলসৈন্ত অথবা নৌসৈন্তের পোষাকেই ভূষিত দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে কাঁদিতে আরম্ভ করিলে অনেক সময় মাতা সন্তানকে রঙিন কাগজের জাতীয় পতাকা ক্রয় করিবার জন্ত একটি পয়সা অথবা অর্ধ পয়সা দিয়া থাকেন। নিশান পাইয়া কান্না ভুলিয়া যায়। মিঠাইওয়াল অথবা মজাদার ঘুঁড়িদানা কিম্বা সাড়ে বত্রিশ ভাজি ওয়ালাদের খায় ফেরিওয়ালারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের জাতীয় পতাকাগুচ্ছ সঙ্গে লইয়া ফেরি করিয়া থাকে। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ক্রেতাদিগকে এক একটি পতাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। উহাদের পতাকার দিকেই বিশেষ লক্ষ্য মিঠাই উপলক্ষ মাত্র।

বঙ্গের পল্লীগ্রামে সময় সময় যাত্রার দল রামায়ণ মহাভারতের কোন কোন বিষয়

অভিনয় করার পর তথাকার বালকেরা দুই এক সপ্তাহকাল কেহ ভীম, কেহ শকুনী, কেহ রাম, কেহ হনুমান সাজিয়া যষ্টিদণ্ডকে অস্ত্র-স্বরূপ ধরিয়া “আয় পাপাত্মা যুদ্ধ করি” বলিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। গত কৃষ্ণ-জাপ-যুদ্ধের সময়ও জাপানের ছেলেদেব ভিতব যুদ্ধের খেলা ছাড়া অন্য কোনরূপ খেলা ছিল না। সে বৎসর আমাদের শিল্প বিজ্ঞান সমিতির প্রথম বৎসর। আমবা সাত জনে একসঙ্গে জাপানে গিয়া এক বাড়ী ভাড়া করিয়া অবস্থান করিতেছিলাম। বাড়ীর সঙ্গে লাগানই একটা ক্ষুদ্র পাহাড়। প্রায় প্রতিদিনই সে পাহাড়ে উপর ছেলেদের যুদ্ধ চলিত। সৈন্তদের খায় সারি বাঁধিয়া বিউগলের তালে তালে পাহাড়ের তলদেশ পর্যন্ত আসিয়া দুই দলে বিভক্ত হইত। এক দল পাহাড়ের উপর উঠিয়া এখানে ওখানে কাগজের তাঁবু তৈয়ার করিত, অপর দল নীচেই তাঁবু রচনা করিত। দুই পক্ষের যোগাড় যন্ত্র হওয়ার পর যুদ্ধ আরম্ভ হইত। তালে তালে বিউগল বাজিতে থাকিত। হাওয়া বন্ধুকের ফাঁকা আওয়াজে সংগ্রামের গুরুত্ব যেন আরো বাড়িয়া উঠিত। দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটিতে অনেক সময় খোকাদের আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিত। যখন দুই পক্ষ একেবারে সম্মুখীন হইত তখন অনেককে যষ্টি এবং বন্ধুকের প্রহারে আহত হইতে হইত। আহত ব্যক্তিকে রেড্ ক্রস সোসাইটির লোকেরা স্কন্ধে করিয়া পরিচর্যার জন্ত শিবিরে লইয়া যাইত; ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিত। স্থানে স্থানে আগুন লাগিয়া তাষু ভস্মীভূত হইয়া যাইত। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর যখন ছেলেরা একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িত

তখন একপক্ষ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিত অপর পক্ষ তাহাদের শিবিরে প্রবেশ করিয়া যাহা কিছু মূল্যবান তাহা আত্মসাৎ করিত এবং অগ্রাগ্র সমস্ত জিনিস লণ্ডভণ্ড করিয়া শিবিরে আগুন লাগাইয়া দিত।

বড় বড় যোদ্ধাগণ সমরক্ষেত্রে যাইবার পূর্বে স্ত্রীর নিকট যে ভাবে বিদায় লইয়া থাকেন, জাপানে খেলিবার যুদ্ধে যাইবার প্রাক্কালেও থোকা তেমনি ভাবে খুকীর নিকট বিদায় লইতেছে। খুকীও বিনম্রভাবে বিদায় দিতেছে।



খোকীর যুদ্ধযাত্রা।

খোকাদের এই নকল যুদ্ধ সৃষ্টিজালরূপে নিষ্পন্ন করিবার জন্ত দুই পক্ষেই দুই একজন বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তি নেতা হন। এইরূপ খেলার ছোট বড় সকলেই উৎসাহ দিয়া

থাকেন। কিণ্ডার গার্টেন হইতে কলেজ পর্য্যন্ত সকলপ্রকার বিদ্যালয়েই—খেলার চর্চা বড় বেশী। লাঠিখেলা, বন্দুকচালান, তরওয়াল-ভাঁজা প্রভৃতি মধ্যস্কুলে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়। মধ্যস্কুলে উত্তীর্ণ যে কোন ছেলে তিন মাস অভ্যাসের পর উপযুক্ত যোদ্ধার আয় যে কোন যুদ্ধে রণকৌশল দেখাইতে সক্ষম।

বালিকা বিদ্যালয়েও অনেক রকম খেলা শিক্ষা দেওয়া হয়, শ্যাণ্ডো, নৃত্য, গীত, বাঘ ইত্যাদি মেয়েদের নিত্য শিক্ষণীয়। তাহাদের নৃত্যকেও এক প্রকার কাওয়াজ বলিতে হইবে, অনেক শিক্ষিত মেয়েকেও তরওয়াল খেলিতে দেখিয়াছি।

আজ কাল ইউরোপ আমেরিকায় অনেকে জাপানী মাষ্টারের সাহায্যে জিউজুৎসু শিক্ষা করিয়া থাকেন। মার্কিং রাজ্যের কন্সবীর ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট রুজবেল্ট স্বয়ং এবং তাহার পরিবারস্থ অনেকে প্রতিদিন জিউজুৎসু অভ্যাস কাব্য্য থাকেন। বোধ হয় এ খেলা সম্বন্ধে পাঠকগণ অনেকেই বিদিত আছেন। ইহাতে শক্তির চেয়ে কৌশলের অধিক আবশ্যিক। দুর্বল ব্যক্তি কৌশলে স্থলকায় শক্তিশালীকে অনায়াসে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে পারে। জিউজুৎসুর ইতিহাসে দেখা যায় জনৈক জিউজুৎসুনিপুণা জাপানী রমণী সতীত্বনাশে উদ্ভত এগার জন পরাক্রান্ত দস্যুকে একে একে পরাস্ত করিয়া সম্মানে উহাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন।

জাপানী স্কুল কলেজে প্রতি বৎসর হেমন্ত এবং বসন্তকালে ছেলে মেয়েদের ক্রীড়া (Sport) প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সে ক্রীড়া

নব্য এবং পাশ্চাত্য ধরণের। একটু বিশেষত্ব এই, কয়েকটি খেলাধর পর পর এক একবার প্রহসন দৃশ্য বা সামাজিক সডের দৃশ্য দেখান হয়। সে দৃশ্য অতি কোতূহলোদ্দীপক। বার্ষিক ক্রীড়া প্রদর্শনীতে উপযুক্ত ছেলে মেয়েকে পুরস্কার দেওয়া হয়। অধিকাংশ স্থলেই নোটখাতা, ক্রমাল, তোয়ালে, পেন্সিল, কাগজ, কলম, গেঞ্জি, বাক্স, টুল ইত্যাদি পুরস্কারের দ্রব্য।

অনেক দোকানদার নিজ নিজ দোকান সর্বসাধারণে বিজ্ঞাপিত করিবার জন্তু ঐ সকল দ্রব্য স্কুলকর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করে। সংবাদ পত্রে ঐ সকল মুদ্রিত হইয়া থাকে। তামা, দস্তা, পিত্তল প্রভৃতি ধাতু নির্মিত মেডেল ও বিস্তর প্রদত্ত হইয়া থাকে।

আমাদের ধনাঢ্যনন্দনদের শ্রায় জাপানের লর্ড সন্তানগণ সূর্যোত্তাপে গলে না, ঠাণ্ডায় জমে না, বাতাসে হেলিয়া পড়ে না, পদব্রজে চলিতে পায়ে ফেঁস্কা পড়ে না, মাথা ধরেনা, অপাকে পেটফাঁপা বা অজীর্ণে ভোগেনা। তাঁহারা সবল ও স্থষ্টকায়, পাঁচ মিনিটের রাস্তা কেন তাঁহারা প্রতিদিন দুই মাইল দূরবর্তী কলেজে মোটার গাড়ীর পবিনর্তে হাঁটিয়াই যাতায়াত করিয়া থাকেন। এবং কুস্তি ডনেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ নহেন। আমার সঙ্গে পাঁচটি লর্ড সন্তান পড়িতেন, তাঁহারা কাউন্ট এবং ভাইকাউন্টের ছেলে। তাঁহাদের চারিজন প্রতি বৎসর বার্ষিক ক্রীড়ায় প্রথম দ্বিতীয় স্থান দখল করিয়া তোয়ালে, ক্রমালের শ্রায় যৎকিঞ্চিৎকর পুরস্কার গ্রহণ করিতেও কত আনন্দ বোধ করিতেন। পিয়ার্শঙ্কলের ছেলে মেয়েদের পুরস্কারও

একই প্রকার। একদা আমার এক অধ্যাপক ধাতু রোপন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে করিতে আমাকে বলিয়াছিলেন ধানের চাষা গাছগুলি যখন নার্সারিতে তোমাদের দেশীয় রাজপুত্রদের শ্রায় অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দুর্বল রোগীর শ্রায় ক্যাশে হইয়া পড়ে তখন উহাদিগকে যথা-স্থানে বোপন করা দরকার। আমাদের গুধু রাজপুত্রগণ বলিয়া কেন, যাহাদের স্বচ্ছলভাবে বসিয়া থাইবার পছন্দ আছে তাহাদের অনেকেই এব সম্বন্ধে ধাতুবৃক্ষ স্বরূপ। আর যাহাদের বাসিয়া থাইবার যো নাই অতিরিক্ত শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রমে তাহাদের অনেকেই গুধু দণ্ডবৎ।

ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রায় সমস্ত খেলাই জাপানে প্রবর্তিত হইয়াছে। জাপানীরা টেনিস ক্রিকেট, বিলিয়াড, পিংপং, হকি, বেছবল, ফুটবল, রাগবি ইত্যাদি সমস্তই খেলিয়া থাকে। টেনিস এবং পিংপং খেলিতে নব্য ছেলে মেয়ে অনেকেই সিদ্ধহস্ত, এবং এই দুইটি খেলা মেয়েদের খেলা বলিয়াই ধর্তব্য। আমাদের দেশে ফুটবল ও ক্রিকেটের শ্রায় জাপানে বেছবল খেলার চলনই বেশী। বেছবল খেলা এখনও আমাদের দেশে প্রচলিত হয় নাহি। ইহা আমেরিকার প্রধান খেলা। তে'বি'ওর ওয়াছেদা নামক একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির বেছবলপাটি জাপানে সর্বশ্রেষ্ঠ। ঐ পাটি জাপানস্থ অনেক বৈদেশিক পাটিকে পরাস্ত করিয়া থাকে। দুই বৎসর পূর্বে উহার হাওয়াইস্থ আমেরিকান পাটিকে পরাস্ত করিয়াছে।

সহরের অনেক স্থানে পাশ্চাত্য খেলার

অনেক ক্লাব রহিয়াছে। এমন কি বাজারের জায়গায় জায়গায় বিলিয়ার্ড খেলিবার টেবিল রহিয়াছে। সামান্য খরচেই ইচ্ছামত তথায় যে কেহ খেলিয়া আসিতে পারে। সভা সমিতিতে বক্তৃতার ছড়াছড়ির চেয়ে খেলার প্রচলনই বেশী।

জাপানে লুকোচুরি, ছুটোছুটি, কাণা-মাছির গায় অনেক খেলাও আছে। ছোট ছোট মেয়েরা আমাদের দেশের মেয়েদের গায় বৌ সাজিয়া রান্না, খাওয়াদাওয়ার খেলাও খেলিয়া থাকে।

ছুটি বোন একসঙ্গে খেলা কবিতোছে, এখন উহারা বোন নহে, বন্ধু সাজিয়াছে। ছোট বোনটি আগন্তুক। জাপানে আগন্তুকেব পরিচর্যা যে ভাবে করিয়া থাকে এ চিত্রে তাহাই দেখাইতেছে। বন্ধুকে উপবেশন করিতে আসন দিয়া কিঞ্চিৎ গল্প প্রসঙ্গের পর

চা, বিস্কট, জল ব্যঞ্জন প্রভৃতিদ্বারা পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হয়। তারপর কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর বন্ধু পারিতোষের জন্ত গান বাজনা আরম্ভ হয়। বন্ধু গম্ভীর ভাবে একধানা ক্রমাগত হাতে লইয়া আগন্তুকের গায় বসিয়া আছে বড় বোন তিন তারের একটি বাণ্ড যন্ত্র বাজাইতেছে। গীত বাণ্ডের পর কড়ি, সতবন্ধ, কিম্বা গোলকধাঁধার গায় কোন খেলা আবিস্কৃত হইবে। এইরূপ আমোদ উৎসবে যখন ক্রান্ত হইয়া পড়ে ত ন তাহাদের খেলা বন্ধ হয়।

আর একটি জাপানী খেলার কথা উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছিলাম। উহা নববর্ষের “হানেংকুবী” অর্থাৎ একপ্রকার ব্যাটলডোর শাটলকক্। হানে অর্থে পাখীর পালক আর ংকুবী প্রয়োগ করা; এই অর্থেই খেলাটির নামকরণ হইয়াছে। এ খেলা



দুই বোনে খেলিতেছে।

ছই ছই জনে খেলিতে হয়, দুজনের হাতে দুইখানি ব্যাট্। ব্যাটগুলি চিত্রিত এবং উহার একধায়ে রঙ্গিন কাপড়ে এবং অলঙ্কারে সজ্জিত একটি মূর্তি। যে ধারে মূর্তি নাই সেই ধারের সাহায্যে পালকে লাগান ক্ষুদ্র সুপারীর জায় বল অর্থাৎ শাটলকক্ ফিরাইতে হয়। বল ফিরাইতে না পারিলেই পরাজয়। নববর্ষদিনে স্ত্রীপুরুষ, যুবকযুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, ছেলে মেয়ে সকলেই এ খেলায় পাগলপ্রায় হইয়া উঠে। জননী ক্ষুদ্র শিশুটিকে পৃষ্ঠদেশে বাঁধিয়া হয়ত নিজের ছেলে কিম্বা মেয়ের সহিতই খেলিতে-ছেন, পরাজিত ব্যক্তিকে মুখে গালে চুণ-কালীতে এক অদ্ভুত সজ্জায় ভূষিত হইতে হইয়াছে। ভারতীয় ছাত্রদিগকে ৬৭ বছরের খোকাখুকীর সহিত খেলিতেও যাত্রাব দলের মহাদেব কিম্বা ভূতপ্রেত সাজিতে হয়।

জাপানীরা খর্সাকৃতি হইলেও পৃথিবীর মধ্যে হাইজাম্প রেকর্ডে সর্বপ্রথম। কিন্তু কুস্তি ডন প্রভৃতি শারীরিক প্রক্রিয়ায় জাপানীরা বিশেষ দক্ষ হইলেও এবং সেদেশে বহু সার্কাস পাটি থাকিলেও আমাদের প্রফণর ব্যানার্জির কিম্বা বোম্বে গ্রেট সার্কাস পাটির জায় কোন পাটি সেখানে নাই। অর্থাৎ বাঘের সহিত এবং ঘোড়ার উপর আমাদের দেশে যেমন খেলা হয় ওদের দেশে তেমন নাই। ওদের সাইকেলের খেলা বেশ। অনেক সার্কাস পাটিতেই সেখানে মেয়েরা খেলা করে। কোন কোন পাটিতে কেবল মেয়েরাই খেলে।

আত্মারাম সরকারের ভেঙ্কিবাজীতে পাঁচ মিনিটে আমের বীজ হইতে গাছ জন্মায়, ফল ফলে। এ বাজিতেও ভারত শ্রেষ্ঠ। জাপানীরা তেমন পারে না।

শ্রীযত্ননাথ সরকার।

হার-জিত।

(১)

নন্দলাল তার মাতুলের মুখের উপবেই বলিয়া বসিল—“তাই বেশ!—আমি কালই চলে যাচ্ছি!”

এ পর্য্যন্ত পরাগবাবু মুখের উপর এমন ভাবে কেহ কখনো জবাব দিতে সাহস করে নাই। তিনি রোষে ও বিশ্বয়ে ক্ষণকাল নির্ঝাক হইয়া রহিলেন। মুহূর্ত্ত পরে জাগিয়া বলিলেন—“এখন বেরোও!”

নন্দলাল স্থির ও পরিষ্কার কণ্ঠে উত্তর করিল—“বেশ!—টাকা কড়িগুলো ফেলে দিন—যাচ্ছি!”

পরাগবাবু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন—বলিলেন—“টাকাকড়ি!”

নন্দলাল কহিল—“আজ্ঞে—হাঁ!—মার তিন হাজার টাকার গহনা আর বাবার বিষয় বিক্রীর টাকা।”

পরাগবাবু একটু বিক্রপের হাসি হাসিয়া বলিলেন—“ও!—তোমার বাবার জমিদারী ছিল!—তাই বুঝি তুমি ছোট বেলা থেকে আমার অঙ্গে ‘মাছুষ’ হয়ে আসচো?”

নন্দলালের মুখ শুকাইয়া গেল—সে বিকৃত কণ্ঠে বলিল,—“আঁ!—এত কু-অভিসন্ধি!”

পরাণবাবু তাঁর এক অনুচরের প্রতি
চাহিয়া বলিলেন—“গুন্‌চো শ্রামলাল!”

সমগ্র স্তাবকের দল বলিয়া উঠিল—ছিঃ
—ছিঃ—একি অসম্মানের কথা!”

পরাণবাবু আলবোলাব নল টানিতে
টানিতে মোটা গলায় বলিলেন—“কলিকালে
উপকার করার ফল—এই!”

সকলে বলিল—“যা বলেচেন!” পরাণবাবু
নন্দলালের দিকে চাহিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—
“যাও!—নাগিস করে নাও-গে!”

নন্দলাল একবার উল্লসনে চাহিয়া বলিল
—“এর বিচার তিনই করবেন।” বলিয়া
সে তথা হইতে দ্রুত চলিয়া গেল।

পরাণবাবু একবার স্তাবকমণ্ডলীর দিকে
চাহিয়া বলিলেন—“এ হলো কি?—এত
আস্পর্কী কিসের?”

এক ব্যক্তি বলিল—“ও ‘বালামে’র গুণ!”
পরাণবাবু একটু রূপার হাসি হাসিয়া বলিলেন;
“তাই দেখি!”

২

নন্দলাল শৈশবেই পিতৃহীন হয়। তাহার
পিতা পশ্চিম অঞ্চলে বছদিন চাকুরী করিতে
করিতে অবশেষে সেই দেশেই বসবাস স্থাপন
করিয়াছিলেন। তাঁহার আরো কয়েকটি
সন্তানাদি হইয়াছিল কিন্তু দু-এক বৎসরের
হইতে না হইতে সবগুলিরই জীবন মুকুল
অকালে ঝরিয়া পড়ে। ইহাতে নন্দলালের
পিতার, অর্থসঞ্চয়ের দিকে তেমন দৃষ্টি
ছিল না—তিনি উপার্জিত অর্থের অধিকাংশই
লোকহিতে ব্যয় করিতেন। কিন্তু দশ
বৎসর পরে বিধাতা সেই নিরানন্দ সংসারে
আবার একটি স্নেহের ধন সন্তান

পাঠাইয়া দিয়া পিতামাতার শোকদগ্ধ প্রাণে
আনন্দরস সঞ্চারিত করিয়া তুলিলেন।

শোকজীর্ণ প্রোঢ় কাশিনাথ কিন্তু
‘ভাঙিয়া’ পড়িয়াছিলেন। নন্দলালকে বেশী
দিন বুকে করিয়া জুড়াইবার অবসর পাইলেন
না!—পূর্ণিমার এক স্নিগ্ধ রাত্রে তাঁর ডাক
পড়িল। আন্তিমকালে অতৃপ্ত পিতৃস্নেহ মায়ার
শৃঙ্খলটি আরো জটিলতর করিয়া তুলিয়াছিল!
মৃত্যুকালে, পত্নী হাতখানি ধরিয়া দুই চক্ষে
ধারা বহাইয়া বলিলেন—“তুলসি! ছেলে বুকে
ধরে সুখ ভোগ করাব কপাল আমার নয়!
—তবু একে যে রেখে যেতে পারলাম, এই
ঢের!”

নন্দলাল তখন পাঁচ বৎসরের। পিতৃকূলে
তাহার তেমন কোন আশ্রয় ছিল না।
যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা যে অনাথ শিশুর
‘রক্ষক’ হইবেন এমন সম্ভাবনা ছিল না।
সুতরাং তুলসী সহোদর পরাণবাবুর শরণাপন্ন
হইলেন—হাজার হ’ক তিনি ‘মারপেটে’র
ভাই!

পরাণবাবু লোকটা খুব ‘পাকা’। তিনি
কলিকাতায় বাস করেন। পৈতৃক বিষয়
সম্পত্তি যৎকিঞ্চিৎ আছে বটে কিন্তু তাহাতে
কলিকাতার বিলাস ব্যয় সফুলান হয় না।
অথচ পরাণবাবুর সংসারিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল,
—বরং স্বচ্ছলেরও বেশী। ইহাতে ‘পাঁচজনে’
পাঁচ রকম কথা বলিলেও বাহিবে তাঁহার
প্রতিপত্তি অটুট—!

তুলসী পাঁচ বছরের ছেলে লইয়া ভায়ের
সংসারে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। এই আশ্রয়
গ্রহণের মূলে দৈত্বেয় দংশন জালা যে এতটুকু
ছিলনা এবং অভিভাবকের একমাত্র অশ্রাবই যে

তাঁহাকে—ভ্রাতৃসংসাবে টানিয়া আনিয়াছে একথা তুলসী কাহাকে কোনদিন বুঝাইতে চান নাই। তিনি আশ্রিতের মতই কৃত্রিম ভাবে জীবনের অবশিষ্ট কালটুকু পূজা অর্চনায় কাটাটয়া দিবাব সঙ্কল্প কবিয়াছিলেন!— তিনি ভাবিতেন বৈধব্যে চেয়ে নাবীর কপালে আর কি বেশী অভাগোর—অধিক দানতাব বিষয় হইতে পারে!

পরানবাবুও ভগিনীকে মর্যাদার সহিত গৃহে স্থান দিলেন; ভাগিনেয়ের যাতাতে মঙ্গল হয় তাব জন্ত ‘প্রাণপণ যত্ন করিতে’ ক্রটি হইবে না বলিয়া আশ্বাস দিলেন। ভগিনীবিষয় কল্প পদ্যবেক্ষণ কবিত্তে গিয়া পরানবাবু অনেক সময় নিজের ক্ষতিও স্বীকার করিতেন।

এইরূপে এক বৎসরের উপর অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন পরানবাবু ভগিনীকে কহিলেন—“এত দূরে থেকে বিষয় রক্ষা কবা বড়ই শক্ত ব্যাপার! আমার দ্বারা দেখাচ আর হয়ে ওঠে না—আর সে সম্ভবও নয়... অগচ বিশ্বাসী লোকও পাওয়া হুঙ্কর...”

তুলসী জিজ্ঞাসা কবিলেন—“তবে কি করলে ভাল হয়!” পরানবাবু ক্রিয়ংকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—“আমাব মতে বিদেশের বিষয় সম্পত্তি সব বিক্রী কবে সেই টাকা সুদে খাটানো ভাল!—তা’তে কিছু কম লাভ হয় সেও বরং ভাল—‘বিষয় আশয়ে’র ঝঞ্জট চের!—এই দেখতেই তো পাচ্ছে!।

কথাটা বিধবার নিকট কতকটা সমীচীন বলিয়া বোধ হইল, তিনি বলিলেন—“তুমি যা ভাল বোধ তাই কর—তুমি তো আর নন্দর ‘পর’ নও!”

পরানবাবু চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল—তিনি আর্দ্রস্বরে কহিলেন—“দি’দি, নন্দ যে আমার ‘পর’ নয় তা কি অর বলে গোঝাতে হয়!—ভাগনে আর ছেলেতে তফাৎ কি?—বিশেষ যখন অমন সোণাব ঠান ছেলে! যে দেখে তাবই বুকে তুলে নিতে ইচ্ছা করে!” কথাটা বলিয়া পরানবাবু একটা দার্ষ নিশ্বাস ফেলিলেন।

ইহাব একছু দিন পরে পরানবাবু পশ্চিম যাত্রা কবিলেন। ভগিনীপতিব মৃত্যুর পর এই চতুর্থাব পরানবাবু পশ্চিম যাত্রা। বাহিবে প্রকাশ—তার ‘শবীর খারাপ’।

বিষয় বিক্রয় হইল, কিন্তু তেমন ‘দর’ উঠল না—পরানবাবু সে টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিলেন। ভগিনীর অলঙ্কার আদিত পূর্বেই তিনি আপনাব লোহসিদ্ধকের নিবাপদ গহ্বরে নিষ্ক্ষেপ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। সুদের টাকাটাও পরানবাবু ক্যাশবাক্সে আশ্রয় লাভ করিত, তবে, ভগিনীবিষয় আবশ্যক হইলে পরানবাবু টাকা লইয়া প্রস্তুত!

তুলসী নিশ্চিন্ত, তাঁহার শিশুপুত্র নন্দলালও নিশ্চিন্ত! একজন নিশ্চিন্ত—গভাব বিধাস; আর একজন নিশ্চিন্ত—শৈশব সরলতায়!

শুধু নিশ্চিন্ত নহেন—পরানবাবু!

এইরূপে পাঁচ বৎসর বাহিয়া গেল।—সেই সঙ্গে তুলসীর বৈধব্য জ্বালাও অবসান হইল! মৃত্যুকালে তুলসী পুত্রকে ভ্রাতার হস্তে জন্মের মত সপিয়া দিয়া গেলেন!

তুলসীর মৃত্যুর পর হইতে পরানবাবুর চক্ষু খুলিয়া গেল—তিনি ভাগিনেরটীতে অনেক ক্রটি দেখতে লাগিলেন;—সে হরস্ত—উদ্ধত—অসাহযু—বুদ্ধহীন—নিথ্যাবাদী—গোভা

—বিলাসপ্রিয়,—এবং উদ্বকালে সে যে একজন দারুণ—হৃদ্য লোক হইবে পরাণবাবু যেন তাহা ভবিষ্যতের দর্পণে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইলেন। পরাণবাবু যখন দেখিতে পাইলেন তখন তাঁহাব ‘উৎসাহ’বা যে না দেখিতে পাইবেন এটা কোন মতেই হইতে পারে না।

পরাণবাবু পত্নী রাজলক্ষ্মীকে কেবল স্বামীব মত সূক্ষ্ম-দৃষ্টি লাভে বঞ্চতা হইলেন। তিনি পূর্বে মতই নন্দলালকে স্নেহ ও শাসন করিতেন।

শাসন করা হয়—হোক, পরাণবাবু তাহাতে আপত্তি নাই কিন্তু এত স্নেহ দেখাইয়া অমন ‘আদর্শ’ করিয়া তুলিবার কি প্রয়োজন! তখন হইলে খাওয়া হয়না,—ডালের সঙ্গে ‘ভাজি’ দবকাব,—সকালে-বিকালে জলখাবাব,—এত কেন?—কিসের জন্ত?

রাজলক্ষ্মী যদ বলিতেন “আহা চিরকাল ও ভাল খেয়ে ভাল পবে’ এঘেচোঁ!” পরাণবাবু অমনি জাঁখি বক্রণ করিয়া বলিতেন— “পরের বাড়িতে এসে আবে ও সব আদ্যাব করলে চলেনা!”

রাজলক্ষ্মী আশ্চর্য হইয়া গালে হাত দিবা বলিতেন—“ওমা!—সেকি গো! ‘পরের বাড়ী’ কি গো!”

পরাণবাবু বিরক্ত হইয়া বলিতেন—“হাঁ—হাঁ আর ‘আপনার’ হয়ে কাজ নেই!—কে কার?”

এই কথায় পত্নী মর্মান্বিত ও বিরক্ত হইয়া একদিন বলিতেন—“তা না হয় ওর ‘খোয়াকা’ব দাম ধর নিও—ওর বাপের টাকা-ত তোমার হাতে আছে!”

পরাণবাবু অশ্লীল হইয়া বলিয়া উঠিলেন—“কি?—‘বাপের টাকা’।—বাপ কত ‘নশ-পঞ্চ’ বেখে গিছলো যে আজো তাই আছে?”—

শুনিয়া রাজলক্ষ্মী বজ্রাঘাতের ন্যায় ক্ষণকাল নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া স্বামীব মুখেব পানে চাহিয়া বলিলেন—“ও!—”

অতি অল্প দিনেব মধ্যে নন্দলাল পরাণবাবু ‘চক্ষুশূল’ হইয়া উঠিল। লাজনার ও অপমানে নন্দলাল আরো কিছুকাল কাটাইয়া দিল! পরাণবাবু অমনোযোগে ও কু-শাসনে নন্দলালেব ‘লেখাপড়া’ও তেমন হইল না। শেষে একদিন তিনি নন্দকে চাকুরীর চেষ্টা দেখিতে বলিলেন। নন্দ কাহল—“আজ্ঞে চাকুরীব যোগাড় করে নেওয়া বড় কঠিন বিশেষত—এই কোলকেতায়।”

পরাণবাবু একটু রুক্ষ স্বরে কহিলেন— “চাকুরী করবাব ইচ্ছা থাকলে তার চেষ্টা করতে,—সে ইচ্ছা তো নেই!”

নন্দলাল বলিল—“আজ্ঞে চাকুরী পেলে আর করিনা!”

“নাঃ—চাকুরী আর কোলকেতা সত্রে মেলেনা!—এই তো সেদিন ট্রামোয়ের কণ্ঠারী চাকুরী কতকগুলো খালি ছিল, একবার তাব চেষ্টা করেছিলে?”

নন্দলালের মুখখানা অভিমনে ও অপমানে লাল হইয়া উঠিল!—তাহার অধর বারেকের জন্ত ফুরত হইয়া উঠিল, সে একটা টোক গিলিয়া যথাসম্ভব আয়তন সংযত করিয়া বলিল—“খেতে না পাই সেও-ভাল তবু আমি ও চাকুরী করিচিনা!”

শুনিয়া পাইয়া পরাণবাবু স্পষ্টই বলিলেন

তবে তুমি তোমার বাসা ঠিক কর আমি আব তোমায় বসিয়ে খাওয়াতে পারব না !”

নন্দলালও রাগেব মাথায় বলিয়া ফেলিল —“তাই বেশ !—আমি কালই বাচ্ছ !”

৩

রাজলক্ষ্মী সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া নন্দলালকে বলিলেন—“সত্য ! এত লাঞ্ছনয় আমি এখানে থাকা তোমাব উচিত নয়—তা’ তোমার টাকা উনি না দেন আমি দেব !—আমার তো যা হোক দু-দশখানা গয়না আছে ! অবশি তাতে তোমার সব টাকা হবে না—তবু যতটা হয় ।”

নন্দলালের বুকটা ছুর-ছুর করিয়া উঠিল — সে বলিল—“আপনাব ..গয়না !”

রাজলক্ষ্মী বলিলেন—“হ্যাঁ—তাতে কি ? আমার গয়না—সেত তাঁবি পরসায় !”

নন্দলাল ভাবিল—“তাও তো সত্য ! আমি কেন অনর্থক ফাঁকীতে পড়তে যাই ?—তবু যতটা পাওয়া যায় তাই লাভ !”

গহনার বাকসো রাজলক্ষ্মীর কাছেই থাকিত। গহনা প্রায় পাঁচ ছয় হাজার টাকার হইবে। রায়ে কর্তা নিদ্রা যাইবার পর রাজলক্ষ্মী নন্দকে তাহা দিয়া গেলেন। হাতে রছিল শুধু দুগা’ছ ‘রুলা ! নন্দলাল রাজলক্ষ্মীকে দেখিয়া বলিল—“মা’মমা আপনাকে বড় বিক্রী দেখাচ্ছে...না আমি গয়না চাইনে—আমার কপালে যা আছে তাই হবে !”

রাজলক্ষ্মী গম্ভীরস্বরে কহিলেন—“না, তোমার নিতে হবে—নইলে আমার সংসাবে দোষ লাগবে—আমার ছেলের অঙ্গল হবে !” বলিয়া তিনি গহনার বাকস

নন্দলালের নিকট রাখিয়া চলিয়া গেলেন !— পরমুহূর্তে আবার রাজলক্ষ্মী ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন—“নন্দ ! শুধু একটা অনুবোধ করতে এসেচি—রাখতে হবে !—কাল খুব সকালে বেরিয়ে য়েয়ো—উনি ঠেঁবার আগে—”

“নন্দলাল কঠিনদৃষ্টিতে তাব মামীর মুখেব পানে চাহিয়া বলিল—“চোরের মত চু’প চুপি ?”

রাজলক্ষ্মী বুঝিলেন—তাঁর কথাটা নন্দলালের কোথায় বাজিয়াছে ! তিনি তখন মায়েব মত স্নেহের ভাবে বলিলেন—দূর পাগল !—তা কেন ?—বল’ছলুম এট জন্তে,—তুমি যাচ্ছে জানতে পাবলে উনি যেতে না দিতে পারেন,—কিন্তু এট রকম বারবাব অপমান সহ্য কবে। যে তুমি এখানে থাকো আমাব তা মোটেই ইচ্ছা নয় !—

নন্দলালের মনে কিছু কেমন একটা খটকা লাগিয়া রছিল। সে ভাবিতে লাগল—তাইত ! আমার যথাসর্বস্ব মামা ঠকাইয়া লইতে উদ্বৃত হইয়াছেন !—আমার মার গহনাগুলি পর্যাস্ত ! অহা আমার মরা-মা ! যিনি ম’রবার সময় আমাকে তাঁর ভায়ের হাতে সংপয়া দিয়া গিয়াছিলেন ! আর সেই ভাই—তার এই কাজ !!—চোর তস্করের মুখ হইতে যদি কিছু ছিনাইয়া লইতে পারা যায়, তাহাতে কি দোষ ?—কিসেব সঙ্কেচ ?

ভাবিতে ভাবিতে নন্দলাল অস্থির হইয়া উঠিল—তাঁর কপালে রিন্-রিন্ করিয়া ঘাম বাহর হইতে লাগিল—সে অস্থির চিত্তে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পাড়ল।

পথে কেরোসিনের একটা টিন পড়িয়াছিল সেটা সশব্দে সিঁড়িতে গড়াইয়া পড়ল। কুহুরটা সতর্কতা অপেক্ষা ভারতাব বশে চাঁৎকার করিতে লাগিল—নন্দলাল কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া বহির্বাৎ উন্মুক্ত করিয়া একেবারে রাস্তার আগর উপস্থিত! ভূতা জনার্দনের নিদ্রা তখন 'পরিপক্ব' হইয়া আসিয়াছিল—সে জাগ্রত হইয়া “চোব—চোব” বলিয়া চাঁৎকাব করিয়া উঠিল। কষ্ঠা গৃহীণী উভয়েই জাগিয়া উঠিলেন এবং বাতরে আসিয়া দেখিলেন নন্দেব ঘবেব দ্বাব উন্মুক্ত—আগো জ্বলিতেছে। পবাণবাবু 'নন্দ' 'নন্দ' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে সেই ঘবে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নন্দলাল সেখানে নাট। তখন হঠাৎ পবাণবাবুর দৃষ্টে নন্দেব টেবিলেব উপব পড়ল—তিনি চাঁৎকাব করিয়া উঠিলেন—“সর্বনাশ হইতেছে—গঘনাব বাক্স এখানে!—একি?—আা!” এই বলিয়া তিনি পশ্চাদমুগামনী স্তম্ভের পানে চাহিয়া একেবারে স্তম্ভ হইয়া গেলেন!—তাহার স্ত্রী একরূপ নিবাতবণা!

বিশ্বয় ও উৎসেগে বাজলক্ষ্যাব কর্তব্যাব হইবার উপক্রম হইল—তান নির্ঝাক নিশ্চল

ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পবাণবাবু ছুটয়া টেবিলের নিকট গেলেন; দেখিলেন গঘনাব বাক্স অলঙ্কারপূর্ণ আর তার মধ্যে একখানা চিঠি!—এ যে নন্দেবই হাতের লেখা!

নন্দ লিখিয়াছে—“মামিম! গহনা নিতে পারলুম না—আমার সর্ব্বব গেলেও যা আমার আজো আছে তাও হারাতে বসেছিলুম!—এই রইলো আপনার গহনা—এব বড় নেশা!—আমি পাল'লুম—দেখচি পাগল হবাব জোগাড় হইবেচি!”

প্রণত নন্দ।

জীবনে এই প্রথম পবাণবাবুব চোখেব পুরু আবরণ স'বয়া গেল!—তিন চকিতে দেখিলেন,—তিনি কত নাচে, আর স্বতসর্ষষ পলাতক অনাথ নন্দলাল—কত উচ্চে!

কিন্তু এ ভাব মুহূর্ত্তেব জ্ঞান মার! ইহাব পব পবাণবাবুব সংসার যেমন চাঁৎতেছিল তেমনিই চলিতে লাগিল!—নন্দলালের কথা কেহই তুলিত না! বরং তুলিলে, পবাণবাবু 'ববক্ত হইতেন!

কেবল একটী মেহকোমল নারীস্বন্দয় সেই মাতৃহীন অনাথ সন্তানেব জ্ঞান মাঝে মাঝে ব্যাখ্যত হইয়া উঠিত!

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

ভক্তি ও ঘৃণা।

উর্দ্ধ ছুট উৎস সম ভক্তি, হৃদি ভেদিয়া,
স্বয়ং পানে টানতে চাহে হৃদয়ে।
ঘৃণা সে প্রপাতসম মবম দ্বার ভাঙ্গিয়া,
হৃদয়ে নাচে অ নিতে চাহে নিরয়ে।

ভক্তি কিবা মবমফলে আলোকে তুলে ফুটায়,
পুলকভরে গন্ধমধু বিতরি,—
ঘৃণা তাহারে সংস্কারেতে মুদিয়ে আনে গুটায়
অন্ধকারে বৃক্ষলে আবরি।

শ্রীকালিদাস রায়।

প্রয়াগে শিল্পপ্রদর্শনী ।

প্রয়াগের শিল্পপ্রদর্শনীর আশ্রয় বিরাট-প্রদর্শনী আমাদের দেশে বহুকাল হয় নাই। এবাবকার এ প্রদর্শনী যুক্ত প্রদেশের গবর্মেণ্টের উদ্যোগে ও ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, ইহা কানীষ মহাসমিতিবই অস্তবঙ্গ। মহাসমিতিব অধিবেশনের সহিত প্রতি বৎসরে যে প্রদর্শনী হইত, তাহাটী অবলম্বন করিয়া যুক্তপ্রদেশের গবর্মেণ্ট এই বিরাট আয়োজন করিয়াছেন। সমস্ত প্রাদেশিক গবর্মেণ্টই এই প্রদর্শনীর সফলতার জন্ত যথাসাধ্য আয়োজন ও ব্যয়ের ক্রটি করেন নাই, এবং ভারতগবর্মেণ্টও প্রদর্শনীকে পাঁচ লক্ষ মুদ্রা ঋণ দিতে কৃষ্টিত হন নাই। এ টাকাটা অবশ্য প্রদর্শনার আয় হইতেই শোধ যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতের করদ ও মিত্র রাজারাও গবর্মেণ্টের এই কন্ঠে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়াছেন এবং আপন আপন রাজ্য হইতে শ্রেষ্ঠ শিল্প ও অত্যাশ্রয় সামগ্রী প্রদর্শনীতে পাঠাইয়াছেন। ব্যাপার যে কত বিরাট ও চমৎকার তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। আমরা সংক্ষেপে তাহার অল্প আভাস দিবাব চেষ্টা করিতে'চ মাত্র।

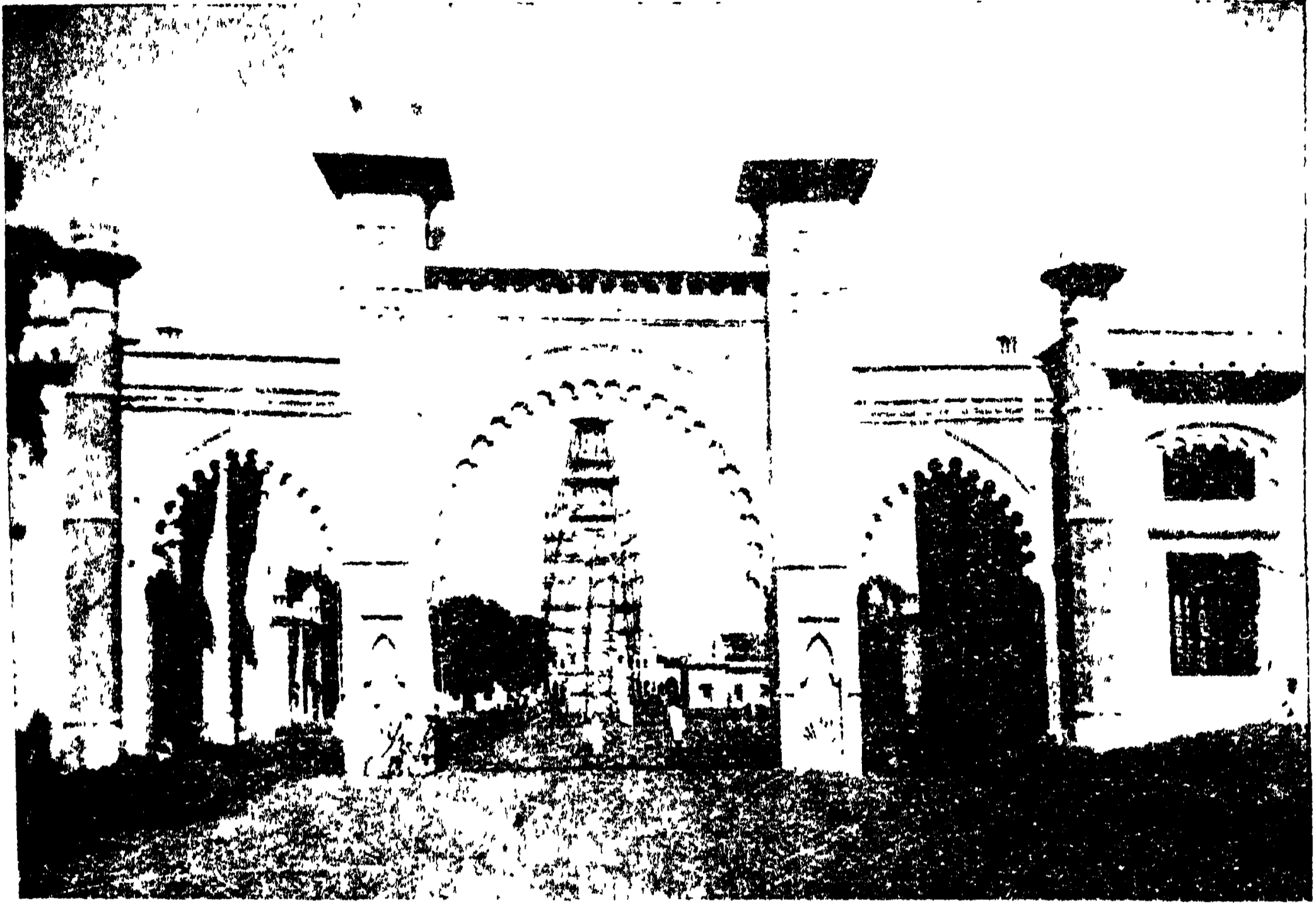
গঙ্গা যমুনার সম্মুখস্থলে প্রয়াগের প্রাচীন তর্গের সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ-প্রান্তরে এই প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। এক একটি বিষয়ের এক স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা ছাড়া ভ্রমণ, বিশ্রাম ও আহারা'দর জন্ত স্বতন্ত্র স্থান ও আয়োজনেবও ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই সকল বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আমরা প্রধান কয়েকটি বিভাগের উল্লেখ করিব।

প্রথম দেশীয় রাজাগণের বিভাগ। এই বিভাগে ববোদা, গোয়ালিয়া, জম্মু, কাশ্মীর, জয়পুর, যোধপুর, বিকানির, কোটা, আলোয়ার ও অত্যাশ্রয় স্থানের বিভিন্ন মনোহর ও বহুমূল্য শিল্প সামগ্রী প্রদর্শিত হইয়াছে। অধুনিক ক্রটিব অনুগত ও ব্যবহারের উপযোগী শিল্পপ্রদর্শনীতে গোয়ালিয়াব রাজ্যই সর্বাগ্রগণ্য। এ সকল দ্রব্য সূন্দর বা মনোহর না হইলেও নিত্য ব্যবহারে নিত্যস্তুই আবশ্যিক। গোয়ালিয়াবের চামড়াব কলে প্রস্তুত ঘোড়ার সাজ হইতে জুতা পর্যন্ত নানা প্রকার চামড়াব দ্রব্য দেখতে পাওয়া যায়! ধাতব শিল্পেবও অভাব নাই—বাক্স পাটবা হইতে আবস্ত কবিয়া কুনুপ পর্যন্ত সকল প্রকার জিনিষই আছে। আবার এই বিভাগে ভূবনখ্যাত চান্দোরি মসলিনেব অপকৃপ শিল্পনৈপুণ্য ও কারুকার্য্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। সম্প্রতি গোয়ালিয়াবে একটি নিবের কল খোলা হইয়াছে। এই কলের বহুপ্রকার নিবও প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বহুমূল্য কাপেট, প্রস্তর ইত্যাদি অসংখ্য বস্তুর অভাব নাই।

জয়পুরেব বহুমূল্য রত্নাদি ও খোদিত মর্ম্মরে শিল্প চাতুর্য্য দেখলে চমৎকৃত হইতে হয়। জয়পুরেব প্রাচীন চিত্রশিল্প বর্ণ বৈচিত্র্য্য ও শিল্পগৌরবে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

যোধপুরের গজদন্ত নির্মিত বস্তুগুলি অতুলনীয়। এমন সুন্দর কারুকার্য্য আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। যোধপুরের শিল্পারা যে কতকগুলি খোদিত মর্ম্মর



প্রদর্শনীর তোৰণ ।



দেশীয় রাজগণের বিভাগ

প্রস্তরের চেয়ার, ফুলদান ইত্যাদি পাঠাইয়া-
ছেন সেগুলি দেখিলে এ সকল দেশের অতীত
গৌরবের কথা মনে পড়ে এবং সুখেব সঙ্গে
একটা ছুঃখের ভাব আসিয়া প্রাণটাকে উছোলত
কারয়া তোলে।

তাহার পর অযোধ্যা বিভাগ। এখান-
কার দ্রব্যগুলি অযোধ্যা প্রদেশের বর্তমান
ভূস্বামীবা দান করিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে অবিকাশ দ্রব্যই এককালে
অযোধ্যাব মুসলমান নৃশাতগণের সম্পত্তি ছিল,
এবং এক্ষণে সেগুলি অমূল্য বলিলেও অত্যাঙ্কি
হয় না। প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায়
কতকগুলি 'ঝোবি' রহিয়াছে। এই সকল
'ঝোরি' অর্থাৎ রেকাব নবাবেরা ব্যবহার
করিতেন। দিল্লীর ঘোরিবংশের রাজাগণ এই
'ঝোরি' এদেশে প্রচলিত করেন। এই সকল
রেকাবে নাকি বিষমি শ্রুত খাণ্ড রাখিবামাত্র
এগুলি ভাঙ্গিয়া যায়, বলিয়া তাহার বিখ্যাস
করিতেন। আনোকটি ত্রুত হস্তালাপির মধ্যে
হুই একটি একটা অমূল্য বস্তু আছে যে
তাহা একবার নষ্ট হইলে আর তাহাব
পুনরুদ্ধার অসম্ভব। একটি আবুল ফজলের
স্বহস্ত লিখিত আকবর নামার পাণ্ডুলাপি।
আকবর স্বহস্ত স্থানে স্থানে যে সকল
সংশোধন করিয়াছেন, সেগুলি পর্যাপ্ত আজিও
সুস্পষ্ট রহিয়াছে। আর একটি আওরঙ্গজেবের
কণ্ঠা জয়বনের খসুরোধে সখ্যাটের আদেশক্রমে
লিখিত কোরাণেব প্রাতলাপি। আওরঙ্গজেব
এই কোবাণখান জুম্মা মসজিদে রাখিয়া
রাজামধ্যে ঘোষিত কারয়াছিলেন, যে ব্যক্তি
ইহাতে কোনও ভ্রম বা হর করিতে পারিবে,
সে প্রত্যেক ভুলের জন্ত লক্ষ মুদ্রাপারিতোষক

পাইবে। অযোধ্যার নবাবদিগের চিত্র এবং
তাঁহাদের ব্যবহৃত স্তব্ধ রৌপ্যের হাওদা,
পরিচ্ছদ, শাল ইত্যাদি রহিয়াছে। সে
কালে চানরাজ্য হইতে দূতেরা নানা
প্রকার উপঢৌকন লইয়া উপস্থিত হইতেন।
এইরূপ একটি উপঢৌকন প্রদর্শিত হইয়াছে।
জিনিষট একখানি অত্যন্ত পাতলা কাগজে
লেখা বই। ইহার পত্র পত্র মেকালে চীন
দেশে যে সকল ভাষণ শাস্তি প্রদত্ত হইত,
তাহারই চিত্র রহিয়াছে।

তাহার পর মহলাবিভাগ। এ বিভাগে
ভারতের নানা স্থানের বালিকা বিদ্যালয় ও
অস্ত্রপুর হইতে নানা প্রকারের বিচিত্র শিল্পজাত
বস্তু আসিয়া সমবেত হইয়াছে, সকলগুলিই
সুন্দর ও মনোহর।

শিক্ষা বিভাগটি একটি নূতন ব্যাপার।
ইতিপূর্বে শিক্ষা সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ
কোন প্রদর্শনাতেই খোলা হয় নাই। দেশের
শিক্ষকাদিককে শিক্ষাদান করা ও জনসাধারণকে
শিক্ষাবসয়ে উৎসাহিত করাই এ বিভাগের
উদ্দেশ্য। প্রাথমিক শিক্ষা হইতে মুক ও
বর্ধরের শিক্ষা পর্যাপ্ত সর্বপ্রকার প্রচলিত
শিক্ষার এক একটি স্বতন্ত্র অস্ত্রবিভাগ খোলা
হইয়াছে। এবং ভারতীয় এই সকল ব্যাপারের
পার্শ্বেই হংলণ্ডের প্রচলিত শিক্ষানীতি দেখান
হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন শিল্পবিদ্যালয়ের
দ্বারা নির্মিত যে সকল দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছে,
সেগুলি দেখিলে মনের মধ্যে বেশ একটা
আশা ও আনন্দ জাগ্রত হইয়া উঠে।

ইহারই একপার্শ্বে প্রাচ্যশিক্ষা বিভাগ।
এখানে প্রাচীন আরবী, পারস্য ও সংস্কৃত
হস্তালাপগুলিই সর্বাপেক্ষা অধিক মনোহর।

পোষ্ট কার্ডের ত্রায় ক্ষুদ্র একখানি কাগজ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কাগজের উপর দুইখানি পাবসী পুস্তক লিখিত হইয়াছে। আশ্চর্য্য অধ্যবসায় ও লিপিত্যুর্ঘ্য। একস্থানে সম্রাট আকবরের প্রিয় কবি ও মন্ত্রী আবুল ফজল এবং ফৈজির লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদের পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে। একখানি বাবনামা অর্থাৎ বাবরের স্বহস্ত-লিখিত আত্মজীবনী রহিয়াছে। ইহাব মধ্যে আকবরের প্রসিদ্ধ চিত্রকরণের চিত্রিত কয়েকখান অতি সুন্দর চিত্র রহিয়াছে। বহু বৎসর পূর্বে প্রসিদ্ধ কবি চাঁদ হিন্দিতে পৃথারাজের রাজত্বের যে ইতিহাস লিখিয়াছিলেন তাহারও পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে।

তারপর এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। এখানে বিগাতা কোম্পানীরা আধুনিক নানা প্রকার কলকারখানা দেখাইয়াছেন। এ বিভাগটিতে আমাদের চিহ্ন কোথাও নাই। কলকারখানা ব্যাপারে পাশ্চাত্যেরা এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, যে এ বিষয়ে তাঁহাদিগের নিকট আমাদের শিক্ষালাভ করিতেই দাঁঘকালের আবশ্যিক; প্রতিদ্বন্দ্বিতা ত' পবেব কথা!

বস্ত্রবিভাগের মধ্যে প্রবেশ করিলে যুক্তপ্রদেশের কলপ্রস্তুত নানা প্রকারের কাপড় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। এবিষয়ে যুক্তপ্রদেশ অল্পদিনের মধ্যে যেরূপ উন্নতি করিয়াছে তাহা প্রশংসা যোগ্য। কলগুলি বিলাতী সত্য, কিন্তু সে দোষ বিলাতবাসীর নয়, আমাদেরই অজ্ঞতা ও উদ্বিগ্নতার ফল!

তাহার পর ভারতের শিল্পকলা ও অলঙ্কার বিভাগ। কলাবিভাগে খৃষ্টপূর্ব ২৫০ সাল

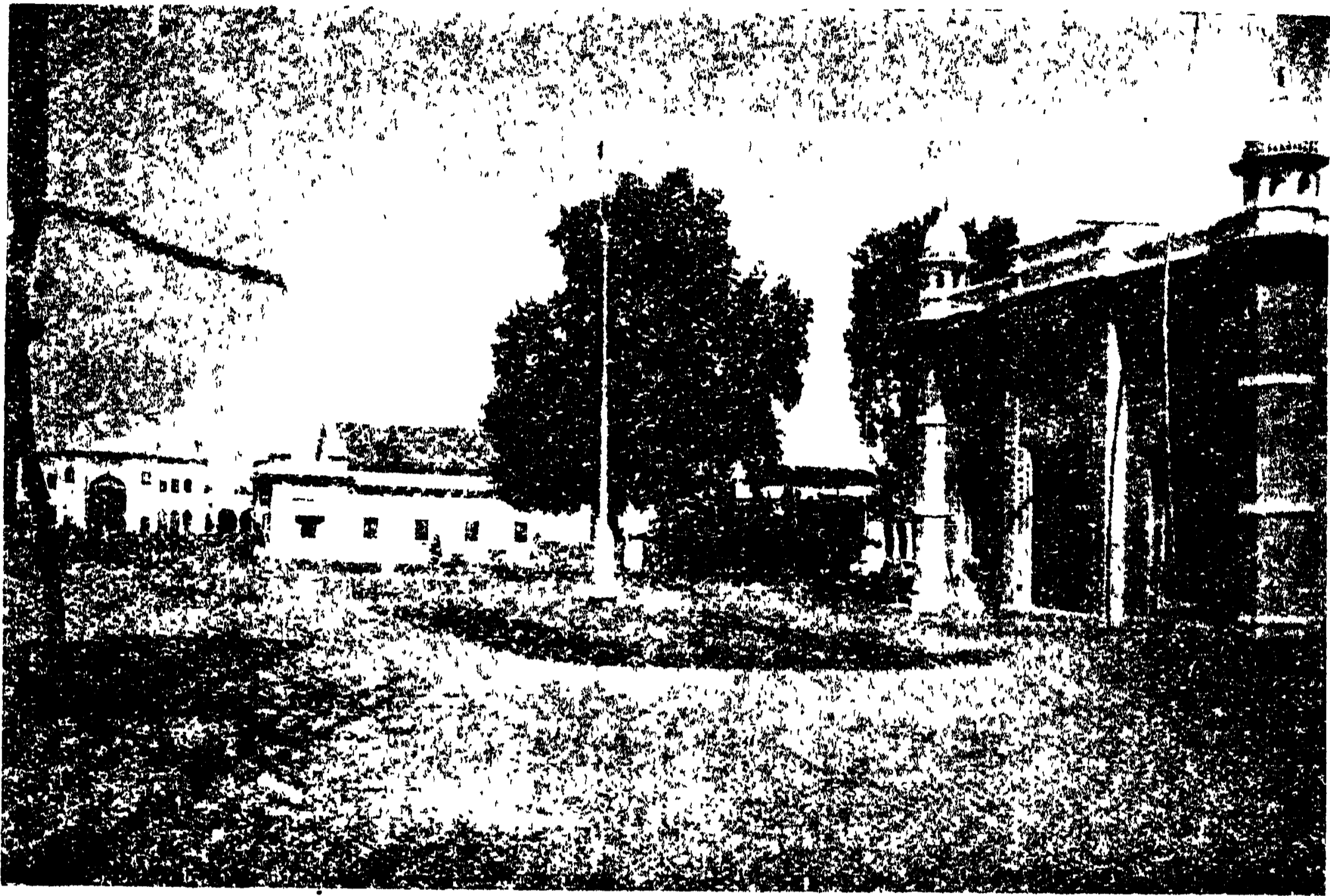
হইতে বর্তমানকাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন শিল্পযুগের স্বাতন্ত্র্য অনুসারে দ্রব্যগুলি বিভক্ত করিয়া দেখান হইয়াছে।

মোগলশিল্প হস্তলিপির দ্বারাই প্রদর্শিত হইয়াছে। একদিকে স্তবে স্তরে কেবল প্রাচীন আরবী ও পাবসীগ্রন্থ রহিয়াছে। অপর একস্থানে মোগল সম্রাটদিগের প্রাচীন চিত্র রহিয়াছে। চিত্রগুলির বর্ণবৈচিত্র্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়।

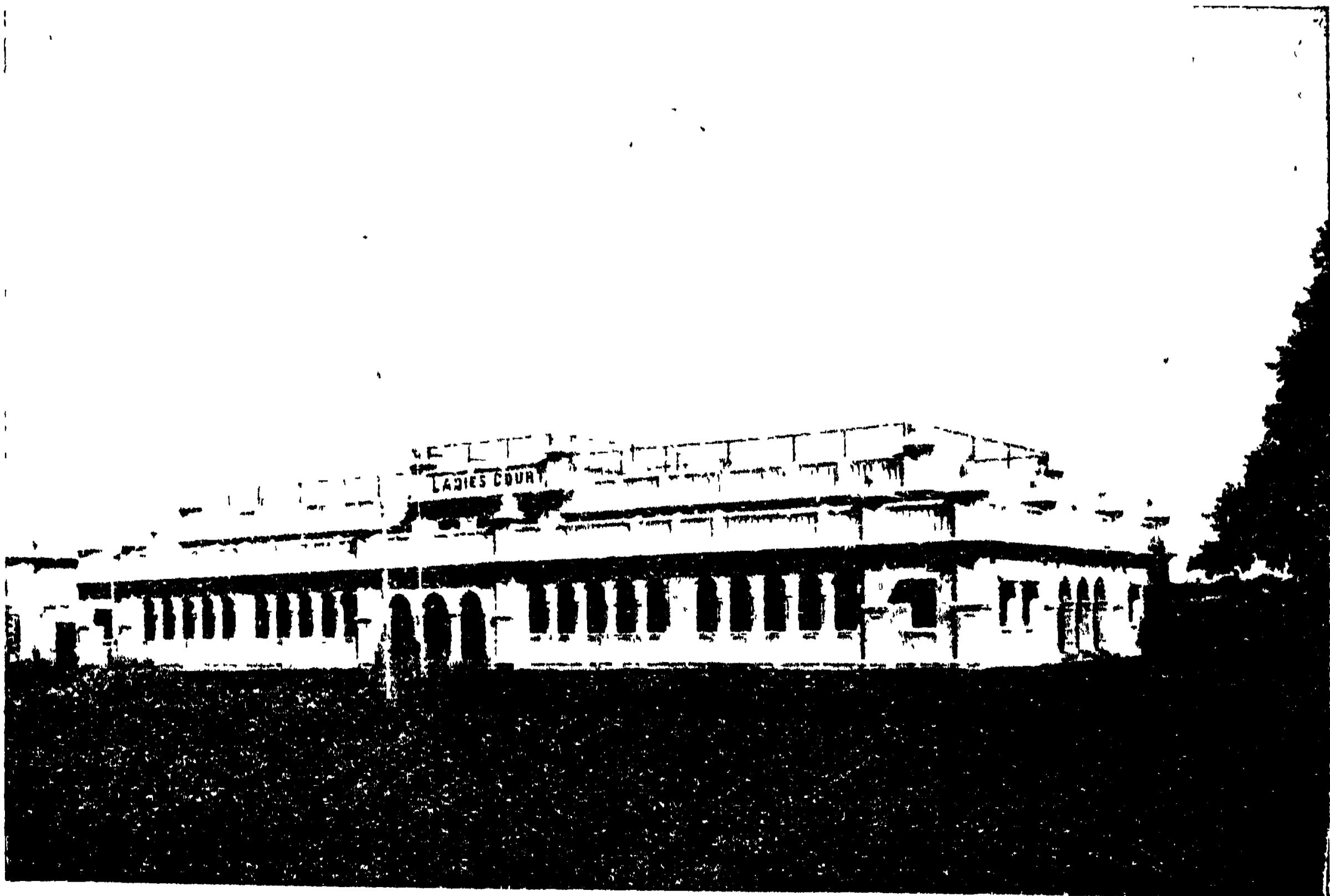
অলঙ্কারবিভাগে কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত যত প্রদেশের যত শ্রেষ্ঠ সামগ্রী সবই প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাচীন কয়খানি জাপানী মুদ্রা বহিয়াছে। সেগুলি স্বর্ণ নিয়িত, এবং আকাবে এক একখানি দশ টাকার নোটের মত। অলঙ্কার বিভাগের সুন্দর দ্রব্যগুলির অধিকাংশই সাধারণের পক্ষে তর্মুলা। গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলে মনে হয় যেন আলাদিনের রত্নগৃহে প্রবেশ করিয়াছি।

এবাবে বনজ দ্রব্য লইয়া একটু পরে বনবিভাগ খোলা হইয়াছে। বনবিভাগের স্থানটিই সর্বাঙ্গের সুন্দর ও মনোহর এবং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। একটু বাগীতে নানা প্রকারের ক'ষ্ঠ প্রদর্শিত হইয়াছে। আব একটুতে নানা প্রকারের মৃগয়াহত বগ্ন জন্তু এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন অস্ত্রাদি আর একটু বাগীতে সহস্র প্রকারের শস্ত্র ও বাজ প্রদর্শিত হইয়াছে। বনবিভাগটি দেখিলে অনেক অজ্ঞাত ব্যাপার শিক্ষা করা যায়।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একস্থানে মেজর বি, ডি 'সু' নানা প্রকারের ভারতীয় ঔষধ প্রদর্শিত করিয়াছেন। তিনি একসহস্র তিনশত



শিল্প ও অলঙ্কার বিভাগ



মহিলা বিভাগ ।

প্রকারের লতা-গুজাদি সংগ্রহ কবিরাছেন ।
‘এক বে’ব ক্রিয়া, প্লেগেব বিষপুই মাছি,
ম্যালেরিয়া পুই মণ ইত্যাদি দেহবক্ষ্যের জন্য
জ্ঞাতনা নানা বিষয় এই বিভাগে পবাফা বা
চিত্রদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে ।

আব একটি নূতন ব্যাপার এবাব
প্রদর্শনাতে দেখা গেল । কিছুদিন হইতে
পাশ্চাত্যদেশে অনেকে উড়িয়া বেড়াইতেছেন,

কিন্তু ভারতে একপ ব্যাপার দেখিবাব সুযোগ
ই তপূর্বে ঘটে নাই । বিলাত হইতে ছুইজন
অভিজ্ঞ বাক্তি আসিয়া উড়িবাব যন্ত্র লইয়া
আকাশমার্গে উড়িয়া বেড়াইতেছেন । আমাদের
কালকাতাতেও সম্প্রতি ছুইবাব একপ ব্যাপার
আমবা দেখিয়াছি, এখন আমাদের কাছে
ইহা আব নূতন নাই ।

কাব্যে নিদাঘ-চিত্র ।

গ্রীষ্মকালীনায় শুষ্কশীর্ণতা, বৌদ্ধকর-
নিচ্ছুরিত অগ্ন্যুষ্টি, নিস্কল মনোহের মর্য়নিহিত
আত্মনাদ, ক্ষীণকায় সলিলাপাথ, নুচকাটা প্রান্তব
এবং অলস ও শিথিল কর্মপ্রণাথেব একটা চিত্র
ঠাং আমাদের চোখের সামনে পড়ে ।

ইহার মার কবিচিত্র কোন বসেব সন্ধান
পাইয়াছে, ভ্রমরেব ত্রায় ইহাব বন্ধে বন্ধে
কোন্ অমৃত কবিকে লুকু কবিয়াছে তাহা
জানতে উৎসুক হইয়া অসম্ভাবিক নহে ।

নিদাঘ-মরুর ইতস্ততঃ নিষ্কপ্ত খজ্জুব-
বাথিকা ও তালীবনের অস্তবালে এই
গোপন অমৃতানাদ, খবতর উগ্রতার মাঝে
গুণ্ঠনময়ী ললিত লক্ষ্মীর অমর্তমূর্তি স্কুমার
শিল্পীব শিরীষ-কোমল তুলিকায় অঙ্কত ।

আরব কবিব সুস্থ মুক্ত আনন্দ সাহারার
অগ্নিব-সমুদ্র নির্ধা পচ কবিত্তে পারে নাই ।
তাহাব প্রলুকু দৃষ্টি, শত শত হরদ্বর্গ উষ্ণীয়ারী
নালবস্ত্রব শখল প্রাচুর্য্য ভবপূব, দীর্ঘকায়
মরুপাঙ্ক কর্তৃক অধিষ্ঠিত দার্ঘ্যগীব উষ্ট্রপর্যায়ের
পশ্চাতে ছুটিয়াছে । স্বেদাক্ত ললাট, কঠিন

ক্ষিপহস্ত, রক্তাক্ত কপোল, তীক্ষ্ণনয়ন নবনারী
আরব কবিব চোখেব সামনে প্রবল ঐদাশ্বেব
সহিত অগ্নবপ্ত মরুশ্রেণীব মাঝে ডুব দিয়া
ছোটে । উষ্ট্রেব অনিচ্ছা ও বন্ধিমদৃষ্টি,
রাসবজ্জুদ্বাবা সংযত হইতেছে । চার্দকের
ক্ষুধার্ভ বিপুল শৃঙ্খতা, শুভ্রকরোজ্জল শুদুরের
চক্রবাল, যেখানে সুরম্য মরীচিকায় অলৌক-
রসে পূর্ণ হইয়া উঠে তাহার প্রান্তশায়ী আরব-
পল্লী কোণের কুটির-প্রাণ, এই সাহার-সমুদ্রে
অহরহঃ ভাসিয়া বেড়ায় । এই বিচিত্র,
উত্তম-চঞ্চল, সুদীর্ঘ প্রমাণে নরনারীর চিত্ত
বৈশাখী ঝড়ের হিল্লোলে কম্পমান রক্ত-
গোলাপগুচ্ছেব ত্রায় উষ্ট্রেব পৃষ্ঠে কম্পিত
হইয়াছে । এই প্রমাণের আবর্তমোহে,
মরুনির্ঝরের আকর্ষণ বোধহয় পর্যাপ্ত নহে ।
রুদ্ধতব দেব, সেই পাগল নিদাঘেব হিংস্রতার
মাঝে যেন বনলতাকে অয়স্কাস্তমণির ত্রায়
আকর্ষণ কবে ।

আরব নবনারী মরুর নিষ্ঠুর কোলে
ওমানের শুভ্র মুক্তা, হৃদমঠের কস্তুরীগন্ধ,

আদীনের বুলবুল বুলবী ও উপবন এবং
বিমেনের এলাইচ ও দারুচিনিব সুবাস
প্রভৃতির স্বপ্ন দেখে ।

আরব চিত্তস্তব হারুন-অল-রসিদেব ছায়
সম্রাট রহশাকুল করিয়া তুলিয়াছে—ইবন্
মোকনেমেব ছায় কবি, আরেষা ও লয়লাব
ছায় নাবী, কসিদা ও গজলগানে মরুভূম
উর্দবতাব ছিল্লাল তুলিয়াছে ।

পূর্বদেশীয়গণের ছায় অত্র কেহই
নিদায়ে কাবাকে বিশেষভাবে জীবনের অঙ্গ করে
নাই । চারুগণের কবিতার আৱৃতি গুনিয়া,
আরব, তুর্কী, পার্সী, ভাবতবর্ষেব সহিত একামনে
বসিয়া সহজেই বর্তমানের দৈত্য ও দারিদ্র্য
স্বৃতি কল্পনার মধুক্রোড়ে হারাইয়া ফেলে ।

আরবীয়গণ মক'নশীখের কঠোর শীতর্ষ
সময়, তাঁবুব মাঝে মাঝে প্রসন্নত অগ্নিকুণ্ডেব
চারিদিকে উপবেশন করিয়া কাল্পনিক আখ্যান
ও কাব্যরসেব মাদক ছায় নিবিষ্ট হইয়া দিনের
সকল কর্ম, ও শ্রম তুলিয়া যায় । অত্র
নিপুণ ভাষকগণ পৌড়িতগণেব চিত্তবিনোদনার্থ
ভেষজরূপে কবিতা আৱৃতির ব্যবস্থা করে ।

আরব্য কল্পনা আরবগণের জীবনের
ছায়ই বিচিত্র, উজ্জ্বল, ও রসময়ী ! আরব্য
নিশীথের কল্পনায় একাদশ সহস্রটি সুন্দরী
কাহারনা :চিত্ত হরণ করে ? এইজন্ত
কল্পনাকুশল কবির আরবসমাজে সুনির্দিষ্ট
স্থান আছে । নরনাবীর প্রেম ও আকাঙ্ক্ষা
বেদনা আরব কবির চিত্তে প্রতিধ্বনিত
এবং সকলের আকাঙ্ক্ষা তাহাব মাঝে
সহানুভূতি লাভ করে ।

মরুভূমি আরব'চক্রে বড়ই মহার্হ ।
তাহার নানা ইতিহাস, নানা সংগ্রাম নানা

স্বপ্ন ও আড়ম্বল আৱচিত্ত যেন পূর্ণ
করিয়া রাখে ।

তাহারই ফলে আমবা স্বদৃঢ় হইতে
ক্ষুণ্ণ সঞ্চরণশীল, বিহীন-আবনীমক কটি-গ্ন
শাণিত ছুরিকা, উদ্যাব দৃষ্ট, তীক্ষ্ণ ভ্রাণশক্তি
লইয়া প্রাপ্তবে ছুটেতে দেখি । আন্দোলনের
উত্তেজনা, বিক্ষাণিত দৃষ্ট, চিত্তপ্লাবী, অর্গলহান
সমুজ্জল হস্ত লইয়া যেন তাহাসেব প্রাপ্ত
হইতে বিহীনগণ হরিণের ছায় ছুটিয়া
বেড়াইতেছে ।

বৌদ্ধতীর্থেব এই অধিবাসীর হৃদয়কোণে
কি নিদায়েব কল্পিত গুণিত পাটব ? খব-
বৌদ্ধেব উষতার কোণে বর্জিত ইহাদেব
প্রকৃতও যেন খবরোদ্র ধর্ম্যে রূপান্তরিত
হইয়াছে । প্রাণ জিঘাংসা, শ্রাস্তগান
সংগ্রাম, শাণিত তববারার কোণবিহান
অনুভূত রক্তহিল্লাল একদিকে, অত্রদিকে
মরুভূমির ছায় হৃদয়কোণে লুকাইত,
অপরিসাম অপভ্রমের, প্রেম ও ভক্ত, এবং
শৈলকন্দরে গ্রীষ্মাপস্পৃশা—উভয়রসে, যেন
যুগপৎ উষতা ও শৈত্যে অনুমিত মরুরাজ্যের
সহিত ইহাদের অবিচ্ছেদ্য যোগ সংঘটন
করিয়াছে ।

আরবীয়গণ কাব্য'চক্রে একেবারে পাগল
হইয়া উঠিতে পারে । কালিফ বৈঠকের
রাজত্বকালে সঞ্জীতজ্ঞ আবু মছম্মদ, কালিফকে
এমন অভিভূত করিয়াছিলেন যে তিনি সিংহাসন
হইতে উঠিয়া তাহার নিজের বহুমূল্য হারক-
খচিত পরিচ্ছদ কাবর দেহে নিক্ষেপ করিলেন ।
বিখ্যাত ওস্তাদ অল ফেরবী কালিফ
নৈককল্পকে যুগপৎ হস্তে টলাসত, কন্দনে
বিগলিতাশ্র, এবং পারশেষে নিদ্রাতুর করিয়া



কৃষি বিভাগ ।



বন বিভাগ

সঙ্গীতের গৌরব ও বিশ্বজয়ী শক্তি প্রমাণ কবিরাছিলেন।

পাশ্চাত্য কবির কথাও আসিয়া পড়িতেছে। খবতর নিদাঘে বিপণিশ্রেণীব সূক্ষ্মায় স্নিগ্ধতার মাঝে হেনাব গন্ধ, তরমুজেব সুরাস, আঙুরেব গুরু প্রাচুর্য ও কিস্মিসেব সরবৎ খুঁজিতে হইলে পারসিক ভূমিতে পদার্পণ করিতে হয়। তবল লোহিত নদিবাব অবিচ্ছিন্ন আকর্ষণ এমন আব কোথায় আছে? গোলাপী রঙেব কাজল-পনা, অঙ্কিত দরমণীব তরুণ মুখশী এমন সুলভ কোথায়?

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সুনীল-উজ্জল আকাশ তলে আলোক ও হাঁওগার মাঝে সরিৎ-সরোবরেব স্রোতময়ী জলধাবা উপভোগেব সুখ, শীতার্ভ জাতির কল্পনায় তেমন স্থান পাননা। গ্রীষ্মভূমিতে এই কারণেই বহিজর্গতের সচিত মেনামেশাপ সুযোগ বেশী ঘটে। কাজেই উত্তান, উৎস, মুক্ত গবাক্ষ, কুঞ্জবন, তরণীবিহাব, জ্যোৎস্না-উৎসব, দক্ষিণ-পবন প্রভৃতির সহিত ভাবের বাণিজ্য একটু বেশী হয়! এখানে মৃগনাভি গন্ধে, গোলাপ-মাগ্যেব শয্যাস্তবণ, কুঙ্কম রক্ত গালিচা, উৎসমুখর স্ফটিক-স্নানাগার প্রভৃতির মোহিনী শক্তির আকর্ষণ বড়ই প্রবল। আহমেদের তবমুজ শ্রীতি, হাকেজের প্রগাপ-মবীচিকা ও আকোণান সামাজিকতা, ওমব খৈয়মেব স্বপ্ন, এনব ত ক্রমশই বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

পল্লব-পবাগ প্রভৃতিব মাঝে তন্ন তন্ন করিয়া পাবসিক চিত্র সৌন্দর্য্য খুঁজিয়াছে; এজ্ঞ খণ্ড ও গীতিবাণ্ডে ইহার সমকক্ষ জগতের কোথাও পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য কবির যে কোন কবিতার সৌন্দর্য্য জগতের

এই শ্রেণীর অন্ত্যস্ত কাব্যচেষ্টাকে গ্লান করিয়া দেয়!

অপরদিকে ভারতবর্ষে এক বিচিত্র ব্যাপক রাগিনী ধ্বনিত হইয়াছে। অধ্যাত্মবাদী ভাবত্ববর্ষ, কবিতার মাঝে কোন খণ্ডগীতি বদ্ধত করে নাই। কলারাজ্যে ব্যাপকত্বের প্রতি একটা নৈসর্গিক আকর্ষণে, চিত্তবস্তুর হৃৎকে উপলক্ষি করিয়া অংশকে তাহার সম্পর্কেই প্রভাব কবিরাছে। প্রতি খণ্ডের সৌন্দর্য্য সমগ্রের মাঝে তাহার সুনির্দিষ্ট আসন অনুসারে, চিত্তিত হইয়াছে। এজ্ঞ বর্তমান যুগে যাহাকে গীতি কবিতা বলা হয় তাহা সংস্কৃত সাহিত্যে নাই বলিলেই হয়।

ভারতে প্রাকৃতিক ঐর্ষ্যের অধিক্রমে হৃদয়েব পরিধিও বিস্তৃত হইয়াছে। নিবিড়তর সংযোগরজ্জ্ব বসুধাকে আত্মীয়তার আলিঙ্গনে ঐক্য দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকতর চবমের, দৃঢ় সৌন্দর্য্য গুণবিহীন সজ্জায় উন্মুক্ত হইয়াছে।

প্রথমেই গাঙ্গনৈকত, সিন্ধুবিতস্তার বেলাবলয়, নর্মদা কালিন্দীর ললিত লাশ্রভূমি, কদম্ববনচ্ছায় যমুনার নীলতোয়া, কাশ্মীরের স্নিগ্ধ হৃদপ্রাচুর্য্য, চিত্রকূট ও বিক্রোর সমারোহ; পঞ্চবটির মহার্হ সম্ভাব, কৈলাস ও হিমালয়ের উদার মহত্ব—এ সমস্তের সজ্জা বিস্তৃতি ও বিক্ষেপ আমাদিগকে চকিত করিয়া তোলে।

পরম রমণীয়, উপভোগ্য গ্রীষ্মকে অবহেলা করিয়া, ভারতে কে কখন শৈলকন্দরে লুকাইয়াছে? ভারতের সুন্দরতম নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলা গ্রীষ্মকে উপলক্ষ্য করিয়াই রচিত হইয়াছে।—

নটী। তবে কোন ঋতু অবলম্বন করিয়া গান করিব ?

স্ব। আর্য্যে, তুমি অচিরাগত, উপভোগভোগ্য গ্রীষ্মসময় অবলম্বন পূর্ব্বক গান কর। দেখ এখন অতিশয় সুখন সলিলস্নান; পাটলোকুহুমের সংযোগে অরণ্যসমীরণ সুরভিময়, ছাষায় নিদ্রা অতি স্থলভ, এবং দিবসের পরিণামভাগ অতি রমণীয়।

নটী। তাহাই হোক—শিরীষকুহুমের সুকুমার কেশর শিখাসমূহ, ভ্রমর কর্তৃক ক্ষণে ক্ষণে চূষিত হইতেছে এবং সদয় হৃদয়া রমণীগণের কর্ণে তাহা ভ্রষণ রূপে শোভা পাইতেছে।

ভারতবর্ষে গ্রীষ্মে উৎসবের উদ্যমতা বাড়িয়া উঠে। শ্রামল বনরাজির ছায়াবন প্রান্তবের মাঝে স্তিমিত কল্লোল লোকালয়ের অজস্র গুঞ্জনধ্বনির অবকাশে নিদ্রাঘের উৎসব আয়োজন চলিতে থাকে। বিশেষতঃ দিবসে, অলস আবেশেব মাঝে নিদ্রাতুবেব, সত্ত্ব অন্ত-হিত বসন্তের উজ্জলস্মৃতি এবং ভবিষ্য-বর্ষার সামোপ্য চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া তোলে।

কাব্য বলে, গ্রীষ্মে “সুভগ সলিলাবগাহাঃ।” প্রথর রৌদ্রাতপদগ্ন কলেবর সলিল মাতার আলিঙ্গনে যে লোভনীয় স্নিক্ততা আনয়ন কবে, তাহা বীচিবিক্ষোভ শাতল চম্পক গন্ধভরপূব বায়ু একান্ত পুলকময় কবিয়া তোলে। তরুণীরা চন্দন ও পদ্মরেণু মাখিয়া কুঞ্জবনে অলস জীবন যাপন করে।

সংস্কৃত কবিরা গ্রীষ্মপীড়া ও প্রেমসম্ভাপকে অনেকটা সমধর্ম্মী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা হৃষ্যকু মনে ভাবিল :—

“তবে কি ইহা আতপদোষ অথবা আমার চিত্তের প্রেমসম্ভাপ ?”

“অথবা সন্দেহে প্রয়োজন কি? * * *
একটি মাত্র মৃগালবলয়—তাহাও শিথিল হইয়া

পড়িয়াছে। অতএব প্রিয়র এই দেহ পীড়ায়ুক্ত হইলেও অত্যন্ত মনোহর ভাব ধারণ করিয়াছে। প্রেম-সম্ভাপনিদ্রা সম্ভাপ তুল্য হইলেও গ্রীষ্মসম্ভাপ তরুণীদের শরীরে একরূপ কমনীয়তা দেখা যায় না, অতএব ইহা প্রেমসম্ভাপই বটে।

বৈজ্ঞানিকগণ এই নূতন আবিষ্কৃত ‘সিম্পটম’টি তাহাদেব গ্রহে যোগ করিতে পারেন এবং চক্ষুরাগ শাস্ত্রের ডাক্তারগণও ইহা স্ববণ করিতে পারেন।

নিদ্রাঘ ক্রান্তির মূলেও আনন্দরস লুক্কায়িত আছে। তরুণীগণেব শ্রান্তি গ্রীষ্মকালে মেঘবাতাহতা মগরীর মুচ্ছার ঞ্চায় প্রতীযমান হয়। পুষ্পময় শয্যা, উষাবলেপন, শিলাতল, নলিনীদল রচিত তালবৃন্ত, লতামণ্ডপ, মৃগাল-বলয়, কর্ণোৎপল, নিদ্রাঘের সুশীতল এ সমস্ত সজ্জা ভারতের হৃদরাজ্যে বড়ই উপভোগ্য।

সরিং সরোবর, কান্তার কন্দর গ্রীষ্মে কতনা উপভোগ্য। ভবভূতির দণ্ডকারণ্য চিত্র মনে পড়িতেছে।

স্নিক্তশ্যামাঃ কচিদপবতো ভীষণাভোগকক্ষাঃ

ইত্যাদি।

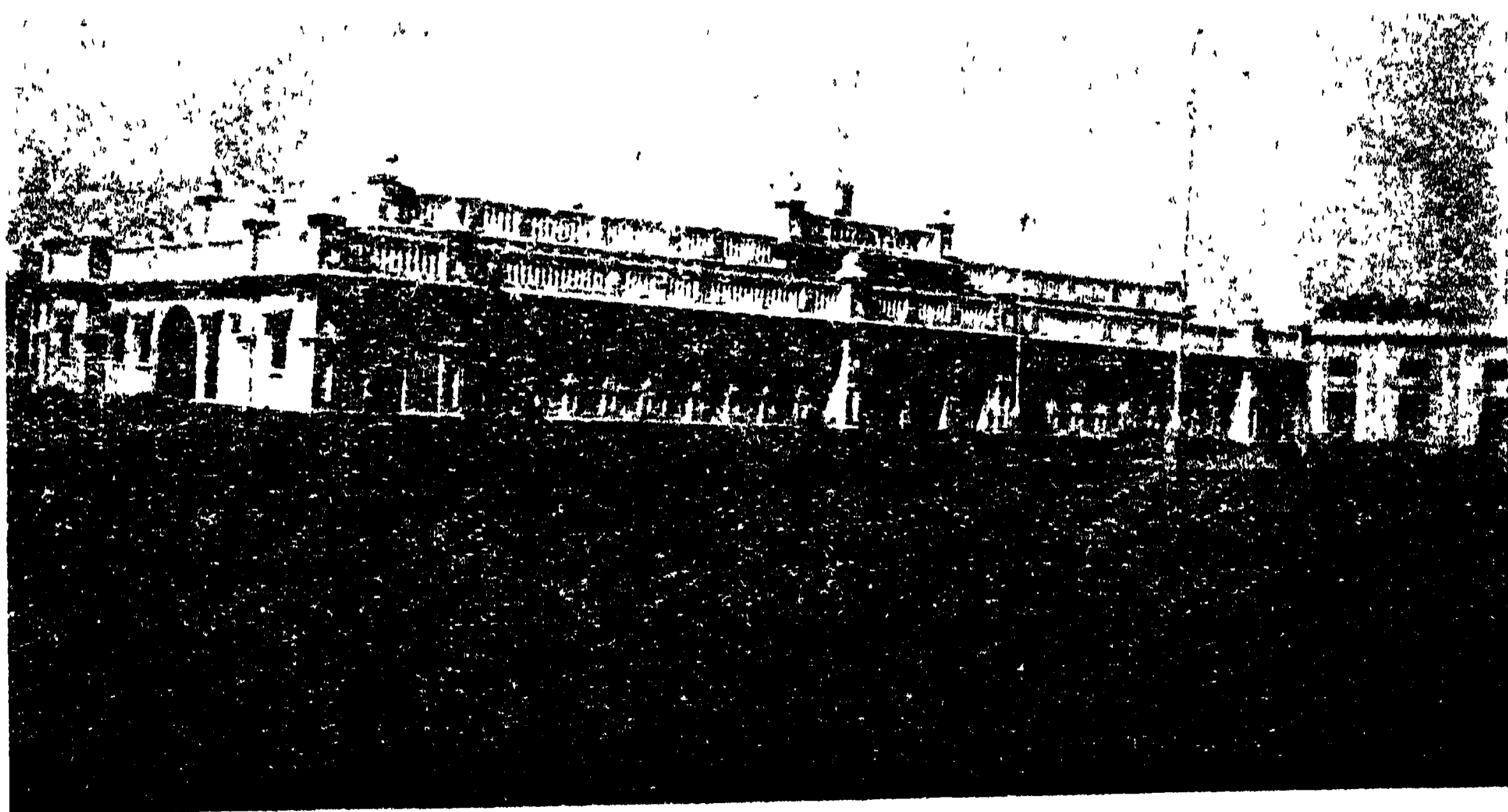
ইহা ছাড়া পবিমুদিত মৃগালের ঞ্চায় দুর্ব্বল অক্ষর অলসলুলিত অশিথিল পরিবস্তের কত চিত্রই চোখেব সাম্নে ভাসে।

চম্পাসবোবের মদকল মল্লিকান্ধের পক্ষ সঞ্চালিত পুণ্ডরীক এবং নীলোৎপল প্রভৃতির দৃশ্যে চিত্ত মোহিত হইয়া উঠে।

পদ্মগন্ধ আকর্ষণকারী শীতল বীচিমকুং, রামচন্দ্রের মোহ অপনয়নে ঘেরূপ সমর্থ হইয়াছিল, গ্রীষ্মবিভাষিকা পীড়িত শৈলশীর্ষে পলায়নপর বর্তমানের শিমলা-মরীচিকালুকগণকে ইহা আকর্ষণ করিতে পারিবে কিনা জানি না।



এঞ্জিনিয়াৰিং বিভাগেৰ একাংশ



শিক্ষা বিভাগ

ভবভূতির বিরহপীড়িত রাম সীতাম্পর্শকে মনে করিতেছেন ; —

প্রশ্চেত্যাতনং নু হরিচন্দন পল্লবানাং ; ইত্যাদি।

রত্নাবলীর মদনমহোৎসব প্রভৃতির মাঝে গ্রীষ্মভোগ্য কদলীগৃহেব ব্যবস্থা আছে !

নিদাঘমিলনের এক অপরূপ শ্রী কালিদাস অঙ্কিত করিয়াছেন।

“প্রচণ্ডসূর্য্য, স্পৃহনীয় শশাঙ্ক, অবিরল অবগাহনে শীর্ণজলাশয়, রমণীয় দিনাস্ত প্রভৃতিযুক্ত গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইল।”

ইহাছাড়া বিচিত্র বস্ত্রমুখর মন্দির, সরস চন্দন, সুবাসিত চর্যাতল, প্রিয়ামুখোচ্ছাস কম্পিত মধু, স্তম্ভিগীত, রমণীয় স্নিগ্ধদৃশ্য-ছকুল, গন্ধদ্রব্য, সুবভিত কবরী, লাক্ষা রসরাগ লোহিত চরণতল, হংসকাকলি অনুকরণকারী নুপুরসিঞ্চন, চন্দনাম্বাসিক্ত বায়ু, বীণাঝঙ্কার-আছত নিদ্রা,—এ সমস্ত চিত্র পরিস্ফুটভাবে কাব্যে স্থান পাইয়াছে !

কিন্তু এইরূপে শুধু নরনারীর হৃদয়ে প্রেমোন্মাদনা জাগাইয়াই গ্রীষ্মেব কাব্য শেষ হয় নাই। ইহা মানব-বর্জিত সৃষ্টিচিত্র সম্বন্ধেও উদার হৃদয় ভাবত কবির কল্পনাকে বিচলিত করিয়াছে।

ক্ষুধাপুষ্ট জিঘাংসা, খাণ্ডখাদকের সংহাবতন্ত্র অতিক্রম করিয়া গ্রীষ্মের প্রভাবে সর্প ময়ূরের ক্রোড়ে, সিংহ হস্তাগণের সমীপে বিচরণ করিতেছে। আহতদ্রব্যে বর্দ্ধিততেজ অগ্নিব-শায় রুদ্রপ্রচণ্ড রৌদ্রে ময়ূবগণের শবীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে ; এ জন্ত সর্প নিকটে আসিয়া আতপভরে পুচ্ছচক্রহায়ায় মুখ রাখিলেও উহাকে বধ করিতেছে না ! এই

চিত্র দেখিয়া নিদাঘেব কল্যাণ প্রভাবের উদ্দেশে জয়ধ্বনি করিতে ইচ্ছা হয় !

অন্যত্র ভেক ক্লান্তদেহে তৃষ্ণাতুর সর্পের ফণার নীচে নিঃশব্দে শীতল হইবার আশায় অবস্থান করিতেছে। বেচারি বোধ হয় আতপত্রটি ভালরূপে নজর করিবার সুযোগ ও সময় পায় নাই।

যাহা হউক কাব্যেও অন্ততঃ একপ মিলন মন্দ কি ? যাহাদেব চিত্র অহবহঃ মিলন, অহিংসা প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তায় মগ্ন তাহারি কালিদাসের এই সুন্দর সৃষ্টির জন্ত নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করিবেন।

গ্রীষ্মেব কঠোবশ্রীও আছে। আর এই কঠোব রুদ্র চিত্রের মাঝেও কবি সুন্দরের সন্ধান পাইয়াছেন। নিষ্ঠুরদাব-ছতাশনের দিক্‌দাহ-হাহাকাণ্ডের মাঝে কবি নিশ্চল মিন্দুর বর্ণে বিভার হইয়াছেন ; শাল্মলীবনে রাণাকৃত সূর্য্যকরবহ্নি কবির চোখে সূবর্ণের শায় প্রতীয়মান হইতেছে। বহ্নির দাহিকা-শক্তিও কবিকল্পনার যেন সৌন্দর্য্যে লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

কালিদাসেব সমাপ্তিও বড় সুন্দর : —

কমল বন চিতাশ্রুঃ পাটলামোদরশ্রুঃ

সুখ সলিল নিনেকঃ সেব্যচন্দ্রাংসুহাসঃ

ব্রজতু তব নিদাঘঃ কামিনীভিঃ সমেতো

নিশি সুললিতগীতে হর্ষাপৃষ্ঠে সূধেন ॥

নিদাঘনিশীথের জন্ত এই ব্যবস্থা করিয়া কবি পুনর্কিত হইয়াছেন। গ্রীষ্মপীড়ার জন্ত মেডিক্যাল কলেজের ফার্মাকোপিয়ায় এই প্রেসক্রিপশনটি লিখিয়া রাখিলে হানি কি ?

ক্রমশঃ

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

ক্রমবিকাশে অভ্যাসের প্রভাব ।

সমগ্র মানবজাতির ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টতঃ দেখা যায় যে দুইটি স্বাভাবিক নিয়মের বশে মানবের সমস্ত কার্য ও ব্যবহার পরিচালিত হইতেছে। মানব জাতসারে হটক আর অজ্ঞাতসারেই হটক সেই দুই নিয়মের বশীভূত হইয়া জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল অবস্থায় সকল সময়েই কার্য করিয়া থাকে। প্রথম অভ্যাস; দ্বিতীয় বংশানুগত্য; এই দুইটি স্বাভাবিক নিয়ম।

প্রথম নিয়ম অভ্যাসমূলক (Law of Habit)। ভূমিষ্ঠ হইবার সময় মানব অভ্যাসের সম্পূর্ণ অনায়ত্ত। ক্রমশঃ যেমন তাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি সতেজ হইতে থাকে, অভ্যাস তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করে। নবজাত শিশুর চক্ষু উন্মীলিত হয় বটে, কিন্তু সে উহার ব্যবহারে অক্ষম। কারণ পূর্বে হইতে তাহার অভ্যাস নাই। তাহাব পক্ষে সমস্ত জগৎ গর্ভকোটারের ত্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। সে চতুর্দিকে অন্ধকার দেখাই অভ্যাস করিয়াছে ও সেই অভ্যাসপ্রায়ুক্ত সকল দিকই অন্ধকার দেখে। এক দিন, দুই দিন, করিয়া প্রত্যহ তাহার সে অভ্যাস মন্দীভূত হইয়া আসে—সে আলোক দেখিতে অভ্যস্ত হয়। আগ্রহের সহিত আলো দেখিতেই তখন তাহার সুখ বোধ হয়। ঐ সুখের লালসায়, ঐ সুখ বোধের প্ররোচনায়, সে কেবল আলো দেখিলেই সুখী হয় বলিয়া ক্রমশঃ তাহার আলোকের জ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয় তখনও কিন্তু কোন বস্তুর বিস্তার অবধারণ করিবার ক্ষমতা তাহার থাকে না।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে সে সময় চক্ষুর আভ্যন্তরীণ রেটিনা (Retina) নামক ঝিল্লি অপরিপক্ব থাকায়, সেখানে কোন দ্রব্যের ছায়া পড়িলে উহাদ্বারা দর্শনেক্রিয়ের স্নায়ুগুণ উত্তেজিত হয় না, সুতরাং বাহ্য বস্তুর জ্ঞান নস্তিক্ষে পরিচালিত হইতে পারে না। ক্রমশঃ অভ্যাসের গুণে সে অভাবও দূরীভূত হইয়া যায় এবং অভ্যাস সম্পূর্ণ দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া অনির্বচনীয় আনন্দ পায়। চক্ষুর সম্মুখ ভাগে যে মসুরাকৃতি ক্ষুদ্র স্বচ্ছ পুটক (crystalline lens) আছে, উহার আলোকরশ্মি বক্রীকরণের ক্ষমতা আছে। সেই বক্রীভূত আলোকরশ্মির সঞ্চারনে সম্মুখস্থিত বস্তুর আকৃতিযুক্ত একটি ছায়া রেটিনায় আসিয়া প্রক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু যেমন ফটো ক্যামেরার কাচে, বা ম্যাজিক-লণ্ঠন, বায়োস্কোপ্ প্রভৃতি আলোক যন্ত্রের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত ছবি বাহ্য বস্তুর বিপর্যস্ত প্রতিকৃতি, উহার উল্টা ছায়া, সেইরূপ রেটিনার ছবিও উল্টা। বাহ্য বস্তুর উপরভাগের ছায়া বক্রীভূত হইয়া রেটিনার নিম্নদেশে পড়ে এবং ছবি উল্টা দেখায়। শিশু প্রথমতঃ সমগ্র বস্তু উল্টা দেখে—তাহার ঐরূপ দেখিয়া দেখিয়া অভ্যাস হইয়া যায়, এবং প্রবীণ চক্ষুতে উল্টা ছবি পড়িলেই সেই ছবি যে বস্তু, সেই বাহ্যবস্তু যে সোজা তাহাই বুঝিবার অভ্যাস আসিয়া পড়ে। ছবি উল্টাই পড়ে, আমাদের অভ্যাসবশতঃই আমরা সোজা দেখি।

যে রূপ চক্ষু, সেইরূপ কর্ণ প্রভৃতি অপর অপর ইন্দ্রিয়বোধ ও অভ্যাস মাপেক্ষ।

শব্দ শুনিয়া দূরতা বোধ ও শকোৎপত্তির দিঙ্‌নির্গম আমরা ক্রমশঃ অভ্যাস করি। এমন কি শব্দের উচ্চতা বা নীচতাব তারতম্য লইয়া আমরা যে দূরত্বের উপলব্ধি করি তাহাতে হর্বোলা প্রভৃতি (ventriloquist) দ্বারা অনায়াসে প্রতারণিত হই। তাহারা উদরভ্যন্তর হইতে একরূপ ভাবে শব্দ করে যে তাহাতে মনে হয় যে বহু দূর হইতে অথবা ভিন্ন দিক হইতে শব্দ আসিতেছে। এটি অভ্যাসের চূড়ান্ত চূষ্টান্ত।

হুচের দ্বারা আমরা যে উষ্ণতা বা শৈত্য অনুভব করিয়া থাকি তাহাও অভ্যাসবশতঃ আমাদের ষথার্থ জ্ঞান উৎপাদনে অনেক সময় ব্যাঘাত জন্মায়। দক্ষিণ হস্তে বরফ ও বাম হস্তে গরম তুধের বাটি কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিলে পরে দুই হস্ত এককালে একটা বালুতীর জলে ডুবাইয়া দিলে, বাম হস্তে ঐ জল শীতল বোধ হইবে ও দক্ষিণ হস্তে উষ্ণ বোধ হইবে। অথচ তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় যে বালুতীর জলের উত্তাপ সর্বত্র সমান। এই প্রকার অনুভূতির বিভ্রান্তির মূল কারণ আমাদের অভ্যাস। দক্ষিণ হস্ত পূর্বে হইতে বরফ সংযুক্ত আছে বলিয়া উহাতে উত্তাপগ্রহণক্ষমতা অর্শিয়াছে এবং বাম হস্তে উষ্ণ বস্তু ছিল বলিয়া উহা উত্তপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এ অবস্থায় বালুতীর জলে হস্তদ্বয় ডুবাইলে বাম হস্ত হইতে উত্তাপ শীতলতর জলে চলিয়া গেল এবং ঐ জলের উত্তাপ শীতলতর দক্ষিণ হস্তে আসিল। যে বস্তু আমাদের ত্বক্ হইতে উত্তাপ দূরীভূত করে সেই বস্তুকে আমরা শীতল বলিয়া অনুভব করিবার অভ্যাস করিয়াছি। যে বস্তু হইতে

উত্তাপ আসিয়া ত্বকে প্রবেশ করে সেই বস্তুকে আমরা উষ্ণ বলিয়া অনুভব করিতে অভ্যাস করিয়াছি। সুতরাং বালুতীর জল সমতাপ-সম্পন্ন হইলেও বাম হস্তে শীতল ও দক্ষিণ হস্তে উষ্ণ বোধ হইল। মার্কেল পাথরের টেবিল শীতল বোধ হয়, কাঠ বা কাপড়মোড়া টেবিল তত শীতল বোধ হয় না, অগচ থার্মমিটার বলে উভয়ে সমান গরম। ইহাও আমাদের হুচের বিশেষত্ব ও আমাদের অভ্যাসমূলক। মার্কেলের উত্তাপ পরিচালন ক্ষমতা কাঠ বা কাপড় অপেক্ষা অনেক বেশি; সুতরাং মার্কেল স্পর্শ করিলে স্বচস্থিত উত্তাপ শীঘ্রই স্থানান্তরে পরিচালিত হইয়া যায়, কাঠে দ্বারা তত শীঘ্র হয় না। আমাদের উত্তাপ শীঘ্রই হ্রাস প্রাপ্ত হয় বলিয়া মার্কেলকে কাঠ অপেক্ষা শীতল অনুভব করি।

আমাদের অভ্যাসনিবন্ধন ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ক্রিয়া ও তৎপ্রযুক্ত জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে। অভ্যাস যে কতদূর আমাদের কার্যের জঘ্ণ দায়ী তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। আমি যে অভ্যাস করিলাম তাহার দাগ আমার শরীরে এবং মনে চিরকাল রহিয়া যায়। ক্রমশঃ অভ্যস্ত অনেক প্রক্রিয়া সময়ান্তরে কাল ও অবস্থা ভেদে পরিত্যাগ বা পরিবর্তন করা বড় দুর্লভ ব্যাপার। একটা গল্প মনে পড়িল। গোয়ালিয়র প্রদেশে গীতবাণের জঘ্ণ সুপ্রসিদ্ধ কোন এক পেশাদার গায়ক একটি সুকণ্ঠ বালককে গীত শিখাইত। বালক শুইয়া শুইয়া গীত অভ্যাস করিত এবং শীঘ্রই সুগায়ক হইয়া উঠিল। একদিন ওস্তাদজী চেলা লইয়া রাজবাড়ী গান শুনাইতে গেলেন। ওমরাহগণ বালকের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে ওস্তাদজি

তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তানপুরায় সুর বাঁধিলেন । বালক বসিয়াই রহিল, কিছুতেই তাহার কণ্ঠ হইতে গান নির্গত হইল না । হতাশ হইয়া ওস্তাদ ঘুণায় বালককে পদাঘাতে ধরাশায়ী করিবামাত্র বালক অতি স্মিষ্ট গানে সভাসুদ্ধ সকলকে মোহিত করিয়া দিল । হায় ! ওস্তাদ জানিত না, এবং খোদ বালকও জানিত না যে গানের সহিত ধরাশয়নও অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে !

যে অভ্যাস বাহ্যবস্ত লইয়া ও যাহা আমাদের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির প্রক্রিয়ার মূল, তাহা আয়্যাসে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে ; কিন্তু যে অভ্যাস আমাদের অন্তরিন্দ্রিয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহার প্রভাব শুদ্ধ আমাদেরই উপর নহে, অধস্তন বংশধরগণেরও উপর বিস্তৃত হয় । এই আভ্যন্তরীণ অভ্যাসবশতঃ অতি নিম্ন শ্রেণী হইতে ক্রমবিকাশে উন্নত সৃষ্টিত মানবের সৃষ্টি হইয়াছে দেখা যায় । এ বিষয় পরে আলোচিত হইবে ।

কখন কখন প্রকৃতি অভ্যাসের অনুকূলতা সাধন করে, তখন অভ্যাসই দ্বিতীয় প্রকৃত বা স্বভাব হইয়া দাঁড়ায় । ইহার দৃষ্টান্ত দুই একটি আমাদের শরীরেই বর্তমান । আমরা লিখিবার সময় ও অত্র কাৰ্য্য নিষ্পন্ন করিবার জন্ত প্রায় দক্ষিণ হস্তই ব্যবহার করিয়া থাকি । এমন কি লেখার বিষয়ে দক্ষিণ হস্তের ব্যবহার যেন স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে । কিন্তু উহা অভ্যাসমূলক মাত্র । বাহাদের দক্ষিণ হস্ত কোন কারণে অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে তাঁহারা বাম হস্তে অতি উত্তম দ্রুত লিখিতে অভ্যাস করিয়াছেন, দেখা যায় । বালককে প্রথমেই দক্ষিণ হস্তে লিখিবার শিক্ষা

দেওয়া হয় । এই প্রথার স্রুবিধা অনেক, প্রকৃতি এ বিষয়ে অনুকূল এবং পিতৃপিতামহাদি পুরুষানুক্রমে ঐ দক্ষিণ হস্তের ব্যবহার অভ্যাস করা নিবন্ধন বালকের দক্ষিণ হস্তে লিখন অভ্যাস করা বামহস্ত অপেক্ষা সুসাধ্য হইয়াছে । ক্রমশঃ দেখা যাইতেছে যে মানব শক্ত কাৰ্য্যে দক্ষিণ হস্ত ব্যবহার করে বলিয়া ঐ হস্তের মাংসপেশী বামহস্ত অপেক্ষা অধিক বলবান ও শক্ত হইয়া পড়িতেছে । অভ্যাস আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন আনয়ন করিয়া ক্রমশঃ এমন রূপান্তর ঘটাইতে পারে যে বামহস্তের মাংসপেশী জন্মাবধিই (ক্রমবিকাশেই) ক্ষীণ ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িতে পারে । আধুনিক প্রাণিতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন যে এই অভ্যাসের বলেই মানবের পুচ্ছহীনতা ও পদদ্বয় হইতে হস্ত দুয়েব বিভিন্নতা ঘটিয়াছে । অনভ্যাসের বলে ও অব্যবহারে অভ্যাসে পুরুষানুক্রমে আমাদের উক্ত দ্বিবধ কাৰ্যিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে । এই রূপে ক্রমশঃ হ্রস্ত সভ্য জগতে মানবের বামহস্ত একটা অকর্মণ্য কিত্তৃতকিমাকার প্রত্যঙ্গে পরিণত হইয়া অবশেষে লোপ পাইতে পারে । পূর্বে যে মানবের পুচ্ছ ছিল তাহাব নিদর্শন খান কয়েক অস্থি মাত্র আজিও নরকঙ্কালে দৃষ্ট হয় ।

অভ্যাসের আর এক দৃষ্টান্ত আমাদের দাঁড়াইয়া দুই পায়ে চলা । প্রাণীর মধ্যে এক জাতীয় মর্কট (Gorilla) কেবল মধ্যে মধ্যে ঐরূপ ভাবে সোজা হইয়া চলিয়া থাকে । এখনও অভ্যাসের প্রভাব আমাদের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই — মানবশিশু জন্মিয়াই দাঁড়াইতে পারে না । ক্রমশঃ তাহার সে অভাবও দূরীভূত হইবার

উপক্রম দেখা যাইতেছে। পদদ্বয় হইতে হস্তদ্বয়ের গঠন একেবারে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য ইহা যুগযুগান্তরের অভ্যাসের ফল। সোজা হইয়া চলিবার দরুন আমাদের পদদ্বয় হস্তদ্বয় অপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠ লক্ষ্যকৃতি ও দৃঢ় অস্থি সংযুক্ত। আমরা যে সকল কার্যের জন্য হস্তের অঙ্গুলি ব্যবহার করিয়া থাকি ;—মুঠা করা, অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া ধরা প্রভৃতি যে সকল কার্যে হস্তাঙ্গুলী ও হস্ততালুব বক্রীভাব ধারণ কবাই, পদদ্বয়ের অঙ্গুলিতে সে সকল কার্য করা আমাদের আবশ্যিক না হওয়ায় আমাদের সে অভ্যাস চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু মর্কট হস্ত ও পদেব অঙ্গুলি সমভাবে ব্যবহার করিতে পারে। এই নিমিত্ত প্রাণীতত্ত্বাবৎ পণ্ডিতে বা বানর জাতিকে চতুর্হস্ত (quadrumana) ও মানব জাতিকে দ্বিহস্ত (Bimana) এই দুই প্রাণীবিভাগে ফেলিয়াছেন। মানব দ্বিহস্ত জীবের একমাত্র প্রাতভূ। উপরি উক্ত কাবণে আমাদের পদদ্বয়ের অঙ্গুলি ছোট, ও অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে। পায়ের অঙ্গুল এখন না থাকিলেও ক্ষতি নাই; ক্রমশঃ হয়ত মৎশ্বের ডানার স্থায় আমাদের সমস্ত পদাঙ্গুল চর্ম ও মাংসপেশী দ্বারা আবৃত হইয়া পড়বে ও পদতল পাছকাতনের স্থায় সমক্ষেত্র হইয়া যাইবে।

উর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসী যে হস্ত ব্যবহার করেন না, তাহা ক্রমে অকর্মণ্য হইয়া তদবস্থ একথণ্ড কাষ্ঠপ্রস্তরের স্থায় হইয়া যায়। ঐ অবস্থায় বদ তাঁহার ঔৎসে ঐরূপ উর্দ্ধবাহুবৃত্তা কোন রমণীর গর্ভে সন্তান জন্মে তবে সেই ভ্রূণের ঐ অঙ্গহীন হইবে ইহাই সম্ভব। কিন্তু সকল

ক্ষেত্রে নাও হইতে পারে। সেই ভ্রূণ হইতে যে মানব হইল সেও যদি ঐরূপ উর্দ্ধবাহু অভ্যাস করে এবং ঐরূপ অঙ্গহীনা রমণীর সহিত বিবাহিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের সন্তানের ঐরূপ অঙ্গহীন হওয়া পূর্বাৎপেক্ষা অধিক সম্ভব। এইরূপে ৫৭ বংশ ধরিয়া যদি একই অভ্যাস চলিয়া আসে তাহা হইলে স্থায়ী প্রকৃতিগত বিকাব আসিয়া পড়ে, আর সে বিষয় অভ্যাস করতে হয় না। ইহাই অভ্যাসের নিয়ম—Law of Habit।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এইরূপ অভ্যাসের কাবণ কি? সে অভ্যাসেব বলে একটা বিষয় পরিবর্তন আমাদের শরীরে ও মনে ঘটয়া থাকে, সে অভ্যাসের দাস আমরা হই কেন? এ প্রশ্ন বড়ই জটিল। স্থূলতঃ দেখা যায়, সুবিধা ও সুখবোধ বা দুঃখ ও কষ্ট নিবারণের স্পৃহাই অভ্যাসেব মূল। অনেক স্থলে অজ্ঞাত-সারে একটা অভ্যাস পুরুষাণুক্রমে চলিয়া আসিতেছে দেখা যায়। আবার অনেক স্থলে জ্ঞাতভাবে একটা সুবিধা বা সুখের চেষ্টায় অভ্যাসটা প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং সেই সুবিধা বা সুখ ক্রমাগত অভ্যাসের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যাইত বলিয়া ঐ অভ্যাসেব ফল এক্ষণে একটা স্থায়ী পরিবর্তনে আসিয়া পড়িয়াছে। জলচর ও খেচর পক্ষীর পুচ্ছের আবশ্যিক; সেই প্রাণী যখন স্থলে বিচরণ কবে তখন তাহাকে পুচ্ছের ব্যবহার আদৌ কবিত্তে হয় না। ক্রমশঃ যে জীব জলে বা আকাশে গতিবিধি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার অব্যবহারের অভ্যাস বশতঃ পুচ্ছ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে একেবারে অগুর্দ্ধান করে। কিন্তু যদি কোন

স্থলচর জন্তু পুচ্ছের ব্যবহার করিতে থাকে, তাহা হইলে সেই অভ্যাসের বলে তাহার পুচ্ছের আকৃতি ও গঠন বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়া দৃঢ়, শোষণ ও মাংসল হইয়া পড়ে। যথা শৃগাল প্রভৃতি।

অধ্যাপক হেকেল তাঁহার Evolution of Man নামক সুবিখ্যাত পুস্তকে বহু গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মানব ক্রণাবস্থা হইতে আৰম্ভ করিয়া পরিপক্ক অবস্থাদ ভ্রমিষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত যে সমস্ত পরিবর্তনের

মধ্য দিয়া যায়, তাহাতে সে যে অতি নিম্ন প্রাণী হইতে ক্রমে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। গর্ভে উহার এক এক অবস্থা, কোন না কোন নিম্নতর প্রাণীর গর্ভাবস্থাব সহিত একেবারে মিলিয়া থাকে। এ বিষয় বাবাস্তবে আলোচিত হইবে। এরূপ যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন যে ক্রমবিকাশবাদ আব সন্দেহ করিবার যো নাই। ইহার মূলে অভ্যাস ও বংশানুগতা এই দুইটি নিয়ম বিদ্যমান।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মহর্ষি রুদ্র

অতি পুরাকালে, মানব-সভ্যতার সেই আদিম অবস্থায়, মানবজাতির আদিগুরু ঋষিগণ মনুষ্যত্বের দিব্যবীজ মানসক্ষেত্রে বপন করিয়া অক্ষুণ্ণিত করিবার জ্ঞান যখন তাহাতে তপস্কার সলিল সেচন করিতেছিলেন; মনুষ্যত্ব সেই নবশাক্তর সাধনা, সভ্যতার বিচিত্র কোলাহলের আবেশে ঘূর্ণিত না হইয়া, স্বভাবের পথে, সহজে তাহার চরম লক্ষ্যেব সান্নিধ্য লাভে যখন সক্ষম হইয়াছিল, সেই সময়ে এ দেশে পশ্চিম অঞ্চলে রুদ্র নামে এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ দস্যু বাস করিত। কত শত নিরপরাধ পথিক যে এই দস্যুর হস্তে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইহার নাম শ্রবণমাত্র দেশবাসী সকলেই যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া উঠিত।

এই দস্যুর সপ্তবর্ষ বয়স্ক একটি পুত্র ছিল। দস্যু তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। পুত্র-

স্নেহ ব্যতীত দস্যুর পাষণ্ড হৃদয়ে অণু কোনো কোমল রক্তির লেশমাত্র দেখা যাইত না। একদিন মধ্যাহ্নকালে বাড়ী ফিরিবার সময়ে দস্যু দেখিল যে জঙ্গলের ধারে এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র তাহার সেই প্রিয়পুত্রকে আক্রমণ করিয়া নখদস্তাবাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেছে। দেখিয়া দস্যুব প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং পুত্রের প্রাণরক্ষার জ্ঞান তৎক্ষণাৎ সে লক্ষ্য প্রদান পূর্বক ব্যাঘ্রের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। দস্যু অত্যন্ত বলশালী ছিল। স্মরণ্য তাহার আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া ব্যাঘ্র, শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া, প্রবল বেগে দস্যুকে আক্রমণ করিল। দস্যুও স্বীয় বাহুবলে সেই ভীষণ আক্রমণের বেগ প্রতিহত করিয়া ব্যাঘ্রকে একেবারে ভূতলশায়ী করিয়া ফেলিল। আর কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই দস্যু সেই ব্যাঘ্রকে নিশ্চয়ই সমালয়ে প্রেরণ করিতে পারিত, কিন্তু

যখন সে দেখিল যে তাহার একমাত্র পুত্রের প্রাণ-বিয়োগ হইয়াছে এবং তাহার রক্তাক্ত মৃত দেহ ভূমিতে পতিত রহিয়াছে, তখন কে যেন তাহার শবীরের সমস্ত বল মুহূর্ত্তমধ্যে অপচরণ করিয়া লইল। সে আঁচড়াইতে না পারিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে পড়িয়া গেল। এদিকে সুর্যোগ পাইয়া সেই মৃতপ্রায় ব্যাঘ্র যথাশক্তি সেই পুত্রশোকাতুৰ্ব দৃষ্টাকে বারংবার আহত করিয়া মূহূর্ত্তমধ্যে পতিত করিল।

ব্যাঘ্রের বারংবার আক্রমণে রুদ্র মৃতবৎ হইয়া পড়িলেও একেবারে তাহার প্রাণবিয়োগ হয় নাই। সে সমস্ত দিন ত্রৈকণ অবত্যাতেই সেই জঙ্গলেব ধারে পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যার সময়ে চারিজন পথিক সেই পথ দিয়া বাইতোরছিল। পথিপার্শ্বে ঝালকের রক্তাক্ত মৃতদেহ, ভীমকায় মৃত ব্যাঘ্র ও ক্ষত বিক্ষত শরীর রুদ্রকে দেখিয়া পথিকেরা দাবপব নাট ভীত হইল। অনন্তর কিয়ৎক্ষণ পবিত্র দর্শনের পর যখন তাহারা দেখিতে পাইল, যে আহত ব্যক্তি এখনও জীবিত আছে, তখন কিঞ্চিৎ অস্থিত হইয়া সকলে রুদ্রের নিকটবর্তী হইল ও তাহাকে স্বক্ৰমেণে স্থাপন-পূর্বক বহন করিয়া লইয়া চলিল।

নিকটেই পবন দয়ালু মহর্ষি সৌম্যেব আশ্রম ছিল। পথিকেবা মৃতপ্রায় রুদ্রকে বহন করিয়া সেই আশ্রমে আসিয়া উপাস্ত হইল ও মহর্ষির চরণোপাস্তে উপনীত হইয়া আত্মোপাস্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সবিময়ে নিবেদন করিল। পরম রূপালু মহর্ষি পথিকগণের নিকট সবিশেষ অবগত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাহাদিগের সঙ্কদয়তার

ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর অত্যন্ত যত্নপূর্বক ক্ষতবিক্ষত দেহ রুদ্রকে গৃহনধ্যে লইয়া গিয়া একান্ত মনে তাহার সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

হোমধূমেব পুতগন্ধে আশ্রমস্থ বায়ু সততই পবিত্র থাকিত। তপোবনের সেই বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে ও মহর্ষি সৌম্যেব ত্রৈকান্তিক যত্ন দার্ষিকালের পর সে ক্রমশ আরোগ্য লাভ করিল। এই দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শুইয়া শুইয়া রুদ্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যা সময়ে প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নির দীপ্ত শিখা যখন নিবীক্ষণ করিত; সমবেত পার্শ্ববালকবালিকাগণেব স্তকোমল কণ্ঠোচ্চারণিত বেদপাঠ ও গায়ত্রী মন্ত্রেব উচ্চারণ যখন শ্রবণ করিত, তখন তাহার অন্তঃকরণ এক অনন্তভূতপূর্ব আনন্দেব রসাবেশে অবশ হইয়া আসিত। বালকবালিকাগণেব মধো মহর্ষি সৌম্যের কণ্ঠা দোপিকানই এই কার্যে বিশেষ নিষ্ঠা দেখা যাইত। যখন প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নির উর্দ্ধশিখা আকাশমার্গে আলোকিত করিত, তখন তাহার উজ্জ্বল চক্ষু হইত প্রেমানন্দে উজ্জ্বলতব হইয়া উঠিত; আনন্দের উদ্ভাম প্রবাহ তাহার সরল শিশু হৃদয় ভাসাইয়া দিয়া নয়ন প্রান্তে অশ্রু তবল তরঙ্গ বিস্তার করিত! সে তখন আপন অস্তবস্থিত আনন্দকে কোন্ উচ্চলোকে বিসৃত করিয়া দিয়া অনন্ত আনন্দকে আপনার মধ্যে আস্থান করিয়া আনিত কে তাহা বলিতে পাবে!

দোপিকা স্বভাবতঃ অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী ছিল; সে একাকিনীই সমস্ত গৃহকর্ম ও আশ্রমের অন্যান্য কার্যসমূহের তত্ত্বাবধান অনায়াসেই করিত। মহর্ষি সৌম্যের এই

কল্পা ব্যতীত সংসারে আর কেহই ছিল না।
ছহিতার অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাইয়া
মহর্ষি বিশেষ যত্নে তাঁহাকে ব্রহ্মসাধনায় নিযুক্ত
করিয়াছিলেন। গৃহকর্ম, আশ্রমোচিত কার্য
ও সাধনার অত্যন্ত অবসরেও এই কোমল
হৃদয়া ঋষিতনয়া, পিতার সহিত দম্য রুদ্রের
সেবা গুণশ্রমায় যথাশক্তি যোগদান করিত।

একদিন রুদ্র বালিকাকে জিজ্ঞাসা
করিল :—

“ঋষ তনয়ে, তোমরা প্রতিদিন কাহার
অর্চনা কর এবং সেই অর্চনারই বা ফল
কি” ?

বালিকা উত্তর কবিল :—

“যিনি আমার অন্তর্যামী পবন পুরুষ,
যিনি এই প্রজলিত অগ্নিতে, দিবসে আলোক
মালায়, রজনীর গাঢ় অন্ধকার পুঞ্জ, জলে,
স্থলে এবং আকাশে সতত বর্তমান আছেন
আমি তাঁহাকেই এইরূপে অর্চনা করিয়া
থাকি ; এইরূপেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া

তাঁহার সহিত প্রতিদিন যোগযুক্ত হই ; পরম
আনন্দই ইহার একমাত্র পরিণাম ! আমি
ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই জানি না। পিতার
নিকট জিজ্ঞাসা করিলে সবিশেষ সমস্তই
জানিতে পারিবে।”

বালিকার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া
দম্য অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল :—

“ভাগ্যবতি, আমি আরোগ্য লাভ করিয়া
আর গৃহে ফিরিয়া যাইব না ; তোমাদেরই
আশ্রমে থাকিয়া তোমাদেরই ত্রায় আমিও
সেই অন্তর্যামী পরম পুরুষকে জলে, স্থলে,
অনলে, আকাশে, আলোকে অন্ধকাবে
সর্বত্র প্রত্যক্ষ করিতে শিক্ষা করিব !”

রুদ্র সেই হইতেই সৌম্যের তপোবনে
থাকিয়া গেল ; এবং মহর্ষির নিকটে ব্রহ্ম-
জ্ঞানের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, সেই পরম পুরুষের
দর্শন মানসে ব্রহ্ম সাধনায় নিযুক্ত হইল।

এই দম্য রুদ্রই পরে মহর্ষি-রুদ্র নামে
বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

শ্রীহেমলতা দেবী ।

ভয়ন ।

আগ্রা ।

৩৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯০০ ।

আগ্রাই ভারতীয় মুসলমান-সভ্যতার
সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পরচনা। ষোড়শ শতাব্দীর
নাবাবাঝি, উদারচেতা মোগলসম্রাট আকবার
দিল্লী হইতে তাঁহার রাজধানী আগ্রায় উঠাইয়া
আনেন :—এই মহাপুরুষের স্মৃতি এই বৃহৎ
নগরটিকে সজীব রাখিয়াছে।

যে সময়ে যুরোপীয়েরা, ধর্মসংক্রান্ত তুচ্ছ
বিবাদ লইয়া আপনাদের মধ্যে কাটাকাটি
করিতেছিল, সেই ষোড়শ শতাব্দীতে এই
ভাবত-সম্রাট সকল ধর্মকে এক করিবেন
বলিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। জাতিতে
মুসলমান হইলেও তিনি প্রথমে, উচ্চতম
হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত দুইটি কন্যাকে বিবাহ

করিয়া, আয়ুবিসর্জনের কমনীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। তাহার পর তিনি মহা-ধর্মমণ্ডলী বা ধর্মের 'পার্লমেন্ট' আহ্বান করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সেই মহাধর্ম-মণ্ডলীতে;—ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, পার্শি, ইহুদী উপস্থিত হইল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—তাহাদেব মধ্যে তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। প্রত্যেকেই যে ধর্মবিশ্বাস লইয়া আসিয়াছিল, সেই ধর্ম-বিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়া গেল।

এই আকবর, যমুনার তীরে যে প্রসিদ্ধ দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া আজও মুগ্ধ হইতে হয়। ধূসর-লাল রংএর প্রকাণ্ড 'বুরুজ'-বিশিষ্ট দস্তুরপ্রাচীর;—সাদা মার্বেলে গঠিত এই দুর্গ প্রাচীর, গম্বুজ ও চূড়াবিশিষ্ট একটি রাজপ্রাসাদকে আগলাইয়া রহিয়াছে। এই রাজপ্রাসাদটি প্রকাণ্ড ও পরী স্থানের ন্যায় রমণীয় : ইহার অভ্যন্তরে কত প্রাঙ্গণ, কত ছাদ, কত বড় বড় দালান। সেই সমস্ত হইতে বিযুক্ত মার্বেলের মসজিদ—সমস্ত সাদা—সুন্দর গগন-পটে যেন অঙ্কিত রহিয়াছে। সুলতানা-বেগমদিগের কক্ষগুলি অতি সুন্দর : বাহ্যতে বায়ু ও আলোক প্রবেশ করিয়া, ভিতরে তাপ সংরক্ষিত হয় এইরূপ সূক্ষ্ম খোদাইকাজবিশিষ্ট জালিকাটা মার্বেলের দেয়াল। নেত্রসমক্ষে প্রসারিত বিশাল ময়দান, মসুরগতি যমুনার জল ও দূরস্থ তাজমহল।

তাজমহল! ইহাই আগ্রার চিরন্তন গৌরবের সামগ্রী। আকবরের একজন বংশধর শা-জাহান, তাহার প্রিয়তমা বেগমের স্মরণার্থ এই সমাধি-মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়া-

ছিলেন। ইহা দেখিলে, নিখুঁত-সুন্দর একটি শিল্পসামগ্রী একটা অর্ধ ও অলৌকিক স্মৃতি মনোমধ্যে রহিয়া যায়।

ধূসর-লাল রংএর একটা বৃহৎ সিংহদ্বার; তাহাব উপর, সাদা মার্বেলে উৎকীর্ণ কোবাণের কতকগুলি বয়েৎ। তাল, কমলা-নেবু, দাড়িম, ঝাউ প্রভৃতি বৃক্ষে সুষোভিত একটি চমৎকার উদ্যান। গোলাপ ও ঘুঁই-এর গন্ধে সমস্ত স্থান আমোদিত। পদ্মকূলে আচ্ছন্ন কৃষ্ণভ জলবিশিষ্ট একটি দীর্ঘিকা, তাহার চারিদিকে সাদা মার্বেলের সান। কালো-কালো ঝাউ-গাছের মাথা ছাড়াইয়া,—সাদা মার্বেলে গঠিত, সূক্ষ্ম খোদাই-কাজ-করা, বহুমূলা রত্নখচিত, গম্বুজবিশিষ্ট একটা প্রকাণ্ড ইমারৎ সমুখিত হইয়াছে। চারিদিকে, চারিটা সাদা মার্বেলের মিনার-স্তম্ভ। ইমারতেব অভ্যন্তরে, শাজাহান ও তদীয় প্রিয়তমার সমাধিস্থান, তাহার চারিদিকে জালিকাটা মার্বেলের ঘেব—কি সূক্ষ্ম কারুকার্য! তাহার তুলনা নাই...

তাজমহলেব জটিল সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে হইলে, দিবারাত্রির সকল সময়েই উহাকে দেখিতে হয়। প্রাতঃকালে, উদীয়মান সূর্যের রক্তিম আলোকে, উহাকে অস্পষ্ট ও অবাস্তব বলিয়া মনে হয়; আরও কিয়ৎকাল পরে, মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর রশ্মিব প্রভাবে, উহাব জ্যোতির্ময়ী বিশ্ববিজয়িনী উগ্রমূর্তি প্রকাশ পায়; অবশেষে রাত্রিকালে, চন্ডের জ্যোৎস্নার, কবিকল্পনাসুলভ পাণ্ডুবর্ণ, রহস্যময় কোমলকান্ত, মর্মস্পর্শী, স্নিগ্ধ মূর্তি প্রকটিত হয়।

স্থপতি ও জহুরী—এই উভয়ের হস্তগঠিত

সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পসামগ্রী এই তাজমহল ; কি পাশ্চাত্য কি প্রাচ্য সকল জাতির লোকেই এই তাজমহল দেখিয়া বিমুগ্ধ হয়। উত্তর-ভারতীয় সমস্ত দেবালয়ের ও সমস্ত সমাধি-মন্দিরের সৌন্দর্য্য এই তাজমহলে যেন একাধারে অবস্থিত। বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সমবায়ে ইহার সৌন্দর্য্য একটা বিশালভাব ধারণ করিয়াছে ; কিন্তু বিশাল হইলেও গন্ধকপুরীর তায় রমণীয়। সুবর্ণময় ও ধাজু— এই সকল বেথারই বা কি অপূৰ্ণ সৌন্দর্য্য—এই সকল রেখাগুলির কেমন সুন্দর সামঞ্জস্য ! তাব পর, অমল-ধবল মার্বেলের শুভ্র সৌন্দর্য্য। আবার যেমন কোন রত্নালঙ্কারে সযত্নরচিত অতি সুক্ষ্ম কত কি খুঁটিনাটি কাজ থাকে, সেইরূপ ইহার সুক্ষ্ম সুকুমার সৌন্দর্য্য। খোদাই মার্বেলে সুন্দর ফিতার কাজ (Lace)। ঝিনুকের পাতের মধ্যে, প্রবালের মধ্যে, ফিরোজা প্রভৃতি মণির মধ্যে ফুল বসানো। বিলাসময়, ছায়াময়, সুগন্ধময় উদ্ভানের সৌন্দর্য্য। অক্ষয় প্রস্তর-গাত্রে, মুসলমান-মস্তিষ্ক-প্রসূত যে সকল সুন্দর বাক্য খোদিত রহিয়াছে সেই সকল বাক্যের

সৌন্দর্য্য। বৃহৎ সিংহদ্বারের গায়ে লেখা আছে ;—“কেবলমাত্র ঈশ্বরই মহান্ ;” “ঈশ্বরের উদ্ভানে শুদ্ধাত্মারাই প্রবেশলাভ করিবে।” তারপর, সেই ভাবের সৌন্দর্য্য যাহা এই সমাধিমন্দিরটিকে অমর করিয়া রাখিয়াছে : সুন্দর সেই জলন্ত প্রেম, সুন্দর সেই নিভয় মৃত্যু, সুন্দর সেই অনন্তপরায়ণ প্রেমিকের তীব্র শোক ! এবং প্রেমের স্বপ্নকে—ঐশ্বর্য্য-বিভবেব স্বপ্নকে বাস্তবতায় পারণত করিবার জন্ত, যতদিন মানবজাত থাকিবে ততদিন, একজন মৃত রমণীর স্মৃতিকে মানুষের মনে সজীব রাখিবার জন্ত, সুন্দর সেই বিরাট প্রযত্ন ! তাজমহলেব দীপ্ত মাহিম,—এই সাহসনাদায়ক বচনটির সত্যতা সপ্রমাণ কবে : —“মৃত্যুর চেয়ে প্রেমের বল বেশী।”

হাঁ, পৃথিবীতে যত স্মৃতি-মন্দির আছে তন্মধ্যে তাজমহলই সর্বাপেক্ষা সুন্দর। একবার যে তাজমহল দেখিয়াছে, তাহার জীবন সার্থক।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বন্দী

আমার কাহিনী ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য—বহু সন্ধানেও এই উল্লিখিত কাহিনীটি আমাদের করায়ত্ত হয় নাই। বোধ হয় সময়ের স্বল্পতা হেতু তিনি এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার অবসর পান নাই।

ভিলা হোটেলের একটা বক্ষ হইতে।

ভিলা হোটেল হইতে !... আমি এখানে আছি ! সে স্থানটা—ঐ যে আমার জানালার নিম্নেই ! বিস্তর লোক জমিয়াছে। কেহ চাঁৎকার করিতেছে, কেহ বা হাসিতেছে।

এখন সাহস—শুধু সাহস! ঐ লানরঙের কাঠের খাম দুইটা দেখিয়া আমার বুকটা ধক করিয়া উঠিয়াছে!

কয়টা কথা আমি বলিয়া যাঁতে চাহি! সরকারা ডাকলকে ডাকিয়া পাঠানো হইয়াছে তাঁহার জন্ত প্রতীক্ষা কারমা আছে—যেটুকু সময় এমন কারমা পাওয়া যায়!

এই যে কাহাবা আসে! সময় হইয়াছে! আর অবসব নাই! সমস্ত দেহ কাঁপমা উঠিতেছে! এই ছয় ঘণ্টা ধাবিয়া, ছয় মাস ধারমা যাহা ভাবিতোছলাম তাহা ঘটিতে চলিল! এতক্ষণ ভাবিয়াছি—তবু মনে হইতেছে এ মুহূর্ত্ত এক অত্যন্ত ভাবেই আজ আসিয়া পড়িল!

কতকগুলো অগিগাল, সোপানশ্রেণী ঘুরাইয়া তাহারা আমাকে লইয়া চলিল। শেষে একটা ছোট ঘরে আসিয়া দাড়াইলাম—ছোট বায়ুপথের মধ্য দিয়া আকাশ দেখা যাইতেছিল—চারিধার কুয়াশাতে ভারমা গিয়াছে! রোদ্দ নাই! আমি চেয়ারে বাসলাম।

ঘরে আবে তিন চারজন লোক ছিল—আচার্য্য ছিলেন!

সহসা আমার কেশে লোহের শীতলস্পর্শ অনুভব কারলাম এবং কাঁচর শব্দ স্পষ্ট শুনিতো পাইলাম। কেশের ভার নিমেষে আমার পদতলে লুপ্ত হইল! আমি স্থির হইয়া বাসয়াছিলাম। আশ পাশে সকলে চুপ চুপ কথা কাহিতোছিল!

একজন কাহিল, “এ কি হচ্ছে?”

আর একজন কাহিল, “মাথার চুলগুলো কেটে—দাড়টা কামিয়ে তবে নিয়ে যাব।”

চোখ তুলিয়া দেখ—কাগজের তাড়া ও

পেন্সিল লইয়া একটা লোক প্রশ্ন করিতেছে—বুঝলাম সে কোন পত্রকার সংবাদদাতা! কালিকাব কাগজেব জন্ত তথ্য সংগ্রহে আসিয়াছেন! কাল প্রত্যাষে সংবাদ-পত্রের বাজারে আমার বিষয় লইয়া মহাপ্রমা বাধমা যাইবে—তায় তখন কোথায় আমি?

একটা প্রহরা আসিয়া আমার হাত ধরিল—আমি কাহলাম, “আঃ!”

সে কাহিল, “ক্ষমা করবেন—আপনার কি ব্যথা লাগছে?” এই সে—আমাকে যে কাঁসকাতে বুলাইবে—সবকারা জ্বলাদ! যে হাতে আমাকে সে স্পর্শ কাবয়াছে, সেই হাতে কত লোকের প্রাণ নিয়াছে! এমন নম্র কথা-বার্তা তার এমন শাস্ত্র সুর! আশ্চর্য্য!

তারা একটা ফুস্ক দড়িতে আমার পা দুইটা আঁরা কারমা বাধমা দিল—বাহাতে আমার গাত একটু শব্দ হয়—দ্রুত না চলিতে পারি!

আচার্য্য ডাকিলেন, “এস বৎস!”

দুইটা প্রহরা আমার দুই হাত ধরিল। আমি ধীর পাদক্ষেপে আচার্য্যের অনুসরণ কারলাম।

বাহরের দ্বার খুলিয়া গেল! খানিকটা কোলাহল, দমকা ঠাণ্ডা বাতাস ও অক্ষুট আলোক-তরঙ্গ একসঙ্গে ভিতরে ঢুকিল! বাহিরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে—এই বৃষ্টি একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া আজ দেশের নরনারী এই বীভৎস হৃদয়হীন অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে! কি নির্লজ্জ কোতুক স্পৃহা! কাতারে কাতারে লোক দাড়াইয়াছে ছাতাটুপের সংখ্যাই নাই! চারিধারে সশস্ত্র প্রহরার শ্রেণী—পাছে কোনরূপে শাস্তিভঙ্গ

হয় ! আমি বাহিরে আসিলেই চীৎকার উঠিল—
—“ঐ-ঐ-ঐ যে আসছে একধারে বিপুল
করতালির ধ্বনি উঠিল ! রাজার যোগ্য
সম্মানে আমি পথে চলিয়াছি ! চমৎকার !

বাহিরেই একটা ছোট ঠেলাগাড়ী—আমি
তাহাতে চড়িলাম। সশস্ত্র কয়েকটা প্রহরী
গাড়ীর চারিধার ঘেরিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী
চলিল !

একদল ছেলে চীৎকার কবিতা উঠিল—
“নমস্কার, মশায়।” আর একজন কহিল
“বহৎ আচ্ছা ! সুপ্রভাত !”

একটি স্ত্রীলোক কহিল, “মরতে চলেছে”।

চারিধারের এই বিকট কোলাহলে মনে
একটা সাহস পাইলাম।

পথে আমারি জন্তু আজ এই বিপুল
জনতা। আবার কে কহিল, “টুপি খুলে
ফেল সব !” যেন রাজা চলিয়াছেন।

আমি হাসিলাম—হায় ইহারা টুপি খুলি-
তেছে,—আমাকে মাথাটা খুলিয়া দিতে হইবে !
ফুলের বাজারের পাশ দিয়া গাড়ী চলিতেছিল !
মিষ্ট গন্ধে প্রাণ যেন কতকটা আশ্বস্ত হইল ;
লাল নীল সাদা নানা রঙের ফুলে শোভাও
সুন্দর হইয়াছিল ! বাজারে-বাড়ীতে—কোথাও
তিলমাত্র স্থান নাই—লোক—কেবল লোক—
বাড়ীওয়ালারা বেশ দুই পরসাপ উপাঙ্গনে সুযোগ
পাইয়াছে ! ক্রমে ভিড় বেশী হইতে লাগিল !
মুখখানাতে প্রফুল্লতা আনিবার জন্তু আমি
প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলাম—যেন কেহ
কাপুরুষ না মনে করে।

কারে বৃথা দর্প ! জীবনের শেষ মুহূর্তে
এখনো এত মায়া কিসের জন্তু ? লোকের
স্তুতি-নিন্দার প্রতি এত শ্রদ্ধা, এত আগ্রহ !

আচার্য্যের হাত হইতে ক্রশ লইয়া বৃকে
চাপিলাম, একান্ত আগ্রহে বলিলাম,—“দয়া
কর প্রভু—দয়া কর—বল দাও ভগবান, হে
আর্তের বন্ধু—” ! সমস্ত বাহুজগৎটা উড়াইয়া
চিত্তাব মধো মগ্ন হইবার সঙ্কল্প করিলাম ! কিন্তু
লোকের কোলাহলে একাগ্রতা ভাঙ্গিয়া
যাইতেছিল। কেমন একটা কম্পন আসিল
সাধা অঙ্গ ও বৃষ্টি-জলে ভিজিয়া উঠিয়াছিল।

আচার্য্য কহিলেন, “কাঁপছে তুমি ? শীত
লাগছে বুঝি ?”

মুখে বলিলাম, “হাঁ !” কিন্তু ভগবান
জানেন, এ কম্পন শীতের জন্তু নহে !

কয়েকটি স্ত্রীলোকের করুণ সহানুভূতি
কানে গেল—আমাব এই তরুণ বয়স দেখিয়া
তাহার করুণায় গলিয়া গিয়াছিল !

ক্রমে সেই স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম।
আমার দৃষ্টি ও শ্রুতি-শক্তি ক্রমে ক্ষীণ হইয়া
আসিল। এই কোলাহল, এই অগণিত
পরিচিত অপরিচিত নরশির—আমি উন্মা-
দের মত হইয়া পড়িলাম—এতগুলো লোক
আমার পানে চাহিয়া আছে—ইহা ভাবিয়াই
অস্থির হইয়া পড়িলাম !

ক্রমে সেই মিশ্র কোলাহলের একটি বর্ণও
আয়ত্ত করা দুর্কর হইয়া পড়িল। সমস্ত মিলিয়া
একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনির মত কাণে
বাজিতেছিল !

দোকানের নাম ও রাস্তায় বিজ্ঞাপনগুলো
আপন মনে পড়িয়া যাইতে লাগিলাম !
একধারে নদী চোখে পড়িল—উপরে ছায়ার
মত উচ্চচূড়াও অন্ন দেখা যাইতেছিল ! ইহার
মধ্যে কখন সেতু পার হইয়া এপারে আসিয়া
পড়িয়াছি—জানিতেও পারি নাই !

হঠাৎ এক সময় গাড়ী থামিয়া পড়িল।
আমি শিহরিয়া চাহিয়া দেখি, সম্মুখেই ফাঁস-
কাঠ!

আচার্য্য বলিলেন, “মনে বেশ সাহস
আনো, এগার!”

তার পর আনার হাত ধরিয়া প্রহরীগুলি
আমাকে উপরে তুলিল। মাতালের মত
আমার পা টলিতেছিল, মাথা ঘুরিতেছিল।

আচার্য্যকে বলিলাম, “একটা কথা
আছে।”

তিনি কহিলেন, কি?”

আমি কহিলাম, “একটু সময় দিন—ক্ষমা
—ক্ষমার জন্ত প্রার্থনা করেছি—যদি
দয়া হয়, যদি ক্ষমা মেলে—দোহাট্টে আপনাব
দয়া করে একটু সময় দিন—একটু শুধু—
আমি মরে গেলে যদি ক্ষমার খবর আসে, তখন
আর কোন উপায় থাকবে না, তাই—”

আচার্য্য সবিয়া গেলেন। প্রহরী আসিয়া
বলিল, “আসুন—সময় হয়েছে!”

আমি কহিলাম—“দাঁড়াও একটু দাঁড়াও,
ভাই—ক্ষমার খবরটা আসতে দাও,
এখন এসে পৌঁছবে—এমন ত কত
হয়েছে! শুধু সময় দাও,—একটু সময়—
তাতে কারো কোন ক্ষতি হবে না—!”

কেহ সে কথা কাণে তুলিল না।

ওঃ!—ঐ সব উৎসুক দর্শকের সারি! কি
বিকট তাদের চীৎকার-ধ্বনি—মানবের কণ্ঠে
ভাষা এমন পুরুষ, এমন ভীষণ!

তবে কি কেহ আমাকে রক্ষা করিবে না-
কেহ বাঁচাইবে না? ক্ষমা—ক্ষমা—কিছুতে না!

প্রহরী দুইটা বন্দুকের মত হাত ধরিল—
ফাঁসিকাঠেব নিকট আনিয়া দাড় করাইল—
আমার। চারিদিকে একটা পর্দা খাটাইয়া
দিল—

* * * * *

ঘড়িতে চারিটা বাজিতেছে!

সমাপ্ত।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

(তৃতীয় খণ্ড)

১। উচাংনা (উচুান)

উচাংনা দেশ প্রায় পাঁচ হাজার লি বিস্তৃত। এ
দেশীয় পর্বত ও উপত্যকা সমূহ অবিচ্ছিন্ন। উপত্যকা
ও জলাভূমির মধ্যে উচ্চ ভূমি। নানা প্রকার শস্ত
বপন করা হয় কিন্তু তত সুন্দর ফসল হয় না। যথেষ্ট
আঙ্গুর পাওয়া যায় কিন্তু ইক্ষুদণ্ড অধিক পাওয়া যায়
না। স্বর্ণ ও লৌহ পাওয়া যায় এবং এতদেশীয়
ভূমি হরিদ্রা উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।
প্রচুর পরিমাণে পুষ্প ও ফল পাওয়া যায়। দেশের
জল বায়ুও উত্তম। অধিবাসীগণ ভীক কিন্তু ধূর্ত ও

চতুর। ইহারা বাদুবিদ্যা আচরণ করে। কেবলমাত্র
কাপাস নির্মিত গুত্র বস্ত্র এইদেশে ব্যবহৃত। এই
বস্ত্র ব্যতীত অন্য কিছুই ইহারা পরিধান করে না।
সামান্য প্রভেদ সত্ত্বেও এতদেশীয় ভাষা ভারতবর্ষীয়-
ভাষার স্তায়। অক্ষর ও আচরণেও এই প্রথা
প্রচলিত। ইহারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং মহাযান
মতাবলম্বী।

সুভাবস্ত নদীর উত্তর তীরে প্রায় চৌদ্দশত প্রাচীন
সম্ভারাম। বর্তমানে উহারা জনশূন্য। পূর্বে তথায়
অষ্টাদশ সহস্র যতি বাস করিত কিন্তু ক্রমে ক্রমে কম

হইয়া এইক্ষণ অতি অল্প সংখ্যক যতিই বাস করে। ইহার মহাবান মতাবলম্বী; নির্জনে ধ্যান করে এবং শাস্ত্রপাঠও করে কিন্তু শাস্ত্রে বোধ কম। যতিগণ যাদুবিদ্যা আচরণ করিতে নিষেধ করে। সর্বস্বি-বাদিন, ধর্মগুপ্ত, মাতিশশাক, কাশ্যপীয়, এবং মহা-সঞ্জিকা—এই পাঁচ প্রকার বিনয়-সম্প্রদায় প্রচলিত। দেবতাদিগেয় দশটা মন্দির আছে এবং অবিখ্যাপীগণ উহাতে বাস করে। চাবিটী কে পাঁচটা সুরক্ষিত নগর আছে। রাজামুঙ্গল নগরে বাস করেন। এই নগরটী প্রায় ১৫১৭ লি এবং লোকপূর্ণ। মুঙ্গলীর ৪।৫ লি পূর্বে একটা বৃহৎ স্থানে অনেক প্রকার নৈসর্গিক ঘটনা দৃষ্ট হয়। এই স্থানে বুদ্ধদেব বোবি-সদ্বকপে বাস করিয়া কলিবার জন্ত নিজ শরীর উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

মুঙ্গলি নগরের ২৫০ কি ২৫০ লি উত্তর পূর্বে আমবা এক পার্বত্যশ্রেণী উদ্বার হইয়া অপলাল নামের উৎসে উপস্থিত হই। এই উৎস হইতে শুষ্ক পট নদীর উৎপত্তি। এই নদী দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত। বর্ষা ঙ্গ বসন্তকালে এই নদীর জল জানিয়া যান এবং প্রাতে কাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত বায়ু তাড়িত ভূমির রাশির স্রন্দর শোভা দৃষ্ট হয়। এই নাগ, কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে মনুষ্যরূপে ভ্রমগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গাজি নামে অভিহিত হইতেন। মাদবিনা বলে এই ব্যক্তি দৈত্যগণকে দমন করিয়া দেশকে কটিকা হইতে রক্ষা করিতেন। তাঁহারই অন্তর্গত দেশে অচির শত্রু জন্মিত। এই জন্ত প্রত্যেক পরিবারই তাহাকে বাৎসরিক কিছু কিছু করিয়া শস্যদান করিতে মনস্ত করিল। কয়েক বৎসর পরে এক ব্যক্তি এই প্রতিশ্রুতি শস্য দিতে বিস্মৃত হওয়ায় গাজি আর্শনা করিলেন যে তিনি যেন বিষাক্ত সর্পরূপ ধারণ করিয়া এতদেশ বাসীর শস্য বৃষ্টি ও কটিকা দ্বারা নষ্ট করিতে পারেন। জীবনান্তে তিনি সর্পরূপ ধারণ করিলেন; এবং উৎস হইতে একপ্রকার শ্বেত বারি ছড়াইয়া এদেশের সকল শস্য নষ্ট করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শাক্য তথাগত দেশবাসীর দুঃখে দয়াজচিত হইয়া সর্পকে স্বর্গে দীক্ষিত করিবার জন্ত এই স্থানে অবতীর্ণ হইলেন।

বজ্রপানির দণ্ডধারণ করিয়া তিনি পর্বতে আঘাত করিতে লাগিলেন। সপ্তরাজ ভীত হইয়া গুহা হইতে বহির্গত হইয়া তথাগতকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং বুদ্ধদেবের বাক্যে সপের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইল। বুদ্ধদেব সর্পকে কুব্জগণের শত্রু বিনষ্ট করিতে নিষেধ করিলেন; উহাতে সপরাজ উত্তর করিল আমার সকল আহারীয় সামগ্রী এই সকল কুম্বদিগের ভূমি হইতে সংগ্রহ হয় কিন্তু এইক্ষণ আপনার উপদেশে কৃতজ্ঞ হইয়া, আমি একপ সংগ্রহ বন্ধ করিব; কিন্তু আমি দ্বাদশ বৎসর অন্তর বাহাতে আহার সংগ্রহ করিতে পারি, তাহাও আদেশ প্রদান করুন।" তথাগত বাক্যে পরবশ হইয়া এইরূপ অমুমতি দেওয়াতে দ্বাদশ বৎসর অন্তর এই দেশে শ্বেত নদীর জল বৃদ্ধ হইয়া অবিখ্যাপীগণের দুঃখা হয়।

অপলাল নামের উৎসের ৩০ লি দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় পার্বতে বুদ্ধদেবের পর্বতচিহ্ন আছে। দর্শকের পূর্ণ ভূমি এই চিহ্ন দ্বারা বুদ্ধ হইয়া সর্পদমনের চিহ্ন বুদ্ধদেব এই স্থানে রাখিয়া গিয়াছেন। পথে জনসাধারণ এই স্থানে প্রস্তরের আধাণনিষ্কাশন করিয়াছে। বন্দুর হইতে জনসাধারণ এই স্থানে আঁসিয়া গজপ্রবা ও প্রস্পদারা এই পদচিহ্ন পূজা করে। ৩০ লি দূরে বুদ্ধদেব যে স্থানে তাঁহার বস্ত্র পেতে করিয়াছিলেন আমবা তথায় উপস্থিত হই। বর্ষায় বস্ত্রের সূতের চিহ্ন অনাথি ও দৃষ্ট হয়।

মুঙ্গলি নগরের ১০০ লি দক্ষিণে আমবা হিল পার্বতে উপস্থিত হই। নদীতীরে নানাপ্রকার পুষ্প ও ফল পাওয়া যায়। উপত্যকায় অনেক গুহা ও নদী আছে। অপ্রশস্ত খটাসের গায় অনেকগুলি প্রস্তর আছে; দেখিলে বোধ হয় যেন ইহার মনুষ্যের সৃষ্ট। এই স্থানে তথাগত একটা মাথা অর্ধেকাংশ শ্রবণ করিয়া আত্মহত্যা করিয়া ছিলেন।

মুঙ্গলি নগর হইতে দুই শত লি দক্ষিণে আমবা মহাবান সজ্জরামে পৌছ। এই স্থানেই প্রাচীনকালে তথাগত 'সর্বদাতা রাজা' নামে আখ্যাত হইয়া গোধি-সব্বের গায় জীবনাতিপাত করিয়াছিলেন। শত্রু কর্তৃক তাড়িত হইয়া তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া

গোপনে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ এই স্থানে তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে এবং তাঁহার সঙ্গে কিছুই না থাকিতে তিনি তাঁহাকে বন্ধন করিয়া তাঁহার শত্রুর নিকট লইয়া পুরস্কার গ্রহণের জন্য ব্রাহ্মণকে আদেশ দেন। মহাবান সজ্জারাম হইতে ৩০।৪০ লি উত্তর পশ্চিমে বাইয়া আমরা “মল্লনজ্জারামে” পৌছি। এই স্থানে একশত ফুট বা ততোধিক উচ্চ একটী স্তূপ আছে। এই স্তূপের নিকটেই চতুষ্কোণ প্রস্তরে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন আছে। প্রাচীনকালে বুদ্ধদেব এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কোটি কিরণরশ্মি দ্বারা মহাবান সজ্জারাম আলোকিত করিয়াছিলেন এবং পরে দেবতা ও মনুষ্যের উপহারার্থে নিজের পূর্বজীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই স্তূপের নিম্নদেশে খেত ও পীত বর্ণের একখানি প্রস্তব আছে; এই প্রস্তব হইতে সদাসর্বদা একপ্রকার ধ্বজ নির্গত হয়। এই স্থানে প্রাচীনকালে বুদ্ধদেব যখন বোধিসত্ত্ব ছিলেন, তখন প্রকৃত ধর্ম-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বর্গীয় শরীরস্থ অস্তির চর্কি দ্বারা একখানি পুস্তকের সারাংশ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

মোহু সজ্জারাম হইতে ৬০।৭০ লি পশ্চিমে অশোকরাজ নির্মিত একটী স্তূপ আছে। তথাগত এই স্থানেই পুরাকালে বোধিসত্ত্বরূপে শিবাকরাজ নামে খ্যাত ছিলেন। একটী শ্চোনপক্ষী হইতে একটা পারাবতকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি এই স্থানেই নিজের শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে ২০০ শত লি উত্তর-পশ্চিমে আমরা সান-নি লোপির উপত্যকায় পৌছি। এই উপত্যকায় মাপোও-সটিয় মঠ আছে। এইস্থানে আশি ফুট বা ততোধিক উচ্চ একটী স্তূপ আছে। প্রাচীনকালে যখন বুদ্ধদেব শত্রু নামে খ্যাত ছিলেন, তখন এই দেশে সর্বত্র দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধি ছিল। ঔষধে কোন উপকারই হইত না এবং রাজপথ মৃত-পূর্ণ থাকিত। বুদ্ধদেব কি প্রকারে সকলকে রক্ষা করিতে পারিবেন এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অক্ষম্যৎ সর্পমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া উপত্যকায় নিজ মৃত শরীর বিসৃত করিয়া তিনি সকলকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

তাঁহার আহ্বানে সকলে সানন্দ চিত্তে তথায় উপস্থিত হইয়া মৃতসর্পের শরীর কাটিতে আরম্ভ করিল। যতই তাঁহার সর্পের দেহ কাটিতে লাগিল ততই তাঁহার স্তূপ হইতে লাগিল এবং সেই সময় হইতে সেই দেশে দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধির কোনরূপ প্রকোপ রহিল না।

এই স্তূপের নিকটেই বৃহৎ স্তূপ। এই স্থানে তথাগত করুণ চিত্ত হইয়া স্তূপ নামক সর্পে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহার তাঁহার মাংস গ্রহণ করিয়াছিল, তাঁহারাই আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। উপত্যকার পার্শ্বেই অল্প একটী স্তূপ। পীড়িত ব্যক্তি এই স্থানে উপস্থিত হইলে আনোগ্য লাভ করে। পুরাকালে তথাগত মথবের রাজা ছিলেন। এক দিন তিনি সহচরবর্গ সহ এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৃষ্ণার্ত হইয়া তাঁহার সহচরগণ জল অনুসন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইল না। ময়ূররাজ তাঁহার চক্ষু দ্বারা পরীক্ষিত আঘাত করিতে জল নির্গত হইল; এই জলে হৃদ নিম্নিত হইয়াছে। পীড়িত ব্যক্তি এই হৃদের জল পান বা ইহাতে অবগাহন করিলে আরোগ্য লাভ করে। পরীক্ষিত গায়ে এখনও ময়ূরের পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

মুঙ্গলি নগরের ৬০।৭০ লি দক্ষিণ পশ্চিমে বৃহৎ নদী পূর্বদিকে ৬০ ফুট উচ্চ স্তূপ আছে। ইহা উত্তরসেনা নির্মিত। পুরাকালে তথাগত ধর্ম-মণ্ডলীকে বলিয়াছিলেন “আমার নির্বাণের পরে উদ্যানরাজ উত্তরসেনরাজ আমার শরীরের চিহ্ন-বিশেষ পাইবেন”। যখন রাজগণ বুদ্ধদেবের শরীরের চিহ্ন সমভাগে বিভক্ত করিতে উদ্যত তখন উত্তরসেন রাজ তথায় উপস্থিত হন। বৈদেশিক রাজা বলিয়া অল্প কোন রাজা তাঁহা ক কোন প্রকার সম্মান করেন নাই। এই সময়ে দেবতাগণ বুদ্ধদেবের শেষ কথাগুলি পুনর্ব্বার প্রচার করেন। পরে চিহ্নের অংশ-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সম্মান প্রদর্শনার্থ এই স্তূপ নির্মাণ করেন। এই স্তূপের নিকটেই গজাকার এক পরীক্ষিত আছে। উত্তরসেনরাজ খেত হস্তী পৃষ্ঠে বুদ্ধদেবের স্মৃতিচিহ্ন আনয়ন করিয়াছিলেন। এই স্থানে উপস্থিত হইলে

অকস্মাৎ হস্তীটি প্রাণ পরিত্যাগ করে এবং তৎক্ষণাৎ প্রস্তরে পরিণত হয়। ইহার সন্নিকটে স্তূপ নির্মিত হইয়াছে।

মুঙ্গলি নগরের ৫০ লি পশ্চিমে আমরা ৫০ ফুট উচ্চ অশোক রাজ নির্মিত রোহিতক স্তূপে উপস্থিত হই। তথাগত যখন বোধিসত্ত্ব ছিলেন তখন তিনি এই দেশের রাজা ছিলেন। এই স্থানে তিনি নিজ শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া পাঁচজন যক্ষকে নিজ রক্ত দ্বারা আহার করাইয়াছিলেন! মুঙ্গলি নগরের ৩০ লি উত্তর পূর্বে ৪০ ফুট উচ্চ স্তূপ আছে। এই স্থানে, পুরাকালে তথাগত মনুষ্য ও দেবতাগণের জন্ম বর্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তথাগতের প্রস্থানের পরে পৃথিবী গর্ভ হইতে সহস্রা এই স্তূপ উৎখিত হয়। জনসাধারণ এই স্তূপকে ষথেষ্ট ভক্তি করে এবং অনবরত পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য দ্বারা পূজা করে! প্রস্তর স্তূপের পশ্চিমে আমরা নদী পার হইরা একটা বিহারে উপস্থিত হই। এই বিহারে অবলোকিতেখর বোধিসত্ত্বের মূর্তি আছে। ইহার অনৈসর্গিক ক্ষমতা প্রহেলিকাপূর্ণ। সকলে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া অনবরত ইহাকে পূজা করে।

বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্তি হইতে ১৪০ কি ১৫০ শত লি উত্তর পশ্চিমে বাইয়া আমরা লালপোনু পর্বতে পৌছি। এই পর্বতের শিরোভাগে ৩০ লি আন্দাজ পরিধি বিশিষ্ট সর্প-হৃদ আছে। ইহার জল দপণেব জায় স্বচ্ছ। পুরাকালে বিরুদ্ধকরাজ শাক্যগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে শাক্যগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। একজন শাক্য রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া এবং ভ্রমণক্রান্ত হইয়া রাজপথের মধ্যস্থলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করেন। এক বনুহংস আকাশমার্গ হইতে তথায় উপস্থিত হইল এবং উক্ত শাক্য বংশীয় ব্যক্তি উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহাকে লইয়া হংস এই সরোবর সমীপে উপস্থিত হইল। এই প্রকারে পলায়িত শাক্য নানাদিকে নানাদেশ ভ্রমণে সক্ষম হইলেন। একদিন তিনি পথশ্রান্ত হইয়া সরোবর তীরে বৃক্ষতলে নিদ্রিত হইলেন। এই সময়ে এক

যুবতী নাগকন্যা তথায় ভ্রমণ করিত করিতে ঐ শাক্য যুবককে দেখিতে পাইল। অল্প উপায়ে নিজ অভিলাষ চরিতার্থ করিবার সম্ভাবনা না দেখিয়া নাগ কন্যা মনুষ্য মূর্তিতে শাক্য যুবকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে আদর করিতে লাগিল। যুবক ইহাতে ভীত হইয়া নিদ্রাভঙ্গে যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, “আমি দরিদ্র ক্রান্ত পর্য্যটক; স্মতরাং তুমি আমাব প্রতি এত অনুগ্রহ কেন দেখাইতেছ?” অতঃপর যুবক যখন যুবতীকে বিবাহ করিতে চাহিলেন, তখন যুবতী উত্তর করিল যে “তাহার পিতামাতার আদেশ ব্যতীত ইহা সম্ভবপর নহে। যুবক যুবতীর গৃহেব কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবতী উত্তর করিল যে, সে ঐ সরোবরের নাগরাজের কন্যা।” এবং সে শাক্যগণের পরাজয়ের কথা এবং ঐ যুবকের গৃহ তাড়িত হইয়া ষত্রুতন্ত্র ভ্রমণের কথা শ্রবণ করিয়াছে। এইক্ষণ পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত সে যুবকের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারে না।

শাক্যযুবক তৎপর বলিলেন যে তাঁহার পূর্ন-জন্মার্জিত পুণ্যকলে এই নাগ স্ত্রী মনুষ্যরূপে পরিণত হইল। বলিবামাত্রই নাগ-যুবতী ৩ রূপ হইল। ইহাতে যুবতী পরম সন্তুষ্ট হইয়া শাক্যযুবককে কৃতজ্ঞাচিত্তে নিবেদন করিল “আমার কৃকর্ষকলে আমি নানাক্রম জন্মপরিগ্রহ করিয়া এইক্ষণ আপনার পুণ্যবলে মনুষ্য দেহ পরিধারণ করিলাম। আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই এবং কোটি কোটি বার আপনার নিকট বাষ্ট্রাজ প্রণিপাত করিলেও ইহার শোধ হইবে না। আমি আমার পিতামাতাকে এই বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া পরে আপনার অনুবর্তিনী হইব। নাগিনী পরে সরোবরে প্রত্যাবর্তন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার পিতামাতার নিকট বর্ণনা করিয়া বিবাহে সম্মতি প্রার্থনা করিল। নাগরাজ ইহাতে পরম সন্তুষ্ট হইয়া বিবাহে সম্মত হইলেন। পরে সরোবর হইতে যুবকের নিকট গমন করিয়া শাক্য যুবককে নিবেদন করিলেন যে “আপনি অল্প জীবকেও ঘৃণা করেন না; অনুগ্রহ করিয়া আমার আবাসে উপস্থিত হইয়া আমার আতিথা গ্রহণ করুন।” যুবক এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া নাগরাজের ভবনে

উপনীত হইলেন। ইহাতে নাগরাজের সকল আত্মীয় অত্যন্ত আশ্রয় আশ্রয় করিতে লাগিল কিন্তু যুবক উৎসবদি কার্যে নিযুক্ত সপত্নীর আকৃতিতে ভীত হইয়া সে স্থান পরিত্যাগের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। নাগরাজ তাঁহাকে বলিলেন যে অমুগহ করিয়া তিনি যেন প্রস্থান না করেন। নিকটবর্তী কোন বাসস্থানে তিনি থাকিলে, নাগরাজ শাক্য যুবককে শীঘ্রই ঐ দেশের বাজা করিয়া দিবেন। ঐ দেশের সকল ব্যক্তিকেই তিনি বশীভূত করিয়া দিবেন এবং শাক্যযুবকের বংশ অনেক দিন ধরিয়া ঐস্থানে রাজ্য করিতে পারিবে।

যুবক এই প্রস্তাবে সন্তোষিত হইয়া পীকার করিলেন কিন্তু নাগরাজের কথায় সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। নাগরাজ ইহাতে মূল্যবান এক তরবারী উদ্ভূতম্বনির্মিত এক আবারে স্থাপন করিয়া যুবককে বলিলেন যে “ইহা লইয়া আপনি অনুগ্রহ করিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া এক শুভ উদ্ভূতম্বাধার রাজাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করুন। রাজা ইহা যেন গ্রহণ করিতে যাইবেন, তৎক্ষণাৎ আপনি এই তরবারীদ্বারা তাহাকে হত্যা করিবেন। এই প্রকাবে আপনি ঐ রাজ্য-ধিকারে সক্ষম হইবেন।” শাক্য যুবক নাগরাজের উদ্দেশ্যেব রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া রাজাকে হত্যা করিলেন। উপস্থিত মন্ত্রী ও ভৃত্যবর্গ ইহাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। শাক্য যুবক তাঁহার তরবারী উত্তোলন করিয়া বলিলেন যে “এই তরবারী আমাকে পুণ্যাগ্নী নাগরাজ দিয়াছেন; ইহাদ্বারা আমি গর্ভিতকে শাসন করিব।” ঐশ্বরিক শক্তিবিশিষ্ট যোদ্ধার নিকট তাহার পদানত হইল এবং তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিল। শাক্যযুবক দেশে শান্তিরক্ষা ও কুশখা দমন করিলেন। পরে সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে নাগরাজের প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং তাঁহার কণ্ঠকে সঙ্গ লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু এ যাবৎ নাগিনীর পূর্ব জন্মার্জিত পাপের ক্ষয় না হওয়াতে রাত্রিকালে তাহার মস্তক হইতে নয়টা নস্কক বিশিষ্ট সর্প বহির্গত হইত। শাক্যরাজ ইহাতে ভীত

হইয়া একদিন রাত্রিকালে তাঁহার নিদ্রিতা রাজীর মস্তক উত্তিত সর্পের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিলেন। রাজ্যী জাগরিতা হইয়া সভয়ে বলিলেন যে “ইহাতে আমার জীবনে আমাকে বিশেষ কিছু কষ্ট দিবে না, কিন্তু আপনার উত্তরাধিকারীগণ চিরকাল মস্তকের বেদনায় কষ্ট পাইবে।” সেই সময় হইতে এতদেশীয় রাজবংশীয়গণ এই ব্যাধিতে আক্রান্ত। শাক্য যুবকের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উত্তর যেন সিংহাসনাধিরোহণ করেন।

উত্তর সেনের সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই তাহার মাতার দৃষ্টিগতি লোপ পায়। তথাগত নাগ অপলালকে দমন করিয়া শূন্য হইতে এই স্থানে অবতীর্ণ হন। উত্তর সেন অনুপস্থিত ছিলেন তথাগত তাঁহার মাতাকে ধর্মোপদেশ দেন। বুদ্ধদেবের স্ত্রীমুখ হইতে এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া রাজমাতা দৃষ্টিগতি লাভ করেন। তথাগত উত্তরসেনের মাতাকে পুত্র কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার মাতা নিবেদন করেন যে রাজা মগধাথ গমন করিয়াছেন। তথাগত ও তাঁহার সমভিব্যাহারী ব্যক্তিগণ প্রস্থানোত্ত হইলে রাজমাতা নিবেদন করিলেন যে “বহুপুণ্য বলে তিনি পুণ্যবংশীয় রাজপুত্রকে গড়ে ধারণ করিয়াছেন এবং সেইজন্যই তথাগত বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশে আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। আমার পুত্র শীঘ্রই প্রত্যাবর্তন করিবে। সুতরাং অনুগ্রহ করিয়া কিছু কালের জন্য অপেক্ষা করুন।” পৃথিবীপতি উত্তর করিলেন যে “রাজমাতার পুত্র তাঁহারই বংশীয়। ধর্মের কথা শ্রবণ মাত্রই তিনি বিশ্বাস করিবেন। যদি রাজা উত্তর সেন তাঁহার আশ্রয় না হইতেন, তবে তিনি এইস্থানে থাকিয়া তাঁহার সম্মুখে ধর্মপ্রচার করিতেন। তিনি মগধা হইতে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাকে বলিবেন যে তথাগত এই স্থান হইতে কুশী-নগরে গমন করিয়াছেন; শালবৃকতলে শীঘ্রই তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন; আপনার পুত্র যেন স্মরণ চিত্তের জন্য তথায় গমন করেন।”

তথাগত এই কথা বালিয়া সপারিষদ আকাশমার্গ দ্বারা প্রস্থান করিলেন। পরে উত্তর সেন

নৃগয়াকালীন দেখিতে পাইলেন যে তাহার প্রাসাদ সহস্রা আলোকিত হইয়াছে। সন্দিগ্ধচিত্তে তিনি প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং মাতাকে দৃষ্টি-শালিনী দেখিয়া সানন্দচিত্তে কি প্রকারে তিনি দৃষ্টি-শক্তি লাভ করিলেন এই প্রশ্ন করিলেন। রাজমাতা বলিলেন যে রাজার প্রস্থানের পর তথাগত তথায় আগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপাসনা শ্রবণান্তে তাঁহার দৃষ্টিশক্তিলাভ হইয়াছে। তথাগত কুশীনগরে গমন করিয়াছেন; তথায় তিনি দেহ ত্যাগ করিবেন এবং স্মরণচিহ্ন সংগ্রহের জন্ত রাজাকে তথায় প্রয়াণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। রাজা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। পরে জ্ঞান লাভ হইলে তিনি সপারিষদ তথায় শালবৃক্ষ মধ্যে বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করিয়াছিলেন তথায় উপনীত হইলেন। বৈদেশিক রাজা বলিয়া প্রথমতঃ অগ্ন্যন্তঃ সকল রাজাই তাঁহাকে 'দুণ্ডু'র চক্ষে দেখিতে লাগিলেন কিন্তু দেবতাগণ বুদ্ধদেবের আদেশ জ্ঞাপন করিলে অগ্ন্যন্তঃ রাজাগণ তাঁহাকেও স্মরণ-চিহ্নের ভাগ দান করিলেন।

মুঙ্গলিনগরের উত্তর পশ্চিমে আমরা পর্বত উত্তীর্ণ হইয়া এবং উপত্যকা পার হইয়া পুনরায় সিন্ধুনদীর মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। রাজপথ বন্ধুর এবং গড়ানে। উপত্যকাগুলি অন্ধকার। কোন কোন সময়ে রজ্জু সাহায্যে এবং কোন সময়ে লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা আনাদের পার হইতে হইয়াছে। প্রায় এক সহস্র লি যাইয়া আমরা টালিলো দেশে পৌঁছি। পূর্বে এইস্থানেই উচাংনা দেশের রাজধানী ছিল। এই দেশে যথেষ্ট সুবর্ণ ও হরিদ্রা পাওয়া যাইত। বৃহৎ সজ্জারামের পার্শ্বে কাঠের মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহা সুবর্ণ রঞ্জিত, দেখিতে উজ্জ্বল এবং অলৌকিক ক্ষমতাপালী। উচ্চে ইহা এক শত ফুট এবং ইহা অর্হৎ মধ্যনতিক নির্মিত। এই অর্হৎ তাঁহার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে একজন ভাস্করকে নিজচক্ষে মৈত্রেয়ের শরীরের চিহ্ন সকল দেখিবার জন্ত তিনবার স্বর্গে প্রেরণ করেন। এই মূর্ত্তি গঠনের সময় হইতেই পুন্যকালে বৌদ্ধধর্মের শ্রোত

প্রবাহিত হইতে থাকে। পূর্বাদিকে অনেক তুঙ্গ পর্বত উত্তীর্ণ হইয়া এবং উপত্যকা পার হইয়া আমরা ৫০০ লি যাইয়া পোলুলো (বোলর) দেশে উপস্থিত হই।

বোলরপ্রদেশ

এই প্রদেশ ৪০০০ লি; ইহা তুমার পর্বত শ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। পূর্ব পশ্চিমে এই দেশ খুব লম্বা কিন্তু উত্তর দক্ষিণে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। এই দেশে গম, কলাই, সুবর্ণ ও রৌপ্য জন্মে। প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায় বলিয়া, এতদেশবাসীরা অর্থশালী। দেশটি শীতপ্রধান। অধিবাসীরা অসভ্য। তাহারায়ের ধার ধারে না এবং আদৌ বিনয়ী নহে। উহারায় পশমের বস্ত্র ব্যবহার করে এবং অশিষ্ট। প্রচলিত অক্ষরগুলি ভারতবর্ষের ত্রায় কিন্তু ভাষা স্বতন্ত্র। শতাধিক সজ্জারামে সহস্র যতি আছেন কিন্তু উহারায় জ্ঞানার্জনে উৎসুক সাধু চরিত্র নহেন। এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া আমরা সিন্ধু নদী পার হই। এই নদী ৩৪ লি বিস্তৃত এবং ইহার জল দপণের ন্যায় সচ্ছ। নদীতীরে বিঘাত্ত সর্প এবং হিংস্র জন্তু বাস করে। যদি কেহ মূল্যবান পণ্য বা রত্ন অথবা পুষ্প ও ফল বিশেষতঃ বুদ্ধের স্মরণচিহ্ন লইয়া এই নদী পার হইতে চেষ্টা করে, তবে নদীর ঢেউ নৌকাকে গ্রাস করে। এই নদী পার হইয়া আমরা তক্ষশীলায় পৌঁছি।

তক্ষশীলা

তক্ষশীলা রাজ্য প্রায় ২০০০ লি এবং ইহার রাজধানীর ১০ লি পরিধি। রাজবংশ নির্কংশ হওয়াতে উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ ক্ষমতা পরিচালনের জন্ত বিবাদ করে। এই দেশ প্রথমে কপিলা রাজ্যের অধীন ছিল কিন্তু বর্তমানে ইহা কাশ্মীরের অধিকারভুক্ত। জমী বিশেষ উৎকরা এবং প্রচুর পরিমাণে ফসল জন্মে। দেশে অনেক নদী ও উৎস আছে। নাতিশীতোষ্ণ এই দেশে যথেষ্ট পুষ্প ও ফল পাওয়া যায়। অধিবাসীরা সাহসী, অক্ষুণ্ণ এবং তিরস্ককে সম্মান করে। অনেকগুলি সজ্জারাম আছে কিন্তু বর্তমানে সেগুলি জনশূন্য; তথায়

কয়েকজন মাত্র যতি বাস করে। ইহার মহাযান মতাবলম্বী। রাঙধানী ৭০ লি উত্তর পশ্চিমে নাগরাজ ইলাপত্রের সরোবর অবস্থিত। ইহার জল সুস্বাদু ও পবিত্র। নানারঙের পদ্ম পুষ্প এই সরোবরের শোভা বৃদ্ধি করে। এই নাগ পূর্বে ব্রাহ্মণজাতীয় ছিল এবং কশ্যপ বুদ্ধের সময় ইলাপত্র গুহ্য নষ্ট করিত। এইজন্য এতদেশীয় লোকের যখন বৃষ্টির আশঙ্ক হয়, তখন ইহার শ্রমণগণের সহিত সরোবর তীরে উপস্থিত হইয়া তজ্জলিধারা শব্দ করে অথবা প্রার্থনা করিলেই অলৌকিক হয়।

নাগ সরোবরের ৩০' লি দক্ষিণ পূর্বে দুইটি পর্বতের মধ্যস্থ গিরিচক্রে উপস্থিত হই। এইস্থানে অশোকরাজ নির্মিত স্তূপ আছে। উচ্চ এই স্তূপ প্রায় একশত ফুট। এইস্থানে শাক্য তথাগত ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রকাশ করেন যে যখন পৃথিবীপতি মৈত্রেয় এই জগতে আবিভূত হইবেন তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে চারিটি রত্নও আপনা হইতে আবিভূত হইবে এবং ঐ চার রত্নের সবটী এই দেশে থাকিবে। লোক-পরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে, যখন চতুর্দিকে ভূমিকম্প হয়, তখন এই স্থানের একশত পাদভূমি বেঠেন করিয়া বোনপ্রকার আন্দোলন হয় না। যদি কোন ব্যক্তি এই স্থান খনন করে, তবে পুনর্বার ভূমিকম্প হয়। স্তূপের নিবটে সজ্জারামের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। অনেকদিন হইতে এই সজ্জারাম জনশূন্য এবং এখানে বোন যতি বাস করেন না।

নগরের উত্তরে ১২।১৩ লি দূরে অশোকরাজ নির্মিত স্তূপ আছে। উৎসবদিবসে এই স্তূপ আলোকিত হয় এবং ঐশ্বরিক পুষ্প এই স্থানে পতিত হয় সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বরিক বাদ্যও শ্রুত হয়। জনশ্রুতি এইরূপ যে পুরাকালে বৃষ্টিব্যর্থাধগ্রস্ত হোন স্বালোক এইস্থানে বাস করিত। গোপনে স্তূপে আসিয়া সে নানাপ্রকারে পূজা করে এবং নিজ পাপ স্বীকার করে। পরে স্তূপের আঙ্গিনা গোময় এবং মূল পরিপূর্ণ দেগিয়া সে উহা পরিষ্কার করে এবং পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য বিক্ষিপ্ত করে। পরে নীলপদ্ম সংগ্রহ করিয়া

উহাও এইস্থানে প্রদান করে। ইহাতে বৃষ্টিব্যর্থাধ হইতে মুক্তিলাভ পূর্বক সে দিবা দেহ লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার লাবণ্যময় অঙ্গ হইতে নীলপদ্মের গন্ধ বিকীর্ণ হইতে থাকে এবং এই স্থানও উক্ত গন্ধ লাভ করে। তথাগত এইস্থানে বোধিসত্ত্বরূপে বিনয় শিক্ষা করিয়াছিলেন। তখন তিনি এই দেশের রাজা ছিলেন এবং চন্দ্রপ্রভা নামে খ্যাত ছিলেন। বোধি লাভের তত্ত্ব তিনি নিজ মস্তক ছেদন করেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে তিনি সহস্র জন্ম ঐরূপ করিয়াছিলেন।

এই স্তূপের পার্শ্বের সজ্জারাম জনশূন্য, কেবলমাত্র কয়েকজন যতি তথায় বাস করেন। প্রাচীনকালে হনুমান মঙ্গলায়াসুর্গত কুমারলক এই স্থানে কয়েকখানি শাস্ত্র রচনা করেন। নগরের দক্ষিণপূর্বে পর্বতপার্শ্বে ১০০ ফুট উচ্চ স্তূপ আছে। এই স্থানে তাহার কুনালের চক্ষু উৎপাটিত করিয়াছিল। এই স্তূপ অশোক কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। অন্ধ ব্যক্তির এই স্তূপের নমস্কে আশ্রয় করিলে তাহার দৃষ্টিশক্তি লাভ করে। কুনাল পাটরাণীর সন্তান ছিলেন। তিনি দেখিতে সুন্দর এবং দয়াদ্রুচিত ছিলেন। যখন পাটরাণীর মৃত্যু হয়, তাহার স্থলাভিষিক্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণা রাণী রাজপুত্র কুনালের নিকট কুৎসিত প্রস্তাব করিলে, কুনাল তাঁহাকে ভৎসনা করিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে বিমাতা কুৎসিত হইয়া রাজাকে বলে যে জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই তক্ষশীলার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করা উচিত। রাজপুত্র কুনাল দয়াদ্রুচিত এবং সুধীর। রাজা ইহাতে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া কুনালকে তক্ষশীলায় প্রেরণ করেন। এদিকে কুনালের বিমাতা প্রতিশোধ লব্ধবার মানসে যোম দ্বারা পত্র লিখিয়া নিদ্রিত অশোকের দস্ত চিহ্ন পত্রে স্থাপন করিয়া দূত দ্বারা ঐ পত্র তক্ষশীলার মন্ত্রীগণের নিকট প্রেরণ করে। কুনালের মন্ত্রীগণ এই পত্র পাঠ করিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া একে অপরের দিকে চাহিতে থাকে। রাজপুত্র মন্ত্রীগণকে তাহাদের বিস্ময়ের কারণ জিজ্ঞাসা করায় মন্ত্রীগণ উত্তর করেন যে মহারাজা উক্ত পত্রে রাজপুত্রকে অপরাধী

বিবেচনা করিয়া তাহার চক্ষু উৎপাটন পূর্বক সম্রাট পর্কতে নির্বাসনের আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা রাজার এইরূপ আদেশ পালনে সাহসী নই; আমরা দ্বিতীয় আদেশ প্রাপ্তি পয্যন্ত আপনাকে বন্ধন করিয়া রাখিব।”

রাজপুত্র উভয় কহিলেন যে “পিতা যখন এরূপ আদেশ করিয়াছেন তখন অবশ্যই তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে; তাহার দৃষ্টির মোহর দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে এই আদেশ সত্য। ইহাতে কোন প্রকার ভয় নাই।” এই বলিয়া তিনি চণ্ডালকে তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিতে আদেশ দিলেন। এই প্রকারে দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া তিনি ভিক্ষাদ্বারা উদর পূর্ণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে চলিতে চলিতে একদিন পিতার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। পত্নীর নিকট ইহা শুনিয়া রাজপুত্র কুনাল বলিলেন যে, তিনি এককালে রাজপুত্র ছিলেন; এখন পথের ভিখারী। যদি তিনি সুবিধা পাইতেন তাহা হইলে তাঁহাদের দোষস্থাননের চেষ্টা করিতেন। এই মানসে তিনি রাজোদ্যানে প্রবেশ করিয়া রাত্রিতে বংশীবাদন ও সঙ্গে সঙ্গে করুণধরে গান করিতে লাগিলেন। স্নান উপরন্তু হইতে এই করুণধর শুনিয়া ঐ গায়ককে তাহার সম্মুখে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। অন্ধ ব্যক্তি তাঁহার সমীপে আনীত হইলে তিনি শোকাভিভূত হইয়া আর্তনাদ করিতে করিতে কে কুনালের এই দশা করিল তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

কুনালও ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার পিতাকে ধন্যবাদ দিয়া উত্তর করিলেন “বসন্তঃ, পিতৃভক্তির অভাব হেতুই ভগবান তাঁহাকে এই শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। অমুক বৎসরের অমুক মাসে এবং

অমুক দিনে রাজ্যদেশ তাঁহার নিকট প্রেরিত হয়। এবং সেই আদেশ প্রতিপালনের জন্যই তিনি অন্ধ হইয়াছেন। রাজা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীই এইরূপ করিয়াছেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই তাহার ইত্যার আদেশ দিলেন।

বোধি বৃক্ষের নিকটস্থ সজ্জারামে ঘোষ নামে এক অহং বাস করিতেন। তিনি বিনা আয়াসেই ভবিষ্যৎগণনা করিতে পারিতেন। তিনি ত্রিবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। অশোক তাঁহার নিকট অন্ধকুনাল সহ উপস্থিত হইয়া কি প্রকারে তাঁহার পুনরায় দৃষ্টিশক্তি লাভ হইতে পারে, তজ্জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন। অহং রাজার অনুরোধ শ্রবণ করিয়া বলেন যে “যে আগামী কল্য আনি ধর্মপ্রচার করিব, প্রত্যেকে একটি পাত্র হস্তে লইয়া আমার নিকট যেন উপস্থিত হয় এবং চক্ষুর জল সেই পাত্রে রক্ষা করে।” পর দিবস, দেশ দেশান্তর হইতে স্রাপুরুষ সমবেত হইলে অহং দশ দশ নিদান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে থাকেন এবং তাঁহার বাচ্য সকলেরই চক্ষু হইতে জল নির্গত হয়। সন্ধ্যা পাত্রে এই চক্ষুজল সকলেই রক্ষা করিলেন এবং পরে অহং এই চক্ষুজল সূবর্ণপাত্রে লইয়া বলিলেন “বুদ্ধবৈবের সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা যদি সত্য না হয়, তবে সাহা আহে তাহাই থাকুক; আর যদি সত্য হয়, তবে এই অন্ধ ব্যক্তি যেন এই জলদ্বারা চক্ষুধৌত করিয়া নিজ দৃষ্টি শক্তি লাভ করে।” এই বলিয়া তিনি কুনালের চক্ষু ধৌত করিলে পর তাঁহার চক্ষু পূর্ববৎ হইল। রাজা পরে তাঁহার মন্ত্রীদের নানাপ্রকার শাস্তি প্রদান করিলেন ও অন্যান্য সহকারীগণকে নির্বাসিত করিলেন।

এই রাজ্য হইতে দক্ষিণ পূর্বে ১০০ লি বাইরা আমরা সিংহপুর রাজ্যে পৌছি। (ক্রমঃ)

খেয়ালির গান ।

(ওন্গনেসি হইতে)

স্বপ্ন-স্থখে আমরা সুখী ছন্দে গাঁথি গান,
সিন্দুকুলে আমরা শুনি ভাঙা চেউয়ের তান !

ছুনিয়া ভুলে জ্যোৎস্না-জলে আমরা ফেলি জাগ,
মোরাই আবার ছুনিয়াটারে নাচাই চিরকাল !

গল্প মোরা সত্য করি যখন করি মন,
অমর শ্লোকের ভিত্তি দিয়ে রাজধানী পত্তন !
থোস্-থেয়ালি মুকুট পরে রাজ্য করে জয়,
সুরের হাওয়া ফিবিয়ে কভু সৃষ্টি কভু লয় !
স্বর্গ নরক আমরা রচি, সন্দেহ নেই লেশ,
হাসির বোঁকে আমরা গড়ি হবু রাজ্যব দেশ ;

অশ্রু দিয়ে গড়েছিলাম পোনার অপোক বন ;
গড়েছিলাম অন্ধবাজের হস্তিনা শোভন !
আমরা আবার গেয়েছিলাম পত্তন তা' সবার,
পুরাতনের অবসানে নূতন অবতার !
একটি ক'রে যুগ চলে যায়, একটি স্বপন শেষ,
নূতন যুগে আমরা রচি নূতন স্বপন-দেশ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিবিধ।

পৃথিবীর আলোক।

জ্যোতির্বিদগণ আকাশের আলোক লক্ষ্য করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, সমস্ত তারকাকে একত্র করিলে যতটা আলোক পাওয়া সম্ভব, আমাদের আকাশ তাহার অপেক্ষা অধিক আলোকে আলোকিত থাকে। কেবল তাহাই নহে; রাত্রের যামানুসারে এবং এক রাত্রি অপেক্ষা অপর রাত্রে এই আলোকের হ্রাস বৃদ্ধি

হইয়া আসে এবং উর্দ্ধ অপেক্ষা দিগ্‌মণ্ডলে এই আলোক অধিক প্রবল বলিয়া বোধ হয়। অনেকে বলেন নক্ষত্রালোক ভিন্ন পৃথিবীর নিজের একটা আলোক আছে। সে আলোকের উৎপত্তি যে কোথায় তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

মিশরের প্রাচীনতম শব্দেহ। (Mummy)

প্রাচীনকালে মিশরদেশে মৃতদেহকে একপ্রকার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা রক্ষা করিত যে তাহা সহস্র বৎসরেও ধ্বংস হইত না। এই সকল রক্ষিত শরীরের নামই মামী (Mummy) তাহার মৃত দেহের সর্কাসে একপ্রকার প্রলেপ লাগাইত। তাহার দ্বারাই শবেরা ঠিক স্বাভাবিক আকৃতিতে অমর হইয়া থাকিত। অজ্ঞকাল মিশরে একপ্রকার অনেক 'মামী' আবিষ্কৃত হইতেছে। ১৮২১ সালে অধ্যাপক পেট্রি (Petrie) মিডাম পিরামিডে যে মামীটির আবিষ্কার করেন, এক্ষণে মিশরের সেইটিই প্রাচীনতম যুগের বিজ্ঞানকৌশলে রক্ষিত মামী' বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে। জীবিতাবস্থায় এই ব্যক্তির নাম রানেফার (Ranefer) ছিল। যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্বে রাজা

সেনফুর (Senfu) রাজত্বকালে ইহা রক্ষিত। আবিষ্কারের পর 'মামী'টিকে লইয়া ইংলণ্ডের রয়েল কলেজে রাখিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর ইহার কথা আর বড় কাহারও মনে ছিল না। তাহার কারণ লোকের একটা বিশ্বাস ছিল যে একপ্রকার অনেক প্রাচীন 'মামী' এমন কি ইহা অপেক্ষাও প্রাচীনতর 'মামী' আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি এই সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে মিশর বা ইংলণ্ডের কোথাও খৃষ্টাব্দপূর্ব ১৫৮০ বৎসরের অধিক পুরাতন 'মামী' রক্ষিত নাই। দশম ও দ্বাদশ রাজবংশের কালে অর্থাৎ ২০০০ হইতে ২০০২ খৃষ্টাব্দপূর্ব বৎসরের মধ্যে যে সকল 'মামী' প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার কতকগুলি ১২০৭ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু সেগুলি এতই সগভঙ্গুর যে তাহা

স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয় নাই। মিডাম পিরামিডে (Medum pyramid) যে নামটি পাওয়া গিয়াছে ডাক্তার বেসনার (Beisner) বলেন যে দেরি

খৃষ্টপূর্ব ২৮৭০ সালের। সুতরাং অত্যাধি আবিষ্কৃত 'মানী অপেক্ষা ১১০০ বৎসর পূর্বেকার।

প্রজ্বলন্ত সূর্য্য ।

আদিম অবস্থার মনুষ্য ও সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে জগতের আলোক উত্তাপের উৎস যে সূর্য্য তাহা কেবল একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিত্ত মাত্র। কিন্তু যে সকল বৈজ্ঞানিক এসময়ে আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেরই বিশ্বাস স্বতন্ত্র। তাঁহারা বলেন যে এই উজ্জ্বল নক্ষত্রটি জ্বলন্ত হওয়া অসম্ভব, কারণ তাহা হইলে বহুযুগ পূর্বেই ইহার দাহের অবসান হইত। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে ইহার উজ্জ্বলতা দাহমান বাতি বা গ্যাসের আলোকের ত্বার কারণ হইতে উৎপন্ন নহে। বৈদ্যুতিক ল্যাম্পে যেরূপ অল্পজ্বলের অভাবে বিনা রাসায়নিক দ্রব্যেতেই আলোক দান করে ইহাও সেইরূপ। সূর্য্য গ্রহে বখেই অল্পজ্বল বর্তমান আছে সত্য, কিন্তু ইহার উত্তাপ এতই অধিক যে কোনপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও আলোক দান করিতে হইলে বস্তু মাত্রেরই শক্তি ক্ষয় হইয়া থাকে এবং এক প্রকারে না এক প্রকারে এই শক্তির পূরণ হওয়া আবশ্যিক। দাহমান শিখা রাসায়নিক প্রক্রিয়া হইতে এই শক্তি লাভ করিয়া থাকে। বৈদ্যুতিক ল্যাম্পে তাড়িতপ্রবাহই এই শক্তিকে পূরণ করে। কিন্তু সূর্য্যর মধ্যে এ শক্তি কোথা হইতে আসে? বহু বৎসর ধরিয়া এ প্রশ্নের কোন সীমাংসাই হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে বৈজ্ঞানিক গণের সাধারণ মত এই যে, সূর্য্যের অংশগুলি অবিরাম তাহার অন্তরমধ্যে পতিত হইতেছে বা সঞ্চিত হইতেছে তাহারই ফলে সেই বিরাট গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এই প্রচণ্ড উত্তাপে পরিণত হইতেছে। অনেকে অবশ্য এ মতের বিরোধী আছেন। মিষ্টার এট্‌স্‌ এস্‌.শেলটন (H. S. Shelton) Knowledge and scientific News নামক

পত্রে সূর্য্যগঠনের এক নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

“সূর্য্যগ্রহেব গঠন প্রণালী অপেক্ষা অধিক মনোহর বা অদ্ভুত বিষয় জ্যোতিঃশাস্ত্রে নাই। সূর্য্যের উজ্জ্বল পিণ্ডের চতুর্দিকে একরূপ একটা তীব্র আলোকের আবরণ আছে যে পার্থিব কোন বস্তুর তুলনায় তাহা কল্পনা করা অসম্ভব। এই আলোক আবরণটি অতি সূক্ষ্ম, সূর্য্যের বাসের তুলনায় ক্ষুদ্র পরমাণুব অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। এত সূক্ষ্ম যে সময়ে সময়ে যে সৌরবাত্যা বহিতে থাকে তাহার আঘাতে ইহা অবিরামই ছিন্ন হইতে থাকে। এই সকল ছিন্ন স্থলকেই আমরা সূর্য্যের কলঙ্ক চিহ্ন বলিয়া থাকি।”

“অনেকেব মতে এই আলোকপ্রদ আবরণটি কঠিন বা তরল অক্সিজেন (carbon) ও সিলিকনে (Silicon) গঠিত এবং ইহা সূর্য্যের তরল বা বাষ্পীয় দেহের উপরে স্থিত। এই একমাত্র প্রচলিত মীমাংসাই বেশ প্রশংসা লাভ করিয়াছে, কিন্তু এ মতের সমর্থন করার পক্ষে অনেকগুলি কঠিন বাধা আদিয়া উপস্থিত। এই অক্সিজেন ও সিলিকন যে কি কারণে সূর্য্যের উপরিভাগেই থাকিবে তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। তদ্বিন্ন আমরা সূর্য্যের উত্তাপের পরিমাণ ঠিক না জানিলেও, নিতান্ত অল্প করিয়া ধরিলেও তাহা এত অধিক যে তাহাতে কেবল অক্সিজেন বা সিলিকন কেন, পার্থিব যাবতীয় বস্তুই দগ্ধ হইয়া বাষ্পে পরিণত হইবে সন্দেহ নাই।”

“অধিকন্তু সূর্য্যের উপরিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও উক্ত মতের সমর্থন করা কোনমতেই সম্ভবে না। এই আবরণটি যে এক স্বভাবাপন্ন একটা উজ্জ্বল বস্তু তাহা নহে, পরীক্ষা দ্বারা ইহার গঠনপ্রণালী বেশ স্পষ্টরূপে দানাদার বলিয়াই বুঝা

যায়। ধারের দিকে এই আবরণটি উজ্জ্বল রেখায় পরিণত হইয়াছে। এই রেখাগুলিকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় *facula* বলে।”

“অনেকগুলি বিশেষত্বের বিষয়ে আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, এই আবরণটি রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল। সূর্যের কোন কলঙ্কচিহ্ন যখন অপসৃত হইতে থাকে তখনই ইহা আরও স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। আবরণের ছেদস্থলের পূরণটি যে ধীরে ধীরে হয় তাহা নহে। সেগুলি সহসা একরূপভাবে পূর্ণ হইয়া যায় যাহা দ্বারা অনুমান হয় যেন একটা বিরাট শিখাস্তম্ভ বেগে সেই অন্ধকার গহ্বরের উপর দিয়া ছুটিয়া গেল। ইহার অপেক্ষা এ সম্বন্ধে আর অধিক স্বাভাবিক বর্ণনা হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক মতের দ্বারা না পাইলে আমাদের পরীক্ষা ও কল্পনা আপনাই বলিতে থাকে যে সূর্যাগ্রহ একটি বিরাট অনল শিখার আবরণে পরিবেষ্টিত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মত হিসাবে এ কথা বলা চলে না, কারণ অনলশিখা বলিতেই দাহক্রিয়া বুঝায়, দাহক্রিয়া বলিলেই রাসায়নিক ক্রিয়া বুঝায় এবং তথাকার রাসায়নিক ক্রিয়া যে ঠিক কি হইতে পারে তাহা আমরা কল্পনা করিতেও অক্ষম। লর্ড কেলভিন ত স্পষ্টই বুঝাইয়াছেন যে সমস্ত সূর্যাটা জ্বলন্ত কয়লা হইলেও, কয়েক সহস্র বৎসর মধ্যেই তাহা দক্ষ হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইত।

“সম্প্রতি জ্যোতিষ ও রসায়ন সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে সূর্য্য সম্বন্ধে এই আদিম স্বাভাবিক ধারণা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণা অপেক্ষা অধিক সত্যানুবর্তী হওয়া আশ্চর্য্য নহে। এক্ষণে ইহা সম্ভব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে যে সূর্যের এই প্রচণ্ড উত্তাপের অধিকাংশভাগই কোনপ্রকার স্বাভাবিক আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন উদ্ভূত। সাধারণ রাসায়নিক বা আণবিক ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র করিবার জন্ত আমরা ইহাকে রাসায়নিক-অতীত (Meta chemical) ক্রিয়া বলিব।”

তাহার এই মতের সমর্থনের জন্য শেলটন সাহেব

যে প্রমাণগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা নিম্নে সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত করিয়া দিলাম।

(১) একরূপ একটা কোন ‘মেটাকেমিকেল’ শক্তি না থাকিলে অবিরাম সূর্যের উত্তাপদানের শক্তি কোথা হইতে আসা সম্ভব তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না। পৃথিবী কত শত কোটি বৎসর হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু সূর্যের মাধ্যাকর্ষণজনিত উত্তাপের কথা বিশ্বাস করিলে পৃথিবী ৫ কোটি বৎসরের অধিক থাকি সম্ভব হয় না।

(২) সার নরম্যান লর্কিংগার ও অগ্নাত্ত জ্যোতির্বিদগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে শূন্যস্থিত রাসায়নিক মূল উপাদানগুলি (elements) অবিরামই পরিবর্তিত হইতেছে ধরিয়া লইলে শূন্যস্থিত অনেক ব্যাপারের সংজ্ঞাই মীমাংসা হওয়া সম্ভব।

(৩) আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায় যে, আমাদের চক্ষের সম্মুখেই একটি রাসায়নিক মূল উপাদান অপর উপাদানে পরিবর্তিত হইতেছে। এইরূপ পরিবর্তনের ফলে এক অতুলনীয় শক্তি সঞ্চারিত হয়।

এই সকল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া শেলটন সাহেব বলেন—“এই সকল কারণে আমরা মনে করিতে পারি যে রাসায়নিক প্রত্যেক মূল উপাদানের (element) পরিবর্তন হওয়া সম্ভব, এবং এইরূপ রাসায়নাতীত পরিবর্তনের ক্রিয়া হইতে অনন্ত শক্তি উদ্ভূত।”

“সৌর উত্তাপের এইটিই প্রধান কারণ ধরিয়া লইলে আমরা সূর্যের অবস্থা সম্বন্ধে অনেকটা যুক্তিসঙ্গত অনুমান করিয়া লইতে পারি। সূর্যের মধ্যে যে একটা ভীষণ উত্তাপতপ্ত বিরাট জড়পিণ্ড রহিয়াছে তাহা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। এই জড়পিণ্ডের অধিকাংশ ভাগেই উত্তাপের একটা সমতা আছে, সুতরাং সে স্থলে কোন প্রকার ‘মেটাকেমিকেল’ পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যে সকল স্থান শীতল হইতেছে তথায় উত্তাপ নির্গত হওয়ার জন্য সামান্যতম ব্যতিক্রম ঘটিতেছে।

এই সকল স্থানেই মেটা কেমিকেল পরিবর্তন হওয়া

আভাবিক। ইহার ফলে শক্তি উদ্ভূত হয় পরিবর্তনের ক্ষেত্র হইতেই উত্তাপ বহির্গত হইতে এবং আমাদের মনে হয় যে, এই আণবিক থাকে।

মস্তিষ্ক সম্বন্ধে নূতন মত।

ডাক্তার জোসেফ্ সিমন্ (Dr. Joseph Simms) মস্তিষ্ক সম্বন্ধে এক নূতন মত প্রচার করিতেছেন। এই বিষয়টি আলোচনা কালে তিনি পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের মনুষ্য হইতে পশু পর্যন্ত সহস্র সহস্র জীবের মস্তিষ্ক ওজন করিয়া দেখিয়াছেন। এক কথায় বলিতে হইলে তাঁহার মতে সাধারণতঃ যে সকল কিয়ার জন্ত মস্তিষ্কে গৌরবদান করা হয়, সেগুলি তাহার গুণ নহে, সেগুলি আমাদের জংপিণ্ডের ক্রিয়া মাত্র। তাঁহার মতে মস্তিষ্কের চিন্তা করিবার কোনও শক্তি নাই। তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন যে আরিষ্টটল্ হইতে ডার্কইন পর্যন্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনস্বীগণ তাঁহারই মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি বলেন—“বিজ্ঞান বলে যে, ১৪ হইতে ২০ বৎসর বয়সের মধ্যেই মস্তিষ্কের মস্তিষ্ক সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হয়। বিংশতি বৎসর বয়সেই মস্তিষ্কের চরম বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মনুষ্যের জন্মকালে তাহার মস্তিষ্ক তাহার দেহের তুলনায় যেরূপ অধিক ভারী থাকে এরূপ জীবনের আর অন্য কোন কালেই দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ বৎসর বয়স হইতেই আমাদের মস্তিষ্কের দিন দিন হ্রাস ও ক্ষয় হইয়া থাকে, যত্নের পূর্বকাল পর্যন্ত প্রতি দশবৎসরে প্রায় এক আউন্স কমিয়া যায়। এ কথা অনেক দিন পূর্বেই প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু ২০ হইতে ৬০ বৎসরের মধ্যে মস্তিষ্কের এইরূপ অবিরাম ক্ষয় হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বুদ্ধির বল ও শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, দেশের জল বায়ুর উপর মস্তিষ্কের আকারের পার্থক্য নির্ভর করে। শীতপ্রধান দেশের লোকদিগের মস্তিষ্ক বড় এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত ছোট;— ইহা আমি বহু পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি এবং জাতীয় অভিমান ব্যথিত হইলেও ব্যাপারটা সত্য সন্দেহ নাই।

“মেরুপ্রদেশ হইতে বিষুবরেখাবর্তী দেশ পর্যন্ত পৃথিবীর সকল স্থানের জীবেরই মস্তিষ্ক আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। স্কটল্যান্ডের তিন মৎশ্বের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি—তাহা আকারে সাধারণ মনুষ্যের মস্তিষ্ক অপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক। অনেকগুলি হস্তীকে পরীক্ষা করিয়াও দেখিয়াছি তাহাদের মস্তিষ্ক আমাদের অপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক বৃহৎ। সাধারণ ভাবে দেখিলে বোষ্টনের মনুষ্যের অপেক্ষা ইংলণ্ডের লোকের মস্তিষ্ক ওজনে আধ আউন্স কম, তাহার কারণ বোষ্টন ইংলণ্ড অপেক্ষা শীতপ্রধান। আমেরিকার দক্ষিণ অংশের লোকের অপেক্ষা নরওয়ে বা স্কটল্যান্ডের লোকের মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যে অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন তাহা নহে।

“আমার মতে মস্তিষ্কেই বুদ্ধির স্থান বলা ভ্রম। আমি পরীক্ষার দ্বারা যাহা পাইয়াছি তাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, আমাদের মন আমাদের দেহময় ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইউরোপের অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতও আমার এ মতের সমর্থন করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস যে আমাদের চিন্তাক্রিয়া আত্মার দ্বারাই সম্পন্ন হয়। আত্মার বাসস্থানের কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই, সর্বদেহেই তাহা ব্যাপ্ত এবং সর্ব যন্ত্রের দ্বারাই তাহা রক্ষিত। শরীরের কোন একটি অংশ অক্ষুণ্ণ হইলে যে আমাদের মনও কতকটা অক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে, তাহা আমরা নিত্যই দেখিতে পাই।

“মনুষ্যদেহে মস্তিষ্কের একটা উপকারিতা আছে সন্দেহ নাই। অনেকে বলেন দেহের উত্তাপ পূরণ করাই ইহার কৰ্ম। রক্তের উত্তাপ অপেক্ষা মস্তিষ্কের উত্তাপ অধিক সন্দেহ নাই এবং দেশের উত্তাপের ফলে মস্তিষ্কের আকারের পরিবর্তন হয় ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। নিরোধের মস্তিষ্ক বুদ্ধিমানের অপেক্ষা বৃহৎ হয়, কি তাহাদের জংপিণ্ড নিতান্ত ক্ষুদ্র হইতে দেখা যায়। মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা, বোতাল্

ও মাকোড়শার কৰ্ম কৌশলের কথা চিরদিনই গুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের যে মস্তিষ্ক বলিয়া কিছুই নাই তাহা আমরা সকলেই জানি।

“গ্যাস্‌গো বিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন্ ক্লেলাণ্ড (John Cliland) প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছেন যে মস্তিষ্কের সহিত আমাদের স্মৃতি, বিবেচনা বা অগ্ৰান্ত মানসিক ক্রিয়ার যে সম্বন্ধ নাই তাহা তিনি প্রমাণ করিতে প্রস্তুত।

মস্তিষ্ক আমাদের মন বা বুদ্ধির আসন এটা নিতান্তই অনুমান। ইহার কোন প্রমাণই দেখিতে পাওয়া যায় না। আধুনিক অনেক বিজ্ঞানবিদ বরং আমার মতেরই পক্ষপাতী। মস্তিষ্ক বাহির করিয়া লইলেও যখন আমাদের বুদ্ধির কোন বিপর্যয় ঘটে না, তখন মস্তিষ্ককে বুদ্ধিস্থান বলা অবৌক্তিক।”

বণ্টন ।

সকলেই অবগত আছেন যে অর্থোৎপাদনে তিনটি শক্তি আবশ্যিক—ভূমি, পারিশ্রম ও মূলধন। এই তিন শক্তির অধিকারীগণের মধ্যেই উৎপাদিত অর্থের বণ্টন হয়। ভূমির অধিকারী ভূম্যধিকারী,—পারিশ্রমেব অধিকারী শ্রমিক এবং মূলধনের অধিকারী কর্তৃকর্তা—এই তিন জনে উৎপাদিত অর্থের যে যে অংশ পায় বা ভোগ করে, তাহাকে ক্রমান্বয়ে খাজনা, বেতন এবং লাভ বলে। সাধারণতঃ উৎপাদিত অর্থ এইভাবে তিন প্রকার ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন হয়।

অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই যে অর্থ এইভাবে ও এই তিন জনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া বণ্টন হয় তাহা নহে। কৃষকের নিজেরই যদি জমী থাকে, মূলধন যদি ধাব না করিতে হয় এবং নিজে ও তাহার সন্তানগণ দ্বাৰাই যদি জমীর চাষ ও বুননাদি চলে, তাহা হইলে তাহার আর জমিদারকে খাজনা দিতে হয় না; শ্রমিক রাখিয়াও মাহিয়ানা দিতে হয় না এবং মূলধনের জন্ত মহাজনকে ও সুদ দিতে হয় না। একরূপ ক্ষেত্রে, খাজনা, বেতন ও ও সুদ (লাভের অংশ-

বিশেষকেই সুদ বলে) কৃষক নিজেই পায়। কৃষকেব নিজের যদি জমী না থাকে কিন্তু শ্রমিকের এবং মূলধনের অভাব না হয়, তবে খাজনাটা কেবল জমী মালিককে দিলে তাহার আব অর্থ কোন দেনা থাকে না। বেতনের বাবত তাহার যাহা খরচ হয় ও সুদের বাবত মহাজনকে যাহা দিতে হয় তাহা তাহার নিজেরই প্রাপ্য হয়। আবার অনেক সময় তাহার নিজের জমী হইতে পাবে, মূলধনও তাহার নিজের কিন্তু লোকজন নাই, মাহিনা দিয়া শ্রমিক রাখিতে হয়। সে ক্ষেত্রে বেতনের অংশ মাহিনা করা লোককে দিতে হয়, অর্থ দুটি অংশ কৃষকই পায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে অবস্থা বিশেষে উৎপাদিত অর্থের তিন অংশই একব্যক্তি পাইতে পারে—পক্ষান্তরে একব্যক্তি এক বা ততোধিক অংশ এবং কোন কোন সময় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন অংশের অধিকারী হয়। অতঃপর আমরা খাজনার বিষয় আলোচনা করিব।

ভূম্যধিকারীগণ তাহাদের জমী ভোগ দখলের জন্ত অপরের নিকট যে পাওনা দাবী

করেন ও পান, তাহাই খাজনা নামে অভিহিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ অপরে তাঁহাদের ভূমি ভোগ দখল করা যেন তাঁহারা যে মূল্য গ্রহণ করেন, তাহাই খাজনা । কোন কোন দেশে এই খাজনার হার দেশাচারের উপর, কোথাও প্রতিযোগিতার উপর নির্ভর করে । ইতিহাস পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মনুষ্যের আদিম অবস্থায় কেহ প্রতিযোগিতার ধার ধারিত না । “জোর যার মুল্লুক তার” এই নীতিই সকলে অবলম্বন করিত । পরে দেশাচারই ক্রমে ক্রমে দুর্বলকে বলবানের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে আরম্ভ করিল । (১) মনুষ্যের আদিম অবস্থায় যদিও বলবান দরিদ্রকে পীড়ন করিয়া সময় সময় নিজ অধিকার বৃদ্ধি করিত, তত্রাপি মোটের পর দেশাচার সকলকেই অল্পবিস্তর মানিয়া চলিতে হইত । অর্থনীতিবিৎ মিল এই সম্বন্ধে প্রকৃত কথাই লিখিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে অতি অল্প দিন হইতেই মানুষ প্রতিযোগিতা মানিয়া আসিয়াছে । আমরা যতই প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করি, ততই আমরা দেখিতে পাই যে পূর্বে দেশাচার অনুসাবেই সকল চুক্তি সম্পাদিত হইত । ইহার কারণ সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে । বলবানের হস্ত হইতে দুর্বলকে রক্ষা করিবার একমাত্র অস্ত্র—দেশাচার । (২) দুর্বল যে সকল

অধিকার বা সত্ত্ব লাভ করে তাহা দেশাচারের জন্তই—বলবানের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া নয় । ভূম্যধিকারী এবং কৃষকের মধ্যে যে সম্পর্ক এবং প্রথমোক্ত পক্ষ শেষোক্ত পক্ষের নিকট যে পাওনা আদায় করে তাহা প্রায়ই ব্যবহার বা দেশাচারের নিয়মাধীন । মিল বলেন যে আদিম কাল হইতে অনেকদিন পর্যন্ত এই নিয়মেই ভূম্যধিকারী ও প্রজার দেনা পাওনার সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হইত ।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ মিল ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি বলেন যে ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের খাজনার হার দেশাচারের উপরই চিরকাল নির্ভর করিয়া আসিয়াছে ।

অনেক স্থলেই কৃষক বা প্রজাদের দলিলাদি নাই কিন্তু যতদিন তাহারা নির্দ্ধারিত খাজনা দিতে থাকে, ততদিন নিরাপদে জমী দখল করে । প্রকৃত খাজনা কত তাহা জানিবার কোন উপায় নাই—অনেক স্থলেই ইহা তমসাক্ষর । বলপূর্বক দখল, স্বেচ্ছাচার, বৈদেশিকগণের কবলে পতিত হওয়া প্রভৃতি কারণে ইহার উদ্ধারেরও কোন উপায় নাই । কিন্তু যখন কোন হিন্দুরাজ্য ইংরাজগবর্ণমেণ্টের দখলে আইসে, তখনই দেখা যায় যে যদিও হিন্দুরাজ্য যতদূর ইচ্ছা পাওনা বৃদ্ধি করিয়াছেন, তত্রাপি প্রত্যেক পাওনা ভিন্ন

(1) “Custom is a barrier which, even in the most depressed condition of mankind, tyranny is forced in some degree to admit” Mill—Political Economy.

(2) To the industrious population, in a turbulent military community, freedom of competition is a vain phrase ; they are never in a condition to make terms for themselves by it ; there is always a master who throws his sword into the scale and the terms are such as he imposes. But though the law of the strongest decides, it is not the interest nor in general the practice and the strongest to strain that law to the utmost and every relaxation of it has a tendency to become a custom and every custom to become a right.” Ibid.

ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্রিটিশ রাজত্বে গবর্ণমেন্ট একটা নির্দ্ধারিত হার স্থির করিয়া প্রজার নিকট হইতে খাজনা গ্রহণ করেন এবং সেইজন্ত প্রজারা পূর্বাপেক্ষা অনেক সুবিধা ভোগ করিতেছে।

সাধারণতঃ জমার উর্ধ্বা শক্তি যতই বেশী হয়, ততই সেই জমির খাজনা বেশী হয়। অবশ্য শুধু যে কেবল জমার উর্ধ্বার উপরই জমার খাজনা নির্ভর করে তাহা নয়। স্থান বিশেষেও জমার খাজনার তারতম্য ঘটে। বড় বড় নগরের নিকটবর্তী জমীর খাজনার হার বেশী; কেননা ঐ সকল জমীতে উৎপাদিত দ্রব্য অল্প বা বিনা আয়াসেই বিক্রেতা সুবিধা দরে বিক্রয় করিতে পারে। মাল লইয়া অধিক টানাটানি করিতে হয় না। কিন্তু বড় বড় নগরাদি হইতে দূরবর্তী স্থানে ভূমি উর্ধ্বা হইলেও তাহার খাজনা কম কেন না সে স্থানে উৎপাদিত দ্রব্য খরিদারের অভাবে বিক্রয় করিতে যথেষ্ট ক্লেশ পাইতে হয়। এবং তজ্জন্ত কৃষক সে জমী সহসা চাষ করিতে চাহে না। এই জন্ত জমীর উর্ধ্বাশক্তি ও জমার অবস্থানের সুবিধা অসু-বিধানুসারেও খাজনার যথেষ্ট তারতম্য হয়। যখন ঐ দুটীর কোন একটীর অভাব হয় তখন খাজনা কমিয়া যায়। যে জমার উর্ধ্বা-শক্তি এত কম যে উহাতে যে মূলধন ও পরিশ্রম প্রয়োগ করা হয় তাহার বায় যদি উৎপাদিত দ্রব্য দ্বারা পূরণ না হয়, তবে কেহই ঐ জমী চাষ করিতে চাহিবেনা। পক্ষান্তরে, যদি মনুষ্যের অগম্য স্থানে অত্যন্ত উর্ধ্বা জমী থাকে, তাহা হইলেও কেহই তাহা লইতে চাহিবে না। আমেরিকায় ও অষ্ট্রেলিয়ায়

একটি অনেক জমা আছে কিন্তু ঐ সকল স্থানে উৎপাদিত দ্রব্য মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে টানাটানিতে এত অধিক ব্যয় পড়িয়া যায় যে সেখানে চাষ করা আদৌ লাভজনক নহে।

রিকার্ডো নামক পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদ পণ্ডিত ভূমির খাজনা নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে এক নিয়মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মনে করুন ক ও খ নামে দুই খানি জমা আছে। হয় উর্ধ্বাশক্তির জন্ত কি সুবিধামত স্থানে স্থিতির জন্ত 'ক'-র খাজনা খ অপেক্ষা বেশী। এই উভয় জমীর খাজনার বিভিন্নতা হইতে আমরা এক জমীর উৎপাদন শক্তি (অর্থাৎ উর্ধ্বা শক্তি ও সুবিধা মত স্থান স্থিতি) হইতে অপর জমীর পার্থক্য বুঝিতে পারি। এইক্ষণে এই ক ও খ ব্যতীত গ নামক আর একখানি জমা আছে যাহাতে এই সকল শক্তির অভাবের জন্ত নাম মাত্র খাজনা আদায় হয়। এই গ জমী যাহা হইতে নাম মাত্র খাজনা আদায় হয় ও পূর্বেক্ত ক জমির খাজনা—এই দুই খাজনার যদি তুলনা করা যায় তাহা হইলে তাহার খাজনা হইতে উভয় জমীর উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। কিন্তু গ জমির নাম মাত্র খাজনা, কেননা উহা অনুর্ধ্বা বা অলৌপাদিকা শক্তি বিশিষ্ট। সুতরাং উৎকৃষ্ট জমী নিকট জমী অপেক্ষা যে সকল সুবিধা ভোগ করে ঐ সকল সুবিধার আর্থিক মূল্যই হইতেছে খাজনা।

রিকার্ডোর মতে যে জমী নাম মাত্র খাজনা দেয় উহা “কর্ষণের শেষ মাত্রায় অবস্থিত” (margin of cultivation) এইরূপ

বুঝিতে হইবে। দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা করা যাক। রামের জমীর উৎপাদিকা শক্তি ও আয় শ্রামের জমীর অপেক্ষা বেশী। আয় কথাটী ছই অর্থে ব্যবহৃত হয়—সুল আয় ও আসল আয়। চাষেব জন্ম যে খরচ হয় উহা বাদ না দিয়া মোট যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে সুল আয় বলে। কিন্তু কৃষকের আসল আয় নিষ্কারণ করিতে হইলে এই সুল আয় হইতে ঐ জমীর আবাদে যত প্রকার খরচ হয় তাহা বাদ দিতে হইবে। জমীতে যে মূলধন প্রয়োগ করা হয়, তাহার সুদ স্বরূপ কিছু অংশ ঐ সুল আয় হইতে বাদ দিতে হইবে; কৃষক যে তত্ত্বাবধান করিবে তাহাব বাবদও কিছু বাদ দিতে হইবে; ইহায় পব শ্রমিকের বেতন বাবদ, জমির সার অর্থাৎ জমির ফসল উৎপাদন করিতে যত প্রকার খরচ হয় উহা বাদ দিয়া যে আয় অবশিষ্ট থাকিবে উহাকেই আসল আয় বলে। এখন রামের জমীর আসল আয় যদি শ্রামের জমী অপেক্ষা বাৎসরিক ১০% বেশী হয়, তাহা হইলে ইহা বৃদ্ধিতে হইবে যে আবশ্যিক হইলে রাম শ্রামের অপেক্ষা ১০% বেশী খাজনা দিতে সমর্থ। যদি শ্রামের জমীর অল্লোৎপাদিকা শক্তির দরুণ নাম মাত্র খাজনা ধার্য্য হইয়া থাকে, তবে ঐ জমীর আসল লভ্যও নাম মাত্র ইহাই বৃদ্ধিতে হইবে। অনেকে বলিবেন, এ ক্ষেত্রে শ্রাম জমী চাষ করিবে কেন? তদুত্তরে ইহা বলিলেই যথেষ্ট যে, সমস্ত প্রকার খরচাদি বাদ যৎসামান্য উদ্ধৃত হইলেও কৃষকের ক্ষতি হয় না। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে শ্রামের জমীর উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যাপেক্ষা রামের জমীর উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য

১০% বেশী এবং আবশ্যিক হইলে এই ১০% রাম জমিদারকে খাজনা স্বরূপ বেশী দিতে পারে। কেননা, সচরাচর দেখা যায় যে, সকল প্রকার খরচ বাদে সামান্য মাত্র লাভ হইলেই লোকে সে জমী বা ব্যবসায় ছাড়িতে চাছে না। এইক্ষণ, রামেব ভূম্যধিকারী যদি রামের খাজনা ১০% বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলেও রাম জমী ছাড়িতে চাহিবেনা কেন না এই ১০% এবং অল্প সকল প্রকার খরচ বাদ দিয়াও আসল আয় স্বরূপ সে কিছু পায়; কিন্তু ভূম্যধিকারী যদি ১০% স্থলে ১১% খাজনা করিতে চাহেন, তাহা হইলে রাম আর সে জমা চাষ করিতে চাহিবেনা। ঐ জমীতে রাম যে প্রকার অর্থ পরিশ্রম ইত্যাদি প্রয়োগ করিত উহা অল্প জমীতে বা অল্প ব্যবসারে প্রয়োগ করিলে রামের অধিক লাভ হইবে এবং উক্ত কারণে ভূম্যধিকারী রামেব নিকট ১০% টাকার অধিক দাবী করিলে রাম জমা ছাড়িয়া দিবে এবং তিনিও এই কারণে ইহার খাজনা আর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। এই প্রদক্ষে ইহাও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, জমীদার যেমন খাজনা বৃদ্ধি চেষ্টা করিবেন, রামও সেই প্রকার খাজনা হ্রাসেব চেষ্টা করিবে। করুক, কিন্তু প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে রামেব সমব্যবসায়ীগণ উক্ত জমীতে কত লাভ হইতে পারে অনায়াসে উহা নিষ্কারণ করিয়া রামেব খাজনা হ্রাসের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিবে। রিকার্ডের নিয়ম এই জন্ম প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রেই প্রায়ুজ্য।

আমরা পূর্বে কয়েকস্থলে উল্লেখ করিয়াছি যে কোন কোন জমী কর্ষণের শেষ মাত্রায় অবস্থিত। ‘কর্ষণের শেষ মাত্রা’ অর্থে এইরূপ বৃদ্ধিতে হইবে যে ঐ জমীর উর্ধ্বাশক্তি ও স্থিতি

এত খারাপ যে অল্প উৎপাদিকা শক্তি প্রযুক্ত না হইলে উহার কোন লাভ হইবে না। দুই প্রকারে এই উর্ধ্বশক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে। প্রথমতঃ, কৃষিজাত দ্রব্যের গ্রাহক বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়তঃ সমুন্নত কৃষি পদ্ধতি দ্বারা ঐ জমী হইতে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি। পূর্বে যে গ ভূমির জমীর কথা লিখিয়াছি ঐ গ জমী হইতে কৃষক কোন প্রকারে নিজের খরচাদি উঠাইতে পারে। কিন্তু ঘটনাপরম্পরায় এই শেষ মাত্রা আরও নামিয়া পড়িতে পাবে এবং সেই জন্য খাজনারও ভারতম্য হয়। সে ঘটনাগুলি নিয়ে বর্ণনাব প্রয়াস পাইতেছি।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের লাভের হার ভিন্ন। অষ্ট্রেলিয়ায় শত করা ১০ টাকা অনায়াসেই পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে প্রচলিত হার ৫ মাত্র। আমাদের দেশের মহাজনেরা শতকরা ২০২৫ টাকা সুদ লাভ করেন। ইংলণ্ডদেশে লাভের হার খুবই নীচু। মনে করুন, সহসা কোন কারণ বশতঃ ইংলণ্ডের লোক প্রচলিত শতকরা পাঁচ টাকা অপেক্ষা আরও কম লাভে টাকা কর্জ দিতে বা ব্যবসায়ে টাকা খাটাইতে প্রস্তুত! এক্ষেত্রে জমীর শেষ মাত্রাও নামিয়া যাইবে। কৃষক কম লাভে ঐ জমী চাষ করিতে চাহিবে, ভূম্যধিকারীও পূর্বাপেক্ষা কম খাজনায় ঐ জমী দিতে চাহিবে। গ নামক যে জমীর কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি তখন ঐ প্রকার জমী অপেক্ষাও খারাপ জমী লোকে চাষ করিতে

চাহিবে। এবং গ ও শেষোক্ত প্রকারের খুব খারাপ জমীর উৎপাদিকা শক্তির পার্থক্যে খাজনার হার নির্দ্ধারিত হইবে। এই প্রকারে, অষ্ট্রেলিয়ায় যখন লাভের হার ১০ হইতে আরও কমিয়া যাইবে, তখন আরও জমি চাষ হইবে।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়, কেন না লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে কৃষিজাত দ্রব্যের গ্রাহকও বৃদ্ধি পায়। গ্রাহক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যও বৃদ্ধি পায় এবং যে সকল জমি কর্ষণের শেষ মাত্রার সামান্য উপরে ছিল তাহাও লোকের আহাৰ সরবরাহ করার জন্য চাষ করিতে হয়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে কর্ষণের শেষ মাত্রা আরও নিম্নে পড়ে অর্থাৎ আরও অল্পোৎপাদিকা শক্তি বিশিষ্ট জমীর চাষ হইতে থাকে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমীর খাজনার হারেরও ভারতম্য হয়। কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধির সঙ্গে ভূম্যধিকারী খাজনার হারও বেশী করিতে পাবেন।

কিন্তু লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই যে দেশেব আর্থিক উন্নতি হইয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে তাহা নয়। কোন কোন দেশে এইরূপই হয় বটে কিন্তু সর্বত্র একরূপ ঘটনা। অষ্ট্রেলিয়ায় প্রচুর পরিমাণে উর্ধ্ব-ভূমি আছে এবং সেইজন্য তথায় আহাৰ্য্য দ্রব্যাদিও যথাসম্ভব সুলভ। ভারতবর্ষের পক্ষে এই নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পাবে না। এখানে লোকসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু অর্থ বৃদ্ধি হয় নাই।

() "The standard of comfort of the population has been lowered and vast numbers are constantly living just on the verge of pauperism and starvation."
Mrs. Fawcett.

অধিবাসীগণের অবস্থা স্বচ্ছল নহে এবং অনেকেই কার্যক্লেশে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। অধিবাসীগণের সঞ্চিত অর্থ নাই এবং কোন কারণে এক সময়ে ফসল না হইলেই তাহারা অভাবগ্রস্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভাবতবর্ষে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত আর্থিক উন্নতির কোন সংশ্রব নাই। (১)

অনেকেই মনে করেন যে উৎপাদিত দ্রব্যাদি খরচের বিভাগে খাজনার সম্পর্ক বেশী। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে খাজনা আদৌ ধর্তব্য নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতেছে যে যদি গবর্ণমেন্ট একদিন অকস্মাৎ আদেশ দেন যে জমীর বাবত কাহারও কোন খাজনা গবর্ণমেন্ট

বা অন্য কোন ভূম্যধিকারী গ্রহণ করিবেন না তাহা হইলেও কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় কিছুই কমিবে না বা বাড়িবে না। পেটের ও হস্তের কার্য সমভাবেই চলিবে। অর্থাৎ এই আদেশের পূর্বে অধিবাসীগণের ব্যবহারের জন্ত যে পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্যের আবশ্যক হইত, এখনও তাহাই হইবে এবং পূর্বে যে পরিমাণ জমী চাষ হইত এখনও তাহাই হইবে। এই কারণেই কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত খাজনার কোন সম্পর্ক থাকে না।

অতঃপর আমরা বেতনের বিষয় আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদার।

পল্লীগ্রামে ডাইনে খাওয়া

মানুষের উপর ভূতের প্রবল প্রভাবের কথা তো আজি কালি অনেক সুসভা শিক্ষিত সমাজেও শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পল্লীগ্রামে আর এক জাতীয় জীব যে কিরূপ দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করে তাহা বোধ হয় অনেক জানেন না। ভূতের ঞ্চায় ইহা অশরীরী কল্পনা মাত্র নহে, একটা জলজীবন্ত আস্ত মানুষ, এখানে গ্রামের ভীতিস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ইহার নাম ডাইন্

বা ডান্! অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীলোকই উক্ত পদ স্থিত। পুরুষ ডান্ অতি কদাচিত্ শুনিতে পাওয়া যায়। ভিকাজীবী বৈষ্ণবী, মৎস্য জীবী-মালো বা টাড়াল হুঁহতা, পণ্য বিক্রেতা বেনিয়া রমণী ইহারাই অধিকাংশ স্থলে এই সম্মান লাভ করিয়া থাকে। তাহারা গ্রামে প্রবেশ করিলে বালবৃদ্ধরমণী মহলে সামান্ সামান্ পড়িয়া যায়। যুবারা প্রকাশ্যে তাহা- দেব উদ্দেশে অনেক আশ্ফালন করিয়া থাকে

(1) The people have no reserve of any kind and the failure of a crop immediately brings the pinch of want ; they cannot meet bad times by giving up luxuries in order to buy necessaries ; they have no luxuries ; they have no cheaper kind of food to which they can resort ; they are already at the bottom of the scale of human existence and to fall any lower means actual famine "Mrs Fawcet." এই উক্তির মধ্যে সত্য নিহিত থাকিলেও ইহা যে একটু অতিরঞ্জিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বটে কিছু অস্তুরে 'ডাইন' নামে সকলেরই হৃৎকম্প হয়। ডাইনী বেচারাদের স্থানে স্থানে লাঞ্চার সীমা থাকে না। আমরা অত এই বিষয়ের দুই চারিটি চাক্ষুশ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছি!

পৌষ মাস। দরিদ্র কৃষকের অঙ্গনে ধনু বাশিস্থ সূর্যোর মন্দ কিরণ ক্রমে মন্দতর হইতেছে। কৃষকের গৃহে সুখ নাই, দুই তিন বৎসরের অজন্মায় তাহাদের ছুববস্থার একশেষ। এবারে দুরন্ত বন্যায় আউস খাত্ত সব ভাসিয়া গিয়াছে। আমন কিছু হইয়াছিল কিছু মহাজনের ঋণ এবং জমিদারের খাজনা তাহাতে শোধ করিয়া লওয়ার অঙ্গনের শূণ্য 'গোলা' দুইটা ছম্ভী খাইয়া পড়িবার জোগাড় করিতেছে। পৌষ ষায়, অগ্রহারণ হইতে এক ফোঁটা বৃষ্টি ন' হওয়ার রবি শষ্যের আশাও এবারের মত শেষ।

উঠানের 'আখার' কৃষকবধু ধান "ওমাইতে" ছিল। পৃষ্ঠ বেতের ঝাঁপি, তন্মধ্যে গাছ টাচিবার তীক্ষ্ণধার অস্ত্র 'দাউলো,' কোমরে জড়ানো প্রকাণ্ড একগাছা দড়া, হস্তে দুইটা কলসী লইয়া যুবা কৃষকপুত্র অঙ্গনে প্রবেশ করিল। কলসী দুইটা একপাশে নামাইয়া, ঝাঁপি ইত্যাদি অঙ্গনে আছড়াইয়া ফেলিয়া হতাশ ভাবে "পিঁড়ে"র এক ধারে বসিল। মাতা, পুত্রের ভাবান্তর দেখিয়া বলিল "কিরে- 'রমুলা' ? অমন ক'রে বসলি যে ?" পুত্র কোন উত্তর দিল না। মতা আবার বলিল "অস্ কি "চোরে গিয়েছে" সব ? "আরে "আরে না, না ; এই 'অসের' জন্তেই ত আজ ম'লাম" ! মাতা শঙ্কিত হইয়া বলিল "ম'লাম কিরে ? কি হ'ল তোর ?" "হবে আর কি !

এখনি ফটকে মালোর মা মাগী কোথায় ছিল জানিনা, খেজুরে পুকুরের পাড় থেকে 'অস্'র 'ঠিলি" হাতে করে নামতেই আমার দফা সেরেছে।"

"ওরে সেকি ? সেকি 'অস্' চেয়েছিল ? দিলিনে কেন তাকে ?"

"হাঁ-সে 'অস্' নেবে কিনা ? আমার প্রাণডা বড় কেমন করছে শুই একটু।" বলিয়া অমূল্য সেই খানেই ধূপ করিয়া শুইয়া পড়িল। মাতা ডাক্ ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওগো আমাব সর্বনাশ হ'ল ! ওগো তোমরা কে কোথায় আছ', আমার "রমুলা রতনে"র কি হ'ল এসে ঝাং' সে" !

অবিলম্বে পাড়ার লোক সব আসিয়া জুটিল। অমূল্য তখন মাটিতে পড়িয়া ছুটু ফটু করিতেছে। সকলে 'ওঝা আনাইবার পরামর্শ দেওয়ার একজন পরোপকারী তৎক্ষণাত্ গ্রামান্তরে 'ওঝা' ডাকিতে ছুটিল। ইতি মধ্যে ডাইনে খাওয়ার ঔষধ যে যাহা জানে রোগীর উপরে তাহা প্রয়োগ করিতে লাগিল। হলুদ ও লৌহ পুড়াইয়া কপালে ছাঁকা দেওয়া, নানা প্রকার লতা পাতার রস হস্তে পদে বক্ষে লেপন, তেল পড়া, জল পড়া খাওয়ানো ইত্যাদি। অমূল্যের মা উঠানে বসিয়া হতাশ ভাবে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিল। "ওবে 'রমূল্যের' ভরসাতেই যে চালের তলায় মাথা দিয়ে আছি। 'ম্যালোর' জরে তিন বছর ভুগে ভুগে মোড়ল, যহ, দুজনেই ফাঁকী দিলে। পুঁটে টাত' নিত্যি রোগা, জন্মকালই জরে ভুগছে। বেনে মাগী যেদিন পাড়ার আসে সেই দিনই আমার পুঁটে 'কেঁথা' ঢাকা দিয়ে শোয়। তার ভরসাত

আমি করিই নে। একা ‘রমূল্য’। সে বলে “মা জমী জমা যা আছে ভাগে করি।” একটা ‘দোহর’ নেই তাব, যা আছে তাও আবাদ করতে পারে না। তিন বছর ধান হয়নি, এবাব যা হ’ল মহাজনের ‘দেন’ শোধ করলাম, খন্দ ছুটো হয়—সরকারীতে তুলে নেবে, আজ তিন বছর খাজনা দিতে পারিনি! ভাবি ‘রমূল্যের’ বিষে দেব, ‘রমূল্য’ বলে মা ছবছবের ধাক্কা আগে সামাল দিই, আর ‘দেন’ কবিস্নে এখন”। তিন কুড়ী খেজুব গাছ জমা নিয়েছে, বাছা আমার সকল দিন গাছে গাছে আর ‘বাইনের আগুনের জ্বালেই থাকে! পুঁটে জ্বালানি কুড়িয়ে কুড়িয়ে ব’সে ব’সে জ্বাল দেয়। সেদিন সাজ্ বেলায় গাছ থেকে প’ল—বলি মা কি হবে! তা আমাব “নোয়ার বাঁটুগ” রমূল্যব কিছু হয়নি, আজ আমার কপাল বুঝি ভাঙ্গল! সর্বনাশীবে আমার কপালই এমন করে খায় কেন রে?”

ইতি মধ্যে বোগী একবার বমি করিয়া একটু স্ফু হইল। সকলে আশ্বাস দিতে লাগিল, ভয় নেই—ভয় নেই, ওঝা এলেই এখন সব ভাল হবে।

গরু চরাইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে পুঁটে আসিয়া সব ব্যাপার দেখিল এবং সেও দাঁড়াইতে না পারিয়া ঘরে গিয়া শয্যা গ্রহণ করিল। মা দ্বিগুণ কাঁদিয়া বলিল “নিশ্চয় আজ বেনে মাগী ওকে নেখেছে। আজ তিন দিন একটু ভাল ছিল, ‘রমূল্য’ মাঠে যেতে বাবণ করে, তা ভাল থাকলেই যায়! আমার কত “দুখ” সহিয়ে” ‘ধনেরা সব। আমার ছার কপালে বাঁচলনা?”

ওঝা আসিল। অমূল্যের সর্দিগম্মা ভাবটা তাহার আসিবার পূর্বেই কমিয়া আসিয়াছিল। দু তিন বার দাস্ত ও বমি হইয়া সে তখন অনেকটা স্ফু হইয়াছে। ওঝা দেখিয়া বলিল “আর ভয় নেই। আমার আসার আগেই ভয়ে সে সরে গিয়াছে। এই ওষুধটা ভাতের আমানির সঙ্গে বেঁটে খাইয়ে দাও আর এই সববেব পুঁটুলিটা তিন দিন কাছে রেখো। তেমন কিছু করতে পারেনি। আমি এখন রতনপুর পেকে আসছি। সে গ্রামের রায়েদেব বোকে আজ তিন দিন ডানে খেয়েছিল। আজ তিন দিন তিন রাত আমি সেইখানে ছিলাম! কত সব ইংরাজি জানা ছেলে পিলেরা ‘ফট্’ ‘ফট্’ ‘হিষ্টি’র’ ‘মিষ্টি’র’ বলে ডাক্তার এনে কিছুতে কিছু করতে পারেনি! তখন আমি ‘কুগী’ হাতে নিয়ে তিন দিন তিন রাত খেটে ভাল করে দিয়ে এলাম। ইংবিজি পড়া ছেলেরা সব তখন গাল হাত বসে রইল”। সকলে অমূল্যকে ছাড়িয়া তখন ওঝাকে মহা উৎসুক্যে ঘিরিয়া বসিল। ওঝাও সাড়ম্বরে বলিতে লাগিল,—

“আত্ম সাবধান” করে বাড়ী থেকে তো বেরুলাম। ‘কুগী’র বাড়ীর দুয়োরে গিয়ে আগে বাড়ী বাঁধলাম, আসামী আগেই না পালায়! আমায় দেখে ত সে রেগেই আগুন! “তুই কোথাকার রোজা,—দেখি ত তোর কতবড় সাধি, আমায় কেমন তাড়াতে পারিস্”।* আমিও বলি “দেখি তুমিই কেমন ডান্!” মস্তুর পড়ে পড়ে হায়রাণ হয়ে, দড়ী দিয়েবেঁধে কিছুতে যখন পারলাম না তখন একগাছা বাঁটা এনে দুএক ঘা বসাতেই

* বলা বাহুল্য এসব কথা ভূতগ্রস্ত রোগীর মত ডাউন-প্রাপ্ত রোগী স্বমুখেই বলিয়া থাকে।

বললে “আর না, আর না, এইবার যাচ্ছি!” আমি বললাম “তোকে যেতে ত হবেই, কিন্তু আমি কেমন রোগী তা টের পেয়ে যেতে হবে। বল্ তুই কে, তবে তোকে ছেড়ে দেব।” বললে “না, তাহলে বড় লজ্জায় পড়ব আমার ছেড়ে দে!” সেকথা কে শোনে! ঝাঁটা আনতেই বললে “আমি বুড়ো মানুষ, আর মারিস্নে! আমি ন গায়ের বুড়ো বষ্ট্রমী! এ গায়ে ভিক্ষে করতে আসি! বোটা এলোচুলে সিঁড়র পরে বসে বড়ী দিচ্ছিল! আমার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মুখ ঝামটা দিগে উঠল! ভারি কটু কথা বলেছে আমার, “ভিক্ষে করে মরিস্ন কেন, খেটে খেতে পারিস্নে, মাগী ডান!” তা যা করেছে তা করেছে এইবার আমি যাচ্ছি। তখন বললাম অর্মান ত যাওয়া হবে না, কিছু নিয়ে যেতে হবে। নইলে রুগীর ক্ষেতি। এই শিলখানা নিয়ে যেতে হবে!” তা বললে “আমি বুড়ো মানুষ। শিল মুখে নিতে পারব না।” “তবে জুতো নে!” “আমি এই মুখে হরিণাম করি, আনার জুতো দিস্নে তোদের অধম্ম হবে।” “মাগীর ধম্মজ্ঞানও যে বিলক্ষণ” জটনক শ্রোতা মত ব্যক্ত করিল। অল্প একজন অত্যন্ত চিন্তিত মুখে বলিল, ওদের জালায় তো মানুষের শোয়াস্তিও নেই! ‘বিটি’দের জন্ম করাও তো সহজ নয়। আমার মামাদেব গায়ে এমন এক ‘বিটি’ ডান্ ছিল, তার জালায় গায়ের লোকের

শোয়াস্তি ছিল না। শেষে গায়ের ক’জন লোকে ষড় করে তার ঘরে ছতিনটে দামী জিনিস লুকিয়ে রেখে ‘চোর’ বলে ধরিয়ে দিলে! ‘বিটি’ তখন জেলে গেল,—তবে লোকের শোয়াস্তি!” আর এক ব্যক্তি বলিল “কেন আমাদের গায়ের কৈলেস সেথ! সে এমন “ডোকো হাজরা” মানুষ ছিল যে এক ‘বিটি’ ডান্কে তিন মাসের ভাত খাইয়ে দিয়েছিল! আপেব ভুঁইয়ে আখ্ বোঝাই কব্ছে গাড়ীতে, আর—সে এক মাগী ডান্ তখন এ গায়ে আস্ত, একখানা আখ্ চাইলে তার কাছে। কৈলেস্ আখ্ দিলেও মাগী গাড়ীব পানে তাকাতে তাকাতে যায়, এই সেথের পো আগুণ হ’য়ে বললে “খেল খেল আমার একগাড়ী আখ্ খেয়ে নাশ করল শালি!” এই বলে ছুগাছ মোটা আখ্ না নিয়ে মাগীকে গো বেড়োনে বেড়ুলে! সেট হ’তে মাগী গাঁ ছাড়ে, তিন মাস নাকি পড়েছিল!” প্রথনোক্ত ব্যক্তি বাধা দিয়া বলিল “কৈলেস কি সোজা লোক ছিল, নইলে ত্রিসব লোকেব গায়ে হাত দিতে পারে। ওদের মোছলমানের কাণী-তলায় ‘প্রাত’ আমাবস্তায় সে মোরগ দিত!”* “ওদের ও মস্তোর শিখে কি হয়? ডান্ হ’য়ে লোকের ক্ষেতি ক’রে ‘বিটি’দের লাভটা কি?” ওঝা বিজ্ঞতার বোঝা নামাইয়া বলিল “তা বুঝি জাননা? ওরা কি স্ব-ইচ্ছেয় ডান্ হয়? ডাইনেরা নিজের

* পৌষের ‘প্রবাসী’তে হেমলতাদেবী “ভারতবর্ষীয় মুসলমান সমাজে হিন্দুয়ানী” ইতি শীর্ষক প্রবন্ধে বহু-দূরদেশের মুসলমানের হিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণের কথা অনেক বলিয়াছেন। আমি দেখিয়াছি, এই বঙ্গদেশের নদীয়া জেলার ঘোর পল্লীগ্রামে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুমুসলমানের আচার ব্যবহারে তফাৎ খুবই কম। এখানে মুসলমানেও গাছতলায় কালী পূজা করে এবং পুত্রের নাম কালিদাস, দ্বারিক, মথুরানাথ, গোপাল, হরি এবং কল্লার নাম গোলাপ, কামিনী প্রভৃতি রাখে।

মস্তুর কারকে না দিলে ত' তাদের প্রাণ
বেরোয় না ! মস্তুর সময় মানুষ না পেলে
তারা ঝাকড়ায় গিঁট বেঁধে কাঁটার বাড়নে
মস্তুর রেখে যায়, অজান্তে যে সেই গিঁট
খোলে বা কাঁটা বাড়ন ছোঁয় অমনি সেই
মস্তুর তাকে গছে । তারপরে শোন ! ডান্
মাগীকে বললাম আমার কুগী ভাল হবে ?
ঠিক করে বল ? নইলে তোর "ঠিক
ঠিকানা তো জানলাম, এমন ক'রে 'বাণ'
মারব যে মুখে রক্ত উঠে তখন মরবি।"
জনৈক শ্রোতা বাধা দিয়া বলিল "তা পারা
যায় না কি ?" "তা বুঝি জাননা ? আচ্ছা
বেশ ত' তুমি । হর্শে মুচী মিন্বে অমনি
ডান্ হ'রেছিল । কাকে কোন্ গায়ে খেয়ে
এসেছিল ! কোন্ শক্ত রোজায় 'বাণ'
মেরেছিল ; ভাল না মন্দ না হর্শে মুচী
ঘরের মধ্যে জলের কলসীর গোড়ায় মুখে
রক্ত তুলে মরে আছে !" ওঝা বলিলেন
"ই্যা জলের কলসীর গোড়ায় যখন—তখন
নিশ্চয় ওঝাতেই মেরেছে বটে ! তারপর
শোন ! মাগী শুনে বলে কি তাত বলতে
পারিনে ! কচুর পাতে ক'রে বোর প্রাণটুকু
জলের বলসীর কাছে বেখেছিলাম কি হ'ল
তা কি জানি !" "জানিন্বে বটে !" বলে
একটা কুমড়া এনে মস্তুর প'ড়ে যখন বলি
দিতে যাই তখন মাগী সোজা হ'য়ে প্রাণটা
ফিরিয়ে দিল ! তা কি অমনি যেতে দিলাম !
সেই হরিবলা মুখে জুতো নিয়ে যেতে হ'ল !"
"জুতো কে মুখে নিল—সেই বোটা ?"
"সে কি আর তখন বউ ? সেই ডান্ মাগী ?
জুতো মুখে ক'রে উঠোন পর্যন্ত গিয়েই
বউ ধড়াস্ ক'রে অজ্ঞান হ'য়ে গেল ! হুদু

পরে যখন দাঁত ছাড়ল তখন সে মেয়ে আর সে
মেয়েই নয় ! এক গলা ঘোমটা দিয়ে বসল !"

গৃহের মধ্য হইতে পুঁটে সহসা বিষম
চীৎকার করিয়া উঠিল । সকলে শশব্যস্তে
ঘরে গিয়া দেখিল অন্ধকার ঘরে শুইয়া ঐ সব
ভীতিজনক কাহিনী শুনিতো শুনিতো দুর্বল
কুণ্ড বালক ভয়ে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে ।
ওঝা দেখিয়া বলিল "কিছু নয় এও ডান্ ।"

পুঁটেকে তখন বাহিরে জানা হইল,
অমূল্য তখন সামলাইয়া উঠিয়া বসিয়াছে !
'ডানে' পাওয়ার প্রতিকারের ব্যবস্থামত
সেই বালকের উপর তখন জুতা নাটা বর্ষিত
হইতে লাগিল । তাহার মাতা চীৎকার করিয়া
কাঁদিতে আরম্ভ করিলে সকলে তাহাকে ধমক
দিতে লাগিল "ন্যাকা মাগী এ মার্কি ওর
গায়ে পড়ছে ! ছেড়ে গেলে দেখিস্ একটুও
গায়ে দাগ থাকবে না ! মাতার প্রাণ কিন্তু
এ সান্ত্বনায় প্রবোধ মানিল না ।

ভীত কম্পিত বালক ওঝার বাক্যের
প্রতিশ্রুতির মতই প্রায় ঐ রকম কথাবাত্তাই
বলিয়া গেল । ডান্ ছাড়িয়া যাইবার কালে
বালকের মুখে একখানা গুরুভার শিল তুলিয়া
দেওয়া হইল । সেই শিল দাঁতে কামড়াইয়া
ধরিয়া বালককে তার অধিক দূর অগ্রসর
হইতে হইল না । দুই চারি পা গিয়াই শিলসহ
দাওয়ার নীচে পড়িয়া গেল । "তার কোন
ভয় নাই । এই ধারে ঘরে তুলে নিয়ে এস ।
এই ওগুধটা বেঁটে মাথিয়ে দাও, দু চার দণ্ড
পরেই জ্ঞান হবে, তখন এইটে বেঁটে খাইয়ে
দিও । যা খেতে চাবে দেবা, আর এর ওগুধটা
সকদা কাছে কাছে রাখবা ! আমি এখন
হলাম !" সকলে অমূল্যর মার পানে চাহিয়া

বলিল “ওনার বিদায় ?” ওঝা বাধা দিয়া বলিল “এখন ওসব কথা নয় ! ছেলে দুটি ভাল হোক, তখন নিজেই উনি খুসী হয়ে ‘বিদেয়’ করবেন !

তখন ওঝা বিদায় হইয়া গেলোও অমূল্য ও তাহার মাতা পরদিন ওঝাকে ডাকাইয়া সমস্তোষ করিয়া বিদায় দিল, পুঁটেও দু চারি দিন একটু উঠিল বসিল কিন্তু সেই গুরুভার প্রস্তর বক্ষে কবিয়া পতনের ধাক্কা সে

কখন বালক সামুলাইতে পারিল না। কয়েক দিন পরেই তাহার মাতার ক্রন্দনে সমস্ত গ্রাম ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সকলে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে ‘হায়’ ‘হায়’ করিয়া বলিল, “মাগীব কপাল বড়ই মন্দ ! অমন রোজা অমন ক’রে ছেলেকে ডানের মুখ থেকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল ! এত আর মানুষের হাত নয়, মাগীর কপালই খারাপ !—ছেলেটা সেই জন্তুই বাঁচ’ল না” !

শ্রী নিকুপমা দেবী।

শিশিরকুমার ঘোষ

বাংলা দেশের যে সকল কস্মবীবের দ্বারা দেশেব নানা কল্যাণ সাধিত হইয়াছে শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহাদের অগ্রতম। সেই জন্তু আজ তাঁহার বিয়োগে বঙ্গবাসীমাত্রেই ব্যথিত। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কে না তাঁহাকে চিনিতেন ? নূতন করিয়া তাঁহার পরিচয় দিবার আবশ্যিক নাই। তাঁহার কস্ম-জীবন তাঁহার যে উজ্জ্বল পরিচয় রাখিয়া গেছে তাহাই যথেষ্ট ; সে পরিচয়কে উজ্জ্বলতর করিবার সামর্থ্য কাহারো নাই।

১২৪২ বঙ্গাব্দে বশোহর জেলায় মাগুরা নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ছিল হরিনারায়ণ ঘোষ। হরিনারায়ণ ঘোষের পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে শিশির-কুমার ও বিখ্যাত সংবাদপত্র অমৃতবাজার পত্রিকার সূযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষই বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন। এই অমৃতবাজার পত্রিকা প্রথমে শিশিকুমারের উদ্যোগে, তাঁহার চেষ্টায় ও অধ্যবসয়ে প্রকাশিত ও

পরিচালিত হয়। কি কষ্ট স্বীকার করিয়া শিশিরকুমার অমৃতবাজারপত্রিকা বাহির করেন তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই পত্রিকা খানি তিনি প্রথমে নিজের গ্রাম হইতে বাহির করেন ;—সেখানে না ছিল, প্রেস, না ছিল কম্পোজিটার ! একটা কাঠের প্রেস ও কতকগুলি পুরাতন টাইপ সংগ্রহ কবিয়া কার্য্য আবস্ত হয়। শিশিকুমার কালকাতায় আসিয়া প্রেসের সমস্ত কার্য্য নিজে শিক্ষা করিয়া ভ্রাতৃগণকে তাহা শিক্ষা দেন। তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতারা মিলিয়া প্রবন্ধ রচনা হইতে আরম্ভ করিয়া, নিজের হাতে কম্পোজ, ছাপা সব কাজই করিতেন। এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আর কেহ আমাদের দেশে কাগজ বাহির করিয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁহার এ উদ্যম সত্যই বিস্ময়াবহ ও প্রশংসনীয় ! যে অমৃতবাজারপত্রিকা একদিন দারিদ্র্যের মাঝে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কালে তাহা বিরূপ বিভবশালী ও প্রতিষ্ঠাপন্ন

হইয়াছে তাহা বলিবার আবশ্যক করে না। প্রথমে অমৃতবাজার বাংলা ভাষায় মুদ্রিত হইত। পরে ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে যে সময় সংবাদপত্র আইন বিধিবদ্ধ হয় সেই সময় হইতে ইহা ইংরাজিতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ

হয়। শোন। যাম, শিশিকুমার রাতারাতি বাংলা কাগজকে ইংরেজি করিয়া ফেলেন।

বহুদিন এই পত্রিকা যোগ্যতার সহিত চালাইয়া শিশিরকুমার তাহার পরিচালন ভার তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষকে অর্পণ



শিশিরকুমার ঘোষ ।

করেন এবং নিজে বিষ্ণুপ্রিয়া নামে একখানি বাংলা কাগজ বাহির করেন। সে কাগজ আজিও চলিতেছে।

সংবাদপত্রের সম্পাদন ব্যতীত শিশিরকুমার 'অমির নিমাই চরিত' প্রভৃতি

কয়েকখানি বিখ্যাত বৈষ্ণবীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দেশের বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ ভাবে স্নাদৃত। এই গ্রন্থগুলি তাঁহার ধর্মজীবনের পুণ্যস্মৃতি ও তাঁহার হৃদয়ের ভক্তি-উচ্ছ্বাস বহন করিয়া অমর হইয়া থাকিবে।

সমালোচনা।

বস্তু উপলক্ষে শিক্ষা। প্রথম ভাগ। মৌলবী মেথ আবদুল জম্মার প্রণীত। মূল্য চারি আনা মাত্র। অধুনা প্রচলিত কিংওরগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির উপযোগী করিয়া ছাত্রগণের জন্য এই গ্রন্থ রচিত।

শিক্ষাকোষ। শিক্ষাব্যবসায়। পঞ্চম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত মন্থধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রতি সংখ্যা ৮০। সমগ্ৰ গ্রন্থ ৩০ টাকা। শিক্ষাকোষ কাগ্যালয়, বিনোদকুটীর, লক্ষ্মী। ইহার পূর্ব সংখ্যাগুলি দেগিবার আশা দিগের সুযোগ ঘটে নাই—সুতরাং একেবারে পঞ্চম সংখ্যা দেগিয়া গ্রন্থকারের “প্ল্যান” বা উদ্দেশ্যের কোন একটা ধারণা করিতে পারিলাম না। বর্তমান সংখ্যায় “ভূগোল-শিক্ষা” আলোচিত হইয়াছে। ভূগোল-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, ভূগোলের ইতিহাস, ভূগোলশিক্ষায় পয়্যার প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখকের আলোচনা ও সংগ্রহ বেশ তথ্যপূর্ণ ও সুখপাঠ্য। এখানি প্রতি মাসে প্রকাশিত হয় কিনা তাহাও বুঝিলাম না।

চণ্ডিকা-বিজয়। (মটীক *স্তম্ভবিষয়ক আদি বাঙ্গালা কাব্য গ্রন্থ) দ্বিজ কমললোচন প্রণীত। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল সম্পাদিত। বিখ্যকোষ প্রেসে মুদ্রিত। রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। এখানি প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে রঙ্গপুরনিবাসী কাব দ্বিজ কমললোচন রচিত পুৰাতন কাব্য; সম্প্রতি সাহিত্য পরিষৎ ইহার আবিষ্কার করিয়াছেন। গ্রন্থখানির বিশেষত্ব এখানি শক্তি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ, বৈষ্ণবগ্রন্থ নহে। কাব্যখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে; গ্রন্থের ভূমিকায় কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কবিতাশক্তি বেশ দক্ষতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। কবি কমললোচনের সৌন্দর্য্যজ্ঞান, উপমাবৈচিত্র্য প্রভৃতি প্রকৃতই উপভোগ্য।

পত্রলেখা। শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী। প্রণীত কাব্যিক প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। কবির রচনার নূতন পরিচয়

অনাবশ্যক। এই গ্রন্থে প্রায় দেড়শতাব্দিক কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভাবে ছন্দে এমন একটি করুণ সুর বহিয়া গিয়াছে যে তাহা নিম্নেই হৃদয় স্পর্শ করে। ভাষার গতি লীলাময়-সরল। কবিতাগুলি পাঠ করিবার সময় পাঠকের মনে হয়,—

“গাঢ়তর সঙ্কার আঁধারে

লুপ্ত আমি, লুপ্ত লেখা অশ্রুবারি ধারে!”

কবির মর্ম্মবেদনায় পাঠকের চিত্ত একটা করুণ সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠে। সে বেদনা একান্ত নিজস্ব বলিয়াই মনে হয়। বাঙ্গালায় কাব্যসাহিত্যে পত্রলেখা বিশিষ্ট উচ্চস্থান লাভ করিবে বলিয়া আশা দিগের বিশ্বাস আছে। শ্রীসত্যব্রত শর্মা।

শাস্ত্র। গীতি কাব্য; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। “সাহাজ্, প্রিটিং ওয়ার্কস” হইতে মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ৮০ আনা। এতদিন পরে বঙ্গসাহিত্যের প্রিয় “বড়াল কবির” মাসিক পত্রিকার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে পাইয়া অনেকেই ক্রীতিলাত্ত করিবেন। অক্ষয়বাবু নূতন কবি নহেন, বহুদিন হইতেই তিনি কবিতা রচনা করিয়া সাহিত্যে আপনীর গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বর্তমান কবিতাগুলিতে, কবির, নিজস্ব সাকরুণ সুরটা সর্বত্র বস্তুত। এই সাকরুণ সুরটা নৈরাশ্রব্যঞ্জক হইলেও, ইহার অন্তর একটা গুঢ় নিভরতা আছে যাহা নিতান্তই বিশ্বাসলব্ধ। এই গ্রন্থে কাবির নানাদিগাভিমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়—একদিকে লঘু গীতি অন্তর্দিকে গভীর অধ্যাত্তত্ব। আশা করি বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকা কাব্যখানি উপভোগ করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইবেন। এবং আমরা অচিরে তাহার অন্ত মঙ্গলন পাঠ করিবার সুযোগ পাইব।

পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু। প্রেসি-ডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্, এ, বহাণয় কর্তৃক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত প্রবন্ধ। সাহিত্য-পরিষৎ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত

মূল্য ১০ আনা মাত্র। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যতদূর সম্ভব, অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার বিষয়টী সেই ভাবেই আলোচনা করিয়াছেন। তিনি চন্দ্রনাথবাবুর রচিত গ্রন্থবন্দীর অপেক্ষা চন্দ্রনাথবাবুর ব্যক্তিগত জীবনের অধিকতর আলোচনা করিয়াছেন। বিশেষ নূতন কথা না থাকিলেও, খগেন্দ্রবাবু প্রাকৃতিক বেষ মনোরম করিয়া তুলিয়াছেন। আশা করি খগেন্দ্রবাবু এই ক্ষুদ্র রচনা, কালে বৃহত্তর করিতে আকাশ পাইবেন।

প্রাকৃতিক চিকিৎসা (পূর্বভাগ)

শ্রীযুক্ত দুর্গেশনাথ ভট্টাচার্য্য লিখিত। মুরশিদাবাদ কাণিকা যন্ত্রে মুদ্রিত। ভূমিকায় গ্রহকার লিখিতে-ছেন * * * সম্পাদকেরা কিরূপ সমালোচনা করেন এবং স্বার্থের বিনিময়ে কেহ পুস্তক লন কিনা তাহা দেখিয়া দ্বিতীয়োংশ প্রকাশিত করিব। অশচ গ্রহকার লিখিয়াছেন তাঁহার নিজের প্রেস আছে! গ্রহকার শিক্ষা দিতেছেন “উপর বর্জন করুন”। বলা বাহুল্য এ ধূম্য পাস্চাত্যজগতে অনেকদিন উঠিয়াছে। এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে অক্ষম তবে যাঁহাদের উৎসাহ আছে তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। গ্রহকার যদি তাঁহার পদ্ধতি

অনুসরণ করিয়া যে যে ব্যক্তি কল লাভ করিয়াছেন, তাহার এচটী বিস্তৃত বিবরণ দিতেন তাহা হইলে উপকার হইতে পারিত। নতুবা এচটী নূতন বিষয়ে গ্রহকার আস্থাবান বলিয়া, সাধারণ তাহা সহজে গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু এবং প্রণয়সহ।

গৃহধর্ম্য। শ্রীমতী বিদ্যাবতী আরিয়ার সবসতী প্রণীত। হিতবাদী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১০ আনা। গৃহধর্ম্য সাধারণতঃ “সন্তানের শিক্ষা ও পালন রীতি” সহজ ভাষায় বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন, সেগুলি পাঠ করিলে বন্দীয় মাতৃগণ নিশ্চয়ই উপকৃত হইবেন। গ্রহকার্ত্তী পরিশিষ্টে সন্তান ও মহিলাগণের পৌড়ার সহস্রসাধ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালী সঙ্কলন করিয়াছেন। আমরা এই সঙ্কলনের পক্ষপাতী নহি। যিনি স্বয়ং চিকিৎসক নন তিনি কঠিন চিকিৎসা গ্রহের সঙ্কলন করিতে উপযুক্ত নহেন। তাহার উপর, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ গুলির অবিকাংশ স্থলে মাত্রা বা কম উল্লিখিত হয় নাই।

শ্রীগঃ

আমার কর্মভূমি।

১
ধন্য মান্ত যশে গাঁথা, আমাদের এই কলিকাতা,
তার নামে এক আপিস আছে, সব আপিসের সেরা,
ও যে ইট-পাথরে তৈরী মেটি, রেলিঙ্ দিয়ে ঘেরা,—
এমন আপিস কোথাও খুঁজে পাবে নাক ভূমি,
সকল বুদ্ধি হানি-করা, আমার কর্মভূমি!

২
কেরাণী দপ্তরী তারা, কোথায় এমন খেটে সারা,
কোথায় এমন বিবাদ জাগে, এমন মলিন মুখে,
ও তার ‘বেলের’ ডাকে আঁৎকে উঠি গভীর মনের দুঃখ!
এমন আপিস ইত্যাদি।

৩
এত রুক্ষ সাহেব কাহার, কোথায় এমন গালি আহার
কোথায় এমন লোহিত নেত্র কটমটিরে থাকে।

এমন কাণের উপর হাত খেলে যায় গছ মপুর পাকে!
এমন আপিস ইত্যাদি।

৪
ঘরে ঘরে ভরা বাবু, কলম পিষে দেহ কাবু
এপ্রাণ্টিং পড়ে তবু পালে পালে গিয়ে
তার টুলের উপর ঘুনিয়ে পড়ে, টেবিলে শির দিয়ে।
এমন আপিস ইত্যাদি।

৫
কেরাণীদের জীর্ণ দেহ, কোথায় এমন পাবে কেহ
চাকরি, মা, তার চরণ দুটি নিত্য পূজা করি,
আমাব এই আপিসে কর্ম যেন সজার রেণে ধরি!
এমন আপিস ইত্যাদি।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক, এম,এ।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কালিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মাস্তা দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

ভারতী

৩৪শ বর্ষ]

চৈত্র, ১৩১৭

[১২শ সংখ্যা

প্রাচীন ভারতের লোকশিক্ষা ।

আমাদের জীবধাত্রী বহুকরার একটা সূচিত্রিত ইতিহাস আছে। বায়স্কোপের মত একটির পর একটা স্তরবিস্তৃত ছবি— ঘনিষ্ঠ ভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, একটির অঙ্কে আরেকটি বিশ্রাম করিতেছে। অকস্মাৎ একদিন তন্ত্র-বিদের হস্ত তাহার লুকানো স্প্রিংটিকে স্পর্শ করে—আর লক্ষ লক্ষ বংশরের কাহিনী পলি মাটির তল হইতে, প্রস্তর-স্তরের ভিতর হইতে, অঙ্গারীভূত অরণ্যে অস্তরকক্ষ হইতে বাহির হইয়া দাঁড়ায়,—তাহার বিরাট বপু বহু বহমানকালের প্রত্যেক উর্ধ্ব রেখায় আচ্ছন্ন দেখা যায়। শুধু এই খানেই তাহার সমাপ্তি নয় : তাহার জড় ও অজড়, চেতন ও অচেতন অভিব্যক্তির পথে পাশাপাশি চলিয়াছে। সৌরকক্ষে বর্ণগ-ক্ষিপ্ত অনলাপ্তী দ্রবময়ী পৃথী বধন সঙ্গল সৃষ্টিকার স্নিক শ্যাম-লিমা লাভের জগু মুহূর্হু ভূকম্পনে ও বারিধারা পাতে আপনাকে পর্য্যদস্ত করিতে-ছিল, তখন তাহার চিৎশক্তি তাহারই পাশ দিয়া আপনাকে অপেষ প্রকারে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেছিল। যুগ যুগান্তরের সংগ্রামের পর অবশেষে চিন্ময় মাহাত্ম্যরূপ মনুষ্যে অভিব্যক্তিতে আপনার সফলতার

প্রতিষ্ঠা করিল, সমস্ত সৃষ্টি তাহার পদানত হইল, অক্ষশক্তি জাগ্রত চেতনার করায়ত্ত হইয়া পড়িল।

সেই আদিম দিবসটির সহিত আজিকার দিনটিকে যদি মিলাইয়া লইতে যাওয়া যায়, তবে সেই আত্যন্তিক বিরোধময় পরিবর্তনটির মূলে যে উল্লিখিত বিকাশ আমরা দেখিতে পাই তাহা বুদ্ধি। এই বুদ্ধির সার্থকতার নামই শিক্ষা। পূর্বত যেমন সমস্ত সমভূমির মাঝখানে শুধু উচ্চতার দ্বারা আপনার পার্থক্যকে জাগরিত করিয়া রাখিয়াছে, মানুষ তেমনি সমগ্র জগৎ সৃষ্টির মাঝখানে শিক্ষা দ্বারা আপনাকে স্বতন্ত্র ও অনারত্ত করিয়াছে এবং সমস্ত জড় জগৎ ও জীব জগতের মুখে বলা লাগাইয়া আপনার পদানত করিয়াছে !

এই শিক্ষার ঠিক একটি প্রতিশব্দ যদি বলিতে হয়, তবে “মনুষ্যত্বের বিকাশ” বলা বোধ হয়, সর্বাপেক্ষা সঙ্গত হইবে। তাহার এই বিশেষ উদ্দেশ্য ও বিশেষ সফলতা তাহাকে একটি অপূর্ব মহিমা দ্বারা মণ্ডিত করিয়াছে। অচেতন উদ্ভিদ সৃষ্ঠ্যালোক লাভ করিবার জগু যেমন উর্ধ্বে বাহু বিস্তার করে, মানবাত্মা তেমনি একটি স্বভাবসিদ্ধ আকর্ষণে শিক্ষার দিকে উর্ধ্ব হইয়া আছে। তাহার অন্তঃকরণের

ভিতর সে জন্তু একটা সুগভীর তৃষ্ণা জাগ্রত রহিয়াছে, নিখিল লোক তাহার পানীয় যোগাইয়া কুলাইতে পারিতেছে না।

শিক্ষাকে দুইটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়, ব্যক্তিগত শিক্ষা ও লোকশিক্ষা। একটি ব্যক্তি ভাবের অনুষ্ঠান, অপরটি সমষ্টি ভাবের। সমাধিনিষ্ঠ ভারতবর্ষে শেষোক্ত প্রকারের শিক্ষা প্রধান লাভ করিয়াছিল। এখানে তাহারই কিছু আলোচনা করা যাক।

অবশ্য প্রাচীন ভারতবর্ষ তাহার লোক-শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ কোনো নৈশ বিদ্যালয় অথবা “ইন্সটিটিউশনের নাম কবিত্তে পারিবে না, অথবা নিম্ন শ্রেণীর লিখন ও পঠন পদ্ধতির সহিত সবিশেষ পরিচয়ের কোনো উদাহরণ দিতে পারিবে না, কিন্তু তত্রাচ লোকশিক্ষাকে সে এমন একটি বৃহৎ স্থানে বৃহত্তর করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল যে আজিকার এই লোক শিক্ষার (mass education) দুর্ভাগ চেষ্টার সহিত তাহার কোনো উপমাই চলে না। কথকতা, যাত্রাগান, পুঁথিপাঠ—এই সমস্ত ব্যাপার গুলি তাহার লোকশিক্ষার প্রধান উপায় ছিল, এবং ইহা হইতে এমন একটি সুপরিণত সফল মূর্ত্তিতে এই শিক্ষা বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহা লইয়া বিচার বা স্বপ্ন করিবার অবকাশ ছিল না। বর্ষার কুললগ্ননীর নদীর মতই সে একটি অখণ্ডনীয় পূর্ণতার মণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছিল! দাতা ভারতের এ যেন একটি অনন্য—দেশে যত হুঃখী কান্দাল নিরন্ন আছে, সকলেই তাহার অবারিত দ্বারে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইতেছে, অনন্যপূর্ণার বেশে বীণাপানি

স্বর্ণথালে ভোজ্য লইয়া তাহাদিগকে সুখা বণ্টন করিয়া দিতেছেন!

ষ্টুয়ার্ট মিল সভ্য জগৎতব অবস্থা সমন্বয়ের একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাতে অর্থ সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার না থাকিয়া সাধারণ ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার সুদূবতর আশা ব্যক্ত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, যে লোক সমাজে এমন একদিন আসিবে, যখন ধনী তাহার পৈতৃক অথবা স্বোপার্জিত অধিকারের বিপুল বিত্ত বিলাসবাসনে ব্যয় করিতে পাইবেন না এবং তন্তু শ্রমজীবী ও ভিখারীর দল আপনার গ্রাসাচ্ছাদনে অসমর্থ হইয়া কীট পতঙ্গের মত প্রাণত্যাগ করিবে না, সাধারণ ভাণ্ডার মাঝখানে থাকিয়া সামাজিক তুল্যদণ্ডের সমতা বিধান করিবে। জুয়ার্ট মিলের এই অতিপ্রাকৃত স্বপ্নটী—যাহা অধিকাংশ লোকেই “আকাশগামী ভাবুকতা” বলিয়া মনে হইয়াছে—একমাত্র ভাবতবর্ষ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিয়াছে। কি সামাজিক উৎসবে, কি ধর্মোৎসবে, কি আনন্দোৎসবে,—সে শুধু আপনার চিত্ত বিনোদনকেই কেন্দ্রস্থল করে নাই, তাহার চারিদিকে যে পিপাসু হৃদয়গুলি আছে, পানীয় অভাবে যাহাদের তৃষ্ণা দূব করিবার সামর্থ্য নাই,—তাহারা তাহার উৎসব ব্যাপারের প্রধান অঙ্গ, তাহাদের মন চক্ষের আনন্দ-জ্যোতি তাহার প্রধান দীপালোক!

আমাদের যাত্রাগানে ধনী সাধারণের হইয়া মূল্য দান করেন, সকলের সেখানে অবারিত দ্বার, সকলের সেখানে সমান প্রবেশাধিকার। দরিদ্র সাধারণ—তাহাদের মুষ্টিমের অন্ন হইতে তাহার অংশ দিতে বাধ্য

হয় না। এই সব নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর লোক গুলি—বর্ণমালা যাহারা কখনো চোখে দেখে নাই, তাহাদের চক্ষের কাছে ব্যাস বাল্মীকি কবি কঙ্কের সৃষ্টি পর্যায়ের পরে পর্যায়ের জীবন্ত হইয়া উঠিতেছে,—কত জ্ঞান, কত শিক্ষা, কত ধর্ম—কত প্রেম, ভক্তি, পাপ, পুণ্য—অনাদি কালের কত অনাদি কথা নিব্বার ধারার মত তাহাদের প্রাণের ভিতর আসিয়া নামিতেছে, তাহাদের জীবনের গ্লানি দুঃখ হতাশা মনস্তাপ সব তাহারা ভুলিয়া যাইতেছে! রাম যখন পিতৃপত্য পালন করিতে বনে যাইতেছেন, সীতা যখন শ্রীরামের মনস্তপ্তির জন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিতেছেন, রুক্মিণী যখন সত্য রক্ষার জন্ত বালক পুত্রের শিরশ্ছেদ করিতেছেন, সাবিত্রী যখন সত্যবানের শিয়বে আগত মৃত্যুকে তজ্জনী শাসনে ফিরাইয়া দিতেছেন—তখন তাহাদের অন্ধকার হৃদয় গুলি একটি অপরূপ শিক্ষার আলোক উত্তাপে বিক্ষারিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাদের প্রতি দিনকার ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা মুখ দুঃখ বাদ বিসম্বাদ তরঙ্গ-তাড়িত ত্বণের মতন সবিয়া যাইতেছে, তাহাদের বিজ্ঞানময় সম্বন্ধে সে আলোক-স্পর্শে শতদলের মত প্রক্ষুটিত হইয়া উঠিতেছে, এই ক্ষণিকেব হৃদয় প্রভাতটি চিরদিনের জন্ত তাহাদের হৃদয়ে একটা স্পন্দনের বেগকে জাগরিত করিয়া যাইতেছে। নৌহারিকা ঘনীভূত হইয়া যে পৃথিবীর আকার ধারণ করিয়াছে, অথবা সৃষ্টির কৌট পতঙ্গ হইতে বহুপদ চতুষ্পদ প্রভৃতির ক্রম পর্যায়ের দ্বিপদ মনুষ্যের আবির্ভাব হইয়াছে—বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া তাহারা তাহা নাই বা শিথিল, তাহারা দেখিতেছে তাহাদের চক্ষের সম্মুখে পৃথিবী সৃষ্ট হইতেছে,

জল হইতে স্থল উদ্ভূত হইতেছে, অন্ধকার হইতে আলোক জন্ম লইতেছে—অভিব্যক্তির পর্যায় ক্রমে তাহাদের দেবতা মৎস্য রূপ হইতে কূর্মরূপে, কূর্ম হইতে বরাহ রূপে, বরাহ হইতে অর্দ্ধনরাকার রূপে অর্দ্ধনরাকার হইতে খর্ব্ব বামন রূপে, বামনরূপ হইতে অবশেষে বিরাট-দেহ বৃষক্ক শালগ্রাম মহাভূজ সূঠাম নরাকারে প্রকাশিত হইতেছে! সভ্যজগতকে বুঝাইতে গিয়া ডারুইন যে গবেষণা করিয়াছিলেন (যদিও এখন ডারুইনের সেই মত সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশিত হইতেছে)—কলাগম্বীর অঙ্গনে সঙ্গীতের সৌন্দর্য্যালোকে তাহারা তাহাকে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠিতে দেখিতেছে! তাহাতে কোনো কঠোরতার লেশ নাই, পীড়নের অসহিষ্ণুতা নাই, শিক্ষার অত্যাচারের জগদল পাষণটিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া কাব্য সাহিত্য, দর্শন ধর্মশাস্ত্র একটি প্রবল নিব্বার ধারার মত উৎসারিত হইয়া চলিয়াছে! তাহার অমৃতের এই অনন্ত প্রস্রাবণটিতে আপামর সাধারণ তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিতেছে, তাহাদের জীবন যাত্রার তিমিরাবৃত পথগুলি এই অপরূপ দীপের শত-শিখা বর্ত্তিকার আলোকে ঝক্‌ঝক্‌ করিয়া উঠিতেছে! তাহাদের সম্মুখে তাহারা দেখিতেছে বিধাতার জগৎ-সৃষ্টির লীলাভিনয়—পাপপুণ্যের দণ্ডাভিনয়, মহৎ ও ক্ষুদ্রের কস্মাভিনয়;—ভক্তিতে আনন্দে ও মহৎ ভাবের উদ্দীপনায় তাহাদের হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাদের চারিদিককার কারা-প্রাচীর তাহাদের চোখের কাছ হইতে সরিয়া যাইতেছে!

এই নিম্ন শ্রেণীকে অশিক্ষিত বলিয়া শিক্ষিত

সমাজ যতই স্বর্ণা করুক না কেন, শ্রদ্ধাযোগ্য চরিত্র তাহাদের ভিতর বিরল নহে এবং মার্জিত রুচি-ই যদি শিক্ষার পরাকাষ্ঠা না হয়, তবে বহুস্থলে-ই তাহারা তাহাদের সহিত সমশ্রেণীতে দাঁড়াইবার যোগ্য। একটি বিশ্বয়কর বিষয় এই, যে অণুপাতে তাহারা “অশিক্ষিত” সেই অণুপাতে তাহারা ধর্মনিষ্ঠ। ইহা বেশ দেখা যায় যে ধর্মকে তাহারা বিচার করিবার মত কোনো ক্ষুদ্র জিনিস বলিয়া মনে করে না ও তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠান ও অনুশাসন লইয়া আপনার সক্ষীর্ণ বুদ্ধির পরিমাপ-যন্ত্রে ভৌল করিতে বসে না। যে বৃহৎ শক্তি এই আবহমান কালের ধর্মবুদ্ধিকে ও ধর্মশাসনকে জন্মদান করিয়াছে, একান্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে তাহারা তাহাকে মানিয়া লয়, প্রত্যেকের ঋণ বুদ্ধি দ্বারা সেই অধঃ সত্বাটিকে খণ্ডিত করে না। বৃত্তচ্যুত হইলে বৃক্ষের ফল শূণ্যমার্গে ভ্রমণ না করিয়া কেন ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় অথবা মানবকুলের পূর্ব পুরুষ কপিবংশ ছিল কি না তাহা তাহারা অবগত না থাকিলেও বিদ্যাতার নির্দিষ্ট ধর্মবিধি লজ্বন করিলে যে ফল হয় তাহার সহিত যথেষ্ট পরিচিত আছে। এই বিশ্ব ভুবনের ভিতরে, সমস্ত সংশয়, বিধা ও মূঢ়তার কোলাহলের পাশ দিয়া নিত্য প্রেমের যে শুদ্ধ নির্মল ধারাটি বহিয়া চলিয়াছে, জীবন তরণী গুলিকে বিশ্বাসের পাল তুলিয়া তাহার প্রবাহ-মুখে ছাড়িয়া দিয়াছে, এবং তাহাদের শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিকতা বড়ের বাতাস ঠেলিয়া গুণ টানিয়া তাহাদিগকে জীবনের দিকে টানিয়া লইতেছে।

এই সব সংখ্যাতীত পথ—সংখ্যাতীত দিক্ দিয়া একটিমাত্র গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়াছে, ভারতবর্ষ তাহার ভিতর হইতে সর্বাপেক্ষা সরল পথটি বাছিয়া লইয়াছে। জ্ঞান জিনিসটা খানিকটা মরীচিকার মত— তাহা শুধু লুক করে, তৃপ্তিদান করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, তাহার অসংখ্য নীর অনুসরণ করিয়া যতদূরই যাওয়া যাক্ না কেন, কাহারও কখনও তাহা পানে তৃষ্ণা নিবৃত্ত হন নাই। নিউটন যাহার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ; “লোকে আমাকে কি মনে করে তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু আমার মনে হয় জ্ঞানমহার্ণব আমার সম্মুখে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে—আমি বালকের স্থায় বেলাভূমিতে উপলব্ধি আহরণ করিতেছি মাত্র।”

মুষ্টিমেঘ আয়ু ও ক্ষণভঙ্গু কামা লইয়া সেই মহাসমুদ্র উত্তরণের ছরাশার অনুসরণ করিতে ভারতবর্ষ উগ্ৰত হয় নাই। ভোরের বেলা পাখী যখন আকাশে উড়িতে থাকে, তখন সেই উড়িবার আনন্দটুকু ছাড়িয়া যদি সে তাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের একটা হিসাব খাড়া করিতে উগ্ৰত হয়, তবে অবোধ ক্ষুদ্র প্রাণী সূর্য্য-রাশ্মি-স্পৃষ্ট হইয়াই মরিবে, কোনো আনন্দ সে তাহা হইতে লাভ করিতে পারিবে না। এই সহজ ও সুদূর জ্ঞানকে হৃদয়ত করিয়া ভারতবর্ষ তাহার লোকশিক্ষার মূলে সেই একটি শিক্ষাকেই জাগ্রত রাখিয়াছে, সমস্ত যাত্রাপথে সেই একটি স্থানকেই লক্ষ্যস্বরূপ করিয়া নয়নাগ্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সমস্ত আয়োজনের ভিতর সেই একটি প্রতিপাল্য বিষয়কে ঘোষণা করিয়াছে! সে কেবল বলিতেছে “যাহাতে তোমরা অমৃতত্ব লাভ

করিবে না—তাহার দিকে তোমাদের চেষ্টাকে পরিচালিত করিও না, আশ্রয়দান কর তোমরা সেই শাস্ত্রভূমাকে—যাহা তোমা-দিগকে তোমাদের ক্ষুদ্রতা ও নখরতার উপর উৎখিত করিবে!” প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রতি শিরায় সে বাণী স্বায়ুভাণের মত ব্যাপ্ত হইয়া আছে, মজ্জার মত অস্থিভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, মনের মধ্যে আশ্রয় মত বিরাজ করিতেছে ! যুগ যুগান্তরের স্থিততে ক্রমশঃ তাহা প্রস্তুত হইলেও তাহাকে সে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারিতেছে না, চারিদিক হইতে যখন তাড়নার কশা তাহার উপর পড়িতেছে, তখনও সে আপনাকে তাহা হইতে মুক্ত করিতে পারিতেছে না। সকলে তাহাকে বলিতেছে—“জাগ, জাগ, তোমার বৃকের উপর হইতে ঐ পাষণ পিণ্ডটা ফেলিয়া দিয়া লঘুশব্দে আমাদের সহিত ছুটিয়া চল। দেখিতেছ না, দৌড়েব (race) ঘণ্টা পড়িয়াছে—এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের বিষম স্বক্ষেত্রে যে আগে যাইবে, সেই জিতয়া যাইবে, পিছনে পড়িলে আর রক্ষা নাই। ছুট! ছুট!” কিন্তু তবু সে তেমন করিয়া ছুটিতে পারিতেছে না, তাহার বৃকের ভিতর ভঙ্গুর জগতের কঠিন সত্যের গুরুভার তাহার গতি মন্থর করিয়া দিতেছে।

অবশ্য একথা সত্য যে ইউরোপ লোক শিক্ষাকে কোনো ক্রমেই অবহেলা করে নাই। কর্ম ও চেষ্টা দ্বারা যতদূর করা যায় তাহার কোনো দিক হইতেই তাহার অভিজ্ঞ হইবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটি কথা ভাবিয়া দেখিবার আছে। চন্দ্রের আলো যেমন সূর্যালোকেরই আভাসমাত্র—তাহার

নিজস্ব কিছু নয়, মানুষের শক্তি মাত্রই ঠিক তেমনি একটি মহান শক্তির আভাস মাত্র, তাহা ঠিক তাহার আয়ুগত ক্ষমতা নহে। এই ধাপ্তি—জ্ঞানকে যাহা স্তম্ভদান করিয়া পূর্ণবয়ঃ করিয়া তুলিতেছে—তাহার ভিতর যে মহিমার দিব্য জ্যোতি আছে—‘সাধাবণ’ ভূমিতে কচিং তাহার বিকাশ দেখা যায়। সুপরিণত বিদ্যা—বংশগত ফলের অপেক্ষা রাখে, পুরুষানুক্রমিক প্রবণতার উপর তাহা বহুপরিমাণে নির্ভর করে। চাষার ছেলে যখন চাষের কাজ করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাকে সপ্তসমুদ্র পাড়ি দিয়া কোথাও গিয়া কৃষিবিদ্যা শিখিয়া আসিতে হয় না, তাহার কাজের সমস্ত কৌশলই শৈশব হইতে তাহার অজ্ঞাতসারেই সে অধিগত করিয়া বসিয়াছে। সুতরাং তাহার কার্যে তাহার সফলতার মূলে আমরা দেখিতে পাই তাহার বংশগত প্রবণতা তাহার পৃষ্ঠপোষক শক্তিস্বরূপ কাজ করিতেছে এবং তাহার আশৈশবের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা—তাহাকে নিফলতার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সংগ্রামের জন্ত প্রভূতরূপে ক্ষমতাপন্ন করিয়াছে। দেবী বীণাপাণি আশুতোষের মত স্বল্প পূজায় প্রসন্ন হন না, অগভীর বিদ্যা উচ্চ জলসেকের মত কল্যাণের মূল বিনষ্ট করে, পুষ্পোদ্গমের সহায়তা করে না। এই শ্রমজীবীগণ ললাটের শব্দ শিখন করিয়া যাহারা অন্ন ও লোকসমাজের প্রয়োজনীয় তাবৎ দ্রব্যাদি উৎপাদন করে—বিদ্যামন্দিরে স্বেচ্ছাসেবক (amateur) হওয়া তাহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র—অন্ততঃ আমাদের দেশে তাহাদের

চেষ্ঠা ও কর্মকে কমলার দ্বারে অঞ্জলি প্রদান করিয়া যখন তাহারা বীণাপাণির প্রদান আকাঙ্ক্ষা করে, তখন তিনি বরের পরিবর্তে তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন।

ইউরোপ সাধারণের শিক্ষার জন্ত বহু পরিকর হইয়া বিত্তা শিক্ষার বহু ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। নৈশ বিদ্যালয়, অতৈনিক বিদ্যালয়, ফ্রি লাইব্রেরী—কোনো দিক দিয়া সে কিছু বাকি রাখে নাই। তাহার অতি সচেতন সভ্যতা লিপিবিদ্যার পরিচয়ের অভাবকে জীবনের সমস্ত দৈন্তের ভিতর হীনতম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে এবং বিদ্যাশিক্ষাকে ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও অভিরূচির উপর ছাড়িয়া না দিয়া সে দেশের আইনকে ও সমাজশক্তিকে তাহার রক্ষার জন্ত প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছে। তাহার বিধান অনুসারে প্রত্যেক শিশু পঞ্চম বর্ষে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ না করিলে তাহার অভিভাবকগণের দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। এখন দেখা যাক শিক্ষার এই বৃহৎ চেষ্ঠা ও বিরাট আয়োজন কি পরিমাণ সার্থকতার দ্বারা পুরস্কৃত হইতেছে। হার্বার্ট স্পেন্সারের ভাষায় বলিতে গেলে বলা যায় যে, “শিক্ষার প্রধান কার্য্য আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে জীবনযাপনের উপযোগী গড়িয়া তোলা।” সোনাকে পরীক্ষা করিয়া লইতে গেলে যেমন কষ্টি পাথরে আঁক দিয়া লইতে হয়, তেমনি পশ্চিমের প্রবল চেষ্ঠা ও কঠিন ব্যবস্থার এই শিক্ষা পিণ্ডটাকে আমরা যদি পরীক্ষা করিতে যাই তাহা হইলে মিকষ সোনার বহুপীত রেখাটির

পরিবর্তে একটি মলিন কৃষ্ণ রেখাই আমাদের চোখে পড়িবে। ইউরোপ নিজেও আজ একথা স্বীকার করিতে পারিতেছে না, যে গুরুভার নিষ্ফলতা বৃহৎ বাঙ্গের মত তাহার আশা-দীপ্ত চক্ষের আনন্দ-শ্বেতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইতেছে—তাহা তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে একটা অক্ষুট ভীতির বেদনা-শিহরণ প্রেরণ করিতেছে। আজ আমরা তাহাদিগকে বলিতে শুনিতেছি যে, “শিক্ষা, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষার বহুতরবিষয় সম্বন্ধে আমরা প্রচুর পর্যালোচনা করিয়া থাকি, কিন্তু তাহার ফলে এখন এইরূপ প্রমাণই পাইতেছি যে শিক্ষা যখন আইন-নির্দিষ্ট ছিল না তখনকার কাজই সর্ব্বাংশে প্রশংসা যোগ্য ছিল। তখনকার ইমারতের গঠনপ্রণালী আধুনিক প্রণালী অপেক্ষা উন্নততর ছিল, এবং গৃহ-সজ্জার উপকরণাদি অধিকতর স্থায়ীভাবে নির্ম্মিত হইত। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর তাপরক্ষার উপযোগী পুকু দেয়াল ও ওক কাঠের খামওয়াল কৃষিবাটিকা অথবা বৃহৎ প্রাসাদের সঙ্গে আধুনিক পল্লীস্থাপত্যের কোনো উপমাই চলে না। প্রাচীনকালের কাঠের সিঁড়ি যে বাড়ীতে আছে সে বাড়ীতে তাহা একটি সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে,—তাহা শুধু প্রাচীনত্বের জন্ত নহে, গঠনের অনুপমত্বের জন্তই তাহার আদর। আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিল্পীগণ চেষ্ঠার দ্বারা তাহার অনুকরণ করিতে পারে বটে কিন্তু কখনও অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে আমাদের অপেক্ষা আমাদের

পিতামহগণ যোগ্যতা ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ঈশ্বরার্চনার জন্তু নির্মিত এখনকার এই অশোভন ধর্ম্মমন্দিরগুলির তুলনায় তখনকার মন্দিরগুলি দেখিয়া এ কথাই সত্যতা বেশ বোঝা যায়।”

* * * *

“যখন আমরা মনস্বিতার উন্নততর ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াই, তখন আমরা দেখিতে পাই যে আর্ট স্কুলের প্রাচুর্য্য সঙ্গেও কোনো ব্রিটিশ বড় আর্টিষ্ট নাই এবং যদিও প্রত্যেকেই লিখন ও পঠনপদ্ধতির সহিত পরিচিত, তথাপি সেক্সপীয়র, স্কট, থ্যাচারে, ডিকেন্সের মত উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের এ যুগে একান্ত অভাব। শিক্ষা যে যুগে আইননির্দিষ্ট ছিল না, তাহারাই সেই যুগেরই লোক ছিলেন।”

শিক্ষা সম্বন্ধে এই অসন্তোষের গুঞ্জরণ এখন চারিদিক হইতেই ধ্বনিত হইতেছে। সভ্যতা বাহিরের ঐশ্বর্য্যকে যতই স্কোত করিয়া তুলিতেছে, ভিতরের দৈন্ত ততই যেন গভীর হইতেছে। মানুষ সেই অতলস্পর্শ গহ্বরটিকে বুজাইবার জন্তু হাতের কাছে যাহা পাইতেছে তাহাই যেন চোখ বুজিয়া তাহার মধ্যে ফেলিয়া দিতেছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের স্বন্দে অরাগ্রস্ত জনসমূহ যেন তাহাদের হাতের দিকে চাহিবার অবকাশ পাইতেছে না। যুদ্ধ যখন ঘোরতর বাধিয়া ওঠে আগ্নেয়াস্ত্রের ধূমে অন্ধ সেনারা তখন যেমন আপন দলের লোকের উপরেই অস্ত্র বর্ষণ করিতে থাকে তেমনি তর একটা প্রচণ্ড লাভের চেষ্টা আজ তাহাদের এমন পাইয়া বসিয়াছে যে, তাহার প্রয়োচনার কল্যাণবুদ্ধিকে তাহারা যেন বিসর্জন দিতে বসিয়াছে!

কিন্তু সাধারণের ভিতর শিক্ষা কোনো সফলতা উৎপন্ন করিতে পারে নাই একান্ত ভাবেই যদি একথা বলা যায় তাহা হইলে শুধু নিজের মতকেই প্রচার করা হয় সত্যকে নয়। ভিক্টর হুগো বলিয়াছিলেন “বিগামন্দিরের দ্বার যে উন্মোচন করে সে বন্দীশালাব দ্বার রুদ্ধ করে।” তাঁর কথা মতই আমরা সার জন লাবকের প্রকাশিত ইংলণ্ডের অপরাধী তালিকায় দেখিতে পাই— ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ‘এডুকেশন আইন’ প্রতিষ্ঠার পর তাহার পরবর্ত্তী সাত বৎসরের মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা ২০৮০০ হইতে ১৩০০০তে নামিয়া গিয়াছিল। প্রতি বৎসরের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হাবের সঙ্গে যোজনা করিলে ইহা একটি বৃহৎ সার্থকতার পরিচয় প্রদান করে।

প্রাচীন ভাবতবর্ষ শিক্ষার একটি বৃহত্তর আকাব দিয়াছিল। শুধু সভ্যতার জন্তু নয়, জ্ঞান-গরিমার গৌরবের জন্তু নয়, সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্তু নয়, মনুষ্যস্বার্থ মুক্তির একটি অতুল্য লক্ষ্যের দিকে চাহিয়া সে তাহার বর্ত্তিকা জ্বালাইয়াছিল! একটু একটু করিয়া পথ না চলিয়া সে একদমেই সমস্তটা পথ চলিবার আয়োজন করিয়াছে, পথের ধারে প্রমোদ নিকেতন গুলিতে থাকিয়া দীর্ঘ যাত্রাকে দীর্ঘতর করিয়া তোলে নাট, পথশ্রমে তাহার শ্রান্ত পদ যখন বেদনায় টন্ টন্ করিয়াছে তখন সে এক মনে সেই চিরবিশ্রামের জায়গাটিকে স্মরণ করিয়া তাহার মনের সমস্ত কাঠিগুকে পুঞ্জীভূত করিয়া যষ্টির মত হাতে আঁটিয়া ধরিয়াছে! বাড়ীতে ঘাইবার জন্তুই যে

পথের সৃষ্টি, পথের জন্তু বাড়ীর সৃষ্টি নয়—
সেইটে মনে করিয়া সে অলস বিশ্রামে
পথের ধারে দাঁড়াইয়া আমোদ উপভোগের
বাসনা করে নাই, তাহার স্নেহবুভুকু
হৃদয় ছায়া রোদ্র বিচার না করিয়া আপনার
হৃৎসহ তাগিদে বাড়ীর দিকে ছুটিয়াছে, তাহার
সমস্ত আনন্দ, উল্লাস, বিশ্রাম সেইখানেই
অপেক্ষা করিয়াছে, এবং সেইখানে না
পৌঁছান পর্যন্ত তাহার তৃপ্তি হয় নাই! তুঙ্গ
গিরি শিখবে অবস্থিত সেই চির স্থির
মৃহ জ্যোতির দিকে তাহার চক্ষু অনিমেষ
হইয়া আছে, জীবনের পরপারের অন্ধকারে
যেখানে জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যতা হঠিয়া দাঁড়াইবে
—যে অজ্ঞাত পথেব সম্মুখে আসিয়া ঐশ্বর্য
ও বৈভবের দীপ্তি কৃত্রিমতার ব্যর্থতার মলিন
হইয়া নিভিয়া যাইবে—সেইখানে সে দীপ্ত-হস্তে
জাগিয়া বসিয়া আছে, চারিদিকে তাহার
সে সব যাত্রী আনাগোনা করিতেছে তাহাদের
সে ডাকিয়া বলিতেছে “গৃহ-গমনোৎসুক
কে আছ সে এস, জীবনের এই হৃৎস বেলার
পারে যে অনন্ত দিবস আছে সেখানে কে
পৌঁছাবে .এস, তাহার জন্তু কে প্রস্তুত হইতে
চাও এস!”

ক্লেশের উপর ভারতবর্ষের একটা সহজ
স্বাভাবিক প্রবল অবজ্ঞা ছিল। ছুয়ারের
কাছে কেরাটি-কপাল-ভগ্নালঙ্কারে সজ্জিত
দুঃখকে দেখিয়া সকলে যখন সভয়ে
কপাট বন্ধ করিয়া দিয়াছে, তখন
সে হাশুমুখে আপনার ঘরের ভিতর তাহার
বসিবার আসন বিছাইয়া দিয়াছে, তাহার
অপেক্ষা শক্তিতে যে সে হীন নয়, তাহার
প্রবলতম আঘাতকেও যে সে উপেক্ষা

করিতে পারে তাহা সে সদর্পে প্রকাশ
করিয়াছে।

দারিদ্র্য, অনাহারে, রোগে, মহামারীতে
ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর মৃত্যু-
যুগে পতিত হইতেছে কিন্তু এ বিরাট মৃত্যু
কি নিস্তরক, নীরব, জড়ের মত কি ভয়ানক
মূর্ত্তি! কেহ তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না,
কেহ তাহার কণ্ঠ শ্রবণ করিতে পাইতেছে না,
আলোকিত আকাশের নীচে চলমান নিস্তরক
মেঘ-পুঞ্জের বিস্তৃত অন্ধকার ছায়ার মত
নীরবে তাহা সমাজের উপর দিয়া ভাসিয়া
যাইতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষ! তাহার
অন্তবের ভিতব সহিষ্ণুতাব যে অপরিমিত
বীর্ঘ্য রক্ষিত আছে, তাহা বিভীষিকায় বিচূত
হয় নাই, ঝঞ্ঝার পর্যাদস্ত হয় নাই, কঠোরতার
নম্র হয় নাই; যুগযুগান্তরের সাধনা তাহাতে
সঞ্চিত হইয়া আছে, বিপুল তপোতেজে
তাগ অক্ষতপ্রায় রহিয়াছে! অবশ্য ইহা
সত্য যে ভারতীয় জল বায়ু তাহার অধিবাসী-
গণের একটি বিশেষ সম্পদের মধ্যে পরিগণিত।
মুষ্টিমেয় তাম্রখণ্ড ও জীর্ণ চীর—ইহা হইলেই
তাহারা জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হয়,
শীতপ্রধান দেশের লোকেরা প্রকৃতি-জননীর
নিকট হইতে এই অনুকূলতা প্রাপ্ত হয়
না। হিংস্র প্রকৃতি ক্রুর বিমাতার মত
তাহাদের আপনার তীক্ষ্ণ নখরে ছিন্ন ভিন্ন
করিয়া রক্তপানের জন্তু লোলুপ হইয়া বসিয়া
আছে, এবং গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইতে অসমর্থ
হতভাগ্যগণ তাহার কবলে পতিত হইয়া
জীবনীলা সাক্ষ করিতে বাধ্য হইতেছে।

দরিদ্র ভারতের সঙ্গে তুলনা করিলে
দেখা যায় যে ইউরোপে ‘charity’র অশেষ

বিস্তার সম্বন্ধে তাহার নিবন্ধ অধিবাসীগণকে মনুষ্যত্ব রক্ষার বীৰ্য্য দান করিতে পারিতেছে না। জাতীয় সাহিত্যকে যদি জাতীয় অবস্থার নজির ধরা যায় তবে একথা কিছুতেই অস্বীকার করিবার যো নাই। অথ সব লেখকগণকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র ডিকেন্সের উপন্যাস হইতে দরিদ্র পল্লী বরজনীর অতি সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র দেওয়া যাক। ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ক্রুর আবর্তে পড়িয়া গৃহহারা বালিকা রাজধানীর ভিতর আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে, ডিকেন্স বর্ণনা করিতেছেন—

“এই ভয়ঙ্কর স্থানে রাত্রি! প্ৰম যখন বহ্নিতে পরিবর্তিত হইয়া গেল, এবং প্রত্যেক চিমনি শিখা বিস্তার করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সেই সব জায়গা গুলি—সমস্ত দিন যাহা মৃতের সমাধি মন্দিরের মত অন্ধকার ছিল, অকস্মাৎ শোণিত-দীপ্ত বর্ণে ঝলকিতে লাগিল। রাত্রি—যখন প্রত্যেক কলের শব্দ ভয়াবহ হইয়া বাড়িয়া উঠিতে লাগিল—যখন তাহার চারিদিকে লোকগুলি অধিকতর বর্ধর ও বস্ত্র দেখাইতে লাগিল, কর্মহীন শ্রমজীবির দল দলে দলে রাস্তা দিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল, অথবা মশালের রক্ত আলোক ধবিয়া তাহাদের নেতৃদলকে বেষ্টিত করিয়া দাঁড়াইয়া কর্কশ ভাষায় তাহাদের কৃত দুষ্কর্মের ব্যাখ্যা করিতে লাগিল এবং ভয়াবহ চীৎকারে ও ভয় প্রদর্শক বাক্যে তাহাদের উত্তেজিত করিতে লাগিল। সেই সব রমণীরা—যাহারা প্রার্থনা ও অনুন্নের দ্বারা নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল—তাহাদের দূরে নিক্ষেপ করিয়া ক্ষিপ্তবৎ লোকগুলি মশাল ও তরবারি লইয়া ভয়াবহ কার্য্য ও ধ্বংসের দিকে

ধাবমান হইতে লাগিল, ধ্বংস—যাহাতে অল্পের অপেক্ষা নিজেদের বিনাশই সর্ব্বাপেক্ষা সাধিত হইতেছিল! রাত্রি—শকট সমূহ যখন মৃতের সজ্জাহীন শব্দধার বহন করিয়া আনিতে লাগিল, অনাথ বালকবালিকার ক্রন্দন ধ্বনিত হইতে লাগিল, উন্মাদ রমণীগণ চীৎকার করিতে লাগিল, এবং সুপ্তির ভিতর ভ্রমণ করিতে লাগিল! রাত্রি—যখন কেহ আহাৰ্য্যের জন্ত, কেহ যন্ত্রণা ভুলিবার উদ্দেশ্যে পানের জন্ত চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ অশ্রুক্ষেপে, কেহ ঞ্জলিত গতিতে কেহ রক্ত চিহ্নিত চক্ষে অন্ধকার চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া বাড়ী ফিরিতে লাগিল, রাত্রি—যাহা ঈশ্বরের প্রেরিত রাত্রির মত শান্তি, বিরাম, ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ পূত নিদ্রা বহন করিয়া আনিতে ছিল না!”

কি ভয়ানক শোচনীয় এই ছবি! ভারতের নিদ্রামৌন ঝিল্লিমুখর নক্ষত্রের আলোকপাত মধুর রাত্রির সঙ্গে এই রাত্রির কি প্রভেদ! এই সন্ধ্যা—যখন

“মৌন নভস্থল

ছায়াচ্ছন্ন মৌন বন মৌন জল স্থল
সুস্তিত বিবাদে নম্র! নির্ঝাক নীরব
দাঁড়াইয়। সন্ধ্যা সতী,—নয়ন পল্লব
নত হয়ে ঢাকে তার নয়ন যুগল
অনন্ত আকাশ পূর্ণ অশ্রু ছলছল
করিয়া গোপন। বিবাদের মহাশাস্তি
ক্রান্ত ভুবনের তলে করিছে একান্তে
সাস্তনা পরশ দান।

ক্ষুদ্র নদীতীরে

সুপ্তপ্রায় গ্রাম! পক্ষীরা গিয়াছে নীড়ে
শিশুরা খেলে না, শূন্য মাঠ জনহীন
ঘরে ফেরা শ্রান্ত গাভী গুটি দুই তিন

কুটীর অঙ্গনে বাঁধা, ছবির মতন
সুকপ্রায়। গৃহকার্য হ'ল সমাপন,—
কে ঐ গ্রামের বধু ধরি বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কি জানি
ধূসর সন্ধ্যায়। অমনি নিস্তরু প্রাণে
বসুন্ধরা দিবসের কৰ্ম অবসানে
দিনাস্তের বেড়াটি ধরিয়া আছে চাহি
দিগন্তের পানে, ধীরে যেতেছে প্রবাহি
সম্মুখে আলোক স্রোত অনন্ত অধরে
নিঃশব্দ চরণে, আকাশের দূরান্তরে
একে একে অঙ্ককারে হতেছে বাহির
একেকটি দীপ্ত তারা সুদূর পল্লীর
প্রদীপের মত।

ক্রমে ঘনতর হয়ে
নামে অঙ্ককার, গাঢ়তর নীরবতা,
বিশ্ব পরিবার তাহে মৃত্ত নিশ্চেষ্টন—

ইহার সঙ্গে এই রক্তচকু বহ্নি-শিখা-ক্ষুরিত
কোলাহল হুঃসহ আহ্লাদ ঝঙ্কত ভয়াবহ দৃশ্যে
পরিপূর্ণ সন্ধ্যার কি প্রভেদ! আমাদের এই
পরিদ্র, প্রাচীন, অবজ্ঞাত ভারতবর্ষ! তাহার
এই পার্থক্য কি অপরিমেয়, কি অননুমের্য!
এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও সূক্ষ্মচির

ক্ষেত্রে জগতের অপরাপর জাতির সঙ্গে সমকক্ষ
হইয়া সে না দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু যাহাকে
পাইলে “পুমান সিক্তোভবত্যমৃতী ভবতি
তৃপ্তো ভবতি, যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিৎকতি—”
তাঁহাকে আপনার বক্ষতলে বন্দী করিয়া সে
বিশ্ব সংসার ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার
নির্কৃৎসিতার ক্রুদ্ধ হইয়া সকলে তাঁহাকে
অভিসম্পাত করিতেছে, ব্যঙ্গ করিতেছে,
হাসিতেছে। অভাবের ভিতর তৃপ্ত, ভোগের
ভিতর রিক্ত, সমস্ত কাঠিন্তের ভিতর
আপনার অস্তরের অক্ষয় অমৃত রসধারার সিক্ত
হইয়া ভারতবর্ষ শুধু হাসিয়া বলিতেছে “ঐ
খেলার সীমানা দেখিতেছ? আমি তাহা
ছুঁইয়া পার হইয়া আসিয়াছি, আমার ছুটা
হইয়া গিয়াছে, তোমরা এন, আমার পিছনে
এস! তোমাদের বুড়ি যখন ছোঁওয়া হইয়া
যাইবে তখন আমি পুরোবর্তী থাকিয়া পরম
পরিণামের পথ তোমাদিগকে দেখাইয়া লইয়া
যাইব!

শ্রীআমোদিনী ঘোষজায়া।

সন্ন্যাসী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া চলিয়াছে চঞ্চলা
মধুমতী, আর তার দক্ষিণকূল হইতে নামি-
য়াছে, সোপান শ্রেণীবদ্ধ জীর্ণ ঘাটলা! সেই
প্রস্তর বাঁধা ঘাটলা, কোন্ অতীত যুগের সাক্ষ্য
বহন করিতেছে, তাহা সে মুখ ফুটিয়া বলেনা!
ঘাটলার অদূরে বিগ্রহশূন্য ভগ্ন মন্দির—তার
মাঝে থানিকটা ছাই আর ভস্ম,—কিছু কাঠ,
আর একটা ভাঙ্গা হাঁড়ি,—কবেকার এক

নৌকারোহী অতিথির রন্ধন-আয়োজন
চিহ্ন!

মন্দিরের পাশ দিয়া গ্রামের পথ চলিয়াছে
—তার পাশে পাশে দু'একটা ঝাউ, এক
আধটা আম কাঁঠালের গাছ; সে পথটিকে
শ্রামল ছায়াবৃত করিয়া রাখিয়াছে! পল্লীর
লোক দল বাঁধিয়া সেই পথে ঘাটে আইসে,—
স্নান করে। বালকবালিকারা ঘাটলার

দাঁড়াইয়া মধুমতীর তরঙ্গ দেখে, আর নৌকা গণে ! বধুরা গুণের অন্তরাল হ'তে কোতু-হলী দৃষ্টিতে খোলা মাঠ, নদীর ছকুণ আর মৃহবায়ু কম্পিত হরিৎ ধাতুশীর্ষ দেখিয়া, মধুমতীর মিঠা জলে কলসী ভরিয়া লইয়া, ঘরে ফেরে !

এমনি প্রত্যহই দিন কাটে ! সেদিন সকালে গ্রামাবধূবা কলসী কক্ষে জল লইতে আসিয়া দেখিল, ছাই ঠেলিয়া, কাঠ সরাইয়া, হাঁড়ি ফেলিয়া দিয়া সেই ভগ্নমন্দির কে পরিষ্কার করিয়াছে ! মন্দির মার্জ্জনাগ্ন ভক্ত হস্তে সেবাচিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে ? যুবকেরা আসিয়া দেখিল, সে এক গৈরিক পরিহিত তরুণ সন্ন্যাসী ! অঙ্গ তাহার ভঙ্গপ্রলিপ্ত নহে, শিরে তার জটাভার নাই, তবু দেবাদিদেবেব গ্নায় তাহার কান্তি—প্রভাতা-করণের গ্নায় তাহার অপূর্ব শ্রী ;—মান মন্দিব রূপের আভার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে !

তার সঙ্গে ছোট একটা বীণ ! ভক্ত হস্ত স্পর্শে নে বীণ সায়াছে প্রভাতে বাজিয়া উঠে—আর সেই তরুণ সন্ন্যাসীর মধুরকণ্ঠ নীলা-কাশ প্রাবিত করিয়া বীণের সুরের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধিত হইয়া উঠে । বিহঙ্গ কাকলী ভুলিয়া স্তব্ধ হইয়া সে গান শোনে—মধুমতী সে কণ্ঠ গুনিবার জন্ত ঘাটলার পাথরের উপর আছা-ড়িয়া পড়ে !

বৃদ্ধারা সন্ন্যাসীকে দেখে—মনে করে, ‘আহা কার বাছাগো’ !—অশ্রু আসিয়া তাহাদের দৃষ্টিশক্তি ম্লান করিয়া দেয় ! যুবতীরা দেখে,—ভাবে,—‘কোন্ অভাগীর হৃদয়পিঞ্জর ভাঙ্গা পাখীরে !’—অবগুণের মধ্যে তাহাদের পদচক্কু ককণামুত হইয়া উঠে !

যে বাহার উপহার আনিয়া মন্দিরের ছয়ারে আনিয়া স্তূপ করে—আর সে তাহার পুঁথি নিয়া, বীণ নিয়া, গান নিয়া তন্ময় থাকে ! বৃদ্ধারা শ্রোতার ছাড়া—যেদিন বাহার হাত থেকে সে ছুটা ফল গ্রহণ করে, সে কৃতার্থ হইয়া চলিয়া যায় !—এত প্রেম, এত স্নেহ সঞ্চিত মানুষের হৃদয়ে ;—সন্ন্যাসী মানুষের মুখে ভগবানের প্রতিচ্ছবি দেখে,—আর তাহার নয়নে অশ্রু ফুটিয়া উঠে !

একজন আসে—সে সন্ন্যাসীকে উপহারও দেয়না—কথাও বলেনা ! দিনান্তে সে একবার আসে, ছয়ারে যারা থাকে তারা সম্বমে পথ ছাড়িয়া দেয় ! দরিদ্রের কুটীরে, মধ্যবিস্তের গৃহে, ধনীরা প্রাসাদে, সর্বত্র তাহার অবাধ গতি ! সে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের ক্ষমতাশালিনী কন্যা, যুবকগণের স্নেহশালিনী ভগিনী,—বৃদ্ধিগের সখী, বালক বালিকাগির ক্রীড়াসঙ্গিনী ;—সে জমীদারকন্যা বিধবা জ্যোতির্স্বয়ী !

সন্ন্যাসী প্রতিদিন গ্রামে বাহির হয় ;— শুধু একবাড়ী হতে ভিক্ষা চাহিয়া আনে—মুষ্টিভিক্ষা ! যে গৃহস্থের বাড়ী সে ভিক্ষার জন্ত যায় সে তাহার সর্বস্ব দিতে অগ্রসর হয়—সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া তাহার মন্দিরে ফিরে ! সঙ্গে ছেলের দল—মন্দির পর্য্যন্ত ছোটে—ছয়রের স্তূপীকৃত উপহারগুলি সে এই নগ্নশিশুদের হাতে হাতে আনন্দে বিতরণ করিয়া দেয় ! পরদিন স্নেহের দান আবার মন্দিরের ছয়ারে স্তূপীকৃত হইয়া ওঠে !

অপূর্ব প্রভাশালিনী জ্যোতির্স্বয়ী প্রত্যহ একবার আসে—সে তাহার মৌন স্নিগ্ধ দৃষ্টিদ্বারা মন্দিরবাসীকে কি উপহার নিবেদন করিয়া যায়, কে জানে ? সন্ন্যাসী তাহাকে

দেখে,—ভাবে,—আবার তাহার পুঁথির মধ্যে তন্ময় হইয়া থাকে ! আবার যখন তাহার শাস্ত্রদৃষ্টি উৎসারিত করিয়া চাহে, তখন দেখে জ্যোতিষ্ময়ী—চলিয়া গিয়াছে—আর সেখানে হয়ত দাঁড়াইয়া আছে,—একদৃষ্টে তাহারি দিকে চাহিয়া, একটি চীরপরিহিত রাখাল বালক !

গ্রামে এমন সময়ে একদিন হাহাকার উঠিল—মহামারীতে গ্রাম উৎসন্ন যাইতে বসিল ! পুঁথি বন্ধ করিয়া, বীণ্ ফেলিয়া, সন্ন্যাসী সেই মৃত্যু তরঙ্গের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল ! সেখানে তাহার সহায় মিলিল জ্যোতিষ্ময়ী,—আর সন্ন্যাসীর ডাকে দল বাঁধিয়া আসিল গ্রামের যুবকেরা ! তার পর চলিল পীড়িতের সেবা, পথ্য ও ঔষধ বিতরণ ! —সন্ন্যাসীর আদেশ মত গ্রাম্য যুবকেরা ঔষধ ও পথ্য বিতরণ করে—শবদাহ করে,—কেহ কেহ রোগীর সেবাও করে !

মুমূর্ষুর শিয়রে বীজনরতা জ্যোতিষ্ময়ী,—আর প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে রোগীর তত্ত্বাবধান ও সেবা করিতে ব্যস্ত, তরুণ সন্ন্যাসী ! উভয়েই নীরব, উভয়েই দৃষ্টি পরস্পরের গুণমুগ্ধ,—কৃতজ্ঞতা প্রকাশক ! কি অকুণ্ঠ তৃপ্তি, কি আনন্দ উভয়ের হৃদয়ে !

(২)

সেদিন বীজনরতা জ্যোতিষ্ময়ী দেখিল, কখন রজনীর শেষযাম অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু সে তরুণ সন্ন্যাসী তো সেবা ও শাস্তি লইয়া ফিরিয়া আইসে নাই ! সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া তার যে এখানেই আসিবার কথা ছিল !

সেবানিরতা মাতৃহৃদয়খানি আজি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় ব্যথিত হইয়া উঠিল ! নত

মস্তকে জ্যোতিষ্ময়ী দেখিল প্রভাতের স্নিগ্ধ করস্পর্শে রোগী কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ।— মুখে তার আরাম ও শান্তির চিহ্ন !

তাহার অস্তব বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কি যেন করুণ সঙ্গীতের সুর বাজিয়া উঠিল !— সে যেন সেই চির পরিচিত পুরাতন আবাহন বাণী “ওগো, এস, এস, এস !”

(৩)

পার্শ্বে সুরবাধা বীণ্—মূহূর্ত্তেক পূর্বে বুঝি গায়কের শাস্ত্র করস্পর্শে মূহূর্ত্তক হইয়া উঠিয়াছিল ! আর অদূরে আস্তৃত গৈরিক অঞ্চলোপরি তন্ত্রানিমীলিত নয়নে ও কে ওগো !

জীবন ও মৃত্যুর পুণ্য সন্ধিস্থলে অবস্থিত ; —সেই দীনের বান্ধব, আর্তের সেবক, তরুণ সন্ন্যাসী !

জ্যোতিষ্ময়ী পলকশূন্য নয়নে চাহিয়া চাঁহিয়া দেখিল,—তাহার আননে উচ্ছৃসিত শাস্তির পুণ্যলেখা ! সে তরুণ তাপসমূর্ত্তি জ্যোতিষ্ময়ীর নিমেষহীন নয়নের সন্মুখে দেবতার মূর্ত্তির মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল !

কোন্ পাষণ মন্দিরের অভ্যন্তরে এই দেবতার অধিষ্ঠান ভূমিরে !

সসম্মুখে, ধীরে, অতি ধীরে জ্যোতিষ্ময়ী সেই তরুণ তাপসের চরণ স্পর্শ করিল !— এতটুকু চরণ ধুলির ভিখারিণী সে !

চক্ষু চাহিয়া সন্ন্যাসী দেখিল, কে আসি-
য়াছে !

ইঙ্গিত পাইয়া জ্যোতিষ্ময়ী পুঁথি আর বীণ্ কুড়াইয়া সন্ন্যাসীর হাতের কাছে আনিল ! মূহূর্ত্তে সন্ন্যাসী বলিল,—

“পৃথি—আর বীণ—আমার সর্বস্ব—
তোমাকে দিলাম—আর”—

সেবা, শুশ্রূষার করস্পর্শ করিল!

সন্ন্যাসীর উজ্জল চক্ষু উজ্জলতর হইয়া
ধীরে ধীরে নিশ্চল হইয়া আসিল!

তখন পৃথিবীর কোলাহল তাহার চতুর্দিকে
যেন মূহ সঙ্গীতের মত বাজিতেছিল!—আব
সেই সঙ্গীত গুণনের মধ্যে শ্রামসুন্দরের
চরণনুপুর শব্দ তাহার কাণের কাছে সুস্পষ্ট
হইয়া বাজিয়া উঠিল!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

গুজরাতে অতিথি।

“অতিথির বেশে ঘুরি দেশে দেশে,
কানন কান্তার শৈল লোকাবাসে,
সতত রয়েছ তুমি পরকাশি
স্নেহ মায়া লয়ি আপনা বিকাশি।”

প্রায় চারি বৎসর কাল গুজরাতে
অতিথিরূপে অবস্থান করিয়াছি। দীর্ঘ চারি
বৎসরের স্মৃতি গুজরাতি নরনারীর সৌজন্যে
সমুজ্জল করিয়া রাখিয়াছে।

জীবসেবা গুজরাতে জাতীয় অঙ্গের
একটা শ্রেষ্ঠ দিক; কিন্তু ইহা কালে কালে
মানবসেবা অপেক্ষা বহুলাংশে পশুপক্ষী সেবার
দিকে অধিকতর ধরবেগে প্রবাহিত হইতেছে।

ক্ষুদ্র পিপীলিকা, কীট, পতঙ্গ কুকুর
বিড়াল বানর প্রভৃতির আহাৰ্য্যের সংস্থানের
জন্তুই ইহাদিগকে বিশেষ ব্যগ্র দেখা যায়।
গাঁছের শুঁড়িতে শুঁড়িতে পিপীর জন্তু
গুজরাতির চিনি ফেলিয়া রাখে; কাঠবিড়ালীর
আহারের জন্তু অর্থব্যয়ে স্থানে স্থানে মঞ্চ
নিৰ্ম্মাণ করে; বানরের আহাৰ্য্যের জন্তু বনে
জঙ্গলে প্রভূত পরিমাণ রুটী প্রতিদিন বিতরণ
করিয়া আসে এবং মাছের আহাৰ্য্যের জন্তু
আটা, বাজরী, ‘মুরমুরা’ জলে নিক্ষেপ করে;

আর গৃহে কোন অতিথি উপস্থিত হইলে,
স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলেই তাহাকে স্নেহ
ষঙ্গে অভ্যর্থনা করিয়া লয়। গুজরাত ও
মহারাষ্ট্র ব্যতীত ভারতের সর্বত্রই এ ভাব
বিরল। প্রবাসীর প্রতিও গুজরাতীরা খুব
স্নেহশীল ও অতিথিবৎসল।

গুজরাতে দ্বিতীয় পুলকচঞ্চলদৃশ্য—
গরবা-গান। ইহা গুজরাত জাতীয় জীবনের
অনিন্দ্য আনন্দ উৎস; শরৎ প্রকৃতির নিশ্চল-
নীল আকাশতলে রবিকর বিকীর্ণ শ্রামান্বিত
তরুলতা শয্যের আনন্দ উচ্ছ্বাস পরিব্যাপ্ত
প্রাঙ্গণতলে গুর্জরী রমণীগণের আনন্দ
আবেগ সঙ্গীতস্রোতে দিগ্‌মণ্ডল প্লাবিত করিয়া
তোলে;—এই সময় তাহাদের নওরাত্রি,
দিওয়ালী, দেবদিওয়ালী নববর্ষ প্রারম্ভ ও
শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব। এই উৎসব সময়ে
গুজরাতি রমণীগণের মহিমা-কীর্তন গরবা-
গান সুধার মত সুমন্দ পবনে ছড়াইয়া পড়ে।

সন্ধ্যা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বালবৃদ্ধযুবতী
রমণীগণ সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া
দেবমন্দির প্রাঙ্গণে সম্মিলিত হন; তারপর
একটি দীপশিখা মধ্যস্থলে রাখিয়া করতালি-

তালে দেহ লতা নত করিয়া হুলিতে হুলিতে তাহা প্রদক্ষিণ করিয়া গরবা গান গাহিতে থাকে । তখন যমুনাতীরবিগত—সেই অতীত স্মৃতি,—ব্রজগোপীগণের আবেগ পদকম্পন ঘেন হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করা যায় । সেই সুদূরতম কাল বেন ছায়া বিক্ষেপণকারীগতিতে আসিয়া হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করে,— তাহার সেই সরল বিলাসশ্রীর মধ্যে যে পবিত্রতা ও নিরাকাজ্জ প্রেমতন্ময়তা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আজ স্বপ্নের মত মনে হয় ।

গুর্জরী রমণীর কণ্ঠতল-নিঃসৃত বন্দনা-গীতি কঙ্কণসিঞ্চিত করতাল স্তনিত লহরীর সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপে তালে তালে চলিয়া পড়ে । প্রথমেই উমা মহেশের বন্দনা, রামদীতাজির মহিমা, তৎপর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমতরঙ্গ লীলা তালে তালে মুখরিত হইয়া উঠে । মহারাধা মীরাবাই যে পরাপ্রমে বিগলিত হইয়া গীতাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা গুর্জরী রমণীকণ্ঠে অমিয়ধারা বর্ষণ করে । রাত্রির আঁধার যতই গাঢ় হইয়া আসে স্ত্রীকণ্ঠের আনন্দ উচ্চাস ততই নিবিড় হইয়া উঠে ।

গুজরাতের এই জাতীয় আনন্দ উৎসবের মূলে পরাপ্রেমের আকাজ্জা আছে; প্রবাদ এই,—শ্রীহরি বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া স্ত্রী মূর্তিতে সময় সময় এই গরবা গানে নাচিতে আসেন ।

গুজরাতে এই আনন্দ উৎস—নওরাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া দেবদিওয়ালী পর্য্যন্ত একমাসকাল খুব সঞ্জীবিত থাকে ।

বাজলা দেশ ছাড়াইয়া বেহারে আসিলে স্ত্রী অবরোধ প্রথা একটু লঘু—অযোধ্যা দিল্লী আগ্রাতে একটু বেশী—রাজপুতানার এ প্রথা বহুলাংশে লাবণ হইয়াছে ;

রাজপুতানা ছাড়াইলে মালব, গুজরাত ও মহারাষ্ট্রে রমণীগণের আর্ষ্য স্ত্রী-স্বাধীনতা পূর্ণ বিদ্যমান,—কাজেই গুজরাতি রমণীরা সাহসী বলবান ও নৌষ্ঠবপূর্ণা, তৎসঙ্গে শ্রমশীলা ও নির্ভরপরায়ণা ।

বোম্বাই সুরত প্রভৃতি স্থানের গুজরাতি রমণীরা বেশভূষা ও বিলাস উপকরণের ব্যয়ে কিছু মুক্ত হস্ত । কিন্তু জনসাধারণ গুজরাতের লোক অতি পরিমিতব্যয়ী । তবে বিবাহ শ্রাদ্ধ উৎসবাদিতে তাহারা অনেক সময় এত ব্যয় করে যে অনেককে সেজন্ত নিঃস্ব হইতে দেখা যায় । গুজরাতের পল্লীবাসীরা অধিকাংশই মিতাচারী

গুজরাতের তৃতীয় দৃশ্য—রমণীগণের জল সংগ্রহ । পল্লীগ্রামে বা ছোট সহরে—বেখানে জলের কল বা কোন পুকুরিণী নাই,—প্রায়ই তাহারা মিঠা কুয়ার জল সংগ্রহ করে । প্রতি গ্রামেই একটা না একটা মিঠা জলের কুয়া থাকে ; আবালবৃদ্ধরমণীরা দল বাঁধিয়া সেখানে জল আনিতে যায়—অনেক সময় ২।৩ মাইল দূর হইতেও জল আনিতে হয় ; মস্তকে জলপূর্ণ কলসী—একটীর উপর আর একটা, হস্তে আর একটা কলসী লইয়া অনায়াসে গৃহে ফিরিয়া আসে ।

২৫।৩০ বৎসর পূর্বে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশের পূর্ব পল্লিবাসিনীরাও এইরূপ জল সংগ্রহ করিত । “সই জলকে চল” বলিয়া পরস্পরকে ডাকিয়া সকলে মিলিয়া মিঠা পুকুরের জল আনিতে বাইত । এখন সমস্ত মিঠা পুকুরিণীর জল নল খাগুরার বনে পূর্ণ হইয়া অপানীয় ও দূষিত বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি করিয়া দেশের

লোককে উৎসন্ন দিতেছে। সকলেই সহরে আসিতেছেন আর পল্লিগ্রামগুলি নানা রোগের জন্মভূমি হইতেছে।

গুজরাতের চতুর্থ দৃশ্য—পল্লীগুলি—বঙ্গবাসীর চক্ষে এক অভিনব ব্যাপার। পল্লীগুলিতে প্রাচীন সনাতন প্রথা এখনও বিদ্যমান। পল্লীতে এখনও পঞ্চায়িত নির্বাচিত হয়, তাহার হস্তে পল্লী শাসনের কিছু ক্ষমতাও থাকে। এই পঞ্চায়িত এ দেশী ভাষায় পটেল। মেথর, ধোবা, নাপিত ইত্যাদি সে নিযুক্ত করে; তাহাদের বেতনাদি ও গ্রাম সংস্কারের জন্ত প্রতি গ্রামে একটা অর্থভাণ্ডার থাকে। পল্লীগ্রামের পাঠশালার গুরুমহাশয় ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে পড়ান—কেবলমাত্র মাসে একদিন প্রতি বাড়ী হইতে এক মুষ্টি চাল ডাল সংগ্রহ করেন।

গুজরাতের পঞ্চম দৃশ্য—গুজরাতের তীর্থ-গুলি। মঠের কর্তা বা তীর্থের মোহান্তগুলির অথও প্রতাপ। গুজরাতের অন্ধ ধর্মনিষ্ঠাই

তাহার একমাত্র কারণ। এদেশে মোহান্তেরা ধর্মরাজ্যের সর্বময় কর্তা বলিলেও হয়।

গুজরাতের ষষ্ঠ দৃশ্য,—আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলে অর্থ দত্ত-শোকার্থীগণের আগমন; তাহা বা আসিয়া তালে তালে চীৎকার করিয়া ও ঘন ঘন বুক চাপড়াইয়া দিকুমগুল প্রতিধ্বনিত করিয়া শোক প্রকাশ করিয়া যায়।

গুজরাতের সপ্তম দৃশ্য—অসংখ্য বর্ণবিভাগ; যেমন ৮৪ রকম ব্রাহ্মণ, ৩৬ রকম ক্ষত্রিয় ১২ রকম শূদ্র ৪৬ রকম বেনিরা—ইহার মধ্যেও আবার শাখা প্রশাখা আছে। এই বর্ণের নাম, নাথ। নাথশ্রেণীর মধ্যেও পরস্পর আচার ব্যবহার বিবাহ সম্বন্ধাদি ক্রিয়া কস্ম পর্যন্ত প্রচলিত নাই। যেমন খেরা ব্রাহ্মণ নাথের জল নাগব ব্রাহ্মণ নাথের লোকে পান করিবে না। বর্ণ বৈষম্যের এতদূর অপেক্ষা—“লঘুতর” সমস্ত জগতের কোন জাতির মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

ইয়োরপে সাহিত্য।

অতি অল্পদিনের মধ্যে বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তবে আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডার যতই বৃদ্ধি হউকনা কেন তন্মধ্যস্থ স্তূপীকৃত বিস্তর আবর্জনা রাশি সবেও ইহার গহ্বরদেশ এখনও বহু পরিমাণে শূন্য, এবং এই শূন্যতা পূরণের জন্ত বহু রত্ন সংগ্রহের আবশ্যক।—কিন্তু ইয়োরপের সাহিত্য সম্বন্ধে এরূপ শূন্যতা অপবাদ মোটেই খাটে না। সেখানে রাশি

রাশি গ্রন্থ, ম্যাগ্যাজিন, সংবাদ পত্র জলপ্রবাহ বেগে দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া ছুটিয়াছে। তবু হাহাকারের বিরাম নাই! তফাৎ এই আমরা কাঁদি—অভাবে, তাহারা কাঁদিতেছে আধিক্যে। মানুষের কিছুতে দেখিতেছি সুখ শাস্ত নাই। বলাকার সাহিত্য মূর্তিতে ভীত হইয়া একজন ফরাসী লেখক (Anatole France) বাহা বলিয়াছেন তাহা পড়িলে মনে হয়—তাহার মতে, দ্বিতীয় ওয়ার

ওদেশের প্রধান প্রধান পুস্তকাগারগুলি সব যদি অগ্নিসাৎ করিয়া ফেলে তবেই দেশের মঙ্গল। তিনি বলিতেছেন,—

“পুঁথির পুঞ্জ আমাদের গ্রাস করিতে বসিয়াছে, আমি তাহাদের খুবই ভালবাসি কিন্তু বলিতে কি তাহাদের ভারে আমরা চাপে পড়িয়া মরিতেছি। তাহারা এতই বাড়িয়া উঠিয়াছে যে গণনা করা দুঃসাধ্য—এত রকম হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে মনে করিলে, খতমত ধাইতে হয়। সে কালের লোকদের বইপড়া অভ্যাস ছিলনা—তাঁরা কাজের লোক ছিলেন, ভাল ভাল কাজ করিয়া গিয়াছেন, কেন না বর্ষের অবস্থা হইতে তখন তাঁহারা সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এইরূপ বিনা গ্রন্থে হাজার হাজার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অপচ তখন তাঁহাদের কবিত্ব ছিল, ধর্ম ছিল—সৌন্দর্য্য বোধ ছিল—কবিতা গান এ সমস্ত তাঁহাদের মুখাগ্রে ছিল। দিদিমাদের কাছে সরস গল্প শুনিতে শুনিতে তাঁহারা কল্পনা ছাড়িয়া দিতেন।”

“সে কাল আর এ কাল! এখন এ বিষয়ে আমাদের কি বিষম উন্নতি হইয়াছে! ১৬ হইতে ১৮ শতাব্দী পর্য্যন্ত পুস্তক সংখ্যা কত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আজিকার কালে পুস্তকের ঘেন অস্ত্র নাই। একমাত্র প্যারী নগরীতেই প্রতিদিন ৫০ খানি করিয়া গ্রন্থ বাহির হইতেছে—তাছাড়া সংবাদ পত্রের ত কথাই নাই। কি প্রকাণ্ড কাণ্ড! শেষে আমাদের ক্ষেপাইয়া তুলিবে। আর একটু রক্ষা সংযত করা কি প্রার্থনীয় নহে? বই পড় ক্ষতি নাই কিন্তু ভাল বই বাছিয়া পড়—আমার উপদেশ এই,—তাহা ভিন্ন আর কিছু নয়।”

তিনি আরো বলিতেছেন,

“একদল সাহিত্যব্যবসায়ী উঠিয়াছে তাহাদের মত এই যে ঐতিহাসিক উপকরণ কাগজ পত্র যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাই আগে ছাপান হউক—সে সমস্ত সংগ্রহ করিবার পর ইতিহাস লেখা সুরু কর। তাঁদের কথামত কাজ করিতে গেলে দু তিন শত বৎসর চলিয়া যায়। প্যারীর ম্যুনি’সপাল সভা এইরূপ অজ্ঞাতপূর্ব লেখা সকল ছাপাইবার আদেশ দিয়াছেন এবং সেই কাজ এক্ষণে বিলক্ষণ দ্রুতবেগে চলিতেছে। মঁস্তো তুর্গো এই কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। সে কার্যভার এরূপ গুরুতর যে তাহাতে পূর্ব-কার শ্রমশীল মঙ্কেরাও হস্তক্ষেপ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন সন্দেহ নাই। যাহা হইতেছে খুবই ভাল। কিন্তু আর সমস্ত বিষয় রাখিয়া শুধু করাসা বিপ্লবের বিষয় ভাবিয়া দেখ। যখন দেখি যে ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধীয় কাগজ পত্র যাহা ইতি মধ্যে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা ৫০০০০ এবং যাহা এখনো ছাপানো হয় নাই তাহা আরো অধিক সংখ্যক, তখন ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস আমরা যে কখনও আয়ত্ত করিতে পারিব সে আশা ছাড়িয়া দিতে হয়। এই কথা হইতে একটা গল্প মনে পড়িল তাহা তোমাদের বলি :—

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জেব শিষ্য পারশু যুবরাজ যখন সিংহাসনে আরুঢ় হইলেন তখন তিনি রাজ্যের সমস্ত মৌলবীদিগের ডাকাইয়া বলিলেন,—

“গুরুজি জেন আমার এই উপদেশ দিয়াছেন যে রাজা যদি অতীতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাজকার্য্য নির্বাহ করিতে পারেন তবে রাজ্যে

সর্বপ্রকার মঙ্গল হয়,—নহিলে তাঁহাদের নানা ভ্রমপ্রমাদে পড়িয়া অশেষ দুর্গতি হইবার সম্ভাবনা। এই হেতু আমি এই পৃথিবীর জনপদের ইতিহাস শিথিতে ইচ্ছা করি। তোমরা এই সার্বজনীন ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া আমাকে জানাইতে চাও। সেই ইতিহাস যাহাতে সর্বাবয়ব সম্পূর্ণ হয় তাহাতে তোমাদের যত্নের যেন কিছুমাত্র ক্রটি না হয় এই আমার আদেশ।”

পণ্ডিতেরা রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রাজদরবার হইতে বিদায় লইলেন। সেখান হইতে গৃহে ফিরিয়াই প্রত্যেকে আপন আপন কার্য্য আবস্ত করিলেন। ৩০ বৎসর পরে তাঁহারা পুনরায় রাজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে দ্বাদশ উষ্ট্র গ্রন্থভার বহন করিয়া চলিয়াছে—প্রত্যেকের পৃষ্ঠে ৫০০ পুস্তক। সভাপণ্ডিত রাজসিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রাজাকে অভিবাদন পুরঃসর নিবেদন করিলেন --

“মহারাজ আপনার আজ্ঞানুসারে মৌলবীগণ যে সার্বজনিক ইতিহাস রচনা করিয়াছেন তাহা মহারাজের শ্রীচরণে সমর্পণ করিতে তাঁহারা সমাগত। এই বিরাট পুস্তক ৬০০০ খণ্ডে বিভক্ত—লোকাচার, রাজনীতি, শাসন তন্ত্র, মনুষ্য-সমাজ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা আবশ্যিক তাহা সকলি সংগ্রহ করিতে আমরা কিছুমাত্র ক্রটি করি নাই। প্রাচীন ইতিহাস যত পাওয়া যায় তাহার মধ্যে সকলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তদ্বিন্ন ভূগোল, খগোল, পদার্থ বিজ্ঞা, রসায়ন শাস্ত্র প্রভৃতি আয়ত্ত করিবার জন্ত যত প্রকার টিপ্পনী আবশ্যিক তাহা দেওয়া আছে। সুচী অনূক্র-

মণিকাই এত বিস্তৃত যে তাহাদের বোঝাই ছই উষ্ট্র বহন করিয়া আনিতেছে।”

রাজা উত্তর করিলেন—

তোমরা যে এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আমার এই আজ্ঞা পালন করিয়াছ তাহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি কিন্তু এক্ষণে আমার হাতে রাজকার্য্য বিস্তর আর তোমরা এত বৎসর ধরিয়া যে লেখা সংগ্রহ করিয়াছ তাহাতে আমার বয়সও বাড়িয়া গিয়াছে। আমি এক্ষণে মধ্যবয়স উত্তীর্ণ করিয়াছি, এই সুদীর্ঘ ইতিহাস পড়িয়া শেষ করিতে না করিতেই আমার আয়ু শেষ হইয়া যাইবে। অতএব আমার অনুরোধ এই যে, ইহার সংক্ষিপ্তসার লিখিয়া আমার কাছে লইয়া আসিবে, তবেই আমি আমার জীবদ্দশায় তাহা পড়িয়া উঠিতে পারিব।”

পারশুর মৌলবীগণ ২০ বৎসর ধরিয়া এই কার্য্য করিয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া ১৫০০ গ্রন্থাবলী রাজার কাছে আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

তাঁহাদের অগ্রণী কাজী সাহেব অগ্রসর হইয়া বলিলেন, মহারাজ এই আমাদের নূতন রচনা দর্শন করুন। ইহার মধ্যে সার্বজনিক ইতিহাসের সারকথা সমস্তই রক্ষিত হইয়াছে।

রাজা কহিলেন,

তুমি যাহা বলিতেছ সকলি সত্য কিন্তু আমার পড়িবার অবকাশ নাই। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। এই বয়সে এই দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়িয়া উঠিতে পারিব না। আরো সংক্ষেপ করিয়া আন, বিলম্ব করিও না।

তাঁহারা আর অধিক বিলম্ব না করিয়া ১০ বৎসর পরে পুনরায় রাজদরবারে উপস্থিত

হইলেন। পুস্তকখানি ৫০০ কাণ্ডে বিরচিত, একটা উটের বোঝা মাত্র।

কাজি নিবেদন করিলেন “মহারাজ যেমন অমুমতি করিয়াছেন আমরা তেমনি সংক্ষেপে সারিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি।

রাজা—“সত্য বটে কিন্তু আমি যেমন চাই তেমনটি হয় নাই। এখন আমি আমার জীবনের শেষ দশায় পৌঁছিয়াছি। তোমরা যদি চাও যে আমি পৃথিবীর ইতিবৃত্ত কিছু জানিতে পারিয়া তদনুসারে কাজ করি, তাহা হইলে আরো ছাঁটিয়া সংক্ষেপ করিয়া আনিতে হইবে।”

পাঁচ বৎসর পরে কাজী সাহেব পুনরায় রাজপ্রাসাদে আসিয়া হাজির। এক ষষ্টির উপর ভর দিয়া একটি গাধার রাসরজ্জু ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। গাধার পীঠে মহাভারতের মত একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক।

মন্ত্রী ডাকিয়া বলিলেন—কাজি সাহেব

একটু তাড়া করুন মহারাজ মৃত্যু শয্যায় কাতর আছেন।

সত্য সত্যই রাজা মৃত্যু শয্যায় শয়ান। তিনি সেই গ্রন্থের দিকে ক্ষীণ দৃষ্টি দিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন “পৃথিবীর ইতিহাস না দেখিয়াই আমি পৃথিবী ছাড়িয়া চলিলাম।” কাজিও সেই সময় রাজার স্ত্রীর মুমূর্ষুভাবাপন্ন। বলিলেন, “আমি তিন কথায় পৃথিবীর ইতিবৃত্ত নিবেদন করি মহারাজ শ্রবণ করুন।”

রাজা—বল আমি শুনিয়া বিদায় হই।

কাজী—

১ জন্ম। ২ সুখদুঃখ ভোগ। ৩ মৃত্যু ও পরলোক যাত্রা।

আমি সংক্ষেপে মনুষ্য জীবনের সমুদায় ব্যাপার মহারাজের কর্ণগোচর করিলাম।

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পারি-
‘তোষিক অমুমতি করিলেন ও কিয়ৎকণ
পরেই সুখনিদ্রায় দেহত্যাগ করিলেন।

শ্রীমতৌক্তনাথ ঠাকুর।

ব্রহ্মপুত্রে উমানন্দ

অবিশ্রান্ত ধারাবাহী বর্ষা মাথায় করিয়া বিগত ১৩১৫ সনের ১২ই জ্যৈষ্ঠ পূর্বাহ্ন ১১টার সময় কর্ষস্থল শিলং রওয়ানা হই। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের হিলসেকুসনের অপূর্ব ইঞ্জিনিয়ারিং কোশল ও চতুর্দিকের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য সন্দর্শনের সুযোগ হইবে বলিয়া নারায়ণগঞ্জ হইতে ষ্টিমারে চাঁদপুর আসি। বদরপুর ছাড়াইয়া আসিলেই

‘হিল সেকুসনে উপস্থিত হইতে হয়। এসব স্থানে পাহাড়ের গা’ দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া রেল চলিয়াছে,—দুই দিকে পর্বতশ্রেণী বিশাল নগ্নদেহ ধারণ করিয়া অনন্তকাল হইতে পৃথিবীর এক অজ্ঞাত অধ্যায়ের সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। এই সকল শ্রামায়মান স্নিগ্ধদর্শন বৃক্ষবহুল পাহাড়ের গাত্র হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রোতস্বতীগুলি উদ্ভাস্ত

মধুরিমাময়ী চঞ্চলা বালিকার মত সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া হেলিয়া ছলিয়া আপন মনে চলিয়াছে। বৃষ্টিপাতেই তাহারা উদ্দাম উচ্ছ্বাসে কল গান গাহিয়া বনভূমি মুখরিত করিতে করিতে আপনাদের সজীবতা নিবেদন করে। কোনও স্থানে নিবিড় পত্রাচ্ছাদিত শাল্মলী বৃক্ষে বসিয়া কলকণ্ঠ বিহগকুল তাহাদের সুললিত গীতধ্বনিতে সেস্থান নিয়ত মুখরিত করিতেছে। সে গান কত মধু ও ভাবোদ্দীপক !

বদরপুর ছাড়িয়াই আমরা ১নং টানেল (সুরঙ্গ) প্রবেশ করি। রাস্তা সংক্ষেপ করিবার জন্তই বড় বড় পাহাড়ের ভিতর বহু অর্থব্যয়ে ও সুকৌশলে ডিনামাইট দ্বারা পাথর ও মাটি খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া এই সুরঙ্গ গুপ্তি নির্মিত হইয়াছে। সুরঙ্গের ভিতর গাড়ি প্রবেশ করিলে কিছুই দেখা যায় না, কেবলি পুঞ্জীভূত অন্ধকার! তখন মনে হয় আমরা কোন পাতালপুরীতে আসিয়াছি, আর বুঝি আলো দেখিতে পাইব না। পূর্বে কখনও টানেল দেখি নাই, এই বেলপথে ৩২টী টানেল। মাত্র টানেল সর্বাপেক্ষা বড়, ইহার ভিতর দিয়া গাড়ী বাহিরে আসিতে দুই মিনিট লাগে। দুপুর ১-৩৯ মিনিটের সময় এই সুরঙ্গে প্রবেশ করিয়া ১-৪১ মিনিটের সময় বাহির হইয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার সময় লামডিংএ গাড়ী বদল করিয়া রাত্রি ২টার কিছু পূর্বে আসাম অঞ্চলের প্রধান হিন্দুতীর্থ গোহাটিতে পৌঁছিলাম। সে সময়ে খুব বৃষ্টি হইতেছিল। মেল টোঙ্গার স্থান হইল না বলিয়া সে রাত্রে শিলং যাওয়া বন্ধ হইল। এবং পূর্ক হইতে টোঙ্গা কি

মোটরে স্থান রিজার্ভ করি নাই বলিয়া পরদিনও গোহাটিতেই অপেক্ষা করিতে হইল।

এই অবকাশে আমি ব্রহ্মপুত্রেব মাঝখানে অবস্থিত 'উমানন্দ' দর্শনে রওয়ানা হইলাম। কতকাল হইতে উমানন্দ-মন্দির ব্রহ্মপুত্রেব স্রোতমুখে পাহাড়ের শীর্ষদেশে দাঁড়াইয়া আছে কে বলিবে? এমন সুন্দর সুমোহন দৃশ্য সংসারে দুর্লভ! ব্রহ্মপুত্রেব স্রোতমুখে তিনটী ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের নাম কর্মনাশা, উর্ষনী ও উমানন্দ। কোন হিন্দুই ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া কর্মনাশার দিকে ফিরিয়া চাহিবে না। তাহাদের বিশ্বাস, ভুলেও যদি কেহ স্নানাশ্ত্রে কর্মনাশা দর্শন করে, তবে তাহাদের সেদিনের কোন কোন কাঁর্যাই সফল প্রসূ হইবে না। পুরাণে কথিত আছে, মহাদেবের কপালের বিভূতি হইতে উমানন্দের উৎপত্তি। জনশ্রুতি এই, শাস্তিনিকেতনে শিব "যোগিনী-তন্ত্র" অর্থাৎ আসামের ইতিহাস উমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। উমানন্দের দিকে চাহিলে মনে হয়, কোমল-কঠোরে মিশ্রিত এই পাষণ দেবমূর্তি প্রকৃতি মাথের স্নেহাঞ্চলে ঢাকা তাহার মন্দিরের সুমাময় পবিত্র চিত্রখানিকে অনাদিকাল হইতে মূর্তিমতী ভক্তির ধারায় হিন্দুর প্রাণ অভিসিক্ত করিতেছে। প্রকৃতি দেবীর স্বহস্ত সজ্জিত এই দেবমন্দির— অদূরে হিন্দুর গৌরব-মহিমাময়ী সতীর প্রিয়-ভূমি বিখ্যাত কামাখ্যা শৈল, আর পুণ্য পাদমূলে প্রবাহিত অমোঘা-গর্ভ-সমুত ব্রহ্মপুত্র নদ—এ সব পবিত্র দৃশ্য জীবনে ভুলিবার নয়।

ব্রহ্মপুত্রেব ধার দিয়া সুন্দর ট্র্যাণ্ড রোড চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা ধরিয়া পূর্কদিকে

কিছু অগ্রসর হইয়া নদের চড়ায় নামিয়া
ষ্টিমার ষ্টেসনের দিকে নৌকার অনুসন্ধানে
চলিলাম। শুনিলাম কিছুদিন পূর্বে পদব্রজেই
যাত্রীরা উমানন্দ পাহাড়ে যাইত, এখন
বর্ষার প্রারম্ভ বলিয়া শ্রোতের জল অনেক

বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাই নৌকা না হইলে
আর পাহাড়ে যাওয়া যায় না। ষ্টিমার
ঘাটে নৌকা ভাড়া করিতে অসমর্থ
হইয়া পাহাড়ের বিপরীত দিকে খেয়ার
প্রতীক্ষায় উৎসুক চিত্তে দাঁড়াইরা রহিলাম।



উমানন্দমন্দির ।

এই সময় পর পার হইতে একখানা ডিম্বি
নৌকা চারিটি লোক সহ আমার নিকটে
আসিল! আমি তাহাতে চড়িয়া লইলাম।

অল্পক্ষণেই তরঙ্গায়িত ধরশ্রোত নৌকা-
খানিতে দ্রুতবেগে পাহাড়ের পাদদেশে

আনিয়া ফেলিল। শ্রোতে নৌকাখানিকে
ভাটির দিকে লইয়া যাইবে ভয়ে
মাঝি নৌকার অর্ধেকখানি টানিয়া চড়ার
উপর রাখিয়া দিল। আমি জুতা, ছাতা
নৌকাতেই রাখিয়া মাঝির সহিত তীরে

অবতরণ করিলাম এবং সিঁড়ি বাহিয়া উমানন্দ পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। সিঁড়ির দুই ধারে পাহাড়ের গায় স্থানে স্থানে সিন্দুর-রাগ-রঞ্জিত খোদাই হিন্দুদেবদেবী মূর্তি শোভা পাইতেছে। ব্রহ্মপুত্র চূষিত শৈলমালার দিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কথঞ্চিৎ শ্রান্তদেহে আমরা মন্দিরের বাহিবে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে একজন পুরোহিত প্রভু আসিয়া দর্শন দিলেন।

দূর হইতে পাহাড়ের শীর্ষভাগে জাহাজের মাস্তুলের মত একটা উচ্চ স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। উপরে আসিয়া দেখিলাম এই বিশাল স্তম্ভের উপর গবর্ণমেন্টেব টেলিগ্রাফেব তার দুই দিকে সংযুক্ত রহিয়াছে। নগ্নদেহ পুরোহিত প্রভুর সঙ্গে আমরা মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। বর্তমান মন্দিরের অধিকাংশই ইট দিয়া গ্রথিত। চারিদিকেব ভগ্ন প্রস্তর দেখিয়া মনে হয় এই মন্দির পূর্বে প্রস্তর নির্মিত ছিল। সম্ভবতঃ গদাধর সিংহেব রাজত্বের সময় প্রাচীন মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের কারুকাম্য খুব উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। মন্দিরের পুরোভাগে একটা নাটনন্দির আছে। সেখানে প্রবেশ করিয়া প্রতিনিধি শিবলিঙ্গ মূর্তি দর্শন করিলাম। এ সময়ে পাণ্ডা ঠাকুর 'বাবা উমানন্দ' দর্শনে 'দর্শনীর' চুক্তি প্রস্তাব করিয়া বলিলেন, "কাঞ্চনমুদ্রার অভাবে রজতমুদ্রা না হইলে মন্দির গর্ভস্থ ভৈরবদর্শন সম্ভবপর নয়।"

এস্থলে কামাখ্যার হিন্দুমন্দির সংরক্ষণী সভার (যদি উপরোক্ত নামে কোনও সভাসমিতি থাকে) সভ্যদিগকে আমাদের সাহসনয় নিবেদন, তাঁহারা পাণ্ডা প্রভুদের অগ্রায়

আক্রমণ হইতে যাত্রীদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত একটা উপায় করুন। যাহা হউক, পুরোহিতের জাগাতন অসহ্য হইলেও সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ রূপে তাহা সহ্য করিয়া লইয়া আমরা সিঁড়ি দিয়া মন্দিরস্থ গুহার আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মন্দিরের এই অংশ ব্রহ্মপুত্রের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। মন্দিরগর্ভ অন্ধকারময়; সেই গুহার ভীষণ আধারের ভিতর একটা ক্ষুদ্র ঘতপাত্রে দীপ শিখা আলোক বিতরণ করিতেছে, এখানে লিঙ্গরূপী উমানন্দ ভৈরব জল হইতে প্রস্তর ভেদ করিয়া উন্নাদিকে উখিত। জগতের কারণ এই মিত্র ও বিরাত মূর্তি দেখিলে ভয় ও ভক্তিতে মস্তক আপনা আপন অবনত হইয়া আসে। আমরা ভূমিতে লুটাইয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

সহসা শিবের ডানদিকে কিসের একটা ফোঁ ফোঁ শব্দ শুনিতে পাইলাম। প্রশ্ন করিলে পাণ্ডাঠাকুর বলিলেন, "ইহা সাপের ডাক।" উমানন্দের সেই সৌম্য দিব্যমূর্তি দর্শনের পর পুনর্বার আমরা নৌকারোহণে সন্নিকটস্থ "উর্কশীকুণ্ডে" অবতরণ করিলাম। কথিত আছে, এই কুণ্ডে স্বর্গের আমরা উর্কশী স্নান করিয়াছিলেন। এখন আর সেই কুণ্ড অথবা কুণ্ডের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। বর্ষাগমে উর্কশীকুণ্ড জলে ডুবিয়া যায়। শীমার রক্ষা করিবার জন্ত এই ময়নৈলের উপর একটা স্তম্ভ স্থাপন করা হইয়াছে। এইখানে নানা দেবদেবীর ও বুদ্ধদেবের ধ্যানস্থ দুই একটা মূর্তিও দেখিতে পাইলাম। পদ্মাসনে উপবিষ্ট

সে মূর্তির নয়নে ও অধরে নিষ্ক প্রণামভাব
বিরাজমান । তথায় শিগার উপর শুইয়া
একবার ভৈরব উমানন্দের মন্দির ও আর
একবার কামাখ্যা পাগাড়ের নীরব
সৌন্দর্যের দিকে পুনঃ পুনঃ সতৃষ্ণনয়নে
দৃষ্টিপাত করিলাম । ব্রহ্মপুত্রস্থিত উর্ধ্বশী-
কুণ্ডের শিগাতলে শুইয়া স্বভাবের অনির্দমনীয়

সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিয়া যে সুখ ও আনন্দ
হয়, তাহা মানব-ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব ।
ক্ষণকালের জন্ত এই বিশাল সৌন্দর্য্যের রাজ্যে
আপনাকে যেন হারাইয়া ফেলিলাম । তখন
কে যেন বলিয়া গেল, 'এই সৌন্দর্য্যের চির-
উপাসনাই ব্রহ্মভক্তি । এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মের
সত্তা উপগন্ধি কেহ কখনও করিয়াছে কি ?

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

পোষ্যপুত্র ।

৪০

দিল্লীর জুম্মা মসজিদ হুর্গ প্রভৃতি দর্শনীয়
স্থান সকল খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখা হইয়া গেলে
চারদিনের দিন বীরেশ্বর নীরদকে মুক্তি দিয়া
বলিল “এবার ফেরা যেতে পারে, আর
তোমার ধরে রাখবো না ।” শুনিয়া নীরদ
যেমন উচিত ছিল সে পরিমাণে ধুসী হইতে
তো পারিলই না বরং একটু যেন বিমর্ষ
হইয়া পড়িল ? কোথায় যাইবে সে ? স্থিতিতে
তাহার শাস্তি কোথায় ?

সন্ধ্যার সময় আকাশের বিচিত্র শোভা
যমুনার বক্ষে উদ্ভাসিত হইতেছিল । কূলে
কূলে পরিপূর্ণা নদী সন্ধ্যারাগরঞ্জিত বক্ষময়
গগনছবি আনন্দে নাচাইতেছিলেন । মৃহমন্দ
বাতাসে জল পুলককম্পিত ও মৃহতরঙ্গিত হইয়া
অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে অলক্ষ্যে পরিবর্তন
আনিয়া দিতেছিল । নদীবক্ষে একখানি
নৌকা স্রোতে ছাড়িয়া দিয়া ধীর
গাহিতেছিল “দিন চলিয়া গিয়াছে সম্মুখে
গভীর রজনী সমাগত যাত্রীর দল চলিয়া গেল ।

এখনও ওরে মৃত ! ওরে ব্রাহ্ম ! পশ্চাতে
ফিরিয়া কাহার পানে চাহিতেছিস ?” নীরদ
তাহাদের অন্নদিনের বাসাটির একতল
বারান্দায় একা দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিল ।
যে চলিয়া গিয়াছে তাহার সঙ্গ তো একদিনও
তাহার ইঙ্গিত প্রার্থিত ছিল না ? হায় ! তবু
সে অভাগিনী তাহারি প্রতীক্ষার অবশেষে ম্লান
বিশ্ব হইয়া মাটিতে ঝরিয়া পড়িয়াছে ! শুধু
যদি নীরদ দুদিন আগে আসিত ! তবে এখন
আর কেন তাহার অঙ্গুসরণে ছুটিয়া ফিরা ?
না কিছু প্রয়োজন নাই, যা ছিল না তা নাইবা
থাকিল ! লঘুচিত্তে মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গের মত সে
তাহার স্বহস্তরচিত কানন পাদপছায়ায়
নিঃসঙ্কোচে ফিরিয়া যাইবে । কোনও লজ্জা
আর তাহাকে পীড়িত করিবে না, অলক্ষ্য
উপহাস বিদ্ভাৎ ক্ষুরিত হইয়া হৃদয়ের
নিভৃতপ্রান্ত হইতে আকর্ণ কপোল রঞ্জিত
করিয়া তুলিবে না, জগতের একটিমাত্র
প্রাণী ভিন্ন এতবড় একটা কলঙ্কের কাহিনী,
কাপুরুষতার ইতিহাস জগৎ হইতে চিরবিস্মৃতির

সমাধিগর্ভে লীন হইয়া গেল, উঃ কি মুক্তি দিলে তুমি শিবানী ! নীরদ উর্দ্ধনেত্রে আকাশে চাহিয়া কাহার উদ্দেশে যেন তাহার কৃতজ্ঞতা প্রেরণ করিল ।

কিন্তু পরক্ষণেই যেন চিত্তের লঘুতা একেবারে লঘুতর হইয়া ক্রমে শূন্য হইয়া আসিল । সে যে তাহাকে বিদায় দিল তবে কাহাকে সেখানে স্থাপন করিবে ? এত দিন তো তাহার স্মৃতিও কষাঘাতের মতনই যজ্ঞগার ছিল । ইহাকে তো সে দূরে ঠেলিয়াই ফেলিতে গিয়াছে ; কখনও ত করুণা কটাক্ষে কাছে টানিয়া লয় নাই ! আজ কি ইন্দ্রজাল মায়ায় সেই অনাদৃত স্মৃতি তাহার গোপন সৌন্দর্য্যরাশি প্রকাশ করিয়া শত প্রলোভনে তাহারই দিকে সবলে তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে । আজ সংঘমসংঘত চিত্তের শতচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া মনের ভিতর পুঞ্জীকৃত অনুশোচনা তীক্ষ্ণ ছোরার মতন বিধিয়া তিরস্কার করিয়া বলিতেছে, সব বৃথা ! সব শূন্য ! বৃথা এতদিন নষ্ট করিলি, চিরদিনই নষ্ট করিলি !” সত্যই সে চিরদিনই নিজের সম্বন্ধে নিজে অন্ধ, কোনদিনই আপনাকে চিনিল না ।

আজ রাজরাজেশ্রীণীর মহিমায় সেই সংঘতবাকু রুদ্ধপ্রকৃতি দীনহীনা বালিকা তাহার নিজের অধিকার মধ্যে সগর্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে । আজ আর তাহার সেই কৃষ্ণ তারকোজ্জল বিশাল চক্রে ভিক্ষার আবেদন নাই, মৌন দৃঢ়বদ্ধ অধর প্রান্তে, নিবিড় ছায়া ফেলিয়া অভিমানের হতাশা স্থির হইয়া দাঁড়ায় নাই, দীপ্তিময়ী রমণী তাহার আলোকপ্রদীপ অথচ স্নিগ্ধ

দৃষ্টি স্থির রাখিয়া নিজের পরিপূর্ণ গৌরবে পঙ্কীর আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে । কোথাও যেন তাহার কোন একটু অসম্পূর্ণতা নাই । নীরদের সর্কশরীর পুলকে বিন্ময়ে স্পন্দিত হইতে লাগিল, মুদিতনেত্রে স্তম্ভিতবন্ধে স্বপ্নাভিত্বের মত সে আপনা আপনি বলিল “এসো তুমি ! সতী ! পুণ্যবতী ! সহধর্ম্মিণী ! হৃদয় আসনে অধিষ্ঠিত হও ।”

ষ্টেশনে পৌছিয়া টিকিট কিনিবার সময় নীরদ বলিল, “এসো বেনারসের টিকিট কিনি” । বীরেশ্বর হঠাৎ বিস্মিত হইল কহিল “কখন তোমার কি খেয়াল যাচ্ছে ! প্রথমে তো দিল্লী যেতেই নারাজ ! এখন আবার ফিরতেই চাও না । তা যাহোক যাবেতো চলো আমার কোন আপত্তি নেই । কালীতে আমার মাসিমা আছেন, সেখানে বেশ দুদিন থাকা যেতে পারবে ! তাছাড়া যাচ্চিতো কটা দিন থেকে কংগ্রেসটাও দেখে আসা যাবে ।” নীরদ জিজ্ঞাসা করিল “তোমার দুটী কদিনের ?” বীরেশ্বর কহিল “বোধ হয় চিরদিনেরি । আমার আর পোষাচ্ছে না সেখানে, কলকাতায় ফিরে যদি কোথাও একটা সুবিধে করতে পারি তো আর নাবালকের মোসাম্বেরী করতে যাচ্চিনে ।” টিকিট কাশীরই কেনা হইল । প্ল্যাটফর্মে লোক বেশি ছিল না, হুজনে বেঞ্চে আসিয়া বসিলে নীরদ জিজ্ঞাসা করিল “কত পাও ওখানে ?” বীরেশ্বর শালখানা ভাল করিয়া গারে টানিয়া দিয়া কাসির একটা পিল পকেট হইতে বাহির করিয়া মুখে দিয়া বলিল “তা মন্দ দেয় না । দেড়শো টাকা মাইনে তা ছাড়া বাড়ী” “তবে হঠাৎ ছাড়বে যে ?” “কি

করি বলোনা, ও রকম হস্তিমূৰ্খ ছেলেকে পড়ানোর চেয়ে সপরিবারে না খেয়ে মরাও ভাল। তাকে আবার কিছু বলবারও যো নেই; একদিন রাজকুমারকে একটু ধমক দিয়ে ছিলুম অমনি হৃদিক থেকে দু বেটা মোসাহেব ছুটে এসে তার মাথায় খানিকটা ফুলোন তেল খাবড়ে হাওয়া করতে আরম্ভ করলে। পাছে ধমক খেয়ে ছেলে মূৰ্খা যায়! শোন কথাটা! এখানেই শেষ না। বিকেলবেলা গিয়ে শুনলুম আমার ধমকে বাবুয়াজীর জিউ ঘবড়ে গেছে, আজ রাণীজী তাই তাকে পড়তে আসতে দিতে পার্কেন না। এই ত ব্যাপার! তুমিই বল না এমন চাকরী করা কি পোষায়?" ঘণ্টা পড়িল ও গাড়ী হস হস শব্দে নিকটবর্তী হইতে লাগিল। নীরদ একটু ইতস্তত করিয়া কহিল "আমার স্কুলে কিছু পারিশ্রমিক কম! কি করে তাতে পোষাবে?" বীরেশ্বর সেন বর্তাইয়া গেল, "আঃ তা হলে তো ভালই হয়, তুমি ত ৫০ টাকা দাও বলছিলে? তাতেই কোনরকমে চলে যাবে এখন। গিন্নিও কিছু তাঁর পৈতৃক ধন পেয়েছেন। সম্প্রতি বলচেন ব্যবসা করতে, তা তোমার সঙ্গে থাকি ত বিলিতি জিনিষ আর ব্যবহার কর্কোনা তা বলেই রাখি! আর গায়ত্রী স্কোটেজ্যেও ক্রমে ক্রমে শিখবো এখন।" নীরদ আবেগেব সহিত তাকে আলিঙ্গন করিল।

৪১

বর্ষার বাতাস হুহু করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। মেঘে এখনও আকাশ ভরা। বুপ্ বুপ্ করিয়া বৃষ্টিরও যেন কয়দিন ধরিয়া বিরাম নাই। এক পা কাদা মাথিয়া

ছাতা বা তালপাতার টোকা মাথায় দিয়া পথিকেরা পথে চলিতেছিল। রাস্তার ওপারে মুদির দোকানে বিলাতি কঞ্চল গায়ে বুড়া দোকানী, কারিগরকে বেগুনির জন্ত ডাল ফেনাইতে উপদেশ দিতেছিল ও মধ্যে মধ্যে খেলো ছকার কলাপাতার নলে টান দিতে দিতে খাঁচায় পোষা ময়নাটিকে সীতারাম 'বুলি শিক্ষা দিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। শীতে ও বাদলায় পক্ষীশিশু একেবারে অক্ষুটনাক হইয়া গিয়াছে। সঙ্কীর্ণ গলিপথ,—হ একখানা গোরুর গাড়ি কেবোসিনের টিন বোঝাই লইয়া বলাইচন্দ্র শীলের আড়তের দিকে অত্যন্ত অনিচ্ছুক মস্তক গমনে চলিয়াছে; তাহাদেরি চক্রমথিত কর্দমে পাশের ইষ্টক প্রাচীরগুলি চিত্র বিচিত্র হইয়া উঠিতেছিল।

সেই অপ্রশস্ত পথের ধাবের ক্ষুদ্র একখানা বাড়ির মধ্যে রাস্তার ধারের একটি একতল ক্ষুদ্র গৃহের খোলা জানালার নিকট বসিয়া একটি রমণী সেলাই করিতেছিল। ঘরখানি ক্ষুদ্র, ঘরের আসবাব পত্রও তেমনি সামান্ত,—দেখিলে দরিদ্রের গৃহ বলিয়াই মনে হয়।

রমণী কোলের উপর সেলাইটা রাখিয়া কিছুক্ষণ কার্য্য করিতেছে আবার অল্পপরেই যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া তাহা পরিত্যাগ পূর্বক জানালার বাহিরে রাস্তার দিকে চকিত-দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছে, মধ্যে মধ্যে জানালার কপাটে পিঠ রাখিয়া চক্ষুদ্রিত করিয়া ক্লাস্তিদূর করিয়া লইতেছে।

কুমপক্ষেব কীংজ্যোৎস্নার মত শীত রাত্রির কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন পাণ্ডুচন্দ্রের স্তায় বিবর্ণা এই অপরিচিতা নারীই যে শাস্তি তাহা তাহাকে দেখিলে সহসা কেহই বিখাগ করিতে

পারে না। সুবিধা এইটুকু যে এখানে এই দীর্ঘদিনের মধ্যে কোন একটি পরিচিত লোকের সহিত ইহার সাক্ষাৎ ছিলনা। তাহার স্বামী সেই যে তাহাকে তাহার সকল আশ্রয় সকল আনন্দ সকল গৌরব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়া স্বামীত্বের সমস্ত দাবী পরিশোধ করিয়া দিয়াছে সেই পর্য্যন্তই এই নিরানন্দ নির্বাসনে সে বন্দি। সেই পর্য্যন্তই জগতের সমস্ত আশা আনন্দের আলোক যেন তাহার সম্মুখ হইতে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যাস্তের পর গোধূলীর স্নান আভাটুকু সন্ধ্যার শ্রামাকালে নিঃশেষে মিলাইয়া আসিবার পূর্ক্বে যেন তাহা বিষণ্ণ কাতরতার সহিত এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া ধরণীর পানে চাহিয়া দেখে, বিগত দিবসের সুখস্মৃতির পানে শান্তিরও বর্তমান জীবন তেমনিই যেন অবসানোন্মুখ স্নান দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল। এই পথ দিয়া দিনের মধ্যে একটবার করিয়া লালপাগড়ীপরা ডাকের পিয়ন স্বচ্ছবিগম্বিত চামড়ার ব্যাগ হুলাইয়া ‘চিঠি আছে’ হাঁক দিয়া ছ একটা ঘরে আসিয়া দাঁড়ায় এবং চিঠি বিলি করিতে করিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যায়। দূর হইতে যতাই সে নিকটবর্তী হইতে থাকে শান্তির আশাউষেলিত বক্ষ ততই যেন স্থির হইয়া আইসে। অবশেষে সে যখন তাহার ঘর অতিক্রম করিয়া সম্মুখস্থ আম বাগানের জুলী পথ ধরিয়া দস্ত বাবুদের বাগান বাড়ির অভিমুখে চলিয়া যায় তখন তাহার অশ্রুজল বন্ধন-যুক্ত জলশ্রোতের মতনই অদম্য হইয়া উঠে।

সেদিন সে রাত্তার আর লাল পাগড়ী দেখা গেল না, শীতের বাতাসে গারে কাঁটা

দিয়া উঠিতে লাগিল, আলস্তে সমস্ত শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; তথাপি লোহাকুট চুখকের স্মার সেই রাজাপাগড়ীধারী চামড়া ব্যাগস্বক পিয়নের আকর্ষণে জানালা ছাড়িয়া সে উঠিতে পারিতেছিলনা। ক্লান্ত মস্তক জানালার কবাটের উপর রক্ষা করিয়া অদূরস্থ বৃহৎ অট্টালিকার শ্বেত প্রাচীরের দিকে তাকাইয়া ছিল।

সেও একদিন ঐ অমনি বৃহৎ অট্টালিকার বাস করিত। এই রকমই আমগাছের ছায়ার মধ্যে প্রশস্ত দীর্ঘিকার সান বাঁধান ঘাট পাখীদের মধুর সঙ্গীতে ও পুরবাসিনী নারীগণের হাস্য কলরবে মুখরিত হইয়া থাকিত। যখন অদূরের কোন দেবালয় হইতে সন্ধ্যারতির কাঁশর ঘণ্টা বাজিয়া উঠে তখন তাহার মনের মধ্যে ব্যাকুলতা আরও যেন উদ্দামভাবে জাগিয়া উঠে। ছই চোখের জলধারার অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে সেই এক পরিচিত মন্দিরের পরিচিত মূর্ত্তিট মনে পড়িয়া যায়। হস্তে এতক্ষণে সেখানেও এমনি করিয়া কাঁশর ঘণ্টা বাজাইয়া আরতি প্রদীপ জালাইয়া সন্ধ্যারতির আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সেই আলোকিত মন্দিরের মূর্ত্তিগন্ধ সৌরভরাশির মধ্যে দেবপ্রতিমার সমস্ত দৃশ্যটা মনের ভিতরে একখানা ছবির মতন স্পষ্ট হইয়া উঠে। সবি যেন তেমনি আছে শুধু সে নাই! শ্রামাকান্ত সেই যে নববধূর হৃদে সূতা বাঁধা হাতখানি ধরিয়া আনিয়া সর্বপ্রথম দিনেই শ্রামসুন্দরের নিকটে দাঁড় করাইয়া হাঁসিয়া বলিয়াছিলেন “হরি! আমার মা! তোমার স্থাপন করে গেছিলেন এই দেখ, আবার তিনি

তোমার কাছেই এসেছেন।” শ্রামার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন “দেখছিস মা পাষণি! এই দেখ মাতৃহীন আবার মা পেয়েছে। তুইতো ভাল করে আদর করলিনে শুধুই কাঁদালি—তাই আবার নিজের মাকে খুঁজে আনলুম।” তাহার অধিকৃত স্থানটি আজ কেবল শূন্য আর সবি তেমনি আছে। পাষণ প্রতিমা তেমনি হাশ্বভরা, মন্দিরকক্ষের শুষ্ক বায়ু তেমনি সুরভি স্নাত, সাধক পুরোহিত ও দর্শকগণ তেমনিই ভক্তি বিহ্বল। এইরূপে দিনে নিশীথে— তাহার খণ্ডরবাড়ী ও বাপের বাড়ীর কত কথা, কত আদরযত্ন অবিরামই মনে জাগিয়া ওঠে!

সহসা রাস্তার গমনশীল পথিক জনের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি বিরক্তি সূচক শব্দ করিয়া উঠিল “আঃ পিছল দেখ! মিউনিসিপালিটি এখানের কি যুমুচে? রাস্তা, ঘাটের এমন অবস্থা!”

পরিচিত স্বর! শাস্তি চমকিয়া মুখ তুলিল, পথিকযুবকের প্রতি চোক পড়িতেই সে বিস্ময়ে অক্ষুট ধ্বনি করিয়া উঠিল “মিঃ রায়।” পথিকও শব্দানুসরণ করিয়া আশ্চর্য্যভাবে সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিল, স্বপ্নপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল “রজনীবাবুর মেয়ে না?” অনেক দিন পরে শাস্তির পাণ্ডুমুখখানা একটু খানি লাল হইয়া উঠিল, ঈষৎ স্নানহাসি হাসিয়া সে বলিল, “চিনতে পারচেন না মিষ্টার রায়?” “না পারলে কি কথা কহিতে সাহস কর্তেম? কিন্তু একি আশ্চর্য্য সাক্ষাৎ শাস্তি! কাদের বাড়ি এ?”

শাস্তি উত্তর দিল না, তাহার সব টুকু

শক্তিই যেন নিঃশেষ হইয়া ফুরাইয়া গিয়াছিল, তাহার মুখের অস্বাভাবিক বিবর্ণতা দেখিয়া নীরদকুমার ব্যাকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল “আমি কি বাড়ির মধ্যে যেতে পারি? কেউ আপত্তি কর্কেন না তো?”

শাস্তি উঠিয়া কম্পিত স্বরে “আসুন না” বলিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

নীরদ ছএক কথার পর ব্যাপারটা মোটের উপর এক রকম বুঝিয়া লইল। যে কারণেই হোক হেমেন্দ্র তাহার পিতা ও খণ্ডরের সহিত বিবাদ করিয়া শাস্তিকে তাঁহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া আনিয়াছে—এই অপরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র আবাসই এখন শাস্তির গৃহ,—তাহা বুঝিতে নীরদের বিলম্ব হইল না। সহসা ঈষৎ তীব্রভাবে সে বলিয়া ফেলিল “এমন নিকুট লোকের হাতে তুমি পড়েছ শাস্তি, কি ভয়ানক! বলিতে বলিতে শাস্তির আহতভাবে লজ্জা পাইয়া হঠাৎ খামিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করিল;—“সংসারে কেমন করিয়া চলিতে হয় তাহাও শিখিলাম না।”

নীরদ অত্যন্ত আহতভাবে কাতর হইয়া কহিল “আমায় কিছু লুকিও না। সব কথা খুলে বলো, মনে করো আমি তোমার বড় ভাই, তোমার দাদা আমি, তেমনি বিশ্বাস করে সব আমায় বলো। কেন তোমরা লক্ষ্মীপুর থেকে চলে এলে? আর এলে যদি তবে এ অবস্থায় কেন? রজনীবাবুর মেয়ে তুমি, তুমি আজ এই অবস্থায়? উঃ কি রকম চেহারা হয়ে গেছে! এ সবেম মানে কি?”

এই অত্যন্ত মর্ষপর্ণী মেহনস্তামনে শাস্তির এতদিনকার অনাদৃত বেদনারাশি আবেগ তরঙ্গে উখলিয়া উঠিতে উত্তত হইল,—সে আর আশ্রয়স্বরূপ করিতে পারিল না। কতদিন যে এমনস্নেহের ভাষা সে শুনে নাই! মরুরার সেই বিনায় দৃশ্যের পর আজ এই শ্রদ্ধাপূর্ণ মহৎ বন্ধন স্থাপন! এত কষ্টের মধ্যেও যেন তাহাকে অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য দান করিল। সে চোখ মুছিয়া বলিল “সেখানে দিদি এসেছেন, তাই আমরা থাকতে পারিনি, চলে এসেছি।” বলিতে বলিতেই মুখ ফিরাইয়া লইল। নীরদ আশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল “দিদি? দিদি কে?” শাস্তি অশ্রুদিকে ফিরিয়াই উত্তর দিল,—

“আপনি বুঝি জানেন না,—আমার যা; তিনি বৃন্দাবনে তাঁর ছেলেটিকে নিয়ে, থাকতেন আমবা গিয়ে তাঁকে এনেছি।” বজ্রপাতে স্তম্ভিত পথিকের মতন স্তব্ধ দৃষ্টি বহুক্ষণ পরে ফিরাইয়া নীরদ গভীর বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল “কে এসেছে? বিনোদের স্ত্রী! সে বেঁচে আছে? সত্যি কথা?” তাঁহার ভাব দেখিয়া শাস্তি বিস্ময়বোধ করিল, কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া কহিল “আছেন বই কি। তাঁর নাম শিবানী, তাঁর ছেলেটি কি রকম যে সুন্দর আর এমন শাস্ত।”— নীরদ তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল “বুঝেছি শাস্তি। শিবানীর নাম নিয়ে কোন পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক তোমাদের বিষয় অধিকার করতে এসেছে। সেতো বেঁচে নেই সে স্বর্গে। তাই হেম সহ করতে পারেনি রাগ করে চলে এসেছে। আজ্ঞা আমি তাঁর ষড়যন্ত্র সব ব্যর্থ করে দিচ্ছি দাঁড়াও—”

লজ্জায় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া শাস্তি আর্তভাবে কহিয়া উঠিল “ও কথা বলবেন না, আপনি এমন কথা বলবেন না! ঐ একজন ভিন্ন কেউ এ কথা বলেনি। তিনি সতী লক্ষ্মী পুণ্যবতী তিনি আজন্ম দুঃখ পাচ্ছেন, তার ওপরে এবকম অপবাদ দেওয়া মহা অধর্ম্ম! নিজে তো তিনি আসেনও নি, আর তার স্বামীর পরিচয়ও তিনি এতদিন জানতেন না। জ্যেষ্ঠা মশাই-ই প্রথমে আমার ভাসুরের সঙ্গে অমুখ মিল দেখে কাঁদতে লাগলেন। তার পর তাঁর কাছে জ্যেষ্ঠাইয়ার একখানি ছবি ও আংটি ছিল তাই থেকে বোঝা গেল কে তাঁরা! সব্বাই বলে,—অমু ঠিক তার বাপের মৃত দেখতে।

নীরদকুমার শাস্তির কথাগুলি স্থির হইয়া গুলিল। সত্যই এমন কিছু ত সে শুনে নাই যাহাতে সে মনে করিতে পারে,— নিশ্চয়ই শিবানীর মৃত্যু হইয়াছে। কি ভয়ানক! সে তাহার সস্তানের মাকে এত দিন যুঝা তাচ্ছিল্য ভরে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিল। তাহাকে নিজের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ পাঠাইয়া আবার একজনকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল? শাস্তি যখন তাহাকে তাহার দিদির স্বামী বলিয়া জানিতে পারিবে! গভীর লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিয়া নীরদ মাথা হেঁট করিল। একটু পরে প্রশান্ত ভাবে কহিল, “হেম কোথায়?” ক্ষীণকণ্ঠে শাস্তি উত্তর করিল “কি জানি?” “কখন আসা সম্ভব?” “তাও ঠিক নেই। আজও আসতে পারেন দুদিন দেরিও হতে পারে।” নীরদ বিস্মিত হইল, “এই নির্জন পুরীর মধ্যে একলা তোমায় ফেলে সে বাড়িও থাকেনা নাকি?” বিরক্তিতে তাহার চিত্ত

উত্থিত হইয়া উঠিল। “তোমার বাবার সঙ্গে বোধ হচ্চে সে ঝগড়া করেছে? নিশ্চয়ই তাই না?” অশ্রুজলে শান্তির দৃষ্টি লোপ পাইয়া আসিতেছিল। সে উত্তর দিল না। বিরক্ত, বিস্মিত, অমুতপ্ত নীরদ কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় বিহ্বাৎ হানিয়া কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। আকাশ ঘন মেঘে ছাইয়া আসিতেছে। নীরদ বিপন্নের মত খানিকক্ষণ জানালার ভিতর দিয়া বাহির আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল তারপর আবার শান্তির দিকে চাহিয়া দেখিল—নিঃশব্দে উদাস দৃষ্টিতে সে চাহিয়া আছে। সেই অর্থহীন উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি তাহার বক্ষে সজোরে আঘাত করিল। সেই শান্তি! সুন্দর চঞ্চল, ধ্যানন্দময় সংসার স্মৃথোত্তানের সেই ফুটন্ত স্বেদিত ফুলটি দেবতার পায়ে নির্ম্মালা টুকুরই মত পবিত্র! সংসারের এই সময়ক্ষেত্রের আঘাত হইতে সেও রক্ষা পাইল না! কি বিচিত্র এই জগতের গতি।

সহসা নীরদ জিজ্ঞাসাকরিল—“তোমার মা বাবা তো ভাল আছেন শান্তি? তাঁদের কাছে তো গেলেও হতো? তাঁরা কেন তোমার এখানে থাকতে দিয়েছেন?”

আবার দমিত অশ্রু উখলিয়া উঠিতে চাহিল, জোর করিয়া চোখের জল চাপিয়া রাখিয়া সে মাথা নীচু করিয়া রহিল।

নীরদ একটুখানি উত্তরের অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া তারপর হঠাৎ মনে ঠিক করিয়া ফেলিল, মহৎপ্রকৃতির লোক রজনীনাথের সহিত তাহার লঘুপ্রকৃতির জামাতা হেমের বনিবনাও না হওয়া মোটেই আশ্চর্য্য বা অসম্ভব নয়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সমবেদনা ও

আত্মগ্লানি মিশ্রিত করুণচক্ষে চাহিয়া রহিল।

শীতের অপরাহ্ন মেঘাড়াঘরে বর্ষারজনীর তায় অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। আসন্ন বর্ষণের একটা বড় রকম যোগাড় হইয়া উঠিতেছে। হৃষ্যোগময়ী প্রকৃতির পানে চাহিয়া নীরদের হঠাৎ স্মরণ হইল তাহাকে যাইতে হইবে, এখানে সে পুরুষহীনগৃহে একজন বাহিরের লোকমাত্র। অথচ শান্তিকে এই হৃষ্যোগ রাত্রে একা ফেলিয়া চলিয়া যাওয়াও তো তাহার পক্ষে কর্তব্য হয় না। ভাবিয়া চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করিল “হেম যদি না আসে রাত্রে কি একাই থাকো? চাকররা বিশ্বাসীতো?” শান্তির মন অধরে অতি সূক্ষ্ম বিষাদের এক ফোঁটা হাসি ফুটিতে ফুটিতে বিহ্বাতের ক্ষণ রেখা পাতে ন্যায় চারিদিকের পুঞ্জীকৃত অন্ধকার রাশির মধ্যে মিলাইয়া গেল। “চাকর তো নেই, একজন ঝি আছে সেই থাকে, সে খুব ভাল।”

নীরদ আবার দণ্ডাহতের মত চমকিয়া উঠিল। কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল “আমি তোমার এ অবস্থায় একা এই বনের মধ্যে ফেলে তো চলে যেতে পারি না,—না হয়—” তাহার কথা শেষ হইতে না দিয়াই তড়িতাহতের মত চমকিয়া উঠিয়া শান্তি তাহার আর্ন্তদৃষ্টি মেলিয়া ঈষৎ উৎকর্ষে বলিয়া উঠিল “নানা আমার কোন সাহায্য আপনি করবেন না, আমি তো কত দিনই এই রকম থাকি।” পাছে হেমের আসিয়া আবার কোন একটা বিরুদ্ধভাব ইহার সম্বন্ধে মনে আনে সেইজন্তই হঠাৎ শান্তি এতখানি উত্তেজনা-ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু নীরদ তাহার

ভিতরের অর্থটা না বুঝিয়া উন্টাই বুঝিল। পূর্বেকার লজ্জাস্বর অভিনয়গুণা চকিতের মধ্যে বায়স্কোপের জীবন্ত চিত্রের মতন মনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া তাহার কর্ণমূল পর্যন্ত রাগা করিয়া তুলিল। ধিকারের সহিত সে নীরব হইয়া রহিল। এখন যে সে সকল ছরাশাস্বপ্ন মনের কোণেও জাগিয়া নাই যৌবনের সে সব হৃদয় চপলতা তাহার উৎপত্তির মধ্যেই নিঃশেষে লীন হইয়া গিয়াছে সে কথা সে কেমন করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিতে পারে? একবার ইচ্ছা হইল বলিয়া উঠে,—আমি তোমার রক্ষা করিতে লোকতঃ ধর্মতঃই অধিকারী। সেই আত্মীয়তার সম্পর্কেও আমি তোমায় এ অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে পারি না।” কিন্তু সে কথাটা বলা এখন যেন আরও কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। যে দিদি শাস্তির শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সামগ্রী সেই দিদিরই স্বামী সে! অমু তাহারই অংশ, তাহার হৃদয় শোণিতের বিন্দু—তথাপি এ কথা কেমন করিয়া ঘৃণা লজ্জার মাথা ধাইয়া সে সম্মুখে ব্যক্ত করিবে! দর্পহারী! এ কি প্রায়শ্চিত্ত!

তারপর আবার একটা বাধার কথাও মনে আসিল। হিন্দুর ঘরে তাহাদের সম্পর্কটাও এমনি জটিল সমস্যাক্রম যে তাহার প্রকাশেও এ অবস্থায় বড় একটা সুবিধা না ঘটতেও পারে। মূহু অনিচ্ছকভাবে সে বিদায় চাহিল, শাস্তি ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল “আর একবার আসবেন কি?” নীরদ আগ্রহের সহিত উত্তর করিল “নিশ্চয়, কাল সকালেই আমি আসবো।”

সে চলিয়া গেল। শুধু অশ্রুহীননেত্রে

শাস্তি বহুক্ষণ পর্যন্ত তাহার গন্তব্য পথের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে যখন সন্ধ্যার স্নান ছায়াঙ্ককারের মধ্যে গলির বাঁকের মুখে তাহার সুদীর্ঘাকৃতি মিলাইয়া গেল, তখনও সে পলকহীন চক্ষুকে সেই দিকেই স্থির রাখিয়া গঠিত মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে যখন মেঘভরা আকাশ হইতে বজ্রপাতের সাড়া আসিয়া বনবান্ শব্দে ঘরখানাকে শুধু কাঁপাইয়া তুলিল, এবং রূপু রূপু করিয়া জল পড়িতে আরম্ভ করিল তখন সে সেই লক্ষ্যহীন দৃষ্টি বহুদূর হইতে টানিয়া আনিয়া বিছানার উপরে লুটাইয়া পড়িল।

৪২

শাস্তি পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল “চন্দ্র, আজ কি রোদ উঠেছে? তবে জানলাটা খুলে দাওনা আমার প্রাণটা যেন কেমন হাঁপিয়ে উঠেছে।”

কয়েকদিন হইতেই শাস্তির অসুখ চলিতেছে—গত রাত্রি হইতে জর খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। খোলা জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া দেখিবার পূর্বেই ঘরে জুতার শব্দ হইল ও পরমুহূর্তেই হেমেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিল; শাস্তির উৎসুকনেত্র মুহূর্তে নিরাশায় স্নান হইয়া আসিল। সে অবসন্নভাবে বালিসের উপর মস্তক নিক্ষেপ করিয়া একটা হৃদয়ভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। হেমেন্দ্র তাহার অবস্থা লক্ষ্যও করে নাই,—সে আজ বহুদিন পরে অনেকটা যেন প্রফুল্ল। ছাতা ও শালখানা একটা বাস্তুর উপর নিক্ষেপ করিয়া পরিশ্রান্তভাবে বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া

পকেট হইতে একখানা রসিদ বাহির করিয়া শান্তির সম্মুখে ধরিয়া প্রফুল্লকণ্ঠে কহিল “আঃ এতদিন পরে কতকটা সুবিধা হয়ে এসেছে, — এইখানা ভাল করে রেখে দাও দেখি ? শান্তি বিষয় দৃষ্টি তুলিয়া স্বামীর পানে চাহিল, কাগজখানা লইতে কোন আগ্রহ প্রকাশ করিল না। হেম তখন নিজে হইতেই বলিল “তোনার গহনাগুলো লক্ষ্মীপুর থেকে যোগেশ আদায় করে এনে একজন ব্যারিষ্টারের কাছে বন্দক রাখিয়ে দিলে। টাকাগুলো তাঁর কাছে জমা রইলো, তিনি তো খুব উৎসাহ দিচ্ছেন। তিনি নিজে সব ভার নিচ্ছেন, বলছেন কোন ভাবনা নেই ! এইবার একবার তবে, অদৃষ্ট পরীক্ষা করে দেখাই যাক্,— আর তো চলে না নৈলে। চারিদিকে ধার, কেবল নেই নেই ! বাসন্তী খিয়েটারে কাল যমুনা প্লে হলো তাতে কুমার উৎপলাদিত্য সেজে উঃ কি নামটাই আমার হয়ে গ্যাছে ! ম্যানেজার তো যোড়হাতে দেড়শো মাইনে দিতে চায় হুপ্তায় একবার করে অভিনয় করবার জন্তে। কিন্তু এখন দিনকতক সব ছাড়তে হবে, ভাল করে এইবার অদৃষ্টকে বোঝা যাক্ ।”

শান্তি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। বাবু ঘরে ঢুকিতেই চন্দর ঘর ছাড়িয়া গিয়াছিল। বাহিরে যোগেশের সহিত তাহার কোন্দলের একটা উচ্চ সুর শোনা যাইতেছে। সহসা সে তাহার রক্তহীন পাংশু মুখ স্বামীর পানে ফিরাইয়া প্রদীপ্ত চক্ষু তাহার মুখে স্থির রাখিয়া উচ্চকণ্ঠে তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল “ভাগ্য পরীক্ষা ! ভাগ্য পরীক্ষা বলোনা ভাগ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলো,— বিজ্ঞোহ বলো”—

উত্তেজনায তাহার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল— “বেশিদিন নয় আর হুচারটে দিন অপেক্ষা করো, আমার মরতে দাও, তারপরে তোমার যা খুসী করো, কে বারণ করবে ? শুধু এই সামান্য দিনকটা ধৈর্য্য রাখো, ভিক্ষা চাইচি দয়া চাইচি কিছুই কি পেতে পারিনা ? শেষ ভিক্ষা শেষ—”

হেমেন্দ্র ধড়মড় করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, আকস্মিক একটা ভয়ে তাহার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, শান্তি ! শান্তি তুমি পাগল হলে নাকি ? একি করচো ? থামো—” আলুথালুভাবে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া চিরসহিষ্ণু শান্তি সবেগে মাথা নাড়িয়া তেমনি তীব্র উত্তেজিতকণ্ঠে বলিতে লাগিল। “আর আমি থামতে পারি না, কত আর থামবো, আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে, একটুখানি তুমিই থামো— আমার মরতে দাও, তারপর নিশ্চিত হয়ে যা তোমার সাধ তাই করো, কেউ বাধা দেবার নেই। মাগোঃ !” বলিয়া সহসা সে আবার বিছানার উপরে গুইয়া পড়িল, শক্তির অতিরিক্ত ব্যয়ে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল। নির্বাক হেম তাহার নিশ্চেষ্ট অসাড় শরীরের দিকে কিছুক্ষণ বদ্ধদৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া অল্পক্ষণ পরে তাহার নিকটে ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল, “শান্তি ! শান্তি !” পায়ে হাত দিয়া দেখিল নিশ্চল, তখন ভয়ে বিন্ময়ে তাহার হাত পা যেন অবসন্ন হইয়া আসিল। রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল “যোগেশ !” যোগেশ দ্রুতপদে মরে ঢুকিয়া ক্রোধোত্তেজিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল “কি পাখী তোমার ঐ ঝি মাগীটা ! বলে কিনা তুমিই তো

বাবুর শনি হয়েচ,—এ কি হেমবাবু?” হেম মাটিতে অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িয়া তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদের মতন করিয়া কহিয়া উঠিল “দেখ যোগেশ! আমি ওকে খুন করেছি!”

“এ্যা! সে কি!” কিন্তু সেই সন্ধ্যায়ই শান্তিকে একটু নড়িতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া কাছে আসিল “না, না মূর্ছা হয়েছে! একটু জল আন দেখি এক্ষণি সেরে যাবে, কপালটা ভয়ানক গরম! আমি একজন ডাক্তারকে বরং ডেকে আনি, তুমি কাছে থাকো” হেম আতঙ্কে বলিয়া উঠিল “না যোগেশ আমিই তার চেয়ে ডাক্তারের জন্তে যাচ্ছি। তুমি এখানে থাক।”

যোগেশ বলিল “আচ্ছা তাইবাও” মনে মনে বলিল ভীক! সবেতেই তোমার সমান ভয়, এদিকে আবার যোগেশকে স্ত্রীর সঙ্গে একটা কথা কহিতে দেখলেও সয় না।” শান্তির পরিণাম তাহাকেও যেন অলক্ষ্যে অনুতাপের কষাঘাতে ক্লিষ্ট করিতেছিল, সেইতো হেমের মন্ত্রণাদাতা! সেওতো কম পার্শ্বী নয়! আহা হৃদয়ে পড়িয়া কি তবে সত্য সত্যই বেচারাকে হত্যা করিয়া ফেলিল না কি? এতোটা হইবে কে জানিত!

হেমের কাছে অধিকদূর যাইতে হইল না। গলির মধ্যেই পরিচিত প্রসন্নবাবু ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে হেম ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

“আঃ বাঁচা গেল! আমি আপনার কাছেই থাকিলাম যে, আসুন ডাক্তারবাবু শিগ্গির একবার আমার বাড়ি আসুন—”

ডাক্তার কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু তাহার পূর্বেই তাহার সমভিব্যাহারী লোকটি তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল “কেন বলো দেখি? শান্তি কেমন আছে?”

হেমের অপরিচিতের এই অযাচিত আশ্রয়তায় মনে মনে যগেষ্ঠে বিস্মিত হইলেও এ বিপদের সময় বিরক্ত হইতে পারিল না বা তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতাব প্রকাশ করার আগস্তকের ধৃষ্টতার কথা মনেও পড়িল না। সে তখন ঘোর বিপন্ন,—মনে হইল হয়ত ইহার নিকটও কিছু সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। সে যে কে সে প্রশ্ন পর্যন্ত না তুলিয়া ঈষৎ যেন আশ্বস্ত চিত্তেই বলিল “হঠাৎ তার মূর্ছা হয়েছে, আপনারা শিগ্গির আসুন।”

ডাক্তারের সঙ্গেই যোগেশ তাঁহাব লিখিত প্রেসক্রিপশন দুখানা লইয়া চলিয়া গেলে নীরদকুমার পরুষকণ্ঠে মুহূর্তমানপ্রায় হেমের কাছে বলিয়া উঠিলেন “এমনি করেই মেরে ফেলতে হয়?” নীরদের ব্যবহারে হেম বুঝিয়া লইয়াছিল—তিনি রজনীনাথেরই কোন আশ্রয়,—শান্তির আপনারই লোক। হেমের লজ্জিত স্বভাবের গুণ গুণ করিয়া বলিল “চিকিৎসা হচ্ছিল তো, ডাক্তার বলে ম্যালেরিয়া—”

নীরদ বাধা দিল “ছাই চিকিৎসা হচ্ছিল! ওকি জীবনে কখনও এমন অবস্থায় থেকেচে? তা একবার মনে হলোনা!”

অপরিচিতের এই তীব্র তিরস্কারে গর্জিত হেমের আজ রাগ করিল না, বরং লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। সে যে কত বড় অপরাধে জগতের ও নিজের হৃদয়ের নিকটে অপরাধী সে কথা যে অলস লোহার

বাড়ি দিয়া বুকের ভিতরে আঙনের অক্ষরে বিধাতা সম্প্রতি লিখিয়া দিয়াছেন! নীরদ তাহার পাশে আসিয়া বসিল। একটুও ইতস্তত না করিয়া একেবারে সোজা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া ফেলিল—“কুনলে তো ডাক্তার কি বলে গেলেন? এখনও কি রজনীবাবুকে খপর দিতে তোমার কোন আপত্তি আছে? ভেবে দেখ শাস্তি যদি না বাঁচে চির দিনের জন্ত কি আক্ষেপ থেকে যাবে!”

হেমেন্দ্র তড়িতাহতের মত শিহরিয়া উঠিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল “সেকি বাঁচবে না? দয়া করে আপনি তাকে বাঁচান, আমার যা করতে বলবেন আমি করতে প্রস্তুত আছি। আমিই তাকে মেরে ফেলুম!”

হেমেন্দ্রের চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িল। বিমর্ষ মুখে কহিল “সে যদি না বাঁচে আমি লোকের কাছে মুখ দেখাব কেমন করে। আমার এ সংসারে শাস্তি ছাড়া আর আছেই বা কে! আমার—” গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল “বঁচে থাক। অসহ্য হয়ে উঠবে, আপনার বলতে কেউ আমার নেই।”

নীরদ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, হেমকে সে যে রকম কঠোর চিত্ত, মমতাহীন পাষাণরূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছিল তাহাকে সে রকম ঠিক না দেখিয়া অনেকটা যেন আশ্চর্য হইল। অবস্থার গতিতে পড়িয়া সেও যে কত সময় তাহার স্বভাবের বিপরীত হইয়া উঠিয়াছে! যে দোষী সে অতীর বিচারক হইবে কোন মুখে? তাহাকে যে তিরস্কার গুলো করিবে বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল নিঃশব্দে সেগুলো

মনের ভিতরেই চাপিয়া ফেলিয়া সাক্ষ্যনা পূর্ণ কণ্ঠে সে কহিল “হতাশ হইয়োনা হেম, প্রারব্ধপ্রবল বটে, কিন্তু পুরুষকারও সামান্য বল নয়। আমাদের যথামাধ্য চেষ্টা আমরা করতে যেন পরায়ুধ না হই। তারপর কর্ম-ফলদাতা তাঁর কাজ করবেনইতো। তবে টেলিগ্রাম করি? শাস্তির পক্ষে এখন তার বোগের মূল ওষুধেই সব চেয়ে বেশি কাজ করবে।” লজ্জায় হেমেন্দ্র আবার কিছুক্ষণ বাক্যহীন হইয়া রহিল। তারপর মুখ না তুলিয়াই মৃদু কণ্ঠে কহিল “তাঁরা কি আমাদের ক্ষমা করবেন?”

হেমেন্দ্র সব কথাই অপরিচিত আত্মীয়ের নিকটে খুলিয়া বলিল,—কেমন করিয়া সে রজনীনাথকে ষোগেশের সাহায্যে বিদায় করিয়াছিল, সেদিন তাহার অপমানের তীব্র প্রতিশোধ—তাঁহার আহতমুখের সেই রক্তহীন বিবর্ণতা স্মরণ করিয়া অন্তরের মধ্যে আজ সে লজ্জা ও অনুতাপের তীব্র কষাঘাত অনুভব করিল। এমন বিপদের মধ্যেও নীরদ একটা অদম্য কৌতূহলের হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না। অদূরে দস্তবাবুদের খেত প্রাসাদের উপর হইতে ধীরে ধীরে সূর্য্য-রশ্মি নামিয়া যাইতেছিল এবং শীতের অকাল-সন্ধ্যায় শাস্তির ললাটের মতই পশ্চিম আকাশের প্রান্তটা স্নান হইয়া আসিতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া যেন অনাগ্রহভাবে প্রশ্ন করিল “তোমার বিনোদদার জী সত্যি সত্যিই জাল নাকি? সে নাকি ভাল লোক নয়?”

হেম জীবৎ বিস্মিত ও অপমানিত ভাবে হঠাৎ মুখ তুলিয়া অপরিচিত প্রশ্নকারীর প্রতি চাহিল, তাহার মুখের সাগ্রহ সকৌতুকভাব

হঠাৎ তাহাকে কতকটা উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল, ঈষৎ গর্কিত ভাবে কহিল “তা আমি কি করে জানবো? তা ছাড়া সে সব পারিবারিক কথা—” বলিতে বলিতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া হেমেত্র ঈষৎ অপ্রস্তুত ভাবে বলিল “আমায় মাপ কর্কেন সেও যা ঘটেছে সব আমারি দোষে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি তাঁকে কিছুই জানিনা, তবে শাস্তির তাঁর উপরে যে রকম ভাব তাতে তা’কে দেবী বলেই মনে করা উচিত।’ আবার হুজনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। “সেখানেও একটা থপর দিলে হয় না? তিনি হয়ত এলেও আসতে পারেন। শুনেছি জ্যেষ্ঠা মশাই এখনও আমার স্নেহ করে থাকেন। শাস্তির স্বামী বলেও তাঁরা হয়ত আমার ক্ষমা করতে পারেন, আমার জন্তে না হলেও।”

হেমের এই কথায় নীরদ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল “তুমি শাস্তির কাছে যাও, আমি টেলিগ্রাম দুটো করে আসচি।”

হেমেত্র আসিয়া দেখিল, শাস্তি জাগিয়াছে, সে যেন ব্যাকুলনেত্রে কাহাকে অব্বেষণ করিতেছিল, তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ঘোর অভিমানে অন্তর্দিকে মুখ ফিরাইল।

সেই রোগক্রিষ্ট চিত্তের অভিমানের নীরব বেদনা হেমকে অত্যন্তই আঘাত করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি প্রকৃতিগত আত্মাভিমানের বশে মুখটা একবারের জন্ত একটু লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাবটা সামলাইয়া ফেলিয়া বিছানার উপরে তাহার অত্যন্ত নিকটে আসিয়া বসিল ও কিছুক্ষণ তাহার অভিমানাহত বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া মুহূর্তের ডাকিল “শাস্তি!” সেই এক উৎসব রজনীর পুষ্পমণ্ডিত

প্রাঙ্গণে শঙ্খরোলের মধ্যে যে দুইটি লজ্জা মুকুলিত নেত্র পুষ্প কলিকার মতন, তাহার দিকে প্রথম সলজ্জ দৃষ্টিপাত করিয়াছিল তখন তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতাই তো শুধু ভরা ছিল, কে তাহার পরিবর্তে এ হতাশা ও বেদনা মাত্র প্রতিদান দিল?— সেই না!

“আমার দিকে চাও শাস্তি।” এই বলিয়া সে শাস্তির একখানা শীর্ণ হস্ত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল। তাহার কণ্ঠশব্দে অশ্রুজল পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, শাস্তি আশ্চর্য হইয়া মুখ ফিরাইল, নিঃশব্দে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল “তুমি আমার জন্তে দুঃখ করচো? আমি মরে যাবো বলে?”

হেমেত্র দুই হাতে শাস্তির দুর্বল হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখের উপর নত হইয়া তাহার ক্রিষ্ট অধরে চুসন করিয়া রুদ্ধ আবেগ পূর্ণ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল “ই্যা তোমারি জন্তে শাস্তি, তুমি যে আমার সর্বস্ব? আমি সব হরাকাজকা ছেড়ে দিবে মানুষ হবো শাস্তি, শুধু তুমি আমায় ছেড়ে যেও না! শাস্তি লক্ষ্মী তুমি আমার, তোমার চিনিনি তাই আমি লক্ষ্মীছাড়া হয়েছি, আমার মঙ্গললক্ষ্মী অমঙ্গলের মুখে ভাসিয়ে দিবে আমার তুমি চলে যেও না।”

বলিতে বলিতে হেম দেখিল তাহার কথাগুলো সব ব্যর্থই হইতেছে শাস্তি জাগিয়া নাই। তাহার ক্ষীণ হাতখানি তাহার হাতের মধ্যে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। রোগের পতি সঙ্ঘকে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হেম তাহার সেই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত আনন্দের মূর্ছাকে নিদ্রা

ভাবিয়া নিশ্চিত হইয়া কাছে বাসিয়া বসিয়া নাই, নির্বাপিত প্রায় দীপশিখাটুকুর স্নান
তাহার কক্ষ চুলগুলাকে মুখের উপর হইতে আলোকে সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হইয়া
সরাইয়া দিতে লাগিল। শান্তির মুখখানার গিয়া যেন সেখানে দিব্যজ্যোতি প্রকাশিত
এত সৌন্দর্য্য আর কখনও তাহার চক্ষে পড়ে হইয়া উঠিল।

অন্বেষণ ।

| | | | | |
|-----|----------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| এহি | বিশ্বের মাঝে | বিয়াকুল প্রাণ | হেতা | যেখানে যা'কিছু আছে' অভিরাম, |
| | নিম্নত কাহারে চাহে ? | | | তা'রেই এ প্রাণ চায়। |
| | কাহার লাগিয়া, মরে সে কাঁদিয়া | | | যেন কি আভাসে, অধীর দরশে |
| | দারুণ মর্শ্ব-দাহে ! | | | “ঐ ঐ” বলে' ধায় ! |
| | গাহে বিহঙ্গ অশ্বর ছাপি' ; | | | হেরিলে কাহারে মনের মতন,— |
| | সারা হিয়া মোর তাহে ওঠে কাঁপি' ! | | | তুলে' লয় বৃকে করিয়া যতন ; |
| | সেই গানে ছায়, মরি বেদনায় | | | যত চেপে' ধরে বৃকের উপরে |
| | শুঁমরি মরম মাঝে ! | | | ততই জ্বলিয়া মরে ; |
| | মনে হয় মোর—কত কি যেন রে | | “এ তো নয়, ওগো, এ তো নয়”—বলে' | |
| | সে সুরে লুকানো আছে ! | | | কাঁদে সে আর্ন্ত স্বরে ! |
| যবে | নিকুঞ্জ মাঝে, তরু-শাখা' পরে, | | শুধু | এমনি করিয়া, ব্যর্থ আবেগে |
| | অপরূপ গরিমায়, | | | ফিরি আমি দিবানিশা ! |
| | গোলাপের কলি ধীরে পড়ে ঢলি' | | | চলেছি কোথায়, কি যে চাহি, ছায়— |
| | মধুর মন্দ বায় ;— | | | করিতে পারি না দিশা ! |
| | সোহাগ-মুগ্ধ আগ্রহ ভরে | | | হে মোর তৃপ্তি, ওগো অজানিত, |
| | ছুটে যাই কাছে ; পরম আদরে | | | হে চিরস্তন, চির-বাহিত, |
| | যেই তুলি তা'রে, মূর্তির মাঝারে | | | আর কত দিন হেন উদাসীন, |
| | অমনি পড়ে সে ঝরি' ! | | | ফিরিব পাগলপারা ; |
| | নিরাশা-দিগ্ধ পরাণ তখনি | | দেহ, | দেহ দরশন হে হৃদি-রমণ ! |
| | ওঠে হাহাকার করি' ! | | | —মুছাও নয়ন-ধারা ! |

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী

শতদল-রচয়িত্রী ।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী ।

‘শতদল’ শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী-রচিত একখানি কবিতাগ্রন্থ । একশতটি ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক ক্ষুদ্র কবিতার দলে কবির হৃদয় পদ্য বিকশিত হইয়াছে । কবিতাগুলিতে সুমধুর বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে, একঘেয়ে নহে । বিধাতার করুণার উপর অটল নির্ভর স্থাপন করিয়া, জগতে সকল কাজের মধ্যে বিধাতার করস্পর্শ অনুভব করিয়া তাঁহারি মহিমা কীর্তনরতা কবি ‘পূজিবার শতদল’ লইয়া ‘পবিত্র মন্দির’দ্বারে আসিয়াছেন । তাঁহার শতদলের মিলে সৌরভে, তাঁহার ভক্ত্যুচ্ছ্বাসেব আন্তরিকতায় এ পূজা ব্যর্থ হইবে না । এ কথা আমরা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি ।

কবি গাহিয়াছেন,—

“আমার হৃদয় মাঝে প্রেমভক্তি দিয়া
তোমার পূজার গান রাখিব রচিয়া ।
পুষ্পসম যেন প্রাণ তোমার পরশে ।
হাসিয়া ফুটিয়া উঠে মঙ্গল হরষে ।”

কিন্তু ‘শতদলে’র কবি আজ নূতন এ পূজার সাজি লইয়া বাণীর মন্দির দ্বারে উপস্থিত হন নাই । বহুপূর্বে হইতেই তাঁহার কমকণ্ঠের সঙ্গীত রবে পূজার মন্দির ভবিয়া রহিয়াছে । কবিরচিত “হাসি ও অশ্রু,” “অশোক” প্রভৃতি বহুদিন পূর্বেই তাঁহাকে বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্যে প্রতিষ্ঠার আসন দান করিয়াছে । সে আজ অনেকদিনের কথা, যখন ভারতী-সম্পাদিকা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে সরোজকুমারীর “হাসি ও অশ্রু” প্রথম প্রকাশিত হয় । সেই এক সঙ্কোচে সরমে মুহু সঙ্গীতের অক্ষুট রাগিনী ধ্বনিত হইয়াছিল ! কবির প্রথম গান,—

আকুল মর্ম্মের মাঝে, যে উন্মাদ সুর বাজে
হুটি ছত্রে লিখিতে বাসনা
গোপন হৃদয় ছায় ঘে সিন্ধু উচ্ছ্বেস হায়
কি জানাবে হুটি অশ্রু-কণা ?

আজ আর সে সুর রুদ্ধ নাই, গুমরিয়া মরে না—আজ তাহা সমস্ত বাধা সমস্ত সঙ্কোচ ঠেলিয়া বিশ্ববাসীর হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে !

“হাসি ও অশ্রু”তে কবির হৃদয়ের উদারতা ও ভাবের বিশালতা প্রথম পরিলক্ষিত হইয়াছিল ! ‘সন্ধ্যার তারকা’ দেখিয়া কবির ‘হুইট নয়ন’ ছলছল হইয়া আসিত—‘আগি স্বপ্নে ভোর’ হইয়া আসিত । ভাবের সেই প্রথম বিকাশ—কবির তুলিকায় সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে ! শতাধিক খণ্ড কবিতা—সবগুলিই কবিত্তে পূর্ণ—বিমল সহানুভূতির রসে সুস্নিগ্ধ ! “হাসি ও অশ্রু”তে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-বর্ণিত নায়ক-নায়িকাগণের উদ্দেশে লিখিত যে কোন ‘মনেট’ পাঠ করিলেই আমাদের কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে ! বিষবৃক্ষের কুন্দকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিয়াছেন,

প্রণয় দেবতা তাই হয়ে মূর্তিমান
এসেছেন পূজা তব লইবারে পায়ে ;
এইবার সঁপ বালা আপন পরাণ,
লাজে ‘না’ বলিছ কেন আপনা লুকায়ে ?
নীরব তোমার প্রেম দিবানিশি ঝরে ;
প্রণয়-দেবতাপদে প্রেমের মন্দিরে ।”

রবীন্দ্রনাথের “রাজারাণীর এবং সম্পাদিকা মহাশয়ার উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্রও তাঁহার

ছন্দে বেশ নিপুণভাবে ফুটিয়াছে—স্থানাভাবে
আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

“অশোকা” কবির আর একখানি কাব্য-
গ্রন্থ। ইহাতে প্রায় শতাধিক কবিতা সন্নি-
বিষ্ট হইয়াছে। অধিকাংশ কবিতাই সরল,
মিষ্ট ও ভাবপূর্ণ।

কাব্য-গ্রন্থত্রয় ভিন্ন কবিরচিত ক্ষুদ্রগল্প
গ্রন্থও একখানি প্রকাশিত হইয়াছে। সেখানির
নাম, “কাহিনী”। গল্পগুলি ঠিক ছোট গল্প
নহে। সেগুলি ছোট নভেল। কেবল দুঃখের
কাহিনী! অধিকাংশই ইংরাজি গল্পের ছায়াব-
লম্বনে রচিত। গল্পের ভাষাও বেশ প্রাজল



শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী এবং তাঁহার স্বামী ও শিশু পুত্র।

ও সহজ। লেখিকা মনোযোগ প্রদান করিলে মৌলিক উপভাস লিখিতে পারিবেন বলিয়া আশা হয়।

ইংরাজী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সরোজকুমারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মথুরানাথ গুপ্ত মহাশয় সবজ্জ ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা টি.বিউন সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বঙ্গভাষায় একজন প্রসিদ্ধ গল্প ও উপভাস-লেখক। সিভিলিয়ান বঙ্গসাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় সরোজকুমারীর খুদ্রতাতপুত্র।

সরোজকুমারী বাল্যে পিতার নিকট শিক্ষালাভ করেন। দশ বৎসর বয়সে কলু-টোলার প্রসিদ্ধ সেন বংশীয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামীর যত্নে সরোজকুমারীর রীতিমত শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হয়। যোগেন্দ্রবাবু সম্বলপুরের গভর্নমেন্ট উকীল। সরোজকুমারী বলেন, “আমার জীবনে যাহা কিছু সুখ-সৌভাগ্য, যাহা কিছু শিক্ষা, সব স্বামীর জন্ত।”

অতর্কিত।

লীলাকে আমি একটি বৎসবমাএ পেয়ে-ছিলাম।

সে বৎসরটা যেন আরব্যোপন্যাসের একটা কাহিনী। আমার অন্ধকারাবৃত জীবনের মাঝখানে লীলা যে আলাদিনের প্রদীপ জ্বালিয়েছিল, সে যে শুধু আনন্দ ও আলোকের দ্বারা আমাকে উদ্ভাসিত করেছিল তা নয়, আমার নিশ্চেষ্ট প্রাণকে যেন কোন অজাতপূর্ব জীবনীশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। আকাশের নীলিমা, শৃংখের উদারতা পৃথিবীর সম্পদ তেমন করে আর কখনও আমি উপভোগ করি নি এবং প্রেম ও আনন্দের মধ্যে আমি আর কখনও তেমন করে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে পারিনি।

কিন্তু মাত্র একটি বৎসর। তারপর আমার জীবনের আনন্দ মুছে গেল, আলোক নিভিয়া গেল, এবং এক বর্ষগসিক্ত

ঘনাকার বজ্রবিদ্যুৎ সন্ধ্যার স্নানিমার মধ্যে লীলা তাহার ইহজীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী সমাপ্ত করিয়া দিল!

১

ঝঞ্জাবসানে ভগ্নশির বৃক্ষের মত আমার মনে হইল হায় এ কি খেলা, এ কি নিদারুণ খেলা! একটি বৎসরের জন্ত এ প্রতারণা কেন?

লীলা বলিয়াছিল আবার তাহাকে দেখিতে পাইব। সেই আশা বুকে করিয়া দীর্ঘ দিবস কাটাইয়া দিতাম, তাহার পর যখন সন্ধ্যা হইয়া যাইত, তখন শয্যাবিস্তার করিয়া তাহারই প্রতীক্ষায় শয্যার একপাশে বসিয়া থাকিতাম। মনে হইত দূরে যেন কাহার পদশব্দ শোনা যাইতেছে। উন্মুখ ব্যগ্র হৃদয়ে ছয়য়ারের পানে চাহিয়া থাকিতাম যদি সে আসে! রাত্রি যখন গভীর এবং স্তব্ধতা সুনিবিড় হইয়া আসিত, তখন মনে হইত

সে যেন আরো কাছে আছে। পাছে আমি দেখিলে সে চলিয়া যায় তাই প্রাণপণে দুই চক্ষু বুজিয়া থাকিতাম। যদি তার উপস্থিতি অথু কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারি! সমস্ত দেহ তাহার স্পর্শের প্রতীক্ষায় উন্মূখ হইয়া থাকিত এবং কর্ণ তাহার নিঃশ্বাসের মৃদু শব্দের প্রতীক্ষা করিত! তাহার পর যখন নিশ্বাস রোধ এবং জ্বংপিণ্ড নিশ্চল হইবার উপক্রম করিত তখন অকস্মাৎ চাহিয়া দেখিতাম বৃথা, বৃথা! সে আলোর নাই, আধারে নাই, ঘরে নাই, বাহিরে নাই, কোথাও নাই!

তখন তাহারই জন্ত রচিত শয্যায় লুপ্ত হইয়া পড়িতাম, অশান্ত হৃদয় চাহাকার করিয়া উঠিত, এবং চারিদিকের আলো অন্ধকার এক হইয়া যাইত!

৩

এমনি কারণে একটি বৎসর কাটিয়া গেল, 'তবু'সে আসিল না!

ঠিক সেদিন তাহার মৃত্যু হইয়াছিল— আমি কস্মোপলক্ষে গৃহ ছাড়িয়া অথু গিয়াছিলাম, যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতে লাগিল তখন মনে হইল আর আমার দূরে থাকা কিছুতেই কর্তব্য নহে!

সেদিনও আকাশ গাঢ় কালো মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, আর্দ্র বাতাস বাহিতেছিল এবং আকাশের একপ্রস্থ হইতে অপর প্রান্ত বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছিল। পাষণ নগরী ভীত স্তম্ভভাবে আগত প্রায় বজ্রের প্রতীক্ষা করিতেছিল। পথিক পথত্যাগ করিয়াছিল, এবং ফেরিওয়ালারা গৃহে ফিরিয়াছিল।

একটা অপ্রশস্ত গলির মধ্য দিয়া আমার রাস্তা। খানিকদূরে ঠিক রাস্তার উপরেই একটা বাড়ি। এবং গলিটা তাহারই পার্শ্ব দিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে।

আমি ব্রহ্মপদে চলিতেছিলাম, আজ আমার মনে হইতেছিল কি জানি কেন তাহাকে দেখিতে পাইবই! আজ আমার এক বৎসরের প্রতীক্ষা সফল হইবে;—সেই তাহার ছোট ঘরটিতে, সেই তাহার প্রিয় শয্যায় হয়ত ক্ষণেকের জন্ত তাহাকে ফিরিয়া পাইব!

গলিতে পড়িতেই ঠিক সম্মুখে সেই বাড়ী। তাহার নীচেকার দ্বার বন্ধ কিন্তু জানালাগুলো খোলা, বোধ হয় বজ্রের ভয়ে উপরকার জানালাগুলো বন্ধ ছিল।

মনে হইল যেন নীচেকার জানালার গরাদ ধরিয়া কে দাঁড়াইয়া নিমিষে নেত্রের আমার পানে চাহিয়া আছে। সুদীর্ঘ গলি যতক্ষণ অতিক্রম করিলাম সে তেমনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিলাম কে তাহার দূরগত প্রিয়জনের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, হয়ত আমার মুখের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে, তাই ভুল করিয়া আমাকে দেখিতেছে!

জানালায় আরো কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম, সে তেমনি স্থির। সহসা মনে হইল সে আমার লীলার মত দেখিতে, তেমনি মুখ তেমনি চোখ! খমকিয়া দাঁড়াইলাম, দাঁড়াইয়া নিমিষে দেখিতে লাগিলাম,—সে স্থির অচঞ্চল! আমারই পানে তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ, কিন্তু সে দৃষ্টিতে আনন্দ নাই, শোক নাই!

কড়কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল— সেই শব্দে চমকিয়া ভাবিলাম এ কি করিতেছি, পরের ঘরের সম্মুখে কিসের জন্ত দাঁড়াইয়া আছি! লোকে যদি দেখে,— লীলা যদি দেখে।—অরিত পদে সেখান হইতে চলিয়া গেলাম।

কিন্তু আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত সেই দুইটি চোখ আমারই পানে চাহিয়াছিল। গলি বাঁকিয়া গেল, তবু আমি পিছনে চাহিয়া দেখিলাম, সামান্য অপ্রশস্ত স্থানের মধ্য দিয়াও বাঁকিয়া চুরিয়া কোনপ্রকারে সে আমাকেই দেখিতেছে!

তাহার পব যখন আর দেখা গেল না, তখন সহসা একটা অমুতাপ বোধ হইল, মনে হইল সে যেই হ'ক, সে যখন আমার লীলারই মত দেখিতে, তখন তাহার এ প্রতীক্ষা অবহেলা করা উচিত হয় নাই। যদি সে লীলা হয়,—আজ এক বৎসর পরে এমন করিয়াই যদি লীলা আমাকে দেখা দিয়া থাকে! তখন সেই চিন্তা আমাকে পীড়িত করিয়া তুলিল, দ্রুতপদে জানালার নিকট ফিরিয়া গেলাম—কোথাও কেহ নাই। তখন দুইহাতে ছুরারের কড়া ধরিয়া সজোরে নাড়িতে লাগিলাম—বজ্রের ভীষণ গর্জনের মধ্যে তাহা লুপ্ত হইয়া গেল।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া স্বপ্নে ও জাগরণে তাহাকে এক অন্ধকার গৃহের মধ্যে জানালার নিকট দাঁড়াইয়া আমারই পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিতে দেখিলাম। তাহাকে অবহেলা করিয়া আমি চলিয়া আসিলাম—

তথাপি তাহার সে দৃষ্টি ফিরিল না! হায় অন্ধ, হায় মূঢ়! সে দৃষ্টির স্মৃতি সমস্ত রাত ধরিয়া আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল! তখন বাহিরে বৃষ্টি ও ঝড় মাতামাতি করিতেছিল।

ভোর বেলা উন্মত্তের মত আবার সেই বাড়িতে গিয়া ছুরাবের কড়া নাড়িতে লাগিলাম।

পাশের বাটির একজন লোক আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন “কাকে খুঁজছেন, মশায়, দেখছেন না, ও বাড়ী খালি,—ওপরে চেয়ে দেখুন”। চাহিয়া দেখিলাম লেখা “বাটি ভাড়া দেওয়া যাইবে—”। নিশ্বাস প্রায় তখন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম “কতদিন খালি আছে!” খানিকটা ভাবিয়া তিনি কহিলেন “এক মাসের উপর হবে।”

তখন নতশিরে নতচিত্তে সেই জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইলাম। এবং যে গরাদুসে কাল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার উপর শির রক্ষা করিলাম। সে কাল এইখানেই আসিয়া ছিল। মনে হইল আজও সে সেইখানেই আছে তাহার দেহের সৌরভ আমাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিল, তাহার শেষ কথা যেন গুনিতে পাইলাম। এবং তাহার স্নেহ-স্পর্শ যেন আমার বেদনা-কাতর সর্ব্বাঙ্গে অমৃত সিঞ্জন করিল!

তখন বিশ্বের আলো নিভিয়া গেল, এবং আমার চোখের সম্মুখে একটা ঘন কালো পর্দা পড়িয়া গেল।

শ্রীগুরীকৃষ্ণনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল।

“নারী যেন সুকোমল হস্ত শিশুকে দোলা-
ইয়া ঘুম পাড়ায় সেই হস্তই পৃথিবীর শাসন
দণ্ড ধারণ করে।” ইচ্ছায় হটক অনিচ্ছায়
হটক রমণীকেই সমাজ এবং সংসারের শাসন
ভার বহন করিতে হয়। আমাদেরকে সেই
সম্মানপদবীর যোগ্য করিবার জন্ত, সেই
পদের যোগ্য শিক্ষা বিধানের নিমিত্ত; এবং
ভারতবর্ষীয় সমাজকে উন্নত ও সুশিক্ষিত
করিবার জন্তই এই ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল
স্থাপিত হইয়াছে।

দেশের নারী শক্তি এক মহতী শক্তি
তাহাকে অতিক্রম করিয়া কোন সমাজই
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না, সেই
মহাশক্তিই যদি সুপ্ত থাকে তবে কেমন
করিয়া জাতীয় শক্তি জাগ্রত এবং প্রবুদ্ধ হইবে?
সুতরাং সর্বাগ্রে ব্যক্তিগত ভাবে নারীশক্তির
উদ্বোধন আবশ্যিক। প্রভাতের আলোকে
মঙ্গল শঙ্ক রবে যখন আমাদের এই বিশাল
ভারতের মন্দিরে মন্দিরে নব দিবসের উদ্বোধন
ধ্বনিত হয় তখন আমাদেরকেও জাগ্রত হইতে
হইবে। সূচনায় পূর্ণরূপে ধারণা করিতে হইবে
আমি এই গৃহমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আমি
আছি। পরে ধারণা করিতে হইবে মানব
সমাজও সংসারের সম্রাজ্ঞী আমরা আছি।
পরমা শক্তি যখন সুষুপ্ত! তখন বিশ্বপ্রকৃতি
প্রলয়নিমগ্না, কালরাত্রির অন্ধকারে লীন এবং
নির্লুপ্ত। ভারতনারীরাজ্যের পরমা শক্তিকে
উদ্বোধিত করিতে পারিলেই সংসার এবং
সমাজ জাগ্রত এবং জীবন্ত হইবে।

মহাশি পাতঞ্জল তাঁহার যোগসূত্রে

বলিয়াছেন—শব্দের একটি বিশেষ এবং মহতী
শক্তি আছে।

উপযুক্ত শব্দ নির্বাচন এবং প্রয়োগ,
মন্ত্রকে সার্থক এবং সফল করে। ‘ভীত হও’
এই বাক্যটি উচ্চারণ মাত্র শ্রোতাদিগের হৃদয়ে
এক অস্বচ্ছন্দতার উদয় হয় আবার মাঠে:
শব্দ উচ্চারণে অস্বচ্ছন্দতা দূর হইয়া সঙ্কোচ
অপসারিত হয় হৃদয় উদার উৎসাহে পরিপূর্ণ
হইয়া আবার স্ফীত হইয়া উঠে।

কত যুগ যুগান্তর হইতে ভারতবর্ষীয় নারী-
গণ আপনাদিগকে কেবলি হীন তুচ্ছ অক্ষম
এবং দুর্বল বলিয়া ধারণা করিয়া আসিতেছেন।
সহস্র প্রকারে সহস্র ঘটনায় এই ধারণা
তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। শিশু
পুত্রের জন্মে গৃহে গৃহে যে আনন্দ উৎসব হয়,
বাশরীতে যে আনন্দের রাগিনী বাজিয়া উঠে
আত্মীয় স্বজন যেমন মুক্ত হস্তে দান ও পারি-
তোষিক বিতরণ করেন শিশু কণ্ঠার আগমনে
তাহার একাংশও দেখা যায় না। সেদিন
মাতা যে সুকুমার শিশু কণ্ঠাটিকে বক্ষের
কাছে টানিয়া লইয়া স্মৃতিকা গৃহে শয়ন করিয়া
থাকেন কোন আনন্দ কোলাহল কোন
উৎসব বাণ কোন আত্মীয়ের সাগ্রহ আগমন
সে নিভৃত কক্ষের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করে না,
কোন মঙ্গল অনুষ্ঠান সেই নবীন জীবনের
শুভাগমন সূচনা করেনা। তাহার অস্তিত্ব যে
আছে তাহা স্বীকার করিতে যেন সকলে
কুণ্ঠিত সেই জন্তই ভারতের প্রত্যেক বাণিকা
যখন নারী পদবীতে উন্নীত তখনও সে আপন
গৌরবের অধিকারী হইতে শিক্ষালাভ করেনা,

সে মনে করে সে কিছুই নয়, তাহার কোন শক্তি কিম্বা কোন কর্ণেব অধিকার পর্য্যাপ্ত নাই। সে বলে আমি তুচ্ছ মূঢ় নারী আমার দ্বারা সংসারের কোন উপকার হইবে! নিত্য নিয়ত আপনাকে এই দীন হীনভাবে ধারণা করিয়া তাহার জীবনের মূল্য যথার্থই হীন হইয়া পড়ে, তাহার দুর্বল ক্ষীণ হস্তে পরিবার সমাজ এবং জাতির শাসন কুশাসনে পরিণত হয়।

হায় ভগ্নিগণ একি ভ্রান্তি! এই অশুভ ভ্রান্তির জন্ত আমাদের জাতির কতই না ক্ষতি হইয়াছে। প্রত্যেক শিশু কণ্ঠার জন্ম দিবসকে ছুঃখের অকল্যাণের নগণ্য দিন মনে না করিয়া তাহা এক এক জন বিশ্ববিজয়িনী শাসন-দণ্ড-ধাবিনী সম্রাজ্ঞীর জন্মোৎসব স্বরূপ শুভ অনুষ্ঠান সমূহে পরিপূর্ণ করা কর্তব্য। এই জনের আনন্দ বার্তা চারিদিকে প্রচার করিয়া অতি শিশুকাল হইতে তাহাকে আপন রাজকীয় শক্তি অনুভব করিতে শিক্ষা দান করা আবশ্যিক। যাহাতে ভবিষ্যত অভিষেকের দিনে সে আপনাব সঞ্চিত সমগ্র শক্তির প্রভাবে সেই মহাভাগ্যের যোগ্য হইতে পারে।

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত এবং আত্মমর্যাদাবোধ বিকাশের জন্ত প্রথমে 'আমি আছি' পরে 'আমরা আছি' এই মন্ত্র জপ করিতে হইবে। এই মন্ত্র সাধনায় আমাদের হৃদয়-যতই বিকশিত হইতে থাকিবে আমাদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উদ্ভিত হইবে 'কেন আছি'? আমার ব্যক্তিগত এই নারী জীবনের কর্তব্য এবং উদ্দেশ্য কি? সমাজে আমার এই নারী অস্তিত্বের সার্থকতা কি? এই যে ভারত মহা-বর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি তাহা সার্থক করিব

কেমন করিয়া, কেমন করিয়াই বা বিশ্বনারী-সমাজের সমকক্ষ গৌরব রক্ষা করিতে পারিব?

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যের প্রশ্নগুলি হৃদয়ে উদয় হইবার পরে ক্রমে কেমন করিয়া সে উদ্দেশ্য সার্থক হওয়া সম্ভব তাহারি চেষ্টায় আমরা অনুপ্রাণিত হইব। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে দূরে যাইতে হইবে না, জড়প্রকৃতি জীবদেহে কেমন করিয়া আপন কার্য্যপ্রণালী নিয়মিত করে তাহা বুঝিয়া দেখিলেই আমরা আমাদের পথ দেখিতে পাইব।

জীবদেহের স্নায়ু মণ্ডলীর গঠন এবং কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় ইহা তিনটি পদার্থ যোগে নির্মিত—যথা ইন্ড্রিয়, স্নায়ু এবং মাংসপেশী। বাহিরের সংস্পর্শ যখন কোন জ্ঞানেন্ড্রিয়কে আঘাত কবে তখন সেই স্পর্শের উত্তেজনার সেখানে পরিবর্তন ঘটে। সেই পরিবর্তনের স্রোত স্নায়ুদ্বারা বাহিত হইয়া মাংসপেশীতে নীত হয়। তাহার ফলে কঠিন পদার্থের সান্নিধ্যবশতঃ আমাদের দেহ সঙ্কুচিত হয়। আমরা সেই কাঠিন্যের আঘাত বাঁচাইবার জন্ত আপনাকে সতর্ক করি। স্নায়ুমণ্ডলী প্রধানতঃ পেশীসঞ্চালক সূক্ষ্ম শিরা দ্বারা গঠিত, এই সূক্ষ্ম শিরাগুলি দ্বারা মাংসপেশীতে বাহিরের উত্তেজনা বাহিত হয়।

মানব জগতেও তেমনি কতক লোক আছেন যাহারা আমাদের দৈহিক ইন্ড্রিয়ের স্রাব বহির্জগৎ হইতে ভাব সংগ্রহ করেন, সংযোজক পস্থা দ্বারা সেই ভাবগুলিকে অপর কাহারও কাছে উপস্থিত করিলে আবার কতক লোক আছেন যাহারা মাংসপেশীর স্রাব সেই ভাবকে কার্য্যে পরিণত করিতে

পারেন। আমাদের মহামণ্ডলের ঞ্চার সভা সমিতিগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে স্নায়ু মণ্ডলীর ঞ্চার ভাব সঞ্চারণ করিবে এবং আমাদের কার্যকুশল সভ্যগণ মাংসপেশীর ঞ্চার সেই ভাবগুলি কার্যে পরিণত করিবেন।

এতদিন পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিক মহিলাসমিতি স্থাপিত হইয়াছিল—তাহারা যেন জীবজগতের প্রথম প্রাণীর (Jelly fish) সর্কাপেক্ষা সরল স্নায়ুমণ্ডলের ঞ্চার। সেই প্রথম সরল স্নায়ুমণ্ডলী হইতে ক্রমে যেমন এই জটিল স্নায়ুতন্ত্র মানব স্নায়ু-মণ্ডলীর বিকাশ হইয়াছে তেমনি প্রাথমিক প্রাদেশিক সমিতি সকলের ক্রমোন্নতি স্বরূপ আজিকার এই ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল জন্ম লাভ করিয়াছে। এক্ষণে ভারতে চিন্তাশীলা এবং হৃদয়বতী রমণীগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ বিশেষ ভাবে অমুপ্রাণিত, ভবিষ্যৎ কর্মীদের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে, অবস্থার জটিলতার বৃদ্ধি পাইতেছে, সুতরাং চিন্তাশীলা রমণীদিগের সহিত কার্যকুশলা নারীগণের সংযোগ একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে, এই সংযোগ সাধনের জন্তই ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের স্থাপনা। পূর্বে কোন ভাবের সঞ্চারণ কিম্বা বিকাশ তাহার উৎপত্তিস্থানের আশপাশের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত, এখন মহামণ্ডল স্থাপনের জন্ত প্রত্যেক নূতন ভাব, নবীন উদ্ভব যে কোনও প্রদেশেই উদ্ভাবিত হউক না কেন তাহা ক্রমে শরীরের রক্তশোতের ঞ্চার ভারতবর্ষের সর্বত্রই সঞ্চারিত হইবে।

চিন্তাশীলা এবং কার্যকুশলা ভারতরমণীগণের নিমিত্ত এই স্ত্রী মহামণ্ডলী একটি

সাধারণ কেন্দ্র স্থল, ইহার অবলম্বনে প্রথমতঃ আপন জীবনের উন্নতি সাধন করিয়া ক্রমে সমাজের দেশের এবং বিশ্বসংসারের উন্নতি সাধন করিতে আমরা সক্ষম হইব। একই মহৎ আদর্শ আমাদের প্রত্যেক ভারতবর্ষীয় রমণীর জীবনের লক্ষ্য হইলে আমরা একতার যে সুদৃঢ় সূত্রে গ্রথিত হইব তাহা কিছুতেই ছিন্ন হইবার নয়। এই এক লক্ষ্যের আনন্দ আমাদের কর্তব্যপথে উৎসাহিত এবং মহত্ব প্রণোদিত করিবে। পরে সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় আপনাদের সামান্য পরিচয় লাভের পর যখন আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাৎসরিক সম্মিলনের সময় মিলিত হইব তখন সেই অর্ধপরিচিত কিম্বা শ্রুত মাত্র নামা ভগিনীগণের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ণ পরিচয় লাভে এবং দেশহিতকর বিবিধ বিষয় আলোচনা করিয়া কি অপূর্ণ আনন্দ সম্ভোগ করিব? বিভিন্ন প্রদেশের বিচিত্র স্বভাবের রমণীগণ একত্রিত হইয়া যখন কেহ আপনার বিবিধ চিন্তা ও উন্নতি চেষ্টা কেহ বা সম্পন্ন কার্যের বিবরণী প্রকাশ করিবেন তখন সহানুভূতি দান এবং গ্রহণ করিয়া আরও কত ঘনিষ্ঠ এবং স্নেহময় বন্ধনে আমরা আবদ্ধ হইব।

এইরূপে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল দেশের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত নারী শক্তি একত্র করিয়া প্রভূত উন্নতি সাধন করিবে—পুঞ্জীভূত তড়িৎ শক্তি বিবিধ তারসংযোগে সর্বত্র সঞ্চালিত হইয়া যেমন আলোক এবং আরাম বিস্তার করে তেমনি আমাদের ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের পুঞ্জীভূত শক্তি বিবিধ শাখা সমিতির দ্বারা ভারতবর্ষের দূরতম প্রদেশ

সমূহে নীত হইয়া উন্নতি শিক্ষা এবং আনন্দ বিস্তার করিবে। শতাব্দী পূর্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিসকল পরস্পর, মরু, নদী ও সমুদ্রের দূরতার ব্যবধানে যথার্থই ভিন্ন ছিল, কিন্তু আজিকার দিনে বাষ্পীয় যান এবং তড়িৎশক্তি প্রভাবে মানব বুদ্ধি এবং পরিশ্রমের উদ্ভাবনে তাহারা ভিন্ন নাই এক হইয়া গিয়াছে, দূরতা দূর হইয়াছে, সেতু, সুরঙ্গ, জল প্রণালী, তাড়িতবাহ্যাবহ, বাষ্পীয় যান এবং অর্নবপোত আজ তাহাদের সন্নিকট করিয়াছে। ভারত মহাদেশের ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অংশ গুলি যে একত্রে সংযোজিত হইয়া এক হইয়াছে; বিভিন্ন জাতি সকল যে এক রাজনৈতিক শাসনাধীন হইয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে বিশ্বনিয়ন্তা পরম পুরুষ একদিন তাহাদিগকে এক আধ্যাত্মিক সূত্রে গ্রথিত করিবেন ইহাই তাহার পূর্ব সূচনা।

হিন্দুজাতি আমরা আমাদের জগদীশ্বরের বিশেষ কৃপাপাত্র মনে করি। আমাদের ধর্ম শাস্ত্র আমাদের চতুর্বেদ তাহার স্বহস্তের দান বলিয়া বিশ্বাস করি। আমরা যে অংশে সকল জাতির মধ্যে কল্যাণবিস্তার করিতে পারি সেই অংশে আমাদের প্রতি তাহার দয়ার বিশেষ পরিচয়। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে এই বিশাল বিশ্বে যে বিবিধ মানব জাতি সৃষ্ট হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিশ্বমানব সংসারের উন্নতির নিমিত্ত কিছু না কিছু গুণ সঞ্চিত আছে, সেই গুণাবলীর সম্মিলনেই সমগ্র মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ সাধিত হইবে। তাই কেবল আর্ঘ্য রমণীকে এই স্ত্রী মহামণ্ডল ভুক্ত

করিলে হইবে না, ইণ্ডো-আরিয়ান (ভারতীয় আর্ঘ্য) ইণ্ডো-সেমিটিক, ইণ্ডোমঙ্গোলিয়ান এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সকলকেই ইহার উদার বেটনের মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে। জাতি বর্ণ ধর্ম রাজনৈতিক মতামত বা দল নির্বিশেষে সকলেই ইহার সভ্য হইতে পারিবেন। এক কর্মসূত্রে ইহা ভারতবর্ষের সর্বত্র মনস্বিনী-গণকে গ্রথিত করিবে, তাহাদিগকে উদার উন্নতির পথে অগ্রসর করিবে। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের সমুদ্রের ত্রায় উদারবক্ষে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাদেশিক সমিতি সকল অসংখ্য স্বল্পতোয়া স্রোতস্বিনীর ত্রায় আসিয়া একত্র সম্মিলিত হইবে।

ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল একটি প্রকাণ্ড যন্ত্র স্বরূপ, ইহা দেশের বিভিন্ন অংশের সর্বত্র নারী-সাধিত কার্যের সংবাদ সংগ্রহ করিবে এবং তাহাদিগকে নিত্য নূতন নূতন কার্যের প্রেরণায় উৎসাহিত করিবে। প্রারম্ভে ইহার কার্যপ্রণালির বিবিধ স্বগন এবং ত্রুটি থাকিয়া যাইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু আশা করা যায় কাল সহকারে সে সকল সংশোধিত হইয়া উত্তরোত্তর, ইহা অধিকতর সফলতা ও কার্যকুশলতা লাভ করিতে সক্ষম হইবে এবং শোভা ও সম্পদের অধিকারী হইবে।

ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল দেহস্বরূপ এবং বিভিন্ন শাখাবলী তাহার অবয়ব সমূহের ত্রায় ভারতের সর্বত্র বিস্তারিত থাকিয়া তাহাতেই সংযোজিত থাকিবে। শাখাসমিতিসমূহ প্রাদেশিক সকল মহিলা সমিতিকে একত্রিত করিয়া মহামণ্ডলের সহিত সংযুক্ত করিবে, বাৎসরিক সম্মিলনের সময়ে প্রত্যেক

প্রাদেশিক মহিলাসমিতিগুলি প্রতিনিধির দ্বারা আপনাপন কার্যাবলী পাঠ করাইবেন—প্রশংসা ভাজন হইবার জন্ত প্রত্যেকেরি চেষ্টা হইবে যাহাতে অপর অঙ্গগুলির অপেক্ষা কোন বিষয়ে হীন হইতে না হয়।

নিম্ন লিখিত প্রকারে ইহার সংগঠন সাধিত হইবে—দেশের মহারানী রাণী এবং বেগমগণ পর্যায় ক্রমে ইহার সভাপত্রীর পদলাভ করিবেন, অভিজাত এবং ভদ্র বংশোদ্ভূত মহিলাগণ প্রতিনিধি সভাপত্রীর আসন প্রাপ্ত হইবেন! ভারত সাম্রাজ্যী ইহার প্রধান পোষয়িত্রী, বড়লাট পত্নী এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক লাট পত্নীগণ ইহার প্রতিনিধি পোষয়িত্রী হইবেন। কার্যকরী সভাব সভ্য এবং সম্পাদিকা পদের দায়িত্ব প্রায়শঃই ভারতীয় নারীর উপর ব্রহ্ম হইবে, এদেশ বাসী ইংরাজ মহিলাদিগের মধ্য হইতে বিশিষ্ট সহায়কারিণী সভ্য গ্রহণ করা হইবে—তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শদ্বারা আমাদেরকে লাভবান করিবেন।

আগামী বৎসরের জন্ত কি কি কর্তব্যভার হাতে লওয়া যাইবে এখন তাহাই বিবেচ্য। আমাদের বর্তমান জীবনের প্রধান সমস্যা নারীদিগের শিক্ষা সাধন। একজন ইংরাজ মহিলা যথার্থই বলিয়াছেন—গৃহের সৌষ্ঠব সাধনই নারী জীবনের প্রধান এবং বিশেষ কর্তব্য—কোন পুরুষই আমাদের এ অধিকার চ্যুত করিতে পারেন না। কেননা অগ্ন মধুমক্ষিকা যেমন মধুচক্র রচনা করিতে পারেনা তেমনি কোন পুরুষই একক গৃহ রচনা করিতে পারেন না—তিনি প্রাসাদ এবং হর্ন নির্মাণে সক্ষম কিন্তু কুবেরের ত্রায় অক্ষয় ঐশ্বর্যের কিম্বা বৃহস্পতির ত্রায় অপার বুদ্ধির

অধিকারী হইয়াও তাঁহার গৃহ নির্মাণ চেষ্টা সার্থক হয়না, একাধা এই আনন্দ মন্দির রচনা কেবল মাত্র নারীদ্বারাই সাধিত হয়।

গৃহরূপ আনন্দ মন্দির রচনাই যদি নারী জীবনের বিশেষ কর্তব্য হয় তবে তাহাকে তত্পরসূক্ত শিক্ষা দান করিতে হইবে। এখন দেখা যাউক গৃহটি কি কি উপাদানে গঠিত। পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর আবাস, সুচরিত স্বামী, সখি ও পতিব্রতা স্ত্রী এবং সুবাস্তা সস্তান এই কয়টি জিনিষে মিলিয়া একখানি সুন্দর গৃহ হয়—গৃহকে স্বাস্থ্যের আধার করিতে হইলে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইতে হইবে এবং সেই নিয়মানুযায়িক বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। গৃহকে পরিপাটি ও আরামের আধার করিতে হইলে শিক্ষার দ্বারা নিয়মিত সময়ে নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনের অভ্যাস রাখিতে হইবে, তাহা সর্বদা সুগোছাল রাখিতে হইবে,—মনে রাখিতে হইবে তাহা দুদিনের পাহাশালা নহে তাহা আজীবনের আশ্রয়।

স্বামীর অমুরতাও সঙ্গিনী, তাঁহার সচিব ও সহকারিণী, তাহার বন্ধু ও সাহায্যদাত্রী হইতে হইলে শুধু রন্ধন কার্যে নিপুণতায় কুলাইবে না—অনেক বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে।

কেবল মাত্র স্বামীতে ভক্তিমতী হইলে হইবে না, তাঁহার জীবনের লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষা সকলের সহিত বুদ্ধিপূর্ণ সহানুভূতি থাকা প্রয়োজনীয়—শিক্ষা লাভ না করিলে ইহা ভালরূপ হওয়া অসম্ভব। একজন পুরুষ এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন দেখ,—“কোন ভারত রমণী যথার্থ ভাবে স্বামীর বন্ধু হইতে

পারেন না কেননা আজিও তিনি নিরক্ষর। সংসার ও জগৎ সম্বন্ধে কোনই অভিজ্ঞতা না থাকায়, নিতান্ত পারিবারিক ব্যাপার ছাড়া আর কোন বিষয়ে স্বামীকে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর নাই বলিলেই হয়। অতীত কালের ভগিনীদিগের ত্রায় আজ তাঁহার সে সাহস নাই যাহার বলে তিনি আপন স্বামীকে অর্থের পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন। হিন্দু রমণীর হৃদয়ে সে তেজ সে বিজ্ঞতা আজ কোথায় যার প্রভাবে প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা হৃদয়স্বত্বকে বলিয়াছিলেন “তুমি যদি মনে করিয়া থাক আমি একক অসহায় তবে আপন অন্তর্যামী বিধাতাপুরুষকে জাননা। তিনি তোমার অত্রায় জানিতেছেন—তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখে তুমি পাপকারী। পাপ করিয়া অজ্ঞ মনুষ্য মনে করে তাহা বুঝি কেহই জানিতে পারিল না; কিন্তু দেবতাগণ এবং অন্তর্যামী পুরাণ পুরুষ তাহার পাপের নিত্য সাক্ষী”। কোন আধুনিক মুখ ভীকু ছুর্কল রমণীর মনে উপরোক্ত কথা বলিতে সাহসে কুলায়না। বর্তমান নারীগণ সাহস এবং গভীর ধৈর্যের সহিত না পারেন বিপদ বহন করিতে, না পারেন ছুর্ক্যবহারের প্রতি-কূলতা করিতে। বিপদসঙ্কুল সংসারসমুদ্রের কাণ্ডারী হওয়াত দূরের কথা তিনি আজ কাল স্বামীর বন্ধু নামেরও যোগ্যা নহেন।”

• স্বামীর নৈতিক ব্যবহার অনেক পরিমাণে স্ত্রীর কল্যাণপ্রভাবের উপর নির্ভর করে। অল্প একজন পুরুষ বলিয়াছেন “ভারত নারী অশিক্ষিত হওয়ায় শিক্ষিত পুরুষগণ তাঁহাকে আপনাদিগের যোগ্য সঙ্গিনী মনে করেন না কাজেই তাঁহাদের বিবাহিত জীবন

নৈতিকশক্তি বিহীন। স্ত্রী যদি সহধর্মিণী সহ-কর্মিণী না হইয়া কেবলমাত্র বিলাস এবং উপভোগের সামগ্রী হয় তবে গৃহের মঙ্গল প্রভাব নষ্ট হইয়া যায়। গার্হস্থ্য জীবনের এই হীন অবস্থা দাম্পত্য সম্বন্ধকে নিতান্ত কলুষিত করিয়া ফেলে—এই নিমিত্তই ভারত-বর্ষীয় পুরুষগণ দিন দিন হীনচরিত্র এবং ধর্ম সম্বল শূন্য হইয়া পড়িতেছেন।” স্বামীকে ধর্ম এবং মহত্বের পথে উৎসাহিত করাই পত্নীর প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ কর্তব্য—অশিক্ষিতা হইলে ইহাতে অকৃতকার্য হওয়া ও তৎফলে দুঃখ পাওয়া অবশ্যস্তাবী।

শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা বিশেষরূপে জানি ক্ষুদ্র শাখা যদিকে আনত হয়—বৃহৎ মহীকুহ সেই দিকেই বুঁকিয়া থাকে। পরজীবনে সংশোধন চেষ্টা সর্বথা বৃথা হয়। মাতা স্বয়ং যদি সংযম, বাধ্যতা, সত্যবাদিতা, আত্মরক্ষা এবং স্বাস্থ্য রক্ষার শিক্ষা না প্রাপ্ত হইলে তবে কেমন করিয়া সন্তানকে সে শিক্ষা দান করিবেন? সন্তানের ষপার্থ শুভজ্ঞানবিরহিত সন্তান স্নেহ ভারতবর্ষীয় গৃহে অকল্যাণের বীজ। পতির কোন হুঁকুহ উদারকর্তব্য ও চিন্তার অংশে ভাগগ্রাহিতাশূন্য পতিপ্রেম ভারতীয় দাম্পত্যে শনির গ্রহ। স্বাস্থ্য নিয়ম, পরিচ্ছন্নতা ও সময়ের মূল্য জ্ঞানহীন গৃহকার্য পরায়ণতা ভারতে গার্হস্থ্যধর্মের অঙ্গহানিতা। অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া লজ্জার পরিচয় দান অথচ অশ্লীল বাক্যব্যবহার এবং অশ্লীল সঙ্গীত গান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ডাবোধ না করা ভারতে নারীদের কলঙ্ক। নারীগণের বিবেচনা হীন অথবা দান ষপার্থ পক্ষে

ভারতে পরোপকার সাধনের বিশেষ বাধা। উল্লিখিত প্রত্যেক ভ্রান্তি অশ্রায় ও কুসংস্কার দূর করিবার জন্তই স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ আবশ্যিক।

শিক্ষা বিভাগের কার্য বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় শতকরা একজন মুসলমান বা হিন্দুবালিকা শিক্ষার জন্ত বিদ্যালয়ে যাইয়া থাকে। বাল্যবিবাহ এবং অবরোধ প্রথা স্ত্রী শিক্ষার প্রধান অন্তরায়। এই জন্তই গৃহে থাকিয়া বালিকাগণ যাহাতে শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহারি ব্যবস্থা বিশেষরূপে ভারতবর্ষীয় সমাজের উপযোগী। আমাদের খ্রীষ্টান ভগিনীগণ এই সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসা যোগ্য। তবে তাঁহাদের বাইবেল প্রচারের চেষ্টা তাঁহাদের অন্তঃপুর প্রবেশের বিশেষ বাধা—বিশেষতঃ বিদেশী, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, ভিন্ন পরিচ্ছদ পরিহিত ও আহার বিহারের রুচি স্বতন্ত্র হওয়ায় শিক্ষয়িত্রী এবং শিষ্যার মধ্যে সহানুভূতির বন্ধন দৃঢ় হয় না এবং কচিৎ তাঁহারা ছাত্রীদিগের হৃদয় স্পর্শ করিতে কিম্বা শিক্ষা সম্বন্ধে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে সক্ষম হইলেন। অশিক্ষিত ভগিনীদিগকে শিক্ষা দান করা তাহাদের জীবনে শিক্ষার নবীন আলোক ও আনন্দ আনয়ন করাই আধুনিক শিক্ষা সৌভাগ্যবতী ভারত রমণীর সর্ব প্রধান কর্তব্য।

সেই জন্তই অন্তঃপুর-শিক্ষা-প্রচার ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সর্ব প্রথম সাধ্য! এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রদেশে অর্থ ও স্বচ্ছা শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহ ও বেতনপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত

করিতে হইবে। ভবিষ্যতে কার্য সৌকর্যার্থে এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংগৃহীত টাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন রাখা যাইবে।

ভারত নারীর জন্ত পাঠ্য-পুস্তক রচনা এবং ভারতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন আমাদিগের দ্বিতীয় সাধ্য।

এই নিমিত্ত প্রথম প্রথম আমাদিগকে বাধা হইয়া ইংরাজী পুস্তক সকল ভাষান্তর এবং আমাদের দেশের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। মহামণ্ডলের প্রত্যেক শাখা সভায় এই কার্যের জন্ত লেখিকা নিযুক্ত করিতে হইবে। তাঁহারা ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় নির্বাচিত পুস্তক সকল অনুবাদ করিবেন—তৎপরে তাহা মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইয়া অন্তঃপুর শিক্ষার জন্ত ব্যবহৃত হইবে। যতদিন না হয় ততদিন যোগ্য যে কোন পুস্তক পাওয়া যায় তাহার দ্বারাই শিক্ষা কার্য আরম্ভ করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নারী হস্তের শিল্পকার্য বিক্রয়ের নিমিত্ত ভাণ্ডার স্থাপন করা মহামণ্ডলের তৃতীয় সাধ্য।

বিস্তৃত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নারীগণের চিকিৎসার জন্ত যে যে আয়োজন আছে—ভারতীয় নারীগণ তাহা হইতে কতদূর লাভ উঠাইতেছেন, এ বিষয়ে কোন্ কোন্ বাধা বর্তমান আছে এবং কোন্ উপায়েই বা সে সকল সুন্দররূপে দূর করা সম্ভব এই বিবরণক অনুসন্ধানই এই বৎসরের চতুর্থ এবং সর্বশেষ কার্য। *

শ্রীসন্নতা দেবী।

* গত ৩০ শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে আহৃত ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের বৃহত্তী সভায় ইংরাজী ভাষায় গঠিত শ্রীমতী শ্রিয়মদা দেবী কর্তৃক বাঙ্গলার অনুবাদিত।

চয়ন।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

সাংহোপুলো (সিংহপুর)।

সিংহপুর রাজ্য ৩৫০০ কি ৩৬০০ লি বিস্তৃত। ইহার পশ্চিমে সিন্ধু নদী। রাজধানী ১৪।১৫ লি; চতুর্দিক দূরারোহ পর্বতশ্রেণী ইহাকে সুরক্ষিত রাখিয়াছে। ভূমি রীতিমত কর্ষণ করা হয় না কিন্তু তত্রাপি দেশে প্রচুর শস্য জন্মে। শীত ঋতুই প্রবল; অধিবাসীরা নিষ্ঠুর, সাহসী এবং অত্যন্ত প্রতারণা-পরায়ণ। এই দেশ কাশ্মীরের অধীন। রাজধানীর দক্ষিণে অশোক-রাজ নির্মিত স্তূপ। কারুকাৰ্য্যগুলি বিনষ্ট হইয়াছে কিন্তু অনবরত এই স্তূপে অনৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হয়। নিকটেই জনশূণ্ড সজ্জারাম; উহাতে কোন যতি নাই।

নগরের দক্ষিণ পূর্বে ৪০ কি ৫০ লি দূরে অশোক-রাজ নির্মিত প্রস্তরস্তূপ। ইহা উচ্চে ২০০ ফুট। এই স্থানে দশটি পুষ্করিণী; ইহাদের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সংযোগ আছে। দক্ষিণে ও বামে আবৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ রাশি। পুষ্করিণীর জল স্বচ্ছ কিন্তু তরঙ্গগুলি মধ্যে মধ্যে শব্দ করে। সর্প ও অন্যান্য নানাপ্রকারের মৎস্য ইহাতে বাস করে। চতুর্দিকের পদ্ম স্বচ্ছ জল আবৃত করিয়া রহিয়াছে। শত শত প্রকারের ফলের বৃক্ষ পুষ্করিণীর চতুর্দিকে থাকিয়া নানারূপে ছায়া প্রদান করে। বৃক্ষের ছায়া জলে প্রতিবিম্বিত হয় এবং ভ্রমণের জন্য এই স্থান অত্যন্ত উপযোগী।

নিকটে জনশূণ্ড সজ্জারাম। খেতাবরদিগের শিক্ষক স্তূপের সন্নিকটে প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন। নিকটেই দেবতাদিগের মন্দির। যে সকল ব্যক্তি এই মন্দিরে বাস করে, তাহারা কঠোর তপস্বী করেন। দিবারাত্রির মধ্যে একবারও অবসর গ্রহণ করেন না। ইহাদের প্রবর্তক, বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত পুস্তক হইতে বুদ্ধের আদেশাবলী অপহরণ করিয়াছেন। ইহারা

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত এবং তদনুযায়ী নিজেদের উপদেশ নির্ধারিত করেন। প্রধানগণ ভিক্ষু নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন; কনিষ্ঠগণ ভ্রমণ নামে অভিহিত হন। আচার ব্যবহারে তাহারা বৌদ্ধ যতিগণের ত্রায় কিন্তু ইহাদের মস্তকে শিখা আছে এবং ইহারা উলঙ্গ। যদি কোন সময় বস্ত্র ব্যবহার করিবার ইচ্ছা হয়, তবে শুভ্র বস্ত্র ব্যবহার করে। অপরের সহিত ইহাদের এই মাত্র প্রভেদ।

টাচানিলোর উত্তর সীমার দিকে অগ্রসর হইয়া সিন্ধু নদী পার হইয়া আমরা দক্ষিণ পূর্বেদিকে ২০০ শত লি অগ্রসর হইয়া যে স্থানে মহাসত্ত্ব রাজকুমার কাপে মার্জ্জারের আহারের জন্য দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হই। এই স্থানের ৪০।৫০ পদ দক্ষিণে প্রস্তর স্তূপ আছে। এই স্থানেই মহাসত্ত্ব মার্জ্জারের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বংশদণ্ড দ্বারা নিজ শরীর বিদ্ধ করিয়া নিজ রক্ত মার্জ্জারকে দান করিয়াছিলেন। মার্জ্জার এই রক্ত পান করিয়া সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এইজন্য এই স্থানের মৃত্তিকা ও বৃক্ষাদি রক্তবর্ণ। মৃত্তিকা খনন করিলে কণ্টকময় যষ্টি এখনও পাওয়া যায়। গল্পটি বিশ্বাসযোগ্য কিনা ইহা বিচার না করিলেও, ইহা যে করুণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যে স্থানে মহাসত্ত্ব নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহার উত্তরেই রাজা অশোক নির্মিত দুই শত ফুট উচ্চ প্রস্তর স্তূপ আছে। ইহা কারুকার্য্যে সমৃদ্ধ। মধ্যে মধ্যে অনৈসর্গিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়। এই স্মরণীয় স্থানের চতুর্দিক একশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপে চলনশীল প্রস্তরের কুলঙ্গী আছে। পীড়িত ব্যক্তি এই স্থান প্রদক্ষিণ করিলে আরোগ্য লাভ করে। স্তূপের পূর্বে একটা সজ্জারাম আছে। তথায় মহাযানমতাবলম্বী একশত যতি বাস করেন। ৫০ লি পূর্বেদিকে অগ্রসর হইয়া আমরা এক নির্জন পর্বতে উপস্থিত হই। এই স্থানে এক সজ্জারামে

২০০ শত যতি বাস করেন। ইহারা সকলেই মহাবান মতাবলম্বী। এখানে প্রচুর পরিমাণে পুষ্প ও ফল পাওয়া যায়। পুষ্করিণী ও ঝরণার জল দর্পণের স্থায় স্বচ্ছ। এই মাঠের নিকটে প্রায় ৩০৫ শত ফিট উচ্চ স্তূপ আছে। তথাগত পুরাকালে এইস্থানে বাস করিতেন এবং এক ছুটে যক্ষকে মাংস ভক্ষণ হইতে বিরত করেন। দক্ষিণপূর্বাংশে ৫০০ লি বাইয়া আমরা উলাশি (উরাস) দেশে পৌঁছি।

উ-লা-সি।

এই রাজ্য প্রায় ২০০০ লি বিস্তৃত। উপত্যকা ও পর্বতগুলি অবিচ্ছিন্ন। রাজধানী ৭৮ লি বিস্তৃত। এদেশে রাজা নাই; দেশ কাশ্মীরের অধীন। ভূমি কর্ষণ ও বপনের উপযোগী কিন্তু ফল পুষ্প কম। জল বায়ু উত্তম; অধিক বরফ বা হুমার নাই। অধিবাসীরা বর্ষের ও প্রতারণা-পরায়ণ। বৌদ্ধধর্মে ইহাদের আস্থা নাই।

রাজধানীর ৪৫ লি দক্ষিণ পশ্চিমে অশোকরাজ নির্মিত স্তূপে কয়েক জন যতি বাস করেন। এই স্থান হইতে দক্ষিণ পূর্ব দিকে পর্বতশ্রেণী ও গিরিশৃঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া প্রায় এক সহস্র লি বাইয়া আমরা কিয়া সিমিলো (কাশ্মীর) পৌঁছি।

কাশ্মীর।

কাশ্মীর প্রায় সাত সহস্র লি বিস্তৃত এবং এই রাজ্যের চতুর্দিকেই পর্বতশ্রেণী। পর্বতগুলিও খুব উচ্চ। পর্বতমাধ্যস্থিত গিরিশৃঙ্গগুলি সঙ্গীর্ণ। নিকটবর্তী কোন রাজাই ইহাকে আক্রমণ করিয়া জয় লাভ করিতে পারেন নাই। রাজধানীর পশ্চিমাংশে বৃহৎ নদী। রাজধানী উত্তর দক্ষিণে ১২ কি ১৩ লি এবং পূর্ব পশ্চিমে ৪ কি ৫ লি। শাক সম্রাট উৎপাদনের পক্ষে প্রশস্ত এবং দেশে যথেষ্ট ফল পুষ্প পাওয়া যায়। এই দেশে দৈত্য—ঘোটক, সুগন্ধি, হরিয়া ও ভেষজ লতা পাওয়া যায়।

জলবায়ু শৈত্যপ্রধান। যথেষ্ট বরফ পড়ে কিন্তু ঝটিকা নাই। অধিবাসীরা চর্মের অঙ্গরাখা ও স্ত্রীস্বত্বব্যবহার করে। নিকটবর্তী অন্যান্য প্রদেশের

জনসাধারণের উপরে ইহারা কর্তৃত্ব করে। অধিবাসীরা দেখিতে সুশ্রী কিন্তু প্রতারক। ইহারা উপযুক্ত রূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় এবং বিদ্যাভাসে রত। অধিবাসী ও ধার্মিক উভয় প্রকার লোকই ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় একশত সজ্জারাম ও ৫ সহস্র যতি আছে। অশোকরাজ নির্মিত ৪টি স্তূপ আছে। প্রত্যেকটিতেই তথাগতের শরীরচিহ্ন বিদ্যমান। দেশের প্রাচীন ইতিহাস এইরূপ—এই দেশে পূর্বে এক বিশাল হ্রদ ছিল। পুরাকালে বুদ্ধদেব উদ্যান দেশ হইতে এক দৈত্যকে দমন করিয়া মধ্যদেশে (ভারতবর্ষে) আগমন করিতেছিলেন। তখন মধ্যদেশে তিনি আনন্দকে বলিলেন “আমার নির্বাণের পরে অর্হৎ মধ্যস্থিত এই দেশে রাজ্যস্থাপনা করিবেন, ও অধিবাসীদিগকে দমন করিয়া স্বকীয় ক্ষমতার বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত করিবেন। নির্বাণের অর্ধশত বৎসর পরে, আনন্দের শিষ্য মধ্যস্থিত, ষড়ভিজ হইয়া এবং অষ্ট বিমোক্ষ লাভ করিয়া বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী অবগত হন। তাঁহার অন্তঃকরণ এ সংবাদে প্রফুর হইয়া, তিনি এই দেশে আগমন করেন। উচ্চ এক পর্বতের শীর্ষভাগে অধিবেশন করিয়া তিনি দৈত্যকে অনৈসর্গিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করাতে লাগিলেন। দৈত্য এই দৃশ্যে আশ্চর্য হইয়া অতঃপর কি ইচ্ছা জ্ঞানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। অর্হৎ দৈত্যের নিকট কেবল মাত্র তাঁহার বসিবার স্থান প্রার্থনা করিলেন। দৈত্য তাঁহার বসিবার জন্য স্থান নির্দেশ করিয়া সেই স্থান হইতে জল অপসরণ করিল। অর্হৎ তৎপরে নিজ দৈবশক্তিবলে নিজের শরীর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন এবং দৈত্যরাজও জল স্থানান্তরিত করিতে লাগিল। এই প্রকারে হ্রদ জলশূন্য হইল। ইহাতে নাগ পরাজিত হইয়া বাসের জন্য স্থান প্রার্থনা করিল। অর্হৎ তখন বলিলেন যে ঐস্থানের উত্তর পশ্চিম কোণে ১০০ ডি বিস্তৃত একটা ক্ষুদ্রজলাশয় আছে। ঐস্থানে দৈত্য ও তাহার বংশাবলী বাস করিতে পারিবে। দৈত্য তখন নিবেদন করিল যে হ্রদ ও দৈত্যের আবাস স্থল যখন হস্তান্তর হইয়াছে, তখন অর্হৎকে পূজা করিবার জন্য তাহাকে আদেশ দেওয়া হউক।

মধ্যাহ্নি ঠা উত্তর করিলেন যে “কিছুদিন পরেই আমি নির্বাণ প্রাপ্ত হইব ; সুতরাং আমার ইচ্ছা থাকিলেও কেমন করিয়া আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি?” নাগ তখন উত্তর করিল যে তাহা হইলে ৫০০ শত অর্হৎ যেন বৌদ্ধধর্মের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার পূজা গ্রহণ করেন। তৎপর সে মধ্যাহ্নিকার নিয়োজিত স্থানে প্রত্যাগমন করিয়া বাস করিবে।” মধ্যাহ্নিকা তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

অর্হৎ এই প্রকারে নিজ দৈবশক্তিবলে এই দেশ গ্রহণ করিয়া ৫০০ শত সজ্জারাম নির্মাণ করিলেন। তৎপর যতিগণের দেবাশুশ্রুষার জন্ত তিনি নিকটবর্তী দেশ সমূহ হইতে অনেক গুলি দরিদ্র লোক কয় করিলেন। কিন্তু তদ্দেশীয় উচ্চবংশীয় ব্যক্তিগণ মধ্যাহ্নিকার নির্বাণের পর এই নিম্ন-শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে সূণ্য করিয়া তাহাদের ‘ক্রীত’ আখ্যা দান করিল। কারণগুলি হইতে এইরূপে বুদ্ধ দ বাহির হইতেছে।

তথাগতের নির্বাণের একশত বৎসর পরে মগধরাজ অশোক পৃথিবীপতি হইলেন এবং দূর দেশের লোকের নিকটেও তিনি সম্মানিত হইতেন। তিনি ত্রিবিক্রে যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং সকল জীবকেই সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। তিনি ৫০০ অর্হৎ এবং ৫০০ শত ভিন্ন মতাবলম্বী পুরোহিতকে প্রভেদশূন্য ভাবে দেখিতেন। শেষোক্ত দিগের মধ্যে মহাদেব নামক এক সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রকৃত ধর্মের বিরুদ্ধে পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতেন। যিনি তাঁহার খ্যাতির কথা অবগত হইতেন তিনিই তাঁহার সংসর্গে যাইয়া তাঁহার মতাবলম্বী হইতেন। রাজা অশোক সাধু ও সাধারণ মনুষ্যে প্রভেদ না বুঝিতে পারিয়া এবং বিশেষতঃ যাহারা রাজদ্রোহী তাহাদেরই আনুকূল্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া যতিগণকে গজাগর্ভে নিমজ্জন করাইবেন বলিয়া গজাতীরে এক সভা আহুত করিলেন।

অর্হৎগণ বিপদাশঙ্কা করিয়া নিজেদের ঐশ্বরিক শক্তিবলে আকাশ মার্গে উড্ডীন হইয়া এই দেশে পৌঁছিয়া—পর্বতে ও উপত্যকার লুক্কায়িত রহিলেন।

অশোক এই সংবাদে অনুতপ্ত হইয়া নিজ দোষ ক্ষমার করিলেন এবং অর্হৎগণকে তাঁহাদের স্বদেশে প্রত্যাগমনের অনুমতি দিলেন। কিন্তু অর্হৎগণ অস্বীকৃত হইলেন। রাজা অশোক, তৎপর, অর্হৎগণের জন্ত পাঁচশত সজ্জারাম নির্মাণ করিয়া এই দেশ তাঁহাদের দান করিলেন।

তথাগতের নির্বাণের চারিশত বৎসর পরে রাজা কনিক রাজপদে আসীন হইয়া দেশ দেশান্তর জয় করেন। রাজকার্যের অবসর সময়ে তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম সংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠ করিতেন। প্রত্যহ তিনি প্রাপ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্ত আচার্য্য আহ্বান করিতেন কিন্তু তিনি দেখিতে পাইলেন যে ভিন্ন ভিন্ন মতে যথেষ্ট পার্থক্য। ইহাতে তিনি সন্দিগ্ধ হইলেন কিন্তু কোন প্রকারেই সন্দেহ ভঞ্জে সক্ষম হইলেন না। এইসময়ে মাননীয় পার্শ্ব বলিলেন যে “তথাগতের নির্বাণের পর অনেক বৎসর এবং অনেক মাস অতি-বাহিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ গুরুর পুস্তকানুযায়ী মতের অনুসরণ করে। এতদ্ব্যতীত নিজ নিজ মতের অনুসরণের জন্ত এত বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।” রাজা এই সংবাদে অত্যন্ত কাতর হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পার্শ্বকে বলিলেন “যদিও আমার নিজের কোন পুণ্যবল নাই তত্রাপি বুদ্ধদেবের জন্ম জন্মান্তরে যে পুণ্য সঞ্চিত করিয়াছি, তাহারই কলে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি আমার স্বকীয় হীন জন্মের কথা বিস্মৃত হইয়া সত্যধর্ম রাখিবার চেষ্টা করিব। এই জন্ত আমি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ানুযায়ী জিপটিক চর্চার ব্যবস্থা করিব।” পার্শ্ব তদন্তরে বলিলেন যে, রাজার পূর্ব-জন্মার্জিত পুণ্যফলে এই উচ্চাবস্থা তিনি এই জন্মে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি যাহাতে বৌদ্ধধর্মাত্মবোধিত কর্মপদ্ধতি বজায় রাখেন, ইহাই পার্শ্বের একান্ত ইচ্ছা। রাজা দূর দেশান্তর হইতে যতিগণকে আহ্বান করিলেন।

এই সংবাদে চতুর্দশ হইতে সকলে সমবেত হইতে লাগিলেন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অযুত লি দূর হইতে এই স্থানে আগমন করিতে লাগিলেন। সপ্তদিবস ধরিয়া

রাজা নানা প্রকার উপহার প্রদান করিতে লাগিলেন । পরে তিনি সম্ভ্রহ বাক্যে যতিগণকে বলিলেন যে তাঁহারা অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাহারা সাংসারিক মায়ায় বদ্ধ তাঁহারা প্রস্থান করুন । কিন্তু তত্রাপি অনেক যতি রহিয়া গেলেন । পরে তিনি দ্বিতীয় আদেশ প্রচার করিলেন যে যাহারা শ্রমণত্ব লাভের জন্য বিদ্যার্জন করিতেছেন তাঁহারা প্রস্থান করুন । কিন্তু তত্রাপি লোক সংখ্যা যথেষ্ট রহিল । ইহাতে রাজা আদেশ করিলেন যে যাহারা ত্রিবিদ্যায় পারদর্শী ও ষড়ভিঙ্গ তাঁহারা ব্যতীত অন্যান্য সকলে প্রস্থান করিতে পারেন । কিন্তু ইহাতেও লোকসংখ্যা যথেষ্ট কমিল না । পুনরায় তিনি অন্য আদেশ প্রচার করিলেন যে, যাহারা ত্রিপিটকে ও পঞ্চবিদ্যায় পারদর্শী তাঁহারা ব্যতীত অন্যান্য সকলে প্রস্থান করিতে পারেন । এই প্রকারে মাত্র ৪৯৯ জন যতি রহিলেন । পরে রাজা স্বদেশে প্রত্যাগমনের ইচ্ছা করিলেন । তিনি রাজগৃহে, যেখানে কশ্যপ সন্ন্যাসিনী আশ্রয় করিয়াছিলেন তথায় যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন । মাননীয় পার্শ্ব ও অন্যান্য সকলে তাঁহাকে এই উপদেশ দিলেন যে “তথায় অনেক অবিখ্যাসী আছে এবং তথায় বিচার আরম্ভ হইলে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীদের জন্য বিশেষ সুবিধা হইবে । সন্ন্যাসিনী এই স্থানই পছন্দ করিয়াছেন । এ দেশের চতুর্দিকে পর্বত শ্রেণী । যক্ষগণ এই দেশ রক্ষা করে ; ভূমি উর্বরা ও উৎপাদিকাশক্তি বিশিষ্টা এবং এ স্থানে যথেষ্ট আহাৰ্য্য পাওয়া যায় । এই স্থানে ঋষি ও ধার্মিক ব্যক্তিগণ বাস করেন এবং এই স্থানেই স্বর্গীয় ঋষিগণ ভ্রমণ করেন ।”

সন্ন্যাসিনী বিবেচনা করিয়া রাজার সহিত একমত হইলেন । অর্হৎ সমভিব্যাহারে রাজা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে উপস্থিত হইয়া শাস্ত্র প্রণয়নের উদ্যোগ করিলেন । বহুমিত্র এই সন্ন্যাসিনীর সভাপতি হইলেন । বিচারে যে সকল বিষয় দুর্বেদ্য হইত তাহা তিনিই সীমাংসা করিতেন । এই পঁচশত যতি প্রথমতঃ সূত্রপিটক ব্যাখ্যার জন্য একলক্ষ শ্লোক দ্বারা উপদেশ শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন ।

পরে অভিধর্ম পিটক ব্যাখ্যার জন্য তাঁহারা লক্ষ শ্লোক দ্বারা অভিধর্মবিভাগ শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন । এই প্রকারে তাঁহারা ছয়শত ষাট অযুত শ্লোক দ্বারা ত্রিশ অযুত শ্লোক রচনা করিয়া ত্রিপিটক ব্যাখ্যা করিলেন । এই পুস্তকের সহিত প্রাচীর কোন পুস্তকেরই তুলনা হয় না ; ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ সকল প্রণয়ের সমাধানই এই বিরাট গ্রন্থে হইয়াছিল । সুতরাং এই গ্রন্থ সকল দেশে সমাদৃত হইতে লাগিল ।

কনিষ্করাজ লোহিত বর্ণের তাম্রপত্রে এইগুলি খোদিত করিয়া প্রস্তরাধারে তাহা রক্ষা করিয়া মোহর যুক্ত করিয়া এবং উহা মধ্যস্থলে রাখিয়া এক স্তূপ নির্মাণ করিলেন । যাহাতে অপর ধর্মাবলম্বীগণ এই সকল শাস্ত্রে অধিকার না পায় তজ্জন্ত তিনি যক্ষগণকে এদেশ রক্ষার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন । এই কাণ্ড সমাপন করিয়া তিনি সসৈন্তে রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন ।

এই দেশ হইতে পশ্চিম দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া তিনি পূর্বদিক হইয়া জানু পাতিয়া উপবিষ্ট হইয়া, এই সমগ্র রাজ্য যতিগণকে দান করিলেন । কনিষ্কের মৃত্যুর পরে “ক্রীত”গণ পুনরায় রাজ্যাধিকার করিয়া যতিগণকে নির্যাসন এবং বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ সাধন করিল ।

টোহলো দেশীয় হিমতালের রাজা শাক্যবংশীয় । বুদ্ধের নির্যাসনের ছয়শত বৎসর পরে তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষের রাজত্ব পাইয়া পুনর্বার বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হন । ক্রীতগণ বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে এই সংবাদে তিনি সহস্র যোদ্ধাকে বণিকের বেশে সজ্জিত করিয়া গোপনে অস্ত্র সহ উহাদের রাজ্যে প্রবেশ করিলে পর, ঐ দেশীয় রাজা তাঁহাদের সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন । তিনি পঁচশত যোদ্ধাকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া উৎকৃষ্ট পণ্য সহ রাজার নিকট প্রেরণ করেন । পরে, হিমতালের রাজা ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজসিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইলেন । ক্রীতগণের রাজা ভীত হইয়া কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইলেন । পরে রাজার মস্তক দেহচ্যুত করিয়া হিমতালের রাজা

সভাসদগণকে বলিলেন যে “আমি হিমতালের রাজা। নীচ জাতীয় রাজা। এই সকল অত্যাচার করিতেন বলিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম; এইজন্ত আমি অন্য তাহার মস্তকচ্যুত করিয়াছি। কিন্তু অধিবাসীদিগের কোনই অপরাধ নাই।” মন্ত্রীগণকে নানা দেশে নির্বাসন করিয়া, তিনি যতিগণকে প্রত্যাগমনে আদেশ দিলেন। এবং সজ্জারাম নির্মাণ করিয়া তাঁহাদের বাসের সুবন্দোবস্ত করিলেন। পরে তিনি পশ্চিম দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া পূর্বাস্ত্র হইলেন এবং রাজ্য যতিগণকে দান করিলেন। ক্রীতগণ এই প্রকারে কয়েকবার স্বাধিকার চ্যুত হইল কিন্তু পরে পুনরায় তাহারা এদেশ অধিকারে সক্ষম হইল। এই কারণে বর্তমানে এই দেশে অধিবাসী-গণেরই অধিক প্রভাব।

নূতন নগরের ১০ লি দক্ষিণ পশ্চিমে এবং পুরাতন নগরের উত্তরে এবং বৃহৎ এক পর্বতের দক্ষিণে সজ্জারামে ৩০০ যতি বাস করেন। মঠ সংলগ্ন স্থলে দেড় ইঞ্চি দীঘ খেতপাঁতাভবণ বুদ্ধ-দন্ত আছে। পূজার দিন এই দন্ত জ্যোতির্বির্কীর্ণ করে। পুরাকালে ক্রীতগণ বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়া, যতিগণকে দূরভূত করিয়াছিল। এই সময়ে একজন শ্রমণ ভারতবর্ষের মধ্যে বুদ্ধদেবের যত স্মৃতিচিহ্ন আছে তাহা দর্শনে অভিলাষী হইয়া নিজ দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে শুনিয়া প্রত্যা-গমনের জন্ত অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে হস্তীযুথ দেখিয়া তিনি এক বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। হস্তীযুথ জলপান করিয়া, ঐ বৃক্ষের মূল উৎপাটন করিয়া বৃক্ষকে ভূমিশায়ী করিল। তৎপরে শ্রমণকে পৃষ্ঠে করিয়া নিবিড় বনের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল। তথায় আহত এক হস্তী ছিল। শ্রমণের হস্ত লইয়া পীড়িত হস্তী তাহার ক্ষত স্থান দেখাইয়া দিলে, শ্রমণ সেই স্থান হইতে ক্ষুদ্র বংশ খণ্ড বাহিব করিলেন। পরে ঐ স্থানে ঔষধি প্রয়োগ করিয়া নিজ পরিধেয় বসন ছিন্ন করিয়া ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দিলেন। অচ্য একটা হস্তী একটা সুবর্ণাধার আনয়ন করিয়া উহা আহত হস্তীকে প্রদান করিলে, হস্তী উহা শ্রমণকে

প্রদান করিল। শ্রমণ আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে উহাতে বুদ্ধদেবের দন্ত আছে। পরে সকল হস্তীগুলি তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল। পরদিন প্রত্যেক হস্তী তাহার মধ্যারু ভোজনের জন্ত ফল আনয়ন করিলে, তিনি আহারাদি সম্পন্ন করিলেন। পরে তাহারা তাহাকে বহন করিয়া অনেক দূর আনয়ন করিয়া অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

শ্রমণ ঐ দেশের পশ্চিম সীমায় এক বেগবতী নদী পার হইতে লাগিলেন। ঐ সময় নৌকা নিমজ্জনের সম্ভাবনা দেখিয়া অচ্যাত্ত আরোহীগণ স্থির করিল যে শ্রমণের নিকট নিশ্চয়ই কোন চিহ্ন আছে এবং ঐ চিহ্নের লোভেই দৈত্যগণ নৌকার এই দশা করিতেছে। নৌকাস্বামী শ্রমণের স্রব্যাদি পরীক্ষা দ্বারা ঐ দন্ত দেখিতে পাইলেন। তখন শ্রমণ ঐ চিহ্ন উর্দ্ধে ধরিয়া মস্তক নত করিয়া নাগগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, ইহা এই ক্ষণ তাহাদেরই নিকট ঞ্জন্ত রহিল; প্রত্যাগমন করিয়া তিনি উহা পুনরবার গ্রহণ করিবেন! পরে তিনি নদী উত্তরণ হইতে অস্বীকার করিয়া প্রত্যাগমন করিয়া নদীকে সম্বোধন করিয়া দীঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন যে “এই দৈত্যগণকে দমন করিতে শিক্ষা করি নাই বলিয়াই আমার এই দুর্দশা।” পরে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া দৈত্য-দমন শিক্ষা করিলেন এবং তিন বৎসর পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া নদীতীরে বেদী নির্মাণ করিলেন। নাগগণ তাঁহার নিকট বুদ্ধদেবের দস্তাধার আনয়ন করিল। শ্রমণ উহা গ্রহণ করিয়া এই সজ্জারামে আনয়নপূর্বক সেই সময় হইতে পূজা করিতেছেন।

এই সজ্জারামের ১৪।১৫ লি দক্ষিণে ক্ষুদ্র এক সজ্জারামে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের দণ্ডায়মান প্রতিমূর্তি আছে। যদি কেহ অবলোকিতেশ্বরকে না দেখিয়া অনশনে দেহ ত্যাগ করে, তবে এই প্রতিমূর্তি হইতে উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব বহির্গত হয়। ক্ষুদ্র সজ্জারামের দক্ষিণপূর্বে ৩০ লি দূরে বৃহৎ পর্বতে প্রাচীন সজ্জারামের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। বর্তমানে

মহাবান মতাবলম্বী ৩০ জন যতি এই স্থানে বাস করেন। এই স্থানে স্মারানুসার শাস্ত্র প্রণয়নকারী সঙ্কল্প বাস করিতেন। সঙ্ক্যারামের দক্ষিণসূপে অর্হৎগণের শরীর রক্ষিত হইতেছে। পার্শ্বতঃ পশু ও বানরগণ পুষ্পোপহার প্রদান করে। অনেক অর্নৈসর্গিক ব্যাপার এই পর্বতে সম্পাদিত হয়। অনেক সময় পর্বতের শীর্ষ দেশে অশ্বের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় কিন্তু বস্ততঃ অর্হৎ ও শ্রমণগণ যাহারা এই স্থানে সমবেত হন, তাঁহাদের অঙ্গুলি অঙ্কিত ছায়া দ্বারাই এই সকল মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।

যে সঙ্ক্যারামে বুদ্ধদেবের দন্ত রক্ষিত আছে, তাহার দশ লি পূর্বে পর্বত মধ্যে ক্ষুদ্র সঙ্ক্যারাম আছে। পুরাকালে স্কাণ্ডিল্য এই স্থানে বিভাস-প্রকরণপদশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। নিকটে পঞ্চাশ ফুট উচ্চ সূপে একজন অর্হৎ ছিলেন। তাঁহার হস্তীর ন্যায় পান ভোজন ছিল। লোকে তাঁহাকে বিক্রূপ করিয়া বলিত যে তিনি পেটুকের ন্যায় আহাৰ করিতে পারেন কিন্তু তিনি সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে কি জামেন? নির্কালকালে সমবেত জনসাধারণকে অর্হৎ বলিলেন যে, “কিছুদিনের মধ্যেই আমি অণুপরিশেষ অবস্থায় উপস্থিত হইব। কি করিয়া ইহা সম্ভব তাহাই আমি এইক্ষণ ব্যাখ্যা করিব।” জনসাধারণ এই বাক্যে আরও তাঁহাকে বিক্রূপ করিতে লাগিলেন। পরে অর্হৎ এই প্রকারে নিবেদন করিলেন “পূর্বেজন্মে আমি হস্তী ছিলাম এবং আমি পূর্বাঙ্কলে কোন রাজার হস্তীশালায় বাস

করিতাম। এই সময়ে এই দেশে জর্নৈক শ্রমণ বাস করিতেন। রাজা আমাকে এই শ্রমণকে দান করেন। বুদ্ধদেবের পুস্তক বহন করিয়া আমি এই দেশে আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হই। এই সকল পুস্তক বহন করিবার পুণ্যফলে আমি মরিয়া মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করি এবং পরজন্মে আবার পূর্বে জন্মার্জিত স্মৃতির বলে সন্ন্যাসীর রঞ্জিত বসন পরিধান করি। পরে অনবরত চেষ্টা করিয়া আমি বড়বিদ্যা লাভ করি। যদিও আমি পূর্বাভ্যাস বশতঃ অত্যধিক আহাৰ করি, কিন্তু তত্রাপি আমার যাহা আবশ্যক তাহার এক তৃতীয়াংশ মাত্র গ্রহণ করি।” তাহার কথায় কেহই প্রত্যয় লাভ করিল না। তৎক্ষণাৎ তিনি সমাধি দ্বারা আকাশে উঠিলেন। তাঁহার শরীর হইতে ধূম ও অগ্নি বাহির হইতে লাগিল এবং তিনি নির্কাল প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার অস্থি নিম্নে পতিত হইল এবং সেই স্থানে সূপ নির্মিত হইল।

রাজধানী হইতে প্রায় ২০০ শত লি পশ্চিমে যাইয়া আমরা মৈলিন সঙ্ক্যারামে পৌঁছি। এই স্থানে পূর্ণ বিভাসশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। নগরের ১৪০ কি ১৫০ মাইল পশ্চিমে মহাসঙ্ক্যাকাগণের সঙ্ক্যারাম আছে। তথায় এতশত যতি বাস করেন। এই স্থানে শাস্ত্রজ্ঞ বোধিনাত্তসঙ্ক্য শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে আমরা পুণাচ দেশ ও রাজপুর রাজ্য হইয়া তৎক্ষণে দেশে পৌঁছি।

(তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত)

স্ট্রীসেনা ।

নারী সৈন্তের বিবরণ যদিও পুরাতন বহু গ্রন্থে পাওয়া যায় তবুও অনেকে তাহা সত্য বলিয়া প্রত্যয় করিতে চাহেন না, অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস তাহা গ্রন্থকর্তাদিগের উর্কর কল্পনা প্রসূত। সম্প্রতি নারী সৈন্তের অস্তিত্ব

সম্বন্ধে নুতন এমন সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যাহাতে সে বিষয়ে অবিশ্বাস করিবার আর কোন উপায় নাই। এই স্ট্রী স্বাধীনতা পক্ষপাতের দিনে, সুদূর অতীতেও যে নারীগণ পুরুষোচিত বলবীৰ্য্য প্রকাশ করিতেন,

এবং বীরের ত্রায় কঠোর কর্তব্য পালনে সক্ষম হইয়াছিলেন সে তথ্য সকলেরি নিকট প্রীতিজনক হইবে আশা করা যায়।

সম্প্রতি ইতালীর মধ্য প্রদেশে বেনমণ্ট নামক স্থানে সন্যাসিত কতকগুলি ইট্রস্কান ভাস্কর মূর্তি আবিষ্কারদ্বারা নারী সৈন্তের অস্তিত্ব নিঃসংশয় রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ইট্রস্কানগণ এক রহস্যময় জাতি, রোমক অভ্যুত্থানের বহু শতাব্দী পূর্বেই তাহারা সভ্যতার সর্বোচ্চতম স্থান অধিকার করিয়া-ছিল।

বেনমণ্ট ভূগর্ভস্থস্থানে দুইটি বহু প্রাচীন সমাধির বহির্প্রাচীর গাত্রে নারী সৈন্তের সংগ্রাম দৃশ্য খোদিত আছে। কোনও রমণী রথ চালনা করিতেছেন, কেহ সগর্ভে অশ্ব চালনা করিতে প্রবৃত্ত অপর কেহ বা বর্ষাহস্তে ধ্বন্দ্ব যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন। এই সকল যুদ্ধদৃশ্যে তাঁহারা নিয়তই পুরুষদিগকে পরাজয় করিয়া জয় গৌরবে গর্ভিত। পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বী-দিগের বিশাল বক্ষে অকুতোভয়ে নিষ্ঠুর সাহসের সহিত অসি কিম্বা বর্ষা প্রাথিত করিয়া দিতে উদ্ভত, এবং পরাভূত পুরুষগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন পুরুষক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে-ছেন। নারীগণ অধিকাংশ স্থলেই ধ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের দৃঢ় মাংসপেশী সঙ্ঘর্ষে বাহু-যুগল দেখিয়া স্বতই তাঁহাদিগকে পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর বলশালী মনে হয়। সমাধি মধ্যে দুইটি সবল কায় প্রকাণ্ড নারীকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে আর সেইখানেই তাঁহাদের ধাতুনির্মিত শিরস্ত্রাণ, বর্ষা, তরবারি এবং বর্ষাখণ্ড রক্ষিত আছে। পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস ইহাদিগের

মধ্যে একজন লাতিন কবি ভার্জিন বর্ণিত অসীম প্রতাপশালী চিরকুমারী সাম্রাজ্ঞী কামিনা।

হার্কিউলিনিয়াসের ভগ্নাবশেষ মধ্য হইতে অল্পকাল পূর্বে ধাতুনির্মিত অনেকগুলি অতি সূঠাম যুদ্ধরতা নারীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, প্রত্যেকটিতেই নারীগণ যে জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আছেন তাহার সহিত রোমক কিম্বা গ্রীসীয় পরিচ্ছদের কোন সাদৃশ্যই দেখা যায় না—এবং এই স্বাতন্ত্র্যই তাঁহাদের বাস্তবিকতার সাক্ষ্যস্বরূপ উল্লেখিত হইয়া থাকে। গ্রীসদেশীয় ভাস্কর এই মূর্তিগুলি খোদিত করিয়াছেন, এগুলি যদি কেবল তাঁহার কল্পনা প্রসূত হইত তাহা হইলে স্বভাবতঃই সেগুলি তিনি স্বীয় জাতীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত করিতেন।

গ্রীক পুরাণে দেখা যায় এই যোদ্ধা স্ত্রীজাতি আসিয়া মাইনরে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু আধুনিক Boghany Kniএর ধ্বংসাবশেষের সন্নিকটে থার্মোডন নদীতীরে ক্যাপাডোসিয়া নামক স্থানে তাঁহাদের আদিম নিবাস। সেখান হইতে আসিয়া মাইনরবাসী-দিগকে পরাভব করিয়া নূতন রাজ্য সংস্থাপন অভিপ্রায়ে অভিযান করেন। এই রাজত্ব সম্পূর্ণই স্ত্রীশাসনের অধীন ছিল। কখনও যদি কোন নারী স্বয়ংস্বরা হইতে ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে পার্শ্ববর্তী কোন রাজ্যের পুরুষকে তিনি মনোনীত করিতে পারিতেন—কিন্তু স্বামীটিকে বন্দী কিম্বা শিক্ষানবীশভাবে বাস করিতে হইত; পত্নী যেদিন ইচ্ছা সেইদিনই তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিতে পারিতেন। রাজ্যে পুরুষ সন্তান হইলেই

তাহাদিগকে রাজ্যান্তরে প্রেরণ করা নতুবা মারিয়া ফেলা হইত।

এই স্ত্রী সাম্রাজ্যের প্রসিদ্ধ রাজ্ঞী পেন্থেসিনিয়ার বীরত্ব কাহিনী ইনিয়াডে বর্ণিত আছে। যখন বীরশ্রেষ্ঠ হেক্টর হত হইলেন, যুদ্ধ জয়ের আশা ক্ষীণ হইল, তখন ট্রোজানগণ এই সাম্রাজ্যের সাহায্য প্রার্থনা করেন। পেন্থেসিনিয়া পঞ্চ সহস্র সেনা লইয়া তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রাচীন কবিগণ অনেকেই তাঁহাদের ভৈরব বীরত্বের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই স্ত্রী সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়া গ্রীকগণ এমনই ভীত হইয়া গিয়াছিল যে তাঁহাদের উচ্চ ভীষ্ণ রণহকার গুনিবামাত্র পলায়ন করিত। পেন্থেসিনিয়ার

হস্তে গ্রীসীয় অনেক শ্রেষ্ঠ বীর নিহত হইলেন; পরিশেষে আফিনিসের সহিত যুদ্ধে রাজ্ঞী প্রাণ হারান। যুদ্ধের পর আফিনিস তাঁহার অনুপম রূপ লাভণ্য এবং তরুণ বয়স দেখিয়া অত্যন্ত কাতর ভাবে বালকের স্থায় রোদন করায় কোনও অভদ্র গ্রীকযুবা তাঁহাকে উপহাস করে। এই কারণে তিনি তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। প্রাচীন কাব্যে এই স্ত্রী সেনার বহুবিধ কৌতূহলজনক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। জগদ্বিখ্যাত অমিত-বলশালী হার্কিউলিস বীরোচিত যে দ্বাদশ কার্যের জন্ত চিরস্মরণীয় তাহার মধ্যে এই স্ত্রী রাজ্ঞের সাম্রাজ্ঞী হিপোলিটার মেখলা সংগ্রহ করিয়া আনা অশ্রুতম।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ব্রহ্মে বো-টো।

ব্রহ্মে যখন ইংরেজের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে সে দেশে বো-টো নামে এক প্রসিদ্ধ দস্যু ছিল। তাহার প্রভাবে সকলেই সশঙ্কিত থাকিত। তাহার এরূপ এক আশ্চর্য্য চতুরতা ছিল, যে ইংরাজ গবর্নমেন্ট পর্যন্ত তাহাকে বহু চেষ্টাতেও ধরিতে পারেন নাই।

অবশেষে অল্প কোন উপায় না দেখিয়া ইংরাজেরা তাহাকে রাজদ্রোহী বলিয়া ঘোষিত করিলেন, এবং প্রচার করিলেন যে, যে কেহ বো-টোর মস্তক লইয়া আসিতে পারিবে সেই গবর্নমেন্টের নিকট দশ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার পাইবে। কিন্তু এ সকল ব্যবস্থা সত্ত্বেও বিধাতা তাহার মস্তকটিকে যেখানে রাখিয়াছিলেন, তাহা নিরূপদ্রবে সেই স্থানেই থাকিয়া নিত্য নূতন উপদ্রবের কৌতুক সৃষ্টি করিতে লাগিল।

একদিন সংবাদ আসিল যে বো-টো এক জঙ্গলের মধ্যে রহিয়াছে। সেই প্রদেশের সেনাপতি মনে

করিলেন বন ঘিরিয়া তাহাকে বন্দী করিবেন। তিনি বহু লোক লইয়া সেই জঙ্গলটি ঘিরিলেন এবং প্রত্যেককে বলিয়া দিলেন যে বো-টোকে যে ধরিতে পারিবে সেই দশ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার পাইবে।

সৈনিক, পুলিশ, কুলি, কৃষক, গ্রামবাসী সকলেই আসিয়া এই ব্যাপারে যোগ দিল। সকলেই পুরস্কারের লোভে উৎফুল্ল। ক্রমে এত লোক আসিয়া জুটিল যে সেই লোকপ্রাচীর ভেদ করিয়া পলায়ন করা বো-টোর স্থায় দস্যুর পক্ষেও অসম্ভব হইয়া দাড়াইল।

কিন্তু তখন ভাবিবার আর সময় নাই। যাহা হয় একটা কিছু অবিলম্বেই করিতে হইবে। 'কাজেই বো-টো তৎক্ষণাৎ তাহার পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া কুলির মত এক জীর্ণ চীর পরিল এবং একগাছি ছড়ি লইয়া অস্ত্রান্ত সকলের সহিত তাহারই অধেষণে যোগ দিল। পরিণামে ফল হইল এই বো-টো অপর লোকদের সহিত পারিশ্রমিক চাঙ্গি

আনা আদায় করিয়া লইয়া হুই মনে সে স্থান ত্যাগ করিল। তাহার পরেই সে সেই প্রদেশের সেনাপতিকে এক পত্রের সহিত ছই : আনা ফিরাইয়া দিয়া এইরূপ লিখিল যে, সে অর্ধেক দিন মাত্র খাটিয়া পুরা দিনের পারিশ্রমিক লইতে প্রস্তুত নহে।

কিছুকাল পরে একদিন বোটো এক প্রদেশের কমিশনর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—
“আমিই বোটো, আপনার নিকট ধরা দিতে আসিয়াছি।”

সাহেব একথা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বলিলেন—“বেশ কথা। এখন তুমি কে এবং কি চাও তাহা সত্য করিয়া বল। আজকের এ কাজের জন্ত কত পাবার আশা কর?”

বোটো শাস্তভাবে উত্তর করিল—“দশ সহস্র মুদ্রা।” সাহেব অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

“আমি তোমার কথার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।”

বোটা উত্তর করিল—“কেন, ইহার মধ্যে দুর্ভেদ্যতা কিছুই নাই। গবর্নেন্ট কোনদিনই সত্য ভঙ্গ করেন না তা ত’ আপনি জানেন। গবর্নেন্ট ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি বোটোর মস্তক লইয়া আসিবে সে দশ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার পাইবে।”

সাহেব এতক্ষণে তাহার কৌশল বুঝিয়া বলিলেন—
“কিন্তু তোমার মাথাটি খসিয়া পড়িবে আর তুমি এ টাকা পাইবে কি উপায়ে?”

“আমার স্ত্রী পুত্র ত’ পাইবে।”

“সে কথা সত্য, কিন্তু তোমার এ কৌশল চলিবে না। দশ সহস্র মুদ্রার তোমার অভাব কি?”

“অভাব না থাকিলে আপনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতাম না। আমার অহুচরেরা আমার সর্বস্ব লইয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। আজ এক পক্ষ ধরিয়া এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে আমি কখন ধরা পড়ি তাহার ঠিক নাই। তাই মনে করিলাম স্ত্রী পুত্রের জন্ত যদি দশ সহস্র মুদ্রার সংস্থান করিয়া যাইতে পারি ত মন্দ কি।

“কিন্তু টাকাটা ত আমি নিজেও লইতে পারি। আমি তোমাকে ধরিয়া তোমার মাথা গবর্নেন্টের নিকটে পাঠাইয়াছি বলিলেই হইবে।”

“আপনি শুধু ইংরাজ, আপনি তা করিবেন না তা আমি জানি।

সাহেব কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—“দেখ, তুমি যে বোটো নও তা আমি বেশ জানি। তুমি কে তা জানিবার জন্ত আমি ব্যস্ত নহি। কিন্তু তুমি কি চাও তাহা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল।”

মুহূর্তমাত্র ইতস্তত করিয়া বোটো বলিল—আপনি ঠিকই ধরিয়াছেন। কিন্তু আমার জীবনও বোটোর জীবনের শ্রায়ই বিপন্ন। আমি তাহার সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলাম, সুতরাং আমার জীবনও আর মুহূর্তের জন্ত নিরাপদ নহে। আমি তাহার অর্থ অপহরণ করিয়া পলাইয়াছিলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া মান্দালে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে একটি লোক দিন। এই নিন সহস্র মুদ্রা; আজ হইতে দ্বাদশ দিনের মধ্যে আমি বোটোকে ধরাইয়া দিতে না পারিলে এ টাকা আপনার হইবে। যতদিন না বোটো ধরা পড়ে ততদিন এ টাকা : আপনি নিজের কাছে রাখিতে পারেন।”

মিনিট দুয়েক চিন্তা করিয়া কমিশনর সাহেব দস্যুর প্রস্তাবে আনন্দিত হইলেন।

বোটো নিরাপদে মান্দালেতে উপস্থিত হইবার পর কমিশনর সাহেব তাহার নিকট হইতে এই পত্র পাইলেন—

“দ্বাদশ দিন পূর্বে আমি—বোটো আপনার নিকটে যে টাকা রাখিয়াছিলাম, তাহা আপনিই রাখিয়া দিবেন। আমি আপনাকে সত্য কথাই বলিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি তাহা বিশ্বাস করিলেন না দেখিয়া আমি মিথ্যা কথা বলিয়া উক্ত টাকা জমা রাখিয়াছিলাম। ইংরাজ গবর্নেন্ট সত্য ও টাকা ছইই ভাল বাসেন। কিন্তু তাহার ছইটা জিনিষই একসঙ্গে পছন্দ করেন না।”

শ্রীভ:

প্রাচ্য-গৌরব ।

(Earl of Ranaldshay হইতে)

বিশালকায় আসিয়া মহাদেশের মহীয়সী-মূর্তি জগৎবাসীকে চিরদিনই এক অপূর্বভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে । পর্তুগালের অসমসাহসিক নাবিকগণের অক্লান্ত অধ্যবসায় যে দিন দক্ষিণ-মহাসাগরের রহস্যজাল ভেদ করিল, সেই দিন হইতে দৈনিক ৭ বাণিজ্যজীবীর ক্রম-বর্দ্ধনশীল প্রাচ্য অদ্বিচ্ছিন্ন ভাবে আসিয়ার প্রহেলিকাময়, বিশাল তটভিমুখে বহিয়া আসিতেছে । দক্ষিণ মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার ঘাত প্রতিঘাতে কত মহাজাতির উত্থান ও পতন হইয়াছে ; প্রাচ্য-জগতের বিশাল রঙ্গক্ষেত্রে কত জাতি কিছু দিনের জ্ঞান-রাগ-অভিনয় করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে । পর্তুগাল, স্পেন, হল্যান্ড, ফ্রান্স সকলেই যথাক্রমে এই বিরাট দেশকে আশ্রয় করিয়াই উন্নতির সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল ; এবং আজিও ইংলণ্ড ইহারই উপর নিজের গৌরবসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে ।

কালচক্রের পরিবর্তনে বিজয়-অভিযানের দিন গত হইয়াছে । চারি শতাব্দী পূর্বে যে রহস্য যবনিকার অন্তরালে আসিয়া অস্পষ্ট আলোকে প্রতিভাত হইত, সে যবনিকাও অপসারিত হইয়াছে । আসিয়া আজ উন্মুক্ত, আলোকোদ্ভাসিত । কিন্তু যে ইন্দ্রজালের অপরূপ কুহকচ্ছটায় চারি শত বৎসর পূর্বে বাণিজ্যব্যবসায়ী ও ছঃসাহসিক ব্যক্তিবৃন্দ আকৃষ্ট হইত আজিও তাহার মোহিনী শক্তি কিঞ্চিৎকম ক্ষুণ্ণ হয় নাই ; তাহা কেবল

রূপান্তর গ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছে মাত্র ।

এ কথা সত্য যে এখনও যুদ্ধ ব্যবসায়ী ও আবিষ্কর্তাদিগের জ্ঞান যথেষ্ট ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে । বণিক এখনও তাহার বাণিজ্য-জাল দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তার করিতে পাবেন । কিন্তু আসিয়ার ইউরোপীয় প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, বণিক ও সৈনিকের একাধিপত্য অন্তর্হিত হইয়াছে ; এবং এই সকল যুদ্ধার্থী ও বাণিজ্যকামীর স্থান পর্য্যটক ও অমুসন্ধিৎসু ছাত্রবর্গ দিন দিন অধিকার করিতেছে । প্রাচ্য জগতের গবেষণা ও পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের সীমাহীন ও বিমোহন সাধনাকে এই বিশাল ভূমিতে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে ।

প্রতীচ্য হইতে প্রাচ্যরাজ্যে এই ভার-কেন্দ্রের পরিবর্তন-ব্যাপার খুবই ঘটনা পূর্ণ ; কিন্তু অবোধ্য কিংবা অনৈসর্গিক নহে । প্রাচ্যদেশ সমূহ ও তাহাদের অধিবাসীবর্গের বিশালত্ব এবং বৈচিত্র্য আসিয়া মহাদেশকে এক বিপুল অনন্ত সৌন্দর্য্যে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে । দার্শনিক ও ঐতিহাসিক, সাহিত্য-সেবী ও শিল্পী, প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও পরিব্রাজক, রাজনীতিবেত্তা ও বিপ্লবপন্থী সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতা পরিচালন ও জ্ঞান প্রয়োগের পথ আসিয়ার এই বিরাট ক্ষেত্রের মধ্যেই দেখিতে পাইবেন ।

যে মহান্ ধর্ম্মত্রয়ের সুমধুর শাসন দণ্ডের নিকট আজ সমগ্র জগৎ স্বেচ্ছায় অবনতমস্তক,

যাহাদের মধুময় উৎসের অমৃত প্রবাহ জগতের মানবকুলের ধর্মপিপাসা নিবারণ করিতেছে, সেই বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, এবং মহম্মদীয় ধর্ম এই আসিয়া-জননীর পবিত্র ক্রোড়েই ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। দার্শনিক প্রবর এমার্সনের উক্তি—“ইউরোপ চিরদিনই উচ্চতর ধর্মভাবের জন্ম প্রাচ্যপ্রতিভা নিকট খণী”। * *

সাহিত্য ও শিল্প জগতেও আসিয়াব দান তাহার সন্তানবর্গের সর্বাভিসারিণী ও বৈচিত্র্যময়ী প্রতিভার জলন্ত কর্তিস্তম্ভ। আসিয়াব সাম্রাজ্যসমূহ ও নবপতিবৃন্দেব বিচিত্র ইতিবৃত্ত জগতের ইতিহাসে কতকগুলি মোহময়ী পৃষ্ঠা সন্নিবিষ্ট করিয়াছে। তাহাব বিজেত্ববর্গের কাঁতিগাথা ধবিত্রীর ভূপালবৃন্দেব অবদান সমূহের মধ্যে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। দিগ্বিজয়ী সাইরাস, ডেরিয়াস ও জারকসেস্, মোগলবীর জঙ্গিস খাঁ, তাতাররাজ তৈমুরলঙ্গ, গজনীর মামুদ, মোগলরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বাবর, রাজনীতি বিশারদ আকবর—ইতিহাসপাঠক ব্যক্তিবর্গেব মধ্যে ইহাদের নাম কে না অবগত আছেন? ইহাদের বীরকাহিনী লোমাঞ্চ শবীরে ও স্তম্ভিত হৃদয়ে পাঠ করিয়া কে না ভীত ও চকিত হইয়াছেন?

প্রাচ্য সাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডারে বৃহৎমণ্ডলীর জ্ঞান ক্ষুধা মিটাইবার কত বিচিত্র উপকরণ পড়িয়া রহিয়াছে। চীন সাধু কনফুসাসের উপদেশাবলী কি গভীর তত্ত্বপূর্ণ! পারশ্ব কবি সাদী ও ফার্দীসীর হৃদয় কন্দরোপিত আবেগময়ী কবিতা কি মধুময়ী! Old Testament লেখকদিগের শব্দ-চিত্রাঙ্কন-প্রতিভা কি বিস্ময়করী!

শিল্প জগতে নেত্রপাত করিলে দেখিতে পাই, আসিয়ার মসজিদ, মন্দির এবং হর্ম্যাবলী তাহার সন্তানদিগের অল্পমম সৌন্দর্য্যজ্ঞানের মূর্ত্তিমান সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পিকিংএর “ত্রিদিব-মন্দির” (Temple of Heaven) কি সুন্দর! নিকো এবং টোকিয়োর জাপানী মন্দিরসমূহের পরিকল্পনা কত উচ্চ! আবুশৈলের শিখরদেশস্থ জৈন মন্দিরগুলি অপেক্ষা সূক্ষ্ম কারুকার্য্য এবং নির্ম্মাণকৌশল কোথায় দেখিতে পাইব? চারু-শিল্প-কম আগ্রাব তাজ অপেক্ষা প্রাণস্পর্শী কি? ‘কামকুর’স্থ বুদ্ধদেবেব বিরাটমূর্ত্তি কি মহিমাময়ী! সমরখণ্ড দেশেব গৌরবস্বরূপ যে সকল বিশালকায় হর্ম্ম্যরাজি এখনও বিস্তমান রহিয়াছে, তাহাদের বিরাটত্ব কত বিস্ময়জনক!

আসিয়ার প্রতি ধূলিকণায় ইতিহাসের কত নিগূঢ় কাহিনী লুক্কায়িত রহিয়াছে। প্রকৃত তহের বিমোহনক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই, ‘আসিরিয়া’ এবং ‘ক্যালডিয়া’র দিগন্তব্যাপী প্রাস্তর, ‘মুসা’ এবং ‘পার্সিপোলিস্’ রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ, জঙ্গলাবৃত ‘অনার্থাপুর’ এবং ‘পোলানাকুয়া’ নগরীদ্বয়, অতীতের বিস্মৃত রত্নভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া কত রত্নাদি উপহার দিয়াছে। এখনও ‘তাক্লামাকামে’র অগম্য মরুগর্ভে কিংবা ‘আকরতোমে’র অতিকায় হর্ম্ম্যরাজির অমুদ্বিত্ত প্রহেলিকা-গহ্বরে তত্ত্বানুসন্ধান ও আবিষ্কার কি বিশালক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে!

নিনেভা ও প্রাচীন বাবিলনের ভগ্ন পাষাণ-স্তূপের উপর দণ্ডায়মান হইয়া অতীতের রহস্য ষবনিকা উত্তোলন করিবার

হৃদয়মনীর ইচ্ছায় অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। এই সকল বিশ্বৃত জনপদ ও বিলুপ্ত সাম্রাজ্যের মধ্য দিয়া বিচরণ করিতে করিতে সেই সুদূর এবং অতীতের বিপুল কীর্তিগাথার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি যেন আমাদের শ্রুতিপথে আসিয়া আঘাত করে। কিন্তু হায়! মহাকাল একে

একে সকল কীর্তিই নাশ করিয়া ফেলিতেছে। বিশ্বৃতির অতলজলে সকলই ডুবিয়া যাইতেছে। বাস্তব স্বপ্নে পরিণত হইতেছে কালের এই তাণ্ডব নৃত্যের বিশ্ববিধ্বংসিনী গতির রোধ কে করিবে?

শ্রীদীনবন্ধু সেন বি এ।

আন্দামান দ্বীপ।

বর্তমান কালে আন্দামান দ্বীপ পুঞ্জের নাম শুনিলে আমাদের মনে যে খুব সুখকর ভাবের উদয় হয় তাহা নহে। স্থানটি নির্বাসিত অপরাধীর সহিত আজকাল একরূপ একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতাইয়া বসিয়াছে যে, আমরা ইহাকে একটা ভয়ঙ্কর স্থান বলিয়াই মনে করি, ইহার ইতিহাসের মধ্যে যে কোন প্রকার বিশেষ চিন্তাকর্যক ব্যাপার আছে তাহা কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু স্থানটি বহুযুগ হইতে ভারতের সভ্যতা ও সমৃদ্ধির ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট।

প্রাচীনতম যুগ হইতে বঙ্গদেশ শস্যশ্যামল এবং শিল্প সম্পদে ভারতের গৌরবস্থল ছিল। বঙ্গের সমুদ্রতীরবর্তী বন্দরগুলি সমগ্র উত্তর ভারতের বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। এই বন্দরগুলি হইতে অর্ণবপোতের সাহায্যে ভারতের বাণিজ্যদ্রব্যগুলি নানা স্থানে প্রেরিত হইত এবং সেই সকল স্থান হইতে বণিকগণ তদ্দেশীয় দ্রব্যাদি লইয়া ভারতে বাণিজ্যকল্পে আগমন করিতেন। এইজন্ত অতি প্রাচীনযুগ হইতে নাবিকদিগের নিকটে এই দ্বীপপুঞ্জ পরিচিত ছিল। গ্রীক নাবিকদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই দ্বীপপুঞ্জের উল্লেখ দেখা যায়। চীন, জাপান ও আরব্য দেশের বণিকগণ সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে এই দ্বীপপুঞ্জের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের ইতিহাসেও প্রায় ৮৫০ বৎসর পূর্বে ইহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। মার্কো পোলো ১২৯২ সালে যে 'অঙ্গনানায়েন' দ্বীপের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহাই বর্তমান আন্দামান। পরবর্তী

পরিভ্রাজকগণ ইহার যে নামের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহা অনেকটা ইহার বর্তমান নামের অনুরূপ। ১৪৩০ সালে কার্টি ইহাকে 'আন্দামানিয়া, বলিয়া গিয়াছেন। ১৭৯০ সালে ব্লেয়ার সাহেব তাঁহার মানচিত্রে এই দ্বীপের চিত্র দিয়াছিলেন বলিয়াই ইহার এক স্থানের নাম পোর্ট ব্লেয়ার হইয়াছে।

ইয়ুরোপের অনেকে মনে করেন গ্রীকগণই সর্ব-প্রথম এই দ্বীপের নামকরণ করেন। ম্যান সাহেব বলেন টলেমি ইহাকে 'আগামাট ডাইমনোস্' অর্থাৎ সৌভাগ্যদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়া যান, কমে তাহার অপভ্রংশ হইয়া আন্দামান দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে, কারণ গেরিনি তাঁহার প্রাচ্যভূগোলে নিকোচর দ্বীপকেই সৌভাগ্যদ্বীপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, আন্দামানকে 'পাশা-কাটা' বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং 'আগামাট ডাইমনোস্' বলিতে নিকোচর দ্বীপকে বুঝানই সম্ভব।

যাহা হউক এই দ্বীপপুঞ্জ যে বহুদিন হইতে বিদেশী ও ভারতবাসীর নিকট পরিচিত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির কর্মচারীগণ ইহার চতুর্দিকের সমুদ্র পরীক্ষা করিয়া একটি জরিপের মানচিত্র প্রস্তুত করেন। পরে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস আর্চিবল্ড ব্লেয়ার সাহেবকে এই দ্বীপে বসতি স্থাপন করিতে আদেশ করেন। বোধ হয় বঙ্গোপসাগরের

জলদস্যুদিগকে শাসিত করা এবং জলমগ্ন নাবিকগণকে এই দ্বীপের বর্কর অধিবাসীর অত্যাচার হইতে রক্ষা করাই কর্ণওয়ালিসের উদ্দেশ্য ছিল। এই বনসম্মূল স্থানকে মনুষ্যবাসের উপযুক্ত করিবার জন্মই সর্বপ্রথম কয়েদীগণকে তথায় শ্রমজীবী রূপে পাঠান হয়। সে সময়ে ইহাকে অপরাধীগণের নির্বাসনস্থল করিবার কল্পনা পুষ্যস্ত কেহ করে নাই। যাহা ইউক রেয়ার সাহেব একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচিত করিয়া তথায় বসতি স্থাপন করা স্থির করিলেন। এই স্থানটি আজিও বোট রেয়ার নামে পরিচিত। কিছুকাল আয়োজনের পর স্থির হইল যে পোর্ট রেয়ার ত্যাগ করিয়া আরও উত্তরে বসতি স্থাপন করা আবশ্যিক। ফলতঃ ১৭৯২ সালে সে স্থান ত্যাগ করিয়া উত্তর আন্দামান দ্বীপে বসতি স্থাপন করা হইল। কিন্তু এই স্থানের জলবায়ু এরূপ ভয়ঙ্কর যে অবশেষে বাধ্য হইয়া এস্থলে বাসের চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইল। ইহার পর বৎসরকাল আর এই দ্বীপের প্রতি কেহ মনোযোগ দেন নাই। পরে ১৮২৪ সালে ব্রহ্মদেশ আক্রমণে প্রেরিত নৌবাহিনী এই দ্বীপ তাহাদের আশ্রয় স্থল করিল। তাহার পর হইতে মধ্যে মধ্যে পুনরায় ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৪৮ সালে এমিলি নামে একখানি জাহাজ ইহার পশ্চিম উপকূলে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। যাত্রী ও নাবিকগণের রক্ষা করিবার জন্ম শত চেষ্টা সত্ত্বেও দ্বীপবাসীরা তাহাদের অধিকাংশকেই নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে। ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত প্রায়ই এইরূপ নরহত্যার বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। পরে গবর্নেন্ট পুনরায় এই দ্বীপ অধিকার করিলেন। তাহার পর বৎসরেই ভারতে বিদ্রোহ হয়, গবর্নেন্ট যে সকল বিদ্রোহীকে বন্দী করিলেন তাহাদিগকে নিরাপদে রাখিবার জন্ম কোন একটা স্থানের বিশেষ

আবশ্যক হইয়া পড়িল। সেই জন্ম ১৮৫৭ সালের শেষ ভাগেই এই স্থান সর্বপ্রথম নির্বাসন স্থল রূপে ব্যবহৃত হইল। এই সালেই পোর্ট রেয়ার হইতে মুক্ত এক কয়েদী লর্ড মেয়াকে হত্যা করে।

আন্দামান বাসীর সহিত সৌহৃদ্য স্থাপনের জন্ম ইংরাজ কর্মচারীগণ তথায় এক আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। এই আশ্রমে যে কোন দ্বীপবাসী আসিয়া ষতদিন ইচ্ছা বিনাব্যয়ে বাস করিতে পারে। তাহাদিগকে থাকিতে নিষেধ করা দূরে থাক, বরং আরও দীর্ঘকাল থাকিবার জন্ম উৎসাহই দেওয়া হইয়া থাকে। এখানে বিনামূল্যে তাহাদিগকে সাহায্য দেওয়া হয়। এখানে তাহাদের মাছধরা বা কচ্ছপধরা ভিন্ন অণ্ড কোন কর্মই করিতে হয় না। এই কর্মটুকুও তাহাদের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন, ইচ্ছা না করিলে তাহারা ইহাও করিতে বাধ্য নহে। অনেকে আশ্রমে থাকিয়া কেবল আনন্দ ও বস্তুপুঞ্জ শীকার করিয়া বেড়ায়। তবে আশ্রমের নিয়ম এই যে এই সকল লোক আশ্রমে অবস্থান কালে যাহা কিছু সংগ্রহ করিবে তাহা আশ্রমের সম্পত্তি বলিয়াই গণ্য হইবে। এই উপায়ে এক্ষণে আশ্রমের সমস্ত ব্যয় গবর্নেন্টের বিনা সাহায্যে চলিয়া যায়।

আন্দামান বাসীরা বস্তুজীবনই ভালবাসে। সভ্যতার প্রতি তাহাদের কোন আকর্ষণই দেখা যায় না। ইহারা আশ্রমে আসিয়া যখন বাস করে তখনও নিজেদের সেই চিরান্ত্যস্ত ভাবেই কালান্তিপাত করে এবং যখন পুনরায় অরণ্যের মধ্যে চলিয়া যায় তখন যেন একটা অভিনব আনন্দ ও সুখ অনুভব করে বলিয়া বোধ হয়। গভীর বনের মধ্যে হিংস্র পশু ও শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া দুঃস্থ ভাবে জীবন অতিবাহিত করাহ তাহারা যথার্থ সুখ ভোগ বলিয়া মনে করে।

বারাণসী ।

(ফেলিসিয়া-শালের ফরাসী হইতে)

এই বারাণসী ব্রাহ্মণ্যধর্মের 'রোম' (Rome), অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পীঠস্থান ! ইহার দৃশ্য-সমূহ যেরূপ চিত্তবিক্ষোভকারী, যেরূপ অদ্ভুত, ইহার পাগুলামি-কাণ্ডগুলা যেরূপ সংক্রামক এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না ।

ইহার গলিগুলা গঙ্গাতিমুখে নামিয়া আসিয়াছে ; গলির রাস্তায়, পিঁপুড়ার সারির ত্রায় লোকের জনতা ; ভারতের সকল দিক হইতেই লোক আসিয়াছে । এই পুণ্যানগরী একটা তীর্থস্থান, এখানে আসিলে সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায় । উত্তর-প্রদেশের গোবর্গ ব্রাহ্মণ,—নিগ্রো সদৃশ কৃষ্ণকায় দক্ষিণী হিন্দুর গা ঘেসিয়া পাশাপাশি চলিয়াছে । জটিল-শশ, জটাধারী, নগ্নপ্রায় ভস্মাচ্ছাদিত সন্ন্যাসীরা চলিয়াছে, অথবা রাস্তার ধারে ধ্যান মগ্ন হইয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া আছে ; —মনে হয় যেন উহারা কিছুই দেখিতেছে না, কিছুই শুনিতেছে না, চতুষ্পার্শ্বস্থ চঞ্চল জনতার সহিত যেন উহাদের কোন সংস্বব নাই । শাদা ও শীর্ণকায় ধর্মের গুরু দেখিবা-মাত্র লোকেরা ভক্তিভাবে তাহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইতেছে— বাড়ীর ছাদ,—পায়রা, কাক, ময়ূর, টিয়াতে আচ্ছন্ন । দেয়ালের গায়ে, দেবতার মূর্তি ও পৌরাণিক দৃশ্য-সকল চিত্রিত ।

এখানে দুই সহস্র মন্দির, অসংখ্য দেবালয়, পাঁচ লক্ষ দেবতার মূর্তি । আমি গাভীগণের মন্দির দেখিতে গেলাম ; ভক্তেরা এই পবিত্র গাভীদিগকে আদর করিতেছে ; তাহাদিগকে

তৃণ ও পুষ্প প্রদান করিতেছে । একজন বৃদ্ধা রমণী, একটা গরুর পুচ্ছ-প্রান্ত আপনার মুখের উপর ধীরে ধীরে বুলাইতেছে । যে তরুণ হিন্দু-অধ্যাপক আমার সঙ্গে ছিলেন তিনি আমাকে বলিলেন,—কোন গরুকে বিপন্ন দেখিলে তাহার জন্ত প্রাণ দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন না । আর একটা বানরের মন্দির আছে ; শত-শত বানর সেখানে মুক্তভাবে বাস করিতেছে ; কেবল মঙ্গলবারেই তাহাদিগকে খাওয়ানোর সুবিধা হয় । আমি এই সকল ক্ষুদ্র দেবতাদিগের ফোটো তুলিবার জন্ত অনুমতি চাহিয়া অনুমতি পাইলাম ।—একটি নেপালী দেবালয় আছে, তাহার ছাদের চতুষ্পার্শ্বে ভয়ানক অশ্লীল খোদাই-মূর্তি ; আমার ভীতি বলিল, এই ইমারৎটিকে বজ্র হইতে রক্ষা করিবার জন্ত, এইরূপ মূর্তি সকল খুদিয়া রাখা হইয়াছে । লজ্জানীলা সৌদামিনী এই সকল বিভীষিকা দর্শনে সঙ্কুচিত হইয়া পিছু হটিয়া যান !—

প্রতি পদক্ষেপেই, শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় । নবযুবতীরা এই সকল লিঙ্গ-মূর্তিকে কুলে-কুলে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং উহাদের উপর পবিত্র জল সিঞ্চন করে ।

সর্বত্রই পূজা-সামগ্রীর দোকান ; এই দোকানে পুষ্পমালা, জুঁই ও গাঁদার মালা, ছোট ছোট মূর্তি ও দেবতাদের বিগ্রহ বিক্রীত হয় ; সিংহ, বরাহ, মৎস্য প্রভৃতি বিষ্ণুর বিবিধ অবতার-মূর্তি ; নীলবর্ণ দেবতা কৃষ্ণ, তাহার প্রণয়িনীর সহিত একত্র রহিয়াছেন ; সিদ্ধির দেবতা

গণেশ গজমুণ্ডধারী, লম্বোদর, গোলাপী-রং ; কুম্ভবর্ণ বিকট দর্শনা কালীদেবী, বক্ষের উপর শোণিতাক্ত নরমুণ্ডমালা ধারণ করিয়া আছেন।

প্রভাতে, গঙ্গার ধারে শতসহস্র স্ত্রী ও পুরুষ স্নান করিতেছে, স্নানের সঙ্গে কত ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইতেছে ; কেহ বা, শাস্ত্রের নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে শরীরেব সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জলে প্রক্ষালন করিতেছে ; প্রক্ষালন কালে, শরীরের মধ্যে যে অবয়বটি সর্বাঙ্গপেক্ষা পবিত্র সেই দক্ষিণ কর্ণকেও ভুলিতেছে না ; কেহ বা অঞ্জলীতে জল লইয়া, সম্মুখভাগে যতদূর সম্ভব দূরে ছিটাইয়া ফেলিতেছে ; কেহ বা বৃক্ষশাখা লইয়া, জল-তরঙ্গের উপর তালে-তালে আঘাত করিতেছে ; কেহ বা মল্লিকা কিংবা গোলাপের পাপড়ি জলে নিক্ষেপ করিতেছে ;—সেই সব ফুল, স্থানে-স্থানে গঙ্গাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে ; কেহ বা কয়েক বার ঘোর-পাক খাইয়া আপনার নাকে চিম্টি কাটিতেছে, বুক চাপড়াইতেছে ; কেহ বা নিশ্চল-ভাবে দাঁড়াইয়া, নীল-আকাশে সূর্যের উদয় নিরীক্ষণ করিতেছে। তীর্থযাত্রীরা পবিত্র গঙ্গাজলে তাহাদের কমণ্ডলু ভরিতেছে—পবে সেই জল ছিটাইয়া তাহাদের গৃহকে পবিত্র করিবে।

নদীর ধারে, চিতার উপর শব দাহ হইতেছে ; মৃতজনের আত্মায়েরা, শুভ্র শোক-বস্ত্র পরিধান করিয়া, মৃতজনের প্রিয় ভঙ্গি গঙ্গাদেবীর পবিত্র জলে নিক্ষেপ করিতেছে... এক দিন, একটু সহর ছাড়াইয়া, আমি নদীর উপর নৌকা করিয়া বেড়াইতেছি, নদীর তটের উপর হইতে একটা মর্মভেদী চীৎকার

শুনিতে পাইলাম ; নিকটে গিয়া দেখিলাম, একজন হিন্দু একটা মৃত শিশুকে উঠাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, সে এত দরিদ্র যে সে চিতার খরচ দিতে পারে না, তাই ঐ শিশুর মৃতদেহ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিবে ; কিন্তু নদী শিশুটিকে গ্রহণ করিতেছে না,—নদী-কিনাবায়, স্রোতের এতটা জোর নাই যে উহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। সেই হতভাগ্য ব্যক্তি,—নৌকা করিয়া গঙ্গার নাঝখানে গিয়া মৃতশিশুটিকে ফেলিয়া দিবে—এই জন্ত অতি কাতর-স্ববে নৌকা-ভাড়ার কিছু পয়সা, আমার নিকট চাহিল। যখন অনুষ্ঠান পদ্ধতির নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে, শিশুটির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সে সম্পন্ন করিতে পারিল, তখন তাহার মুখে যে আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমি কখনও ভুলিবে না।

এই প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম মানুষকে হতবুদ্ধি ও বিমূঢ় করিয়া ফেলে। যেমন একদিকে বৌদ্ধধর্ম জীবন্ত ও গভীর, তেমনি আবার অত্র দিকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম নিশ্চল ও উদ্ভট-কল্পনাময়। তথাপি, এই সমস্ত গূঢ়-রহস্যময় সাক্ষাতিক মূর্তির আবরণের মধ্যে, এই সব অসঙ্গত অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপের অন্তরালে, একটা বিরাট তত্ত্বের ধারণা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাঙ্গপেক্ষা পুণ্যতন এই যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম,—ইহার মধ্যে, সত্য ও মঙ্গলেব একটা মূল-আদর্শ আবিষ্কার করা যাইতে পারে।

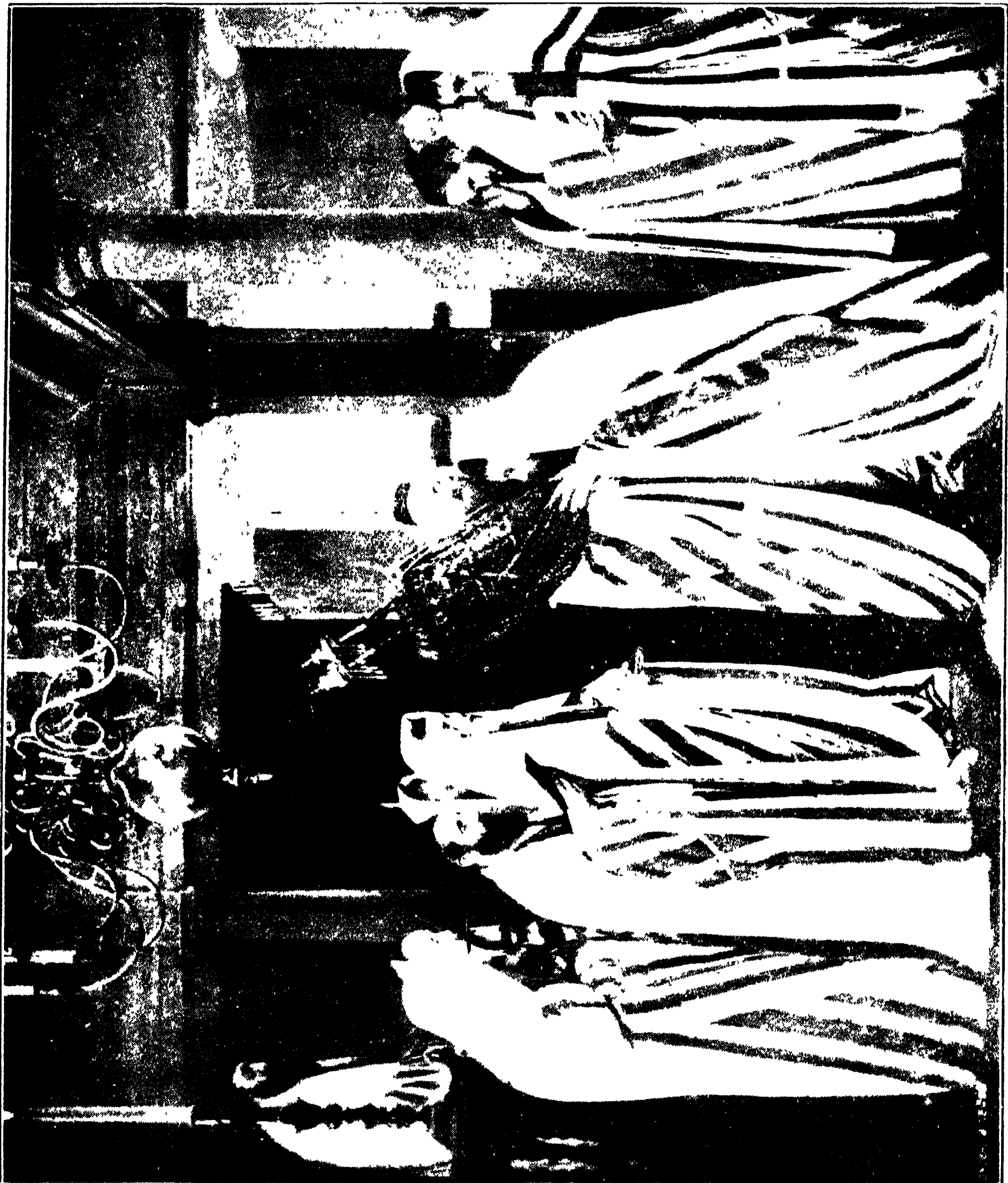
ব্রাহ্মণ্যধর্ম যেমন একদিকে সমস্ত পরম্পর-বিরুদ্ধ জিনিসগুলোকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছে ; যেমন একদিকে, গ্রহনক্ষত্র, নদনদী, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, দেব মনুষ্য—এই সমস্ত একত্র মিশাইয়া একটা অদ্ভুত খিচুড়ী প্রস্তুত

করিয়াছে, তেমনি আবার হিন্দুরা যেরূপ আপনাদের মধ্যে অসীমের অনুশীলন করিয়াছে, সেরূপ আর কোন জাতিতে করে নাই। বহু রূপের অতীত তাহারা একমাত্র অদ্বিতীয় সত্যকে গভীরভাবে দর্শন করিয়াছে ; তাহারা উপলব্ধি করিয়াছে, সমস্ত সত্তাই এক মহাসত্তা হইতে উৎপন্ন এবং সেই মহাসত্তাবই অংশ। সমুদ্র এক হইলেও, যেমন তাহার উত্থান-পতনশীল তরঙ্গরাজি, সমুদ্রকে বহুভাবে প্রদর্শন করিয়া বহুত্বের বিভিন্ন উৎপাদন করে, সেইরূপ জন্ম মরণশীল সমস্ত জীব ও সমস্ত পদার্থ বিশ্ব-জীবনেরই বিচিত্র ও ক্ষণস্থায়ী রূপ মাত্র। যে মহাপ্রকৃতি, আমাদের মনো-বৃত্তি দিয়াছেন, তাঁহা হইতেই যাহা কিছু এই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে ; আমরা সমস্ত মনুষ্যের ভ্রাতা, সমস্ত জীবন্তত্বের ভ্রাতা, সমস্ত বৃক্ষলতায় ভ্রাতা, গ্রহ নক্ষত্রের ভ্রাতা, মেঘ বিজ্ঞাতের ভ্রাতা।

গভীরতত্ত্বদর্শী দার্শনিক Maurice Macterlinck বলেন, —“যে স্থানে, আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তি, আমাদের সমস্ত হৃদয়-বৃত্তি বিকাশ লাভ করিতেছে, সন্নাগ্রে সেই স্থানকে যতদূর সম্ভব বিশাল করাই উচিত।” আমাদের সসীম সত্তাকে বিশ্ব-সত্তার অসীমতার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া ভারতের প্রাচীন ধর্ম,— নীতিধর্ম রহস্যের বেশ একটি উদারব্যাখ্যা দিয়াছেন। জগতের একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর উপর,

আমাদের দেহ বিচরণ করিতেছে ; আবার মৃত্যু আসিয়া আমাদের জীবনের দ্রুতগতি দিনগুলোকে অতি শীঘ্রই শেষ করিয়া দিতেছে। আমরা অসীম বিশ্বের সন্তান—আমরা এই সসীম জীবন-কারাগারে বদ্ধ থাকায় আমাদের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিতেছে। আমরা অহংএর সীমাগুলোকে ভাঙিতে চাই ; এবং বিশ্বজগৎ হইতে জীবন লাভ করিয়া বিশ্ব-জগতেরই জন্ত জীবন ধারণ করিতে চাই। ইহাই আমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। জ্ঞানের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা,—সমস্ত অসীম বিশ্বকে আমাদের সসীম অহংএর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবার জন্ত একটা গভীর অভাব আমরা অনুভব করিয়া থাকি। যে চেষ্টার প্রভাবে আমরা পাশবতার গাঁও হইতে বাহির হইয়া, ক্রমে পাশবতার উদ্ভে উৎখিত হই, সেই চেষ্টার উপবেই নীতিধর্ম প্রতিষ্ঠিত। সকল মানুষকেই ভালবাসা, সকল প্রাণীকেই শ্রদ্ধা করা, বিজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত সত্তাকে জানিবার চেষ্টা করা, চিরপরিবর্তনশীল পদার্থ সমূহের পরিবর্তন-দৃশ্য শিল্পীকে অনুভব দৃষ্টিতে দর্শন করা—ইহাই নীতিধর্ম। সত্য, সুন্দর, মঙ্গলের দিকে অগ্রসব হওয়া—ইহাই নীতিধর্ম। নীতিধর্ম,—বিশ্বাত্মার জ্ঞান ও প্রেমের সহিত একীভূত হইয়া অবস্থিত। সমস্তকে বুঝিতে পারা ও সমস্তকে ভালবাসা—ইহা যথেষ্ট বিশালতর আদর্শ আর দ্বিতীয় নাহি।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।



উইলিয়ম রদেনষ্টাইন।

মিঃ উইলিয়াম রদেনষ্টাইন ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকা প্রভৃতি স্থানেও তাঁহার চিত্র সাদরে সুরক্ষিত। তিনি সম্প্রতি কলিকাতায় আগমন করেছেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে আমাদের বিশেষরূপ পরিচয় ঘটেছে। আমরা সকলেই তাঁর স্বভাবসুলভ সরল ও অকপট ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি! তাঁর শাস্ত্র ও মুহূ মিস্ট্রালাপ বাস্তবিকই উপভোগ্য। তিনি আমাদের দেশকে যে কত ভালবাসেন তাঁর প্রত্যেক কথা থেকে তা বোঝা যায়।

তিনি কিছুদিন পূর্বে অজস্র প্রাচীন শিল্প কীর্তি দেখতে গিয়েছিলেন। রাজপুতানা বারাণসী, পুরী প্রভৃতি ভারতের দর্শন যোগ্য নানা রমণীয় স্থানেও তিনি পরিভ্রমণ করেছেন।

মিঃ উইলিয়াম রদেনষ্টাইন আমাদের দেশের শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, পুবাণ, উপপুবাণ আর আর বাবতীয় ধর্ম পুস্তকেবই ইংরাজী অনুবাদ পড়েছেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন, আশ্চর্যের বিষয়, আমরা পুস্তক পাঠে তোমাদের দেশের ঋষি তপস্বীদের তপজপাদির যে সব মহৎ কাল্পনিক চিত্র মনে একে থাকি তোমাদের এ দেশে সেই সকল চিত্র চোখেব সম্মুখে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই। যেখানে যাই, সেখানেই দেখি—রোমান শিল্পীর সমভ্রগঠিত স্তবকুঞ্চিত বসন পরিহিত মনুষ্যমূর্তি! তোমাদের বসন ভূষণ, ভাব ও ব্যবহার যেন ঠিক প্রকৃতির শোভার সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে ছবির ভাবে গড়া! তিনি আমাদের উত্তরীয়ের সুকৃষ্ণিত ভাঁজকে

নির্ঝরের শিথিল জলরাশির স্তরের সঙ্গে উপমা দেন। কিছুদিন হ'ল তিনি হাই-কোর্টের কাছে কোন গাছের তলায় সবুজ ঘাসের উপর একটি লোককে নিরুদ্ধে ঘুম'তে দেখেছিলেন। তার শোয়াব ভঙ্গীটা তাঁর এতই ভাল লেগেছিল যে, ৫ মিনিট কাল ধরে তিনি তাকে নিরীক্ষণ ক'রেও শ্রান্তিবোধ কবেন নি। তিনি বলেন,—কই এমনতর ভঙ্গীতে ইংলণ্ডে ত কাউকে কখনো শুতে দেখিনি—এ যেন ঠিক একখানি গ্রীক ছবির গঠিত মূর্তি।—তিনি তাঁর স্বদেশীয় মহিলাদের 'লেস' বহুল 'আঁটা-সাঁটা' সজ্জা আদৌ পছন্দ করেন না,—বরং শিল্পীর চক্ষে তা বর্ষের আদর্শ বোলে মনে করেন। আমাদের দেশের শিল্প-বিদার্থীদের বিলাতে শিল্প শিক্ষার জন্মে যাওয়ার তিনি একেবারেই পক্ষপাতী নন। তিনি বলেন, তোমাদের ভারতে শিল্পের উপকরণের কোনই অভাব নাই। তোমরা শিল্পের আব-হাওয়ায় বাস করচো; তোমরা ইচ্ছে করলে অতি সহজেই উৎকৃষ্ট শিল্পী হ'তে পার। তোমরা এটা জেনো! যে, We have many painters in Europe but few artists—অর্থাৎ “আমাদের ইউরোপে অনেক চিত্রকর আছে বটে; কিন্তু শিল্পী খুব অল্পই।” ঠিক ঐ একইরূপ উক্তি অকপট হৃদয়া মিশেষ হারিংহাম প্রভৃতি বিলাতের কতিপয় শিল্পীর কাছে আরও অনেকবার শুনেছি। আমার বিলাত-প্রবাসী বন্ধু “লণ্ডন রয়েল কলেজ অব আর্টের” ছাত্র শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় রায় চৌধুরী বিলাত থেকে আগাকে যে

চিঠি লিখেছেন তাতেও ঠিক ঐ রকমই কথা।
তিনি লিখেছেন, * * * "ভাই, এখানে
আসিস্ না। আমরা মনে করি, না জানি
ওবা কত জানে। আর ওরা যা ক'রে তাই

বুঝি ভাল!—এই খানেই আমরা আমাদের
নিজেকে হারিয়ে "হাঁ ক'রে ওদের দিকে
চেয়ে থাকি! ভাই! এতদিন ত এখানে
আছি, এদের "আর্ট" আমাদের প্রাণে মোটেই



উইলিয়ম রদেন্‌ষ্টাইন

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত চিত্র হইতে

লাগে না। সত্যি বল্টি! এদের সব চক্চকানি। এখন দেখচি আমাদের ঐ আঁধাবে-ছবির মধ্যে ঐ তার লুকিয়ে আছে। দেখ, এক আশ্চর্যের বিষয়! এদের দেশের অধিকাংশ ফুলে আদৌ গন্ধ নেই। এ পর্য্যন্ত আমি যত ফুল দেখলুম, একটীতেও গন্ধ পেলুম না।—বুঝি ছবিও সেই রকম! একেবারেই নেই কি?—তা' নয়, আছে—তবে, এখানকার 'আর্ট' physical beauty নিয়েই আছে।—তার প্রাণ নেই! জড় তনু-খানি রেখে প্রাণ ঘেন উড়ে গেছে!" * * *

হিরণ্ময় যেমন বিলাতে শিল্পের দৈহিক (physical) সৌন্দর্য্যের উন্নতির কথা লিখেছেন, রদেনষ্টাইনও ঠিক সেই কথাই আমাদের বলেন। তিনি বলেন,—আমাদের দেশে (ইউরোপে) শিল্পের যে প্রধান সম্পদ ভাব তা থাক বা নাই থাক হবহ ফোটোর মত ক'রে প্রকৃতির ছবি আঁকতে পারলেই শিল্পীরা সম্মানিত হন। তিনি তাঁদের পরিকল্পিত চিত্রাঙ্কনের (original design) রীতি বা' বললেন তা'তে ভারত ও বিলাতের শিল্প পদ্ধতির পার্থক্য বেশ সুন্দর ভাবে বোঝা যায়। আমাদের দেশের রীতিতে যেমন কোন চিত্র আঁকতে হ'লে প্রথমত চিত্রকর সেই চিত্রের ভাব, ধ্যানে বা মনে ঠিক করে নিয়ে—কোন কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকে অনায়াসে স্বাধীন ভাবে চিত্র আঁকতে পারেন—এ' তা' নয়। উঁহারা চিত্রের বিষয় ভাববার পূর্বে প্রথমত, কতকগুলি মানুষের বিভিন্ন ভঙ্গিতে বসে অবস্থার ছবি দেখে দেখে এঁকে নেন। পরে, ঐ ছবিগুলি একত্রে কিরূপে সাজালে সর্ব সাধারণের দৃষ্টি

আকর্ষক বেশ একটা জমকালো চিত্র হ'তে পারে সেইট দেখেন। এইরূপে যে ছবিটীতে মূর্ত্তি সন্নিবেশ সব চেয়ে সুন্দর দেখায় সেই রেখাঙ্কিত চিত্রটী চিত্রপটে (canvas) আঁকেন। তাবপর, রং দেবার সময় একজন লোককে 'মডেল' রূপে পূর্বাঙ্কিত ভিন্ন ভিন্ন লোকদের চিত্রের বেশে সাজিয়ে এবং সেই ভঙ্গিতে বারংবার বসিয়ে পুনঃপুনঃ সংশোধন ও পরিবর্তন কার্যা কবে থাকেন। রদেন-ষ্টাইন বলেন, ইউরোপে সকল চিত্রকরেরাই উক্ত নিয়মে পরিকল্পিত চিত্র এঁকে থাকেন।

তিনি ভারত প্রদক্ষিণকালে নানা স্থানে যে সকল সন্ন্যাসী, ফকির প্রভৃতির রেখাঙ্কিত চিত্র এঁকেছিলেন, সেই সব চিত্র এবং বিলাতে আঁকা তাঁর স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির চিত্রের অনেক-গুলি ফোটো আমাদের দেখা গেলেন। ছবিতে তাঁর স্ত্রীপুত্রের পরিচ্ছদ এত সাদাসিধে, যে দেখে আশ্চর্য্য মনে হয়!—বিলাতের শ্রমজীবী পরিবারে যেমন "লেস," "ফিল," প্রভৃতির বাহুল্য নেই, এও ঠিক সেই রকম। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন,—“আমার এই পছন্দ, এই জন্মেই আমাকে সাধারণ লোকের গালাগালি ও বিদ্বেষ সহ্য করতে হয়।”

আমরা তাঁর আঁকা ছবির যতগুলি ফোটো দেখলুম সমস্ত গুলিতেই তাঁর উদার ধর্ম্মভাব ও সরল অন্তঃকরণের ভাবটী বিশেষ ভাবে ঘেন ফুটে আছে। তাঁর ছবিতে আমরা বিলিতি perspective বা ছায়া আলোর (light and shade) আচার-গত অত্যাচার লক্ষ্য করলুম না।—অর্থাৎ, চিত্রের রেখা এবং ভাব নিয়েই তিনি ছবি আঁকেন। তাঁর মতে,—ব্রহ্ম যেমন এক, তেমনি শিল্পও

এক । সকল দেশেব সমস্ত ভাল শিল্প জগতের সকল শিল্পেব সঙ্গেই মিলবে । কিন্তু, সর্ব সাধারণের পক্ষে কথাটা ঠিক নয় ।—জন-সাধারণ চায়, চিত্র লিখিত মূর্তির সুন্দর মুখ ও সুন্দর গঠন, আর শিল্পী চান্ মুখের সুন্দর ও কমনীয় ভাবটী এবং গঠনের সুঠাম ভঙ্গী ! —সাধারণ চায়, নাট্যালয়ের সজ্জিতা রূপসী—শিল্পী চান, অস্তুরের মলিনা গৃহলক্ষীর অন্তর্ভাব’ ।

আমবা তাঁর আঁকা কবির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি রেখাঙ্কিত প্রতিকৃতি দেখেছি । এই ছবিখানিতে রবীন্দ্রের উপাসনা কালীন মুখের এবং অঙ্গের ভক্তি-পুলকসঞ্চারিত প্রকৃতির গন্তীর ভাবটী সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে । ভাবতীতে তাঁহার চিত্রের যে প্রতিলিপিখানি প্রকাশিত হচ্ছে এখানি “ধর্ম্মপ্রাণ যিহুদিদের ঈশ্বর-প্রেবিত ধর্ম্ম বিধির নিকট উপাসনাস্ত্রে বিদায় সময়ের প্রার্থনা ।”

তাঁর আঁকা শিশুপুত্র কোলে তাঁর সহধর্ম্মিনীর ছবিটী আমাদের অত্যন্ত ভাল লেগেছিল । তা’তে জননীর পুত্র-বাৎসল্য

মধুর ভাবটী যেন মূর্তিমতী হ’য়ে আছে । দুঃখের বিষয় ছবিখানি এত মূহ রেখাপাতে আঁকা যে তাব প্রতিলিপি হওয়া অসম্ভব ! এখানে রদেনষ্টাইন সাহেবের যে একটী সামান্য প্রতিকৃতি দিলুম সেটী—আমাদের গভর্নমেন্ট শিল্প বিদ্যালয়ে তিনি যখন শিল্পগুরু পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বেখাঙ্কন প্রতিকৃতি আঁকছিলেন, সেই অবকাশে আঁকা ।

অনেকে হয়ত জানেন না, বিলেতে ভারত-বর্ষীয় শিল্পশিক্ষার্থীদের ভারত-শিল্পেব উন্নতির জন্তে সাহায্য এবং উৎসাহ দেবার ইচ্ছায় সেখানকার অনেকগুলি প্রসিদ্ধ শিল্পী-মহাত্মারা মিলে একটী শিল্প-সমিতি গঠিত করেচেন । মিঃ রদেনষ্টাইন সেই সমিতির একজন প্রধান সভ্য ! এখানে হাইকোর্টের উড্‌ফ সাহেব, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি শিল্পোৎসাহী মহোদয়েরা Indian Society of Oriental art নামে যে একটী সমিতি গঠিত করেচেন বিলাতের উক্ত সমিতিও ঐ একই উদ্দেশ্যে স্থাপিত ।

শ্রী অসিতকুমার হালদার ।

বণ্টন ।

২। বেতন ।

উৎপাদিত অর্থের যে অংশ শ্রমজীবীদিগকে তাহাদের পরিশ্রমের জন্ত দিতে হয়, তাহাকেই বেতন বলে । বেতনও খাজনার স্থায় কোন কোন দেশে দেশাচারের উপর কোথায়ও বা প্রতিযোগিতার উপর

নির্ভর করে । ডাক্তার, কবিরাজ, ব্যারিষ্টার, উকীল প্রভৃৎকে পারিশ্রমিক বলিয়া যাহা দেওয়া হয় তাহা অনেক পরিমাণে দেশাচার নিয়ন্ত্রিত । অনেক সময় একরূপও দেখা যায় যে পুরাতন ভৃত্য বা কর্মচারী অল্প অধিক বেতন পাইলেও পুরাতন মনিবকে

পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুত চাকুরী লইতে ইচ্ছা করে না। অনেক মনিবও সুবিধা দরে বা অধিক কর্মঠ ভৃত্য পাইলেও পুরাতন ভৃত্য পরিত্যাগে ইচ্ছুক হন না। সাধারণতঃ, এই সকল ক্ষেত্র ব্যতীত প্রায় অপর সকল স্থানেই প্রতিযোগিতাই বেতনের হার নির্ধারণ করে। কর্মকর্তা শ্রমজীবা চাহেন, শ্রমজীবীগণ পরিশ্রম বিক্রয় কবিত্তে চাহে। কর্মকর্তা কম বেতনে লোক রাখিবাব চেষ্টা করেন এবং শ্রমজীবীগণ বেতনের হার বৃদ্ধি চেষ্টা করেন—এই দুই পক্ষের প্রতিযোগিতায় বেতনের হার নির্ধারিত হয়। মনে করুন তিন জন কর্মঠ এবং সমান অভিজ্ঞ চাকুরী-প্রার্থী কোন কর্মকর্তার নিকট কর্ম প্রার্থনায় উপস্থিত। এ ক্ষেত্রে যে প্রার্থী সর্বাপেক্ষা কম বেতনে কায়া করিতে চাহিবে কর্মকর্তা তাহাকেই নিযুক্ত করিবেন। একজন প্রার্থী বেশী বেতন দাবী করিলে অপর দুইজন কম বেতনে নিযুক্ত হইতে চাহিবে এবং সেইজন্য এই তিনজন প্রার্থীর প্রতিযোগিতা দ্বারা ঐ কর্মের বেতন নির্ধারিত হইবে। পক্ষান্তরে তিনজন কর্মকর্তা যদি কোন একজন শ্রমিককে নিযুক্ত করিতে চাহেন, তবে তিনজনেব মধ্যে যিনি অধিক বেতন দিবার প্রস্তাব করিবেন, তিনিই এই শ্রমিককে নিযুক্ত করিতে সক্ষম হইবেন।

উপরে আমরা যে বিষয়টি বিবৃত কবিলাম উহাকে অর্থনীতির ভাষায় শ্রমিকের “গ্রাহকতা” ও শ্রমিকের “সরবরাহতা” বলে। গ্রাহকতা ও সরবরাহতার উপরেই বেতনের হার নির্ধারিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে বেতন লোকসংখ্যা ও মূলধনের উপর

নির্ভর করে। উভয়েরই অর্থ এক। যাহারা শ্রমিকের বেতন দিতে পারেন তাহারাই শ্রমিকের গ্রাহক। শ্রমিককে যে বেতন দিতে হয় তাহা মূলধনেরই অংশ বিশেষ; সেইজন্য যাহারা শ্রমিকের পাবিশ্রমিক বাবত মূলধন ব্যয় করিতে সক্ষম, তাহারাই কেবল গ্রাহকতা বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং যত মূলধন এই কার্যে ব্যয় হইবে, ততই শ্রমিকের গ্রাহকতা বাড়িবে। সুতরাং গ্রাহকতা অর্থ “যে মূলধন শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া ব্যয় করিতে পারে”—ইহাও বলা যাইতে পারে। আবার যাহারা পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত তাহারাই শ্রমিক সরবরাহ করিতে পারে এবং সেইজন্য অধিক শ্রমিক সরবরাহ হইলেই বৃদ্ধিতে হইবে যে এই শ্রেণীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই হেতু যাহা বলা যেন যে বেতনের হার লোক সংখ্যা ও মূলধনের উপর নির্ভর করে তাহার। প্রকাস্তরে এই কথাই পুনরাবৃত্তি করেন যে বেতন গ্রাহকতা ও সরবরাহতার উপর নির্ভর করে। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি, যন্ত্রাদিব উৎপত্তি ও উন্নতি এবং মূলধনেব রপ্তানীর জন্ত অনেক দেশের বেতনের হার বৃদ্ধি হয় নাই।

বেতনের হার জনসংখ্যাব উপর নির্ভর করে, এ কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। প্রথমতঃ ম্যালথাস নামক ইংলণ্ডদেশীয় জনৈক অর্থনীতিবিৎ পণ্ডিত এই প্রস্তাবটী উত্থাপন করিয়া ইহার বিচার করেন। ম্যালথাস ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে Essay on Population নামক সুলিখিত প্রবন্ধে লোকসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি না পায় এই সব

আলোচনা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ, মড়ক, যুদ্ধ প্রভৃতি লোকসংখ্যা হ্রাসের দৈব উপায়, এবং অল্প বয়সে এবং কার্যক্ষম না হইলে বিবাহ না করা, লোকবৃদ্ধি নিবারণের স্বৈচ্ছাধীন উপায়। আমাদের দেশে প্রথমোক্ত কারণ অর্থাৎ ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষে অনেক লোক মারা যায় সত্য কিন্তু বাল্য-বিবাহে আমাদের দেশে যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। বাল্যবিবাহের ফল স্বরূপ রুগ্ন পীড়িত সন্তান সন্ততি দ্বারা সংসারের ও দেশের যে কোন কার্যই হয় না, একথা আমাদের সকলেরই বিশেষরূপে প্রণিধান করা কর্তব্য। (১)

ভিন্ন ভিন্ন দেশে কি কি কারণে বেতনের হারের তারতম্য হয় তাহার কারণ স্বরূপ আদম স্মিথ পঁচটি হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম, ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ের প্রকৃতি অনুসারে বেতনের তারতম্য দেখা যায়। কয়লার খনিতে যে সকল মজুর কার্য করে, তাহারা অগ্ৰাণ্য মজুরাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অধিক বেতন পায় কিন্তু ঐ প্রকার স্থানে কার্য করা কষ্টসাধ্য ও বিপজ্জনক। সেইজন্যই ঐ সব স্থানে মজুবগণ অধিক বেতন পায়। দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ব্যবসায়ে কৃতকার্য হইবার জন্য যে শিক্ষার আবশ্যিক সেই শিক্ষার ব্যয়ের উপর বেতনের হার নির্দ্ধারিত হয়। বিলাতে বড় বড় ব্যবসা শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমে কয়েকবৎসর ধরিয়া—২।৩ এমন কি ৪

বৎসরও শিক্ষানবিশী করিতে হয়। শিক্ষা শেষ হইলে অধিক বেতন পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও দেখা যায়, উকীলকে আইন পরীক্ষা পাশ করিতে যে অর্থব্যয় করিতে হয়, মোক্তারদেব সেরূপ অর্থব্যয় করিতে হয় না। সেইজন্য উকীলগণ মোক্তারদের অপেক্ষা অধিকাংশ স্থলেই অধিক অর্থ উপার্জন করেন। তৃতীয়তঃ যে যে কার্যের স্থায়িত্ব অধিক দিন, সে সব কার্যে বেতনের হার কিছু কম। বারমাসই রাজমিস্ত্রীরা বা ঘরামীরা কায পায় না; অনেক সময় তাহাদের বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু রাখাল বা অগ্ৰাণ্য যাহারা ভূত্যের কার্যে নিযুক্ত থাকে, তাহারা বার মাসই কাজ পায়; এইজন্য রাজমিস্ত্রীদের বেতনের হার সাধারণ চাকর অপেক্ষা বেশী। চতুর্থতঃ, কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তির দায়িত্বের উপর বেতন হ্রাস বৃদ্ধি হয়। যে সকল কার্য অধিক দায়িত্ববিশিষ্ট, সে সকল কার্যের বেতন বেশী। ক্যাসিয়ার, খাজাঞ্চী প্রভৃতি শ্রেণীর কর্মচারীগণের বেতন অগ্ৰাণ্য কর্মচারী অপেক্ষা, তুলনায় অধিক। পঞ্চম কারণ স্বরূপ আদম স্মিথ লিখিয়াছেন যে, কার্যে সিদ্ধিলাভের নিশ্চয়তা বা অনিশ্চয়তার উপর বেতনের নানাধিক্য যথেষ্ট নির্ভর করে। আদম স্মিথ এই প্রদক্ষে বলিয়াছেন যে, কেহ যদি জুতা

(১) অনেক ইংলণ্ডীয় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, of the children belonging to the upper and middle classes, only 20 p. c., die before the age of five. This proportion is more than doubled in the case of children belonging to the labouring classes." আমাদের দেশের সকলেই এই সব বিষয় বিবেচনা অত্যন্ত আবশ্যিক হইয়াছে। পুণ্যপাদ ডাক্তার মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও রায় সুরেন্দ্রনাথ বাহাদুর প্রমুখ যে "হিন্দু বিবাহসংস্কার সমিতি" সংস্থাপিত হইয়াছে, এরূপ সমিতি দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে হওয়া বাঞ্ছনীয় ও আবশ্যিক হইয়া পড়িয়াছে।

প্রস্তুত বা মেরামতের কার্য্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সে ঐ কার্য্য যে শিক্ষা করিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ থাকে না। কিন্তু আইন, ডাক্তারী ও অন্যান্য সুকুমার বিদ্যায় শিক্ষিত কেহ কেহ অধিক উপার্জন করেন, এবং কেহ কেহ অপরের তুলনায় কম উপার্জন করেন। এই দুই শ্রেণী অর্থাৎ যাহারা বেশী পান ও যাহারা কম পান—ইহাদের পাওনার ভারতম্য একের বেশী পাওয়া ও অপরের কম পাওয়া এ দুটাই সমান দাঁড়ায়।(২) মিঃ ফসেট তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে শীত ঋতুতে ইংলণ্ডের অন্তর্গত ইয়র্কশায়ারের শ্রমজীবীগণ ১৬।১৭ শিলিং সপ্তাহে উপার্জন করে কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে একই প্রকারের কার্য্যে নিযুক্ত ডর্সেটশায়ার বা উইন্টশায়ারের শ্রমজীবীগণ ১১ কি ১২ শিলিংয়ের অধিক উপার্জন করিতে পারে না। এগেট সাহেব ইহার কারণস্বরূপ লিখিয়াছেন যে ডর্সেটশায়ারের শ্রমজীবীগণের অজ্ঞতাই এই নিম্ন হারের কারণ। অশিক্ষিত বলিয়াই উহার একস্থান হইতে নড়িয়া অত্রস্থানে অধিক বেতনেও যাইতে চাহে না। ভারতবর্ষেও বিভিন্ন প্রদেশে বেতনের হারের ভারতম্য দেখা যায়। পূর্বেই বেতনের হার অধিক। যতই পশ্চিমে যাওয়া যায়

ততই বেতনের হার মিয়। কিন্তু যে সকল জেলায় লোকসংখ্যা কম, সেই সেই স্থলে বেতনের হার বেশী। ম্যালেরিয়া প্রসিদ্ধিত বর্ধমান বেতনের হার বেশী। বিহারে বেতনের হার কম। যে সকল নগরে বা বা নগরের নিকটবর্তী স্থানে কল বা ফ্যাক্টরী তথায় বেতনের হার অধিক। যে সকল স্থলে আকর বা খনির কার্য্য হইতেছে তথায়ও বেতন বেশী। কারণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, এসকল স্থলে অধিক সংখ্যক শ্রমজীবী আবশ্যক হয় এবং সেইজন্য বেতনও বেশী। ১৮৭৩ হইতে ১৯০৩ সনের বঙ্গদেশে, আসামে এবং পঞ্জাব প্রদেশে বেতনের হার বেশী হইয়াছে। টাকার হিসাবে ভারতবর্ষে ১৮৭৩ হইতে ১৯০৩ সনের সাধারণ শ্রমজীবীর বেতনের তালিকা আমরা প্রবন্ধের শেষভাগে যোজিত করিয়া দিলাম।*

দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেতনের হার সকল সময়েই বৃদ্ধি হয় না। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষকালীন যখন খাদ্যদ্রব্যাদি মহাঘর্ষ হয়, তখন অল্প বেতনে লোক পাওয়া যায়। শস্য নষ্ট হইলে লোকের বেতন দিবার ক্ষমতা থাকে না এবং সেইজন্য শ্রমজীবীর সংখ্যা বেশী হয় এবং তাহাদের বেতনও কম হয়। আবার যখন কৃষিজাত দ্রব্যের অধিক গ্রাহকতার জন্ম মূল্য বৃদ্ধি হয় তখন

(২) আদর্শমন্ত্রীর এই পক্ষম কারণ অনেকে স্বীকার করেন না। "A clergy man who is obtaining £ 100 a year, may feel assured that if he were engaged in some other occupation his income would be far larger ; but such a man may be prompted by a high sense of duty to enter the church or he may be influenced by the social position he obtains for being in it and therefore he choose his profession independently of pecuniary consideration."

* পৃঃ ১০৩৪ দেখ।

কৃষকগণ এবং ভূম্যধিকারীগণ অধিক লাভ করে এবং সেইজন্তু ঐ সময়ে বেতনের হার বৃদ্ধি হয়।

কি করিয়া শ্রমজীবীগণের বেতনের হার বৃদ্ধি করা যাইতে পারে—ইহার উপায় উদ্ভাবনের জন্তু অনেকে অনেকবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ আইনদ্বারা বেতনের হার নির্ধারণেরও উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এক শিক্ষার অধিক প্রচলন ব্যতীত অত্র কোন উপায়েই ইহা সম্ভবপর নহে। জাতীয় শিক্ষা যতই বিস্তৃত হইবে, ততই অত্র উপকারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবীগণের বেতন বৃদ্ধি হইয়া তাহাদের প্রভূত উপকার হইবে। সর্বত্রই ৮।১০ বৎসরের বালককে পাঠশালা বা স্কুল ছাড়াইয়া তাহাদের পিতামাতা তাহাদেব নিজ নিজ বাবসায়ে লাগাইয়া দেন। ইহাতে দেশের যে কি পরিমাণ ক্ষতি হয় তাহা বর্ণনাতীত। (৩) শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে চোর্যাদি অপরাধও কম হইবে এবং দেশের যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি হইবে। দেশান্তরে যাইয়া কাষের চেষ্টাও শ্রমজীবীগণের বেতন বৃদ্ধির অত্র উপায়। কিন্তু ইহা বলাই বাহুল্য যে ইহাও শিক্ষার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

৩। লাভ।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে খাজনা, বেতন ও লাভ, উৎপাদিত অর্থ এই ৩ অংশে বিভক্ত হইয়া সাধারণতঃ তিনজনের ভাগে পড়ে। যাহাদের ভূমি আছে তাহারা অপবকে ভূমি ভোগ দখল করিতে দেন এবং সেইজন্তু এক অংশের অধিকারী হন। এই অংশকে খাজনা বলে। যাহারা অর্থোৎপাদনের জন্য পরিশ্রম করে তাহারা তাহাদের পারিশ্রমিক স্বরূপ বেতন পায়! যাহারা মূলধন সরববাহ করে, সেই কর্তৃকর্তৃগণ যে অংশ পান তাহাকে লাভ বলে।

সঞ্চয় না করিলে মূলধন সংগ্রহ হয় না এবং মূলধনের অধিকারী ব্যয় না করিয়া যে সঞ্চয় করেন, তজ্জন্য অবশ্যই তাহার কিছু প্রাপ্য হয়। এই সংযম বা বীতস্পৃহতার জন্য অধিকারী যে পুরস্কার পান তাহাকেই লাভ বলে। মনে করুন, একজন কৃষক নিজের জমি ১০০ শত টাকার মূলধন লইয়া চাষ করিতে আরম্ভ করিল। এই মূলধন অবশ্যই শুধু কয়েকটা টাকা নয়। ইহাতে মাল মদলা, যন্ত্রাদি, শ্রমজীবীগণের বেতনের

(৩) "A child, who is taken from school when 8 or 9 years old rapidly forgets almost the whole of the little he has learnt. Widespread ignorance therefore, is a sure indication that a considerable proportion of the population has had inflicted upon it the manifold evils which result from premature employment. Health is sacrificed, physical vigour is diminished and strength often becomes exhausted at an age when men ought still to be in the prime of life. The mischief which thus results is not confined to the labourers themselves, the whole community suffers a severe pecuniary loss if the industrial efficiency of those to whom wealth is primarily produced is impaired." Fawcet : National Education to the Remedies for Low wages.

টাকা সবই ধরিতে হইবে। (৪) চাষের পরে ঐ জমি হইতে যে অর্থ উৎপাদিত হইবে, ঐ অর্থ হইতে একশত টাকার মূলধন উদ্ধৃত রাখিয়া যাহা বাদ থাকিবে, তাহাই কৃষকের লাভ। কিন্তু এক্ষেত্রে কৃষকের মূলধনের যথেষ্ট প্রতিদান হইবে না; কৃষক নিজে ও শ্রমজীবীগণের সঙ্গে পরিশ্রম করিয়াছে অথবা তাহাদের কার্য্য তত্ত্বাবধান করিয়াছে। এই পরিশ্রম বা তত্ত্বাবধানের জন্য সেও অবশ্যই পারিশ্রমিক পাইবে এবং সেইজন্য সে যে লাভ পাইবে তাহা হইতে তাহার বেতন স্বরূপ কিছু বাদ দিতে হইবে। বিশেষতঃ প্রত্যেক কার্য্যেই অল্পবিস্তর বিপদ আছে। কৃষক তাহার জমি হইতে ফসল উৎপাদন করিবার জন্য যে মূলধন প্রয়োগ করিবে, যদি জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ ফসল উৎপাদিত না হয় তবে মূলধন লোকসান হইবে। এই যে ভাবী বিপদ ঘাড়ে লইয়া কাজ করা, তজ্জন্ম কৃষক মোট যে লাভ পাইবে তাহা হইতে এই বাবদও কিছু বাদ যাইবে। এই সমস্ত কারণে কোন ব্যক্তি তাহার ব্যবসায় বা অন্য যে কোন কার্য্যেই লিপ্ত হউক না কেন সেই কার্য্যে যে লাভ পায় তাহা তিন অংশে বিভক্ত করা হয়। প্রথম সঞ্চয় ইহাকে সাধারণ কথায় সুদ বলে। দ্বিতীয় মূলধন হানির আশঙ্কা ও তজ্জন্মিত ক্ষতিপূরণ। তৃতীয় তত্ত্বাবধানের বেতন। বিশদভাবে এই তিনটি আলোচনা আবশ্যিক!

মনে করুন, রামমিস্ত্রী তাহার কাজের সুবিধার

জন্য একটি রেঁদা প্রস্তুত করিয়াছে! শ্রাম মিস্ত্রী রেঁদার সুবিধা দেগিয়া রামের নিকট এক বৎসরের জন্য রেঁদাটি ধার চাহিল। রাম বলিল যে, “বেঁদাটি সে নিজের ব্যবহার ও সুবিধার জন্যই প্রস্তুত করিয়াছে। একবৎসরান্তে শ্রাম শুধু বেঁদাটি ফেরত দিলে রামের কোনই লাভ হইবে না।” সুতরাং বাধ্য হইয়া বৎসরান্তে একটিনূতন রেঁদা ও তৎসঙ্গে একখণ্ড তক্তা ক্ষতিপূরণস্বরূপ রামকে দিতে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

বৎসরান্তে শ্রাম যখন রামকে একটি নূতন রেঁদা ও একখণ্ড তক্তা দিল; তখন রাম পুনর্বার ইহা ধার দিল; এই প্রকারে সে রেঁদাটি ৪ বার ধার দিয়া ৪ বারে ৪ খণ্ড তক্তা লাভ করিল। বর্তমানে তাহার পুত্রও বেঁদাটি ধার দিতেছে। এই গল্প পাঠে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে এক্ষেত্রে রেঁদাটি মূলধনের প্রতিক্রম এবং তক্তাখণ্ড সুদের প্রতিক্রম। শ্রাম ধার করিয়া এবং সুদ দিয়া সুবিধা পায় তাই রেঁদাটি রামের নিকট হইতে ধার লয়— তাহার সুবিধা না হইলে সে রেঁদাটি আর ধার লইত না। এই যে সুদ ইহা সঞ্চয়ের প্রতিদান। রাম রেঁদাটি নিজে যদি ব্যবহার করিত, তবে আর সুদস্বরূপ তক্তাখণ্ড পাইত না।

প্রত্যেক দেশই টাকা খাটানোর একরূপ উপায় আছে যাহা নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হয়। গভর্নমেন্ট কাগজের সুদের হার কম কিন্তু উহা সম্পূর্ণ নিরাপদ। এই বাবত যে

(৪) “Capital is that part of wealth which is set aside to assist future production” ভাবী অর্থোৎপাদনের জন্য অর্থের যে অংশ আলাহিদা করিয়া রাখা যায় তাহাকেই মূলধন বলে। মূলধন অর্থে শুধু টাকা নয়, গরু, মাগ মসলা, যন্ত্রপাতি যাহা কিছু ভবিষ্যৎ অর্থোৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাহাই মূলধন।

সুদ পাওয়া যায় তাহা সঞ্চয়ের পুরস্কার। সঞ্চয় করিয়া না রাখিলে ঐ টাকার সুদ পাওয়া যাইত না। বাহারা এই ভাবে টাকা খাটান তাহাদের লাভের অংশ এই একটী মাত্র উপাদান—সুদ। ইহাদের মূলধনহানির সম্ভাবনা নাই এবং উহার জন্য কোনরূপ তত্ত্বাবধানও করিতে হয় না।

আমাদের দেশে সুদের হার অত্যন্ত বেশী। গভর্ণমেন্টের কাগজের সুদের হার ৩।০ টাকা কিন্তু প্রচলিত সুদের হার ২৫।৩০ টাকা এবং কখন কখন চক্রবৃদ্ধি হারে যে সুদ পড়ে তাহা একশত টাকায় দেড়শত টাকা হয়। ইহার কারণ মূলধন হানির আশঙ্কা। যে সকল ব্যবসায়ের মূলধন হানির আশঙ্কা বেশী, সেই সকল ব্যবসায়ের লাভ বেশী। এ সকল ক্ষেত্রে “চোরের দশ দিন, গৃহস্থের একদিন।” কয়লার খনির কথা ধরুন। অশ্রান্ত ব্যবসায়ের অংশে যেরূপ ডিভিডেণ্ট বা লাভ পাওয়া যায় কয়লার খনিতে সাধারণতঃ তদপেক্ষা বেশী লাভ পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ হইতে পারে যে, যে খনি হইতে প্রচুর কয়লা পাইবার সম্ভাবনা, হঠাৎ সে খনিতে আর কয়লা নাই। এইরূপ আশঙ্কার কথা থাকে বলিয়াই এই প্রকার ব্যবসায়ের মূলধন হানির আশঙ্কা ও তজ্জনিত ক্ষতিপূরণও বেশী। স্থূল লাভ হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ বাদ দিয়া বাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে তত্ত্বাবধানের বেতন বলা যাইতে পারে। যে সকল কারণে বেতনের তারতম্য হয় সেই প্রকার কারণে লাভের অংশেরও তারতম্য হয়। অনেক কার্য

পরিদর্শনে অধিকতর নৈপুণ্য এবং সহিষ্ণুতা আবশ্যিক; অনেক কার্য তত্ত্বাবধান বিপজ্জনক। এষ্ট সকল ক্ষেত্রে এই সকল কার্য তত্ত্বাবধানে লাভের অংশ অপরাপর কার্যাপেক্ষা বেশী থাকে। দৃষ্টান্তরূপ মিসেস ফসেট কসাইয়ের ও বস্ত্রবিক্রেতার কার্য তুলনা করিয়াছেন। ইংলণ্ডে বস্ত্রবিক্রেতা অপেক্ষা কসাই অধিক লাভ করে। তাহার প্রথম কারণ, কসাইয়ের কার্য পরিদর্শন তত পছন্দনই নহে। দ্বিতীয়তঃ হঠাৎ ঋতু পরিবর্তন হইলে কসাইয়ের অনেক পণ্ড মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। এক্ষেত্রে মূলধন বিনষ্ট হইবার ষথেষ্ট আশঙ্কা থাকে এবং পরিদর্শনের অসুবিধা ও মূলধন বিনষ্টের আশঙ্কার জন্য লাভের অংশ অন্যান্য ব্যবসাপেক্ষা অধিক।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে এবং দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলে সুদের হার কম হয়। আমরা খাজনার বিষয় আলোচনা করিবার সময় রিকার্ডের নিয়মের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। এক্ষেত্রেও ঐ নিয়ম অন্য ভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। পরিশ্রম ও মূলধনের পুরস্কার উৎপাদিত অর্থের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অর্থাৎ যদি কোন কারণে সমপরিমাণ পরিশ্রম ও মূলধনপ্রয়োগ করিয়া এবং অন্যান্য বিষয় ঠিক থাকিয়া উৎপাদিত অর্থের পরিমাণ বেশী হয়, তবে বেতন ও সুদও বেশী হইবে। পক্ষান্তরে যদি কোন কারণে সমপরিমাণ পরিশ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়া অল্প অর্থ উৎপাদিত হয়, তবে সুদ ও বেতন কম হইবে। এক বস্তা চাউল “ধ্বংস” করিয়া যদি কোন

লোক দেড়বস্তা চাউল উৎপাদন করিতে পারে, তবে তাহার পরিশ্রম ও মূলধনের সে দেড়গুণ অর্থ উৎপাদন করে। কিন্তু যদি সে সও ১½ বস্তা উৎপাদন করে, তবে বেতন এবং লাভ শতকরা ২৫ কমিয়া যায়। কর্ষণের শেষ মাত্রা যতই নামিতে থাকে অর্থাৎ যতই কম উর্বর ভূমি কর্ষিত হইতে থাকে ততই বেতন ও লাভের অংশও কমিতে থাকে এবং জমির খাজনা বৃদ্ধি পায়; কেননা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নিকট জমি হইতে উৎকৃষ্ট জমি যে পরিমাণ অর্থ উৎপাদন করে, সেই অধিক অর্থই হইতেছে খাজনা। রিকার্ডো সত্যই বলিয়াছেন যে যতই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ততই খাদ্যদ্রব্যের গ্রাহক বেশী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অলৌপাদিকা জমি কর্ষিত হইতে থাকে। আবশ্যকীয় খাদ্য সেইজন্য অধিক ব্যয়ে উৎপাদিত হয় অর্থাৎ সমপরিমাণ পরিশ্রম ও মূলধনব্যয়ে অল্প অর্থ উৎপাদিত হয় এবং সেইজন্য বেতন ও সুদের হার কম হয়।

অর্থবিৎগণ বলেন যে, লাভের রেট পরিশ্রমের ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। শ্রমজীবীগণ যে বেতন পায় এবং তাহারা যে অর্থ উৎপাদন করে এই উভয়ের তুলনার পরিশ্রমের ব্যয় নির্ভর করে। এইজন্য যদি পরিশ্রম অধিক ফলোৎপাদক হয়, তবে পরিশ্রমের ব্যয় কমিয়া গেল; কেন না হয় সেই পরিমাণে বেতন দিয়া অধিক অর্থ উৎপাদিত হয় অথবা অল্প বেতনে সেই পরিমাণ অর্থ উৎপাদিত হয়। পরিশ্রম

অধিক ফলোৎপাদক হইলে লাভও বেশী হইবে এবং সেইজন্য শ্রমজীবীর বেতন এরূপ ক্ষেত্রে ঠিক থাকিলেও উৎপাদিত অর্থের পরিমাণ বেশী হইবে। যদি কোন উপায়ে পরিশ্রম অধিক ফলোৎপাদক হয়, তাহা হইলে শ্রমজীবীগণের বেতনের হার স্থির থাকিলে লাভের হার বৃদ্ধি হইবে। এইজন্য অর্থনীতিবিৎ মিল বলেন যে পরিশ্রমের ব্যয় ও লাভের হার তিনটি উপাদানে গঠিত (১) পরিশ্রমের কার্যকারিতা (২) শ্রমজীবীগণের বেতন (অর্থাৎ শ্রমজীবীগণের প্রকৃত পুরস্কার) (৩) বেশী বা কম খরচে যাহাতে এই প্রকৃত পুরস্কারের উপাদানসমূহ উৎপাদিত বা ব্যয় করা যাইতে পারে। যদি পরিশ্রমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় কিন্তু বেতন ও সাংসারিক খরচের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মূল্য বেশী না হয় তবে পরিশ্রমের ব্যয় কম হয়। যদি বেতন বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি না পায়, তবে পরিশ্রমের ব্যয় অধিক হয়। যদি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সস্তা হয়, তাহা হইলে বেতন কম হয় এবং কর্মকর্তার পরিশ্রমের ব্যয় কম পড়ে।

আমরা এই কয়েক পৃষ্ঠায় অর্থের বণ্টন সম্বন্ধীয় কয়েকটি স্থূল বিষয় আলোচনার প্রয়াস পাইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না। আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যবশতঃ অর্থনীতির অধিক আলোচনা নাই। অধিক কেন—নাই বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। এ বিষয়ে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আবশ্যক। (৬)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদার।

(৬) I am firmly convinced that we need to devote large sums to the founding of chairs of economics in our colleges "And again Let our people, as rapidly as possible be educated in the principles of economics." H. H. The Gaekwar of Baroda.

টাকার হিসাবে ভারতবর্ষে বেতনের তালিকা।

—টিমোটি

১৮৭৩ হইতে ১৯০৩
খুষ্টাব্দের বেতন
বৃদ্ধির অনুপাত *

| প্রদেশ | ১৯০৩ | ১৯০৪ | ১৯০৫ | ১৯০৬ | ১৯০৭ | ১৯০৮ | ১৯০৯ | ১৯১০ | ১৯১১ | ১৯১২ | ১৯১৩ | ১৯১৪ | ১৯১৫ | ১৯১৬ | ১৯১৭ | ১৯১৮ | ১৯১৯ | ১৯২০ | |
|--------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| বঙ্গদেশ | ৩৯.৩ | ৫১.৬ | ৬৩.৯ | ৭৬.২ | ৮৮.৫ | ১০০.৮ | ১১৩.১ | ১২৫.৪ | ১৩৭.৭ | ১৫০.০ | ১৬২.৩ | ১৭৪.৬ | ১৮৬.৯ | ১৯৯.২ | ২১১.৫ | ২২৩.৮ | ২৩৬.১ | ২৪৮.৪ | ২৬০.৭ |
| আসাম | ৪০.৪ | ৫২.৭ | ৬৫.০ | ৭৭.৩ | ৮৯.৬ | ১০১.৯ | ১১৪.২ | ১২৬.৫ | ১৩৮.৮ | ১৫১.১ | ১৬৩.৪ | ১৭৫.৭ | ১৮৮.০ | ২০০.৩ | ২১২.৬ | ২২৪.৯ | ২৩৭.২ | ২৪৯.৫ | ২৬১.৮ |
| যুক্ত প্রদেশ | ২২.৭ | ২৩.৭ | ২৪.৭ | ২৫.৭ | ২৬.৭ | ২৭.৭ | ২৮.৭ | ২৯.৭ | ৩০.৭ | ৩১.৭ | ৩২.৭ | ৩৩.৭ | ৩৪.৭ | ৩৫.৭ | ৩৬.৭ | ৩৭.৭ | ৩৮.৭ | ৩৯.৭ | ৪০.৭ |
| আগ্রা | ৪২.৪ | ৫৩.৭ | ৬৫.০ | ৭৬.৩ | ৮৭.৬ | ৯৮.৯ | ১১০.২ | ১২১.৫ | ১৩২.৮ | ১৪৪.১ | ১৫৫.৪ | ১৬৬.৭ | ১৭৮.০ | ১৮৯.৩ | ২০০.৬ | ২১১.৯ | ২২৩.২ | ২৩৪.৫ | ২৪৫.৮ |
| অযোধ্যা | ৪৩.৪ | ৫৪.৭ | ৬৬.০ | ৭৭.৩ | ৮৮.৬ | ৯৯.৯ | ১১১.২ | ১২২.৫ | ১৩৩.৮ | ১৪৫.১ | ১৫৬.৪ | ১৬৭.৭ | ১৭৯.০ | ১৯০.৩ | ২০১.৬ | ২১২.৯ | ২২৪.২ | ২৩৫.৫ | ২৪৬.৮ |
| পঞ্জাব | ৫১.২ | ৬২.৫ | ৭৩.৮ | ৮৫.১ | ৯৬.৪ | ১০৭.৭ | ১১৯.০ | ১৩০.৩ | ১৪১.৬ | ১৫২.৯ | ১৬৪.২ | ১৭৫.৫ | ১৮৬.৮ | ১৯৮.১ | ২০৯.৪ | ২২০.৭ | ২৩২.০ | ২৪৩.৩ | ২৫৪.৬ |
| মাদ্রাজ | ৬১.৫ | ৭২.৮ | ৮৪.১ | ৯৫.৪ | ১০৬.৭ | ১১৮.০ | ১২৯.৩ | ১৪০.৬ | ১৫১.৯ | ১৬৩.২ | ১৭৪.৫ | ১৮৫.৮ | ১৯৭.১ | ২০৮.৪ | ২১৯.৭ | ২৩১.০ | ২৪২.৩ | ২৫৩.৬ | ২৬৪.৯ |
| বোম্বাই | ৭২.৮ | ৮৪.১ | ৯৫.৪ | ১০৬.৭ | ১১৮.০ | ১২৯.৩ | ১৪০.৬ | ১৫১.৯ | ১৬৩.২ | ১৭৪.৫ | ১৮৫.৮ | ১৯৭.১ | ২০৮.৪ | ২১৯.৭ | ২৩১.০ | ২৪২.৩ | ২৫৩.৬ | ২৬৪.৯ | ২৭৬.২ |
| মধ্যপ্রদেশ | ৩১.৫ | ৩২.৫ | ৩৩.৫ | ৩৪.৫ | ৩৫.৫ | ৩৬.৫ | ৩৭.৫ | ৩৮.৫ | ৩৯.৫ | ৪০.৫ | ৪১.৫ | ৪২.৫ | ৪৩.৫ | ৪৪.৫ | ৪৫.৫ | ৪৬.৫ | ৪৭.৫ | ৪৮.৫ | ৪৯.৫ |
| বর্ম্মা | ২০.৫ | ২১.৫ | ২২.৫ | ২৩.৫ | ২৪.৫ | ২৫.৫ | ২৬.৫ | ২৭.৫ | ২৮.৫ | ২৯.৫ | ৩০.৫ | ৩১.৫ | ৩২.৫ | ৩৩.৫ | ৩৪.৫ | ৩৫.৫ | ৩৬.৫ | ৩৭.৫ | ৩৮.৫ |

ভারতী -

চৈত্র, ১৩১৭

১৯১৩-১৯১৪ খুষ্টাব্দের প্রভেদ

কাব্যে নিদাঘ-চিত্র।

(২)

মোটামুটি সংস্কৃতকাব্যে নিদাঘের ইতিহাসের কতকটা ছায়া পাওয়া গেল। সম্প্রতি পশ্চিমের কাব্য দেখা যাক।

গোড়াতেই সেক্সপীয়রের মধ্যনিদাঘের স্বপ্নের কথা মনে পড়ে। এই নাট্যের লবু কল্পনা মায়াবী উর্নানভের ঞায় নিবিড় হাশ্ব সৃজন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে।

নাটকটির প্রাথমিক সৃচনায় ট্র্যাজিডিভ যাবতীয় উপকরণ সজ্জিত ছিল। নাবীব প্রেম, পিতার নিষেধ, প্রেমপ্রার্থীর সংখ্যাধিকা, কণ্ঠার প্রেমসজ্বর্ষ-রজ্জুব একদিকে পিতাব মংলব, অপবদিকে ঈর্ষাকলুষিতা উপেক্ষিতা দ্বিতীয়া নাবীর উত্তপ্ত চিত্ত—এ সমস্ত ষোল আনাই ছিল।

হঠাৎ কোথা হইতে নিদাঘের এক দম্কা স্বপ্নমাথা হাওয়ায় এসব উড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ পরীরাজ্যের দাম্পত্যকলহ পাঠকের মন জুড়িয়া বসিল। তার পর অলস প্রেমপুষ্পের রসে ভালবাসারাজ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল! মানুষ, গর্দভ, পরী, কোন পার্থক্য রহিল না! কে কাহাকে ভালবাসে হিসাব নাই—সব এলোমেলো প্যাচের মাঝে পড়িয়া স্বপ্নবিভোর হইয়া গেল। ইহার নিবিড় কারণ রহিয়াছে। কিন্তু তাহা আলোচনার পূর্বে নিদাঘের প্রাণকথাটি একবার দেখা যাক।

প্রেমরাজ্যের ধূর্ত অধীশ্বর বসন্ত অপেক্ষা নিদাঘে কম তৃপ্ত নহে। বসন্তের মুগ্ধ অন্ধতা, রৌদ্রপীড়িতচিত্তে মত্ততার পরিণত হয়। পাগলের ধর্ম হুচে সে সব দিক সামলাইয়া

চলিতে পাবে না, হিসাব কেতাবে যথেষ্ট ভুল হইয়া যায়; একটা ঠিক করিতে গেলে আরও পাঁচটা ভুল হইয়া বসে। আতপ-ক্রান্ত মানবেব গ্রীষ্মঋতুতে সহজেই কার্য্যকারণের শৃঙ্খলটি সব দিক বাঁচাইয়া চলিবার উৎসাহ থাকে না। বিলাত এজ্ঞই একালে লোককে বোকা বলিবার সুযোগ খুঁজিয়া April Fool সৃষ্টি করিয়াছে।

ক্ষুদ্র প্রেমসম্রাটটি এজ্ঞ এই ঋতুতে অনুবাগমূলক নানা কোতুক সৃজন করিয়া উল্লসিত হয়। বসন্তেব মিলন প্রকৃতির সহজ মিলন;—গ্রীষ্মেও মিলন আছে—কিন্তু কাহার সহিত কে সম্মিলিত হইতেছে উক্ত স্বপ্ন-উত্তেজিত চিত্ত তাহা ঠাহর করিতে পারে না। এজ্ঞ “কিউপিড” বসন্তসহায় না হইয়া, নিদাঘের অতিরিক্ত উত্তেজিত হৃদয়েব ভিতর তাহার কারিগরী ও নষ্টামীর যেন বিশেষ সুযোগ পায়। কারণ বসন্তে অসম্বন্ধ, অসংযুক্ত, প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপারের সম্ভব সম্ভব নহে—তাহা বসন্তের ধর্ম নহে। কিন্তু নিদাঘের হৃদয়সাহারায় মরীচিকারূপে বসন্তেব যাবতীয় স্বপ্নস্মৃতি ছুটাছুটি করে,—কিন্তু হায়, তাহা বালুকারণির অলীক সৃষ্টি—তাহাব সহিত সামাজিকতা সম্ভব নহে। যে তাহার পশ্চাতে ছোটে সে পাগল কিম্বা বোকা। নিদাঘে বসন্তের ছায়া অন্তর্হিত হইয়া যায় না—কিন্তু দেশে একটু অতিরিক্ত উষ্ণতা, এবং ইউরোপে খররৌদ্রের কাঙ্ক্ষিত মাদকতা মস্তিষ্কের সন্ধিস্থল হইতে কোন পাঁচ খুলিয়া ফেলে। তাহাতে ব্যক্তি

বিশেষকে রূপার পাত্র করিয়া তোলে ।
কলে নানারূপ হাশ্বের উপকরণ লইয়া
কবিগণ নিদাঘের রহস্য কাব্য-স্বপ্ন গ্রথিত
করেন ।

বটম্ গর্দভের সহিত মানুষের বা পরীর
মিলন ব্যাপারে মুচ্ছিত হইবার কোন কারণ
দেখা যায় না । কারণ কবি বলেন, প্রেমের
দেবতা হিসাবকেতাব খুলিয়া বিচার করে
না । নরগর্দভরূপী অবতার Bottom
কেন, একেবারে নিখুঁত গর্দভের সহিতও
সুন্দরী Titania রাণীর গ্রীষ্মপীড়িত মস্তক
যুক্ত হইতে পারিত ।

অপরশ্রেণীর মিলন অভাবাত্মক ।
কালিদাস গ্রীষ্মঋতুকে সংহরণ করিয়া কাব্যে
এক অপূর্ণ স্বপ্ন গ্রথিত করিয়াছেন ।

মিলন যে কেবল প্রেমের ভিতর দিয়াই
সম্ভব, তাহা ঠিক নহে । অভাবাত্মক দিক্
হইতেও তাহা সংঘটিত হয় । জিঘাংসা,
নির্ভুরতার অভাব হইতেও যেমন মিলন
সম্ভব তাবাত্মক দিক্ হইতেও তেমনি ঘটে ।

ঋতুসংহারে কালিদাস হিংস্রপশুগণের
মাঝে দিবালোকে যে অপূর্ণ মিলন সম্ভব
করিয়াছেন তাহা অভাবাত্মক । তাহা হিংস্রতার
অভাবসম্মত—প্রত্যক্ষ প্রেমের আকর্ষণমূলক
নহে । ইহার মাঝেও একটি বিশেষ
উপভোগ্য নিবিড় হাশ্ব লুক্কায়িত আছে ।
সিংহকে ছায়াসিংহে পরিণত করা, খাণ্ডের
উপস্থিতি সত্ত্বেও খাদকের স্পন্দনহীন ব্যর্থতা
যেন দুর্বল প্রাণীজগৎ হইতে একটি অটুহাশ্ব,
বিদ্রুপরাগিনী—অরণ্যময় ছুটাইয়া দেয় ।
দম্ভ—অলিতগতি, শক্তি—আশ্রয়হীন, মোষ
ঔদাস্যে পরিণত হয় ।

যাহাই হোক না কেন দৃশ্যটি যথার্থতঃ
সুন্দর । বিপরীত ধর্ম্মীগণকে অভিন্ন বেদীতে
আহ্বান ব্যাপারটিই দুর্লভ । মানুষের মাঝে
নানা কবি Utopia কল্পনা করিয়াছে
কিন্তু অরণ্যজগৎ তাহাদের সঙ্কীর্ণ চিত্তের
পরিসরে স্থান পায় নাই । ভারতীয় চিত্তে,
মানব কেন, ষাবদীয় প্রাণী ও অপ্ৰাণী রাজ্যের
স্থান আছে—এজন্ত কল্পনার শীলার
তাহাদেরও নির্দিষ্ট স্থান আছে ।

কে বল কবির পক্ষেই এই অভিনব মিলন-
মন্ত্র ধ্বনিত করা সম্ভব । তাহার অঘটন
ঘটন পটীয়াসী ছায়াতুলিকা দ্বারা সৃষ্টির নিয়ম
বিপর্যস্ত হইয়া যায়—ইহাতে কবিরও আনন্দ-
আমাদেরও নিতান্ত কম নহে । কলিযুগে
বিশ্বকর্ম্মার জায় কবিই এই ললিত রাজ্য সৃজন
করেন ।

এই ধানেই কাব্যকলা বা আর্ট স্বভাবে
অতিক্রম করিয়া উচ্চতর রাজ্যে অগ্রসর হয় ।
চিত্তের সুন্দরমুখী বৃত্তি যতদিন বর্তমান থাকিবে
ততদিন এই রাজ্যের উত্তরোত্তর বিস্তৃতি
হইবে ।

নানা দার্শনিক, নানা পন্থায় হিংসা
নির্ম্মুক্ত এই মঙ্গলপথের ধ্যান করিয়াছেন ।
ইহারই ছবি পীড়িত ধরার মুক্তির জন্ত দ্বারে
দ্বারে বিবৃত করিয়াছে !

এক টি পলকে এই মহাদৃশ্যটি দেখান
সম্ভব হইলে তাহার প্রলোভন সঞ্চার নিশ্চি-
য়োজন ! এই জন্ত সংস্কৃত কবি নিদাঘকে
শুভলগ্নে এই পথে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়াছেন ।

ভারতের কবি এই মিলনে আনন্দ অনুভব
করিয়াছেন । ব্যাপারটি কাব্যের দিক্ হইতে
বা কল্পনার দিক্ হইতে অসত্যও নহে । দেশ

কাল নিমিত্তের মৌলিক ধর্ম অনাহত থাকিলেও সাময়িক শৃঙ্খলার বন্ধন সৌন্দর্যের খাতিরে অনেক সময় ছাড়িতে হয়। সৌন্দর্য্য সৃষ্টির গোড়াকার কথাও অনেকটা তাহাই; নতুবা কল্পনার ফাল্গুন দেশকালের মাধ্যাকর্ষণ অতিক্রম করিয়া অন্তরীক্ষে ছুটিতে পারিত না।

ঋতুমাণ্ডে গ্রীষ্মের স্থানটি বড়ই রহস্যময়। সন্ত অন্তর্হিত বসন্তের স্বপ্নস্মৃতি চম্পক গন্ধের স্রাব গ্রীষ্মে মস্মলিনদেহের শিরায় উপশিরায় সঞ্চারিত হয়! অপরদিকে মনোজ্ঞ, লোভনীয় বর্ষাঋতুর নিবিড় বেদনা ও ভবিষ্যতের দূর ক্ষেত্র হইতে স্বপ্ন পললে আনন্দছায়া নিক্ষেপ করে।

এই উভয় ঋতুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া নিদাঘ অনাদিকাল হইতে উভয়ের বৈচিত্র্য ও সজ্জা বিধান করিয়াছে। রক্ত পুষ্পাভরণ বসন্ত ও ও কন্দ-শিরিষ, মাধবী-কদম্বে সজ্জিত বর্ষা—উভয়ই গ্রীষ্মের সান্নিধ্যে পরম উপভোগ্য হইয়াছে।

পশ্চিম দেশের কবিরাও সেক্ষপীয়রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গ্রীষ্ম কাব্যকে সুদর্শন করিয়া তুলিয়াছে। কিট্‌স্ “মানব ঋতু বা Human Seasons নামক কবিতায় গ্রীষ্মের ধর্মটি বড় সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।—

“He has his summer ; when luxuriously
Spring’s honeyed end of youthful
thought, he loves
To ruminare and by such dreaming high
Is nearest unto heaven”

মহিলা কবি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং গ্রীষ্মবিদায় ও হেমন্তের আগমন উপলক্ষ্যে যে

কবিতাটি রচনা করিয়াছেন তাহাতে নিদাঘের আর একটা দিক্ দেখি। গ্রীষ্মোপভোগের পর সমাগত তুষারশীতল হেমন্তে গ্রীষ্মের স্মৃতিটি বাস্তবিকই অনির্কচনীয় বোধ হয়—বিশেষতঃ শৈত্যের লীলাভূমির অধিবাসীগণের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। আমরাও শীতের উপক্রমে গ্রীষ্মের উপভোগ্য উষ্ণতা যে কামনা করিমা এমন নহে।

“The summer sun is faint on them
The summer flowers depart ;
Sit still—as all transformed to stone
Except your musing heart.
How there you sat in summer time
May yet be in your mind
And how you heard the green wood sing
Beneath the freshening wind !”

কোকিল-কবি শেলির তুলিকায় গ্রীষ্মের আনন্দহিল্লোল চিত্রিত হইয়াছে। নিদাঘের এই আনন্দমর্ষর, পশ্চিমের সর্বত্র শোনা যায়—তাহাতে পৌরস্ত্য উগ্রতা নাই—নিদাঘের প্রাণরসে যেন লোকালয় সঞ্জীবিত হইয়া উঠে :—

All things rejoiced beneath the sun
the weeds
The river the cornfields and the reeds
The willow leaves that glanced in the
light breeze
And the firm foliage of the larger trees !

পূর্বদেশীয় উপাখ্যানমূলক কাব্য Lalla Rook প্রণেতা আইরিষ্ কবি মুর্ প্রণীত নিদাঘোৎসব বা Summer Fete নামক কাব্যটি বড়ই রমণীয়। নিদাঘের উদ্দাম কল্পনার উচ্ছ্বাস তাহাতে পাওয়া যায়।

ঠাহার “Irish melodies নামক কাব্যেও
এতৎসম্বন্ধে উপভোগ্য কবিতা আছে ।

স্বচ্ছ কবি বার্গসের নিদাঘসঙ্গীতটি কি
সুন্দর !

“Summer’s a pleasant time
Flowers of every colour
The water rins over the heugh
And I long for my true lover
Aye waukin O
Waukin still and wearie
Sleep I can get nane
For thinking of my dearie.”

Dearie যদি এ দেশেও গরমে ছুটফট
করিবার সময় উৎপাত আরম্ভ করে তবে
গ্রীষ্মের ক্ষুদ্রত্ব কিছু উৎকট হইবে সম্ভব
নাই ।

বাংলা সাহিত্যে নিদাঘের কথা নীড়ভ্রষ্ট
ভ্রমর গুঞ্জনের শ্রাব লেখকের কর্ণে বাজিতেছে ।
বৈষ্ণবকবির—

মাধব মাস বাদ বিধি সাধল
শিককুল পঞ্চম গান ।
দারুণ হুখিন পবন নাহি ভায়ত
ঝুরি ঝুরি না রহ পরাণ ।
জৈঠ হি মিঠ কহত সব রঙ্গিনী
চন্দন চান্দনী রাতি ।
শীতল পবন মোহে নাহি ভায়ত
দারুণ মনমথ সাথী ।

বৈষ্ণব কবির অন্তর্গুঢ় বেদনা ও কারুণ্যের
স্বর অজেয় । সংস্কৃত কবিদের গ্রীষ্মপীড়া
বাংলা দেশে একেবারে জ্বরে পরিণত
হইয়াছে—জ্বরের সহিত বাঙ্গালীর ঘন-
পরিচয়ের ফল যে ইহা নহে কে বলিবে ?
চণ্ডীদাসের ধ্বস্তুরি বলিতেছে :—

“শিরে শিরশূল পীড়িতির জ্বর
হায় থাকে যে রোগীর
বচন না চলে আঁখি নাহি মেলে
তাহারে পিয়াই নীর ।”

ধ্বস্তুরী জ্বর পরীক্ষা করিল :—
বাম হাত ধরি অঙ্গুলি মেলি
দেখে ধাতু কিবা বয় ।
পীরিতের জ্বরে জ্বরেছে ইহারে
পরাণ রয় কিনা রয় ।

বিগ্ৰহপতির বিরহজ্বরে ধূর্ত ডাক্তারের প্রয়োজন
হয় নাই । শীতল সলিল এবং চন্দনপঙ্ক
প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে :—

শীতল সলিল কমলদল লেপহি
লেপহ চন্দনপঙ্কা !
সো সব যতছ আনল সব হোয়ল
দশগুণ দহই যুগঙ্কা ।

বর্তমান যুগের জটিল বহুমুখী চিত্তচর্চার
কবিদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যনিদাঘের মায়াতরঙ্গ-
গুণি আশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত উপলব্ধি
করিয়াছেন । ইহাতে বাঁধা রাগিনীর চাপল্য
ও শীর্ণতা নাই, রসময়ী নিদাঘলক্ষ্মীর রুদ্র
চেহারার মাঝে লুক্কায়িত উৎসটি মুক্তালোক
রাজপথে তৃষ্ণার্জিত নরনারীর হৃদবাহু
নিবাইতেছে ।

“খেয়া”য় মুদ্রিত ঠাহার এ সম্বন্ধে শেষ
কবিতাটি হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

“তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ
আমলা গাছের কচি পাতায় ।
কোথা থেকে ক্রমে ক্রমে
নিমের ফুলে গন্ধে মাতায় ।
কেও কোথা নেই মাঠের পরে
কেও কোথা নেই শূন্য ঘরে
আজ দুপুরে আকাশ তলে
রিমিঝিমি নুপুর বাজে ।


বারে বারে ঘুরে ঘুরে
মৌমাছীদের গুঞ্জ সুরে
কার চরণেব নৃত্য যেন
ফিরে আমার বুকের মাঝে
বস্তু আমার তালে তালে
রিমিঝিমি নুপুর বাজে !”

নিদাঘলক্ষ্মীর এই অমূর্ত অলসমধুর
নিস্কন্ধ মধ্যাহ্ন নৃত্য আর কোথায়ও পাই
নাই। আমরা যেন ছন্দের মাঝেই নুপুর
শিঞ্জন শুনিতে পাইতেছি !

শ্রীযামিনীকান্ত সেন, বি-এল ।

সার্থক দান ।

এ সংসারে সবার সাথে অনেক কথা কই
একটি কথা আছে তোমার তরে,
নয়নপাতে শীরবে কত অশ্রুবোঝা বই
তোমার লাগি একটি ফোঁটা ঝরে ।
কত না সুরে গাহি যে কত গান
কত বেদনা কত যে অভিমান,
তাহার মাঝে একটি সুর ক্ষণে ক্ষণে বাজে
সে সুর শুধু তোমায় খুঁজে মরে ।
আশার কত কুসুম মনে ফুটায় তুলি নিতি
একটি আছে তোমার পদতলে,
কত বাসনা প্রদীপে মোর উজলি উঠে প্রীতি
একটি দীপে আরতি শিখা জলে ।

কত না রসে হৃদয় উঠে ভরি 
প্রকাশে রূপে নব মূর্তি ধরি
একটি রূপ রাঙিয়া রহে সে যে তোমার রঙে
একটি মণি ললাটে শুধু ঝলে ।
আঁধার পটে কত কত না তারা ফোটে নিবিড় রাতে
সেখায় একা তুমি জোছনা ধারা,
আলো আঁধার মিলেছে যেথা উনার আঁধিপাতে
সেখায় তুমি জাগিছ শুকতারা ।
কত ভাবনা নামে হৃদয়তীরে
একটি থাকে চরণ তব ঘিরে
জাগরণে জাগিয়া ছোটে কর্মধারা কত
একটি হ'লে তোমাতে হয় হারা ।
শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

গান ।

এই বাসন্তী বাতাসের মতন
প্রাণ কেন মোর হয় না ;
কেন এপার হ'তে ওপার সোজা
ভুবন ভরি বয় না ?
এই মনোবনের পুষ্পগাছে
যা কিছু মোর গন্ধ আছে,
সবার কাছে বিলিয়ে দিবার
ভার কেন সে লয় না !

ধনীর যেথা বিরাম ভবন
ভক্ত যেথায় পূজে,
হৃৎধী যেথা বিছায় শয়ন
প্রণয়ী প্রেম খুঁজে,—
সেই সবার সেবার সেবক হয়ে
সফল কেন রয় না !
কেন উদারতায় উদাস হয়ে
সকল বাধা সয় না !
শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ।

সমালোচনা।

নদীয়া-কাহিনী। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত। প্রকাশক, গ্রন্থকার, সাহিত্য সভা। গ্রে প্লীট কলিকাতা। ওলিম্পিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা বারো আনা। প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে নদীয়ার রাজনীতি, সমাজনীতি, প্রাচীন ইতিকথা, প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। আগাগোড়া একটা সুশৃঙ্খল ধারাবাহিকতা না থাকিলেও বহু তথ্যের সমাবেশে গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষায় যেন একটি প্রবাহ নাই, তাহারই ফলে এই সুদীর্ঘ গ্রন্থ স্থানে স্থানে একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। এ সকল সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও রত্নসঙ্কলনের জন্য গ্রন্থকার বঙ্গবাসী মাত্রেয়ই নিকট উৎসাহ ও কৃতজ্ঞতা লাভের যোগ্য। গ্রন্থের ছাপা বাঁধাই কাগজ বেশ পরিপাটি হইয়াছে।

সহজ সংস্কৃত শিক্ষা। প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ এম, এ প্রণীত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সনস্ কর্তৃক প্রকাশিত। উইলকিন্স প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য নয় আনা মাত্র। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ সহায়তা করিবে। এমন সহজ ও সরলভাবে গ্রন্থখানি লিখিত যে শিক্ষার্থী অনায়াসেই সকল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবেন, শিক্ষকের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না। ছাপা কাগজ ভালো।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত। শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর প্রণীত। ভারত-মহিলা প্রেসে মুদ্রিত। টাকা। মূল্য দেড় টাকা; কাপড়ে বাঁধাই সাতসিকা। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। বেশ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় সাধু-চরিত্রটি বর্ণিত হইয়াছে। কোথাও অনাবশ্যক টীকা টিপনী নাই, গোড়ামি নাই। এরূপ গ্রন্থপাঠে মনুষ্যত্বের বিকাশ-সাধন হয়, হৃদয় পবিত্র

মন উন্নত হয়। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর হইয়াছে।

বঙ্গের কবিতা। প্রথমভাগ। শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ দেব প্রণীত। কলিকাতা সাহিত্য সভা হইতে প্রকাশিত। জুনো প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। প্রাচীন কাব্যসাহিত্যের আলোচনাই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উদ্দেশ্য। রচনাটি আগাগোড়া হেঁয়ালির ছাঁচে ঢালা। বিশেষত্ব দেখিলাম না।

বৈজ্ঞানিক পাকপ্রণালী। ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ, এম, ডি, প্রণীত। কাস্টিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা মাত্র। গ্রন্থকার অল্পের মধ্যে খাদ্যবিচার খাদ্যপাক প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়াছেন। কোন্ খাদ্যের কি গুণ, আমাদের সংসারের নিত্য অপব্যয়ের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এবং তাঁহার নবাবিষ্কৃত 'ইকনমিক্ কুর্কর' নামক যন্ত্রের সাহায্যে রন্ধন করিলে কিরূপ সুবিধা হইতে পারে তাহাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকার বলেন তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে রান্ধিলে অনেক সম্ভায় অর্ধেক খরচে খাওয়া চলে। ভাতের ফেন ফেলিতে হয় না, কুঁড়া বাদ দিতে হয় না। কমদামী আ-চাঁটা মোটা চাউল বাপ্পে ঝাঁপ গলে বলিয়া তাহারও ব্যবহার চলে। আলানির খরচও অনেক কম। ভাত সুসিদ্ধ হয়। বাপ্পের রন্ধনে পুড়িয়া বা ধরিয়া যাইবার ভয় নাই—রান্ধিতে রান্ধিতে বিদেশে যাওয়া চলে। কয়লার মত হাতে কালি নাই, ধোঁয়া নাই, দুর্গন্ধ নাই ইত্যাদি। সকলেরই একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

শ্রীশ্রীফলাহারতত্ত্বম্। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অগ্ৰহু বিদ্যাভিনোদ সঙ্কলিতম্। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কবিকৃষ্ণেন বঙ্গানুদিতম্। যশোহর। মূল্য দুই আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি রহস্য-চিত্র হিসাবে মন্দ নহে। কলাহার সম্বন্ধে নানাবিধ

কৌতুক কবিতা সংস্কৃতে ও তাহার মর্ম বাঙ্গালা পয়ার ছন্দে গ্রথিত হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতার টুকরা-গুলিতে মূলের সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয় নাই। রসিকতাটুকু তেমন ধারাল নহে।

The Present State of Sanskrit Learning in Bengal. Vanamali Chakravarti, M. A. Published by Bhattacharya & Sons. College Street. Price Eight Annas. 1910 এ দেশে সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্র সম্বন্ধে লেখক আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের মতে

টোলের শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অপেক্ষা অধিক-তর ফলপ্রদ ও কার্যকরী। আলোচনাটুকু উপভোগ্য।

আরবজাতির ইতিহাস। (প্রথম খণ্ড)

শেখ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ কর্তৃক সংকলিত। প্রকাশক-মফিজ উদ্দীন আহমদ, দলগ্রাম, তুঘড়াওয়ার। রংপুর। মূল্য দেড় টাকা। গ্রন্থখানি সনামধন্য আমীর আলি রচিত History of the Saracens গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদের ভাষা সর্বত্র সরল ও প্রাঞ্জল না হইলেও গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যের সম্বন্ধে বৃদ্ধি করিবে। অনুবাদে মূলের ভাব সর্বত্র বঙ্গায় রাখা হুহুহু ব্যাপার—সৌন্দর্য্যহানি হইবার পক্ষে যথেষ্ট আশঙ্ক্য আছে। যতদূর দেখিলাম, অনুবাদক মূলের ভাব, তথাপি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। অনুবাদক মূল্য সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাঝেরই ধন্যবাদের পাত্র। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রহু। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ ভালো।

শাহাজলাল। শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন দেব, বি, এ, প্রণীত। প্রকাশক শ্রীশশিভবণ দাস, শিক্ষক, রাজা গিরীশচন্দ্র হাইস্কুল, শ্রীহট্ট। মূল্য ছয় আনা। 'হজরত শাহাজলাল কোন সময়ে শ্রীহটে আগমন করেন' তাহা লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে, গ্রন্থকার বিভিন্ন মতাদির সমালোচনা করিয়া যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাই পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থকার শিলালিপি ও অনেক প্রাচীন ইতি-

হাসের সাহায্যে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, "শাহাজলাল ১৩৫৪ খৃঃ অর্কে শ্রীহটে আগমন করেন।" গ্রন্থখানি মন্দ লাগিল না।

উষা। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাভিনোদ প্রণীত। গুপ্ত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা মাত্র। এখানি উপন্যাস। কালাপাহাড়, সুলেমান, মুকুন্দদেব প্রভৃতির চরিত্রচিত্রণই লেখকের উদ্দেশ্য—তথাপি লেখকের কথায় উহা 'ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে।' লেখকের ভাষাটুকু মন্দ নহে,—স্বচ্ছ ও সরল। তবে উপন্যাসে কোন আর্ট নাই। লিপিকুশলতারও একান্ত অভাব।

নবযুগের সাধনা। শ্রীযুক্ত কুলদাশ্রমাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ দত্ত, লোটার লাইব্রেরী, ৫০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা মাত্র। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। লেখকের মতে "একদিন ধর্ম্মে ধর্ম্মে অনেক বিরোধ অনেক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। * * * উহা মানবজাতির শৈশবের চপলতা মাত্র। * * * এই বিদ্রোহ ও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকে বালকহুলভ চপলতা ও অজ্ঞানতার ফল বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে।" এই বিশ্বধর্ম্ম-মহামিলনের প্রতিষ্ঠাকল্পে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রয়াস ও উদ্যম অপরিমিত। 'দেবালয়'-প্রতিষ্ঠাতেই তাহার পূর্ণ পরিচয়। বর্তমান গ্রন্থে শশিপদবাবুর সাধু-জীবনী-প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। লেখকের ভাষা বেশ সরল, গম্ভীর ও উপভোগ্য।

কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিহু। শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ছই আনা মাত্র। 'দেবালয়'র একটি অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল তাহাই পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানি কবির রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' খেয়া' ও 'গীতাঞ্জলি'—কাব্যগ্রন্থত্রয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। লেখক বক্তব্যটুকু ভালো করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারেন নাই—অনেক স্থলেই জটিল রহিয়া গিয়াছে—ভাষা ভালো।

THE HERALD. Edited by Krishna Charan Ghosh, Vedanta-Chintamani. January 1911. Annual Subscription Rs. 6. Office 64/1 Sukeas Street Calcutta. এখানি সচিত্র ইংরাজী মাসিক পত্রিকা। বর্তমান সংখ্যায় প্রবন্ধ কবিতা ও গল্পে অনেকগুলি বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত “ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের” ও কুমার মিত্র চীনা হইতে ইংরাজী অনুবাদ করিয়া যে দুইটি সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন, তাহা বেশ বৌদ্ধলোদীপক হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইসের ইংরাজী অনুবাদ বেশ হইতেছে। “ব্রহ্মসূত্র *স্কর-ভাষ্যমের” অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ রচিত “আত্মহত্যা” গল্পটি নিতান্তই উদ্ভট। বর্তমান সংখ্যায় অনেকগুলি সুন্দর চিত্র আছে। পত্রিকাখানিতে প্রবন্ধ বৈচিত্র্যের একটু অভাব লক্ষিত হইল। কেবলই প্রাচীন ইতিহাসের প্রসঙ্গ—একটু ‘একঘেয়ে’ মনে হয়। যাহা হউক, এ সামান্য ত্রুটি, ধর্তব্যের মধ্যে নহে। আমরা সর্বাংসুক্রমে পত্রিকাখানির উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি। কাগজ কভার ছাপা চমৎকার হইয়াছে। সমালোচক।

মরণ-রহস্য। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি.এল প্রণীত। কলিকাতা ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত। মেটকাফ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা।

গ্রন্থকার এই পুস্তকে মরণ কাহাকে বলে এবং মরণের পর আমাদের গতি কি হয় ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমেই গীতার মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন ‘আমি’ আত্মা—অমর, অমর—সুতরাং ‘আমি’ মরিতে পারি না। তাহার পর, তিনি চার্বাকের মত বিশ্লেষণ করিয়া তাহার খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি যে দার্শনিক হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। গ্রন্থকার বেদান্তদর্শন লইয়াও একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি “ব্যতিরেকস্তম্ভাবান্তাবিত্তান্ধ

পলঙ্কিবৎ” সূত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট বেশ সন্তোষজনক বোধ হইল না। এখানে ‘উপলঙ্কি’ শব্দের অর্থ কি—ইহা কি Mill ও Bainএর ‘Bundle of sensations.’? আমাদের বোধ হইল গ্রন্থকার ইহাব এইরূপ অর্থই লইয়াছেন— তাহা যদি হয় তাহা হইলে বাহ্য জগতের অস্তিত্বই ত প্রতিপন্ন হইল। মরণের পর আমাদের কিরূপ অবস্থায় থাকিতে হইবে গ্রন্থকার তাহা ‘বিশদ’রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা এত ‘বিশদ’ হইয়াছে যে তাহা পড়িতে পড়িতে পাঠকের ঠেংচাড়াটি হয়। হইতে পারে যে ইহাতে গ্রন্থকারের দৃঢ় বিশ্বাস আছে—কিন্তু একখানি দার্শনিক গ্রন্থে কোনও যুক্তি তর্কের অবতারণা না করিয়া—এরূপ dogmatically একটা মত লিখিয়া যাওয়া কোনমতেই সমীচীন নহে। ভূত প্রেতের সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা পাঠকবর্গকে না শুনাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। “এ দেহ ছাড়িয়া যখন আমরা আকাশে বা বায়ুস্তরে থাকি, তখনই আমরা ভূত প্রেত হই”, “কোন কোন ভূতপ্রেত যে আমাদেরিগকে বিভ্রাটিকা দেখায়, তাহা মিথ্যা নহে।” ভূতপ্রেত সম্বন্ধে এরূপ মৌলিক, দার্শনিক ব্যাখ্যা বড় একটা শূন্য যায় না। ‘দেবযান’ ও পিতৃযানের বিবরণে এবং চন্দ্রলোকে ‘অভিযানেও’ যথেষ্ট মৌলিকত্ব আছে। গ্রন্থকারের মনে রাখা উচিত ছিল যে তিনি বিংশ-শতাব্দীতে গ্রন্থ লিখিতেছেন। এই বর্তমান যুগে উদ্ভট কল্পনা-প্রসূত প্রলাপবণী অপেক্ষা যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের অধিক আদর, তাহা প্রতিষ্ঠাপন্ন গ্রন্থকারকে স্মরণ কবাইয়া দিতে লজ্জা ও ক্ষোভ হয়। উপসংহারে বক্তব্য, গ্রন্থকার আচার্য্যের মত মরণভয়গ্রস্ত বিশ্বাসীর নিকট এক অসুত-বাণীর আশ্বাস লইয়া আসিয়াছেন—কিন্তু অদৃষ্ট বিড়ম্বনায় তাঁহার সে আশ্বাস বাতাসেই মিলাইয়া যায়—কাহাকেও অভয়দান করে না।

লক্ষণ সেন ।

লক্ষণ সেনের রাজত্ব তিরভুক্তি বা ত্রিহৃত পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল । তিব্ভুক্তি কোন দেশ ? সীতাদেবীর যে দেশে জন্ম, নিশ্মলা বাগ্বতী বা বাগমতী যথায় প্রবাহিতা, যে দেশে মামাংসা, ত্রায় ও বেদাধ্যায়নপটু বটুগণের বাস, ভূদেব যথায় পৃথবী শাসন করিয়াছেন, ভৈবব যথায় বিবাজমান এবং গঙ্গা যাহার সন্নিকটে সেই দেশই তীব্ভুক্তি ; যথা—

যাতা সা যত্র সীতা সবিদ্মালা জলা

বাগ্বতী যত্র পুণ্যা

যত্রাস্তে সন্নধানা শুব নগব নদী

ভৈরবো যত্র লিঙ্গম্ ॥

মামাংসাত্রায় বেদাধ্যায়ন পটু ত্রৈবৈঃ

পণ্ডিতৈঃ মণ্ডিতায় ।

ভূদেবো যত্র দেবো যযন বসুমতী সাস্তি শ্বে

তীরভুক্তিঃ ॥

তথায় লক্ষণ সেনের দানশীলতা সম্বন্ধে এক মনোহর শ্লোক প্রচলিত আছে । চক্রবাকু আপন বধুকে কহিতেছে “প্রিয়ে, আর আমাদিগকে বিরহ যাতনায় অধীব হইতে হইবেনা ; কারণ আর অল্প দিবস গত হইলেই সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির বিনাশ হইয়া যাইবে” । চক্রবাকী কহিল “তাহাও কি সম্ভব ? আমাদিগেব কি একরূপ সুখের দিন আসিবে ? চক্রবাকু কহিল “আসিবে বৈ কি ? কনক গিরি অস্তাচলই যে লোপ পাইতেছে ; তাহা হইলে সূর্যাদেব আর কি করিয়া অস্তমিত হইবেন ?” চক্রবাকু ঔৎসুক্যের সহিত

কহিল “সে কেমন, সে কেমন ?” চক্রবাকু উত্তর করিল “বীর লক্ষণ সেন যেরূপ উন্মুক্ত হস্তে দানরত হইয়াছেন, তাহাতে তিনি ক্রমে ক্রমে সমুদয় কনক গিরিই নিঃশেষিত করিয়া ফেলিবেন” । যথা—

কতিপয় দিবসৈ সক্ষয়ং প্রয়ায়াৎ

কনক গিরিঃ কৃত বাসরাবসানঃ ।

ইতি যুদ যুপযাতি চক্রবাকী

বিতরতি লক্ষণ সেন দেব বারে ॥

ত্রিহৃতে লক্ষণ সেনের অক্ষ অধুনাও প্রচলিত । উহাকে সংক্ষেপে লসং বলে ।

পণ্ডিতগণ এখনো এই অক্ষ ব্যবহার করিয়া থাকেন । সন হইতে শকাব্দা ও লসং বাহির করিবাব তথায় তিরহৃতীয়া ভাষায় যে সম্বন্ধত-সূচক শ্লোক ব্যবহৃত হয় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

সনমহ লিখহঁ শর শনী বান ।

সো শাকে জানহঁ পরমাণ ॥

পুনি সন বান ইন্দ্র শব খো এ ।

বাঁকি বাত্রে লসং বিলো এ ॥

অর্থাৎ—

সনের অঙ্কের সহিত—শব (৫) শনী (১) বান (৫) যোগ দিলে শাক প্রাপ্ত হওয়া যায় ; এবং সন হইতে বান (৫) ইন্দ্র (১) শর (৫) বিয়োগ করিলে লসং প্রাপ্ত হওয়া যায় । অক্ষয় বামা গতিঃ ধরিলেও তাহাই হয় ।

শ্রীশশিভূষণ বিখাসু ।

বর্ষশেষ ।

আর একটি বৎসর চলিয়া গেল । স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী সুখ দুঃখের তরঙ্গ সমভাবেই তাহার বক্ষ আলোড়িত করিয়াছে ! কিন্তু সে সুখ দুঃখের দিকে চাহিয়া ভাবিবার আমাদিগের সময় নাই—আমরা কাজ করিতে আসিয়াছি, কাজ করিয়া যাইব । সুখদুঃখ প্রকৃতির দান—তাহা চিরদিনই সমভাবে মানবসমাজকে আঘাত করিবে । আমাদিগের নিকট ইহা সহিষ্ণুতার এক-খানি পরখপাথর মাত্র । তবু আজ এই বর্ষের শেষ দিনে মুহূর্তের জন্ত দাঁড়াইয়া সংক্ষেপে একবার—আমরা কি হারাইলাম আর কি-ই বা পাইলাম, তাহার আলোচনা করিয়া লইলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না ।

রাজনীতিকক্ষেত্রে আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাপদ সম্রাট, সম্ভ্রম এডোয়ার্ডকে বর্ষারস্তেই আমরা হারাইয়াছি । ভারতবাসীর প্রতি তাঁহার জ্ঞান স্নেহ ও অক্ষুণ্ণ সহানুভূতির সীমা ছিল না । কিন্তু নদী তরঙ্গে যেমন এক কুল ভাঙ্গে, অপর কুল গড়িয়া উঠে, তেমনি তাঁহার পুত্র নবীন সম্রাট পঞ্চম জর্জকে আমরা রাজাসনে পাইয়া তাঁহার স্নেহ সহানুভূতি লাভে নূতন আনন্দে সে দুঃখ ভুলিয়াছি । দুঃখ ক্ষণিকের, ঝটিকার ছায় তাহার প্রভাব অচিরস্থায়ী ; ইহাই জগতের নিয়ম ।

লর্ড মিণ্টো ভারত শাসনকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহার স্থানে আমরা সদাশয় মহানুভব লর্ড হার্ডিংকে পাইয়াছি । লর্ড মিল্লির আসনে আজ লর্ড

ক্রু ! মাননীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের স্থানে সৈয়দ আমির আলি প্রতিষ্ঠিত ।

লর্ড হার্ডিং মহোদয় ইতিমধ্যেই প্রজাবর্গের হৃদয়ে আপনার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । ছদ্মবেশে ছাত্রাবাস সমূহ পরিদর্শন করিয়া তিনি ছাত্রগণের সহিত অসঙ্কোচে বন্ধুভাবে মিশিয়াছেন, তাহাদিগের সুখদুঃখের সংবাদ লইয়াছেন, এদৃশ্যে ভারতবাসী আজ আনন্দে উল্লসিত ! বর্তমান ভারত ইতিহাসে এ এক নূতন যুগের সূচনা দেখা দিয়াছে । লেডি হার্ডিং তাঁহারই যোগ্য সহধর্ম্মিনী । আমাদের দেশ ও দেশবাসীর প্রতি তাঁহারও স্নেহ ও সহানুভূতির আমরা যথেষ্ট পরিচয় পাইতেছি । ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে সকল বাধা বন্ধ তাঁহার সাদর ব্যবহারে আজ টুটিবার উপক্রম দেখা যাইতেছে ।

লেডি হার্ডিং মহোদয় ইংরাজ মহিলাগণের সহিত বাঙ্গালী মহিলাগণকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করেন ।—অভ্যাগতাদিগের প্রতি সাদর সমাদরে রাজাপ্রজার সুদূর সম্পর্ক সেদিন যেন ডুবিয়া যায় ;—আতিথ্যের প্রীতি-মধুর আপ্যায়নে অভ্যাগতাগণ যে আনন্দ লাভ করেন, যেন তাহা বর্ণনাশীত ! তিনি সেদিন প্রতি নিমন্ত্রিতার নিকট স্বহস্তে মিষ্টান্ন খাল ধরিয়া আতিথ্যের মর্যাদা রক্ষা করেন । এই আদর্শ অতিথিসংকার ভারত মহিলাগণের পক্ষেও অমুকরণীয় । এইরূপ আদর ব্যবহারে ভারতবাসীর চিত্তে আজ শুধু শ্রদ্ধা ও সম্মান নহে, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার বহু বহিরা চলিয়াছে !

জন্মগ- যুবরাজ এ বৎসর ভারতে আসিয়া আমাদের সুখদুঃখের পরিচয় লইয়াছেন! তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহাবে, সুমধুর আপ্যায়নে তাঁহার হৃদয়ের আমরা যে পরিচয় পাইয়াছি; তাহাতে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, তাঁহার হৃদয় রাজারহৃদয়েরই মত—অপূর্ব মহিমায় মহাধান!

সম্প্রতি তিনি শিকাবোদে গেলেন সুন্দরবন গিয়াছিলেন। তাঁহার সহযাত্রী জটনৈক শিকারী বাঘ কর্তৃক আক্রান্ত ও আঘত হইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রেরিত হইয়াছিলেন। যুবরাজ সেখানে তাঁহাকে দেখিতে যান! এই ঘটনা তাঁহার সহনশক্তির ক্ষুদ্র পরিচয়মাত্র।



জর্মানিার যুবরাজ ও তাঁহার পত্নী।

বর্ষশেষের একটি নিদারুণ দুঃখের কথা,— কিছুকাল পূর্বে যে অসংঘম ও উচ্ছৃঙ্খলতায় দেশ জর্জরিত হইয়াছিল, আমরা ভাবিয়াছিলাম তাঁহার শেষ হইয়াছে—কিন্তু কয়েকদিন পূর্বে একজন কর্তব্যপরায়ণ পুলিশ কর্মচারীর হত্যা ও লালদীঘির ধারে এক দুর্ভাগ্য যুবকের বক্ষের আচরণে তাহাব পুনরভিনয় দেখিয়া আমরা যাবপন্ননাই নিরাশা ব্যথিত হইয়াছি। এ কি উন্মাদ হৃৎস্পর্শিত্তি! কি বলিয়া এই

সকল কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবককে তাহাদেব ছক্রিয়াব পরিমাণ বুঝাইক, তাহা জানি না। ইহারা এইরূপ কার্য দেশেরও কিরূপ অকলাণ সাধন করিতেছে, তাহা বুঝবার শক্তিটুকুও যে তাহাদের নাই ইহাপেক্ষা অধিকতর ক্ষোভের বিষয় আর কি থাকিতে পারে? সুখের বিষয় এইকপ উদ্ভ্রান্ত বালকের দল নিতান্তই নগণ্য।

রাজনীতির ত্রায় সাহিত্যক্ষেত্রেও আমরা

এইবর্ষে ধীরপদে অগ্রসর হইয়াছি। এই এক বৎসরে বহু সঙ্গ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। নানা স্থানের ইতিহাস সঙ্কলিত ও সংগৃহীত হইয়াছে। নূতন লেখকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে! বহু উদীয়মান লেখক সাহিত্যের মর্যাদা রক্ষার উপযোগী হইয়া উঠিয়াছেন। চাৰিধারে একটা আন্তর্বিধিক সাধনার পরিচয় পাওর গিয়াছে!

এই স্থখে দিনে তুংখের হস্ত হস্তেও আমবা নিস্তার পাই নাই। অকু ব্রহ্ম সচি তা-সৈবী চন্দ্রনাথ, ভোলানাথ, কৃষ্ণচন্দ্র, সুকান্ত রজনীকান্ত, মনসী কালীপ্রসন্ন, সুপ্রসন্ন বাগ্মী ও লেখক শিশিরকুমারকে আমবা হারাইয়াছি।

এ বৎসর অসাধারণ প্রতিভাশালী আচার্য্য কাট্টে লিও টলষ্টয়, ও সহৃদয়া কুমাবৌ ফ্লোবেন্স নাইটিংগেল ইহজগত পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদিগেব সহিত ভাবতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সম্পর্ক না থাকিলেও, তাঁহাদিগেব প্রভাব সমগ্র জগতের পক্ষে কল্যাণজনক। তাই তাঁহাদিগেব মৃত্যুতে জগতের যে ক্ষতি হইল, তাহা কখনো পূরণ হইবে কি না জানি না!

অতঃপর অতীত তুংখ শোকেব জন্ত বৃথা অনুশোচনা না করিয়া নাবর্ষে নূতন দিবসে অগ্রসর কর্তব্য পথে অগ্রসর হওব। ভগবান আমাদিগেব মঙ্গল হউন!

বর্ষ-বিদায়।

আমের মুকুল স্মরণিয়া আঁধারে মিশিছে নিখের ফুলে,
মান স্থাপিতুর্কু কাঁপিতে অধরে অগ্র আঁধার কলে'
নীরবে কে গুই যায়,—
ফুল-পুলকিত কাননের পথে নিশীথেব স্মরণাথ!
কত না তারারু, খণ্ড-জোছনা, কত স্নেহ, কত প্রীতি,
কত স্রুণ আঁখি চেয়ে আছে কত তিত্ত-মধুব স্মৃতি!
কত আশা, কত ভয়,
কতই গরব, কত সে কুণ্ডা—ফুল-কণ্টকময়!
বকুল মরিয়া সুরভি-স্বর্গ ভুবনে বেছেছে পাতি;
সারা যামিনীর যে আলো নিবিল কোথা গেল তার ভাতি
বুক ভরে হাহাকারে,
লুতার লালায় লিপ্ত কুঁড়িটি পাপ ড় মেলিতে নাগে।
কিশোর আশার কিশলয় তুংখের আঁধার বঁধে নীড়?
শুক হৃদয়ে সংশয় আর দুর্ভাবনার ভিড়!
ব্যসন, কলহ, ক্রোধ
ব্যথিছে আজিকে সারা বরষের অপমান বিদেহ।
অঞ্জলি ভরি' সুন্দরী উষা যে যেনা গেছিল ঢালি,
নিশীথের কালো নিকষে কষিতে কলিল কি কল কালি?
জগতের আনাগোনা
সে কি হ'ল তবে নয়ন জলের মত আগাগোড়া লোণা!

অতীত অশোক গাঁথিতে কি হায গাঁথোছি অপরাজিতা
প্রাণের ক্ষতিক পাত্রে তেলেছি মিতার সঙ্গে তিতা?
বিশ্ব কি বিশ্বাস?
একি তুল নথ?—নহেক ক্ষণিক—এই মোহ অবগাদ?
বাণ ফুল পাতা মাটি হ'য়ে বায় জাগে তায অধুব,
মৃত্যু প্রবল কবে উঠে ন জীবনের ক্ষাণ স্র
ওবে! নাই নাই শোক,
তাকিছে আবার অনন্ত তর বরষের নিম্নোক্ত!
বিশ্ব-নাটো নূতন অর্পণী নীরবে কে দ্বাষ টান?
শামুকের বেহ-ন'ড়ে বার্ডন গো কক্ষ আরেকখানি!
পুনাতন অসমান!
তারার কিরণ-সঙ্গম দিবে অর্পিতকে পূণা জ্ঞান!
নব জীবনের বজ্রাৎ—সে যে বেদনার বুকুে খেলে,
শিকড় কাটখা সফল কবে গো নিফলে অবহেলে!
ভাঙ' গড়া অসা-বাণীয়া,
ফুল ফোটারার, কুল করানাব, অপকা এই গাওয়া!
নিম ফুল আপ আমেব মুকুল চুমে আজি ধূলিকণা,
তিত্ত আভাসে বক্ষে ধরিছে মধুব মস্তাবনা!
পুরাণ চলিয়া যায়,
অশ্রু সরস ক্ষীণ হাসি একা নূতনের পথ চায়।

শ্রীমহোদয়নাথ দত্ত।

